

তিলোত্তমা মজুমদার

# বসুধারা





প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০২ থেকে তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০০৩ পর্যন্ত  
মুদ্রণ সংখ্যা ৪০০০  
চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৩ মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০

© তিলোত্তমা মজুমদার

ISBN 81-7756-278-9

অন্য পাবলিশার্স রাইটেট লিমিটেডের পাশে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন  
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরভূমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং  
দ্বারা প্রিন্টিং ওয়ার্কস রাইটেট লিমিটেড  
৪২ বাজা রামমোহন রায় সর্গনি কলকাতা ৭০০ ০০৯  
(থেকে মুদ্রিত)

মূল্য ২৫০.০০

ভায় গোঙ্গামী  
অজ্ঞাপনেনবু





কল

সৈয়দ মুজাফ্ফার সিদ্দিকী, অতীত বঙ্গোপাধ্যায়, হর্ষ দত্ত  
শিল্পী রায়চৌধুরী, অভিজিৎকুমার মল্লিক



বসুধারা





অরুণ সেনের বাড়ির ছাদে প্রতিদিন লাফিয়ে নামেন সূর্য এবং সারা মাথুরের গড়ে আলো ছড়িয়ে দেন। অরুণ সেন এই মাথুরের গড়ে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি সন্দেহ নেই, আবার তাঁকে নগণ্যও বলা চলে, কারণ বৈভব-সাম্রাজ্য ছাড়া তাঁর অস্তিত্বে এমন কোনও মন্দির নেই যা তাঁকে তাঁর পরবর্তী ভবিষ্যতে পৌঁছে দেবে। এবং অন্য কারণ—তাঁর চলাফেরায়, জীবনযাপনে, কর্মকাণ্ডে কোথাও এতটুকু গোপনীয়তা নেই। লোকে তাঁকে নিয়ে আর কীই-বা আলোচনা করবে। যে-তোরঙ্গ একবার খুলে গেছে তা নিয়ে আর মানুষের ঔৎসুক্য থাকে না। তবু, সূর্য প্রতিদিন অরুণ সেনের ছাদে অবতরণ করেন এবং চতুর্দিকে আলো দেন। কোনও অজ্ঞাত কারণে, লাফিয়ে নামার জায়গা হিসেবে ওই ছাদই তাঁর পছন্দ। প্রশ্ন উঠতে পারে যে অরুণ সেনের ছাদ না থাকলে তিনি কী করতেন। সে-ক্ষেত্রে উত্তরটি সরল। ছাদ না থাকলে সূর্যের কাজ আরও সহজ হয়ে যেত। ও বাড়ির ছাদ এই এলাকায় সবচেয়ে উঁচু ও প্রাচীন। সূর্য মাটি ছেড়ে ঠিক যেখানটায় উল্লঙ্ঘন শুরু করেন সেই জায়গাটিই আড়াল করে দাঁড়ানো। সুতরাং বাড়িটি না থাকলে, ছাদই না থাকলে, সূর্য মাটিতে উঁকি দিয়েই সহজে সব দিকে আলো ছড়াতেন—এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

লোকে বলে রানি রাসমণির জামাই মথুর এ অঞ্চলের মালিকানাপ্রাপ্ত ছিলেন। তার কোনও শ্রামণ্য তথ্য নেই শুধু জায়গার নামটি ছাড়া। আর লোকের ভো নাম নিতে জুড়ি নেই, গল্প ছড়াতেও না। সুতরাং এ নামের পেছনে কোনও ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠিত নয়। এ পাড়ার আদি বাসিন্দারাও এখানকার ইতিহাস বলতে পারেননি। কারণ হয়তো-বা, বংশপরম্পরায় আঞ্চলিক ইতিহাস মনে রাখার দায় বা গুরুত্ব তাঁরা বোধ করেননি। ইতিহাস কখন কোথায় প্রয়োজন হবে, কেই-বা আসে থেকে বোঝে। সে-দিক থেকে দেখতে গেলে এই মাথুরের গড়ের এতদিন কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্বই ছিল না। বরানগর অঞ্চলের আর পাঁচটা সাধারণ পাড়ার মতো সে পাড়ে ছিল এবং আপনা ধর্মে জীবন বইয়ে দিচ্ছিল। সন্তানের গোড়া থেকে নকশাল আন্দোলনের সময় বরানগর-কানীপুর যখন আবার প্রাত্যহিক খবর হাতে থাকল তখন তারই মধ্যে মাথুরের গড় নামটিও বেশ জলাজানি হল।

অবশ্য ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য পেয়েও অনেক জায়গা ইতিহাস হয়েছে, এরকম দেখা যায়। মাথুরের গড়ও সে-রকম হতে পারে। এ কথা ঠিক যে এই পাড়াটি বেশ উঁচু। আর বরানগরের অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চল বরানগরের গর্ব হয়ে ওঠে এ কারণে যে, এই অঞ্চলের চারপাশ নদীবেষ্টিত এবং এই মাথুরের গড় ভূখণ্ড নদীতলের চেয়ে উঁচু হয়ে কূর্মপুত্তের মতো জেগে আছে, তেমনই উচ্চতম হয়ে, যেখানে বর্ষায় জল দাঁড়ায় না।

নামে কী যায় আসে। ইতিহাসেই বা কী। জনজীবন যেমন চলার তেমনই চলে। তবে ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য যে-কোনও অঞ্চলই কিছু সুবিধা-অসুবিধা পায় বটে। আর সে-দিক থেকে বলতে গেলে মাথুরের গড়ের উত্তরে রেললাইন ও ফটিক বিল। ফটিক বিলের ধারে যে জনবসতি তা দরিদ্রের বাসস্থান বলে ফটিক বিলের বস্তি নাম পায়। এই ভূখণ্ডের পশ্চিমে গঙ্গা

ও দক্ষিণেশ্বর। উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত সদা ব্যস্ত বি টি রোড এবং বি টি রোড থেকে একটি শাখার মতো বেরিয়ে এসেছে পি ভবু ডি রোড, যা দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে গেছে। অর্থাৎ ফটিক বিলের অবস্থান কলা যার উত্তরপশ্চিম কোণে এবং মাথুরের গড়ের সর্ব সৈধ্যানে প্রথম জালো কখনওই ফেলেন না। প্রথমে তিনি লাফিয়ে নামেন অরুণ সোনের ছানে এবং ভালাসের জোড় আসন করে বসে দরিদ্র জনগণকে জালো বিতরণ করেন।

এ নিয়ে কখনও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি কারণ এমনটাই হয়ে আসছে যিন্মাং। অর্থাৎ চিরকাল ধরে হয়ে আসে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকে মানুষের কাছে। এতটাই অস্বাভাবিক যে যুগে যুগে যে-ইতিহাস রচিত হয়েছে তাতে দেখা গেছে এই মহাজগৎ সম্পর্কিত প্রতিটি মূল প্রশ্ন ও যথাযথ উত্তরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হত্যা ও রক্তপাতের কাহিনী। তার কারণই এই যে যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত কোনও সত্য ভেঙে ওঠে এইসব প্রশ্ন উঠে এসেছিল। কোনও কালেই তার ব্যতিক্রম হয়নি। অর্থাৎ কোনও সত্য, যা মানুষ গ্রহণ বলে ভাবতে শেখে এবং নিজস্ব সুবিধার জন্যও গ্রহণ রাখতে প্রয়াস পায়—তাতে ভাঙন ধরে কোনও না কোনও দিন। সেইসব ভাঙনের কাল। উন্মাদের কাল। এমনকী এ কালেও মানুষের সমস্ত অধিকার সম্পর্কিত কিছু সত্য ও মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিল কেউ কেউ এবং হত্যালীলা সম্পাদিত হয়েছিল। এখন সে-প্রসঙ্গ চাপা আছে বটে, তবে কখন কার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে আবার এবং সেইসব উচ্চারণের ক্রিয়াকলাপে তৈরি হবে অস্ত্রের কারখানা এবং নতুন নতুন অস্ত্রের নীচে কুস্ত-পেট ফুটো হয়ে কখন গড়াতে গড়াতে নেমে যাবে মানুষের লাল গরম রক্ত তা কেউ বলতে পারে না। যেমন এই মাথুরের গড়, কোনও বর্ষায় এখানে জল জমেনি, কিন্তু হঠাৎ কোন বর্ষায় তা ভাসতে শুরু করবে কে বলতে পারে।

গঙ্গায় বান এসে বানের জল পি ভবু ডি রোড ধরে তেঁতুলতলা অবধি এসে হামলে পড়েছে ফটিক বিলে আর বিলের জলে অশুভি সংশোধন খটিয়েছে। কিন্তু মাথুরের গড়ের টিকি ঝুঁতে পারেনি কোনও দিন। অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে বরানগর বা মাথুরের গড় বা ফটিক বিলের জন্য কলকাতা মহানগরী ও তার খালবিলের মানচিত্র শ্রবণ করতেই হয়। কারণ মহানগরীর হাল-হকিকত এসে আছে পড়বেই তার উপকণ্ঠে এবং জল থাকলে জল সমেত বইয়ে দেবে চারপাশে। কলকাতা যাদের ওপর নির্ভরশীল সেই নোয়াই, বিদ্যাধরী ও বাগজোলা খাল কূলটি নদীতে সব পরস্পর সংযুক্ত। নোয়াই খালের বহমানভা বরানগর এলাকা থেকে দূরে নয়। আবার বাগজোলা খালও এই এলাকা ছুঁয়ে গিয়ে এমন হয়েছে যে নোয়াই ও বাগজোলা উপজালে এসব অঞ্চলের নিচু অংশ একেবারে ভেসে যায়।

কলকাতার ওপর বিদ্যাধরীর প্রভাবও কম নয়। এই বিদ্যাধরী নদীই ছিল একসময় এবং কুলের ভূগোল বইতে তা এখনও নদী হয়ে বেঁচে আছে বটে তবে বাস্তবে তার অস্তিত্ব নদীমাতৃসুলভ নেই। সে এখন মজে যাওয়া, হেজে যাওয়া, জঞ্জাল ও কচুরিপানা ভর্তি খাল, যার জলধারণ ক্ষমতা শূন্যে ঠেকেছে।

নোয়াই খালের অবস্থাও তাই। বাগজোলা খালেরও। প্রায় বারো বছর আগে একবার নোয়াই খাল সংস্কারের প্রস্তাবনা হয়েছিল কিন্তু ঠিকঠাক পরিকল্পনার অভাবে সেই সংস্কারে নোয়াই-এর ভাঙন ঠেকানো যায়নি। ফলত প্রতি বছর বর্ষায় যা হয় তাতে এভাবে সংবাদপত্রগুলি জানায় যে—

ঢালা থেকে বিরটি পর্যন্ত উত্তর কলকাতা ও শহরতলির জলনিকাশি ব্যবস্থা গুরুতর সংকটে। আবার ফন বর্ষায়, এমনকী ভারী বর্ষার আগে স্বল্প বৃষ্টিপাতেও জল জমে যাচ্ছে সিথি-কাশীপুর-বরানগর-নিমতা-কামারহাটি-বিরটি প্রভৃতি অঞ্চলে ...।

এরকমই হয়। প্রতি বছর। প্রতি বর্ষায়। বৃষ্টির জল জমে। খালের জল, নদীর জল উপচে

এসে বিল ভরিয়ে দেয়। বিলের জল উপচে উঠে আছড়ে পড়ে ঘরে-উঠানে। প্রথমে তাই ফটিক বিল বস্তির সব দুয়ারে পায়ের পাতা ডোবে। তারপর, দিন জোলে, জল পায়ের গোছ ছাড়ায়। চৌকাঠ গলে যায়। ওই জলে ময়লা ভাসে। আবর্জনা ভাসে। আর সব সমেত-খব্রে ঢুকে যায়। কটা দিন একটু কষ্ট। তাতে বস্তির কোনও কাজ আটকায় না। বাড়ার জন্ম পর্যন্ত হয়। কাজের মানুষেরা জলে হাঁটু অবধি কাপড় তুলে কাজে বেরোয়। কদিনেই পা কটকট করে। হাজা ধরে। বাবুবাড়ির গিন্নিদের কাছ থেকে তখন মেয়ে-বউরা, যারা কপ্তি ছেড়ে কাজ করতে আসে, চেয়ে নেয় হাজার মলম বা বোরোলীন। খানিক নিজে মাখে। খানিক দেস্তা বা পানের কৌটোয় পুরে বাড়ি নিয়ে যায় বরের জন্য, লাগিয়ে দেবে পায়ের।

এরকমই হয়ে আসছে চিরকাল আর চিরকালের মতো। শুকনো জাঠা হয়ে ভেসে থাকছে মাথুরের গড়। কোনও দিন, কোনও কালে এখানে জল দাঁড়ায়নি। কে জানে, যদি সত্যি এ জায়গা রানি রাসমণির জামাই মথুরাবাবুর হয়ে থাকে তবে হয়তো একারণেই যে এই জমি, দিনের পর দিন, এমনকী বর্ষাও, মাথা তুলে জেগে থাকে যেমন পলাতক পুত্রের জন্য আছে মা। সে-ইতিহাস কোথাও লেখা নেই। শুধু নামটুকু আছে।

পাড়া বলতে খুব ছোট বলা যাবে না মাথুরের গড়কে। দরিদ্রও বলা যাবে না। সমৃদ্ধ, সঙ্ঘল ও ধনী পরিবারগুলির বাস এখানে। পশ্চিম বাংলার স্থায়ী বাসিন্দাদের পাশাপাশি বাস নিয়েছেন পূর্ব বাংলা থেকে চলে আসা পরিবারগুলি। তাঁদের মধ্যে যারা প্রতিষ্ঠিত, অর্থবান, তাঁরা আছেন এ পাড়ায়। আর যারা নড়বড়ে, তাঁদের বাস পি ডব্লু ডি বোড পেরিয়ে ওপারের উদ্ভাস্ত কলোনিতে।

এই মাথুরের গড়ের এক প্রান্তে বি টি রোডের ধার ঘেঁষে ব্রজগোপালের গুহুখের দোকান। সেখানে আজ্ঞা বসেছিল। সমরেন্দ্র বলছিলেন, তবে তুমিই-বা শ্রদ্ধাশ্রাদ্ধের পূজা না করে দক্ষিণাকালীর পূজা করে না কেন? ওই ভয়াল রূপেই তোমার ভক্তি? দক্ষিণাকালীর শাস্ত শ্রীময়ী রূপ দেখে ভক্তি আসে না?

মল্লিনাথ মুচকি হেসে চুপ করে আছেন। সে-দিনের কাঠামো ভেসে আসার কথা তিনি আজ পর্যন্ত কাউকে বলেননি। মাধবী আর লিলি ছাড়া কেউ কিছু জানেন না। তাঁর দুই ছেলে অমলেন্দু, কমলেন্দুও নয়।

মল্লিনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে বিতর্ক উসকে দিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। এই আজ্ঞায় তিনিই সবচেয়ে কমবয়সি সদস্য। বনছগলি বি পি সি কলেজে বাংলা পড়ান। বললেন, কালী শব্দের উৎস কী, ডাক্তারদা?

মল্লিনাথ বললেন, কাল শব্দের উত্তরে হ্রী লিঙ্গে ঐ প্রত্যয় যোগে কালীর সৃষ্টি। কালী মহাকালের অংশ। দশ মহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা। অন্যরা হলেন তারা, যোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ত্রিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, রাজরাজেশ্বরী বা কমলা। আদ্যাশক্তি দুর্গার এই দশ মূর্তি। অনন্তকালের শক্তিরূপিণী পরমা প্রকৃতি। কালীকে ভয়াল বলছ কেন? প্রকৃতি তো মা। আর ওই ভয়দশনা রূপ তো আমাদেরই গড়া। আমরা যখন যেমন রূপের কাছে শক্তি চেয়েছি, তেমনই গড়েছি।

এত কথা একসঙ্গে বলে কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন মল্লিনাথ। তাঁর করোটির তলায়, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণমুখের কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসছিল। সত্যি বললে? সত্যি? ভয় করো না তুমি? কালীকে? অভিযাপকে? রূপচাঁদের আত্মাকে?

কিন্তু এ সব কথা কারওকে বলার উপায় নেই তাঁর। ভয় পাওয়া প্রকাশ করারও উপায় নেই। নিজের সমস্ত অনুভব নিজেরই মধ্যে গোপন করতে করতে মুখের রেখাগুলি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টাে ছিলেন তিনি। আনিসুজ্জামান তাঁর কথার পুষ্টে প্রসঙ্গ গেঁথে নীরবতা ভেঙেছিলেন। বলেছিলেন, কাল শব্দের আর একটি অর্থ যে মৃত্যু তা তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন

না ডাক্তারদা।

মল্লিনাথ বলেছিলেন, না, তা পারব না। তবে কালীর আরাধনা মানে মৃত্যুর আরাধনা নয়। বরং রোগ, শোক, ভয় ও দুঃখনাশিনী হিসেবেই আমরা কালীকে ডাকি।

অনিসুজ্ঞামান একটু হেসে চোখ বন্ধ করে গাঢ় গলায় বলেছিলেন—

ওঁ ব্রাহ্মহি ভগবতাস্ত্ব ভক্তানুগ্রহবিগ্রহে।

যোগিনীভিঃ সমং দেবি বক্ষার্থং মম সর্বদা ॥

ওঁ মহাপদ্মবনাস্ত্বৈ কারুণানন্দবিগ্রহে।

সর্বভূতহিতে মাতরেহেহি পরমেশ্বরী ॥

মল্লিনাথ ও সমরেন্দ্র একসঙ্গে হাততালি দিয়েছিলেন— চমৎকার! চমৎকার!

সমরেন্দ্র বলেছিলেন, এত চমৎকার স্তোত্র পড়ে তুমি জানতাম না তো! কোথায় শিখলে?

অনিসুজ্ঞামান বললেন, অবাক হলেন তো! আপনাদেরই মন্ত্র। কিছু বলতে পারবেন এ কোন মন্ত্র?

সমরেন্দ্র মাথা নাড়লেন। পারবেন না। পূজা-পার্বণ সম্পর্কে সমস্ত ধারণা নেই তাঁর। অনিসুজ্ঞামান বললেন, এটি দেবী কালিকার আবাহন মন্ত্র। ঠিক বললাম ডাক্তারদা?

মল্লিনাথ সাহ মিলেন। ঠিকই বলেছেন অনিসুজ্ঞামান। এর পরই পঞ্চমুদ্রা দ্বারা দেবীকে আবাহন করতে হয়। তারপর যজ্ঞমাস। হনু, শির, শিখা, কবচ ও ত্রিনেত্র এবং অস্ত্র। কারও কারও মতে অবশ্য যজ্ঞ মানে মন্তক, হস্তদ্বয়, কোমর, চরণদ্বয়।

সমরেন্দ্র লাজুক লাজুক মুখে বললেন, কিছু মনে করো না অধ্যাপক, না জানলে আজ কিছুতেই মনে করতাম না তুমি হিন্দু নও।

অনিসুজ্ঞামান হেসে বলেছিলেন, ইলেভেন পর্যন্ত সংস্কৃত পড়েছি সমরেন্দ্রদা। আর সাহিত্য পড়তে গেলে একটা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'-একটা ভাষার চর্চা হয়েই থাকে, জানেন তো। সংস্কৃত জানা আছে বলে অনেক বই আমি মূল থেকে পড়তে পাই।

মল্লিনাথ গুনগুন করছিলেন। ব্রজগোপাল বললেন, জোরে হোক না মল্লিদা। শ্যামাসংগীত পাইছিলে তো? নজরুলের সেই গানটা, না?

সমরেন্দ্র অবাক গলায় বললেন, নজরুলের শ্যামাসংগীত? আছে নাকি?

মল্লিনাথ বললেন, জানো না তুমি? তবে শোনো। দু'হাত ছড়িয়ে দরজা গলায় তিনি গান ধরলেন—

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা।

পরমাপ্রকৃতি জগদম্বিকা ভবানী ত্রিলোক পালিকা ॥

অসাধারণ কণ্ঠ মল্লিনাথের। ভারী এবং সুস্বচ্ছ। খুব বেশি গম্ব তিনি জানেন না। যে-গুটিকয় গাইতে শুরু করেন তাতেই এতখানি প্রাণের ছোঁয়া থাকে যে কান পেতে শুনেই হৃদয় হয়।

ফুটপাথ দিয়ে লোক চলাচল করছিল। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল। সাড়ে আটটা বাজতে যায়। ব্রজগোপালের দোকানের সামনের ফুটপাথের পাশে বি টি রোডের অংশ দখল করে তৈরি হয়েছে ছোট রিকশা স্ট্যান্ড। বাস্তব, ক্রেনাস্ক বি টি রোড থেকে সারাক্ষণ ব্রজগোপালের দোকানে উঠে আসে মেথ্যা, ধুলো আর শব্দ। এর মধ্যেই আড্ডা জমে। আড্ডার ব্যঙ্গের কোনও মাপ নেই। তবে যুগের একটি সুন্দর বিভাজন এ পাড়ার তিনটি-চারটি আড্ডাখানায় পাওয়া যায়। হারুর স্টেশনারি দোকানে বসে যুবকদের আড্ডা। সমরেন্দ্রর বাড়ির সামনের রকে বসে ব্যঙ্গসঙ্গিকালের তরুণরা। ব্রজগোপালের দোকানের এই আড্ডাটি প্রধানত অভিনাবকল্পনীয়ে। মাঝে মাঝে প্রণবশব্দেও এই আড্ডায় দেখা যায়। আর অনিসুজ্ঞামান নিয়মিত আসেন। তাঁকে মাঝে মাঝে হারুর স্টেশনারি দোকানে দেখা গেলেও এ আড্ডাতেই তাঁর টান বেশি। এ পাড়ায় বেড়ে ওঠেননি বলে, এ পাড়ার সঙ্গে তাঁর শৈশব-কৈশোরের যোগ নেই বলে, কোনও

বয়ঃজ্যেষ্ঠকেই তাঁর অভিজ্ঞাবকের সম্মান দেবার দরকার পড়েনি। এখানে সব বয়সের মানুষের সঙ্গেই তিনি সহজভাবে মেশেন। এ কথাও বলা যেতে পারে যে বিশেষ যাবার প্রবণতা তাঁর সহজাত। যদিও নিজের বাড়িতে, অনেক আইবোনের মধ্যেও তিনি একা বোধ করতেন।

ফুটপাথ দিয়ে যেতে যেতে চেনা-অচেনা প্রত্যেকেই ব্রজগোপাল খামিরের দিকে তাকাছিল। মল্লিনাথ গেয়ে চলেছিলেন। কেউই তাঁকে থামায়নি কিন্তু মল্লিনাথ নিজেই ইচ্ছা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। লোকজন দেখছে। গান খামিয়ে বলেছিলেন, আচ্ছা! বাতেন মিষ্টিরের গলায় এ গান শুনেছ?

ছেটিখাটো চেহারার ব্রজগোপাল বললেন, শুনেছি। তবে ওই গানটাও তাঁর গলায় আমার ভাল লাগে— শাশানে জাগিছে শ্যামা—

সমরেন্দ্র বলেছিলেন, এ সবই কি নজরুলের গান?

অনিসুজ্ঞামান বললেন, আরও কত শ্যামাসংগীত আছে নজরুলের। দুর্গাঘীতি আছে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বন্দনা আছে।

প্রসঙ্গের পরিবর্তন হয়ে চলেছে। যে-কোনও আক্কারই যা স্বাভাবিক চরিত্র। রাজনীতি দিয়ে শুরু হয়, শেষ হয় সিনেমাঘ। মাঝখানে সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, ক্রীড়া এবং অর্থনীতির পথপরিক্রমা থাকে অবশ্য। কারণ কারণ এই প্রসঙ্গভেদ পছন্দ নাও হতে পারে। তেমন কারণেই সমরেন্দ্র অসহিষ্ণু গলায় পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে বললেন, সে তুমি যাই বলো, শ্মশানকালীর পূজো করা যে ভাল নয় এ কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। তা ছাড়া মল্লিনাথ তুমি আবার বলিবিবর্জিত পূজো করো! অথচ শ্মশানকালীর পূজো বলি ছাড়া হয় বলে শুনি। লোকে বলে এ পূজোয় বিয় হল বংশ নির্বংশ হয়।

মল্লিনাথ খানিকটা উত্তেজিত গলায় বলেছিলেন, শোনো, এ আমাদের পারিবারিক পূজা। যখন শুরু হয়েছিল, এরকমভাবেই শুরু হয়েছিল। আসলে পূজার নিয়মটা প্রধান নয়। শুদ্ধ ইচ্ছেটাই প্রধান।

আজ সারা দিন সমরেন্দ্রের কথাগুলো মনে পড়েছে মল্লিনাথের। বারবার নিজেকে বুঝিয়েছেন তিনি—দুর্ভাগ্য হযো না। তুমি কোনও অন্যায় করেনি। পাপ করেনি। সারাজীবন মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছ। মানুষ তোমাকে অভিশাপ দেবে না। যে-দিন থেকে পূজা করছ, সে-দিন থেকে অন্তরাখ্যা দিয়েই আরাধনা করার চেষ্টা করেছ। ঈশ্বরও তোমায় অভিশাপ দেবেন না। তবে?

মল্লিনাথ ভয় পান। কার কাছে তিনি অপরাধী হয়ে আছেন? মন মানে না। সামগ্রিকভাবে অস্থির বোধ করেন। কিছুক্ষণ আগেও অমলেন্দুকে দেখে এসেছেন তিনি। অস্থিচর্মসার শরীর নিয়ে বিছনায় মিশে আছে। কমলেন্দু এখানে নেই। কানপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেষ বর্ষের পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছে। মল্লিনাথ অমলেন্দুর বিষয়ে কিছুই জানাননি তাকে। কী করবে জেনে। বরং পরীক্ষাটা দিক। অমলেন্দুকে দিয়ে কোনও আশা মিটল না। কোন অজ্ঞাত যন্ত্রণায় মেডিক্যাল ফোর্স ইয়ার পড়তে পড়তে সে নেশা ধরল। গাঁজা, চরস, হেরোইন। মল্লিনাথ যখন জানলেন তখন দেরি হয়ে গেছে। এই দেরি হওয়ার জন্য, নিজের ছেলেকে বুঝতে না পারার জন্য মল্লিনাথ নিজেকে দায়ী করে চলেছেন সর্বক্ষণ। আগাগোড়া ভাববার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সঙ্গে মাধবীর যে-সম্পর্কই থাক, দুই ছেলেকে তিনি কখনও অবহেলা করেননি। মাধবীকেও করেননি। কিন্তু মাধবী ভুল বৃত্তে ক্রমশ সরে গেলেন। শরীরটা যেমন তেমনই রইল কিন্তু মন নিয়ে হারিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর ক্ষোভ ছিল। হয়তো অমলেন্দুরও ছিল। কড় হতে হতে সেও গুটিয়ে গিয়েছিল। মল্লিনাথের থেকে সরে যাচ্ছিল। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন এ বয়ঃসন্ধিকালীন অন্তর্মুখিনতা। তাই ঘটাননি। আজ বুঝছেন, এই গুটিয়ে যাওয়া আসলে



পল্লায়ন বা গোপন জীবনবিমুক্ততা। সে যে-পথে যাচ্ছে সেবার থেকে আর ফেরা যাবে না তা বোঝার মতো শিক্ষা ও বুদ্ধি অমলেন্দুর ছিল। তবু সে গিয়েছে। তা হলে মরে-যেতেই কি চেয়েছিল সে? এর উত্তর পাবার আর কোনও উপায় রাবেনি অমলেন্দু।

আর হয়তো আধঘন্টা আশু আছে তার। কিংবা একঘণ্টা। মল্লিনাথ জানেন কিছু কাহিনীকে বলেননি। অনুস্থ অমলেন্দুর কাছে থাকার জন্য লিলিকে ডেকে এসেছেন তিনি। অমলেন্দুকে বুঝালবাসতেন লিলি। বিয়ের আগে খুব কোলেপিঠে করেছেন। এ ব্যাপ্তে আসার পর অমলেন্দুর পাশ থেকে একটুও নড়েননি। মাধবী নির্বাক হয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। মল্লিনাথের ইচ্ছে করছিল মাধবীকে ধরে জোরে জোরে কাঁকানেন। বলবেন— জেথো, জানালায় বড় ছেলে চলে যাচ্ছে। ওকে জিজ্ঞেস করো, কেন ও এরকম করল। জেনো।

শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয়নি। শুধু একা একা সহ্য করেছেন— আর আধঘন্টা বা একঘণ্টা পর পৃথিবীতে অমলেন্দু বলে কেউ থাকবে না। মাধবী সমস্ত বলা-কওয়ার বাইরে চলে গেছেন। কিছু লিলিকেও বলতে পারলেন না মল্লিনাথ। বরং শব্দে থাকার ছেঁটা কতকো জরতে বসেছেন, তুই থাক এখানে। আমি পূজোটা সারি।

লিলি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। মল্লিনাথ ঘুণা দেখলেন তাঁর চোখে। কিন্তু মল্লিনাথের কিছুই করার ছিল না। এক্ষুনি পূজায় বসতে না পারলে পূজাশৌচ এসে যাবে। পূজার আয়োজন সম্ভেও পূজা না করার অপরাধে পাতকী হবেন তিনি। তার চেয়ে এই ভাল। না জানা ভাল। মৃত্যু কখন আসে দেখেন না মল্লিনাথ। জানেন না। যতক্ষণ না জানছেন ততক্ষণ মৃত্যু নেই। গৃহদেবতার পূজার কোনও শৌচাশৌচ নেই এমনই তিনি জেনেছিলেন রূপচাঁদদায়র কাছে। কিছু পুত্রের মৃত্যু হয়েছে জেনেও নিজেই পূজার আসনে বসানোর মতো মানসিক জোর তাঁর নেই। তাই তিনি পালিয়েছেন। মৃত্যুশয্যার পাশ থেকে পালিয়েছেন।

পূজার সমস্ত আয়োজনই শেষ। প্রতিটি অমাবস্যার মতো আজও মল্লিনাথ সারা দিন উপোস করে সমস্ত সংগ্রহ করেছেন। নিবৃত্তভাবে পূজার উপকরণ সাজিয়েছেন। আজ আটাশ বছর হল প্রতি অমাবস্যায় তাঁর বাড়িতে শ্মশানকালীর পূজা হয়ে আসছে। ভাল-মন্দ বোঝেননি, সুখসুখ বোঝেননি। কাঠামো পাবার পর থেকে পূজা করেছেন কেবল। যে-দিন, গঙ্গার ঘাটে, ওই কাঠামোটি ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকে গেল, সে-দিনই, আকস্মিকভাবে ওখানে উপস্থিত থাকা মল্লিনাথ পূজা সম্পর্কে দায়বদ্ধ হয়ে গেলেন।

তখন সবে বিবাহ করেছেন তিনি। একটু বেশি বয়সেই করেছেন। মাধবী অন্তঃসত্ত্বা। তাঁদের প্রথম সন্তান আসছে। মাধবীই বলেছিলেন— চলো, দক্ষিণেশ্বরে পূজো দিয়ে আসি।

পাঁচ মাস চলেছে তখন তাঁর। বরাবরই গোলাগাল দেখতে বলে এক নজরে বোঝা যেত না। মিষ্টি মুখখানিকে সবসময় খুব ছেলেমানুষ লাগত। একটু বেশি বয়সে বিবাহ করেছিলেন বলে নিজের চেয়ে অন্তত আঠারো বছরের ছোট মাধবীর প্রতি গভীর স্নেহ বোধ করতেন মল্লিনাথ। লিলিকে যেমন করতেন তেমনই স্ত্রীকেও মাঝে মাঝে শাসনও করে ফেলতেন। আবার কোনও অনুরোধ ঠেলে ফেলতেও পারতেন না। সে-দিন তাঁর খুবই কাজের চাপ ছিল, তবু দক্ষিণেশ্বর যাবার অনুরোধ রেখেছিলেন। না রাখলে হয়তো জীবন অন্যরকম হত। আর রেখেছিলেন বলেই, এখন এই অবস্থায় বড় বিপন্ন বোধ করছেন তিনি। কবে থেকে এই বিপন্নতা ঘাপটি মেবেছিল? সে-দিনের জন্যই কি আজ নিজেকে সবার থেকে দূরে সরে যাওয়া একলা একজন মানুষ মনে হয় না? মল্লিনাথ প্রতিমার দিকে তাকান। হাসছে কি ও? কিছু বলবে কি? ভগ্নিটা দেখো। উদ্ধত। কষ্ট। যেন দাবির কোনও শেষ নেই। দু'টি হাত আড়াআড়ি করে নিজের দুই কাঁধ খামচে ধরছেন মল্লিনাথ। দাঁতে ঠোঁটে চেপে ধরছেন। নিজের কাছে অতি দ্রুততার সঙ্গে স্বীকার করছেন তিনি— আজ তাঁর পূজা করতে ইচ্ছে করছে না। তিনি ফিসফিস করছেন। দাঁতে দাঁত পিষে বলছেন— তোরা জন্য। তোরা জন্য। সব নে। সব নিয়ে যা।

মল্লিনাথ ক্রান্ত বোধ করেন। এ সব কথা কার জন্য? এ সব নিয়ম কার জন্য? কাকে আসলে ভয় করছেন তিনি? কালী না রূপচাঁদ? কাঠামো পাবার দিন থেকে প্রায়ই যন্ত্রে ঘরা নেন রূপচাঁদদাদু। মাধবীর সঙ্গে, সেই সময় শারীরিক মিলিত হলেই তিনি দেখা দিয়েছেন। নীরব কিন্তু তীব্র চোখ মেলে চেয়ে থেকেছেন মল্লিনাথের দিকে। যেন মল্লিনাথ, সংঘে পালন না করলে তুমুল শাস্তি নেমে আসবে মাথায়। ওই স্বপ্ন দেখলেই, অনেকদিন তাঁর নিশাখান হত না। কারওকে মুখ ফুটে বলতে পারেননি এ কথা। মাধবীকেও না। শুধু নিজের হৃদয়ের বিরুদ্ধে, ভয়ে, ক্রমশ যৌনজীবন শুরু করে দিয়েছিলেন।

সময় যাচ্ছে। ক্রমশ বাসি হতে থাকে ফুলের গন্ধ নাচে লাগছে তাঁর। রূপ ও চন্দনের গন্ধ লাগছে। বাসি হতে থাকে ফুলের গন্ধ বড় দুখেময়। সমস্ত আয়োজন ও সামাজিকতার পর নববিবাহিতরা যখন ফুলশয্যার ঘরে যাবার অবকাশ পায়, তখন এরকম গন্ধ। ক্রান্তির। কেননা, সন্ধ্যাবেলা কারও সাজিয়ে রেখে যাওয়া খাট এবং মালাগুলি তখন ক্রান্ত। প্রাণ শেষ হতে থাকা। এবং প্রাণ ফুরিয়ে গেলে মৃতদেহের চারপাশে রেখে যাওয়া ফুলেরাও ধীরে ধীরে সৌগন্ধ হত্যা করতে করতে ভিমিয়ে পড়ে। পূজার আয়োজনেও তার ব্যতিক্রম নেই। মল্লিনাথ তাঁর পূজার ঘরে রাত-কুরানো অসার্বিক ফুলশয্যার গন্ধ পান। প্রাণ শেষ হয়ে যাওয়া মৃতদেহের গন্ধ পান। তাঁর অস্থির অস্থির লাগছে এখন। তিনি জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর উদর ফুলে উঠছে। আর সেই শ্বাসের সঙ্গে ঢুকে পড়ছে চন্দন ও ধূপের উদার গন্ধের মিশেল। আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা করলেন মল্লিনাথ। সমস্ত আয়োজন পূর্ণ। পূজা তাঁকে করতেই হবে। আজ স্বহস্তে তাঁর তৃতীয় পূজা। এতদিন পুরোহিত শ্রীকান্ত চক্রবর্তী দায় মেনেছিলেন। তিনি মারা যাবার পর মল্লিনাথ স্বয়ং পূজার ভার নিয়েছেন। হাসপাতাল থেকে অবসর নিয়েছেন। শুধু চেয়ার করেও অনেকটা সময় পান। নিত্যকার ফুলজল আগেও দিতেন, এখন অমাবস্যায় পূজার ভার নিলেন। অনেকে বারণ করেছিল। কিন্তু পূজা না করে মল্লিনাথেরও আর উপায় ছিল না।

ধীরে হাত জোড় করলেন তিনি। তাঁর চোয়াল দৃঢ় হল। প্রবাম সেরে ডান হাতটি গোপকর্ণের আকারে নিলেন। মাঘমাস পরিমাণ জল গ্রহণ করে জোরে জোরে, হুতো-বা, অন্যান্য পূজার দিনের চেয়ে অনেক বেশি জোরে উচ্চারণ করলেন—

ওং হ্রীং শ্রীং ক্রীং কালিকে

ক্রীং শ্রীং হ্রীং ওং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা।...

ক্রমশ ওষ্ঠ, মুখ, দক্ষিণ ও বাম নাসা, চোখ, কান, নাভি, বুক শুরু করে চলেন তিনি। একাত্তে উচ্চারণ করে বান কপালিনৈঃ, কুরুকুল্লায়ে, বিরোধিন্যে, বিশ্বচিত্তায়ৈ... আচমন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, পূজা শুরু হয় এবং আন্তে আন্তে পূজায় ডুবে যান মল্লিনাথ, আর পাশের ঘরে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রচাপ হতে থাকে। একা, অসহায়ের মতো, অজ্ঞান অচেতন অবস্থায় সে কালের গর্ভে ঢুকে যায়।



পূজা শেষ করে বেরিয়ে এলেন মল্লিনাথ। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সম্ভবত তাঁরই মস্তোচ্চারণের শব্দ এতক্ষণ জোরে ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কী যেন হয়েছিল, কী যেন করার কথা তাঁর— সহসা মনে পড়ল না। মাধায় হোমের শিখা জ্বলজ্বল করছে। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একটা টিকটিকি ওপর থেকে খসে একেবারে জলন্ত স্থণ্ডিলের মধ্যে পড়েছিল। মল্লিনাথ তখন চোখ বন্ধ করে মন্ত্র পড়ছিলেন। টিকটিকিটাকে দেখতে



পাননি তিনি। কিন্তু মাংসে পোড়ার কটু গন্ধে পূজার পরিকল্পনা বিঘ্নিত হয়ে উঠেছিল। দু' ডামচ পরিমাণ ঘি ঢালতে ঢালতে মল্লিনাথ কারণ বিশেষণ করেছিলেন সে, যেহেতু এ ঘরে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় মাংসসর্বস্ব প্রাণী টিকটিকিই, সেহেতু এই প্রাণীটির পক্ষেই পুজতে থাকা সম্ভব। হোমায়িতে অবস্থিত বস্তু পড়লে কোনও ক্রিয়াবিধান আছে কিনা মল্লিনাথ জানেন না। হয়তো আছে। হয়তো নেই। সব কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে থাকে ধরে নিলে এই পতনও তাঁরই অভিপ্রায় এ কথা মনে আনার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু অগাধ বুদ্ধিবোধ বললে নেই। তাঁর হঠাৎ মনে হতে লাগল এ কোনও ইঙ্গিত। কীসের ইঙ্গিত?

ছোটবেলায় মল্লিনাথ টিকটিকি ভয় পেতেন। দেখতে পেলেই ছুটি গিমে ঠাকুরমার কোলে মুখ লুকোতেন। ওরা উড়তে পারে এবং যে কোনও সমস্যা গলাফড়িংয়ের মতো গায়ে এসে বসতে পারে এ বিশ্বাস দৃঢ় ছিল তাঁর। একদিন ঠাকুরমা একটি মজার গল্প শোনালেন তাঁকে। বললেন—ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির পেছনেই একটি কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। তিনি যখন সব প্রাণী গড়লেন, তাঁর বিশাল বাগানে আর জায়গা নেই, সব প্রাণহীন মূর্তি হয়ে আছে...

মল্লিনাথ বলেছিলেন— প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি তখনও ঠাকুরমা?

প্রাণ প্রতিষ্ঠা জানতেন মল্লিনাথ। রূপচাঁদাদানু প্রতি বছর নতুন প্রতিমায় প্রাণ দিতেন। এই কঠামোতেই সে-প্রতিমা বসাতেন। প্রাণ দেবার আগে পর্যন্ত প্রতিমার হাত, চুল, গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতেন মল্লিনাথ কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হবার পর আর সাহস হত না। মনে হত, হাত দিলেই ওই প্রতিমার গা মানুষের শরীরের মতো নরম ও উষ্ণ লাগবে। তাঁর ভয় করত।

ঠাকুরমা মল্লিনাথের প্রেমের জবাব দিয়েছিলেন—

সেইটাই তো গল্প। সব মূর্তি তৈরি। একটা বিশাল পিপের প্রাণ রাখা আছে। যার ফটুকু জায়গা, ভরে দেওয়া হবে। ভরা শুরু হল। যার জন্য যেমন প্রাণ তেমনই জায়গাও তৈরি। গোক, ভেড়া, কুকুর, ছাগল, বাঘ, সিংহ, কেতাল, ইন্দুর, পাখি, ফড়িং, বোলতা, উচ্চিড়ে, মৌমাছি, কৈচো, জোঁক, উকুন, ছারপোকা সব প্রাণ পেতে লাগল আর টুপটাপ পৃথিবীতে পড়তে লাগল। কোনও ব্যামেলা হল না। কিন্তু গোল বাধল মানুষকে নিয়ে।

দেওয়ালের কোণ থেকে অমনি একটা টিকটিকি ভেঁকে উঠেছিল— টিক টিক টিক টিক। মল্লিনাথ ঠাকুরমার আরও কাছ ঘেঁষে বসেছিলেন। ঠাকুরমা বলেছিলেন— ঠিক ঠিক ঠিক। আমার গল্প পুরোটো শুনলে আর একটুও ভয় করবে না।

মল্লিনাথ ঠাকুরমার নরম শাড়ির প্রান্ত মুঠোয় নিয়ে বলেছিলেন— বগো, ঠাকুরমা বলো।

নলিনীবালা, মল্লিনাথের ঠাকুরমা বলেছিলেন— সব পশু পাখি পতঙ্গ কীট চলে যাবার পর ঈশ্বর মানুষের প্রাণ দিতে গিয়ে দেখেন প্রাণ রাখার জায়গাই তার নেই। ইস্ ন্ স্। ঈশ্বর বলতে থাকলেন। কী ভুল হল। কী ভুল করলাম। সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি দিয়ে, সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা দিয়ে, শেষ পর্যন্ত কি-না প্রাণ দেবার জায়গা নেই। কী করা যায়। স্বর্গের নাপিত এসেছিল ভগবানের গোঁপ কটোত্তে। সে বললে— এত চিন্তার কী আছে মহারাজ! মহাঠাকুর! মহাশ্রষ্টা। ওই যা মাঙ্গপত্র পড়ে আছে তা দিয়ে মানুষের প্রাণ ধরার মতো ছোট কিছু তৈরি করে তাতে মানুষের প্রাণ পুরে দিন। ওটাও রইল, মানুষও রইল। ভগবান খুব খুশি হলেন। তাঁর নাপিতেরও কত বুদ্ধি। বললেন— বাঃ বেড়ে বুদ্ধি তো তোর। বাঃ। আমার গোঁপটা কামিয়ে তৃতীয় স্তরে চলে যা। নাপিতের পদোন্নতি হল। আভিজাত্য বাড়ল। সে একেবারে নিবৃত্ত করে ভগবানের গোঁপ চাঁহতে লাগল আর সেই ফাঁকে ভগবান দু' আঙুলে একটা টিকটিকি গাড়ে ফেললেন আর তাকে দেওয়ালে চলার উপযুক্ত করে দিলেন কারণ নইলে মানুষই ওকে মাড়িয়ে দেবে আর তাতে ওর নিজেরই বিপত্তি হবে। এ সব হল, তারপর তিনি টিকটিকির মধ্যে পুরে দিলেন মানুষের প্রাণ।

মল্লিনাথ বিশ্বাসে ও বিশ্বাসে বলেছিলেন—ও ঠাকুরমা। তাই। সত্যি ঠাকুরমা।

দেখিস না, বুদ্ধি অত্যন্ত হলে কী হয়, মানুষের প্রাণটা সেই এতটুকুনি। লিবি টিকটিকির মধ্যে ধরে গেল তা। সেই থেকে শুরু সব মানুষের গ্রাণ হয়ে বেড়ায় আর মানুষের ঘরে ঘরে থাকে। কামড়ায় না। কাঁদে না। চোঁচায় না। তো ওকে অত্যন্ত ভয় করার কী আছে? কোথাও কোনও টিকটিকির মৃত্যু হল তো জানবে কোথাও কোনও মানুষ মারা গেছে।

মল্লিনাথ বলেছিলেন— আর টিকটিকির নিজের প্রাণটা কোথায় রইল ঠাকুমা? ভগবান সেটা কোথায় রাখলেন?

জোরে জোরে হেসেছিলেন নলিনীবালা। মল্লিনাথের বুদ্ধি ঘরে বলেছিলেন— আচ্ছা বাপু, তোমার সঙ্গে কথায় পারা ভার। টিকটিকির প্রাণ ভগবান নিজের পকেটে রেখে দিলেন। ওরা দেখতে একটু খারাপ বটে। লেজ খসিয়ে ফেলে আর পোকা ধরে বাম ডান্ডা ঠিক। ছোট ছোট নখও তুমি ওদের আঙুলের ডগায় দেখতে পাবে, কিন্তু জেনো ওরা খুবই পবিত্র প্রাণী।

তীর হর্ন বাজল। পি ডব্লিউ ডি রোড দিয়ে কোনও ট্রাক গেল হয়তো। ওই রাস্তায় সারা দিনরাত ট্রাক যাবার বিরাম নেই। দিনের বেলা অন্যান্য আওয়াজে মিশে হর্নের শব্দ এত তীব্র লাগে না। কিন্তু শেষরাত্রের স্তব্ধ পরিমণ্ডলে মল্লিনাথ ওই শব্দে কঁপে উঠলেন। যেন কেউ তীর কাঁকুনি দিয়ে তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। তাঁর মনে পড়ল অমলেন্দুর কথা। মনে হল ও কি চলে গেল? তখনই? যখন বাসে পড়ল টিকটিকিটা? মল্লিনাথের বিজ্ঞান পড়া, ডিকিৎসক মস্তিষ্কে ভয় উকি দিল। তিনি অমলেন্দুর বিজ্ঞানার কাছে এই প্রত্যাশা নিয়ে ছুটে গেলেন যে এখনও তার বুকের ওঠাপড়া দেখতে পাওয়া যাবে। অক্সিজেনের নল এখনও সক্রিয় থাকবে। স্যালাইনের বোতল থেকে ওষুধ সমেত ফোঁটা ফোঁটা জল ঢুকতে দেখা যাবে তার শরীরে। আর তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু এত কিছু দেখার আগে মাধবীকে দেখে চমকে গেলেন মল্লিনাথ। দু'হাতে অমলেন্দুর মুখ ধরে কপালের কাছে নিজের মুখ ঝুকিয়ে এনেছেন মাধবী। লিলি নিঃশব্দে অমলেন্দুর পায়ের কাছে বসে আছেন। মল্লিনাথকে দেখেই তিনি বললেন, পা দু'টো বরফ হয়ে আছে দাদা।

মল্লিনাথের বুক কাঁপল। তিনি ছেলের পায়ে হাত দিলেন। হলুদ মৃদু বিষণ্ণ আলোক তিনি মৃত্যুর অমাত্রান্ত খবর পেলেন। তবু অসীম প্রত্যাশায় বা ভক্তির অভ্যাসবশে ছেলের হাত টেনে নাড়ি দেখতে গেলেন। আর মাধবী এক রুটকায় হাতখানি টেনে নিয়ে বলতে লাগলেন, চুপ। ধোঁরো না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে ঘুম পাড়ালাম। মল্লিনাথ দেখলেন মাধবীর দু'হাতের মধ্যে থাকা অমলেন্দুর মৃত মুখ মুক্তি পেয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল। তিনি লিলির দিকে তাকালেন। তাঁর ঠোঁটের দু'পাশে গভীর ভাঁজ। কপাল কঁচকে গেছে। পুই আর মাখন বরাবর জীবনের নিষ্ঠুর রসকলি। লিলি বুঝলেন। তাঁর চোখ জলে ভরে গেল। মল্লিনাথের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইলেন তিনি। কষ্টের সঙ্গে, বেদনার সঙ্গে, ভয়ের আভাস লাগল সে চাওয়ায়। মাধবী অনেকদিন এত কথা বলেননি। আজ বলছেন কেন? অমলেন্দুর মৃত্যু কি তাঁরও স্থবির স্বাধুগুলি নাড়িয়ে দিচ্ছে? আশ্চর্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে দু'জনের মাঝে। মল্লিনাথের দীর্ঘ বাজু ও সবল শরীর ভেঙে নূয়ে পড়তে চাইছে। টালমাটাল পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। পুজার পোশাক ছেড়ে আসছেন। একবারি পাজিমা ও পরিষ্কার পটিভাঙা পাঞ্জাবি পরছেন। শীত করছে তাঁর। দূরে কোকিল ডাকছে। তা হলে কি বসন্ত এল? মল্লিনাথ সোফায় শুয়ে পড়েন। তাঁর দু'চোখ থেকে জল গড়ায়। তবু তিনি নির্মমভাবে নিঃশব্দে থাকেন। মনে মনে বলেন— অমল, চলে গেলি কেন? এভাবে গেলি কেন? আমাকে এত দূরে ঠেলে দিলি কেন?... তাঁর হৃদয় স্তব্ধ হয়। একবারও ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে না। অমলেন্দুর নিটোল বালকবেলা বা কৈশোরের কথা মনে পড়ে না। শুধু ধ্বংস হতে থাকা, ক্ষয় হতে থাকা অমলেন্দু ঘুরেফিরে আসে। মল্লিনাথ সব কিছুই জন্য নিজেই দেখা করেন। নিজেই দাবী করেন। ছেলের ক্ষয় চোখে পড়েনি বলে, ধ্বংসের খবর রাখেননি বলে নিজের মনোকার বহু নিরাসক্তি ও উদাসীন্যের প্রতি আঙুল

তোলেন তিনি। অঙ্ককারে একটি টিকটিকি শব্দ করে ডেকে ওঠে। মল্লিনাথি শুনেলেন এবং নিশ্চয় উচ্চারণ করলেন ঠিক ঠিক। তখন মাখবীর গলা পাওয়া গেল। ধমক্যেছেন লিলিকে—  
আঃ! কেঁদো না তো। ওর ঘুম ভেঙে যাবে।

লিলি ছুটে এসেন মল্লিনাথের ঘরে। মল্লিনাথের বুকের ওপর পড়ে কাঁদার সময়ে সময়ে বলতে লাগলেন, ও দাদা গো! দাদা! আর পারি না!

মল্লিনাথ, লিলির মাথা আঁকড়ে ধরলেন বুকের ওপর।



পাড়ার উত্তর কোণ থেকে রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে ফিরছিল হরিচরণ। তার পাশ দিয়ে বাস্ত পায়ে ছুটে যাচ্ছিল অঙ্কর মা। হরিচরণকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, হরিদা, শুনছেন নাকি?

অঙ্কর মার কথায় বিশেষ খবরের গন্ধ পেয়ে ঝাঁটা বেলচা সরিয়ে রেখে হাত বাড়তে বাড়তে এগিয়ে এল হরিচরণ। গোর্গের প্রান্তগুলি দু'চারবার মুচড়ে বলল, কী হল আবার?

অঙ্কর মা গলা ঝাঁটো করে বলল, শুনেন নাই? কাইল রাইতে ডাক্তারবাবুর বড় পোলাডা মইরা গ্যাসে। আমার অঙ্ক কাইলৈ কইসে, মা, আমি যান সারাদিনে হরিবোল-হরিবোল শুনি...

হরিচরণ কিছুক্ষণ হাঁ করে থাকে। তার গোল ফুলকো গাল ও বুদে চোখ দুটি আরও কুলে পড়তে থাকে। গোর্গের প্রান্ত নেমে যায়। সে প্রশ্ন করে, ডাক্তারবাবুর ছেলে? কোন ছেলে?

অঙ্কর মা তেমনই ফিসফিসিয়ে বলে, কইলাম না, বড় পোলা? ডাক্তারি পড়তেনামিল।...

সে আশ্বেপ করে চলে—বদসঙ্গে পড়ল ছেলেটা। জানেন তো। এমন সোনার টুকরো ছেলে একেবারে জলে চলে গেল। ডাক্তারবাবুর জন্য যে কী খারাপই লাগে। ওইরকম মানুষ—লোকের বিপদে-আপদে সবসময় পাশে। আমার মল্লিনার বিয়ের সময় গিয়ে বলতেই এক কথায় একশো টাকা দিয়ে দিলেন। বললেন—ভাল করে বিয়ে দিস। ছেলে-মেয়ের অসুখে-বিসুখে যখনই যাই, একটা পয়সা নেন না। ঠাকুর দেবতায় কত ভক্তি। এই মানুষের কী কপাল! বউটা পাগল। ছেলেটার মরণ হল! ভগবানের কি সত্যি চোখ নেই গো।

সে চোখের জল মুছতে অঁচল চাপা দেয়। বলতে থাকে—আমার অঙ্কর কয়, মা, ভগবানের চোখ নাই। আমার লাখান অঙ্ক, অঙ্ক। আমি কই, কানও কি নাই তোমার ঠাকুর?

হরিচরণের মুখও দুঃখে ছান হয়ে আসে। ডাক্তারবাবু সত্যিই মানুষ ভাল। এই এলাকায় গরিবের ডাক্তার বলতে তিনিই। পুরনো ডাক্তার আর ক'জন? নতুন যীরা বসছেন, গরিব-গুর্বে মানেন না। যতই অসুবিধা থাক পুরো ভিজিট চাই। আশেপাশের বস্তির মানুষ শিবতোষ বা সুবীরহত ডাক্তারের কাছে তাই যেতে চায় না। ও দিকে শীতল ডাক্তার আছেন বটে। তবে তাঁর চোখ এখন কম দেখে। কানও কম শোনে। ওজুখের চিঠি লিখতে হাত কঁপে যায়।

হরিচরণ অকারণে হাত আড়ে দু'বার। অকারণে গোর্গ পাকায়। বলে, জয় শ্রীগাম! জয় হনুমান! দেখো ভগবানের কী ইচ্ছে সে আর আমরা কী বুঝ। তুমি কেঁদো না অঙ্কর মা।

অঙ্কর মা চোখ মোছে। বরা গলায় বলে, হ। এই আমাগো দ্যাছেন। ভগবানের পুখি। কী পাপ করছিলাম ক্যাডা জানে। সুখ-শান্তি টার পাই না। আথা পাটে খাইয়া, লাখি কিল গুতা খাইয়া, বইচা আসি।...

সে চলে যায়। হরিচরণও ঝাঁটা-বেলচা গুটিয়ে ভানে তোলে। আজ আর পরিষ্কার হবে না। অন্য নিকটা এসময় পরিষ্কার করছিল। সেও হয়তো এ খবর শুনে কাজ ফেলে চলে আসবে।

আর আসবেই-বা না কেন! ডাক্তারবাবুকে এ পাড়ায়, এ অঞ্চলে কে না চেনে! সে জানে ঠেলে ডাক্তারবাবুর বাড়ি অভিমুখে যায়। পথে যেতে যেতে দেখে এ বাড়ি ও বাড়ির বাবুয়া, ছেলেরা, শিশুরা সব বেরিয়ে পড়েছেন। সবাই চোখে-মুখে ঘুম লেগে আছে। এখনও দৃষ্টিতে সকাল ফোটেনি। গৃহিণীরা জনালার পর্দা তুলে আছেন। কে আসে কে যায় দেখছেন বাবা! মাথার তো কোনও বন্ধ নেই, দুপুরের-বিকেলের কেনাকাটার সন্নিবিষ্ট নেই। এ সবে আর প্রয়োজন নেই তাঁর। কিন্তু পাগল মানুষটির জন্য সব গৃহিণীর বুকেই একঘর সমবেদনা। কিন্তু তা হলেও এই সাতসকালে একটু সংসার না গুছিয়ে কেমন করেই বা তাঁরা বেবেল। শুধু ঘোলেই তে, হলে না। মড়ার বাড়ি। আবার রাতে মারা গেছে মানে বাসি মজা। কিরে এসে জান করা, ধোয়া, কাটা সব করতে হবে। সে-সব না করে সংসারে কিছুটি করার জো থাকবে না। রবিবার হলও নয় কথা ছিল। কিন্তু আজ অফিস-কাছারি প্রত্যেকেরই আছে। ডাক্তারবাবুর ছেলে মারা গেছে খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু তার জন্য তো অফিস কামাই হবে না। জনজীবন দাঁড়িয়েও থাকবে না এতটুকু!

হরিচরণ ভ্যান ঠেলেতে ঠেলেতে চলল। বাধানো রাস্তার খোয়া উঠে গেছে এখানে সেখানে। লোহার চাকায় ঘটাং ঘটাং শব্দ উঠছে। হরিচরণ চলতে চলতে মলিনাথ ডাক্তারের কথা ভাবছে। সত্যি কী কপাল! রামজির কী ইচ্ছা কে জানে! সে দু'হাত দিয়ে তান ধরে আছে, তাই কপালে হাত ঠেকাতে পারছে না। মনে মনে রামজির পায়ে মাথা রাখছে। হরিচরণ জানে ডাক্তারবাবুর ছেলে খারাপ নেশাটি করত। এ পাড়ার অনেক ছেলেই করে। কাজল, সুজন, নুগ্রয়, অমিতাভ। কত ভাল পরিবারের ছেলে সব। কত বড়লোক বাপ-মায়ের ছেলে। হরিচরণ অনেকদিন ওদের ওই ক্লাবটিতে দেখেছে। নরজা বন্ধ করে নেশা করে সব। কিন্তু রেললাইনের উঁচু অবস্থান থেকে জানালা দিয়ে সব দেখা যায়। পুরিয়া খুলে সিগারেটের রাংতায় সাদামতো গুঁড়ো ঢালে। নীচ থেকে দেশলাই বা লাইটার ছেলে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাপ দেয়। সাদা গুঁড়োগুলো পুড়তে থাকে। ওরা শাট খুলে মাথার ওপর দিয়ে নেয়। প্রায় অদৃশ্য ধোঁয়া বুক ভরে নিজের মধ্যে শুবে নেয়। একসঙ্গে বেশ কয়েকটি প্রসন্ন প্রশ্বাস নিতে থাকে সবাই। আস্তে আস্তে ওদের চোখ দু'টি নিখুম হয়ে আসে। অদ্ভুত মোহশূন্য অভিব্যক্তির তলায় ওরা ডুবে যায়।

হরিচরণ জানে না এ নেশার কী নাম। জানার আগ্রহও বোধ করেনি কখনও। তার নিজের কোনও নেশা নেই। আগে বিড়ি খেত। এখন ছেড়ে দিয়েছে। তুলসী একদিন বলল, কত পয়সা বিড়িতে দাও?

হরিচরণ বলেছিল, তা হবে, পনেরো টাকা-কুড়ি টাকা মাসে।

তুলসী বলেছিল, সে-পয়সায় ফল এনো বরং বাচ্চাদের জন্য। আর নেশা কোরো না।

সুতরাং হরিচরণ বিড়ি ছেড়ে দিয়েছে। পালায়-পার্বশে একটু চুন্নু খায় বটে কিন্তু তাতে তুলসী রাগ করে না। সুতরাং হরিচরণ, এই সব গুঁড়ো নেশা, যাতে বাবুদের ছেলেরা ডুবে থাকে, তার নাম জানে না আর জানতেও চায় না। কারণ সে বুঝেছে, এ নেশার নাম অভিসম্পাত। যারা এ নেশা করে, হরিচরণ দেখেছে, তারা সরু ও দুর্বল হয়ে যায়। এবং অবশেষে বুকি মরেও যায়। যেমন মরে গেল অমলেন্দু।

যেতে যেতে পরেশবাবুর বাড়ির সামনে একবার নাক কোঁচকাল হরিচরণ। সারা পাড়ার মধ্যে এই বাড়িটির সামনে সবচেয়ে বেশি ময়লা জমে থাকে। এ বাড়ির সামনে একফালি বাগানের বিস্তৃতা ঢাকতে একটি মাত্র নাম-না-জানা হলুদ ফুলের গাছ, যা এই প্রাক-বসন্তে ফুটে আলো হয়ে আছে। তারই তলায়, প্রায় ঢোকার মুখেই জঞ্জাল। তরকারির খোসা ও মাছের আঁশ, ভাত, আধ-পোড়া ফটি, ছাই, এমনকী মেয়েদের রক্তকাপড়। হরিচরণ অনমনে ভাবে, একটু ঢাকতে পারে না? একটু কাগজে মুড়ে ফেলতে পারে না? সবাই কি চোখে পড়লেই, নিশ্চিত বোঝে না, এ কাপড় কার?

জঞ্জাল না তুলে চলে যেতে যেতেও ধমকে দাঁড়াল হরিচরণ। পরেশবাবুর স্ত্রী শবরী ডাকছেন। একতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। পলাশফুল বড়ের শাড়ি পরা। খোলা চুল। চুলের রাশির নীচে তলিয়ে আছে মসৃণ অনাবৃত কঁধ। কিছু জারী, কিছু কক্ষস্থরে তিনি বলছেন, হরিচরণ। কী হল। আমার বাড়ির সামনেটা আজ পরিষ্কার করলে না?

হরিচরণ কথা বলতে পারে না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আগুনের মতো কারী একে তাঁরই বাবস্থিত রক্তচিহ্নিত খোলামেলা কাপড়ের টুকরোগুলি তাকে বাকরহিত করে দেয়। সে হয় দূর সম্ভব শবরীর দিকে পেছন ফিরে কীটা-বেলচা হাতে নেয়। তখন ঘরের ক্ষেত্রে হারমোনিয়ামের শব্দ ওঠে। কোনও নির্দিষ্ট সুরে নয়, কেনে কিছুটা অনমনস্ক, চিন্তাময় কিছুটা, এমনই ভাবে হারমোনিয়ামের গায়ে আঙুল চালায় কেউ। শবরীর হৃৎকণ্ঠে যখন তিনি দু'বার তুলে খোলা চুলের ব্যশে খোঁপা আটেনে। তাঁর হাতের নীচ থেকে উলি মারে অটল অঙ্ককার। হরিচরণের কানে আসে, শবরী বলছেন, ছি। গামাও এ সব। তুমি কি মানুষ। পাশে এত বড় একটা ঘটনা হল আর তুমি হারমোনিয়াম নিয়ে ছি।

একটি ভরা পূর্ণব কণ্ঠ চড়া শব্দে হেসে বাজে। হরিচরণ যোকে, এ কণ্ঠ পরেশবাবুরই। তিনি বলেন, বাঃ। বা বাঃ সকালবেলায় তুমি স্নান করে, ফ্রিম মেখে লোলাপাকী হয়ে বসে আছ যে! সেখানে তো কোনও শোকের চিহ্ন নেই। আমি শালা গান গাইলেই দোষ?

শবরীর তীক্ষ্ণ ও খসখসে স্বর শেনা যায়, বাজে বোকো না। তুমি কি চেয়েছিলে, শোক বোঝাবার জন্য আমি রাস্তায় গিয়ে ধুলো মাখব?

—না না। তুমি ধুলো মাখতে পারো? তুমি শালি পাক্‌ফিউম মেখে মলিনাথ ডাক্তারকে চুমু খেয়ে এসো। উম্মম্। তোমার চুমু খেলে ডাক্তার ছেলের শোকও তুলে যাবে।

কোনও কিছু আছে পড়ার শব্দ হয়। হয়তো বহুবিভক্ত হয় কোনও মূল্যবান বস্তু। ভেঙে ফেলার তীব্র উল্লাসে মতে আগুন ছুঁয়ে আট্টে-পুটে বেঁধে ফেলা সম্পর্ক। এ সব স্তন্যে স্তন্যে হরিচরণ শেষ বিন্দু ময়লা তুলে নেয় তার ভ্যানে। পরেশবাবু ও শবরীর জন্য মনে মনে স্ত্রীরামের কাছে প্রার্থনা জানায় সে। এবং ধন্যবাদও জানায় যেহেতু ইস্করের বাগান এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সামান্য ভূখণ্ড পরিষ্কার করার কাজ সে পেয়েছে। সামান্য আবর্জনা দূর করারও অধিকার পেয়েছে।

ভ্যান নিয়ে সে সামনের দিকে চলে যায়। অটালিকার ফাঁক ফোকর দিয়ে তার গায়ে ব্রোদুর পড়ে। আবার সে অমলেন্দুর কথা ভাবে। একদিন নতুন একশো টাকার নোটো ওই গুঁড়ো টেলে নোট পুড়িয়ে নেশা করছিল অমলেন্দু। রেললাইনের উঁচু পারে বসে দেখছিল হরিচরণ। তার বাড়িতে সে-দিন একটিও পয়সা ছিল না। ভোরবেলা কাজে বেরবার আগে তুলসী সে-কথা মনে করে দিয়েছিল। সূত্রশকে দুধ বাওয়াছিল সে। অঁচল দিয়ে দুধ পান করতে থাকা শিশুকে আড়াল করে বলেছিল, মাইনে কবে হবে? ঘরে চাল নেই। অঁটা যা আছে আজ এ বেলাতেই ফুরিয়ে যাবে।

হরিচরণ বলেছিল, তুমি দুপুরটা চালিয়ে নাও। আমি সাহাবাবুর কাছে দুপুরে কিছু খার চেয়ে নেব।

এককম প্রায়ই হয়। হয়ে থাকে। তার জন্য হরিচরণের কোনও ক্ষোভ ছিল না। ভগবান যাকে যেমন দেন। কিন্তু অমলেন্দুকে, সিগারেটের রাংতার পরিবর্তে একশো টাকার নোটো আগুন ধরিয়ে নেশা করতে দেখে, হরিচরণের চোখ জ্বালা করছিল। কালু সাহার ওখানে, দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত অত বজা টেনেও সে এ টাকা পায় না। সেই দিন, জীবনে প্রথম, ভগবানের করুণা ও কৃপার প্রতি সন্দেহান হয়েছিল সে। আর তখনই তার পাশ দিয়ে ময়লা, ছেঁড়া শাড়ি পরা, রোগা, প্যাকাটি কিছু আশ্চর্য বড় বড় স্তনওয়ালা ফুলরেণু পিঠকুজো শরীর নিয়ে, চার হাত-পায়ে ভর করে, ইফাতে ইফাতে চলে গেল। তার হাতে একটি বাঁশের কুড়ি, তাতে



গোবর। কুঁজো বলে, কুঁজি বইতে হয় বলে, সে যখন হাটে তখন তার খুঁকে থাকা চলন প্রায় হামাগুড়ির মতো দেখায়। সারাদিন এভাবেই সে চলে। এভাবেই মাঠ, খাট ও রেললাইনের চিহ্নের ঢালে ঘুঁটে দেয় সে। গুল দেয়। আর এইসব বিক্রি করে আয় করে। হরিচরণ তাকে কখনও অভিযোগ করতে শোনেনি। ভিক্ষে চাইতেও দেখেনি।

ফুলরেণুকে দেখে হরিচরণ সে-দিন ঈশ্বরের ওপর থেকে সব অভিযোগ তুলে নিয়েছিল। যে-শক্তি নিয়ে একা পিঠকুঁজো ফুলরেণু লাড়ে যাচ্ছে, সেও তো ঈশ্বরেরই দান। অতএব, এই নানা বৈষম্যের মধ্যেও ঈশ্বরের কোনও কল্যাণের ইচ্ছা থেকে থাকবে, এমনই বিশ্বাস করেছিল সে।

মল্লিনাথের বাড়ির কাছে পৌঁছল হরিচরণ। ঘরে বাইরে ভিড়। তার হো ভেতরে যাবার কোনও উপায় নেই। এক পাশে ভ্যান রেখে উবু হয়ে পাথের ধারে বসে পড়ল সে। দেখতে থাকল। লোক আসছে আর যাচ্ছে। সবারই কপাল কুঁচকে আছে। মুখে বিষাদ। এই পাড়া ও তার আশেপাশে প্রায় সবাইকে চেনে হরিচরণ। সে দেখতে থাকে। একধারে চোখে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শেফালির মা। সঙ্গে অমরেশ, শ্যামল, কমল। তাঁরা বুজি-বা ঝগড়ানো যাবেন। সবলেই কোমরে গামছা বেঁধে আছেন। হরিচরণ ভাবছে, যদি অন্য কোনও অসুখে মারা যেত অমলেন্দু বা কোনও দুর্ঘটনায়, তবে যেন ডাক্তারবাবু কিছু সাহুনা পেতেন। অথবা, কে জানে, এই নেশা, এও হয়তো এক গুরুতর অসুখ এবং যে-কোনও ছেলে-মেয়ের জীবনেই এও এক বিশাল দুর্ঘটনা।



অবশেষে সমরেন্দ্র ও অনিসুজ্জামান কাজে যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। মল্লিনাথের সঙ্গে সারাদিন থেকে যাওয়াই সাবাস্ত করলেন তাঁরা। বিবাহ আর রঞ্জনও অনেকক্ষণ রইলেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে অফিস কামাই করা সম্ভব হল না। দিবোলু, ব্রজগোপালের ছেলে, অমলেন্দুর বন্ধু হিসেবে স্থান যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল। ব্রজগোপাল তাই দোকান সামলাবার জন্য থেকে গেলেন। মল্লিনাথ এবং তাঁর লসীসেয় ছেলেরা, একই শাভ্য, শাস্যগোয় বন্ধু হয়েছে, এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। যদিও এইসব ছেলেদের শিক্ষার মান, কচি, পেশা ও জীবনযাপনে পরস্পরের মধ্যে অনিল রয়েছে। একসঙ্গে বেড়ে ওঠার টান তবু থেকেই যায় একরকম। প্রায় আজীবন।

পরেশ বোসের ছেলে অনুপম, দেবোপম; বিকাশের ছেলে দেবাশিস, রঞ্জন সেনের ছেলে নিখিলেশ— প্রত্যেকেই অমলেন্দুর বন্ধুই। কিন্তু তাদের কারওকে কোনওদিন জ্ঞাবের নেশার আসরে দেখা যায়নি। কলেজের পড়া শেষ করে অনুপম এল আই সি-তে ঢুকেছে। দেবাশিস ব্যাঙ্ক। দেবোপম চাকরি পায়নি। টুইশন করছে। নিখিলেশ কলার দোকান দিয়েছে পাড়ায়। কেরোসিন তেলের ডিলারশিপও পেয়েছে। নেশার জন্যই হোক বা ডাক্তারি পড়তে গিয়ে পাড়াছাড়া হয়েছিল বলেই হোক, শেষের দিকে অমলেন্দুর সঙ্গে অনুপম-দেবাশিসদের আর তেমন যোগাযোগ ছিল না। অথচ একাত্তর-বাহাত্তরের সেই তুলুল সময়ে সমস্ত অকারণ অভিযোগ ও নির্মম হত্যার হাত থেকে একসঙ্গে পালিয়ে বেড়িয়েছে তারা। নকশাল আন্দোলনের সমর্থনে বা অসমর্থনে নিজেদের মধ্যে তর্ক করেছে। সমর্থন করা বা না-করা বিষয়ে তারা খুবই সংশয়ে ছিল তখন। শক্তিও হয়েছিল দেবাচন আর নীলাদ্রিকে নিয়ে। তাদের চেয়ে ছোট ছিল ওরা কিন্তু তবু, নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল। তবু, সেই সময়কার সমস্ত নির্ধারিত বর্তমানের অশান্ত উত্তাল তীব্রতার পর ধীর অবতরণ প্রক্রিয়ার কালে ছিটকে গিয়েছিল

অমলেন্দু, আর ঢুকে পড়েছিল কাজল, সুজন, মুখ্য আর অমিতাভের সঙ্গে। গভীর নেশায় অতিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ওরা কেউই কলেজ পেরেন না। মুখ্য ছাড়া অন্য সকলেই পৈতৃক ট্রাক বা বাসের ব্যবসা চালাবার প্রস্তুতি নিল। বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী ছিল না আরণ্ডার বাবা সেতারি মিথিলেশ ব্যানার্জি, উত্তরাধিকার সূত্রে হোমকে সেতার ছাড়া আর কিছুই সেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। মুখ্য সেতারে আগ্রহী না হয়ে ম্যাগাজিন তুলে নিল। আর নিউ মার্কেটের রেস্তোরাঁয় একটি ব্যান্ড বাজিয়ের দলে সঙ্গত করতে লাগল। প্রত্যেকের হাতে পেল কিছু কাটা পরস। আর তাই নিয়ে সতেরো-আঠারো বছর বয়সেই মন নিয়ে তারা ঢাকা সোনাগাছিতে দেহপরিগ্রহীদের পাড়ায়। নিখিলেশ, দেবাশিস, অনুপম। তখন বাড়ির অনুমতি ছাড়াই সিনেমা যাচ্ছিল বাটে কিছু মদ ছুঁতে পারেনি। অন্য পাড়ায় মাঝারি ভাগিরদেবী কয়েকদিন চাকরির ‘কাটিপতঙ্গ’ দেখে পাগল হয়েছে এক-একজন আর ওইসব বন্ধুদের মন ও মহিলাজনিত অভিযান বিষয়ে দমবদ্ধ করা গল্প শুনেছে। বয়সেজিকাল পেরলে এতে আর ভাসের কুচি ছিল না, তখন যেন একটি গভীর হওয়ার ইচ্ছে তাদের মধ্যে আর দেখা বা শোনার বিষয়েও তারা হাঁকনি ব্যবহার করতে চাইল। ফলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঠাকুরদা-ঠাকুরমাকে পোড়াতে গেলেও একটি অনিবার্য মেককরণে অভ্যস্ত হয়েছিল তারা। দিবোন্দু, অনুপম, দেবোপম, নিখিলেশ ও দেবাশিস ক্রমশ সুন্দর হয়েছে। যৌবনোদ্ভব ও স্বাস্থ্যবান হয়েছে, কিন্তু কাজল, সুজন, মুখ্য ও অমিতাভ ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকেছে কেবল। বিলিতি মদ আর চুঙ্গু, গাঁজা আর চরসের থেকে ক্রমে গিয়ে পড়েছে হেরোইনের গর্তে। আর এই দুই মেককর ঠিক মাঝখানে বহুদিন থেকে গিয়েছে অমলেন্দু। সে পড়ে ভাল ফল করেছে আবার গাঁজাও টেনেছে। নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে বা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গভীর মতামত দিয়েছে দিবোন্দু-দেবাশিসের কাছে, আবার কাজলের সঙ্গে সোনাগাছিতেও হামলা করেছে।

তার জন্য এখন ঘাটে ফুল লাগাচ্ছে দু’প্রান্তের বন্ধুরাই। আর ভাবছে ছোট ছোট স্থিতি কবে গুলি নিয়ে ঝগড়া করেছিল কোন ছোটবেলায়। কবে খেলতে গিয়ে ক্রিকেট বাট দিয়ে মেরে অমলেন্দুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল সুমন। অস্ত পরীক্ষার কাজলকে খাতা দেখাতে গিয়ে ভূগোল সায়ের কাছে থরা পড়ে মার খেয়েছিল অমলেন্দু। সেই অমলেন্দু এখন ঘুমন্ত, কৃষ্ণ, মলিন। দেবাশিস তার পোশাক বদলে তাকে ধুতি ও পাঞ্জাবি পরাচ্ছে। যদি ঠিক ঠিক চলত অমলেন্দুর জীবন তবে আর দু’-এক বছরের মধ্যেই এই পোশাক তার পরার কথা ছিল। দেবাশিস জানে, শৈশব থেকে সব ছেলেরই ওই পোশাক সম্পর্কে একটি স্বপ্ন তৈরি হয়। ওই পোশাক পরার জন্য তারা আকুল হতে থাকে। সেই আকুলতা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই এই পোশাকের বিরুদ্ধে সোচ্চারও হয় কেউ কেউ। কিন্তু অপূর্ব লজ্জামেশানো ইচ্ছে ক্রমশ রক্তে-মাংসে বাড়তে থাকে সব পুরুষের মধ্যেই।

আয়োজন শেষ হয়েছে। ঘরে কান্নাকাটির কোনও শব্দ নেই। প্রত্যেকেই নিচু গলায় কথা বলছেন। কিছুই যায় আসে না আর এমন মুখ করে দুই চোখ তুলসীপাতার ঢেকে শুয়ে আছে অমলেন্দু। গতরাতে মলিনাথ যে-পূজা করেছিলেন তার প্রসাদ পড়ে আছে যেমনকার তেমন। কারও সে-কথা মনেও নেই।

শ্রাদ্ধ যাবার জন্য খুব বেশি লোক আর রইলেন না। মলিনাথের আত্মীয় বলতে লিলি ও তাঁর স্বামী সত্যেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা। তারা, মিতা ও সন্দীপ, চুপ করে কোশে বসে আছে। মাধবীর কোনওকালেই কেউ ছিলেন না। যে-মামার কাছে তিনি ছিলেন তাঁকে মলিনাথ মুক্তি দিয়েছেন মাধবীকে বিবাহ করেই। অমরেশ, শ্যামল ও কমলকে নিয়ে বসে আছেন। তাঁদের সঙ্গে রইলেন সত্যেন, সমরেন্দ্র, অনিসুজ্ঞামান ও অমলেন্দুর বন্ধুরা। সকলেই শ্রাদ্ধ যাবার জন্য তৈরি। কিন্তু মাধবীকে দেখা যাচ্ছে না। তিনি চিলেকোঠার ঘরে চলে গিয়েছেন। তাঁকে শেষ দেখা দেখাবার জন্য নিয়ে এলেন লিলি। মলিনাথ চুপ করে আছেন। বড় বেশি সাদা লাগছে তাঁর

চুল। গালের মাংস খুলে পড়েছে। ষাট পেরোলেও এতদিন বারকাস স্পর্শ করেনি তাকে। কাল রাতে আশ্চর্য মহাকাল সে-কাজ সম্পন্ন করে গেছে।

বিবেকানন্দ অনুমতি চাইল, ওকে খাটে নিই মোটামুটি?

মলিনাথ নিজের মনে হাবিয়ে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ কথা শুনেও পাননি। তাঁর কপালে এখনও রক্তচন্দনের টিপ শুকিয়ে আছে। সবলেই বিস্মিত। বিরক্তও। নতুন চোখে দেখছেন এতদিনের পরিচিত লোকটিকে। কী কঠিন মানুষ! নিষ্ঠুরও কি নন। ছেলে মহাশয়্যায় জেনেও পূজা সম্পাদন করেছেন নিজে। মলিনাথ সুদূর থেকে চোখ তুলে আসেন। ঘনিষ্ঠ কলম দান্যাকে দেখতে চায়, কী বলব? যদি মাধবী বলে আমার হোসে কেয়ার গেল, কী বলব? যে-বার-খাপা সব আমার কাছে বুঝতে চাইবে। আমি কেমন করে দেব।

কথাগুলি নিস্তরঙ্গ বলে যান মলিনাথ আর শুনেও শুনেও অনিসূজ্ঞামানের চোখে ভাল এসে যায়। পকেট থেকে ক্রমাল বার করে চোখ মোছেন তিনি।

মলিনাথের হয়ে সমরেন্দ্র সম্মতি দেন দিবেকানন্দকে। ত্রোশক, বালিশ, গায়ের চামড়ার সমেত ধুতি-পাঞ্জাবি পরা চিরমুমুস্ত বন্ধুকে তুলে নেয় আটজন। এক খাট থেকে শুইয়ে দেয় অন্য খাটে। তাদের নির্ভার লাগে। ফেন যা-কিছু ওজন ওই ত্রোশক আর বালিশের। আটজনের ভারসাম্যে ত্রোশকের দেয়লায় মহাপ্রস্থানের পথে প্রথম পা রাখতে অমলেন্দু। সুমনের গলা ধরে আসে। তার মনে পড়ে যায় মাস দু'রেক আগেকার কথা। অমলেন্দু বলেছিল— আমি ফুটুস হয়ে গেলে— বুঝলি, সুমু, সঙ্গে কিছু পুরিয়া দিয়ে দিস। না হলে শালা ভগবানের কাছে গিয়ে নেশা করব কী করে।

সুমনের কাছে টাকা ছিল না সে-দিন। বলেছিল, পঞ্চাশ ছাড় তো গুরু। ধার রইল। তোর চিতায় পুরিয়া দিয়ে শোধ দেব।

অমলেন্দু পকেট থেকে টাকা বার করছিল যখন, আর দিচ্ছিল সুমনকে, সুমন দেখেছিল অস্বাভাবিক হাত কাঁপছে তার। আজ অমলেন্দু সত্যি ফুটুস হয়ে গেল। সুমন ওকে পুরিয়া দিতে পারছে না তো। অমলেন্দু কি বুঝেছিল সে চলে যাবে। কেন বলেছিল ওরকম। সুমনের মাথায় যন্ত্রণা হয়। খাটের কোনায় মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। ভারী ও বিকৃত গলায় কী যে বলে বোঝা যায় না। বোঝার চেষ্টাও করে না কেউ। অমলেন্দুর মৃত মুখে রোদূর পড়েছে। প্রায় মিশে যাওয়া শরীরে গরদের পাঞ্জাবি চকচক করছে। মিতা একটি সোনালি কলম এনে অমলেন্দুর পকেটে গুঁজে দেয়। এবং কান্নায় কাঁপতে থাকে। সন্ধ্যা দিকের জড়িয়ে নিয়ে সোফায় বসিয়ে দিতে চায়। তখন, মাধবীকে নিয়ে বারান্দার দরজায় এসে দাঁড়ান লিলি। সোতলার ড্রইংরুম সংলগ্ন বারান্দাতেই রাখা হয়েছে অমলেন্দুর খাট। মলিনাথ মাধবীকে দেখে সচকিত হন। তাঁর সঙ্গে অন্যরাও ভয়ংকর কিছু ঘটনার সম্ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। রঞ্জন ও বিকাশের স্ত্রী নিভা ও লক্ষ্মী স্বামীদের অফিসে রওনা করে দিয়ে উপস্থিত হন তখন। লিলিকে নিভা বলেন, ওকে বলো লিলি, ছেলে চলে যাচ্ছে। শেখবারের মতো ঝুঁতে বসো।

আমি পারব না, কিছুতেই পারব না, বলতে বলতে নতুন করে শোকগ্রস্ত কান্নায় ভাঙেন লিলি। কয়েকটি চতুই বারান্দার দিকে উড়ে এসেই আবার পালিয়ে যায়। এই পূর্বাহ্নে ময়দানের দিকে হেঁটে চলেছে একটি আসন্ন ভোটের মিছিল। প্রিয় নেতা ও নেত্রীর কাট আউট নিয়ে, দলীয় পতাকা উড়িয়ে যেতে যেতে ভোট পাবার দাবি জানায় তারা। রোজ। এক-একটি মিছিলের এক-এক রকম দাবি। মাধবী নিশ্চল হয়ে বাইরের দিকে দেখেন। মিছিলের জন্য পি ডব্লু ডি রোডে যানবাহন থেমে যাচ্ছে। তাদের হর্ন ও ধোঁয়ায় বাতাস কলুষিত হল। লক্ষ্মী আঁচলে নিজের চোখ মুছে বলেন, দিদি, পুরাশোক কী শোক, আমি বুঝি। ছেলে চলে যাবে তোমার। কিন্তু এখনও ও আছে। ওকে আশীর্বাদ করো।

লক্ষ্মী নিজের হাতের চাপ দিলেন মাধবীর হাতে। আর মাধবী সে-হাত ছাড়িয়ে এ পিঠ ও



পিঠ দেখে ঘরে চলে গেলেন। লক্ষ্মী আর নিভাও গেলেন তাঁর সঙ্গে। মাধবী বামাঘরের নিকে হাত ধুয়ে এ কৌটো সে কৌটো খুঁজে একমুঠো চিনি নিয়ে ফিরে চকলেম খারান্ধায়। গাঁরে ধীরে পা মুড়ে ছেলের মাথার কাছে বসলেন। গভীর ও অপলক চোখে চোখে রইলেন কিছুক্ষণ। সকলে নীরবে সভয়ে দেখতে লাগলেন মাধবীকে। মাধবী বললেন, মাশ্বিন্ ? যা। তবে পানি মুখে যেতে নেই বাবা। একটু চিনি মুখে দিয়ে বাও।

হাতের চিনি তিনি গুঁজে দেন অমলেন্দুর ঠোঁটে। ঠোঁট কাঁকায় না। শক্ত হিম মুখে চিনির দানা ছড়িয়ে যায়। গড়িয়ে পড়ে গলায়, বাকিশে, কানের গাওঁ। চিনিতে ঢুকে-পড়া দু'টি-তিনটি পিপড়ে অমলেন্দুর মৃত মুখে ঘুরে বেড়ায়। নিভা ও লক্ষ্মী মাধবীকে তুলে নেন। নিয়ে যান ঘরের দিকে। মল্লিনাথ আনিসুজ্ঞামানের দিকে তাকিয়ে বলেন, ভীষ্মশায় সবচেয়ে বড় শাস্তি কী জানো অধ্যাপক? নিজের হাতে ছেলের মুখাঙ্গি করা।

চার বন্ধু খাট তুলতে তুলতে আগুয়াজ দেয়। একজন হাঁকে— বলহরি—

সকলে পালটি দেয়— হরিবোল।

আনিসুজ্ঞামান, একা, শুক হয়ে বসে থাকেন। মল্লিনাথের বেদনা তাঁকে হুবির করে দেয়।



শ্মশান থেকে ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেল। খুব ঘিমে পেয়েছিল অনুপমের। বন্ধুকে দাহ করতে যাবার বেদনা উধাও হয়ে এখন একরাশ বিরক্তি। শ্মশানে আজ মৃতদেহের লাইন পড়েছিল। অমলেন্দুর আগে আরও চারজন পুড়ল।

সারাক্ষণ গোড়ানোর জন্য অপেক্ষা করে থাকা, শ্মশানের কটু গন্ধে গুলিয়ে ওঠা শরীর, অনুপম ভাবছিল, যে যায় সে তো যায়, যে থাকে তার শাস্তির সীমা নেই। হয়তো, এ কারণেই মৃত্যুকে ধরা হয় শাস্তি পারাবার। তবু, জীবনের এমনই টান যে শ্মশানের গন্ধের মধ্যেও ঘিমে পায়। তৃষ্ণা জাগে। গভীর নেশায় দুঃখাতুর সময়কে অস্বীকার করতে ইচ্ছে হয়। মৃত্যু, সর্বজনবিদিত শাস্তির। কিন্তু মৃত্যু জীবিতের আশ্রয় নয় কখনও। মৃত্যু একমাত্র মৃতকেই তৃপ্ত করে।

কাজল, সুজন, মুখ্য আর অমিতাভ এরই ফাঁকে গাঁজা টেনে এল। দিব্যেন্দু দু' টান মারার ফিকির করছিল। অনুপম বাধা দিয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সারাদিন শ্মশানে কাটাতে গেলে মদ-গাঁজা চমৎকার উপশম হতে পারে।

দেবালিস অনেকক্ষণ উদাস হয়ে বসেছিল আজ। ওকে বড় একটা উদাস বা উদ্মনা হতে দেখা যায় না। বরাবরই ও কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক ও সুখপ্রিয়। একটু মোটা দাগের বলা যায়। অমলেন্দুর দাহ আজ ওকেও উদাসী করেছে। ও বলছিল, অমলেন্দু আর অমলেন্দু নেই, না? শ্মশানে এসেই বড়ি হয়ে গেছে। স্রেফ বড়ি একটা।

দিব্যেন্দু বলেছিল, শুধু শ্মশান কেন? হাসপাতালে? হাসপাতালে গেলেই তুই বেঁচে থাকলে হবি বেড, মরে গেলে বড়ি।

দেবালিস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, শ্মশানে-টশানে এলে মনে হয় বেঁচে থাকার জন্য এত যুদ্ধ করে কী লাভ! সেই তো পুড়তে আসবই একদিন।

অনুপম বলেছিল, ব্যাপারটা অন্যভাবে ভাব। মনে কর, আমরা আজও কত ভাগ্যবান। শ্মশানে এসেছি কিন্তু পুড়তে আসিনি।

আসলে সমস্ত ঐদাসীনা ও দার্শনিক হয়ে ওঠার কারণ এই শ্মশান। শ্মশান কিংবা

গোরস্থানগুলি মানুষকে মৃত্যুর দিকে দিগিরিয়ে দেয়। এ মৃত্যু স্বাধিক প্ররোচিত করে না। করণ তৈরি করে ক্ষমাপ্রসন্নতা, শান্তিমোহ, যদিও অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্যই।

কোনও কথাই আসলে কোনও শেষ নেই। উত্তর নেই। মল্লিনাথ অমলেন্দুর সেই কুয়ে বসেছিলেন। নির্বাক শূন্য চোখ প্রবাহিত গম্বায় নিবদ্ধ ছিল। অমলেন্দুর আগে লাইনে এক বলিরেখাময় বৃদ্ধার শরীর। আজ, অমলেন্দু ছাড়া, অন্য যারা পুড়তে এসেছিল, তারা প্রত্যেকেই সারা জীবন পুড়ে পুড়ে কয়লা। মহাপ্রস্থানের পথে লম্বা কুঁড়ে দিয়ে গাঁড়িতে তাদের কবরও কোনও ক্ষোভ, কোনও আপত্তি নেই। শুধু অমলেন্দু আলাদা। তার হাতসবই সেই যৌবনের এতটুকু উজ্জ্বলতা নেই। তবু শ্মশানের ডোম থেকে শুরু করে প্রতিটি শ্মশানঘাটের বদলে খবর গেল—অকালে চলে গিয়েছে একজন। ডোমেরা ডাঙারখাঁড়িতে ঢেঁকি। তারা কেবল; আমা, দী শোকার্ত মুখ মানুষটার। এমন মুখে তাঁকে কেউ কখনও দেখেনি। শ্মশানঘাটেরও কেউ কেউ ডাক্তারবাবুকে চেনে, কেউ চেনে না। যারা চেনে না তারা দেখতে থাকছে একজন অকালমৃত পুত্রের পিতাকে। মানুষটার দীর্ঘ পরিপূর্ণ দেহা সুখী ও সফল অবস্থায়। এখন কাঁচাপাতা চুলগুলি বিন্যস্ত নেই। চোখ দুটি গঙ্গাজলের মতো ঘোলা ও গৈরিক।

অনুপম মল্লিনাথকে ছোটবেলা থেকে দেখছে। যে-কোনও সময় যে-কোনও পরিস্থিতিতে তাঁকে কখনও উত্তেজিত হতে দেখা যায়নি। এই পৃথিবীতে যা-কিছুই ঘটুক—খবর, কন্যা, খুনোখুনি, দাঙ্গা, রোগ, মৃত্যু—মল্লিনাথ অবিচল থেকেছেন। চিকিৎসা চালিয়ে গেছেন। পাড়া-প্রতিবেশীর বোজখবর নিয়েছেন। মল্লিনাথ যেন আগুনের মধ্যে দিয়েও সোজা হেঁটে যাবেন এমনই মনে হত। ডাক্তার হয়েও তাঁর কালীপূজা করা নিয়ে নানান কথা চালু আছে। মাখবী নাকি এই পূজার জন্যই পাগল হয়ে গেছেন। শ্মশানকালী নাকি খুবই আগ্রাসী। ভক্তের ভাগ-বাটোয়ারা সহ্যে পারেন না। আজ শ্মশানে বসে বসে অনেক ভেবেছে অনুপম। মল্লিনাথের জীবনের এই দুটি দুর্ঘটনার দিকে তাকালে প্রচলিত বিশ্বাস চ্যেপে বসতে চায়। কিন্তু ঈশ্বর তো সর্বশক্তিমান। তিনি সৃষ্টি, ক্ষমা, কল্যাণের দোাতক। ইতরজনের মতো তাঁরও কেন ঈর্ষা, ঘেঁষ, ক্রোধ ও দাখি থাকবে? অনুপম উপন্যাস ফরে, মল্লিনাথকে দেখে এ পাড়ার মানুষ শ্মশানকালীর প্রতি আরও ভীতি ও ভক্তি অর্জন করবে।

মুখাঙ্গির সময় অনুপম জলের কাছে দাঁড়িয়েছিল। চিতার সামনে যাননি। চিতায় তোলার আগে একেবারে নয় করে ফেলা হয়েছিল অমলেন্দুকে। নিয়ম অনুযায়ী শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের কথা জানে অনুপম যারা মৃত পুরুষকে চিতায় শোওয়ায় উপড় করে। নারীকে চিত করে। তাদের মতে ছেলে নাকি গর্ভদেশ থেকে এভাবেই আসে। মেয়ে আসে চিত হয়ে। তাই যাবার সময়ও এরকমই নিয়ম। এমনকী মৃতদেহ জলে ভাসালেও জল এ নিয়ম পালন করে যায় বলে মনে করে তারা। নারী ভাসে চিত হয়ে। পুরুষ উপড়। চিতা যেন অন্য এক মাতৃগর্ভ যা মানবদেহকে পৌঁছে দেবে অন্য কোনও দুনিয়ায়। তাই যথাযথ নিয়ম পালন করা। আর মানুষ, জীবনে যতখানি নিয়ম ভাঙতে পারে মৃত্যুতে ততখানি নয়। আজ শ্মশানের ধারে বহমান গঙ্গার দিকে তাকিয়ে অনুপমের মনে হয়েছে, শুধু জন্মকাল নয়, এই উপড় হওয়া পুরুষ, এই চিত হওয়া নারী, এ যেন যৌন-মুহূর্তেরও প্রতীক। এই ভঙ্গিতে সৃষ্টির মহিমাও নির্দেশিত। নারী-পুরুষের চূড়ান্ত মিলনের এটাই কি স্বাভাবিক ভঙ্গি নয়? এভাবেই একমু অস্থিতীয়ম হয়ে যায় না দুটো মানুষ?

অনুপম ভাব পায়। তার মধ্যে কি যৌনবিচার জন্ম নিচ্ছে? এরকম ঘোর মৃত্যু আর শোকের অবস্থানে এ সব মনে পড়ছে কেন তার? সে চিন্তাক্রিষ্ট ও ক্রান্ত হাতে দরজার বেল বাজায়। প্রলম্বিত যান্ত্রিক শব্দ নেচে নেচে বেড়ায় ভিতরে। কিছুক্ষণ পর শব্দী এসে দরজা খোলেন।

মায়ের মুখ দেখেই অনুপম টের পেল কিছু একটা হয়েছে। কিছু হওয়া তাদের বাড়িতে নতুন নয়। ছোটবেলা থেকে মা-বাবার বিবাক্ত দাম্পত্য দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে আর

তার ভাই। মা-বাবার ঋণগ্রস্ত হলে। মাঝে বাবা গালাগালি করে চলে যান। আরে মারতেনও। এখন, অনুপমরা বড় হওয়ার পর সেটি বন্ধ হয়েছে। এখন পরেশ শুধু গালাগালি করে চলে যান। এবার তিনি সারাদিন ফিরবেন না। শবরী রাখবেন না। খাবেন না। অনুপম-দেবোপম কিছু খাবে কি না দেখবেন না। তাঁর শোকপালন চলতে থাকবে। রাতে পরেশ মন খোঁয়ে ফিরবেন। আর এক প্রস্থ তুমুল গালাগালি করবেন শবরীকে। শবরীও মন অনুচ্চ থাকে তাকে। ইচ্ছা যোগাবেন। দু'একটা জিনিসপত্র ভাঙচুর হবে। তারপর আশ্রয় সমঝোতায় দু'জনে এক বিছানায় শুতে যাবেন। কেমন করে পারেন? অনুপম আজও এ বিষয়ের বিচার পাশনি। এই বিষয় সম্পর্ক নিয়েই এতগুলো বছর এঁরা পাশাপাশি আছেন। পাশাপাশি ঘুমান। হাসেন। গল্পও করেন। শবরী রূপটান দেন। পরেশ সংঘাতচর্চা করেন। সবই মতো তারা অনুপম ও দেবোপমের জন্ম দিয়েছেন এবং বিনা আয়াসে বড়ও করে ফেলেছেন।

অনুপমের মনে আছে, কতদিন ভুল থেকে ফিরে দু' ভাই দেখেছে খাবার নেই। খিদেয় মুখ শুকিয়ে গেছে। ফলত ছোটবেলা থেকেই উপায় খুঁজতে হয়েছিল তাদের। আর পেয়েও গিয়েছিল তারা। মাটির ভাঁড়ে খুচরো পয়সা জমাতে শবরী। এখনও জমান। দু' ভাই মিলে সেই ভাঁড় সরিয়ে আনত। চামচের পেছন দিয়ে পয়সা ফেলার ফুটোয় আঙুলে আঙুলে ঠেলা দিত অনুপম। আর খুচরো গড়িয়ে পড়ত। দেবোপম কুড়িয়ে দিত। দু'জনের খাবার পয়সা উঠে এলেই আবার ভাঁড়টি রেখে আসত যথাস্থানে। একদিন ফুটোটীর কাছে ভেঙে গিয়েছিল। শবরী সন্দেহ করেছিলেন। কিছু ধরতে পারেননি। তারা ভাঙা অংশটা আলতো করে চেপে রেখেছিল। শবরী আজও জানেন না এ সব। আজ আর পয়সা নেবার দরকার নেই কিন্তু তাদের পারিবারিক চিত্র বদলায়নি। বাইরে গিয়ে খাবার খেয়ে আসার প্রয়োজন আজও পড়ে।

শবরী কোনও কথা বললেন না। অনুপমও কিছু জিজ্ঞেস করেনি। আশুন আর লোহা সে ফেরার পথে ময়িনাখের বাড়িতে ছুঁয়ে এসেছে। সোজা স্নানঘরে গিয়ে অনেকটা স্নান করে নিল এখন। আর স্নান শেষ হতেই দলবীর খিদে দাঁত বসাল পাকস্থলীতে। কোথাও খাবার নেই। রাত থেকে এটো বাসনের পাঁজা পড়ে আছে। আঁশটে গন্ধ উঠছে। ঠিকে কি এসেছিল। শবরী তাকে কোনও কাজ করতে না দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। মশারি বালিশ চাদর স্তূপ হয়ে আছে বিছানায়। মাঝখানে হারমোনিয়াম। সোফায় চোখ বন্ধ করে পড়ে আছেন শবরী। অনুপম বুঝল, বেশ বড়ই হয়েছে। কী নিয়ে হয়েছে কে জানে! শবরীকে এখন খিদে কটা বলে কোনও লাভ নেই। দেবোপমকেও দেখা যাচ্ছে না। অমলেন্দু দেবোপমেরও বন্ধ ছিল। অনুপম-দেবোপমের বয়সের পার্থক্য কম বলে দু'জনের বান্ধবজগৎও প্রায় এক। অমলেন্দু মারা গেছে স্তনেও দেবোপম দেখতে যেতে চায়নি। বলেছিল, ও হেরেইন ধরেছিল। এটাই এখন আধুনিকতম নেশা বুঝলি। লেটেস্ট আমদানি। খুব টান বুঝলি। তোকে দু'দিনে নেশাভু করে দেবে। খরচও অনেক।

অনুপম বলেছিল, দেখতে যাবি না?

—না।

—কেন?

—পড়ানো আছে।

—আজ নাই-বা গেলি।

—ওর যখন তৃতীয় দিন, হেরোইন টানছে, সে-দিনই ও মরে গিয়েছিল বুঝলি। ওর অন্য নসীরা যত টানে, একদিনে ও টানত তার তিনগুণ। ওর জন্য আমি আগেই শোক পালন করে ফেলেছি।

দেবোপম এরকমই। কঠিন, জেদি, খাপছাড়া। কেউ ওকে বুঝতে পারে না। হয়তো-বা অনুপমই একমাত্র যে ওকে ছুঁতে পারে। কিন্তু সেও হয়তো সবটা নয়। তারা সহোদর এবং আবালা সহচরও। শৈশব থেকে যাবতীয় ত্রিভুজ ও যন্ত্রণা ভাগাভাগি করে নিতে নিতে তাদের

মূল টান ও ভালবাসা তারা বাড়িয়ে দিয়েছে পরস্পরের প্রতিই, যা আসলে তাদের শব্দ-মাঝের পারবার কথা ছিল। পরস্পরের কাছে তাদের কোনও আবডাল নেই কিছু সহমর্মী হয়েছে তাদের দু'জনের দুঃখভঙ্গি একতরফ নয়। যে-কোনও ঘটনা সম্পর্কে দেবোপম বড় বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু অনুপম উদাসীন হতে জানে। তার মনে হয়, অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দুঃখের পাল্লায় না, শুধু নিজের ক্ষতি করে প্রচুর। অনুপম সংগীত আঁকড়েছে জীবনে। দেবোপমও গায়। কিন্তু বন্ধুই ফেলে-ছড়িয়ে। পরেশের কাছ থেকে সংগীতটুকু পেয়ে অনুপমের কৃতজ্ঞতার নামা নেই। গানের মধ্যে সে সব ভুলতে এবং ধূয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। নিয়মিত সন্ধ্যাকটকটা করে সে। দেবোপমের এ সব কিছুই নেই। কোনও কিছু নিয়মিত করা তার নয় না। ইংরেজি সাহিত্যে এর এ করে সে টাইশন করছে। চাকরি করবে না। তার নাকি চাকরির সরঞ্জাম নেই। অনুপম দেখেছে, দেবোপমের আঙ্গু ও বা নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় আছে তা ওর পঠাড্যাস।

দেবোপম শেষ পর্যন্ত কী করবে অনুপম জানে না। আজকাল তার ভাবনার সমস্ত কমে গেছে। কথারও। হেঁদোয় একটি গানের স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সে। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা সেখানে চলে যায়। ফিরতে ফিরতে রাত্রি এগারোটো-সাত্বে এগারোটো। তখন আর কথা জমে না কিছু। দেবোপম অনেক রাত্ত পর্যন্ত আলো জ্বলে কীসব লেখে। অনুপম জানতে চেয়েছিল একদিন। দেবোপম বলেছিল—ডায়েরি লিখি। আমি মরে গেলে ওগুলো তুই নিয়ে নিস। বুঝলি?

বাইরে থেকে কিছু খেয়ে আসা দরকার। পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপিয়ে অনুপম বেরোচ্ছিল। দরজার কাছেই দেবোপমের সঙ্গে দেখা হল। দেবোপম বলল, কখন এলি?

—এই তো। এসে স্নান করলাম।

—কোথায় ঘাচ্চিস আবার?

—ঘরে খাবার-দাবার নেই। খুব খিদে পেয়েছে।

—তুই যা। আমি আনছি।

—পরাসা আছে?

দেবোপম পকেট থেকে টাকা বের করে গুনল। বলল, হয়ে যাবে।

খাবার আনতে চলে গেল সে। অনুপম ঘরে ফিরল। দেবোপম এসে যাওয়াতে ভালই হল তার। এত ক্লান্ত লাগছিল যে বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু ঘরের অগোছালো অবস্থায় তার ক্লান্তি আরও বেড়ে গেল। এলোমেলো অপরিচ্ছন্ন ঘর সে সহিতে পারে না। এক হিসেবে তার কিছু নিজস্ব বৃত্তবৃত্তিই আছে। তার পোশাক কাকবাকে ঝাকা চাই। সে শুলে যদি বিছানার চাদর গুটিয়ে যায় তবে সে-চাদর টান না করা পর্যন্ত তার ঘুম আসে না। গ্রাসে আঁশটে গন্ধ থাকলে সেই জল সে পান করতে পারে না কিছুতেই। ঘরের হাল ফেরাতে টুকটাক জিনিসপত্র গোছাতে লাগল সে। মশারি ভাঁজ করল। ছড়ানে জামাকাপড় হাতায়ে খোলাল। শবরী সোফা ছেড়ে ব্যালকনিতে গিয়ে বসেছেন। তাঁর মুখ এখন বাইরের দিকে ফেরানো। এখনও শবরীকে কত তরুণী দেখায়। না বললে কেউ ভাববে না শবরীর এত বড় বড় দু'টি ছোলে আছে। সেই তুলনায় বরং পরেশ অনেক বুড়োটে মেরে গেছেন। মাথায় চকচকে ঢাক। গোলা ভুঁড়ি। পুরু গোঁফ। মদ খেয়ে খেয়ে চোখের তলায় জলস্থলী। চিরকাল ভেবে গেলেন মামা দে-র চেয়ে তাঁর প্রতিভা কম ছিল না। শুধু কপালজোরে বিখ্যাত হয়ে গেলেন মামা দে আর পরেশ বোস মাথুরের গড়ে পড়ে রইলেন। পরেশের জন্য মাঝে মাঝে কষ্ট হয় অনুপমের। এ যেন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। কী ব্যর্থ জীবন মানুষটার। শবরীর জন্যও অনুপমের কষ্ট হয়। অল্পত জীবন শবরীরও। চোন্দো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল শবরীর। সেই থেকে এই মাথুরের গড়ে। কোথাও কোনও বন্ধু নেই। মাথুরের গড়ের কোনও বাড়িতে তিনি যান না। পরেশ বোসের ইচ্ছে ও খেয়ালে পা ফেলে চলতে চলতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন মহিলাটি। এতদিনের সংসারজীবনে

একবার মাত্র সপরিবারে বাইরে গিয়েছিলেন পারেশ। আগ্রায়। সেই স্মৃতি, সেই ভয়ংকর স্মৃতি কোনও দিন ভুলতে পারবে না অনুপম-দেবোপম। তখন অনুপমের রাস দশ। দেবোপমের নয়। ততদিনে অনেক জেনে ফেলেছে তারা। অনেক দেখে ফেলেছে। কিন্তু সে-দিন তারা এক ঝটকায় শয়তানের মতো বড় হয়ে গিয়েছিল। দু'জনেই।

অনুপম মায়ের পাশে দাঁড়াল। এ পাশ থেকে রেললাইন দেখা যায়। শরীর সে-দিকেই দেখছিলেন। অনুপম ভাল, মাকে কিছু বলবে। কিন্তু কী বলবে ভেবে পেল না। তার মনে হল, সে কি মাকে ভালবাসে? বাবাকে? হঠাৎ এ প্রশ্ন মনে আসায় সে নিজেও কম অবাক হল না। সহসা উত্তরও পেল না কিছু। তখনই দেবোপম ঘরে ঢুকে উল্লস, দাদা।

অনুপম ঘরে এল। ডিম আর পাউরুটি এনেছে দেবোপম। সঙ্গে একবার মিষ্টি। বলল, সন্দেশগুলো খা। আমি ততক্ষণে ফ্রেকটোস্ট করে দিচ্ছি।

শরীরও ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দেবোপমের হাত থেকে প্যাকেটগুলো নিতে নিতে বললেন, তোমরা বাসো। আমি করে দিচ্ছি।

কোনও কথা না বলে প্যাকেটগুলো বাড়িয়ে দিল দেবোপম। অনুপম বলল, দুপুরে কী খেয়েছিস?

—ভাত খেয়েছি। হোটеле।

মাদুর নিয়ে এল দেবোপম। বালকনিতে বিছাল। এ তাদের পুরনো অভ্যাস। সন্ধ্যাবেলা এক জায়গায় হলে বালকনিতে বসে কথা বলা। অনুপম বালকনির আলো নিবিয়ে দিল। হাতে মাখা রেখে শুয়ে পড়ল মাদুরে। টান টান হয়ে শুতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু বালকনির ছোট পরিসরে শরীর টান করা সম্ভব নয়। দেবোপম শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে গান ধরল—ইয়ে যো মহবত হ্যায়...

অনুপম বলল, ওঃ। পারিস তুই।

—কেন?

—এটা ছাড়া আজ আর গান পাছিস না?

—কেন? এটা বসন্ত। একটু বার্ষ প্রেমের গান গাইব না?

—তা নয়। আজ এরকম একটা দিন।

—অ। প্রা হলে 'আছে দুখে আছে মৃত্যু' গাই? দেবব্রত বিশ্বাসের মতো কৈদে কৈদে গাইব তো?

অনুপম জবাব দিল না। দেবোপম আরও কিছুক্ষণ ইয়ে যো মহবত হ্যায়... গুনগুন করল। অনুপমের মনে হল ও জোর করে অমলেন্দুর মৃত্যুজনিত বিষয়তা অস্বীকার করতে চাইছে।

অনুপমের মুখোমুখি বসল দেবোপম। বলল, তুই অমলেন্দু মারা গেছে বলে বলছিস তো?

—তাই তো মনে হয়।

—আর অমলেন্দু। তাকে বললাম না ও দু'বছর আগেই মারা গেছে? ফেব্রুইয়ার পেরনোর আগেই অমলেন্দু ওর মেডিক্যালের বই বেচতে শুরু করেছিল। হেরোইন কি ও আজ থেকে খায়?

—সে কী।

—এতেই অবাক হোস না। আরও আছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে দেশের সেরা ও মেধাবী ছাত্ররাই ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায় তবে এ কথাও মানতে হবে যে সেরা মেধাবীরাই সবচেয়ে বড় নেশাড়া। সবচেয়ে বেশি উদ্ভুদ্ধল ও নিষ্ঠুর।

—কেন?

—মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হস্টেলগুলোতে কী পরিমাণ নেশা চলে তোর কেনও ধারণা নেই। মেয়েদের নিয়েও ওরাই সবচেয়ে বেশি খেলে। আর নিষ্ঠুরের মতো রাগিৎ—এ

ওদের জুড়ি নেই।

—অমলেন্দুও এরকম ছিল কলতে চাস।

—কেন নয়? তুই কি জানিস ও নিয়মিত সোনাগাছি যেত?

—সে কী! সে তো কাজল-সুজনরা যায়।

—অমলেন্দুও যেত। আর ডাক্তারজের্ট বোধহয় এখনও জানেন না যে তাঁর বউয়ের গয়নাগুলোর প্রায় সব হারিস।

—বলিস কী? কী করে?

—শোন, হেরোইন যেতে প্রচুর পয়সা লাগে। বলছিলুম না, লামি নেশা। হয় টাকা লাগে, না হলে বেচো। পেড়লার হও। শেষ পর্যন্ত সবাই অবশ্য পেড়ালি করে। কিন্তু মারামারি নিয়ে জিনিস বা বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি করার দীর্ঘ পথ পেরতে হয়।

—কীরকম?

—যেমন প্রথমে বই। তারপর ঘড়ি। তারপর জামা-প্যান্ট। নিজের ঘরান আর কিছুই থাকে না তখন বাড়ির বাসন-কোসন। ঠাকুরপুজোর ছোট ছোট পেতল বা রূপোর সেকাবি থেকে শুরু করে বড় বড় হাড়ি-কড়া পর্যন্ত। বাসন নেওয়া একটু অসুবিধে। তার থেকে অনেক বেশি সুবিধে গয়না নেওয়া। সরলমতি মায়েরা ছেলেদের একটুও সন্দেহ করে না। তারাও একটি দুটি করে গয়না সরায়।

—তুই এত সব জালিলি কী করে?

—অমলেন্দুই বলেছে। সরাসরি। ওদের সঙ্গে ক্লাবে হেরোইন যেতে যেতেই শুনেছি।

—তুই খেয়েছিস নাকি?

—দুটান। টান মানে কী। এ তো সিগারেট বা গাঁজা টানা নয়। এটায় নাক দিয়ে ঘোয়া টানতে হয়।

—সে কী রে। বলিসনি তো?

—তোর সময় কোথায়?

—কীসের?

—শোনার।

—হঁ। তারপর?

—অমল বলছিল, প্রথম দিন ঘরান ও মায়ের গয়না সরায় ওর দুই হয়নি। সারা রাত মনে হয়েছিল ও পাপ করেছে। এমনকী প্রথম যে-দিন হেরোইন খায় সে-দিনও এরকম লাগেনি। ও ভেবেছিল আর এ সব থাকে না। সকালবেলায় বইটাই খুলে পড়তে বসেছিল। কিন্তু বই খুললে ওর নাকি বমি পোত।

—ভাঃ! অমলেন্দুর মতো ছেলে! ভাবা যায়। স্কুলে বোধহয় এখনও ওর রেকর্ড আছে।

—ও বলত, ডাক্তারি বই দেখলেই ওর মনে হয় পাস করে বেরলেই বাবা ওকে খশানকালীর পুজোর ভার দেবে। ওদের বংশের নিয়ম অনুযায়ী বংশের বড় ছেলে হিসেবে এ দায়িত্ব নাকি নিতেই হবে।

শরীরী খাবারের ছোট নিয়ে এলেন। ডিমভাজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। অনুপম বলল, তোমার কোথায় মা?

শরীরী বললেন, আছে। তোরা নে।

প্লেট দিয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বললেন, তোর ইয়েটসটা কোথায় রে?

দেবোপম উঠে গেল। তার টেবিলে বা বইয়ের র্যাকে কারও হাত দেবার অধিকার নেই। শরীরী বই পড়তে ভালবাসেন। তাঁকে খানিকটা স্বশিক্ষিতই বলা যায়। তাঁর সমস্ত জীবন-যাপনের ফাঁকে ফাঁকে মাথুরের গড় লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে অজস্র বই তিনি পড়েছেন।



ছেলেবাই তাঁকে বই এনে দেয় এবং শবরী ইরাজি বাংলা দুই-ই পড়েন। দেবোপম রাখন ইংলিশ অনার্স নেয় তখন বুশি হয়েছিলেন শবরী। বলেছিলেন, তোর পড়াগুলো আমাকে পড়ারি ছোটপম?

সব পড়ানো সম্ভব হয়নি। সাহিত্যের ইতিহাস বা ভাষাতত্ত্ব পড়েনি শবরী। কিন্তু উপন্যাস, নটিক, প্রবন্ধ ও কবিতাগুলো পড়েছেন। অনেক কবিতা শবরীর মুখস্থ। ছেলেটা বেখবত রাখে। কিছু স্বয়ং পরেশই হয়তো তা জানেন না।

বই নিয়ে ফিরে এল দেবোপম। শবরী বললেন, তোমরা যাতে কীট যাতে না ভাসে? অনুপম বলল, ভাতই করে।

শবরী চলে গেলেন। দেবোপম যেতে যেতে বলল, শবরী রাস্তা পড়ছে।

অনুপম বলল, এখনই সিদ্ধান্ত নিস না। দেবা ফরাক। সে-পর্বটা বাকি আছে এখনও।

—যা বসেছিস।

অনুপম প্রসঙ্গ ফেরায়। বলে, হ্যাঁ। তারপর? যা বলছিলেন।

—হ্যাঁ। কী বলছিলাম। ও। কালীপূজা করতে হবে এই ভয়ে ও চেয়েছিল কোনওদিন যেন ভাক্সারিটা পাস করতে না হয়।

—কী বোকাম মতো কথা। ভাক্সারি পাস না করলেও ওকে পূজা করতে হত।

—সেটা তো সঠিক যুক্তি হয়ে গেল। অমলেন্দুর তো সঠিক যুক্তির প্রয়োজন ছিল না। ওর প্রয়োজন ছিল নেশা করা বা যাবতীয় উদ্ভুলতার উদ্দেশে কিছু খাড়া করা।

—এবং, আরও কথা আছে। পূজাও ওকে করতেই হবে তার মানে কী? পরিবারের প্রত্যেক রীতিনীতি মনতে এখন আর কেউই বাধা থাকে না। পূজোপাঠ, ধর্মাচরণ, বিয়ে—এই সবই এখন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় কি?

—ব্যক্তিগত। ঠিক। এই কথাটা তুই কতদিন ধরে শিখেছিস?

অনুপম গরম টোস্টে কামড় দিয়ে চিঝোয়। ভাবে। তারপর বলে, তা বলতে পারব না।

দেবোপম বলে, আমাদের পরিবার দেখে বিচার করিস না। আমাদের কোনও শিকড় নেই। কিন্তু সাধারণ ভাবে এখনও আমাদের সমাজে শ্রেণী, সমাজ, পরিবার, আভিভাতা শব্দগুলি খুবই প্রবল। এর বাইরে আমরা ভাবতেই পারি না। ব্যক্তিগত ব্যাপারটা খুবই সাম্প্রতিক এবং তুচ্ছ।

অনুপম ভাবে, ঠিকই বলেছে ছোটপম। এ সমাজে প্রত্যেকেরই হচ্ছে অনিচ্ছে কোনও পরিস্থিতি বা পরিবেশের নিরিখে নিবেদিত। একা 'আমি' কোনও গুরুত্ব পায় না। যারা 'আমি'কে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, বলতে চায়—এই পৃথিবী আমার, এই জীবন আমার, এই ধর্ম, দর্শন, রাজনৈতিক মতামত আমার—তাদের ধ্বংস বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। কিংবা ধ্বংসের ভয়ে পালাতে পালাতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তাদের। এ এক অদ্ভুত অসম হাতুড়ু খেলা যেখানে একজনের প্রতিপক্ষ হাজার হাজার নিয়ম ও সংস্কার।

দেবোপম আবার অমলেন্দুর প্রসঙ্গে আসে। বলে, অমলেন্দু একবার একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা বলেছিল।

—কী?

—ওর মায়ের গমনাগুলো নিতে নিতে যখন প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে সে-সময় একদিন দুপুরে আলমারি খুলে ও কোনটা নেবে ভাবছে, তখন পিছনে জেঠিমা এসে দাঁড়ালেন।

—সে কী। তারপর?

—অমল বলেছিল, আমি প্রথমে ভাবাচাকা খেয়ে গেলাম। চুরি ধরা পড়লে যা হয় আর কী। মা তো এ সময় ঘুমিয়ে থাকে! তা হলে কি খাবা আজ মাকে ঘুমের ওষুধ দেয়নি? তাড়াতাড়ি গমনাগুলো লুকোতে গেছি। মা বলল, নিবি? নিবি? আয়। আমি বেছে দিছি। মাধবী



জ্যোতিমার নাকি খুব সুন্দর দু'টো কঁকন ছিল। পাছা বসানো। সে দু'টো নিয়ে উনি বলেছিলেন—  
এগুলো ছাড়া সব নিয়ে যা। কাকে দিবি রে? পুত্রো দিবি না তো? কালীর পুত্রো দিবি না তো?  
এই মেয়েছেলেটা খুব খারাপ। উলঙ্গ হয়ে থাকে আর পুরুষ ভোলায়। এগুলো দিয়ে বাপুশি  
কর কিন্তু সাবধান, ওর ফাঁদে পড়িস না। আর দেখ, এ দু'টো দেখ, এগুলো তোরা বউ আর  
কমলের বউয়ের জন্য, বুঝলি।

লোডশেডিং হল। শবরী বিরক্ত হয়ে গজ গজ করতে করতে উঠে এসেন। এই শুরু হল।  
কতক্ষণ থাকবে না কে জানে! খুব গতি নিয়ে দশকে পার হয়ে গেলে একটি ট্রেন। বোধহয়  
দার্জিলিং মেল। কড়া নাড়ার শব্দ হল। শবরী দরজা খুলতে গেলেন। দেবোপম উঠে দেখলই  
জ্বালল। কোথায় মোমবাতি, কোথায় লণ্ঠন কে জানে! প্রায় প্রত্যেকদিন লোডশেডিং হয় অথচ  
কোনওদিন কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় এগুলো পাওয়া যায় না। দরজা খোলার শব্দ হল। হুইচই  
করে ভিতরে এল অরূপ। কলকাতা পুলিশে চাকরির আবেদন করেছিল। পেতে গেছে।  
শবরীকে একরকম জড়িয়ে নিয়েই ভিতরে এসেছে সে। ঘরে কয়েক পাক ঘুরে অন্ধকারেই  
নাচগান জুড়ে দিল—ইয়া ইয়া হিপি হিপি ইয়া ইয়া হিপি। তখনই, অবিস্ম্যাস কম সময়ে আলো  
ফিরে এল।

চমৎকার দেখাচ্ছে অরূপকে। হলুদ রঙের শাট আর সাদা প্যান্ট পরেছে। দেবোপমের মনে  
পড়ল, অমিতাভ বচ্চনের যে নতুন ছবিটা এসেছে, কী যেন নাম, তাতে এরকমই একটা পোশাক  
পরেছেন বচ্চন। হঠাৎ খুবই বিরক্তি লাগল দেবোপমের। অরূপ দেবোপমেরই বন্ধু। কিন্তু  
অরূপের এই অমিতাভকে নকল করার ব্যাপারটা সে একেবারে সহ্য করতে পারে না। এটা ঠিক  
যে বচ্চনের সঙ্গে অরূপের চেহারার মিল আছে। আর অরূপ তা এক মুহূর্তের জন্যও ভোলে  
না। সে চুলও ছাঁটে বচ্চন কাটিং-এ। অনেকটা পরেশের মামা সে হওয়ার মতো।

অরূপ চাকরির খবর পরিবেশন করেছে। অনুশম বলছে, শ্যাম্পেন কোথায়? শ্যাম্পেন?

অরূপের দিকে দেখতে দেখতে দেবোপমের চোখ পড়ে গেল শবরীর দিকে। শবরীর মুখ  
অপূর্ব উজ্জ্বল। সকাল থেকে জমে থাকা বিষ্ময়া ও গাভীরের মেঘ উড়িয়ে কেউ যেন আনন্দের  
মগ্ন আবেশ পরিয়ে দিয়েছে তাকে। এটা দেবোপম আগেও লক্ষ করেছে। অরূপ এলে শবরী  
বদলে যান। অরূপের উপস্থিতিটাও এমনই। হঠাৎ হাওয়ার মতো বা হাড়কীপানো হিমে  
একরাশ বলমলে রোদ্দুরের মতো।

শবরী অরূপের দিকে অপজক চেয়ে বললেন, আজ রাতে খেয়ে ফিরছ তো? আমার কিন্তু  
এখনও রান্না হয়নি।

দেবোপম ভাবে, কে বলবে এই মহিলা আজ সারাদিন রান্না করেননি বরের সঙ্গে কগড়া  
হয়েছে বলে।

দরাজ গলা অরূপের। দরাজ উন্নত শরীরের মতোই। এবং অমিতাভ বচ্চনের মতোও। সে  
দু'হাত তুলে বলে—

সম্পূর্ণ ক্ষুধার নীচে বালি আর সোরা আর গন্ধকের গৃহ...

অন্ধরে করুণ ঘণ্টা আরও ক্ষিপ্ত করে তুলে কিরণক্ষমতা

ভরে নিতে প্রক্ষেপণে, তুমি কি সমস্ত শেষে আমাকে সমীহ

করাই মনস্থ করলে শ্যামল ধনুক-তীর?...

শবরী জু কুঁচকে বললেন, উঃ। এ তো প্রায় মধুসূদনের ভাষা বলছ। যা জিজ্ঞাসা করছি তার  
জবাব না দিয়ে কীসং বলছ বলো তো।

অরূপ চোখ বন্ধ করে হাসে। বলে, হে ইয়েটস্-এলিয়ট পড়া রমণী! ইহা আবোল-তাবোল  
নহে। মধুসূদনও নহে। ইহা জয় গোস্বামী। সাম্প্রতিকতম আধুনিক বাবি।

পকেট থেকে একটি পাতলা বই বের করে সে। অনেকটা স্বপনকুমারের গোয়েন্দা গল্পের

বইয়ের মতো। বইখানা রোল করে পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিল অরূপ। হাত দিয়ে পেটি সোজা করার চেষ্টা করতে করতে দেবোপমের দিকে তাকিয়ে সে বলে, প্রভাসকে মনে আছে তো?

—কোন প্রভাস?

—আরে বাংলার প্রভাস। কবিতা লিখত। আমাদের গ্রামের সন্ধ্যাশ্রীকে কবিতায় প্রেম নিবেদন করেছিল। সন্ধ্যাশ্রী খিচাইন করে ছেড়েছিল, মনে নেই?

—হ্যাঁ। মনে পড়েছে। পাগলা-প্রভাস।

—আজ ওর সঙ্গে দেখা। কলেজ ট্রিটে। সেই একইরকম আছে মাহিরা। আমাকে জোরজোর ধরিয়ে দিল বইটা। বলল—পড়ে দেখ। অন্যধারণ। কলেজ ট্রিট থেকে এখানে আসি। অন্য সেভেনটি এইট বাই ওয়ান থরলাম। শালা এমন জামা বিসি গোড়ে, বাসই নড়ে না। কী আর করব, বইটা পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে গেল।

দেবোপম বইটা নিল। শবরী বললেন, তুমি কিন্তু কী বাবে বলোনি।

অরূপ গমগমে স্বরে শবরীর স্বর ঢেকে দিল, বাব কী? খাওয়াব। বড়োপম, ঢলো, ঢিকেন নিয়ে আসি।

অনুপম মাথা নাড়ল। বলল, আমি যাব না অরূপ। তুমি ছোটপমকে নিয়ে যা। আজকে পাড়ায় একটা বাজে ব্যাপার হয়েছে। সারাদিন শ্মশানে ছিলাম। এখন ভাল লাগছে না।

—শ্মশানে? কেন? কেউ মারাটার গেছে?

—হ্যাঁ। আমাদেরই বন্ধু।

—ওঃ। তা হলে আজ ঢিকেন থাক, নাকি। তোদের বন্ধু মানে তো...কীভাবে মারা গেল রে? এবার দেবোপম অরূপকে খামিয়ে দিয়ে বলে, 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ' পড়ে কি তুমি শীত হয়ে গেলি? অমলেন্দু হেরোইন খেয়ে ফিনিশ হয়ে গেছে। তার জন্য আমাদের ঢিকেন না বাবার কোনও মানে হয়?

অরূপকে নিয়ে দেবোপম চলে যায়। কী করা যেতে পারে বুঝতে পারছিল না অনুপম। সারা মুখ বিষাদ হয়ে আছে। আজকাল বাড়িতে থাকতে ভাল লাগে না। কোনওদিনই কি লাগত? গানের কূলে চলে গেলে বরং ভাল হত। অনুপম ছাড়া কেউই গানের কূলে প্রতিদিন যায় না। সে যায়, কারণ গিয়ে ভাল থাকে। আদর্শ পরিবার বা সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ কেমন হতে পারে সে-সম্পর্কে অনুপমের কোনও ধারণা নেই। একসময় প্রত্যেক সহপাঠীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুপম ভাবত—ওদের খুব আনন্দ। ওদের কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু পরে কোনওদিন কোনওভাবে অনেকেরই যন্ত্রণার কথা জেনেছে সে। সবাইই আলাদা আলাদা যন্ত্রণা। তার মনে হয়েছে, জীবন এরকমই। আপাত উজ্জ্বল। আজ মনে হচ্ছে জীবন অন্ধকার। অসার। ইঠাং হাসি পেল তার। এ সব কী ভাবছে সে! সম্যাসী হয়ে গেল নাকি? আজ সারাদিন শ্মশানে থাকার ফলাফল। এর আগেও অনেক বার শ্মশানে গেছে অনুপম কিন্তু সেইসব মৃত্যুর কোথাও কোনও শোক ছিল না। জরাজীর্ণ মৃতদেহ পোড়ানোর মধ্যে বেশ একটা জঞ্জাল পরিষ্কার করার তৃপ্তি পাওয়া যায়। পৃথিবীর বোকা যেন হালকা হল একটু। কিন্তু আজ অমলেন্দুকে পোড়ানোর ব্যাপারটা অন্যরকম।

পারিবারিক নিয়ম মানতে চায়নি বলেই এরকম উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল অমলেন্দু, এ কথা মনেতে পারেনি অনুপম। হ্যাঁ, সমাজ ও পরিবারের অনুশাসন লঙ্ঘন করা সোজা নয় কিন্তু অসম্ভবও নয়। তার জন্য হয়তো একা হয়ে যেতে হয়। কতবিক্ষত হতে হয়। কিন্তু অনুশাসন ভাঙা যায়। তার জন্য আত্মক্ষতের কোনও প্রয়োজন হয় না। আসলে এটা আত্মপ্ররোচনা। নিজের দুর্বলতার সপক্ষে দুর্বলতার যুক্তি। ধ্বংসকে কখনও সমর্থন করতে পারেনি অনুপম। পলায়নপরায়ণতাকেও নয়। অমলেন্দু পরিবার ছেড়ে চলে যেতে পারত। মল্লিনাথকে অস্বীকার

করতে পারত। আসলে নিজের দুর্বল চরিত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল সে। তবু কোথাও একটা কষ্ট হতে থাকে অনুপমের। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। বহু ছোট ছোট মুক্তি। আশ্রমের পুকুরে একবার এ পার-ও পার সাতার প্রতিযোগিতা করেছিল তারা। মাঝ-পুকুরে মুখায়ের পেশিতে টান লেগে গিয়েছিল। অমলেন্দু আর দেবোপম আস্তে আস্তে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে আসে। না হলে, কে জানে, মুখায় মরেও যেতে পারত। অমলেন্দু মাথাখানে নকশালে কুকেছিল। খুব লেনিন-মার্কস পড়ত। সত্যজিৎ নামে একটি ছেলে আসক্ত অমলেন্দুর কাছে। সত্যজিৎ আর অমলেন্দুর সঙ্গে দু'একবার উদ্বাস্ত কলোনিতে শ্যামল নামে একটি ছেলের বাড়িতে গিয়েছে অনুপম। শ্যামলের সঙ্গে এখনও মাঝে মাঝে দেখা হয়। হাঃ। মাথা নাড়ে। কিন্তু ওঁকুই। সত্যজিৎ তুমুলভাবে নকশাল করত। অনুপম কখনও রাজনীতি করতে শয়ন করেনি। কিন্তু সত্যজিতের কথা শুনতে ভাল লাগত তার। হঠাৎ অমলেন্দু সত্যজিৎকে ওদের বাড়িতে আসতে বারণ করে দিল। বলল, ও পুলিশের কোপে পড়তে চায় না। সত্যজিৎ আসা বন্ধ করে দিল। অমলেন্দুরও মার্কসচর্চা ইতি।

তখন রেললাইনের ধারে ক্লাবটা সদ্য তৈরি হয়েছে। নেহাতই তাস, ক্যারাম আর দাবাখেলার ক্লাব। শীতে ব্যাডমিটন, ক্রিকেট। কিন্তু পুলিশের নজর ছিল ক্লাবটার ওপর। কোথায়ই-বা ছিল না। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তখন বাজুপাখির মতো নিষ্ঠুর, তীক্ষ্ণচক্ষু ও বানু শিকারি হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল সত্যজিৎ আর অমলেন্দু ঠাণ্ডা মাথায় ভক্তারি পড়তে গিয়েছিল। তখন এইসব পারিবারিক দায়বদ্ধতা ও অস্বীকার কোথায় ছিল কে জানে। আসলে নেশার প্রতি ওর বরাবরের টান। স্থূল পালিয়ে শশালঘাটে গিয়ে গাঁজা খাবার সন্ধান অমলেন্দুই প্রথম দিয়েছিল।

ভারতে ভারতে হাঁফিয়ে ওঠে অনুপম। সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে নিজের হারমোনিয়াম বার করে। এ বাড়িতে তার ও পরেশের হারমোনিয়াম আলাদা। হারমোনিয়ামের গায়ে খুশিমতো আঙুল খেলায় সে। যেন ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রমাণ করে। সে নিজেও জানে না এ মুহুর্তে কোন সুর কোন রাগ তার ভাল লাগবে। অস্থির পতঙ্গের মতো ঘুরে বেড়ায় তার আঙুল। বাসন মাজতে মাজতে শবরী বলেন, মারোয়া পরলি ?

মারোয়া ? তাই তো। অনুপম লক্ষ করে, দ্রুত আঙুল চালালেও সে বারবার নিষাদ, শৈবত, কড়িমধ্যম পেরিয়ে, গাঙ্গার ছুঁয়ে কোমল খষভে চলে আসছে। সে কোনও শব্দ করে না। গায় না। শুধু আনমনে বাজিয়ে যায়। শবরী মাজা বাসনে জল ঢালেন। গুনগুন করে সুর ধরেন— আকাশে ছাইল ঘন বাদল মেঘলা/একা চলে যাও/ভাবো না বসে রয়েছি একেলা...

গানের কথা ও সুর পরেশের। গানটি মারোয়ায়।

তখন ভোরবেল বাজে। অনুপম উঠছে দেখে শবরী বলেন, তুই বোস। আমি যাচ্ছি।

শবরী নীচে যান। আর একটু পরেই হইহই করতে করতে অরূপ ঢোকে। পেছনে প্যাকেট হাতে দেবোপম।



রান্না হয়ে গেল, কিন্তু কেউ যেতে বসতে পারছে না। পাবেশ ফেনেনি এখনও। বাত্ৰি-স্যাডে দশটা বেজে গেছে। এত দেরি হল দেখে আর ফিরবে না ঠিক করল অরুণ। তাকে লেকটাউন যেতে হবে। একটু চিন্তিত গলায় সে বলল, কোনও জায়গা থেকে ফোন করা যাবে দেবোপম?

দেবোপম খাড় নাড়ল। বলল, দেবাশিলের বাড়িতে চল। ওদের ফোন আছে।

—মাকে একটা ফোন করে দিই। ভাববে না হলে।

—তারা ফোন নিয়েছিস?

—না। পাশের বাড়িতে। মায়ারা নিয়েছে।

দেবোপম হাসল। বলল, ও। তোর সেই মায়?

দেবোপমের কথা ফুরোতেই লোডশেডিং হল আবার। এক মুহূর্ত কেউ কোনও কথা বলল না। বিছানায় সবাই যে-যার মতো ছড়িয়ে আছে। শবরী আস্তে আস্তে নামলেন। সন্ধ্যায় একবার লোডশেডিং হয়েছিল। মোমবাতি হাতের কাছেই আছে। দেশলাইও। জ্বালাতে গিয়ে দুটো কাঠি নষ্ট করলেন শবরী। তৃতীয় কাঠিটায় মোম জ্বলল। শবরীর খোঁপা ভেঙে চুল এলিয়ে পড়ল পিঠে। মোমের আলোয় কাঁপতে থাকা অন্ধকারে প্রেতসদৃশ লাগল তাকে। সেটি হাতে নিয়েই গাঞ্জীর্ষ ও অপলকে খাটের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। বললেন, মায়! কে?

লোডশেডিং-এর আকস্মিকতায় মোম জ্বালবার দুটি বিফল প্রচেষ্টা লক্ষ করতে করতে মায়ার প্রসঙ্গ সবাই ভুলে গিয়েছিল। শবরীর প্রশ্নের কী জবাব দেবে কেউ বুঝতে পারছে না। দু'এক মুহূর্ত, তারপরই স্বভাবসুলভ হা হা হাসিতে ফাটল অরুণ। সদ্য পড়া 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ' থেকে আওড়াল—

ভেবে দ্যাখো, এ-পর্যন্ত এ-কথা জানে না। রাত্রে বালুতীর ধরে

হেঁটে গেছে আর তাঁবু নেমে এল চারিদিকে অবনত, মোটা...

বালির উপরে উঠে অজ্ঞান ঘুমের স্বাস থেমে থেমে দোরে

ধাক্কা দিল, তারপর স্বপ্নে এসে দেখা দিতে তুমি চমকে ওঠা

অরুণকে থামবার জন্য তার পিঠে চাপড় মারল দেবোপম। শবরীকে বলল, মা, মোম গলে হাতে পড়বে। কোথাও বস।

শবরী একটা পেতলের শূন্য ফুলদানি উল্টো করে মোমের ফেঁটা ফেলতে থাকলেন। অরুণ উঠে বসল। বলল, চল, কোনটা করে আসি।

কড়া নাড়ার শব্দ হল। অনুপম বলল, বাবা এল বোধহয়।

শবরীর মুখ কঠিন হতে থাকল। মোমের আলোয় গালের শক্ত পেশির প্রকট হওয়া ফুটে উঠল না। কিন্তু শবরী দরজা খোলার তাগিদ দেখালেন না। তখন নিচ থেকে গলা ভেসে এল— দেবোপমদা, অনুপমদা, একবার শোনো।

দু'জনেই দ্রুত নামল বিছানা থেকে। এত রাত্রে কে ডাকছে! অরুণ দরজার দিকে তাকিয়েছিল। সরাসরি দৃষ্টিপাত না করেও চোখের কোণ দিয়ে সে বুঝতে পারল শবরী তাকে দেখছেন। সে এবার শবরীর দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর সিরসির করে উঠল তার। তীব্র চোখ শবরীর। মোমের আলোয় বুমি-বা ফুলিঙ্গ উপচে উঠছে। শবরী অতি নিচু স্বরে, প্রায়

কিসকিসিয়ে বললেন, মায়ার কথা আগে তো বলোনি।

দেবোপম দরজা খোলার জন্য নীচে গেল। পেছন পেছন অনুপম। দরজা খুলে দেখা গেল সি পি এম নেতা শ্যামাকান্তর ভাই তপন দাঁড়িয়ে আছে। বলল, দেবোপমদা, কাকু অরুণ সেনের বাড়িতে আছেন।

এ কোনও নতুন কথা নয়। এর পরও আরও কিছু আছে। দু'ভাই অসন্তোষ করল। তপন একটু থামল। একটু কাশল। অরুণও নেমে এসেছে নীচে। একা শবরীর কোনও কৌতূহল নেই। তিনি চিত্ত হয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়। অনুপম-দেবোপম কোনও প্রশ্ন করছে না। বায়া জানে, অনুমান করতে পারছে, পরবর্তী সংবাদ। তপন একটু থেমে, একটু বেশ, হোট্ট থেতে থেতে বলল, মানে... কাকু একটু বেশি অসুস্থ। মানে... ওই ... হেঁটে আসতে পারছেন না এ পর্যন্ত। মনাদা বলল একটু খবর দিতে।

দেবোপম কথা বলল না। অনুপম বলল, ঠিক আছে তপন, তুই যা, আমারা আসছি।

তপন চলে গেল। অরুণ কোনও প্রশ্ন করল না। ভিন্নজনে উপরে এল আবার। দেবোপম বলল, আমি যাব না। তুই যা।

অনুপমের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। কোনও উদ্বেগ বা উত্তেজনাও নয়। শান্তভাবে গিয়ে পাঞ্জাবি চাপাতে চাপাতে সে বলল, এত রাতে রিকশা পাব না। আমি একা আনতে পারব নাকি?

দেবোপম চুপ করে আছে। অরুণ বলল, আমি যাচ্ছি, চল।

রুক্ষ গলায় দেবোপম বলল, না। আমিই যাব।

বেরিয়ে গেল দু'জন। অরুণ একা একা ঘরের এ দিক-ও দিক ঘুরে বিছানায় এসে বসল। ব্যালকনি দিয়ে হাওয়া আসছে। মোমটা নিবু-নিবু হয়ে আবার জ্বলে উঠছে। একটা ট্রেন চলে গেল। নীচে কোথাও বেড়াল ডাকছে। একটানা। একঘেয়ে। চুপ করে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে অরুণের। সে বলল, অরুণ সেনের বাড়ি কত দূর? মানে, রাস্তায় ওই যে বড় বাড়িটা পড়ে তো? হঠাৎ, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন শবরী। আর পারছি না... আর পারছি না...। অরুণ বুঁকে পড়ল শবরীর ওপর। স্বর মজ্জিত করে বলল, কী হল? কী হয়েছে?

ঘট করে শব্দ হল একবার। দু'বার চমক দিয়ে জ্বলে উঠল টিউবলাইট। ফ্যান ঘুরতে শুরু করল। আলোয় চমকে সোজা হয়ে বসল অরুণ, যেন লোভশেডিং বিনা এরকম খুঁকে পড়া ঠিক নয়। শবরী এক হাতে চোখ ঢেকে শুয়ে আছেন। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরা। পেট থেকে আঁচল সরে গেছে। সামান্য মেদমজ্জিত পেটে একটি উদ্বেলিত নাকি। অরুণ বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। ফ্যানের হাওয়ায় মোম ধপ ধপ করছিল কিছু নিবুছে না। ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল অরুণ। তারপর ব্যালকনিতে গেল। একটা সিগারেট ধরাল সে। মায়ার মুখ মনে পড়ল। কীরকম অপরাধী লাগছে তার। কী অপরাধ? প্রত্যক্ষ কোনও অপরাধের সন্ধান পেল না সে। তবু সারা মুখ বিশ্বাস হয়ে গেল। প্রত্যাশিত চাকরি পাবার যে আনন্দ আজ সরাদিন মনে তির তির করছিল তা কোথাও খুঁজে পেল না। মায়ের জন্য ভাবনা হল তার। মাকে খবর দেওয়া হল না। দুশ্চিন্তায় থাকবেন। যদিও মাকে সে বলে এসেছিল আজ মাথুরের গড়ে আসবে। আর দেবোপমের বাড়িতে সে মাঝে মাঝেই থেকে যায়। তবু, মায়ের বয়স বাড়ছে। আজকাল খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন।

একবার পিছন ফিরে তাকাল অরুণ। শবরী বিছানায় নেই। কিছু তাঁর শুয়ে থাকা জায়গাটায় চোখ পড়তেই অরুণ শরীরে সিরসিরানি টেল পেল। তার চোখে ভেসে এল আঁচল সরে যাওয়া পেট। উদ্বেলিত নাকি। সিগারেটে জ্বারে টান দিল সে। মনে মনে বলল— বায়া, আমাকে ক্ষমা করো। আমার কোনও উপায় নেই।

সিগারেটের টুকরো অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে শবরীর খোঁজে ঘরে এল সে। তার মাথা থিমথিম করতে লাগল। তখন নীচে পরেশের কণ্ঠ বাজল। স্থলিত জড়ানো উচ্চারণ। পরেশ মাতাল

হয়েছেন। সরজায় ছিটকিনি দেওয়া ছিল না। দু' ভাই পরেশকে দু'দিক থেকে ধরে সিঁড়ি নিয়ে তুলতে লাগল। আর পরেশ শবরী সম্পর্কে একরাশ ঘৃণা, কিংবা রাগ, কিংবা গাঢ় প্রেমের তাঁর রস ঢালতে ঢালতে উপরে উঠতে লাগলেন। সারাদিন পান করে লজ্জায় বেহাশ হয়ে গিয়েছিলেন। অরুণ সেন বিজ্ঞানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন। সেই পরে একজন কান্টিনি তাঁর শিথিল শরীর অনুপম ও দেবোপম আর টানতে পরছে না। অরুণ কয়েক বাণ নোট পরেশের কোমর জড়িয়ে ধরল। পরেশ বললেন, কে? অরুণ? এত রাতে? এত রাতে আমাদের বাড়িতে কেউ থাকে না। আমি থাকি, আমাদের ছেলেরা থাকে আর লোকপাশী। তুমি কি সোনারাণীকান্দন প্রেমিক? আঁ?

কেউ কিছু বোঝার আগেই পরেশকে ছেড়ে বিল দেবোপম। পরেশ পড়ে যাচ্ছিলেন। অরুণ তাঁকে জড়িয়ে ধরল। পরেশের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা হওয়ায় সে ভারসাম্য রাখতে পারছিল না। দেবোপম সঙ্গেসঙ্গে এক চড় মারল পরেশের গালে। অনুপমের হাত ছিটকে গেল। পরেশ কঁপে পড়লেন। অরুণ তাঁকে ধরে রাখতে পারল না। তিনি ঘোষণা করিয়ে দিলেন। উপরে হঠাৎ একটুক্ষণ পড়ে থেকে উল্টে যেতে যেতে কালো জুড়ে দিলেন তিনি— মার। মার। আমাকে মেরে ফেল। আমি তো ক্রীষ। ক্রীষ একটা। শুধু চড় কেন? লাথি মার আমাকে...

একজন চিরকালীন মাতালের মতোই বিলাপ চলতে লাগল তাঁর। সেই কোন কাল থেকে এমনই অভিব্যক্তি সমস্ত মাতালের। অসফল গায়ক, অসফল পিতা এবং সার্থকতাশূন্য মানবজীবনে, পরেশ বোস একজন সফল মাতাল—যা পূর্ণীভূত হল একটি সশব্দ ধারণে।

সশব্দ চড় পৃথিবীকে তখন রাখে কিছুক্ষণ—তারপর কাঁপন ধরায়। আলোড়ন হতে থাকে তারও পর। পৃথিবী একটি নড়াচড়া গ্রাস্ত হয। যেমন এখন, এক মাতালের বিলাপের পাশে প্রাথমিক স্তব্ধ করেকজন। তারপর নড়াচড়া স্তব্ধ হলে শবরী নিশেবে এসে দাঁড়ালেন দেবোপমের সামনে। এবং একইরকম সশব্দ চড় মারলেন তার গালে। দেবোপম ছিটকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগল। অরুণ অনুসরণ করল তাকে। অনুপমের ইশারায়।



একটুও চাল নেই রাধিকার ঘরে। দু'টোর সময় স্কুল থেকে ফিরে আসবে পলাশ। ভাত চাইবে। রাধিকার মুখ শুকিয়ে গেল। শরীর ভাল নেই তার। সাত মাস চলছে। এখনও গা শুকোয়। সারাদিন ঘুম পায়। আজ নিরে পাঁচদিন হল কার্তিক বাড়ি ফেরেনি। প্রায়ই ফেরে না। ফিরলেও রাধিকার কী! রাধিকার কাছে কার্তিকের একটিই প্রয়োজন, শরীর। বিয়ে হওয়ার পর থেকে এক রাত্রি বাদ দেয়নি সে। পলাশ হওয়ার সময় তিনদিন মাতৃসদনে ছিল আর তারপর শেফালির মাঝের সঙ্গে শুয়েছিল এক হপ্তা। বাস। ওই দশদিন মাস্তুর ছোঁড়াড়ি বন্ধ ছিল। ভরা মাসে যখন আর কোনও কিছু সম্ভব নয় তখন রাতে বাড়িই ফেরেনি কার্তিক। কোথায় থাকত কে জানে! যাবার আগে পুণের ঘরে শেফালির মাকে বলে যেত—‘মাসি, একটু দেখবেন।’

খুব ভয় করত রাধিকার। যদি কিছু হয়, যদি ব্যথা ওঠে। ওঃ! কী সাংঘাতিক ব্যথা হয়! সে হ্যাঁ দেখেছে তাদের গায়ে। যন্ত্রণায় ছিটকি করতে করতে একেকজন মাটি কামড়াত। নখে খিমাচে নিজে গায়ের ছাল তুলে ফেলত। মুখে গাঁজলা তুলে অজ্ঞান হয়ে যেতেও সে দেখেছে। ডাকতেই হাত-পা হিম হয়ে আসত তার। একদিন বলেই ফেলেছিল কার্তিককে। কার্তিক তখন অলস ও তৃপ্ত অজ্ঞগরের মতো ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। রোগা লম্বা শরীরটাকে



দুমড়ে অজুত দ করে ঘুমোয় কার্তিক। নীচের পুরু ঠোঁট কুলে পড়ে আর নাল গাড়াই। পা ঘিনঘিন করে রাধিকার। তবুও, ছাদে বিছানায় কার্নিশে অহরহ উকি মারতে থাকে ভয় নিয়ে সে কার্তিকের কাছেই আশ্রয় খুঁজেছিল। আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে ডেকেছিল কার্তিককে—  
শুনছেন। শুনছেননি। ঘুমাইয়া পড়ছেন।

ঘড়ঘড়ে গলায় জবাব দিয়েছিল কার্তিক, কী বলিস? আ? কী?

রাধিকা কিছু বলতে পারেনি প্রথমে। তখনও সংকোচ যায়নি তার। আপনি থেকে তুমি হয়নি কার্তিক।

ডাকা পর্যন্ত একরকম। কিছু বলতে গিয়ে সে টের পেয়েছিল, ভয় পাবার কথা কার্তিককে বলা কত কঠিন। এক ভয়ের কথা বলতে গিয়ে অন্য এক ভয়ের দুষ্টর পথ পেরুতে হয়েছিল তাকে। হাত-পা ঘেমে, গলা শুকিয়ে, কোনওক্রমে বলেছিল, আমার ডর করে।

কার্তিকের খর স্বর প্রায় রেখেছিল, কেন? ভয় করে কেন?

রাধিকা অসহায় মরিয়া। বলেছিল, আপনে আমারে ফলাইয়া যান গিয়া। যদি ব্যাভা-বাদনা উঠে— আমি কী করম।

বলতে বলতে রাধিকার কোমল কণ্ঠ বেয়ে কান্না নেমে এসেছিল। সে জানে কার্তিক কান্নাকাতিতে ভিজে যাবার লোক নয়। তবু, অজানিত ভয়ে, অসহায় একাকিত্বে, আর এই পূর্ণ সন্তানসম্ভাবিত অবস্থায় স্বামীর তাকে একা ফেলে চলে যাবার অভিমানে সে চাপা কান্নায় ডুকরে উঠেছিল। কার্তিক তেমনই ঘুম জড়ানো গলায় বলেছিল, তোর ব্যাথা উঠলে কি তোকে কোলে করে বাস থাকব আমি? ব্যাথা উঠলে মাতৃসদনে রাবি। নাম তো লেখানোই আছে। দুনিয়ায় কোনও মেয়েছেলের আর বাচ্চা হয় না।

হঠাৎই অসম সাহসে ফুঁসে উঠেছিল রাধিকা। কান্নার দমকে বলেছিল, আমার একলা ঘরে যান্ দম ঠেইলা উঠে। চাইরদিকে ধন্নধন্ন। আমারে কইসে, প্যাট কাচাইল্যা মাইয়া মাইন্যের লিগা পেত্রি ঘুর ঘুর করে।

এক থাবড়া মেরেছিল কার্তিক রাধিকার মুখে। তার শক্ত হাত ভারী, কর্কশ থাবার মতো এসে পড়েছিল রাধিকার ঠোঁটের ওপর। মার খেয়েছিল রাধিকা। কার্তিকের হাতে ওই প্রথম। এমনিতে হেসে সোহাগ করে কখনওই কথা বলত না কার্তিক। কিন্তু সে-দিনের মতো অত কর্কশ থাবায় আর মারেনি এর আগে। সে, হয়তো-বা থামাতে চেয়েছিল রাধিকার গহিয়া কুসংস্কারের বুকনি। এবং থামাতে পেরেওছিল। রাধিকা তার পরে আর শব্দ করেনি। তার হুক খোলা ব্লাউজ থেকে ফুঁসে ওঠা স্তন ঠিকরে পড়েছিল। আর স্তনীয় উদরে খুব জোরে নড়েচড়ে উঠেছিল নাড়ি জড়ানো পিণ্ডটি। হয়তো ওই সর্বনশা থাবা— যা সমস্ত কাতর আবেদন গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়— তার অসহ্য লেগেছিল। রাধিকা আর কখনও কিছু বলতে চায়নি। অর সমুহ ভয়ের জন্য, ইচ্ছের জন্য, কষ্টের জন্য, সে সঙ্কীর্ণনীর মতো সূর্য থেকে বায়ু থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে শিখেছিল। সে যখন বাপের কাছছাড়া হয়েছিল তখন গাঁয়ের আলো-বাতাসে, নদী আর ধানের সৌখ্যে, পোয়াতি অবস্থায় আচরণীয় বিধি বা বিবাহিত মেয়ের কামকলাসক্রিয়তা সম্পর্কে কিছু জ্ঞানবার অবকাশ পায়নি। সে-পর্যন্ত তার দিনগুলি কোমল রঙিন বিঙেলতার মতো ছিল। বাতাসের আপটা খেত, বৃষ্টিতে নেতিয়ে পড়ত, কিন্তু আবার উঠত। মাচায় বাহিত। হলুদ হলুদ ঝিলে ফুল ফুটিয়ে সন্ধ্যা সাজাত।

তার কাকা-কাকি তাকে মূল থেকে উপড়ে রাস্তায় ফেলেছে। এবং কাকা-কাকির পিছু পিছু তাদের ইচ্ছেয় চলতে চলতে, কাকির বিছানো জীষন তাকে কার্তিকের কর্কশ হাতে মুখ খুবড়ে ফেলেছে। আশ্চর্য এই মানুষ যে শরীর ছাড়া আর কিছু ব্যবহে না। রুদ্ধ উত্তপ্ত হাতে সে পোয়াতি নারীর মুখে থাবা বসিয়ে দেয়। আশ্চর্য এই শব্দ— যেখানে মানুষে মানুষে ঠাসঠাসি। পাশাপাশি বসবাস কিন্তু স্বার্থে দীর্ঘ। অগতাপ্রবণ। পথে নাড়ালে অকারণে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়।



এমনই শহরে, এমনই মানুষে পিষ্ট রাধিকার স্মরণের কল্যাণের মতো গেয়ে গেছে শাস্ত্র, জিন্দা, দীঘিজল—শেফালির মাকে। স্বামী-পুত্র-সংসার আর ইকুলের আয়োগিরি করতে যাওয়া মানুষটা এই দশ ঘর ভাড়াটের মধ্যেও উজ্জ্বল সিঁদুরটিপ পরে নতুন হেসে রাধিকার গলর নিচে যেতে একদিনও ভোলে না।

পলাশ হওয়ার সময়, প্রথম পোয়াতি হওয়ার ভয় ও আড়ষ্টতায় দিশেহারা রাধিকাকে মাথায় তেল দিয়ে কতদিন চুল বেঁধে দিয়েছে শেফালির মা। কার্তিক না থাকলে, ব্যতের সমস্ত কাজের শেষে, ভেজা হাত দু'খানি মুছতে মুছতে রাধিকার নরজায় এসে সাজিয়েছে। আশ্চর্য-আজ্ঞার মতো মনে হয়েছে রাধিকার।

শেফালির মা'র কাছে সে কীসে। সুখ-দুঃখের কথা বলে। তার পরামর্শ নেয়। শেফালির মা থাকলে রাধিকার মন ভাল হয়ে যায়। সে তখন নাস্তবর্তীত স্বপ্নের মধ্যে খিলপাটনি গায়ে চলে যায়— যেখানে শমসের আছে। না। শুধু রুনসুখে যায় না। দুঃখেও যায়। তার মনে মনে ওড়ার জায়গা একটাই। খিলপাটনি গ্রাম। আর স্বপ্নেরও লোক একজনই। শমসের। তার মনে পড়ে, রূপসী নদীর তীরে ওই মাটির বাড়িখানিকে। কুঁড়েঘর নয় কিন্তু। দিবি। কোঠাবাড়ি। ইটের গাঁথনিতে মাটির মেঝে, আর ওপরে টিনের চাল। বাড়ার দলের সঙ্গে এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে যখন ফিতে আসত তার বাবা, আর ঠাকুমার জন্য, কাকির জন্য শাড়ি আনত, রাধিকার জন্য রঙিন ব্রক আর নানা রঙের ফিতে, আর মায়ের জন্যও নতুন শাড়ি, কিন্তু কোন লক্ষ্যায় কিংবা ভয়ে নিজের হাতে মাকে দিতে পারত না। রাধিকার হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলত— তার মায়েরে পরাইস।

ঠাকুমা চলে গিয়েছে কবে। মা-বাবাও চলে গেল। দীর্ঘস্থাস ফেলে রাধিকা। তার খুব একা লাগে। রাধিকা একটু-একটু বুঝছে যখন, বুঝি ন'-নশ বছর বয়স হল তার, জ্বলে যায় না আর, গায়ে-ঘরে মেয়েদের বুকে গুটি উঠলেই জ্বলে যাওয়া মানা, তবু আপনা-আপনি নর-নারীর সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বা পিতা-মাতার মধাবর্তী এক ফাল্গুনী টান তার গোচরে এসেছিল। সে, মায়ের প্রতি বাবার বুকের মধ্যে জন্মে থাকা বাখাদীর্ণ অসহায় টান অনুভব করত সারাক্ষণ। বাবাকে বলত— তুমি দ্যাও না ক্যান বাবা? মায়ের লগে কথা কও না ক্যান?

রাধিকার বাবা, সত্যসাধনের চৌটির দু'পাশে অনিবার্য ভাঁজ পড়ত তখন। চোখ দু'টি উদাস হয়ে যেত। কাঁচা-পাকা চুলে অস্থির আঙুল চালাত, যে-আঙুলে তবলা বাজিয়ে বিস্তার কড়া পড়ে গেছে। হুতো-বা রাধিকাকেই, হুতো-বা কোনও অনিদিষ্ট শূন্যতাকে উদ্দেশ্য করে আপন মনে মানুষটা উচ্চারণ করত— তার মায় আমারে চিনে না রাধু। আমি কথা কইতে যামু কই, ফালফালাইয়া চাইয়া থাকে, নাইলে কান্দে। কথা কয় না।

রাধিকা বাপের কাছে সরে আসত তখন। বলত— মায় কারুরেই চিনে না বাবা। কারুর লগেই কথা কয় না।

তার কথায় বুঝি-না কোনও কাজা লুকিয়ে থাকত, কোনও অভিযোগ বা প্রশ্ন। কেন চেনে না মা? কেন কোমাকেও চেনে না? মাকে এক নিশান্দ যন্ত্রের মতো লাগে কিংবা কোমও শাপথস্ত স্বর্গবালিকা। দীরব। বেতুল। কথা বলে না। চুল বাঁধে না। সারা পিঠে ছড়িয়ে থাকা চুলের রাশির মধ্যে নির্বাক রক্তহীন মুখে প্রত্নসম্পদের মতো সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায়। মাকে নিয়ে প্রশ্নের শেষ ছিল না রাধিকার। বস্তুত তার সঙ্গে সত্যসাধনের কথার নিখরই ছিল মা। সত্যসাধনের না-থাকার সময়গুলোয় মায়ের সমস্ত ইতিহাস রাধিকা বর্ণনা করত তাকে। সত্যসাধন স্তমত। চুপ করে ভাবত। তার নেশা ছিল পদাবলী পড়া। সুখে-দুঃখে পদাবলী খুলে বসত যখন তখন। ভাল লাগত না রাধিকার। তবু ক্রান্তেই হত। বাবাকে খুশি করার জন্য, সঙ্গ দেবার জন্য, অনিচ্ছায় অজান্তে কত যে পদ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তার। কী যে ভাষা। সত্যসাধন মাঝে মাঝে বুঝিয়ে বলে দিত। স্তমত সে। আর ঘুমিয়ে পড়ত। বাবার গা ঘেঁষে, কোল ঘেঁষে।

কতদিন কাকি আড়ালে ঠাসিয়ে চড় মেয়েছে তার জন্য— লজ্জা শ্রমের মাথা খাইছ, দিলি মাইয়া। বাপের কাসে ঠ্যাং উচাইয়া শোওন তর কাইর ককম।

সিটিয়ে যেত রাধিকা। ভয়ে, শঙ্কায় বা অপরাধবোধে। লজ্জানী-প্যাবর লজ্জা অনিতের জন্য বিষয় করে দিত তাকে। কিন্তু লজ্জা কেন পেতে হবে এ হিসেব তার মিলত না। বাবার কাছে তার কখনওই তেমন লজ্জা করে না যেমন করে শমসেরের সামনে বা হরিশচন্দ্রের সামনে। কেন করে না? এ প্রশ্ন সে কোনওদিন কারওকে করেনি। সে বুকেছিল কাকির চোখে অনেক কিছুই অপরাধ। যেমন মুড়ি খেতে দেরি হওয়া বা গোয়াল পরিষ্কার করতে সময় লেগে যাওয়া। যদিও এর জন্য পৃথিবীর কোথাও কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, সময়ও বেঁধে দেওয়া নেই। তবু, রাধিকার কাকি সারাদিন অসংখ্য অন্যায় সময়চাপন খুঁজে পেত এবং স্বপ্নের বিরুদ্ধে অগণন অভিযোগ করত এই বলে যে সত্যসাধন এক স্বার্থপর মানুষ— সে তার ভালমানুষ ছোট্টাই সত্যাবদ্ধুর ওপর পাগল স্ত্রী ও জন্মকুটিল মেয়ের দায় চাপিয়ে নিশ্চিন্তে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কোনও ভোগান্তি পোহাতে হয়নি, অতএব স্বপ্নের একচেতামি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না তার। সেইসঙ্গে ভালমানুষ স্বামীর জন্য হা-হুতাশ অপরিসীমা। স্বামী সে, সত্যাবদ্ধ, মুদিদোকান চালায় এবং দিনান্তে পরিশ্রমের অন্ন অপরের মুখে তুলে দেবার সময় বা কাড়ে না, হয়, তাকে ঘিরে আছে সব দাঁতাল নখনিবিড় রাক্ষস— তাকে ছিড়ে যাচ্ছে যেন-বা— কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কিছু বললেই পাড়াপড়শি— অন্য সব রাক্ষস দায়ি করতে পারে সত্যাবদ্ধকে। বলতে পারে— সত্যাবদ্ধ অন্যায়ভাবে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বড় ভাইকে বঞ্চিত করল— কারণ, কে না জানে যে ওই মুদিদোকান, ওই ভিটে সবই সত্যসাধন ও সত্যাবদ্ধুর পিতা সত্যসিদ্ধুর হাতে তৈরি। কিন্তু সংসারে ক'পরস্য দেয় সত্যসাধন আর তার পরিবারের জন্য ক'পরস্য বায়— সে হিসাব কে রাখে! তখন, এইসব ভাবনা ও বাস্তবদর্শনের বিনিময়ে, রাধিকার কাকি স্বামীর ভালমানুষির প্রতি ছড়া কেটে ফোভ প্রদর্শন করে—

হাক করে না রাউয়ার ডরে।

হয়ল রাউয়ায় বেইরা ধরে ॥

আজ, এমতাবস্থায় যখন রাধিকা দ্বিতীয়বার অঙ্কসংস্থা, যখন কার্তিক খুবই অনিয়মিতভাবে আসে এবং অবহেলা করে তাকে, তার মনে পড়ে সব। এই একটুও ভাল না থাকা এবং শিশুটি শুকনো মুখে ঘরে ফিরলে তাকে কী-ই বা খেতে দেয় এমনই দৃষ্টান্তের পাশাপাশি সমস্ত অন্নসংস্থানের প্রতি তার ভীতি বাড়ে। কাকি তাকে যত ভাত বেড়ে দিত, তার সমস্ত কাকির তার মুনিঃসৃত ছিল এবং একল কার্তিক তার ভাল কিনে আনে বা যে-টাকা দিয়ে যায় মাঝে মাঝে এবং যার দ্বারা সে অন্নসংস্থান করে, সে-অঙ্গেও প্রচুর পাথর। তার চোয়াল ব্যথা করে, নাভিতে দংশায়। রাধিকার তখন দ্বিধা হেমন্তবেলার মতো বাবাকে মনে পড়ে। বাবার কথা। বাবার পাঠ। বাবার চাহনি। মাকে মনে পড়ে। পাগলি লুখী মা। ভেসে যাওয়া মা। আর মনে পড়ে ওই সমস্ত বাকবিন্যাস, পদাবলীর আশ্রয় বয়ন। কেন মনে আসে? কেন অর্থ হয়ে যায়? কেন ভাল লাগে? তন্ত্বরের মতো বা ডিম্বকের মতো অশেষ কাঙালপনায় সে ভাবে, ভেবে যায়—

প্রেম-আকুল গোপ গোকুল

কুলজ-কামিনী-কন্তু।

কুসুমরঞ্জন মঞ্জু মঞ্জুল

কুল্লমন্দির সন্ত ॥

তার নিজস্ব মানসসিন্দুকে উকি মেরে যায় একটি মুখ— পরমেশ— কী সুন্দর! নরম মুখ, দীঘল চোখ, স্বকথকে বোনের মতো শরীর। শরীরে এঁটে থাকা শার্ট পরে কাছে যায় সে আর অমন শার্ট খুলে অমন শরীর একখানি ধুতি জড়িয়ে স্নান করাতে নিয়ে আসে উঠোনের খোলা কলে। দীর্ঘ সময়ের পুরু শ্যাওলার ওপর অতি যত্নে গা ঘষে। রাধিকা, দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে

অপলব্ধ দেখে, গোপনে। সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না এই দর্শনের কথা। মাঝে মাঝে মনে হয়, জানে, সে জানে, যার দিকে তাকায়, না হলে সেও তাকায় কেন? আসতে-যেতে দেখে কেন দু'চোখের কোণে? আর রাধিকার কেবলই মনে হয়— কার্তিক নয়, পরমেশ, বা পরমেশও নয়, পরমেশের মধ্যে সে আসলে অন্য একজন মানুষকে দেখতে পায়। তার সঙ্গে পরমেশের বরণে না হলেও গড়নে মিল, বয়সে মিল, চাহনিতে মিল— সেই মানুষকেই সে চেয়েছিল অন্য কোনও জন্মের পাব থেকে। তাকে আর দেখবে না কোনওদিন, তাই সে অন্য পুরুষের আর মুখ খোঁজে। আর পরমেশ, দশ ঘরের এক ঘর ভাড়াটে পরমেশ, অন্য একজনের মতো হয়ে রাধিকার বেঁচে থাকা সঙ্গীভিত করে যায়। রাধিকার মনে পড়ে—

নিজ পরিজন      সে মুছে আশ্রয়  
বচনে বিশ্বাস করি।  
চাহিতে তা পানে      পশিল পরাণে  
বুক বিদারিয়া মরি ॥

রাধিকা, ছেলের মুখে দেবার জন্য ভারী শরীরে শেফালির মা'র কাছে দু'টি চাল আনতে ছোটো। যেন-বা মাতৃমুখ— শেফালির মা তার কাছে এমনই প্রতিভাত হয়। তবু কুণ্ঠায় হাত পাতে সে। এই প্রথম। ছেলে খাবে, কী খেতে দেয়? ঘরে একটু চাল নেই। স্নেহকাঙাল সে, শেফালির মাঘের মাতৃকাঙাল। প্রেমেরও কাঙাল— কোনও এক শমসের সদৃশ পরমেশ পুরুষের। সে এখন দু'টি হাত পেতে ছেলের জন্য কাঙালপনা করে। শেফালির মা, তারও জানাতানির সংসারে চালের পাত্র ঠনঠন করে— নুন আনতে পাত্তা ফুরায়/ প্যাটের আতুন বন্ধ পুড়ায়— তবু সে দু'টি চাল তোলে এবং জিজ্ঞাসা করে— আইজও আসে নাই?

রাধিকার মুখ নিচু। হাতে চালভর্তি পাত্রখানি সমেত সে টের পায় তার চোখে জল চলে আসছে। তখন উঠানে সাইকেল ঢোকানোর ঠুনঠুন শব্দ হয়। রাধিকার বুকের তল ধক করে ওঠে। পরমেশ! অফিস যায়নি কি আজ? চালভর্তি বাটি আড়াল করতে চায় রাধিকা। কাকির বকুনি খাওয়া নির্লজ্জ মেয়েটি হঠাৎ চাল ধার চাওয়া লুকোবার প্রয়াসে শেফালির মা'র ঘরে সৈধিয়ে যেতে চায়। তার আগেই পরমেশ একমুখ হাসে। রাধিকাকে দেখে নয়। তার চোখ শেফালির মা'র দিকে। যেন-বা রাধিকাকে দেখতেই পায়নি সে। হাসি বিনিময় করে অনায়াসে নিজের ঘরের দিকে যায়। রাধিকাও পা বাড়ায় নিজের ঘরের দিকে। হঠাৎই রাগ হয় তার। ক্ষোভ আগে। পরমেশ তাকাল না কেন? যেন কথা ছিল চোখে চোখে কথা হবে। রাধিকার কানে বাজে—

কে হেন কালিয়া      নিঠুর হইল  
কি শেল লাগিল যেন।  
দরশন আসে      যে জন ফিরয়ে  
সে এত নিঠুর তেন ॥

এবং সে আনমনা হয়ে যায়। সম্ভানের ক্ষুদ্রবৃদ্ধির জন্য চেয়ে আনা চালের বাটি হাতে ধরে সে ভাবতে থাকে আশ্চর্য প্রাজ্ঞল এইসব আখরের কথা। বাবা কেমন মূর করে পড়ত। তখন তো বোঝেনি কিছু। এখন কেমন করে বুঝে যায়। ভাবতে ভাবতে ছুতগুত্তর মতো সে হেঁটে যায়। তখন শেফালির মা ডাকে— বাড়ি।

রাধিকা বহু দূর থেকে শুনতে পায় সে ডাক। এবং ফেরে। ঘীরে পাকখাওয়া লাটুর মতো লাগে তার চলা। শেফালির মা বলে— আইজ আমার শরীলভা ভাল নাই। প্যাটে ব্যাদনা হইতাসে।

রাধিকা তার আকাশচারণ থেকে এতক্ষণে মাটিতে নেমে আসে। বলে, ক্যান? এমুন হইল ক্যান?

শেফালির মা পেটে হাত রেখে বলে, কহিল নিদিমণি নারায়ণ পুজার প্রসাদ মিসিল। কুন সকালে মাথা ছিঁরি আমারে দিসে ব্যালা চাইরটায়। কেনুন ব্যালা গন্ধ লাগতেহানিল।

রাধিকা বলে, বাইলা ক্যান?

—বাইলাম। প্রসাদ ফেইলা নিমু?

রাধিকা ঝেঁষে ওঠে। বলে, হা। প্রসাদ কইয়া পচা-খটা সবৈ খাওল লাগাব। অখন হুজো। খাইয়া প্যাট ছাড়সে। তাও কইব প্রসাদ। খেও ক্যালাইয়া।

শেফালি মা পালটা বাঁধায়, হা। তগো তো সবৈ ফালিন। কহা বলে— খাইরা বাবুর হইড়া যায়/ চামচিকায় কটকটায়— তগো হইল ওই দশা। কিসু মানামানি নাই। হাজারখার কইসি, পোয়াতি মাইয়া চুল খুইল্যা ঘুরবি না। প্যাট খালি রাইয়া থাকবি না। শুনত।

—ক্যান? অখন কি আমার চুল খুলা নাখায়?

রাধিকা তার প্রকাশ খোঁপা শেফালির মার নাকের ডগায় এগিয়ে দেয়। শেফালির মা তার গালে একটি ঠোনা মেরে বলে, সকাল খিবদা কী খইছস।

—শুকনা মুড়ি আসিল দুগা, খাইসি।

—হা। ওই খাইয়াই থাক। কপাল পুড়াইয়া আইসা ছুটসো। জিগাই যে চাইল দিসি যা তর পোলাটে হইব। তুই খাবি কী?

রাধিকা হঠাৎ বিরক্ত বোধ করে। কিংবা আসলে হয়তো ধরা পড়ে যাওয়ায় বিরক্তও। কেন এসব প্রশ্ন। এমনকী, মাঘেরই রেহতুন্স শেফালির মাঘের কাছেও সে তেতো কষ্ট উদ্‌গীরণ করে ফেলে, কিসু খামু না। প্যাটে কিল মাইরা পইড়া থাকুম।

—হা। তাই থাক গিয়া। কহ না?

ভাতারে ন্যায় কিল

তাই খাইয়া শুই,

মাঘ দিসে ভাতের খালা

গজ গজাইয়া থুই।

রাধিকা হেসে ফেলে এ বার। বাটির চাল দু'বার নেড়েচেড়ে বলে, কী ককুম কও? ভাতারে ভো কিলাইতেও আইতাসে না।

শেফালির মা কোমল হয়ে যায়। বুঝি-বা শেফালির কথা তার মনে পড়ে। চোখে জল ভরে আসে। কত কিছুই তো হল জীবনে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে ধনধান্য গ্রাম ছেড়ে নিঃসঙ্ঘল অবস্থায় স্বামী-কন্যা-স্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে পাড়ি দিয়েছিল দীর্ঘ উদভ্রান্ত পথ। শাশুড়ি রাস্তাতেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন। অমন সুলক্ষণা সংসার ফেলে, টেকিঘরের গজ, তাজা কলমি ও শাপলা-ভরা পুকুর, বিঙে ফুল ফোটা বিকেল আর দোয়েল-শ্যামা ভোরের সিন্ধু যাপন ফেলে পেটীলা-পুঁটলি আঁকড়ে ওই পথ চলা তাঁর সম্মান। রাস্তার ধারে ক্রীকে ওভাবে মরে যেতে দেখে শোকের উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন স্বশুর। ক্রী, পুত্র, পুত্রবধূর জন্য কিছু করতে না পারার অক্ষমতা বোধ সম্ভবত তাঁর আত্মসম্মান সম্পূর্ণ হরণ করেছিল। তিনি প্রায় ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। যে কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন, ওভাবেই। এমনকী, শেফালির শোক পর্বস্ত স্পর্শ করেনি তাঁকে। তখন শেফালির মার সতেরো বছর বয়স। এই এমনই— এই রাধিকা যেমন এসেছিল প্রথম। তার পর থেকে ঘষে ঘষে চলা। দিন গুজরানো। সেইসব দিন, কোনও দিনই ভুলবে না শেফালির মা। আর ভুলবে না শেফালিকে। রাধিকাকে দেখে তার শেফালি স্মরণ হয়। বুকে মেহ উপচে আসে। ইস্থুলে আয়োগিরি করে উপার্জন করা যে-অর্থ সে সংসারকে দেয় সেই অম্লর ভাগ আসন্নপ্রসবা রাধিকাকে দিয়ে তৃপ্ত হতে চায় সে। বলে, যা গিয়া। পোলার লিগা ভাত বস। কয়লা আসেনি?

—আসে।

—যা গিয়া। আমি আইতামি।

রাধিকা চলে যায়। শেফালির মা একটি খালায় অতি যত্নে ফাঁক বাড়ে। শ্যামল, শেফালির মা'র বড় ছেলে, দোকান থেকে নাইতে খেতে এসেছিল। প্রশ্ন করে—কর লিগা ভাত বাড়ো মা? আমার সান হয় নাই।

শেফালির মা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, শুইন্যা তর কুন কামডা হইব? বাড়িহিয়া না পহিকা তর কাম তুই কর পা যা।

শ্যামল বোকে। কথা বাড়ায় না। সে জানে তার মা 'না' বলতে জানে না। স্বার্থপর হতে পারে না। নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য তার জন্ম। যে-ইকুলে শেফালির মা আয়গিরি করে সেই ইকুলের বড় দিদিমণি যখন তখন খাটিয়ে দেয় তাকে।... আজ কি আসেনি, শেফালির মা, আমার বাসনটা মেজে দিয়ে যেও।... আজ কাপড় কাচার বউটা এল না। সকালে এক গাদা কাপড় ভিজিয়েছিলাম। জানো তো, তোমার দাদার রোজ পটিভাজা শাট না হলে চলে না। ছেলেও হয়েছে তেমনি—তুমি একটু কেচে দিয়ে যেও যাবার আগে... এই রবিবারে একটু এসে শেফালির মা। মশলার শিশি-বোতলগুলো খুতে হবে।...

আপন সংসারে, ছুটির দিনেও, কড়ায় পুঁইজাঁটা চাপিয়ে শেফালির মা বড় দিদিমণির বাড়ি ছোটো। শ্যামল, কমল এবং তাদের বাবা আপত্তি করার চেষ্টা করেছে। বলতে চেয়েছে—তুমি যাইবা কান? তুমি কি আগে বাড়ির কি?

শেফালির মা জিভ কেটেছে। বলেছে, ছি ছি! কী কও! এই ইকুলের কামডা ছাড়া আমাগো চলত? সেইখো, অকিতজ হইও না।

মায়ের জন্য শ্যামলের কষ্ট হয়। অকারণে গলার কাছে ব্যথা করে ওঠে। মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে কলতলার দিকে যেতে যেতে সে ভাবে—মা এত ভাল, তবু মা'র এত কষ্ট কেন? ঈশ্বর ভালমনুষ্যদের প্রতি কবে সদয় হতে শিখবেন? হঠাৎ সত্যজিজ্ঞাসের কথা মনে পড়ে গেল শ্যামলের। সে বলত—অত ভগবান-ভগবান কোরো না। ভগবান-নির্ভরতা মানুষের নিজস্ব শক্তির প্রতিবন্ধক। ভগবান-ভগবান করে মানুষকে ভাগ্যনির্ভর এবং অক্ষম করে দেওয়া একটা বুর্জোয়া পরিকল্পনা।

শ্যামল বলেছিল, পৃথিবীর সব প্রশ্নের উত্তর কি জানো তুমি? সমস্ত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ব্যাখ্যা? ঈশ্বর না মেনে আমাদের উপায় কোথায়?

সত্যজিৎ বলেছিল, প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়। নিউটনস ল তো তুমি ক্লাস সেভেনেই পড়ে ফেলেছিলে। কিন্তু তাঁর আগে ওই ব্যাখ্যা কেউ দিতে পেরেছিল কি? ততদিন ওইটুকু ভগবানের নামে ছিল। তাই না?

শ্যামল রলেছিল, মানুষ যতটা জানে, ততটাই জানে না, সত্যজিৎ।

দেবার্চন ছিল সঙ্গে। বলেছিল, ঈশ্বর নয়, বিজ্ঞানে বিশ্বাস কর। সমস্ত ঘটনার বুক পেট কেটে সত্যটা জেনে নাও। সত্য জানার কোনও শেষ নেই।

—তার মানে কী দাঁড়াল? শুধুই বিজ্ঞান? না, ঈশ্বর ও বিজ্ঞান?

—সেটা বলা খুব শক্ত। নিউশে যেমন, ঈশ্বরকেও অস্বীকার করেছিলেন, বিজ্ঞানকেও। এক জায়গায় বলেছিলেন—বিজ্ঞানও এক ধরনের আত্মসম্বোধনের উপায়, যার সাহায্যে মানুষ নিজের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারে; যেখানে প্রশ্নভীক, জীবনবিমুখ, ক্ষুভদৃষ্টি বুদ্ধি আশ্রয় খোঁজে, যা ধর্মের মতো প্রামোর্ষ প্রাধিকার দাবি করে নির্বোধ জনসাধারণকে স্তোক দেয়; প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে রফা করে যা পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রসার লাভ করে; যা প্রয়োণের ফলাফলের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব স্বীকারে পরাজয়।... আসল কথা হল তুমি কী বিশ্বাস করবে সেটা তোমার ব্যাপার। কাজ করাটাই মূল কথা।

বেলুড মঠের প্রাঙ্গণে বসেছিল তারা। সত্যজিৎ বহুক্ষণ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে চুপ করে ছিল।

সে প্রেসিডেন্সিতে পড়ত তখন। শ্যামল পরাসার অভাবে, হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে বাবার দোকানেই দর্জির কাজ শিখত। তবু তারা একসঙ্গে বসত। কথা বলত। সে-দিন সত্যজিৎ বলেছিল, বেশ। তুমি তো বিবেকানন্দকে মানো। মানো না?

—মানি।

—ঈশ্বর সম্পর্কে ঠর মতটা শোনো—

অসীম এক, বহু নয়, একই অসীম আত্মা স্বাক্ষর স্বাক্ষর করছে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আত্মা-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই বিশ্বের অধিষ্ঠান-স্বরূপ অসীম আত্মাকেই আমরা বলি 'ঈশ্বর'। মানব মনের অধিষ্ঠান সেই এক অসীম আত্মাকেই আমরা বলি 'মনবাধ্য'।

দেবার্চন চুপ করে ছিল। একটু ভেবে বলেছিল, সেই তো, সেই কথাই তো ভাবতে হবে। মানবাধ্যার কথা। শুধু তবু দিয়ে তাকে কখনও ধর্য্য হবে না সত্যজিৎ। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ভারতের মূল চিন্তার জায়গাটা আমরা ধরতে পারিনি। আমাদের এ কাজ সফল হবে না।

ফুঁসে উঠেছিল সত্যজিৎ। বলেছিল, কেন? হবে না কেন?

—কারণ আমরা আমাদের দেশের মানবাধ্যার সন্ধান রাখিনি। যুগ যুগ ধরে যে-বিশ্বাস ও নির্ভরতা তাদের মধ্যে জন্মে রয়েছে তার একটা মূল্য আছে। আমাদের তত্ত্বের সঙ্গে যদি তা না মেলে তবে সাধারণ মানুষ কোনওদিন তত্ত্বটাকে মেনে নেবে না। বিশ্বাসকেই নেবে।

—সেটাই তো আমাদের কাজ। ওদের বোঝাতে হবে যে তত্ত্বটা আসলে ওদের ভালর জন্য, ওদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

—হ্যাঁ। এখানেই আমার আপত্তি। তত্ত্বের জন্যও বিশ্বাস দরকার। বিশ্বাস ছাড়া তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার তত্ত্ব বোঝানোর জন্য শিক্ষাও দরকার। শিক্ষা না থাকলে তুমি কী করে তত্ত্বজ্ঞান ঢোকাবে। ভাববার ক্ষমতাই যদি না জন্মায় তবে পেনিসিলিন ইন্জেকশনের মতো তত্ত্বজ্ঞান ফুটিয়ে কোনও লাভ নেই। একটা আনপড লোককে তুমি কী করে কেন্দ্রের বৈদেশিক নীতি বোঝাবে? কী করে বোঝাবে মুদ্রাস্ফীতি আর ঘাটতি ব্যয়ের অন্তর্নিহিত রাজনীতি?

—খণ্ডের কথা বলছ? এটা বোঝানোই তো সবচেয়ে সহজ। আমাদের দেশের সমস্ত ছোট চাষি বা শ্রমিক কীভাবে স্বাণগ্রস্ত হয়ে থাকে, তুমি কি জানো না?

—জানি। সেটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে। জাতীয় স্তরের সমস্যাগুলো তুমি বোঝাতে পারবে না।

—বোঝাবার দরকার নেই দেবার্চন। রাশিয়া বা চীনে কি সমস্ত মানুষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান জানে? অর্থনীতি বোঝে? ওখানে কি সমাজ এগোয়নি? বিপ্লব হয়নি?

দেবার্চন বলেছিল, রাশিয়া বা চীন নয়। আমি আমাদের দেশের কথা ভাবতে চাই। প্রত্যেক দেশের অন্তর্কণ্ঠামো আলাদা আলাদা। আমাদের সবই ভাবতে হবে আমাদের দেশের ধর্ম, সংস্কার, বিশ্বাসের নিরিখে। আমি তত্ত্ব জানি কিন্তু যাদের সঙ্গে কাজ করব তারা জানে না। সুতরাং আমার লক্ষ্য হওয়া উচিত ওদের বোধগম্য উপায়ে তত্ত্ব প্রয়োগের কথা চিন্তা করা।

—সেটা কী করে করবে? তুমি কি দাস কাপিটালকে বলবে ধর্মগ্রন্থ আর তার ওপর গীতার মতো ভক্তি জাগিয়ে তুলবে?

—ঠিক তা নয়। হয়তো আমি তোমাকে বোঝাতে পারছি না। ধরো গম সেদ্ধ করে কেউ থুপুপা বানিয়ে খায়। কেউ রুটি ভাজে।

সত্যজিৎ বলেছিল, তোমার মধ্যে সংশয় ঢুকে গেছে দেবার্চন। এটা বিপ্লবের পথ নয়। বিপ্লব বিশ্বাস থেকে আসে। বিপ্লবের জন্য একটা নিঃসংশয় স্বপ্ন দেখতে হয়।

শব্দ করে হেসে উঠেছিল দেবার্চন। বলেছিল, সেই আমার কথাতেই কিন্তু ফিরে এলে তুমি। সেই বিশ্বাসে ফিরে এলে। দেখো, আমরা পড়ন্তনো জানা, বিশ্লেষণবাদী, তত্ত্ব জানা কর্মী। তবু



আমাদের বিশ্বস্ত স্বপ্নদ্রষ্টা হতে হয়। তা হলে যারা আগেই অন্য কোনও দিকান আঁকড়ে ফেলেছে তারা সেটা ছাড়বে কেন যুক্তিতে?

দেবার্চন ও সত্যজিৎদের সব কথা বুঝতে পারত না শ্যামল। কিন্তু বোকার চেহারা করত। ভ্রমের মধ্যে গনগনে আগুনের আঁচ পেত সে। দেবার্চন ও সত্যজিৎ দু'জনের কেউই তার বেঁচে নেই।



রাধিকাকে পাশে নিয়ে শুয়েছিল শেফালির মা। ঘোঝাছিল পোয়াতির অ্যাসমীয়া বিধি। দুপুরের উল্হসিত আলোর ক্রান্তি চারপাশে। মালাইবরফওয়ালা ডাক দিয়ে যায়। সফ গলায় বাসনওয়ালা ইকছে—লাগে—এ-এ-এ সিলের বাসু-উ-উ-ন। কার ঘরে কচি ছেলে কেঁদে উঠল। কেউ-বা ভারী গলায় শিশুটিকে ধমকায়। কোথাও একটানা ডেকে যাচ্ছে কুবো পাখি। কোথায় বসে ডাকে সে! এই শহরে আড়াল কোথায় পায়! পলাশ মায়ের পাশে শুয়ে আছে। আজ ইকুলে একক দশক শতক চিনেছে সে। তাই আপনমনে বিড় বিড় করছে একক দশক শতক—এ দ শ হা অ ল নি কো, এদ শহা অল নিকো। এদশহা অলনিকো—খেলা পেয়ে গেছে সে। পড়া পড়া খেলা। এক এক রকম উচ্চারণে এক এক রকম ছন্দ। আবার চুপ করছে। কুবো পাখির ডাক শুনছে কুব-কুব-কুব। ভাবছে—কেমন দেখতে পাখিটা? কতবার ডাকছে। না থেমে? দম না নিয়ে? খড়ির কাটার মতো। একটুও আগে পারে নয়। একটুও কাছে দূরে নয়। কেমন করে পারে? একক-দশক-শতক—আবার তার মনে পড়ে যায়। এক সংখ্যা, দু' সংখ্যা, তিন সংখ্যা—লক্ষ কোটি—কত কত সংখ্যা! আবার তার মনে পড়ছে—শিখেছিল—বনে থাকে বাঘ। গাছে থাকে পাখি। এখন শিখছে, অন্য বধ্য কল্য হাস্য দাস্য। ডাক্তারবাবুর বাগানে টিনের ঢালাঘরে কর্পোরেশনের ইকুল। সেখানে বিদ্যাভ্যাস করছে সে। আজ দিদিমণি অনেকটা পড়িয়েছেন। মাঝপথে ছুটি দিয়ে ইকুলে তাল মেরে চলে যাননি। দিদিমণির মন বারাপ কারণ ডাক্তারবাবুর বড় ছেলে মারা গেছে। আর তাই বুঝি দিদিমণির পক্ষে এমন পড়ানো সম্ভব হল। কেউ মারা গেলে, কেউ দুঃখ-কষ্ট পেলে সমস্ত হালকা বস্ত্র ওপরে উঠে যায় আর ভারী বস্ত্র—যেমন মনঃসংযোগ, যেমন কর্তব্যসঙ্কেতনতা, যেমন পরপার চিন্তা—এইসব নেমে আসে। মানুষ ক্ষণকালের জন্য হলেও বধ্যায্য হয়ে ওঠে।

ডাক্তারবাবুর ছেলের মৃত্যুর ফলেই বুঝি আজ পলাশ একক দশক শতক শিখছে। এখন সে ঘুমিয়ে পড়ছে। মালাইবরফওয়ালায় বরফের প্রতি একটু লোভ, কুবো পাখি কেমন দেখতে—এই উৎসুক এবং মা কেন একদিনও বাসনওয়ালায় থেকে বাসন কেনে না—এমনই প্রশ্ন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে। বাবা নেই বেশ কদিন। সে ভাল আছে। বেশ আছে। বাবাকে একটুও ভাল লাগে না তার।

অন্ধকার খুপরি এই ঘর। তাতে মশা। তাতে পোকা। তাতে উই। দক্ষিণে এঁদো পুকুরের ধারে মনকচুর ঘোশে পোকামাকড়ের সংসার। শেফালির মা অঁচল দিয়ে মশা তাড়ায়। সম্ভ্রায় পুরনো ন্যাকড়া পোড়া দেয়, ঘোঁরা দিয়ে মশা তাড়াতে। রাধিকা মশার কামড় টের পায় না। তার পা ফুলেছে। শেফালির মা এই কথাই তাকে বোঝাতে চাইছে যে কথা শুনে না চললে পোয়াতির এমনই দশা হবে। পলাশ হওয়ার আগেও এইসব শিক্ষা সে নিয়েছিল। তখন আরও ছোটটি ছিল রাধিকা। তাই আরও অনুগত ছিল। এবারে তার বুদ্ধি পেকেছে। গা-ছাড়া ভাব এসেছে। সবচেয়ে তর্ক। সবচেয়ে প্রশ্ন। কিছুই মানছে না। তাই পা ফুলেছে। চোখ-মুখ ফুলেছে। আর ছেলের সঙ্গে তারও ঘুমে চোখ ভার। শেফালির মা তাকে ঘুমেতে দেবে না—ঘুমাইস না দুফরে। হ্যান্ডিয়া

যাবি।

রাধিকার আসুরে গলা শোনা যায়, কী করুম! ঘুম পাইতেন্যাসে।

—কথা ক।

—তুমি কও। স্নানতয়াসি।

—তর যেমুন প্যাট হইসে রাধু আমার যান মনে লয় যমজ হইল।

রাধিকা ভয় পায়। উত্তেজিতও হয় কিছুটা। রক্ত মাথা বেড়ে বলে, কান হইব মাসি? আমি কুনোদিনে ঝোড়া ফল খাই নাই।

শেফালির মা সন্দেহ প্রকাশ করে, খাইস নাই? তর কিসু বিচার আসে? কুনখানে কুন অখাইল্য-কুখাইল্য খাইছস? কুনো কথা স্নান তুই?

—কান? কুনডা শুনি নাই কও।

—স্নানহস না আরও কিসু।

—কান তুমি কইস চুল খুইল্যা না ঘুরতে। ঘুরদি?

—হ। কয় না?

শুচি শুচি বামনি, নিরামিষা খায়

শোল মাসের মাথা লইয়া, উত্তরতলে যায়।

—হি হি হি হি—

রাধিকার হাসি শোনা যায়। হেসে বলমল করতে তাকে বড় একটা দেখেনি শেফালির মা। মেয়েটা কথা বলে কম। এতদিনেও শেফালির মা ওর বাপের বাড়ির বস্তান্ত তেমন জানে না। তার নিজেরও কোনও বাড়তি কৌতূহল নেই। এমুন সুন্দর মাইয়া—কার্তিকের মতো রুক্ষ, অভাবী, বয়স্ক ও দারিদ্রজনীন লোকের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। শেফালির মা জানে, এর আড়ালে দুঃখের ইতিহাস। তার নিজের জীবনের অশেষ সংগ্রাম ও দুঃখের পর আরও-আরও দুঃখের বৃত্তান্ত স্নানতে তার ইচ্ছে করে না। দুঃখের প্রতি তার আর কোনও কৌতূহল নেই। রাধিকার জন্য শুধু মায়া হয়। কে জানে, তার শেফালিরও এমনই হয়েছে কিনা। সম্ভব হলে শেফালির মা তাকে সরো পৃথিবীতে বুজত। কোথায় আছে সে? যেখানেই থাক, ভাল থাকুক। কিন্তু কিছু কিছু... সন্দেহ এসে শেফালির মা'র হৃদয় ফালা ফালা করে দেয়। যদি কোনও আশ্রয় না জোটে তার। যদি সে ভাল না থাকে। যদি মরে যায়। না। আর ভাববে না। শেফালির মা হৃদয়ে গামছাবান্ধন দেয়। এ সব সে অনেক ভেবেছে। অনেক বেঁদেছে এজন্য। শেষে আর কান্নাও পোত না। কিন্তু রাধিকা আসার পর, রাধিকার কষ্ট দেখার পর শেফালিকে আরার নতুন করে মনে পড়ছে শেফালির মা'র। এমন নয় যে সে সব মেয়ের প্রতিই কন্যাসুলভ স্নেহ অনুভব করে। কিন্তু রাধিকা যেন কেমন করে স্নেহ হুঁয়েছে। সে এক ভাল মেয়ে, আত্মসম্মানবোধের মেয়ে, কিন্তু কেমন স্বপ্ন-স্বপ্ন সে, আর দুঃখী, একা—শেফালির মা এই মেয়ের মুখের হাসি ভালবেসেছে। কপট গাভীরে সে বলছে, এমুন হাসনের কী হইল?

রাধিকা সামান্য কাত হয়ে শেফালির মা'র গায়ে হাত রাখে। বলে, মাসি, এমুন আর কত জানো তুমি?

শেফালির মাও হাসে। বলে, জানি, জানি। দ্যাশে-ঘরে এমুন হয়লৈ জানত।

রাধিকা বলে, হ। আমিও তো দ্যাশে আসিলাম। আমি তো একখানও কৈতে পারি না। কাকি কৈত—হাক করে না রাউয়ার ডরে/ হঙ্গল রাউয়ায় বেইরা ধরে। এমুন সব কইত। অকন আর মনে নাই। আর কমখান কও না।

—হ। কই। আর তুমি হাইসা প্যাটে ব্যাদনা তুলো।

—কও, কও। হাসুম না। কও মাসি।

—আইছা। এমুন হইলে হইব না। অবস্থা খুইজ্যা কওন লাগব। আইছা—এইডা কই—

খাইয়া নাইয়া পাত্তা ভাত।

গল্প করে দই।

মাইটো হকায় তামুক খায়

গুড়গুড়িটা কই।

ফের হাসে রাধিকা। হাসির দমকে শরীর দুলে ওঠে। শেফালির মাও এই হাসিতে সংক্রামিত হয়। তার মধ্যে শোলোক বলার উৎসাহ জেগে ওঠে। সে বলে—আর একখান কই—

গেরস্ত পায় না ঘোলের পানি

চাকরে কয় ক্ষীর দাওখানি

রাধিকার চোখে এইসব ছবি জীবন্ত হয়ে যায়। যেন-বা কেউ বুকিয়ে, সের দিয়ে পাত্তাভাত খেয়েছে, সঙ্গে একখানি পেরাজপোড়া ছিল কি ছিল না। তারপর জমিয়ে বসেছে আত্মা দিতে। সাতকাহন করে বলছে—আইজ নইখান যা আসিল না—একজের মাখানের লাখান। খাইয়া প্যাড্ডা আইডাই করে। দাও গো। তামুক আসেনি? দুই টান মাইয়া যাই।

তার ঘরে বুকি তামাক নেই। তাই এই ছলকলার চাল। রাজা-উজির মারা। যে শুনছে তার মুখ ব্যাজার। গামছা দিয়ে মুখ পিঠ গলা মুছে সে মাটির হাঁকায় আশ্রয় আনল। সেও আজ পাত্তা খেয়েছে দুপুরে। তাই চুপ করে আছে। দুঃখে আছে। দরিদ্রের মধ্যে সে বুকি দরিদ্রতম। প্রথমজনের রাজা-উজির মারার উৎসাহে পাখা লেগেছে তখন। মাটির হাঁকায় চারখানি সুখটান দিয়ে সে বলছে—তা তামুক দিলা আর গুড়গুড়িটা দিলা না?

রাধিকা হাসছে আর দু'হাতে পেট চেপে ধরেছে। শেফালির মা বলেছে, আর কম?

—না, না। কইয়ো না। অ মাসি! প্যাটে বিল ধরছে আমার।

রাধিকার মুখে হাসি মিলিয়ে গিয়ে বিবর্ণতা এসেছে। হাসির দমকে পেটে বিল ধরে গেছে তার। ভিতরকার সমস্ত পেশি দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। শেফালির মা তার পা টান করে দিচ্ছে। তাকে চিত্ত কব্বর শুইয়ে তার পেটে মালিশ করে দিচ্ছে। আন্তে আন্তে জড়ানো, পাক খাওয়া তলুগুলি শিথিল হতে থাকছে। আন্তে আন্তে সহজ বোধ করছে রাধিকা। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এলিয়ে পড়ছে। এই ক্ষণিক পেশি-সংঘর্ষে ক্লান্ত বোধ করছে সে। হঠাৎই, সে জানে না কেন, তার চোখে জল আসছে। হয়তো-বা যজ্ঞঘাঘ, হয়তো-বা শেফালির মার প্রতি পরম কৃতজ্ঞতায়, অথবা কার্তিক নামে লোকটার অসম্ভব অবহেলায়। হঠাৎই অসহায় লাগছে রাধিকার। তার আকাশ নেই। তার মাটি নেই। শূন্য শূন্য শূন্য। ভাসছে সে। ভেসে যাচ্ছে। কোথাও কোনও শাখাপ্রশাখা নেই যে। সারা পৃথিবী জুড়ে ন্যাভামুণ্ডি গাছের কঙ্কাল। কোথায় বসবে সে? জিরোবে কোথায়? কার কাছে একটু আশ্রয় চাইবে? সে পলাশের গায়ে হাত রাখে। শেফালির মার নির্দেশ না মেনে অপরাধ করেছে, এমনই মনে হয়। অপরাধবোধে ভারী হয়ে যায় মন। ভাল-মন্দ যা-কিছু এ মানুষটাই দেখে। সম্ভানসম্ভবা নারীর পালনীয় বিধিগুলি কতবার বলেছে সে। চুল খুলে চৌকাঠ পেরিয়ে না। কুবাতাসে শরীর নষ্ট হবে। সম্ভান কান-বোঁড়া হতে পারে ভাত্ত। পেটের মধ্যেই মরেও যেতে পারে। দেখো, এই মহাশুনো দুট আখ্যারা ঘুরে বেড়ায়। ডাকিনী-যোগিনী নাচে। ভূত-পেঙ্গি-দত্তা-দানোয়, পিশাচে-পিশাচিনীতে বাদ্যমণ্ডল ঠাসাঠাসি। ঘরের পেছনে ওই যে পুকুর, ওখানে শয়তানী আছে। মাছের বাচ্চা আর ডিমলো মাগুরের পেট খেয়ে খেয়ে লালচ বেড়েছে তার। ডিমলো ইলিশ আমাদের কেমন প্রিয় বেলো। ডিমলো ট্যাংরা দেখলে তোমার জিভে জল আসবে কি না বেলো। আমরা মাইনয়ের ছাওয়াল, আমাদেরই যদি ওই দশা হয় তো ভূত-পেঙ্গির দশা কী হয় ভাবো। পোয়াতি মেয়ে দেখলেই তাদেরও জিভ লক লক করবেই। তাদের নরম-সরম রক্তমাংস চিবিয়ে খাওয়ার জন্য, তাদের বুকুর দুখ শুবে খাওয়ার জন্য তারা উকি-খুকি মেরে সুযোগের সলুক-সন্ধান করবেই। সব নোংরা স্থানে, অজায়গায়-কুজায়গায় তাদের আসা-যাওয়া। তাই, যখন তুমি বাঁধি যাবে, আঁচল

দিয়ে অঁট করে, শক্ত করে তোমার দুধগুলি বেঁধে রাখবে। যাতে ভবা কোনও কীক-ফেকর দিয়ে, ছিন্ন দিয়ে ঢুকতে না পারে। ইয়া, ভিক্ষা দিয়ে না কারওকে। ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে শয়তান আসার কাহিনী তো যুগে যুগেই রচিত হয়েছে।

শুনতে থাকে রাধিকা। মাথের পাশে পলাশ নিশ্চিন্তে ফুটোয়। সোফাটির মা'র দুই চোখে কথা বলে চলার তুলুনি নামে। আপনমনে মাতৃহের কৃতান্ত কইতে কইতে তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। কথা জড়িয়ে গেল। কী যে বলছে বোঝা যাচ্ছে না। সে বুঝি একই লাইন ব্যাবার বলছে। রাধিকার কানে কিছু পৌঁছচ্ছে না। তার খুম চটে গেছে। সে ভাবছে, কার্তিক কতদিন হল আসছে না। কী করবে সে? চেয়ে-চিন্তে কতদিন চালাবে? কার্তিক কেন ওই বকম হল না? ওই বকম? পরমেশ্বর মতো, বা শমসেরের মতো? কার মতো চাইবে—পরমেশ্বর না শমসের—ছিন্ন করতে পারে না রাধিকা। চোখ বন্ধ করে বোঝার চেষ্টা করে সে। কার্তিক কার মতো হলে ভাল লাগত তার? লাল নীল হলুদ আলো, অঙ্ককার গছ, জলন্ত অগ্নিপিশু, পাথর, নদী, মাটি—সব পেরিয়ে তার চোখের সামনে নেমে আসে একখানি শান্ত গ্রাম। বর্ষায় ভরন্ত গ্রাম। আর সেই গ্রামেরই মতো শ্যামল, সজল, সবল, শান্ত মুখ একজনের। এ বার রাধিকা সুস্থির হয়। ফের ভাবে, কার্তিক কেন তার মতো হল না? কার মতো রে, কার মতো? শমসের-শমসের-শমসেরের মতো।



আখতারুজ্জামানের ইচ্ছে ছিল জানাকাটা পরি খউ আনবেন ছেলের জন্য। কিন্তু সেটি সম্ভব করার আগেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এটা সত্যি যে ভালমানুষের আত্মা তড়াতড়িই ডেকে নেন, আর আখতারুজ্জামান সে স্মৃতি সজ্জদহ, বিচক্ষণ ও শুদ্ধচিত্ত ছিলেন তা তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করবে।

এ প্রশ্ন উঠতেই পারে যে আখতারুজ্জামানের মতো মানুষের শত্রু থাকবেই বা কেন, আর যা যা কিছু তাঁর মিত্রপক্ষের স্বীকার করার কথা—সে-তার তাঁরা নেকেনই-বা কেন। এক্ষেত্রে, বলা যেতে পারে যে নিশত্র লোক কেমন করেই-বা থাকা সম্ভব যেখানে এই পৃথিবীতে ঈর্ষা বিরাজমান।

আখতারুজ্জামান ছিলেন সফল ব্যবসায়ী ও সুনামগরিব। বলা যেতে পারে, তাঁর আকাঙ্ক্ষা বা তাঁরও আকাঙ্ক্ষার সাধারণ ব্যবসাকে আখতারুজ্জামানই বৃহৎ ও ঈর্ষণীয় করেছেন যা তাঁর বড়ভাই এবং ছোটভাই সমেত গোটা পরিবারের ভরণ-পোষণ, অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ বজায় রাখছে।

বড়ভাই বেঁচে নেই দীর্ঘদিন, আর সেই শোকে বড়ভাবিও অল্প বয়সে গত। কিন্তু তাঁদের ছেলে-পুলেয়া আছে, যাদের ভার আখতারুজ্জামান গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রত্যেককেই। ব্যবসার কাজে তারা সকলেই নিবেদিত এবং দুই চাচা আখতারুজ্জামান ও মনিরুলে অনুগত—ব্যতিক্রম আনিসুজ্জামান। আনিসুজ্জামানের ব্যবসায়ে অনুগত্য বা আকর্ষণ নেই, মনিরুলেও না। পিতাকে তিনি খুবই ভালবাসতেন কিন্তু বিদ্রোহও করতেন। নানা পারিবারিক আচরণ ও ধর্মীয় নিয়ম অনুসরণে তাঁর আপত্তি ছিল। মসজিদে যাওয়া, ধর্মের বাণী শ্রবণ করা ও পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ার কোনও নিয়মই তিনি মানতেন না। মনিরুলের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি পারিবারিক পাপ যা সহ্য করলেও পাতকী হতে হয়, আর

আখতারুজ্জামানের ছিল সৈয়ের শরীর যা দিয়ে তিনি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছেলেকে এতটুকু জোর না করে তার স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধির জন্য প্রতীক্ষা করেছেন।

আখতারুজ্জামান নিজে ধর্মান্তরণে কোনও যাক গ্যাবেনলি। এবং ছেলের প্রতি তার স্নেহ এত গভীর ছিল যে স্ত্রী গত হলেও তিনি আর নিকাহ করেননি এই ভেবে যে, ছেলের রেহাশ্রিতে কিছু ঘাটতি তা হলে দেখা দিতে পারে।

আনিসুজ্জামান তাঁর শৈশব থেকেই ঘোর পড়ার এবং একা একা কোথাকি থাকায় তাঁর উৎসাহ। খেলাধুলায় তাঁর টান তেমন ছিল না, যেমন ছিল বইয়ের পর বই শেষ করার নেশা। কী ধরনের পড়াশুনো করলে তাঁর ভবিষ্যৎ সুগম হতে পারে তা নিয়ে যেমন আনিসুজ্জামান নিজেও ভাবিত ছিলেন না তেমন চিন্তিত ছিলেন না আখতারুজ্জামান বা অনিহাল। আনিসুজ্জামান নিজের খেলায় পড়েছেন, ভাল ফল করেছেন এবং নিজেই আশ্চর্য করেছেন যে সাহিত্যেই তাঁর পতি। এ ক্ষেত্রে মনিরুলের কাছে উর্দু বা ইংরাজি ভাষা নিয়ে পড়াই বাঞ্ছনীয় ছিল সম্ভব ও আনিসুজ্জামান বাংলা ভাষাই বেছে নিলেন এবং এম এ পাস করে শেখালপুর আদর্শ বোধ বিদ্যালয়ে পড়াতে শুরু করলেন যখন তখনও আখতারুজ্জামান সুস্থভাবে বর্তমান এবং ডানাকাটা পরিণতে সন্ধান করেন। কিন্তু আনিসুজ্জামান—গৃহে থাকে সন্তোষন করা হয় মেঠা নলে—নিশ্চিত বিবাহবিমুখ। পৃথিবীর সমস্ত ডানাকাটা পরিকে তিনি বিদায় জানিয়ে বসে আছেন এ জন্য যে ছোটবেলাতেই তাঁর পায়ে যে-শ্বেতচিকুটি জন্ম নিয়েছিল, তা ক্রমে বিকৃত হচ্ছে এবং তিনি কলেজে ক্লাস করতে করতেই টের পেয়েছেন যে গৌরদাড়ির নীচে, ঠোঁট এবং ঠোঁটের তলাকার অল্প ভাঁজে শ্বেত রং লাগছে। এখন তা চোখের তলায় ছড়িয়েছে, কানেও, যা তাঁকে স্পষ্টত চিহ্নিত করে শ্বেতরোগী হিসেবে।

চিকিৎসা হয়নি তা নয় কিন্তু ফল পাওয়া যায়নি আর এই মাথুরের গড়ে স্থিতি হওয়ার আগেই, সে আজ প্রায় দশ বছরের কথা, আনিসুজ্জামান তাঁর ছোটতুতো ভাইয়ের স্ত্রীদের আচরণে ঘৃণা দেখেছেন এবং পরিবারের সমস্ত দেবদূতের নায় শিশুদের চূড়ন করা বা কোলের কাছে নেবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বাচ্চারা তাঁর কাছে এলেই মায়েরা তাদের তেকে পাঠায় বা টেনে নিয়ে যায় ছল-ছুড়ায়, মারধরও করেছে। এবং মেঠা কখনও তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেননি যে শ্বেতরোগ তেমন করে ছোঁয়াচে নয় মোটেই।

অতএব শ্বেতবর্ণ যত প্রকট হতে থাকল, তত আনিসুজ্জামান একা হতে লাগলেন এবং তাঁর ধর্মান্তরণে বীতম্প্রহা তাঁকে ঠেলে দিল সকলের থেকে দূরে, আরও দূরে এবং অজ্ঞান—দয়ালু, বিচক্ষণ, ধর্মপারায়ণ—আখতারুজ্জামানের মৃত্যুতে তিনি হয়ে পড়লেন বিচ্ছিন্ন, অস্পৃশ্য, অনাকঙ্কিত ও একাকী, যা তাঁকে এই রিপন স্ট্রিটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও থাকবার সিদ্ধান্তকে প্ররোচিত করতে লাগল। যারা আপন বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে তাদের মাঝখানে থাকার পরও যে-একাকিত্ব তাকে সহ্য করা মুশকিল। কারণ মানের মধ্যে সারাক্ষণ এই প্রত্যাশার স্ফুরণ হতে থাকে যে প্রিয়জনদের দ্বারা এই একাকিত্ব দূর হওয়ার কথা ছিল। প্রত্যাশার পূর্তি হয় না। তাই ক্ষোভ জাত হয়। ক্ষোভের জন্ম ক্রম দূরে ঠেলে দিতে থাকে অন্যদের। এর চেয়ে বরং ভাল দেখ্ছা দূরে চলে যাওয়া। আনিসুজ্জামানের পক্ষে অনাকে সোষারোপ করা এমনই যত্নশীল যে তার চেয়ে দেখ্ছা নির্বাসন তাঁর পক্ষে উপশম হয়ে ওঠে।

আখতারুজ্জামানের মৃত্যুর দিনকয়েক পরেই তাঁর এই বি পি সি কলেজের চাকরিটা হয়ে যায় এবং অধ্যাপক দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে তিনি মাথুরের গড়ে থাকবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। মাথুরের গড় থেকে এই কলেজের দূরত্ব অতি সুবিধেজনক এবং রিপন স্ট্রিটের বাড়ি ছাড়ার পক্ষে তা অতি জোরালো যুক্তি। অতএব অস্বীয়দের থেকে দূরে গিয়ে একাকী জীবন কাটিয়ে দেবার সর্বাসীল প্রস্তুতি নিলেন যখন আনিসুজ্জামান তখন নীলোফা এসে তাঁর দরজায় দাঁড়িয়েছিল।



আখতারুজ্জামানের কথা মনে করে আনিসুজ্জামানের অবাক লাগে যে, অত বড় ব্যবসা চালিয়ে, অত বড় পরিবার সামলে এবং যেখানে তাঁর ছাঁ ছিল না যে শাস্তি দেবে বরং ছিলেন গোড়া মনিরুল যিনি প্রতি পদক্ষেপে দাদার ঈদারের প্রতি কটাক্ষ করতেন এবং তিনি যদি পরিবারের মাথা হতেন তবে কী কী হত বা হত না তা প্রকাশ্যে খোদা করতেন, তখন এতটুকু বিরক্ত না হয়ে, ধৈর্য না হারিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে ও বক্তব্যে স্থির থাকতেন আখতারুজ্জামান। প্রকৃত ধর্মপ্রাণ বলতে তাঁকেই বোঝায় কারণ জীবনের কোনও পর্বে, দুষ্ট বা দুঃখে, আনন্দে বা বেদনায় তিনি খোদাকে স্মরণ করতে ভোলেননি। বরং আরার ইচ্ছাই সমস্ত চলছে এমনই মত তিনি প্রকাশ করেছেন বারবার এবং অন্য যে-কোনও ধর্মমতের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা রেখেছেন। তাঁর হৃদয়ে ছিল আশ্চর্য ধৈর্য আর ক্ষমা।

আনিসুজ্জামান প্রশ্ন করেছিলেন, আক্বাজান, কুনলাম নাজলীন আর কুলে যাবে না।

আখতারুজ্জামান কেনও উত্তর করেননি। তাঁর গৌফ-দাফির আড়ালে একজন চিন্তাশ্রম বিপন্ন মানুষের মুখ ফুটে উঠেছিল। সেই মুহুর্তে আনিসুজ্জামানের চোখে তা ধরা পড়েনি। কিন্তু আক্বাজানের ওই মুখ, আশ্চর্যভাবে আজও ধরা আছে স্মৃতিতে, তার স্মরণক্ষেপে উঠে আসে বিপন্নতাও। মস্তিষ্ক, আপনাপ্রাণনি, মানুষের সজ্ঞান ইচ্ছার অগোচরে অনেক কাজ সম্পন্ন করে রাখে। যেন-না, একজন মানুষের মধ্যে বসে আছে অন্য এক মানুষ, যে প্রয়োজনীয় ধূনিটি বিশ্লেষণ, বোধ, উপলব্ধি গ্রহণ করছে, সংঘটিত করছে। নিজের মধ্যে এক অন্যতম আপনজন, যে সতর্ক, বুদ্ধিমান ও বলশালী।

পরে যতবারই সে-দিনের কথা ভেবেছেন, অনেকবারই তাঁকে ভাবতে হয়েছিল, কারণ, বলা যেতে পারে, ওইদিনই রিপন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে আসার বীজ রোপিত হয়েছিল হয়তো, আর সেইসব পথ ধরে ওই ভাবনায় তিনি দেখেছেন, আখতারুজ্জামানের সৌম্যমুখ উধাও এক বিপন্নতা। এক ক্রিষ্ট মুখ। কেন ওরকম হয়েছিল? আক্বাজান কি মনে মনে ক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন? তার নানা রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু আনিসুজ্জামান জানেন, সব ব্যাখ্যাই হবে তাঁর একান্ত নিজস্ব ধ্যানধারণার উৎসায় যা প্রকৃত সত্যের অনুবাসে নাও যেতে পারে।

আখতারুজ্জামান চুপ করে ছিলেন কিন্তু মনিরুল জু কুঁচকে বলেছিলেন, হ্যাঁ। তাতে তোমার কী?

আনিসুজ্জামান, যা কি না প্রায় বিরল ঘটনা যে তিনি চাচার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেছেন, তেমনটাই খটিয়ে, মনিরুলের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ও পড়াশুনায় খুবই ভাল। আমি জানি কারণ আমি ওকে পড়িয়েছি। ওর স্কুল বন্ধ করে দেবার কী মানে হয়।

আখতারুজ্জামান বলেছিলেন, ওর এগারো হল। তুমি জানো এ পরিবারে দশের পর মেয়েরা বাইরে যায় না। এটাই এ পরিবারের দস্তুর।

আনিসুজ্জামান অবুঝের মতো বলেছিলেন, কীদের দস্তুর? কেন দস্তুর? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বদলায়। আমাদের পারিবারিক নিয়মও কেন বদলাবে না? কেন ওদের এভাবে অটিকে দেওয়া হয়?

মনিরুল বলেছিলেন, দেওয়া হয় কারণ মেয়েদের একটা আবর ও নিরাপত্তার ব্যাপার আছে। নীতি-নৈতিকতার ব্যাপার আছে। প্রথম থেকে ওদের তা না শেখালে, সংযম না শেখালে, সংসার উজাড হয়ে যায়।

আনিসুজ্জামান টের পাচ্ছিলেন, তাঁর দুটি মুঠি শক্ত হচ্ছে। তিনি ক্রোধী হচ্ছেন। তবু কণ্ঠ সংযত করে বলেছিলেন, মেয়েরা মেয়েদের স্কুলে পড়তে পারে। এখানে অনেক মেয়েদের স্কুল আছে। আমাদের ফুফুর মেয়েরাও ওখানে পড়ে।

মনিরুল গর্জে উঠেছিলেন, চুপ করো। বোকার মতো কথা বোলো না। ফুফুরা তাদের পরিবারের নিয়মে চলেন। আমরা আমাদের নিয়মে চলি।



তাদের শব্দে সব জানালায় শিশুরা আর মেয়েরা কান পেতেছিল। এ শব্দে সকলেই উত্তেজিত হয়েছে। বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে প্রত্যেকেই মনে মনে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে। শিশুদের মধ্যে পুরুষ যারা, তারা ক্রমশ আসরের কাছাকাছি এসে আসবাবটিকে ঘিরে বসছে, সম্ভবত নিজেদের ভবিষ্যৎ অবস্থান তারা পছন্দ করে নিচ্ছে মনে মনে। প্রত্যেকের মাথায় ছবিদার টুপি ও গায়ে বকবক পোশাক। তাদের কেউ বলে দেখনি, ইয়া, তোমরা ওই আসরে যেতে পারো। কিন্তু তারা বুঝে গেছে। আরও অনেক কিছুই মতো তারা জেনে ফেলেছে যে যা-কিছুর প্রতি এগিয়ে যাবার অধিকার তাদের আছে। অন্য দিকে মেয়েরা মায়েল, চাফির, ভাবির কোল ঘেঁষে অন্তরালে দাঁড়িয়ে। তাদেরও কেউ বলেনি—না, ওখানে বেয়ো না—তবু তারাও জেনে গেছে, ওখানে যেতে নেই। আর নাজনীন দীর্ঘত চোঁট কান্নাকাতি আছে। ইস্কুল তার খুব পছন্দ ছিল। আর যেতে পারবে না শুনে কষ্ট হচ্ছে। এই কষ্ট সে মেঠা ভাইজানের কাছে প্রকাশ করেছিল। এখন তার লজ্জা করছে। ইস—ভাইজান কেন এ সব নিয়ে ঝগড়া করতে গেলেন।

অনিসুজ্ঞামান বলেছিলেন, ফুফুর মেয়েরা যদি বড় হয়েও झুলে যেতে পারে, আর তাতে যদি তাদের আবরু, নিরাপত্তা, নীতি-নৈতিকতা নষ্ট না হয়, তবে আমাদের বাড়ির মেয়েদেরই বা হবে কেন।

মনিরুল বলেছিলেন, তুমি অনেক কথা বলেছ। আর একটি কথাও না বলে চলে যাও। পরিবারের কর্তা হিসেবে আমরা এখনও বেঁচে আছি। সমস্ত নিয়ম-কানুন আমাদের মতেই চলবে। ভাইজান, আপনাকে বলেছিলাম ওকে কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে পাঠাবার দরকার নেই। জোর করে ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিন। আপনি শোনেননি। দেখুন, ওর অধঃপতন দেখুন। আধুনিকতার হাওয়া লেগেছে ওর গায়ে। চরম কিছু ও করে বসবে এবার। আমার সন্দেহ হয়, বাইরে হিন্দুদের সঙ্গে ও আশা না করি না। চোখের সামনে হিন্দুর মেয়েগুলোকে নেচে বেড়াতে দেখে ওর বিকার হয়েছে...

আখতারুজ্জামান দু'হাতে কান চাপা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, থামো, থামো তোমরা। মেঠা। নাজনীন আর ইস্কুলে যাবে না। তবে সে যদি পড়তে চায়, ঘরেও পড়তে পারে। তুমিও ওকে পড়াতে পারো। বাইরে গিয়ে একবার পরীক্ষা দিয়ে আসুক না হয়। এমনকী নীলোফাও এটা করতে পারে কারণ ওর পড়ার আগ্রহ আছে। তবে, এ বাড়ির মেয়েরা কখনও পড়াশুনায় কোনও আগ্রহ দেখায়নি। তাই নিয়মটাও বদলানো হয়নি। পারিবারিক স্থিতি, কল্যাণ ও শৃঙ্খলার জন্যই নিয়ম তৈরি হয়। কিন্তু এমন নয় যে তা বদলাবে না বা শিথিল হবে না। বরং দরকারমতো নিয়ম-কানুন একটু বদলে নিলেই কাজে লাগে ভাল। নিয়মের জন্য তো মানুষ নয়, মানুষের জন্যই নিয়ম। পড়াশুনা যত দূর সম্ভব প্রত্যেকের করা উচিত। এ বাড়ির মেয়েরাও তার ব্যতিক্রম নয়। যদি কেউ সত্যি সত্যি সে বিষয়ে আগ্রহী হয় তবে কোনও রাস্তা আমাদের ভাবতে হবে।

মনিরুল বলেছিলেন, এ সব আপনি কী বলছেন ভাইজান? আপনি কি অন্ধ হয়ে গেলেন? পারিবারিক প্রথা বলে কিছু থাকবে না? মেয়েরা পড়াশুনো শিখে করবেই বা কী। সেই তো বাচ্চা পয়সা করবে আর বিবিয়ানি রীখে।

আখতারুজ্জামান ঠাণ্ডাভাবে বলেছিলেন, কিন্তু কারও সন্দিগ্ধ্য আমরা বাধা দিতে পারি না। নাজনীন পড়ায় আগ্রহ প্রকাশ করলে তা সে করুক।

মনিরুল চরম অঘাত হেনেছিলেন। বলেছিলেন, কিন্তু নাজনীনকে পড়াবার ডার আমি মেঠার ওপর দিতে পারি না।

—কেন?

—আমি ওকে বিশ্বাস করি না। যে ধর্ম মানে না তার ওপর আমার বিশ্বাস নেই।

আনিসুজ্জামানের কান ঝাঁ ঝাঁ করেছিল। দু' ইটুতে মুখ রেখে তিনি ধ্বংস অস্তিত্ব সামান্য দেবার চেষ্টা করছিলেন। আখতারুজ্জামান নীরবে উঠে পড়েছিলেন। শিশুরাও পালিয়ে গিয়েছিল। আর নাজনীন কোন অঙ্ককারে মুখ লুকিয়েছিল কোড ঘানে না। তখন আমিনা আনিসুজ্জামানের কাছে এসেছিলেন। মনিকলের প্রথম স্ত্রী আমিনা। মুসলিমদের মেয়ে। খুবই দাপুটে। কিন্তু স্নেহপ্রবণ। অন্দরের হাল তিনিই শক্ত করে ধরে আছেন। তাঁর বচন ইচ্ছা। বছর বছর তিনি অতি পৃথুলা হয়েছেন। ভারী শরীর নিয়ে হাসকানি করে তাঁকে চলতে হয়। নিতান্ত বাইরের লোক না থাকলে তিনি বোরখা পরেন না। আনিসুজ্জামানের কাছে তিনিই মাতৃহানীয়া এবং নির্ভরস্থল। আনিসুজ্জামান, তাঁর স্নেহকণ্ঠ গুনতে পান, বাপজান, তোমার জন্য আজ্ঞা কী রান্না করেছি বলে দেখি!

গলে গিয়েছিলেন আনিসুজ্জামান। ভিজে গিয়েছিলেন। তাঁর বিবীর্ণ পঞ্জরটি থেকে ছিটকে বেরিয়েছিল আহত অপমানিত হৃদয়। কান্নার সম্মুখে কৈশে উঠেছিল পিঠ। আমিনা তাঁকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছিলেন সেইমতো, যেন এ তাঁর মাতৃহারা শৈশব এবং এই নরম কোল অতীত প্রয়োজনীয়। আমিনার কাছে, পৃথিবীর সমস্ত মায়েরই মতো, কোনও সন্তানই বয়ঃপ্রাপ্ত নন। আর এমনই বাৎসল্যে তিনি নিজের বিপুল বুক টেনে রাখেন আনিসুজ্জামানের মাথা এবং তাপিত মস্তক শান্ত করতে চান। মকবুলের ছোট ছেলে ইয়াসিন—এত বড়, মেজাজি, তাক্কিক চাচুকে, ভেঙে পড়তে দেখে, প্রবল মজায় হাসে, হেসে গড়ায়—হি হি হি হি— চাচু ওঁহা ওঁয়া...চাচু বাচ্চা বাচ্চা...। আমিনা তাকে ধমকাচ্ছেন, তাড়াচ্ছেন, আর ধীরে ধীরে আনিসুজ্জামানের মাথার চুল খাঁটতে খাঁটতে বলছেন—

মাতৃদত্ত শিক্ষাবীজ এতই অতুল

অন্য কোনও শিক্ষা নহে তার সমতুল

পটবস্ত্রে গুণ্ণাকল মূল্য নাই হয়

ছিন্নবস্ত্রে মতির মূল্য কখনও না যায়

তোকে কি আমি কখনও বলেছি মোঠা, তোকে বিশ্বাস করি না?

—না চাচি।

—কখনও কি বলেছি তোকে, পড়িস না ইস্কুলে, কলেজে?

—না, চাচি।

—তুই যখন পাস করে আসতিস আর আমাকে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতিস এইবার নাইনে উঠলাম চাচি...এইবার ইলভেন...আমি কি খুশি হইনি? আর আদর করিনি তোকে?

—হ্যাঁ চাচি।

—তা হলে? তা হলে? এত দুঃখ কেন পাস বাপ আমার। ওরা বোকে না। কিছু বোঝে না। যে-দিন বুঝবে সে-বড় কল্যাণের দিন। তুই কাদিস কেন মিছিমিছি? তোর জ্ঞান হয়েছে। বুদ্ধি হয়েছে। যা ভাল বুঝেছ, বলেছ। তবে কথা কী, সব কথা সবখানে বলতে যেয়ো না। তোমাকে বুঝতে হবে, কোথায় কী কথা চলে। পাহাড় অটল। তাকে টলাবে তোমার সাধা কী? তাই পাহাড় ঠেলে কেন মিছে শক্তিকর করছ? বরং পথ দেখো। পথ খোঁজো। কী করে ওই বিশাল পাহাড় উপকে যাওয়া যায়। মাইয়ামাইনযেরে পায়ের তল্যায় না রাখলে, বন্ধ না করলে ওদের প্রভুত্ব কার ওপর জারি থাকবে! সবাই রাজত্ব চায়। দেশ না হোক, শহর না হোক, গ্রাম না হোক—অস্তিত্ব নিজের ঘরে, নিজের পরিবারে!

আশ্চর্য লাগে। আজ ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে আনিসুজ্জামানের। ওই স্বচ্ছ সুন্দর মানসিকতা কোথায় পোয়েছিলেন আমিনা? স্কুলে যাননি, বাড়িতে বিদ্যাভ্যাস করেননি, আধুনিকদের বক্তৃতা শোনার ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। কিংবা, ইচ্ছে থাকলেও, কোনও সুযোগই আসেনি জীবনে। তা হলে কে-ই বা তাঁকে এমন শেখাল। জীবন—জীবন। জীবনের চেয়ে বড়

শুধু আর কে হতে পারে! এ সবেই নাম স্বশিক্ষা। এ সবেই নাম জীবনবর্ণনা। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ সংঘর্ষ থেকে জন্ম নেওয়া আশ্চর্য উপলব্ধির অধ্যায়।

নাঙ্গনীনের মতো বড় হওয়ার অনেক আগেই বোরখার আড়ালে বেতে হয়েছিল নীলোকাকত। নির্ধারিত আড়াল বা অন্ধকারের চেয়েও বেশি আড়াল ও অতিরিক্ত অন্ধকার জারি ছিল তার জন্য। শৈশবের গন্ধ মুহুর্তে না-মুহুর্তেই তারা সবাই ছিল নুরে চলে যাওয়া, নিগন্তের আবছা বৃক্সারির মতো। গতিবিধি দেখে কখনও বোলা যেত না ও নীলেকা, ও জহমিনা, ও নাঙ্গনী। আনিসুজ্জামান নজরও দেননি তেমন। সে-দিন, মনিরুলের কথার পর অন্ধদের সঙ্গে তাঁর সামান্য যোগাযোগও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দাঁকনের চে-ঘরে তিনি পড়াশুনা করতেন, সে-ঘরই তাঁর সম্পূর্ণ জগৎ ছিল। যার খবর খুব কমই যেত বাইরে।

আজ আনিসুজ্জামান স্বীকার করেন যে মনিরুলের রাগ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। তাঁর বেশির ভাগ হিন্দু বন্ধুবান্ধব এবং তাঁদের বাড়িতেও বাওয়া-আসাকালে কোনও দিন বাধা অনুভব করেননি আনিসুজ্জামান। তিনিও অন্য ছাত্রদের মতোই অধ্যাপকদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন। আজ, যখন ছাত্ররা তাঁর পা ছোঁয়, প্রণামে নমিত হয়, তখনও মনের মধ্যে কোনও বাধা অনুভব করেন না তিনি। কিন্তু ঐকুই সব নয়। ছাত্রাবস্থায় দৃষ্টি আলোকরেখার মতো। প্রেম শ্রদ্ধা ভালবাসার কোনও জাত মান থাকে না তখন। কিন্তু সে-দৃষ্টি বদলায়। জট পাকায়। শক্ত ঈদের মতো জড়িয়ে ফেলে মানুষের অন্তরাত্ম। মনিরুল তার শিকার। চারপাশের বেশির ভাগ মানুষই তার শিকার। এই মাথুরের গড়ে এসে আনিসুজ্জামান তা দেখেছেন। মনিরুলের মতোই বিপরীত স্পর্শকাতরতা এখানে ছড়ানো। কিন্তু এ নিয়ে তাঁর নিজের কোনও বিদ্বেষ বা অভিযোগ নেই। তিনি নিজেকে নিরপেক্ষ দেখাব চেষ্টা করেন। নির্বিকারভাবে তিনি দেখে যান এই দুনিয়ার আশ্চর্য খেলা। ফেন তিনি পৃথিবীতে এসেছেন এই বিস্ময়কর মানুষ দেখার জন্যই। অতএব তিনি পর্যবেক্ষণ করে যান, মানুষ মানুষকে ছোট করছে, অপমান করছে, ঈশ্বরের নামে হানাহানি করছে পরস্পর। আনিসুজ্জামান নিজে কোরান পড়েছেন, গীতা পড়েছেন, বাইবেল পড়েছেন। বুদ্ধ বা মহাবীর জৈন-এর বাণীগুলি সম্পর্কেও অবহিত আছেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছে— মূলত সবই এক। আচরণীয় বিধি-নিষেধের কিছু পার্থক্য ছাড়া সব ধর্মই শ্রেম দেবার কথা বলে। ঈশ্ব না করার কথা বলে। দয়া ও সংযম প্রদর্শনের কথা বলে। কিন্তু যে-সহনশীলতা ধর্মচরণের মূল বিধেয় তাকে বিস্মৃত হয় মানুষ আর ধর্মকে অভিস্রুত করে। দোষ ধর্মে নেই। দোষ মানুষে। মানুষ সত্যকে বিকৃত করে। বোধকে বিকৃত করে। বিকৃত বাখ্যা দ্বারা কলুষিত করে উপদেশ এবং যথার্থ শিক্ষা না পাওয়া মানুষেরা ভুলভাবে পরিচালিত হয়। এর নাম অজ্ঞানতা। আনিসুজ্জামান, একজন সং ও শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে, একজন অধ্যাপক ও ভারতপ্রেমী হিসেবে জানেন, উপলব্ধি করেন যে অজ্ঞানতাই এ দেশের বৃহত্তম অভিশাপ যা থেকে মুক্ত নয় এমনকী শিক্ষিত নাগরিকরাও। সত্যক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে, আনিসুজ্জামান মনে মনে ক্ষমা জারি রাখেন সর্বক্ষণ। অজ্ঞানের প্রতি, অব্যবের প্রতি, অধৈর্যের প্রতি।

আজ বড় বেশি করে মনে পড়ছে সে-দিনের কথা যে-দিন রিপন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন আনিসুজ্জামান। দিনের কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছিল তখন। তিনিও তাঁর বইয়ের সংগ্রহগুলি গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। একটি বোরখা পরা ছোট মূর্তি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। আনিসুজ্জামান মুখ তুলে বলেছিলেন— কে?

তাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গল্পগুচ্ছ’ ধরা ছিল। ক্লাস নহিনে ফুলে সেরা প্রজাপট করে পাওয়া। সমস্ত বইপর গুছিয়ে নিতে নিতে তাঁর এই বাড়ি, এই ঘর, এই বই-জড়ানো অসংখ্য স্মৃতি মনে পড়ছিল। ছোটবড় কত কথা। গোটা বাড়িটাই ফেন আকাঙ্ক্ষার মতোই ছিল, গভীর, ক্ষমাশীল। আনিসুজ্জামান এ বাড়ির সমস্ত ইট চিনে তেলেছিলেন। এ বাড়িতে কখন কোথায় ছায়া পড়ে, কখন বাইরের কোলাহল সবচেয়ে বেশি ঢুকে পড়ে ঘরের আনাচে-কানাচে, কোন

জায়গায় দাঁড়ালে আজও আশ্চর্যকল্পমানের চলাফেরা স্পষ্ট বোঝা যায়—তার জানা হয়ে গিয়েছিল। নিজের ঘরে বাসেই তিনি বলে দিতে পারতেন—যেমনও পায়ের শব্দ মনিরুলের গি-না, আমিনার কি না। এ বাড়ি ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে দ্বন্দ্ব কাতে সেওয়ালে দ্বন্দ্ব বুলিয়েছেন তিনি। একা একা বলেছেন—আমি চলে যাচ্ছি। ক্রমশে পাখি? আমি চলে যাচ্ছি। আশা নেই। বড় চাচি অসুস্থ, চলে যাবেন যে-কোনও দিন। এ বাড়িতে আমাকে আর কেউ চায় না। ওরা ভুলে যাবে আমাকে। কিন্তু তোমরা ভুলো না।

কোথাও কোনও শব্দ হয়নি। কিন্তু আনিসুজ্জামানের স্থির বিশ্বাস, এইসব দেওয়াল, কঙ্কিতটে জানালা-দরজা যদি কথা বলতে পারত, তবে বলত—যেয়ো না, যেয়ো না, থাকো। যেন-আমিনা বলেছিলেন।

আব্বাজান চলে যাবার পর এমনও হয়েছে, পর পর সাতদিন, শুধু বাবার সময় ছাড়া পরিবারের আর কারও সঙ্গে তাঁর কোনও কথা হয়নি। সে-সময়ও কেন তাঁর উপস্থিতি অন্য সবাইকে জড় রেখেছে, আড়ষ্ট রেখেছে। হতে পারে তাঁর গাভীর বা তাকিক স্বভাব এর জন্য দায়ী। অথবা পরিবার সম্পর্কে তাঁর নিষ্পৃহতা, ঔদাসীন্য কিংবা তাঁর বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত, যা সকলে অন্যায় সাব্যস্ত করেছে।

আশ্চর্যকল্পমানের মৃত্যুর পর, আনিসুজ্জামানের পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে পড়ার কারণে বৃদ্ধি মনিরুল তাঁর সম্পর্কে কিছু দুর্বলতা বোধ করেছিলেন। কিংবা এই দুর্বলতা আসলে কোরানের বাণীর প্রতি আনুগত্য যেখানে এতীমকে অভিভাবকত্ব দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আনিসুজ্জামান যেহেতু কোনওদিন ধর্মচরণে অনুরাগী নন, এবং হিন্দু-মানুষের প্রতি তাঁর টান বা ওঠা-বসায় আগ্রহ, সুতরাং তাঁকে শুরু থেকে এভাবেই সাবাস্ত করা হয় যে তিনি নিজস্ব ভালমন্দ বোধহীন, অতএব বুদ্ধিহীন, অর্থাৎ তাঁর ব্যস হলেও, জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ সুন্দর ধারণা থাকলেও, তাঁকে এতীম হিসেবে পরিগণিত করা হয় এবং মনিরুল, একজন ধর্মিক পুরুষ, আনিসুজ্জামানের দায়দায়িত্ব শ্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। অতএব মনিরুল অভিভাবক হয়ে থাকেন এবং আনিসুজ্জামানের নিজস্ব জীবনযাপন সম্পর্কেও মতামত দেবার অধিকার অর্জন করেন। বহুবার তাঁদের মধ্যে নানাবিধ বাক্যবিনিময় ও তর্ক উত্থাপিত হয় বার কবে কোনটি হয়েছিল, কোনটির পর কোনটি এসেছিল আজ আর আনিসুজ্জামান ধারাবাহিকভাবে মনে করতে পারেন না। কিন্তু এটা তাঁর ঠিকই মনে আছে যে আশ্চর্যকল্পমানের ইন্তেকাল হলে মনিরুল আরও ব্যক্তিত্বশালী হয়ে ওঠেন এবং ধর্মে আনুগত্য প্রদর্শন নিমিত্ত তাঁর ধর্মচর্চার বন্ধন আরও কড়া ও কঠিন হয়। ধর্ম সংক্রান্ত কোনও উপদেশ তিনি আনিসুজ্জামানকে দিতে আসেননি বটে কিন্তু কঠোর কর্তব্যবোধে একদিন বলেছিলেন—মেঠা, তোমার ব্যস হল। আল্লার ইচ্ছায় ব্যবসা না করেও তুমি সংসার পালনে সক্ষম। ভাইজান বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তোমার শাদি ইত্যাদি সম্পন্ন করতেন। আমি তাঁর অবর্তমানে, তাঁরই আন্তরিক ইচ্ছায় তোমার জন্য কয়েকটি পাত্রী খোঁজ করেছি। আমার এবং তোমার অন্যান্য ভাইদের ইচ্ছা তুমি পাত্রী নির্বাচনে সহায়তা করো।

আনিসুজ্জামান স্বাভাবিক বিনয় ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, চাচুজান, আব্বাজানের অবর্তমানে আপনিই আমার পিতৃসম। আপনি জানেন রোগগ্রস্ত হওয়ার কারণে আমি শাদি করে সংসার পালন করতে না স্থির করেছি। আগে রোগ অল্প ছিল। পোশাকের আড়ালে ঢাকা থাকত। কিন্তু এখন ক্রমশ তা প্রকাশিত হচ্ছে। ক্রমশ এই প্রকাশ আমার সর্বাস্থে ছেয়ে যাবে। আমি এখনই যথেষ্ট কুৎসিত। ক্রমশ আমার চেহারা আরও বিকৃতি আসবে। আমার স্ত্রী, যদি কেউ হয় — আমার সন্তানেরা, যদি কেউ জন্মায়— আমাকে স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করবে। আমার তা সহ্য হবে না। তাদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কও গড়ে উঠবে না। অতএব, চাচু, এই রোগ সমেত, আমার পক্ষে কারওকে শাদি না করাই শ্রেয়।

মনিরুল বুঝই ঘেরের সঙ্গে প্রতিটি কথা বুঝেছিলেন এবং শান্তভাবে বলেছিলেন, এ সব বিষয়ে আমি ভেবেছি। পৃথিবীতে তুমি একা এ রোগের শিকার নও। এ রোগ তোমাকে এমন কিছু বিকৃতদর্শন বা কুৎসিত করেনি। করবেও না। বহু লোকেরই এই রোগ হওয়া থাকে এবং তৎসত্ত্বেও তাঁরা সংসার প্রতিপালন করেন। আমি কয়েকটি ভাল ব্যাপার শত্রু স্বজন করেছি। আমাদের পরিবারে যেহেতু স্বর্ণশং বিবাহ চলে না সেহেতু ভাল মেয়েল জন্য বাইরে অনুসন্ধান না করে উপায় নেই। বংশ ভাল হলেও পরিবারগুলি দরিদ্র। তোমার রাগ থাকে নাও তোমার আগ্রহ কম নেই কারণ এই দরিদ্র অবস্থায় আমাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন একপ্রকার বড় সহায়। যে তোমার স্ত্রী হবে সে আজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

—এ প্রস্তাবে আমি রাজি হতে পারি না কারণ আমাদের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আসলে মেয়েটিকে বিক্রয় করা হবে। এবং আমিও, আমার রোগলজ্জার কারণে বিক্রীত হব এমন যেন আমাকে নড়া করা হল। বোঝা যাবে না কে কাকে নড়া করল এবং তা অতি জটিল অবস্থা। সবটাই ভ্রান্তি এবং সারাজীবন তার অপমানিত মন আমাকে তাড়া করবে। আমি তা ঠিকই টের পেয়ে যাব আর তাকে আমার সুখ-শান্তি বিদ্রিষ্ট হবে। চাচুজান, প্রেমহীন সম্পর্কে আমি বিশ্বাস করি না। আর এরকম হিসেবের বিবাহে প্রেম কখনও জন্মাতে পারে না।

—তুমি আবার আমার মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিছ। আমি তা সমর্থন করছি না। তুমি কি কিছুতেই বুঝবে না মেঠা, চিরকৌমার্য আমি কোনওদিন মেনে নেব না।

—আমি কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিইনি। আপনার বিধান এ পরিবারে শিরোধার্য কিন্তু তা সাধারণ-স্বাভাবিক মানুষের জন্য। আমি রোগগ্রস্ত। কোনও সুস্থ মানুষকে সুখী করার ক্ষমতা আমার নেই। আপনারাই তো বলেন কারওকে কষ্ট দিয়ে না। অসুখী কোরো না।

—তুমি কি আমাকে অসুখী করছ না? কোনও রীতিনিয়মই কি মানছ তুমি?

অনিসুজ্ঞামান চুপ করেছিলেন। সে-দিনও সমস্ত চোখ তাঁদের ওপর নিবদ্ধ ছিল। শিশুরা কিছু বুঝতে পারেনি। অন্যরা ভাইরাও নিশ্চল ছিল—অধিক শিক্ষিত হওয়ার কারণে এবং বোঝা আচর-অচরণের জন্য অনিসুজ্ঞামান তাদের কাছে দূরতম নম্রতা প্রতিভাত হতেন। তারা অনিসুজ্ঞামানকে মানতে পারত না কারণ মনিরুলকে মানা, মনিরুলের বিধান অনুসরণ করা তাদের কাছে অনেক সহজ ছিল। সেই সবই তারা চারপাশে পালিত হতে দেখে এবং স্বাভাবিক বলে জানে। যা-কিছুই, একবার স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে পারলে আর কষ্ট নেই। সঠিক কিংবা সঠিক নয় বোঝার পরিশ্রমও নেই। ফলে অনিসুজ্ঞামানের ভাষা তাদের দুর্বোধ্য মনে হয়। একদিন তিনি বলেছিলেন, সমস্ত ক্ষীণজীবী, অদৃঢ়চিত্ত ও দুর্বল মানুষের জন্মের কারণ প্রেমহীন পৃথিবী। নারী ও পুরুষের অশ্রদ্ধার মিলন।

এ সবের কীই-বা মানে হয়। অনিসুজ্ঞামানের ভাইরা তা বুঝতে পারে না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বাড়ি ফেরায় সুখ এবং নারী সেই সুখের অনুভব। হ্যাঁ, প্রেম সেখানে থাকতে পারে বটে তবে তা জরুরি নয়। তবু—তবু—তবু অনিসুজ্ঞামানের শব্দোচ্চারণের গুরুভারে ভাইরা নিশ্চুপ থাকে। ভাবে, তাদের মত ও আচরণের সঙ্গে না মিললেও অনিসুজ্ঞামানের কথাগুলি ওজনদার। এবং, কোনও সত্যও হয়তো-বা আছেই যা পূর্ণাঙ্গ। দুর্ভেদ্য।

কিছু ভাইরা মীরব হলেও মনিরুল মীরব থাকতেন না। রাতে পরিবারের পুরুষরা একসঙ্গে বসে আহার করতেন—এ নিয়মের ব্যত্যয় করতেন তিনি। বলতেন, যে নিয়ম মানে না, ধর্মাচরণ করে না তার সঙ্গে যাওয়ার কুচি নেই আমার।

অনিসুজ্ঞামান দুখে পেলেন। আমিনাকে বললেন, বেশ, আমার খাবার আমার ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। আমার জন্য চাচু কেন অন্যদের সঙ্গে খাবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন।

ব্যবস্থা হল। আর অনিসুজ্ঞামান টের পেলেন এই পরিবারের মাটি থেকে তাঁর শিকড়



আলগা হল আরও। হয়তো তাঁর অচরণ তা আত্মন করেছে। লোখ তাকে ভরাবিত করেছে। কিংবা, মা ছিল না বলে, কোনওদিন গভীর সম্পর্ক প্রাণিতই হল না এই পরিবারে, এমন হওয়াও সম্ভব। অতএব আনিসুজ্জামান চলে যাওয়াই মনন করলেন। উপলব্ধি করলেন, আব্বাজানের অনুপস্থিতি তাঁকে কতখানি অসহায় করেছে। তিনি থাকতে, নিজেই অস্তিত্ব ও সম্পর্কগুলি নিয়ে এত জটিল করে ভাবতে হয়নি। আনিসুজ্জামানের সম্ভার গভীর থেকে জ্বলন্ত ঠিকরে বেরিয়েছিল। আখতারুজ্জামানের ইন্তেকাল এই সম্ভার পক্ষে একটি বড়-বাড়ী, আর তাঁর পরপরই আমিনার পক্ষাঘাত, যা, অবশ্যজ্ঞাবী মৃত্যুকে দেওয়ালে টাঙিয়ে দেয়, এবং যা খুলতে থাকে, খুলতেই থাকে সবার বিকট প্রতীকার মতো।

নড়াচড়া করতে পারেন না তখন আমিনা, জড়িয়ে জড়িয়ে কান্টিকুই-রাসতে শায়েন। অথচ ওই বাড়ি জুড়ে তাঁর পায়ের শব্দ ছড়ানো ছিল তখনও। আনিসুজ্জামান, তাই চেয়েছিলেন, আমিনার জীবিতকালেই তাঁকে জানাতে যে তিনি গৃহ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন অন্য কোথাও। হয়তো কলেজের কাছাকাছি কোথাও। যদিও এই বলার কাজটি করে ফেলা খুব সহজ ছিল না তাঁর পক্ষে। কিন্তু বললেন যখন, কোনও জোরালো প্রতিক্রিয়া পরিবারে দেখা গেল না। এবং তিনি আরও একবার আহত হলেন। ভাবলেন, তা হলে তাঁর বিদায়ই অভিপ্রেত এবং তা প্রস্তুত হয়েই ছিল এই পরিবারের জীবনচর্য। তিনি অস্তিত্ব এটুকু আশা করেছিলেন যে ভাইরা বলবে— কোথায় যাবে! থাকো। এ পর্যন্ত আমরা কেউ পৃথক হইনি। তুমিই—বা হবে কেন! থাকো।

শুধু আমিনা বলেছিলেন, চলে যাবি? হ্যাঁ? চলে যাবি? এখন যাস না মেঠা। অন্তত যে-ক' দিন আমি আছি, থাক এই বাড়িতে। আমার কাছে থাক তুই।

চলে যাবার কথা শুনে প্রাথমিক বিহ্বলতায় এ সবই বলেছিলেন বটে, আর তাঁর চোখে জল এসেছিল, ঠোট কেঁপেছিল। কিন্তু দ্রুতই তিনি এইসব আবেগবিহ্বল কথা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, না। আমার জন্য থাকতে হবে না। আমি তো খেতেও নেই। চলে যা। কে আর তোকে দেখবে। কে আর বুঝবে। এ সংসারের হাওয়া বদলে যাচ্ছে রে মেঠা। সংসার আর একসঙ্গে রাখা যাবে না বেশিদিন।

আনিসুজ্জামান অবাক মেনেছিলেন। সংসারে কি গুণ কিছু ঘটেছে? তিনি টের পাননি। কিন্তু আমিনা যা বলেন তা ফেলনা নয়। এ সংসারে তিনিই ছিলেন মূল চালিকাশক্তি। তাঁর উপলব্ধিতে সংসারের বাঁকগুলি ধরা পড়ারই কথা। আনিসুজ্জামানকে নীরব রেখে আমিনা ফের বলেছিলেন, একটা কথা তোকে বলি, একটা অনুরোধ, রাখবি, তুই রাখবি, এ সংসারে তোরা চেয়ে বেশি ভরসা আর কারওকে করি না।

এ-ও আনিসুজ্জামানের কাছে এক বিস্ময় যে চিরকাল সংসার থেকে আলগা হয়ে থেকেও কী করে তিনি এমন এক ভরসাস্থল হয়ে উঠলেন। হয়তো এতে তাঁর কোনও কৃতিত্ব ছিল না। আমিনা তাঁকে গভীর স্নেহ করতেন বলেই হয়তো গভীর ভাবে বিশ্বাসও করতেন। তখন এত কিছু বোধার অবকাশ ছিল না। এক বিষহস্তার মধ্যে থেকে তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ, বলা, তোমার কথা নিশ্চয়ই রাখব।

সে-দিন আর বলেননি আমিনা। পরে বলেছিলেন। আনিসুজ্জামান রিপন স্টিটের বাড়ি ছেড়ে আসার এক বছরের মাথায় তাঁর ইন্তেকাল হয়। আর তার এক বছরের মাথায় মনিরুল ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ররা পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা ও সম্পত্তি ভাগাভাগি করে আলাদা হয়ে যান।

সেই সময় মনিরুল একদিন ডাকলেন আনিসুজ্জামানকে। বললেন, তুমি নাকি বাড়ি ছেড়ে যাবে সুনদাম।

আনিসুজ্জামান সম্মতি জানালেন। সেই সঙ্গে তাঁর চোখ এড়াল না যে খুবই পরিশীলিত দেখাচ্ছে মনিরুলকে। দাড়িতে মেহেন্দি করেছেন। জামায় সোনার বোতাম। টুপির চাকচিক্য বেড়েছে। নিপুণ করে গোঁফ কামিরেছেন। গায়ে বিদেশি সুগন্ধী আর চোখের তলায় পুরু সুরমা।



মজা পেয়েছিলেন আনিসুজ্জামান। মনিরুলের বার্ষিক সমাগত। অনেক পুণ্যই এ সময় বেশবাসে মন দেন। যৌবনের ক্ষয় চাকচিক্যে ঢেকে রাখা উদ্দেশ্য। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে-মজা আর থাকে না যখন মনিরুল বলেন, শুনেছ বোধহয়, আমি আবার নিকাহ করব।

—আপনি।

আনিসুজ্জামানের বিশ্বয় ও তাঁর রাগ। গোপন করতে পারছেন না তিনি। সংকট হতে পারছেন না। বলছেন, আপনি। হঠাৎ! এই বয়সে।

তাঁর শ্রেয় প্রকাশিত। মনিরুল তার প্রতি বিন্দু ঘরতে পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তর সত্যি সহজ ছিল, যা আনিসুজ্জামানের কানে এসেছিল অতি নির্ভর প্রবাহে।

—নিকাহ করার কোনও বয়স আছে বলে তুমি মনে করো বাকি? আর বাহাম বছর গী এমন। তোমার বড় চাচিকে যখন আমি এনেছিলাম তখন আমার বয়স বাইশ। বর্তমানে তোমার ছোট চাচি আসেন। এর মধ্যে আরও কয়েকটি নিকাহ করতে পারতাম আমি। কারণ তোমার দুই চাচিই দু'রকমভাবে অসুস্থ। কিন্তু করতে পারিনি। এখন আর আমার কোনও সংশয় নেই।

আনিসুজ্জামান মনে মনে আতর্জন করেছিলেন, হায় চাচু। হায় তোমার ইচ্ছা। কী আশ্চর্য। ত্রিশ বছর ধরে দাম্পত্য পালন করেও তোমার কামনা নির্বাপিত হয়নি। দু'জন নারীকে নিঃশেষে ভোগ করেও তৃপ্তা মেটেনি। হায় চাচু। হায় হায়!

কিন্তু তখনও বাকি ছিল। মনিরুল বলেছিলেন, হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে আমি নিজে থেকে এ প্রস্তাব উত্থাপন করিনি। খানিকটা তোমার জন্যই, কথা রাখতে আমাকে মত দিতে হয়েছে।

—কীরকম।

—তোমার জন্য একজনকে আমি প্রায় নির্বাচন করে ফেলেছিলাম। এখন, সেই মেয়েটির পিতা, দরিদ্র দুর্ভাগ্য মানুষ, আর কিছুতেই সম্পর্কের সম্ভাবনা হারাতে রাজি নন। তা, তোমার অন্য সব ভাই, যারা বয়ঃপ্রাপ্ত, সবার শাদি হয়ে গেছে। তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কালের হাওয়া। তারা কেউই দ্বিতীয়বার নিকাহ করতে রাজি নয়। আরে, তোরা দুটো-তিনটে নিকাহ না করলে মেয়েরা যে বিপদে পড়ে তা ভাব। তাই, শেষ পর্যন্ত আমাতেই ...।

—বাঃ চমৎকার। গল্পে-উপন্যাসে আছে বটে— বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের জন্য পাত্রী দেবিতে গেলেন। তাঁহার আর পলক পড়ে না। শেষ পর্যন্ত আপনি দার পরিগ্রহ করিয়া... মনিরুলের স্বর বিকৃত হয়। তাঁর ঞ্জ কোঁচকায়। বলেন, তুমি আমাকে হিন্দুর সঙ্গে তুলনা দিচ্ছ। জানো ওদের এক-একজন একশোটাও বিবাহ করত। গ্রামে গ্রামে স্ত্রী। খাতা রাখত সিকানা মনে রাখবার জন্য।

—হ্যাঁ। জানি। কৌলীন্যধর্ম পালন করে পুণ্য করতেন তাঁরা।

মনিরুল লাল দাড়িতে হাত বুলিয়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকে তৃপ্তি গড়িয়ে পড়ছিল।

আনিসুজ্জামান, গভীর ও তিক্ত স্বরে বলেছিলেন, আপনি কি এ সব বলবেন বলেই আমাকে ডেকেছিলেন?

মনিরুল বলেছিলেন, কিছুটা তাই। কিন্তু আমার অন্য কথাও ছিল।

—সেটা কী?

—সুনলাম তুমি চলে যাবে। যদিও তুমি ব্যবসাপত্র দেখো না তবু তোমার এই ব্যবসায় অন্য সবার মতো হক আছে। কারণ এই সবই ভাইজানের হাতে গড়া। তোমার অনেক প্রাপ্য আছে। আমি বুঝতে পারছি ব্যবসা আর একসঙ্গে রাখা যাবে না। ভাগভাগি হবে।

আনিসুজ্জামান চমকে গিয়েছিলেন। একই কথা বড়চাচিও বলেছিলেন সে-দিন। আশ্চর্য। তিনি নিজে ভাঙনের কোনও শব্দই পাননি।

মনিরুল বলেছিলেন, তোমার ভাগ তোমাকে দিয়ে দিতে চাই। আমি মুখার্জিবাবুকে বলেছি। তিনি আমাদের সমস্ত সম্পত্তির হিসেব তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন। তুমি তোমার অংশ বিক্রি করে টাকা নিতে পারো অথবা নিজের মতো ব্যবসা করতে পারো। যা ভাল বুঝবে।

অনিসুজ্ঞামান এ সবেৰ জনা তৈৰি ছিলেন না। ভাত্ৰনৈৰ কথায় তাঁৰ কই হ'ছিল। আকাঙানৈৰ হাতে গড়া আৰু কিছুই রইল না। কথা না বুলে তিনি মূৰ মিটু কৰে বসেছিলেন। মনিৰুল বলেছিলেন, তুমি খুবই আবেগপ্ৰবণ এবং তোমার বিষয়বুদ্ধি তেই। বোকাৰ মতো বলে বোসো না যে তোমার কিছু চাই না। মাস্টারি কৰে ক'পয়সা পাওঁতা ঘাৰ সে-খোঁই আমি নিয়েছি। একটা বড় অসুখ কৰলে ওখুধ কেনাৰ সামৰ্থ্য থাকবে না তোমাৰ। তাই সম্পত্তিৰ অংশ তুমি নিতে না চাইলেও আমি জোর কৰে দেব। একেত্রে মেঠো, তোমাৰ কোনও কথাই আমি শুনব না।

সেই প্ৰথম, অতি সামান্য সময়ের জন্য হলেও মনিৰুলকে অন্য চোখে দেখেছিলেন অনিসুজ্ঞামান। কী কৰতে পাৰতেন তিনি যদি এখটি শয়শাও তাঁকে না কেওতা হ'ত। এবং হয়তো সেই মুহূৰ্তে সম্পত্তিৰ ভাগ না নেবাৰ কথা সত্যি তিনি ভেবেছিলেন। মনিৰুল তা টিৰ পেলেন কেমন কৰে। তাঁৰ মধ্যে কি সত্যি সেই দৃষ্টি আছে যা মানুখৰ অন্তঃস্থলে পৌঁছায়। অনিসুজ্ঞামান বলেছিলেন, খানিক বিহ্বল হয়েই, আমি সম্পত্তিৰ কিছু বুঝি না।

মনিৰুল সঙ্গহ হেসে বলেছিলেন, সে আমি জানি।

—আমি কাগজপত্ৰ, হিসেব কিছুই বুঝতে চাই না।

—বেশ। তোমাৰ তবে কী বক্তব্য?

—আমি জানি না। ব্যবসা আমি কোনওদিনই কৰব না। একেত্রে আপনি যা ভাল বুঝবেন, যা কৰবেন, আমি তাই মেনে নেব।

—এই প্ৰথম, মেঠো, এই প্ৰথম তুমি কোনও বিষয়ে আমার শুভবুদ্ধিৰ প্ৰতি নিৰ্ভৰশীল হলে। আজ আমার খুবই আনন্দেৰ দিন। তুমি চলে যাচ্ছ। একে একে হয়তো আৰুও অনেকে চলে যাবে। আমি তাৰ গছ পাচ্ছি। তোমাৰ বড়চাচি পঞ্চাশ পেরুতে না পেরুতেই পঞ্চাষাতগ্ৰস্ত। তোমাৰ ছোটচাচি এত রুগ্ণ, এত দুৰ্বল যে সন্দোৱেৰ হাল ধৰাৰ সাধাই তাঁৰ নেই। ভাত্ৰনও তাই অনিবাৰ্য। অন্তৰে ভাত্ৰন লাগলে বাইরেটা কেমন কৰে ঠেকাব। তুমি যেতে চাইছ, যাও। আমি আটকাব না। শুধু জেনো, তোমাকে আমি নিজের সম্মাননেৰ থেকে একটুও আলাদা কৰে দেখিনি। তোমাৰ কোনও প্ৰয়োজনে আমার কাছ আসতে দিখা কোৱো না।

অনিসুজ্ঞামান দেখেছিলেন মনিৰুল কাঁদছেন। এক সংক্ৰামক ব্যাধিৰ মতো অনিসুজ্ঞামানেৰও কণ্ঠ ভাৱী হয়ে এসেছিল সে-দিন। মনিৰুল বলেছিলেন, ভাইজানেৰ কথা খুবই মনে পড়ে সবসময়। আকাঙামনেৰে ভুলে গেছি। ভাইজানই আমার সব ছিলেন। তাঁৰ সঙ্গ আমাৰ মতে মেলেনি। কত ছেলেমানুবি কৰেছি। বোকাৰি কৰেছি। তিনি সব ক্ষমা কৰেছেন। আজ মনে হয়, তিনিই ঠিক ছিলেন। আমি বুঝতে পাৰিনি। তাঁৰ মেহ, বৈৰ্য, ক্ষমা—এতদিন সব ধৰে রেখেছিল। নইলে এতদিন কিছু ফল না, আজ সব ভাঙতে চায় কেন?

অস্থিৰ কাম্মায়, তাঁৰ পক্ষে খুবই অস্বাভাবিকভাবে, ভেঙে পড়েছিল মনিৰুল। অনিসুজ্ঞামান তাঁকে জড়িয়ে ধৰেছিলেন। আকাঙানৈৰ প্ৰসঙ্গে ও প্ৰশস্তিতে তাঁৰও কান্না পাচ্ছিল। পৰিবাৰেৰ সকলে অবাক হয়ে দেখেছিল সে-দিন। যে-দৃশ্য আখ্যাতৰুজ্ঞামানেৰ ইন্তেকালেও ঘটানো যায়নি, সে-দৃশ্যই রচিত হয়েছিল তাঁৰ স্মৰণে। আৰু সাৰা পৰিবাৰ, এমনকী মনিৰুল ও অনিসুজ্ঞামানও ভেবেছিলেন এই শেষ। আৰু কোনওদিন তাঁদেৰ মধ্যে তৰ্ক হবে না। তিস্ততা জন্মাবে না। কিন্তু আবার সব ফিৰে এসেছিল। বাৎসৰিক কালবৈশাখীৰ মতো কিংবা বসন্তৰোগেৰ মতো। ফিৰে এসেছিল নীলোফাকে নিয়েই।



খুবই কুষ্ঠার সঙ্গে ভীতভাবে সে বলেছিল, আমি নীলোফ। হাতে পারে এই ক্রমা বা ভীতি সে ক্রমে অর্জন করেছিল, কিংবা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার ওপর, কারণ এটা ঠিক যে তার জিয়ন কারও অভিপ্রেত ছিল না। সে ছিল এক ব্যক্তি বা ফান্টু, আর ব্যাচায় চেয়ে বড় অপকর্ম আর কিছুই ঘটতে পারত না।

কোনও ব্যক্তি নয়, কোনও বিধান নয়, সামগ্রিক পরিস্থিতি তাকে ওইরকম করে তুলেছিল।

অনিসুজ্ঞামানের মনে আছে, ছোটবেলায় ফরসা ও ফুটফুটে ছিল নীলোফা। পুড়ে গেল একদিন। খেলতে খেলতে। না বুঝে। সব সৌন্দর্য পুড়ে গেল। পৃথিবীর সব মানুষই প্রায়, না বুঝে, খেলতে খেলতে পুড়ে যায়। বলসে যায়। সে হল অন্তরে পোড়া। নীলোফা বাইরে পুড়েছিল, তাই অন্তরেও। সে-দিন পুড়তে পুড়তে যে তীব্র চিংকার সে করেছিল, আর অজান হয়ে গিয়েছিল, সে-চিংকার, তার জ্ঞান হওয়া ও বাড়তে থাকা পর্যন্ত আর থামেনি।

ঘটনাটি যখন ঘটেছিল তখন অনিসুজ্ঞামান স্কুলের শেষের দিকে। ইলেভেনের শেষ প্রান্ত। পুরুষ হয়ে ওঠেননি। মানুষ হয়ে ওঠেননি। দায়িত্বশীলও নয়। শুধু কৈশোরের উপাঙ্গে পৌঁছে মনে মনে অশান্ত চিংকার। আর নীলোফা যখন পুড়েছিল তখনও গৃহে কোনও পুরুষ ছিল না। আখবাজান নয়, মনিরুল নয়, ফিরোজ, মকবুল—কেউই নয়। সম্পূর্ণ পুরুষবিহীন অবস্থায়, বলা যেতে পারে অভিভাবকহীন অবস্থায় পুড়ে যাবার অপরাধে নীলোফাকে অন্তত তিন ঘণ্টা ছোটা আলুর তত্ত্বাবধানে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। আর তাতে তার চামড়াগুলি গুটিয়ে দলা পাকাবার যথেষ্ট সময় পায় এবং তাকে বিকৃত করে তোলে অতি সহজেই।

ওইটুকু মেয়ে তখন নীলোফা, হয়তো পাঁচ, ষাটের বোধ তার লুপ্ত হয়েছিল। কারণ ওই যন্ত্রণা সহ্য করা কোনও মানুষের কর্ম নয়। আর নীলোফা হয়তো-বা মানুষই ছিল না। দলা পাকানো ত্বক-মাংসের পিণ্ডের তলে হয়তো-বা দানবশিশু তখন। সঞ্জিদা তার ছোট শিশুটির কাছে নীলোফাকে বসিয়ে রেখে বুকি-বা কোনও কাজে গিয়েছিলেন। আর বোনের কাছে বসে থাকতে থাকতে নীলোফার মনে হয়েছিল, বোনের যত্ন সেও দিকি নিতে পারে। কারণ সে অনুপম্বা নজর করতে থাকে কীভাবে দুধ গোলা হয় আর বোতলে পুরে ধরা হয় শিশুটির মুখের কাছে। সঞ্জিদা অসুস্থ ও ক্ষীণ। যথেষ্ট দুধ নেই শরীরে। তাই বোতলে দুধ নিয়ে শিশুটির মুখে ধরা। সে দুট্টমি করে মাঝে মাঝে মুখ সরিয়ে নেবে আর তখন বোতলের শেষপ্রান্ত তার পাতলা লাল দুটি ঠোঁটে পুরে দিতে হবে। এ ছেন শিশু কৈদে উঠেছিল আর নীলোফার মনে হয়েছিল, এই তো খিদে পেল ওর, আর দুধ গোলার সময় হল। মাঝরাত্রে দুধের ব্যবস্থা করার জন্য ঘরেই স্টোভের ব্যবস্থা রেখেছিলেন সঞ্জিদা। আর নীলোফা খুবই পরিণত বুদ্ধি সমেত তাতে জল বসাবার নিমিত্ত আগুন দিয়েছিল। এরপর কী হয়েছিল কেউ জানে না। নীলোফাও বলতে পারেনি। হয়তো তেল চুইয়ে থাকবে, হয়তো স্টোভ যথাযথ পরিকৃত ছিল না বা ফিতেগুলি অসমান ছিল। কারণ বাই হোক, দাউ দাউ জ্বলেছিল সেটি আর নীলোফার পরিধানে কৃত্রিম গোলাপি পশমের জামা স্পর্শ করেছিল। তার বুক বরাবর আগুন লাগে আর নিমেষেই তা অস্থির ও আগ্রাসী হয়ে যায়। ভয়ে যন্ত্রণায় দিশেহারা নীলোফা জ্বলন্ত আবস্থায় ছুটে যেতে থাকে বারান্দা বরাবর। কেই-বা তাকে দেখতে পেয়েছিল আর কেই-বা তার আগুন নিভিয়েছিল আজ আর কারও মনে নেই। সকলেই আশ্বস্ত হয়েছিল এ কারণে যে সে-দিন স্টোভ থেকে সারা

বাড়িতে আগুন লাগলে পারত বা ছোট শিশুটিও মারা যেতে পারত, কিন্তু তা হয়নি। নীলোফা একা পুড়েছিল। পুড়ে গেল আর কলসে গেল। তার পেট খেঁচে গলা পর্যন্ত কদম গোলপাি রেশমের জামা গলে আটকে রইল। সারা দু'ব আঙনে গলিত মণ্ড হল। নাকের সঙ্গে ঠোঁট আটকে গেল, গালের সঙ্গে কান। শীত মাংসে চোখের তলায় টান পড়ল। চোখ অন্ধত এবং কপাল পুড়ল না এবং নীলোফাও বেঁচে রইল। বেঁচে থাকল। কিছুইই মনে পোলে না।

ছ' মাস হাসপাতালে কাটিয়ে যখন সে ঘিরে এল তখন আর মানুষ নেই। মানুষ রইল না। দানবশিশু সেই, বা দানবশিশুও নয়। প্রাগৈতিহাসিক কোনও প্রাণীর মতো কার চিকিৎসা থেকে গলা পর্যন্ত মাংসপিণ্ড কুলে রইল। বৃকের মাংস-ত্বক দু'মতে মুচড়ে স্বাভাবিক সংকোচন প্রসারণের উপায় রাখল না। দৃষ্টিশক্তি রাখলেন খোদা। কপাল রাখলেন। ডুল। শ্বাস প্রশ্বাস। শুধু চোখের তলায় টান—তাই চোখের পাতা পুরোপুরি বন্ধ হয় না। অগ্নে জ্বাখ তরলে জমার উপায় নেই। গালে পড়লে সে-পথ আঁকাবাঁকা। উষ্ম ভূমির মতো উঁচু-নিচু। বাহুগুলি বলসেছে বটে আর ত্বকও কঁচকেছে, কিন্তু সেগুলি কর্মক্ষম আছে। বৃকের চামড়া গুটিয়ে গুটিল পাকিয়ে বাওয়ায় চলনে শিঁপাঞ্জি সদৃশ বোদুল্যমানতা, কিন্তু উদর ও তারও নিম্নবর্তী দেহভাগ অটুট। আর প্রত্যেকেই খোঁজ ভেমনই যেমন বাসাবাড়ি পুড়ে গেলে ছাই ঘেঁটে দেখা—কিছু অবশিষ্ট রইল কি না। নিটোল-নিটুট রইল কি না।

হাসপাতালে বড়রা তাকে দেখতে যেত এবং শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয়নি। প্রত্যেকেই সারাক্ষণ তার মৃত্যু কামনাই করেছিল। তবু নীলোফা ঘিরে এল এবং ছোটরা তাকে দেখে ভয়ে চিংকার করে লুকিয়ে পড়তে লাগল। নীলোফার গায়ে বোরখা উঠল আর আনিসুজ্জামান নীলোফা-দর্শনে বাথরুমে গিয়ে দরজা দিলেন। বমি করলেন। বমি করতে লাগলেন আর বেসিনের ফুটো বন্ধ হয়ে গেল। তিনি, কারওকে কিছু জানবার অবকাশ দেবেন না এই সংকল্পে একটি কাঠি দিয়ে খোঁচাতে লাগলেন যাবতীয় উগরে দেওয়া বস্তু। যেন নিজের ভেতরকার সমস্ত অপরিষ্কৃত ব্রব্য তাঁর সামনে এসে গেল এমনই বোধ করছিলেন তিনি তখন। আর খোদা, হয়তো ওই ক্ষমাহীন বমনের অপরাধে শ্বেতরোগে কুণ্ঠিত করে তুললেন আনিসুজ্জামানকে। তবু, মনে মনে স্বীকার করেন তিনি, আনিসুজ্জামানের চেয়ে সুখী সে-মুহুর্তে আর কেউই নেই, কারণ, তাঁকে নীলোফার মতো মুখ ঢাকতে হয় না। নড়াচড়া হাসিকান্নায় তাঁর কোনও অসুবিধে নেই।

—নীলোফা! নীলোফা তুই কেমন আছিস?

আনিসুজ্জামানের মনে পড়ল দীর্ঘদিন নীলোফার খোঁজ নেওয়া হয়নি। সে কী করে বড় হল আর কী করে এখন এসে দাঁড়াল দরজায়। সে কত বছর—দশ-এগারো—নীলোফা সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কোনও মুহুর্ত মনে আসছে না, আর আনিসুজ্জামান অপরাধী হয়ে উঠছেন নিজের কাছে। হ্যাঁ, এ খবর তাঁর কাছে আছে যে এই দশ-এগারো বছর নীলোফা বছরে দু'বার হাসপাতালে গেছে আর অল্প অল্প করে তার বিকৃতি অপনোদনের চেষ্টা হয়েছে। প্রথমে বৃকের চামড়া কেটে-কুটে তার চলনকে স্বাভাবিক প্রকরণ দেওয়া হয়েছিল। তারপর নাকের নীচ থেকে ঠোঁটের ওপর খুলন্ত মাংসপিণ্ডটা বাদ দেওয়া হয়। কানের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয় গাল এবং নীলোফা এত বছরে, সাধনার মতো বেঁচে থেকে লাভ করতে থাকে—স্বাভাবিক উচ্চারণ, স্বাভাবিক গতিতে সোজা মানবিক হেঁটে যাওয়া। তবু, আজও তাকে অসহনশপাই বলা যায়, যা সে সারাক্ষণ আবৃত রাখে। অন্দরেও সে বোরখা তোলে না এবং এই দুর্ভাগ্যকে শ্বেতের সঙ্গে মেনে নিতে নিতে সে দেখেছে আগুন তার অঙ্গে কিছু বাড়তি জীবন দিয়ে থাকবে যাতে সে কখনও রোগাক্রান্ত হয় না এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তারও মধ্যে রোমেলি বসন্ত আসে।

আনিসুজ্জামান গভীর প্রার্থের সন্ধান করেছিলেন। নীলোফা! কী নিয়ে আছে ও। কী নিয়ে থাকে। অন্য মেয়েদের মতো ওর বিয়ের স্বপ্ন থাকতে নেই, পুরুষের প্রতি আকর্ষণ থাকতে নেই।

সবাই পুতুলখেলা খেলতে খেলতে সংসার গুছানোর ছাতেখড়ি সম্পন্ন করে। নীলোফা কী করে।

বিছানায় বইয়ের স্তুপ হয়েছিল। সে-সব এ দিকে ও দিকে সরিয়ে নীলোফাকে বসার জায়গা দিয়েছিলেন আনিসুজ্জামান। নীলোফা খুব সংকোচের সঙ্গে বসেছিল। নেবখার মুখ ঢাকা ছিল বলে আনিসুজ্জামান অভিব্যক্তি বুঝতে পারেননি। কিছুক্ষণ চুপ করে বাসন পূর্ণ হলে বলেছিল, আপনি তবে সত্যি যাচ্ছেন, ভাইজান?

আনিসুজ্জামান বই গুছাতে গুছাতে বলেছিলেন, হ্যাঁ রে, যাচ্ছি।

নীলোফা নীরবে বসেছিল। তিনি ভেবেছিলেন এটাই স্বাভাবিক যে একে একে সবাই এসে দেখা করে যাবে আর একই প্রশ্ন করবে, সত্যিই তিনি যাচ্ছেন কি না। ফেন-বা এ দিনই সন্ধ্যা মনে পড়বে তাঁর চলে যাওয়ার খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কথা। যদিও এ বাড়িতে তিনি আসতেই পারবেন যখন তখন কিন্তু একত্র বসবাস না করলে আর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকে হয় না। পরিবার থেকে বিদায় নেবার অস্তিম পর্ব আজ সমাধা হতে চলল। এই বইগুলি ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেবার নেই তাঁর। আবতাসুজ্জামানের গাড়িখানা মনিফল তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি নেননি। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল গাড়ির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা মাশেপে সেটি মনিফলেই করায়। গাড়ি নিয়ে কী করতেন আর তিনি। সম্পত্তির বিনিময়ে যে-অর্থ তিনি পেয়েছেন তার দৌলতেই মাধুরের গাড়ের এই ফ্লাটা। এখান থেকে কলেজ পনেরো-কুড়ি মিনিটের ইটা পথ। রিকশায় ছ' মিনিট। গাড়ি রাখার কামেলাও বিস্তর। আনিসুজ্জামান মূলত পড়ুয়া ও চিন্তাবিদ। পড়া বা লেখার বিষয়ে প্রয়োজন এমন কিছু ছাড়া অন্য কাজে তাঁর উৎসাহ জন্মায় না। যদিও ওই গাড়িই তাঁকে এবং তাঁর বইগুলিকে মাধুরের গাভে পৌছে দেবে। একবারে তা সম্ভব কি না এ কথাই ভাবছিলেন আনিসুজ্জামান।

নীলোফা বলল, ওখানে কে থাকবে আপনার সঙ্গে ভাইজান?

—আমি একা থাকব নীলোফা।

—আপনার রান্না করে দেবে কে, আর কাপড়জামা কে কাচবে, অন্যান্য কাজ?

—হঁ। সে এক সমস্যা। লোক-টোক রাখব। কিন্তু তুই বেশ অনেক দূর ভেবেছিস নীলু! পাকা গিন্নি একেবারে। চাটরা এইসব আলোচনা করেছেন আর তুমি সব শুনেছ, তাই তো?

নীলোফা মাথা নিচু করেছিল। তারপর খুব আশ্বে, প্রায় একলা উচ্চারণের মতো বলেছিল, আপনি কখনও কিছুই করেননি ভাইজান। আমার মনে হয়, আপনি এ-ও জানেন না কী করে উনুন ধরাতে হয়। কী করে সৌভ জ্বালে। কাজের লোকের ওপর নির্ভর করে আপনি বাঁচবেন কী করে ভাইজান? তার চেয়ে আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন? ভাইজান? আমি আপনার রান্না করে দেব। কাপড় কেটে দেব। বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার— মোট কথা একটা লোক যা যা করে...

আনিসুজ্জামান তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, পাগল!

কিন্তু নীলোফা সে-কথা শুনতে পায়নি। সে উত্তরের অপেক্ষা করছিল আর আনিসুজ্জামান ভাবছিলেন— কী বলে মেয়েটা? মজা করছে? এ পরিবারে আনিসুজ্জামান সমস্ত ফাজলামো ইয়াকি ও মজার বাইরে। তা ছাড়া নীলোফার সঙ্গেও তাঁর কোনও মোলামেশা ছিল না। তাঁদের বয়সও অদূর নয় যে নীলোফা দুটি হালকা বেচাল কথার ঝুঁকি নিতে পারে। সূতরায়, আনিসুজ্জামান, তাঁর পাশে এক গভীর পরিস্থিতিতে, যেহেতু তা দুর্বোধ্য, বললেন, নীলোফা আমি ব্যস্ত। এ সব ফালতু কথা শোনার সময় এটা নয়। তুমি চলে যাও।

নীলোফা, হয়তো-বা এই গভীরবে, হয়তো দীর্ঘললিত অসহায়বোধের তাড়নায় প্রায় কান্নায় প্রায় হস্তগায় বলেছিল, আপনি না বলবেন না ভাইজান। না বলবেন না। আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।



আনিসুজ্জামান সব কাজ ছেড়ে ত্রয়ার টেনে নীলোফার মুখোমুখি বসেছিলেন। কোনও কোনও সময় মানুষের স্বপ্ন, উচ্চারণের চেয়েও অনেক বেশি কথা বলে দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পারা যায় অবরুদ্ধ বাষ্পের ঘনত্ব। নীলোফার স্বপ্ন আনিসুজ্জামানকে একটি অসহায় বিধবাপ্রাপ্ত অনুভবে ঠেলে দিয়েছিল। কী বলা উচিত, করা উচিত, কিছুই তার বোধগম্য হয়নি। তবু বলেছিলেন, এরকম বলতে নেই, নীলু।

—কেন?

—তুই আমার সব কাজ করে দিবি কেন? নিজের জন্য একজন লোক রেখে নেই আমি, কেমন?

নীলোফা বোরখার আড়ালে গলার ভেতর ঘোঁষাছিল তখন। বসেছিল, আমি করে দিলে কী হয়। ভাইজান! এ বাড়িতেও তো সব করি আমি। করি না?

—আচ্ছা বেশ। তা করিস। কিন্তু কাজের জন্য আমার সঙ্গে যাবি, তা কী করে হয়।

—কাজের জন্য নয়।

—তা হলে? কীসের জন্য? কেন আমার সঙ্গে যেতে চাস নীলু?

একটা কান্নার শব্দ ছিটকে বেরিয়েছিল তখন। কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য। নীলোফা কিছুটা ধরা গলায়, কিন্তু খুব শাস্তভাবে, যেন-বা সে আগে সব ভেবে রেখেছে, বলেছিল, এ বাড়িতে আর থাকতে ইচ্ছে করে না, ভাইজান। আমাকে কেউ ভালবাসে না। আমি, আবু, চাচি, ভাইরা, ভাবিরা— কেউ না। এমনকী বাচ্চাগুলোও আমার কোলে আসে না। আমি কুজ্জিং। আমি পোড়া। আমি এ বাড়ির বোকা, না ভাইজান? কিন্তু আমি কী করব। আমি যে পুড়ে মরে যাইনি, বেঁচে ফিরে এসেছি, সে কি আমার দোষ?

আনিসুজ্জামান নীলোফার জন্য সহমর্মিতা বোধ করেছিলেন। এবং, সাঙ্ঘনা দেবার যা সহজতম উপায়, তাই অবলম্বন করে বলেছিলেন, না। প্রোমার দোষ কেন হবে? কিন্তু কেউ তোমাকে ভালবাসে না এ কথা কেন বলছ? তুমি যাতে একটু সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে ওঠো তার জন্য তো বাড়ির লোক কম চেষ্টা করেননি, বলো?

—হ্যাঁ। করেছেন।

—তবে? কেউ ভালবাসে না, এ কথা বলতে নেই।

—কেন বলব না, ভাইজান? আমি সবসময় বলে, মরে গেলি না কেন? পুড়লি যদি তো মরলি না কেন? পাপ, পাপ, জঘন্যপাপ। হে খোদা, কী কনাই করেছিলাম যে আমার মেয়ে এরকম হল! অবজ্ঞান আমাকে দেখলেই চটে ওঠেন। আমি সামনে গেলেই বলেন, এই পোড়া কয়লাটাকে এখানে পাঠিও না। বড় আশ্চর্য আমাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেয়। একটু পড়তে বসি যদি, একটু বইয়ের পাতা ওটাই, বলবে, রাখ, অনেক হয়েছে। পড়লেও কিছু বেহেস্তে যাবি না। এমন কপাল পুড়িয়ে এসেছিস যে কুষ্ঠরোগীও তোকে ছোঁবে না। গভর না বটালে আমরা যখন চোখ বুজব ভাবিরা লাথ মেরে বার করে দেবে। যে যা বলে, যে কোনও কাজ, আমি করে দিই ভাইজান। আমাদের বাড়িতে কাজ করতে যে-মেয়েটা আসে, হামিদা, ওর যা বলার সাহস আছে, আমার তা নেই। আমি লজ্জা পর্যন্ত বেটে দিই জানেন। ভাবিরা আমাকে দিয়ে বাচ্চার নোংরা কাঁথা কাচার। কেন, ভাইজান, কেন? কই, আর কেউ তো করে না? আমিকে বললে বলে, কাজ করে জন্মের আগ শোধ তো করতে হবে। ভাইজান, কোনও উৎসবে অনুষ্ঠানে যখন ঘাই, আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না কেউ। এই সে-দিন, ফরিদাদিদির বিয়ে হল, আমরা গেলাম, সকলে ফরিদাদিদিকে ঘিরে বসে আছে, আমিও বসলাম, ওমনি আসর ভেঙে যেতে লাগল। বড় আশ্চর্য বলল, তুই এখানে কেন, নীলু? তুই যা। যেখানে-সেখানে ছুট করে চলে যাবি না। মনে রাখবি তুই অপয়া। সবার সামনে বলল, ভাইজান, আর আমার মরে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু আমি সত্যি সত্যি মরতে চাই না। আমাকে মেরে ফেলাই যদি খোদার ইচ্ছে হয় তবে



আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে কেন?

আনিসুজ্জামানের চোখে জল আসছিল। নীলোফা, সে ধনীর দুলালী, যার খাওয়া-পরা-আশ্রয়ের অভাব নেই, সে প্রকৃত অর্থে কতখানি নিঃসহায় তা তিনি বুঝতে পারছিলেন। হয়তো-বা, যে-কারণে আনিসুজ্জামান নিজে পালাতে চান সে-কারণে নীলোফাও পালাতে চায়। কিন্তু সে এক অসম্ভব প্রস্তাব করেছে। এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার তিনি কেউই নন। নিজেকে তাঁর নীলোফার মতোই অসহায় লাগছিল, কিন্তু তিনি এমনও ভেবেছিলেন যে নীলোফা, ষোলো-সতেরো বছরের মেয়েটি, কী সুন্দর করে ভাবতে শিখেছে, বুঝতে শিখেছে। হয়তো সমস্ত সৌন্দর্যগরিমা ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত বলে তার অনুভবগুলি এত তীব্র। এই দশ বছরে, এমন কঠিন ব্যবহারে সে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারত, ভোঁতা হয়ে যেতে পারত, ভাবতে পারত এ সবই তার পাওনা, কিন্তু ভাবেনি। মনে মনে একটি অবাধ উদার মুক্তির প্রতীক্ষা করেছে। সে মুক্তি অনিশ্চিত জেনেও নির্ভর অন্ধকার মৃত্যুর কাছে তা প্রার্থনা করেনি। এত বঞ্চনা সত্ত্বেও নীলোফা জীবনকে ভালবেসেছে— এ বড় কম কথা নয়! ওই দুই পোড়া দৃষ্টিতে আনিসুজ্জামানের কাছে নতুন উজ্জ্বল এসেছিল। সেই উজ্জ্বলে আমিনা আর সঞ্জিদার মুখ। আমিনা যখন আনিসুজ্জামানকে— মেঠা— বলে বুকে আঁকড়ে রাখেন তখন তাঁর মাতৃহে কোথাও সন্দেহ জাগে না। এই মাতৃত্ব আনিসুজ্জামানে বর্ষিত হল, নীলোফাতে হল না কেন? নীলোফা মেয়ে বলে! তার কোনও গতি নেই বলে! সঞ্জিদার ওই মৃত্যু-কামনা— তার মধ্যেও কি নিকৃষ্ট স্বার্থপরতা নেই। অথবা, নীলোফার প্রতি আমিনা ও সঞ্জিদার এই ব্যবহার হয়তো বিপন্নতারই অন্য প্রকাশ। নীলোফার অসহায়তা ঘোচাবার কোনও উপায় তাঁদের নেই বলে তাঁরা নিজেদেরও সমান অসহায় ও অভিষপ্ত জ্ঞান করেন যা ওই কঠিনভাবে বর্ষিত হয়।

আনিসুজ্জামানকে চুপ করে থাকতে দেখে নীলোফা বলেছিল, আমি তো দোষ দিই না ভাইজান। আমি তো এমনিতেই কত কষ্ট! বড় আত্মা সবসময় ধমকায়। আকবাজান বকে। আমার জন্য আমার কষ্ট আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু আমারও তো কোনও দোষ নেই। আমি তো এভাবে আমাকে জন্ম দেয়নি। সত্যিই, আমিই অপয়া, আমার মুখ আমিকেও দেখাই না আজকাল।

বোধহয় সে-দিন কথায় পেয়েছিল মুখচোরা, অবহেলিত নীলোফাকে। বন্ধ শ্রোতের মুখ একবার খুলে দিলে যা হয়।

আনিসুজ্জামান আবার বলেছিলেন, আমার সঙ্গেই যাবার কথা তুই ভাবলি কেন? আর কোথাও নয় কেন?

নীলোফা বলেছিল, আর কোথায় যাব? আর তো যাবার জায়গা নেই। আপনি যদি এ বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি না করতেন তা হলে অন্য জায়গায় যাবার কথা আমি ভাবতেও পারতাম না। অন্য কোথাও চলে গেলে এ বাড়ির বোঝা হালকা হবে। আমার কথা আর কেউ ভাববে না। কাজ তো আমি এখানেও করি, ওখানেও করব। আর আপনার ঘর সামলাবার জন্য একজন তো সত্যি দরকার। আপনি তো নিজে কিছুই করতে পারেন না ভাইজান। খাবার না দিলে খান না। রাত্রে বই খোলা রেখে আলো জ্বলে ঘুমিয়ে পড়েন। পেন হারিয়ে ফেলেন। ঘড়ি নিতে, পার্স নিতে ভুলে যান। আপনাকে দেখাশুনা করার জন্যও একজন দরকার।

আনিসুজ্জামান একটু থমকে গিয়েছিলেন। এতখানি জানল কী করে নীলোফা! হয়তো আসতে যেতে লক্ষ করেছে। আকস্মিক ভাবনা ও অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে মাথায় চাপ অনুভব করছিলেন তিনি। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বা আজন্মালিত বোধের প্রেরণায় নিষ্ঠুরের মতো বলে ফেলেছিলেন, ধর, তুই গেলি আমার সঙ্গে নীলু, বেশ ঘর-সংসার সামলালি, আর আমি একখানা বিয়ে করে তোর ভাবি নিয়ে এলাম। আর তোর ভাবি তোকে সহ্য করতে পারল না। তখন কী হবে, তখন!

নীলোফা চুপ করে ছিল। তারপর বিষয় প্রলায় বলেছিল, 'ভাইজান, আশাশুনি-বিষে করলে তা সবারই কাছে সুখের বিষয় হবে। আমার কাছেও। তবে ভাবি আমাকে তাড়িয়েও দিতে পারেন। কিন্তু এখানেও যে আমি আর আবু না থাকলে আমার একই দশা হবে না তা কে বলতে পারে? আসলে আমি যেখানেই যাব আমার একই ফল হবে। আমি না-হয় তখন ভাবিও পা আঁকড়ে থাকব। কিন্তু ছোট থেকে যাদের দেখছি, যে-বাড়িতে বড় হলো, যে-বাড়িতে আমার অন্য বোনদের মতোই যত্নে ও আদরে প্রতিপালিত হওয়ার কথা, সেখানেই থাকার জন্য কারও পায়ে পড়তে আমার অনেক বেশি কষ্ট হবে।

আনিসুজ্জামানের মনে হয়েছিল, বোরখার আড়ালে কোনো বছরের নয়, ছত্রিশ বছরের মহিলা বসে আছে। খুবই সচেতন নীলোফা, খুবই স্বচ্ছ তার চিন্তাধারা। এই বাড়ি, এই পরিবার তার অধিকারের জায়গা। এখানে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠার জন্য সে মাথা নীচু করতে চায় না। সেখানে তার দারুণ অপমান, কারণ সে-অপমানে অভিমান আছে। নীলোফার প্রতিটি বেদনা ও আবেদন মনে মনে স্পর্শ করেন আনিসুজ্জামান কিন্তু এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার তিনি কেউই নন এ কথা তাঁর মনে হয়। নীলোফার অনুরোধ খুব বড় নয় কিন্তু খুবই জটিল। নীলোফা বড় হয়েছে। শুধুমাত্র এই অনুভবেই সমাজ, পরিবার ও বন্ধুগুলি দুনিয়াদারির দুর্বহ তার তাঁর ওপর চেপে বসে। কলে তাঁর এই বোধ লোপ পেল, কী বলা উচিত ব উচিত নয়। মুখ পিছলে বেরল, কিন্তু আমি রাজি হলে কিছু হবে না। চাচুজান আছেন। আর লোকজন নানা কথা বলাবলি...

নীলোফা মৃদু শব্দ করে হেসেছিল। সে-হাসি এত তীক্ষ্ণ বিধছিল যে আনিসুজ্জামান থেমে গিয়েছিলেন। নীলোফা বলেছিল, আমি কিছুই যোগ্য নই, ভাইজান। আমাকে নিয়ে কেউ কিছু বলবে না। আমি নিম্নারও বাইরে। আনিসুজ্জামান দু'হাতে মাথা চেপে ধরেছিলেন। কী বলছে মেয়েটা। আমি সমস্ত নিম্নার বাইরে— হ্যাঁ! মানুষ কোথায় পৌঁছলে এ কথা বলতে পারে। যন্ত্রণার কোন গভীরতম জায়গায়।

খুক খুক— শোনা গেল তখন। বাইরে। কাশির মৃদু শব্দ। সঞ্জিদা এসে দাঁড়ালেন। আনিসুজ্জামান হালে পানি পাবার মতো হস্তি বোধ করেছিলেন তাঁর উপস্থিতিতে। যদিও সঞ্জিদা আন্নিয়ার মতো নন, আনিসুজ্জামানের কাছে একটু দূরের মানুষ, তবু, নীলোফার সঙ্গে এতগুলো আশ্চর্য সংলাপের পর সঞ্জিদা আশীর্বাদের মতো প্রতিভাত হন তাঁর কাছে। তিনি চেয়ার এগিয়ে দেন। সঞ্জিদা হাঁফাতে হাঁফাতে বসেন। সেই মুহুর্তে তাঁর বোরখা পরা ছিল না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল জীবনের সমস্ত তার বইতে বইতে বড়শূন্যতা এসে গেছে। শীর্ণ আড়ালে দু'বার মুখ মুছলেন তিনি। দু'টি নিশ্চিন্ত চোখ মেলে চাইলেন আনিসুজ্জামানের দিকে। কিছুক্ষণ, যেন কী বলবেন জানানো না, এমনই ভঙ্গি, যেন গুছিয়ে নিচ্ছেন মনে মনে। বললেন, আজই তবে সব নিয়ে যাবে, মেটা?

দৃমস্ত বীণার মতো শুনিয়েছিল তাঁর স্বর। আনিসুজ্জামান বইয়ের ত্বপের ওপর বসতে বসতে বলেছিলেন, হ্যাঁ। আপনার শরীর ভাল তো, চাচি?

নিজের ঘরখানিকে অচেনা লাগছিল আনিসুজ্জামানের। এমন আত্মা তাঁর ঘরে কখনও বসেনি।

সঞ্জিদার উত্তর দীর্ঘশ্বাস সমেত পাওয়া গিয়েছিল—আর শরীর। এ নিয়ে আর ভাবি না। যে ক'দিন টানতে পারি, থাকব।

আনিসুজ্জামান চুপ করে ছিলেন। নীলোফাও। এমনকী সঞ্জিদা ও নীলোফার মধ্যেও কোনও কথা বিনিময় হয়নি।

সঞ্জিদা বরাবরই কৃশ ও দুর্বল। মৃদু গলায় কথা বলেন। সবসময়ই সকলের কাছে সন্ত্রস্ত ভাব। তাঁকে দেখে মনে হয় কোনও বধাতুমিতে বুদ্ধি এসে পড়েছেন। তাঁর নিজস্ব তীত-সন্ত্রস্ত ভাব বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল মানব্বলের সান্নিধ্যে এসে। বা, বলা যেতে পারে, তিনি সেই নিরীহ

প্রাণীটি যাকে নিরন্তর দুটি জাঁদরেল বাঘের কাছে বসে থাকতে হয়। আমিনা, খুব স্বাভাবিক অধিকার বোধে সঞ্জিদার প্রতি স্নেহশীলা নন এবং অসহিষ্ণুও অনেকটা। বিশালদেহী, স্পষ্টভাষী ও ব্যক্তিত্বময়ী আমিনা এবং ক্ষীণ, দুর্বল, মুখজোরা সঞ্জিদা সজ্জবত যোঁদার দুই পরীক্ষামূলক সৃষ্টি যাদের একই সঙ্গে ধর্মপ্রাণ মনিরুলের জীবনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আর মনিরুল, যিনি আমিনাকে যথার্থ ভয় পান এবং এ জন্য মনে মনে কোনও হীনস্বাম্যভাৱ তাঁর থেকে থাকবে, যা থেকে মুক্তি পেতে সম্পূর্ণ প্রচুর সঞ্জিদার ওপরই তিনি আরোপ করেন। তিনি কত বড়, তাঁর গুরুত্ব ও জোর কতখানি তা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সঞ্জিদার সঙ্গে স্বাভাবিক কথা বলার চূলে বসেছেন। স্বাভাবিক ভাবে তিনি যদি বলতে চান— এক গ্রাস জল আমাকে দাও— তবে, সঞ্জিদার ক্ষেত্রে তা এভাবে অনুদিত হয়ে বেরিয়ে আসে যে— হাঁ করে কাকিয়ে আছ কেন নিরুন্নর বেটি! আমাকে যে এক গ্রাস জল দিতে হয় তাও শিখে আসোনি।

সঞ্জিদা কৈশে গঠেন। জল আনতে গ্রাস পাড়ে যায় হাত ফসকে আর আমিনা বলেন, আদরের বেটি, শুখু ডাঙতেই জানে। খেটে বাবে সে-কপাল নাকি ওর! আর সঞ্জিদা নিজেই হিন্দার দেন। এই জঘাকে তাঁর অপজঘ মনে হয়। সম্ভ্রমদের প্রতি স্নেহবশত তিনি জীবিত থাকার রসদ সংগ্রহ করতে চান এই বাড়ির চার দেওয়ালে, জানালায়, বাইরেরকার ঘিঞ্জি রিপন স্ট্রিট, ফেরিওয়ালার ফেরি করে যাওয়া, ফলওয়ালার নানা রঙের ফল ও অচেনা-অজানা পথচলতি মানুষের মুখে। এই সমস্ত সস্তা ও দৃশ্যাবলিকে সঞ্জিদা ভালবাসেন আপন দেহত্বকের মতোই যাতে ছাঁকা লাগলে ছুঁলে। বিনোদন বলতে সিনেমা, সে-দেখতে মাঝে মাঝে বাওয়া হয়। আমিনার নেতৃত্বে এবং কর্তাদের ইচ্ছায় স্থির হয় যে, কোন ছবি কোন প্রেক্ষাগৃহে দেখা হবে। তাঁরাই টিকিট কাটিয়ে আনার ব্যবস্থা রাখেন এবং বাড়ির মেয়েরা বোরখায় নিজেদের আড়াল করে গাড়ি চেপে সিনেমা দেখতে যায়। এ নিয়ে কারও কোনও অভিমান অভিযোগ নেই। কড়া অনুশাসন থাকলে বরং সকলের মধ্যে একটা নিরাপত্তার বোধ জাগে। মনে হয়, হ্যাঁ, এই তো জীবন। কিছু হারাবার ভয় নেই। কোথাও অনভিপ্রেত কিছু ঘটছে না।

সঞ্জিদা যাই হোন, যতই ক্ষীণ আর দুর্বল, আনিসুজ্জামান তাঁকে, নীলোফার মা হিসেবে, সব কথা বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। বলেছিলেন, নীলু, চাচিকে তবে বলি।

নীলোফা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। আনিসুজ্জামান বলেছিলেন, নীলোফা একটা পাগলের প্রস্তাব করেছে চাচি। আমার দেখভাল করার জন্য ও আমার সঙ্গে যেতে চায়।

সঞ্জিদার চোখ দুটি আরও প্রান হয়েছিল। বলেছিলেন, আমি জানি। বাপজান।

—জানেন।

—হ্যাঁ। নীলু ক'দিন ধরেই আমাকে বলেছে। আমি ভাবলাম, সেই ভাল। ও চলেই যাক। মেঠা, আমি আর বাঁচব না বেশিদিন। তোমার বড়চাচিও যে-কোনও দিন চলে যাবেন। তোমার চাচা আবার নিকাহ করছেন। নীলু এখানে থাকতে পারবে না। তোমাকে বলার জন্য বলেছিল আমাকে ও। আমি ভাবলাম নিজেই বলুক। ওর কষ্ট আমরা তো সবটা বুঝি না।

তখন উঠে পড়েছিল নীলোফা। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। যেন তার আর কিছু বলার নেই। শোনার নেই। আনিসুজ্জামানের ভেতরটা ব্যথায় টাটিয়ে উঠেছিল। একটা মানুষ, একটা নির্দোষ মানুষ, কী অশুচি অসহায়, নিরাশ্রয়, নির্বান্দব। আনিসুজ্জামান মনে মনে আব্বাজানের মুখ স্মরণ করেছিলেন। মনে হয়েছিল সে-মুখে প্রসন্নতা। কিন্তু আনিসুজ্জামান নিজে বিধা বগটাতে পারেননি। সঞ্জিদাকে বলেছিলেন, কিছু, ও বড় হয়েছে চাচি। বাড়িতে সব কী বলবে। চাচা, বড়চাচি, অন্যরা।

সঞ্জিদা বহু দূর থেকে বলেন, ও আমার মেয়ে। আমি ওকে জঘ দিয়েছি। ওর কীসে ভাল হবে তা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানবে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি মেঠা। তুমি ওর ক্ষতি করবে না। তুমি আর সবার মতো তো নও। ওকে নিয়ে যাও সঙ্গে। কেউ কিছু বলবে না।

সবাই ওকে ভুলতেই চায়। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি কিছু রাজি আছেন।

—কিছুটা রাজি? আপনারা এটা নিয়ে কথাও বলেছেন?

—হ্যাঁ, আমি ছাড়া ওই একজনই যার নীলুকে নিয়ে ভাবনার শেষ নেই।

—চাচা? তাঁকে বলেছেন? তাঁর মতই তো প্রধান।

—তোমার কথা বলে মেঠা। তোমার তো কোনও আপত্তি নেই-ওর দায়িত্ব নিতে?

—দায়িত্ব?

—তোমার সঙ্গে থাকলে ওর ভাল-মন্দ তো তোমাকেই বুঝতে হবে বাপজান।

—হ্যাঁ, তা বটে। না, আপত্তি কী? একা থাকার চেয়ে তো ভাল। কিন্তু চাচাকে মাঝে বসুন। তাঁর মত নেওয়া দরকার।

—তাঁকে তুমি বলে মেঠা। আমার নাম করেই বলো।

—আমি? আমি কী বলব। চাচা তো আমাকে বিশ্বাসও করেন না আমি হিন্দু-যেহা বলে—

—উনি কবে কী বলেছেন তা মনে রেখো না। তোমাকে এ পরিবারে সকলেই বিশ্বাস করেন। আমি থাকব। তুমি কথা তোলো। এ বাড়িতে একমাত্র তুমিই পারো তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে।

শুধুমাত্র এই কথাটুকুর জন্য তিনি রাজি হয়েছিলেন। এই স্বীকৃতিটুকুর জন্য যে মনিরুলের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার ক্ষমতা তাঁর আছে বলে কখনও কখনও কেউ কেউ তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকে। ফলে প্রসঙ্গটি মনিরুলের কাছে উত্থাপন করা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা করেছিলেন।

সে-দিন বইগুলো ফ্লাটে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে এসেছিলেন আনিসুজ্জামান। রাতে তাঁকে দেখে মনিরুল বলেছিলেন, ও, তুমি আজও যাওনি?

আনিসুজ্জামানের মনে হয়েছিল, তাঁর যাওয়াটা বুঝি খুবই কাম্য সকলের। এবং এই উপস্থিতিটুকুও প্রত্যাশিত নয়। সঞ্জিনা যেমন বলেছিলেন সকালে, নীলোফারকে সবাই ভুলতে চায়, তেমনই আনিসুজ্জামানের মনে হয়েছিল তাঁকেও সকলে ভুলতেই চান। কিন্তু কেন? তিনি তো গলগ্রহ নন। নির্ভরশীল নন। পারিবারিক অনুশাসন মানেন না বলেই কি তাঁকে একটি অবস্থিত টিউমারের মতো ছোট্ট ফেলে দেওয়া হচ্ছে?

মনিরুলের কথার প্রেক্ষিতে আনিসুজ্জামান সরাসরি নীলোফার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার আর্জি পেশ করেছিলেন। ভাবখানা এমন ছিল যে মনিরুলই যেহেতু নীলোফার জন্মদাতা সেহেতু তাঁর যে-কোনও প্রস্তাবের জন্য তিনিই দায়ী থাকেন। তখন অন্যান্য ভাইদের কথা থেমে গিয়েছিল এবং তারা উৎসুক চোখে চেয়ে ছিল শুধু জানতে যে মনিরুল কী বলেন এবং মনিরুল তাঁর আপত্তি জানিয়েছিলেন এই বলে যে— তোমাদের কি মাথাটাখা খারাপ হয়ে গেল?

খুব বড় আশ্চর্যের ঘটনা সে-দিন মনিরুলের পরিবারে ঘটেছিল। বাড়ির দুই বউয়ের ওপর ভার রেখে নিজেকে হিচড়ে অমিনা সবার মাঝখানে নিজে একে ফেলেছিলেন। তাঁর পাশে ছিলেন বোরখায় ঢেকে সঞ্জিনা। তারা দু'জনে মিলে নীলোফার যাবার সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছিলেন। রাগে হোক বা বিগম্নে মনিরুল নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন তখন। কোনও সিদ্ধান্ত বাড়ির মেয়েরা তাঁকে টপকে খোলা গলার ঘোমটা করছেন, এ তাঁর কল্পনাতীত ছিল। কল্পনাতীত অন্যান্য ভাইদের পক্ষেও। তারা তাদের স্ত্রীদের বোরখা-ঢাকা মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু এ কথা ভেবেছিল যে পরিবারের হাওয়া পালটাচ্ছে। ফলে তাদেরও নির্বাক থেকে ঘটনার শেষ দেখতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মনিরুল বলেছিলেন, তোমরা সবাই যদি চাও, তবে যাবে।

আপত্তি করেছিলেন এবং আপত্তি বন্ধনও করেছিলেন সহজেই। কাজল নতুন বিবির জন্য নীলোফার মতো চিরস্থায়ী যন্ত্রণাকে তিনিও ঘরে রাখতে চাননি। সে-দিনই মধ্যরাতে সঞ্জিনার সঙ্গে কিছু গুড় আলোচনা তাঁর হয়েছিল যা নীলোফা শুনে ফেলেছিল এবং কোনওদিন ভোলেনি।

# উড়িউড়ি

গাছের চারাগুলো হাতে নিয়ে বেরোবার উদ্যোগ করলেন বিকাশ। আজ রবিবার। অফিস ছুটি। কাল সন্ধ্যায় গিয়ে পাড়ার রেললাইনের দিকটি তিনি বেছে এসেছেন। ওই দিকেই পড়েন ক্রান্তবীর আশেপাশে গাছ লাগিয়ে দিলে বেশ হয়। ক্রান্তবীর ছেলেরাগুলোকে ভেঙে নিয়ে এই কাজে সাহায্য করতে পারবে ভেবে তিনি বাগানের কোণ খেঁকে শাবলটা হাতে তুলে নিলেন। তাঁর নিজের বাগানে একফালি। তারই মধ্যে জবা, বোয়েনভেলিয়া ও উপর গাছ। কোণে একখানি নিম। তাকে জড়িয়ে উঠেছে মাধবীলতা। উপর গাছের গায়ে জড়িয়ে আছে হুইলতা। দেবার্চন খুব গাছ ভালবাসত। ওই মাধবীলতা দেবার্চনের লাগানো। উপরটাও। মল্লিনাথের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে এনে লাগিয়েছিল সে। স্পষ্ট মনে আছে বিকাশের। স্বাভাবিকভাবে যেগুলো মনে থাকার কথা নয়, সে-দিনের বিষয়ে সেগুলোও তাঁর মনে পড়ে যায়। আশ্চর্য সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে লড়িয়ে উঠেছে মাধবীলতাটি। বসন্ত প্রায় শেষ হয়ে এল। এখনই দু’-একগুচ্ছ ফুল দিয়েছে। বেল, জুই, মাধবী ফোটার এই প্রকৃত সময়। এই শেষ বসন্ত।

দেবার্চন গাছ ভালবাসত বলেই সারা পাড়া গাছে ভরিয়ে দেবার কথা ভেবেছেন বিকাশ। ও থাকলে নিশ্চয়ই খুশি হত। তিনি আকাশের দিকে তাকান। এখনও তেমন বেলা হয়নি। তবু রোদের তেজ এসে গেছে। তাঁর মনে হল, ওইখানে কি আছে দেবার্চন? ওই নক্ষত্রলোকের কোনও একটিতে?

ছেলেবেলার এককমই বিশ্বাস করতেন তিনি। কেউ মরে গেলে, আকাশের তারা হয়ে যায়। আকও, এই পঞ্চম উত্তীর্ণ বছরে, বিশ্বাস করতে বড় ইচ্ছে হয়।

স্নান করে একবস্ত্র হয়ে এতক্ষণ গীতা পড়ছিলেন লক্ষ্মী। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল বিকাশ বেরিয়ে যাচ্ছেন। এক ছুটি জামালায় চলে এলেন তিনি। বললেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

বিকাস কোনও কথা বলছেন না। মাটিতে ঠুকে ঠুকে শাবল থেকে মাটি কাভছেন। লক্ষ্মী এ বার আসছিছু হলেন। বলতে থাকলেন, সড়ালবেলার কাজ নেই, কর্ম নেই, উনি চললেন সবুজ গড়তে। আশ্চর্য। এরকম লোকও হয়। সারাজীবন জ্বালিয়ে মারল আমাকে। সারাজীবন।

বিকাস মাথা তোলেন এ বার, কী চাই, বলো।

—বড় খোঁচা আজ বাড়ি আছে। ওকে একটু লুচি করে দেব না? ময়দা এনে নাও। ডালডাও লাগবে খানিকটা। তা ছাড়া বাজার-টাজারও তো করতে হবে।

—ময়দাটা এনে দিয়ে যাবছি। গাছগুলো লাগিয়ে এসে বাজার করব।

—না। ওই অত বেলায় আমি রান্নাতে পারব না। আগে বাজার করে দিয়ে তুমি যা ইচ্ছে করো। তা ছাড়া শেফালির মাকে আসতে বলেছি। স্কুলটা একটু ঝুটিপাটি দেবে। পুরনো কাগজ জড়ো করে বেচে দেবে। তুমি দাঁড়াবে ওখানে।

সাপ্তাহিক নানা বিষয় চিরকালই তাঁর ইচ্ছের অভিযুক্ত বদলে দিয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁর এই জীবন-যাপনকে বাহ্যাত্মলক মনে হয়। মাঝে মাঝে অর্থহীন লাগে। যদি তাঁর জীবন এরকম না হয়ে অন্যরকম কিছু হত, ধরা যাক তিনি বিবাহ করেননি, চাকরি করেননি, ঘুরে বেড়াচ্ছেন যেমন খুশি...তা হলে যা পেয়েছেন তার চেয়ে কি কিছু কম পাওয়া হত? এই গতানুগতিক পথেই কি জীবন সবচেয়ে বেশি দেয়? বিকাশ জানেন না। লক্ষ্মীর নানা অচরণ আজকাল অসহ লাগে। তবু বিকাশ কথা বাড়ান না। চারাগুলো ছায়ায় রেখে শাবল নামিয়ে হাত পাতেন, টাকা দাও।

লক্ষ্মী টাকা নিয়ে ফেরেন। বাজারের দিকে চলে যান বিকাশ। পথে প্রণবেশের সঙ্গে দেখা



হয়। খুব অনামনর হয়ে আসছিলেন প্রণবেশ। দু'বার পাথরে ছোট্ট খেঁচনা কাছাকাছি হতেই বললেন, বিকাশদা, আমার ছেলেটাকে পাচ্ছি না।

—পাচ্ছ না। তার মানে?

বিকাশ প্রণবেশের কথার মানে ধরতে পারেন না, প্রণবেশের ছেলে খুবই ছোট। বছর সাতের বয়স। কী হল তার?

প্রণবেশের চোখে জল আসে। বাঁ হাতে জল মুছে বলেন, ফলান্কা থেকে আসছিলাম। খুব এক সপ্তাহ আগে ছেলেকে নিয়ে আমার ওখানে গিয়েছিল। কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছিলাম ওদের নিয়ে পুরী যাব বলে। কালই যাবার কথা। ভোরবেলা আমি আর খুঁই উঠে দেবি বামা নেই।

—কোথায় ছিল ও?

—আমার পাশেই ছিল। খুঁই একটা বার্থে ছিল। অন্যটার আমি আর বামা। কী করি বিকাশদা? কোথায় খুঁজি?

—বউমা কোথায়?

—ও খুব কান্নাকাটি করছিল। ওকে ভবানীপুরে ওর বোনের বাড়ি রেখে এলাম।

বিকাশ কী বলবেন ভেবে পান না। প্রণবেশ দ্রুত চলে যান। বিকাশের ইচ্ছে হয় বলেন— কোথায় খুঁজবে ছেলেকে? ধানায় যাবে? আমি কি তোমার সঙ্গে থাকব প্রণবেশ? কিন্তু বলা হয় না। ময়দা আর ডালডা নিয়ে মিরতে হবে। নইলে লক্ষ্মী অনর্থ করবেন। ময়দা আর ডালডা? বিকাশের নিজের ওপর রাগ হয়। ময়দা, ডালডা, আলু, চাল, বিজয়া দশমী আর নববর্ষ করেই জীবন কেটে গেল। এতগুলো বছর পৃথিবীর কোনও মুহূর্তে, কোনও উখানে-পতনে নিজেকে শামিল করেননি তিনি। শুধু নিজেরটা গুছিয়েছেন। তাঁরই ছেলে হয়ে দেবার্চন কেমন করে অত বড় কাণ্ডে জড়িয়ে পড়ল? কেমন করে ওইরকম অসাধারণ স্বপ্নের জন্য বিলিয়ে দিল নিজেকে? দেবাশিস কিন্তু ও পথে পা বাড়ায়নি। সে বিকাশের মতোই হয়েছে। স্বার্থপর। বিলাসী। বতলোক হওয়ার স্বপ্নে মশগুল।

পক্ষার মুদি-দোকানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর আবার মনে পড়ে প্রণবেশের কথা। পাশে দাঁড়াবার মতো কেউই নেই প্রণবেশের। একটা মাত্র ভাই ছিল। দেবার্চনের মতোই অসম্ভব স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে হারিয়ে যায়। প্রণবেশ সব বিয়ে করেছেন তখন। ছেলে হয়েছে। ভাই যে একটা গোপন কিছুতে জড়িয়ে পড়ছে বুঝতে পারেননি তখন। বিকাশ নিজেই কি বুকেছিলেন? একই কলেজে পড়ত দেবার্চন আর নীলান্দি। বিকাশের ছোট ছেলে আর প্রণবেশের ছোট ভাই। সিটিতে। একসঙ্গেই কলেজ যেত তারা। আরও অসংখ্য ভরপের সঙ্গে একই মুহূর্তে তারা স্বপ্নের বীজ বুনেতে শুরু করে। কারওকে জানতে না দিয়ে। বুঝতে না দিয়ে। সেই স্বপ্নের খবর রাখত মাত্র কয়েকজন। পাটি। পুলিশ আর ওরা। ওই স্বপ্নস্রষ্টারা।

ভাইকে হারিয়েছেন প্রণবেশ। আজ ছেলেকে বুঁজে পাচ্ছেন না। পক্ষাকে এক কেজি ময়দা ও এক প্যাকেট ডালডার কথা বলে বিকাশ ভাবতে থাকেন। প্রণবেশ নিশ্চয়ই এখন নিজের মধ্যে নেই। কোথায় যাবে, কী করবে কে জানে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন চারাগুলো আজ আর লাগানো হবে না। বরং ময়দা-টয়লা বাড়িতে দিয়ে প্রণবেশের সঙ্গে থাকবেন। যেখানে যেখানে সে যেতে চায়, নিয়ে যাবেন। জিনিস নিয়ে দাম মিটিয়ে দ্রুত হাটেন তিনি। একবার পকেটে হাত দিয়ে টাকা কত আছে দেখে নেন। এতে হবে না। কিছু নিতে হবে আরও। টাকাপয়সা সবই লক্ষ্মীর কাছে থাকে। চাইতে হবে। বিকাশ জানেন, খুবই চেষ্টামেচি করবেন লক্ষ্মী। তবু চাইতেই হবে। কে জানে, প্রণবেশ কতটা তৈরি হয়ে বেরাবেন।

সকাল প্রায় নয়টা। দেবাশিস তখনও ঘুমোচ্ছিল। লক্ষ্মী তাকে জড়িয়ে ধরে গুয়েছিলেন। তাঁর দীর্ঘ ভেজা চুল বিছানা জড়িয়ে মাটিতে এসে পড়েছে। পূজাপর্ব শেষ করে, স্বামীকে সাংসারিক



কাজে প্রবৃত্ত করে তিনি সন্তানসুখ গ্রহণ করছেন। একটা পা তিনি ছেলের পায়ে তুলে দিয়েছেন।  
সেবাশিস মাথের বুক মুখ দিয়ে শুয়ে আছে। লক্ষ্মী তার পিঠে হাত বুলাচ্ছে।

বিকাশ ঘরে এসে বললেন, লক্ষ্মী, কুড়িটা টাকা দাও।

লক্ষ্মী মুখ ফেরালেন। সেবাশিসও মুখ তুলে একটু আভ্যন্তরীণ ভাবলেন। বিকাশ বললেন,  
তাজাতাড়ি দাও লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী উঠে বসে বললেন, কেন?

—প্রণবেশের ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এর সঙ্গে কেতে হবে।

—পাওয়া যাচ্ছে না। সে কী? ওইটুকু ছেনো কোথায় যাবে?

—সেটাই তো কথা।

—কী করে হারাল?

—সে অনেক কথা। পরে শুনো। আগে টাকাটা দাও।

—কিন্তু তুমি কোথায় যাবে?

বিকাশ বিরক্ত হন। বড় প্রশ্ন করেন লক্ষ্মী। সময় অসময় পোকেন না। বিকাশের প্রতিটি  
পদক্ষেপ তিনি নিজের মুঠোয় পুরে রাখতে চান। একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলেন, সে তো আমিও  
জানি না। এর সঙ্গে থাকতে হবে। বাস।

লক্ষ্মী বিছানা থেকে নামতে নামতে বলেন, তুমি ছাড়া আর লোক নেই? পৃথিবীর সবার  
সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব কি তুমি একা নিয়েছ? কার ছেলে মরণ, উনি শাস্তানে চললেন। কার  
ছেলে হারাল, উনি বৃজতে চললেন। আশ্চর্য!

বিকাশ বললেন, তার ছেলে মরণের কথা তুমি বলছ লক্ষ্মী? মল্লিনাথদার? সে-দিন আমি  
শাস্তানে বাইনি কিন্তু।

লক্ষ্মী আলমারির দিকে যেতে যেতে বলেন, আজই-বা তোমাকেই যেতে হবে কেন? পাড়ায়  
আর লোক নেই? খেলে না-দেলে না। বাজার-হাট নেই। উনি চললেন।

—বাজার-হাট তো একটা দিন বড় খোঁকাও করতে পারে।

—ওর একটা দিন ছুটি। সেও তুমি বাজার-হাট করতেই পাঠিয়ে দাও। ও তো ছেলমানুষ  
এখনও। ওর তো একটু শুয়ে-বসে আরাম করতে ইচ্ছে করে। সবাই তো তোমার মতো পায়ের  
তলায় চাকর লাগিয়ে টো-টো ঘুরে বেড়ায় না।

বিকাশ কথা ব্যতীত না। তাজাতাড়ি পা চালিয়ে প্রণবেশের বাড়ির দিকে হাটেন। পাড়ার  
দক্ষিণপ্রান্তে প্রণবেশের বাড়ি। চলতে চলতে মনে মনে লক্ষ্মীর কথার জবাব দিতে থাকেন  
তিনি—হ্যাঁ, বড় খোঁকা এখনও ছেলমানুষ। সাতাশ বছর বাস হল, এখনও ছেলমানুষি গেল  
না। ওর বাসে আমি কত দায়দায়িত্ব নিয়েছিলাম তোমার জন্যে নেই।

মনটা তেতো হয়ে যায় বিকাশের। লক্ষ্মী এখনও বড় খোঁকাকে বাছা করে রেখেছেন। ছোট  
ছেলের মতো ওকে জড়িয়ে ধরেন। চুমু খান। এখনও বড় খোঁকা পাশে না থাকলে লক্ষ্মীর ঘুম  
হয় না। বিকাশের কষ্ট হয়, একটু সঁদাও হয়। লক্ষ্মী কবেই বিকাশকে বিছানা থেকে আলাদা করে  
দিয়েছেন। পরক্ষণেই লজ্জা পান তিনি। ছি ছি। এ সব কী ভাবছেন। কিন্তু ছেলের প্রতি এখনও  
এত আদর অতিরিক্ত মনে হয় বিকাশের। লক্ষ্মী যাই ভাবুন, বিয়ের বয়সই তো হয়ে এল  
ছেলের।

প্রণবেশ আসছিলেন। বিকাশ বললেন, কোথায় যাবে বলে ঠিক করলে?

—জানি না। বিকাশদা। ভবানীপুরে যাই। সুরত আছে ওখানে। ভায়রাভাই। ওর সঙ্গে কথা  
বলে যা হোক ঠিক করা যাবে।

—আমি ভাবলাম তোমার যদি প্রয়োজন হয়। সঙ্গে যাব বলে ঠিকরি হয়ে বেরোলাম। পাড়ায়  
আরও কয়েকজনকে বলে দেখাবে? কেউ যদি কোনও সাহায্য করে?

প্রণবশ চুপ করে থাকেন। ধীরে ধীরে পাশাপাশি ইটিতে থাকেন তাঁরা। একসময় প্রণবশ বলেন, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সাহায্য করতে পারে পুলিশ। একটা মিসিং জারবি জমা করতেনই হবে আমাদের। বাম্বার একটা ছবি নিতেই এসেছিলাম।

দু'জনেই চুপ করে যান এবার। দু'জনেই দু'জনের মনের কথা টের পান। পুলিশ। পুলিশের কাছে যেতে হবে। দু'জনেরই মনে হয়—পৃথিবীর সবচেয়ে যুগান্তকারী কী?

—পুলিশ।

সবচেয়ে নোংরা জায়গা কোনটা?

—থানা।

সবচেয়ে বিবর্ণ কী?

—পুলিশের চোখ।

সবচেয়ে কঠিন কী?

—পুলিশের অস্ত্র।

সবচেয়ে অসহনীয় কোনটা?

—ওদের মৃত্যুদণ্ড। ওদের মার। যা দিয়ে ওরা আমাদের ভাইকে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে।

দু'জনের চোখের সামনেই সারা পৃথিবীর রং থাকি হয়ে যায়। এবং থাকি রঙের কেন্দ্রে থাকে সাদা উর্দি। তাঁদের দৃষ্টিশক্তির সমস্ত অনুভূতিতে এইসব উর্দিপরা মানুষেরা কঠিন চোয়ালে ঘোরাফেরা করতে থাকে। আর-সব রং মুছে যায়। সমস্ত শব্দ জিপের শব্দের মতো লাগে। বাতাসে শুধু পেট্রল আর বাকসের গন্ধ। ওরা যখন রেইড করত, হঠাৎ আসত, জিপের স্টার্ট বন্ধ করত না। ভীষণ যন্ত্রণায় একটানা কৌঁ কৌঁ কৌঁ করে চলত গাড়িটা।

এখন সবকিছুই স্বাভাবিক। শুধু কয়েকটা দেওয়ালে বুলেটের দাগ থেকে যাবে। রং করলেও যাবে না। কয়েকটা রাস্তায় আর ময়দানে, কয়েকটা গলিতে আর কয়েকজনের হৃদয়ে টকটকে লাল তাজা রক্ত ছড়িয়ে থাকবে। কোনওদিন মুছবে না। শুকাবে না।

—তবু, আমাদের পুলিশের কাছেই যেতে হবে।

—তবু, আমাদের পুলিশের সাহায্যই নিতে হবে।

দু'জনে একটা রিকশা নিলেন। বিকাশ স্থির জানেন না যে যেখান থেকে বাম্বা হারিয়েছে সেখানেই ডায়ারি করতে হবে নাকি স্থানীয় থানাতেই সাহায্য পাওয়া যাবে। তাঁর নির্দেশে রিকশা থানার দিকে চলল। মাথুরের গড় থেকে বরানগর থানা বেশ দূরে। গঙ্গার গায়ে। বাজারের কাছটায় এসে প্রণবশ বিকাশের হাত আঁকড়ে ধরলেন, বিকাশদা, ওই থানাটা ...ওখানে আমাকে তিনদিন আটকে রেখেছিল...।

বিকাশ দেখলেন প্রণবশের কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা জমেছে। চোখ দু'টি লাল হয়ে উঠেছে। তিনি বলছেন, তিনদিন, বিকাশদা, আমাকে একটা নোংরা ঘরে আটকে রেখেছিল...ঘরটায় কোনও জানালা ছিল না।

উঁচু-নিচু পাথর ওঠা রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছিল রিকশাটা। খুবই ঝাঁকুনি হচ্ছে। বরানগরের এ দিকটা প্রাচীন। ঘরবাড়িতে ঠাসা। ছোট ছোট ইটের বাড়ি। দেওয়াল ফেটে গাছ গজিয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে আশ্চর্য অন্ধকার। জানালার পর্দা না দিলেও কিছুই দেখা যাবে না বাইরের থেকে। প্রণবশ আরও জোরের বিকাশের হাত আঁকড়ে ধরছেন। যেন বিকাশের রক্তমাংসে তাঁর নখ ডুববে যাবে। বিকাশ কী বলছেন ভেবে পাচ্ছেন না। প্রণবশ বলছেন, তখন বিকাশদা, তিনদিন আমি কিছু খাইনি। একবিনু জল পর্যন্ত না। ওরা শুধু প্রণা করত... হাজার হাজার প্রণা... আমার ডিহাইড্রেশন হয়ে গিয়েছিল... আমার ছেলে তখন ছোট, দেড় বছরের, বিকাশদা আমি মরেও যেতে পারতাম, কিন্তু তবু আমার ভাইকে আমি পুলিশের হাতে দিইনি...।

বিকাশের ঠোঁট কঁপে যায়। রিকশার হাতলটা জোরে আঁকড়ে ধরেন তিনি। তাঁর নাকে কুট গন্ধ লাগে। এ কি বারুদের গন্ধ! হ্যাঁ, বারুদেরই হবে কারণ থানা নিকটতর হচ্ছে। এ কি রক্তের গন্ধ! হ্যাঁ, রক্তেরই গন্ধ! কারণ থানা আর একটু এগোলেই। থানা থেকে রক্তের গন্ধ আসবে, বারুদের গন্ধ আসবে— এটাই স্বাভাবিক। থানা মানে পুলিশ, মানে আরক্ষা, মানে শক্তি। রক্ষা আর শক্তির সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। হয়তো বর্তমানের মতোই পরবর্তীকাল এই সম্পর্ক বহন করে নিয়ে যাবে কোনও মহাজাগতিক পরিণতির কাছে।

রিকশা এ বার গঙ্গার পাড় দিয়ে চলতে শুরু করেছে। আর একটুখানি, মাত্র একটুখানি এগোলেই থানা। বিকাশ চিৎকার করেন, থামাও, থামাও তো ভাই।

রিকশা পরোয়া করে না। বলে, থানায় যাবেন বললেন! থানা তো সামনেই বাবু।

বিকাশ দারুণ অসহিষ্ণু হয়ে বলেন, আঃ, তোমাকে থামাতে বলছি না!

রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়ে। বিকাশের মনে হয় রিকশাওয়ালা পুলিশের লোক। জোর করে তাঁদের পুলিশের কাছে নিয়ে যেতে চায়। তখন যেমন হয়েছিল, একজন প্রতিবেশী এলেও, একটি ভিথিরি বা পাগল এলেও মনে হত পুলিশের লোক। ছদ্মবেশে এসেছে। দেবার্চনকে খুঁজছে। সন্দেহ কুটিল হয়ে উঠত!

নিশ্চল রিকশা থেকে দু'জনেই থানাটিকে দেখতে থাকেন। প্রণবেশ বিড়বিড় করেন, বিকাশদা... ওই তিনদিন... আমার মনে হত, একটু একটু করে ওই ঘরের চারটে দেওয়াল ছোট হয়ে আসছে। ক্রমশ নিচু হয়ে আসছে ছাদ...। যে-কোনও সময় আমার ওপর চেপে বসতে পারে। আমাকে পিষে মেরে ফেলতে পারে। ওরা আমাকে মারেনি। অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে প্রশ্ন করেছে... প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে...

বিকাশ খসখসে গলায় প্রশ্ন করেন, নীলাদ্রিকে কি পুলিশ মেরেছিল, প্রণবেশ?

—হ্যাঁ। পুলিশই মেরেছিল। নিশ্চয়ই। ওরা তো খুঁজছিল নীলাদ্রিকে। তাই না? আর দেবার্চনকে! বিকাশদা? দেবার্চনকে কারা...

—আমি জানি না। হয়তো পুলিশ মেরেছিল। হয়তো অন্য পাটির লোক। হয়তো গুণ্ডা। শুধু জানি, মানুষ ওদের মেরেছিল। স্বার্থে, লোভে, জিঘাংসায়। আমাকে তোমার মতো থানায় কাটাতে হয়নি। কেন জানো? আমি সরকারি চাকরি করি বলেই নয়। সে তো তুমিও করতে। আমার চেয়ারে আমি বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করেছিলাম বলে। আমার প্রভুভক্তি দিয়ে আমি নিজেকে রক্ষা করেছি। শুধু নিজেকে। আর আমার পুত্রকে হত্যা করেছি।

প্রণবেশ বলেন, আমি যাব না, বিকাশদা।

—কোথায়?

—থানায় যাব না।

—তা হলে? কীভাবে খুঁজবে প্রণবেশ?

—আমি জানি না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। ঘুরব। সমস্ত হাসপাতালে। মর্গে।

—হাসপাতালে যাবে কেন? মর্গে যাবে কেন?

—ও বিকাশদা। এভাবেই খুঁজতে হয়। এক দিন রাত্রে কৌশিক... কৌশিককে মনে আছে আপনার? জামাল? জামাল কৌশিক... প্রায়ই আসত ওদের সঙ্গে? অসাধারণ সুন্দর ছিল! কী ব্রিলিয়ান্ট...

—কে ব্রিলিয়ান্ট ছিল না? প্রণবেশ? দেবার্চন ছিল না? নীলাদ্রি ছিল না?

—হ্যাঁ। ওরা সবাই ব্রিলিয়ান্ট ছিল। বোধহয় এও এক আশ্চর্য ভাইরাস। বিকাশদা। স্বপ্নের ভাইরাস। যা শুধু মেধাবী ছেলেদের মধ্যে ঢুকে যেত। স্বপ্নে বঁদু করে দিত। স্বপ্নের জন্য ওরা সব ভুলে গিয়েছিল। বাবা-মা, ভাই, বোন। ওই কৌশিক জানেন বিকাশদা, একটাই ছেলে ছিল বাবা-মায়ের। একদিন, অনেক রাতে, কড়া নাড়ল। দরজা খুলতে ভয় করত তখন। কে যে

আসে। পুলিশ না নীলুটা! দু'জনকেই সমান ভাব পেতাম আমি, জানেন বিকাশদা। নীলুকে খুব ভালবাসতাম। কিন্তু নিজের স্ত্রী-পুত্রের কাছেও আমার দায়বদ্ধতা ছিল। আমি...আমি...সত্যি বলতে কী, চাইনি বিকাশদা যে নীলুর জন্য ছুই আর বায়ান্ন পেনও ক্ষতি হোবা। ওদের নিরাপত্তা ভেঙে যাক! আমি চাইনি। আমি নিজে নীলুর জন্য সমস্ত কষ্ট করতে পারতাম, কিন্তু ওদের কথা...ওদের কথা...আমি না ভেবে পারিনি...

—তোমার বউদি বলেন, দেবার্চনের মৃত্যুর জন্য, পরিণতির জন্য আমিই দায়ী। ও যখন সময়মতো বাড়ি ফিরত না, পড়তে বসত না, কী যেন ভাবত, তোমার বউদি বলেন, রাত জাগে চুপিচুপি কী সব লেখাপড়া করত, আমি ওকে শাসন করিনি। কেন করিনি? সে কি ও মরে যাবে বলে? ওর মৃত্যু চাই বলে? বলো? আমরাও তো দেবার্চনকে বাচাবার জন্য কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু দেবার্চনকে পাঠাতে পারিনি। যদি পারতাম, তা হলে তে জানে, হয়তো ও বেঁচে থাকত। কিন্তু পারিনি যে, সে কি ইচ্ছে করে? বিপদ এলে পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভাবা স্বাভাবিক কর্তব্য, প্রণবশ...

প্রণবশ ও বিকাশ দু'টি ভিন্নতর স্মৃতিতে ডুবে যান। দু'জনে দু'জনের কথা বলতে থাকেন। শোনাতে থাকেন পরস্পরকে। রিকশাওয়ালা ওদের তাজা দেয় না। গলায় গামছা দিয়ে সে নিজের নুক পিঠ মোছে। বসার সিটটা খেঁড়ে নেয়। রিকশাটিকে টেনে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড় করায়, পাশে নীরবে গঙ্গা বয়ে যায়। এত জল তবু এতটুকু শব্দ নেই। রিকশাওয়ালা বিকাশ ও প্রণবশকে নেখে। সে চেনে এঁদের। তার স্ত্রী, অন্ধর মা, বিকাশের বাড়ি বাসন মজাতে যায়। দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে থেকে সে অনুধাবন করতে পারে সব। মাত্র পাঁচ বছর আগেও অলিতে-গলিতে গঙ্গার পাড়ে লাশ পড়ে থাকার ইতিহাস সে বিস্মৃত হয়নি। এখন এই দু'জনকে নেখে তার মনে হয়, পরমা থাকলেও, বাড়িঘর থাকলেও মানুষের দুঃখ ঘোচে না। সে শোকতপ্ত মানুষ দু'টিকে কথা বলার সুযোগ দেয়। একবারও তাজা না দিয়ে, তাজা না মিটিয়ে সে ছায়ায় বসে বিড়ি ধরায়। থানার কাছে, গঙ্গার পাড়ে, রক্তচিহ্নবিশীত কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় একটি রিকশা ছায়া-সুনিবিড় কুটির হয়ে যেতে থাকে। যেন প্রণবশ আর বিকাশ নামের দু'টি শ্রান্ত মানুষ তার দাঁওয়ায় বসে আনন্দ ভিরিয়ে নিচ্ছেন।

প্রণবশ বলে চলেন, দরতা খুলে দেখলাম কৌশিক দাঁড়িয়ে আছে। রোগা হয়ে গেছে। গালে একমুখ দাড়ি। চুলে জটা। চোখ দু'টি উদ্ভ্রাঙ্ক। বলল, ওরা নীলাদ্রিকে খুন করেছে, দাদা। আমাকেও করবে। আমাদের সবাইকে করবে। নীলাদ্রিকে খুঁজুন।... কিছু বোঝার আগেই ও অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল। আমি ভয়ে ওকে ডাকতে পারিনি। হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। একটি কথাও ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। প্রথমে ওর কথার মানেই বুঝতে পারিনি আমরা। শোক করতেও ভুলে গিয়েছিলাম। কিংবা ভয় পেয়েছিলাম। পুলিশ যদি জানতে পারে, আমি ওর মৃত্যুর খবর জেনেছি। আমাকে যদি আবার ওই অন্ধকার ঘরে... আর নীলাদ্রি যে মারা যাবে, যাবেই, তা তো জানতামই। সারারাত খুঁমোতে পারিনি। কার কাছে যাব! কী করব! ভোরবেলা বেরিয়ে পড়েছিলাম। প্রথমেই গিয়েছিলাম আর জি কব হাসপাতালে। মেডিক্যাল কলেজে। শিয়ালদার মর্গে। বিকাশদা, ওভাবে করলেওকে খোঁজা যায় না। ওভাবে পৃথিবীর কোউ কোউকে কোনওদিন খোঁজেনি। আমার মতো অসহায়, অপদার্থ ও দুর্ভাগ্য ভাইও পৃথিবীর কোথাও জন্মায়নি। আমি আমার প্রিয়তম ভাইটির মৃত্যুর প্রহর গুনেছি দিনের পর দিন। সেই গুনে যাবার মধ্যে কি মৃত্যুকামনাও ছিল, বিকাশদা? যা ভাবতাম, তাই ঘটল কী করে? আর ঘটে যাবার পর আমি মর্গে ছুটে গেলাম কী করে? সেই সময় আমি কোনও জীবিত মানুষের দিকে তাকাইনি। সমস্ত মৃত মুখের মধ্যে আমি শুধু আমার ভাইকে খুঁজেছিলাম।

প্রণবশ কান্নায় ভেঙে পড়েন। দু' হাতে মুখ চেপে অসহায়ভাবে শব্দ করেন তিনি। বলেন,

এবার আমি আমার ছেলেকে খুঁজব। বিকাশনা। কিন্তু মৃত খুঁজব, না জীবিত, আমি জানি না।

বিকাশ প্রণবেশকে জড়িয়ে ধরেন। এক জন পরিণত মানুষকে বু- হাতে মূখ ঢেকে কানদেতে দেখে লোক জমে যায়। পাঁচ বছর আগে, এ অঞ্চলের হাজার হাজার পরিণত মানুষ এরকম মূখ ঢেকে কেঁদেছিল। তখন তা স্বাভাবিকই ছিল। কারণ ওই সব হত্যাকাণ্ড, যেমন নৃশংস কাশীপুর হত্যার রক্তাক্ত ইতিহাস, প্রাত্যহিক ছিল তখন। মৃত্যু নৈমিত্তিক ছিল। আর হাহাণাদ। এখন আর নয়। এখন শুধুই শান্তি। অপার অনাবিল শান্তি। তাহলে এখন মানুষ কানে কেন?

বিকাশ বিকাশাওয়ালাকে ইশারা করেন। সে নিকশার মূখ ঘোরায়। প্রণবেশ ভবানীপুরের দিকে যেতে চান। দরকার মতো বিকাশের কাছে আসবেন বলে বাস ধরেন তিনি। বিকাশ বাড়ি ফেরেন। লক্ষ্মী বিকাশকে দেখে এগিয়ে আসেন, কী গো, কবর মেলে?

—না, ও ভবানীপুর গেল। শ্যালিকার বাড়ি।

লক্ষ্মী নীর্যবাস ফেলেন। ছলো ছলো চোখে বলেন, পেটের ছেলে হারানোর ছালা যে কী।

লক্ষ্মীর ভাবান্তরে অবাক লাগে বিকাশের। হয়তো পুত্রশোক এমনই বস্তু। লক্ষ্মীর মতো শক্ত মানুষকেও মাঝে মাঝে টলিয়ে দেয়। বিকাশ ভাবতে থাকেন, তাঁর নিজের শোকটি কেমন? লক্ষ্মী মাঝে মাঝে এমন ক্রন্দসী হয়ে ওঠেন দেবার্চন প্রসঙ্গে। এই তাঁর শোক। কিন্তু তাঁর জীবন-যাপনে আর কোথাও শোকের প্রকাশ নেই। বিকাশের শোক কেমন? বিকাশ শোক আলাদা করে টের পান না। তাঁর চোখে জলও আসে না সহজে। তাঁর সারাক্ষণে দেবার্চনের না-থাকা মস্ত হয়ে ওঠে। এই না-থাকা, এই শূন্যতা কি বিকাশের শোক? তিনি ভাবতে ভাবতে বেগুবার উদ্যোগ নেন। লক্ষ্মী বলেন, আবার কোথায় যাচ্ছ?

—বড় খোকা বাজার করেছে।

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ?

—যাই। গাছগুলো লাগিয়ে আসি।

—সত্যি! তোমার কি এক মুহূর্ত বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না?

বিকাশ জবাব দেন না। মনে মনে বলেন— করে না লক্ষ্মী! এ বাড়িতে সব সময় ছোট খোকাকে দেখতে পাই আমি। বারান্দার কোণটা ওর খুব প্রিয় ছিল। চুপ করে বসে থাকত। কতদিন জিজ্ঞেস করেছি— কী ভাবিস ছোট খোকা? বলত, কিছু না বাবা। দেখি।

—কী দেখিস?

—কী দেখি? জানি না তো। হ্যাঁ। গাছ ফুল পাখি আকাশ দেখি। বাবা?

—বল।

—ফুল কখন পাপড়ি মেলে?

—ফুল? রতিন ফুলেরা দিনের আলোয় মেলে। আর সাদা ফুলেরা রাত্রে।

অসহিষ্ণু মাথা নাড়ত সে। বড় বড় চোখ তুলে বলত, ও সব আমি জানি। আমি বলছিলাম, আমি কতদিন কুঁড়ির দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছি, ওর পাপড়ি মেলা দেখব, কতক্ষণ বসে থেকেছি, দেখতে পাইনি। যেই একটু খেলতে গেছি, এ দিক ও দিক গেছি, ওমনি ফিরে এসে দেখেছি, ফুটে গেছে। কেন এরকম হয় বাবা?

আশ্চর্য ছিল ছোট খোকা। ওরা সবাই আশ্চর্য ছিল। যোদ্ধা ছিল বটে। কিন্তু নিষ্পাপ ছিল। তাই বুঝি টিকে থাকতে পারল না।

লক্ষ্মী বললেন, খেয়ে যাও অসুস্থত।

বিকাশ মাথা নাড়েন। থাকেন না। বলেন, প্রণবেশের ছেলেটা হারিয়ে গেল। মনটা ভাল লাগছে না।

—ওর ছেলে না এলে কি না খেয়ে শুকিয়ে মরবে? নিজের ছেলের বেলায়...

বিকাশ আর শোনে না। ক্ষেত্রীয় ক্রান্তি বিনষ্ট করেন। গম্বার কাছে জাহ্নব চিংকার ঘুরপাক

খায়— চুপ করে লক্ষী। চুপ করে। এত নিচুর হোয়ো না। ঈশ্বর তোমাকে কী নিয়ে তৈরি করেছিলেন? হ্যাঁ। ছেলের মৃত্যুর পরও আমি খেয়েছি। খেতে হচ্ছেছে। খাবো গিয়েছি। জীবনযাপন করছি। তোমাদেরও খাইয়েছি। লক্ষী। তুমিও কি খাওনি? বাতানি? তোমার গর্ভজাত সন্তানের মৃত্যুর পরও। আসলে না বেঁচে উপায় থাকে না মাদুরবা। ঈশ্বর এভাবেই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। বেঁচে থাকার অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা সমেত। ঈশ্বর। ঈশ্বর...

ছোট খোকা ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না। কেন করত না? ছোট খোকা রামকৃষ্ণ হিশনে পড়া ছেলে। ধ্যান, ভজন সবই তাকে করতে হত। ও যখন হলেভেনে উঠল তখন বিজ্ঞান মিল না। বলল, মর্শন পড়ব। ফিলজফি।

বরাবর ভাল রেজাল্ট করে আসা ছেলেটা বিজ্ঞান পড়বে আদৌ আশংকিত ছিল। কিন্তু বিকাশ জোর করেননি। শাস্ত্র, অম্বভাষী ছোট খোকার ওপর খুব-আস্থা ছিল তাঁর। যেন ও কোনও অন্যায় করতে পারে না। ভুল করতে পারে না। হয়তো এই আস্থার জন্য, নির্ভরশীলতার জন্য লক্ষী আজও বিকাশকে দোষ দেন— তোমার জন্যই এরকম হল। তুমি কোনওদিন ওকে শাসন করোনি।

বিকাশ বোকাতে পারেননি, ছোট খোকা, দেবার্চন, শাসনের ছেলে ছিল না। ওর মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। ছেলেবেলা থেকে তা উজ্জ্বল ছিল ওর অভিব্যক্তিতে। বেশি কথা সহ্য করতে পারত না। অলসতা দেখতে পারত না। কোনও ভুল-ত্রুটির জন্য অন্যের ওপর দোষারোপ করা পছন্দ করত না। লক্ষীর সঙ্গে লেগে যেত। মাঝে মাঝেই লেগে যেত। লক্ষী বলতেন, ছোট খোকা বড় রুঢ়। দুর্বিনীত।

বিকাশ তর্ক করেননি। কিন্তু তিনি ছোট খোকাকে বুঝতেন। বিনয়ের অভাব নয়, ওটা ছিল স্পষ্টবাদিতা। বড় খোকার সঙ্গেও তার খুব অন্তরঙ্গতা ছিল না। দেবার্চন হয়তো একটু একা একাই ছিল সংসারে। বিকাশের মতোই। বিকাশ লক্ষীকে স্পর্শ করতে পারেন না। বড় খোকাকে স্পর্শ করতে পারেন না। অথচ ওরা ছাড়া বিকাশের আর কিছুই নেই। তিনি শুধু ছোট খোকাকে বুঝতেন। দু'জনের মধ্যে একটা নিবিড় নিভৃত অনুচ্চারিত বোঝাপড়া ছিল।

তেরো বছর বয়সে দেবার্চন প্রথম রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েছিল। স্কুলের জন্য রামকৃষ্ণের নানান বাণী তাকে মনে রাখতে হত। একদিন নিজের ইচ্ছায় সে কথামৃত টেনে নেয়। বিকাশ জানতে চেরেছিলেন, পুরো পড়েছিস?

মাথা নেড়েছিল সে। তারপর খুব স্মিত মুখে বলেছিল, কী সুন্দর সব গল্প বাবা।

বিকাশ হেসেছিলেন। কিন্তু লক্ষীর এগুলো পছন্দ হয়নি। দেবার্চনের সামনেই বলেছিলেন, আশ্চর্য। এইটুকু ছেলেটা কথামৃত পড়েছে, তুমি কিছু বলছ না! এত ডেঁপোমি কেন ওর। সবটাকে বাড়াবাড়ি।

দেবার্চন, ওইটুকু দেবার্চন মায়ের দিকে সোজা চোখ তুলে বলেছিল, তুমি পড়েছ মা? কথামৃত?

লক্ষী অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। কোনওমতে বলেছিলেন, না। পড়িনি।

দেবার্চন বলে ফেলেছিল, তুমি তো স্কুলে পড়াও মা। তোমার কি এখনও ডেঁপোমির বয়স হয়নি?

লক্ষী খুব জোরে চড় কহিয়েছিলেন ছেলের গালে। দেবার্চনের চোখে জল এসে গিয়েছিল। মাথা নিচু করে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল সে। বিকাশ ভেবেছিলেন ও একা থাকতে চায়। কিন্তু তাঁর ধারণা ঠিক হয়নি। একটু পরেই সে একখণ্ড 'ঘরোয়া' এনে লক্ষীর সামনে ফেলেছিল। তার চোখ লালা। লক্ষীও ফুঁসছেন। সে বলেছিল, এই বইটা সামলে রেখো। আমি বাংলা ভালই পড়তে পারি মা। দাদাও পারে। মিলাবের অনুবাদটার কিছুটা আমি পড়ে ফেলেছিলাম।

সে চলে গিয়েছিল। লক্ষী খুব আফালন করেছিলেন সে-দিন— দেখেছ-দেখেছ। কীরকম



চক্রে মেরে গেল গালে। কী অসম্ভব পেকে গেছে ছেলেরা! এ সব বড়দের বই দেখানে তুই পড়বি কেন শুনি! উঃ! ও মানুষ হবে না। কিছুতেই মানুষ হবে না। শোনো, তুমি এখনও শুধু শাসন করবে না?

বিকাশ বলেছিলেন, আমি তাকে শাসন করার মতো কিছু পাইনি। সাবানুপুণ ও বাড়িতে এগা থাকে। নানা রকম বইপত্র পড়ে। হাতের কাছে কিছু পেলে খুসে সেখান থেকে ওর হাতে লক্ষ্য।

—তোমার জন্য ও নষ্ট হয়ে গেল।

সে-দিনও লক্ষ্মী এ কথা বলেছিলেন। আজও বলেন। পরে ছেলেকে ভিজ্ঞাসা করেছিলেন বিকাশ—হ্যাঁ রে। তুই বলছিলিস অনেক মজার গল্প আছে কথামুততে। সেগুলো কী বলে ছেলে? সে উজ্জল মুখে বলেছিল, কেন, ওই যে মথুরাবাবুর ভাব লম্বা। কী কণ্ড বাবা। লোকটা লম্বাধি সমাধি করে পাগল হয়ে গেল। এখন কেন কেউ ওরকম হয় না?

দেবার্চন বই এনেছিল। উৎসাহের গলায় বলেছিল, পড়ে, বাবা, পড়ে।

পড়েছিলেন বিকাশ।

ভাবসমাদির জন্য আবেদন করেছিলেন মথুরাবাবু। জাতি হলনি রামকৃষ্ণ।

বলেছিলেন—ওরে কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁততে পুঁততেই কি গাছ হয়। আর গাছ হয়েই কি ফল পাওয়া যায়?

কিছু মথুরাবাবু নাছোড়। রামকৃষ্ণ সাবধান করলেন—ভাব হলে অঁধে জলে পড়বি। সংসার থেকে মন উঠে যাবে। তখন তোরা বিষয়-আশয় কে দেখবে-কনবে?

ভাতেও দমেননি মথুরাবাবু। কালীর কাছে ভাবসমাদি প্রার্থনা করেছেন। তিন দিন বাদে তাঁর ভাব উপস্থিত। আর ভাব নিয়ে মথুরাবাবুর পাগলের দশা। বিষয়ে মন না দিলে তেত্রিশ ভূত লুটে যায়। চোখের সামনে দেখছেন কিছু মন লাগাতে পারছেন না। বিষয়ে ইচ্ছা যায় কিন্তু ইচ্ছার নামের প্রবলতর টান তাকে সংসারের কর্মে বিমুখ করে। শেষে আবার ভাবসমাদি ফিরিয়ে দেবার বায়না করলেন মথুরাবাবু। স্বীকার করলেন তাঁর কাজ পদসেবা। পরসেবা। সমাধির আনন্দ তাঁর জন্য নয়। রামকৃষ্ণ তুলসীদাস স্মরণ করিয়ে শিক্ষা দিলেন। বলেছিলেন—

তুলসী, য্যাসা ধ্যান ধর,

য্যাসা বিয়ানকা গাই।

মু মে ভুণ চানা টুটে

চেৎ রাখয়ে বাছাই।

প্রসূতি গাই দেখিসনি? মুখভর্তি ঘাসপাতা চিবোচ্ছে। কিন্তু মন পড়ে আছে বাধুরে। তেমনি করেই ডাকতে হয় ইশ্বরকে। সংসারধর্মে কর্ম রাখো। মন রাখো ইশ্বরে।

ছেলের মাথায় হাত রেখেছিলেন বিকাশ। মথুরাবাবুর টানাপোড়েনটি ঠিক ধরতে পেরেছিল দেবার্চন। বিকাশের ভাল লেগেছিল। সব কিছু গভীরভাবে অনুধাবন করার প্রবণতা ছিল দেবার্চনের। বিকাশ বলেছিলেন, এই মথুরাবাবুর নামেই আমাদের এ জায়গার নাম মাধুরের গড়, জানিস?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। লোকে বলে। এ জায়গা নাকি মথুরাবাবুর ছিল এক সময়। যদিও এই জনশ্রুতির পেছনে কোনও প্রমাণ নেই।

ছেটি ছেলেকে অনেকদিন অনেক ইতিহাস শুনিয়েছেন বিকাশ। বিদেশি উপকথা শুনিয়েছেন। দেবার্চন মন দিয়ে সব শুনত। কিন্তু দেবার্চন শুনত না। এ সব শোনার পরিবর্তে

সে অনেক বেশি পছন্দ করত ঘুমোতে। বিকাশ দেবর্শিসহকে কোনওদিন পাঠ্য বইয়ের বাইরে কিছু পড়তে দেখেননি।

অনেক দিন পর, দেবর্শিনের যখন ইলেক্ট্রন, তখন আবার শুধু কথামৃত পড়তে দেখা গেল বিকাশ। ততদিনে অনেকখানি ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত অর্জন করেছিল সে। বিকাশও তাকে প্রশংসা করে কমিয়ে দিয়েছিলেন। যোগাযোগও কমই হত ছেলের সঙ্গে কারণ বিকাশের কাজের দায়িত্ব বাড়ছিল। উর্ধ্বতন অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে হচ্ছিল তাকে। তাদের নানা রকম ব্যক্তিগত কাজের দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে নিচ্ছিলেন। নিজের উন্নতির সিঁড়ি প্রশস্ত ও পোক্ত না করে তাঁর উপায় ছিল না কারণ সম্প্রদায়ের বিকাশের উন্নতির পেছনে আত্মত্যাগ ফিরতেন। বিকাশের তা বোধ করার ক্ষমতা ছিল না। হয়তো তাঁরও মনের কোণে এইসব পদলিঙ্গা ছিল। দেবর্শিস বরাবরই দূরের ছিল। দেবর্শিনও দূরতর হয়ে উঠছিল তখন। সে-সময় একদিন আবার তাকে কথামৃত পড়তে দেখে ঐহসুক্য বোধ করেছিলেন বিকাশ। দেবর্শিনের অগোচরে বইগুলির পাঠ্য উলটোছিলেন। প্রায় প্রতিটি খণ্ডই পেনসিলের দাগ দিয়েছিল সে। রামকৃষ্ণের নানা উক্তি ও ব্যাখ্যা সে আশ্রয় করেছিল। বক্তৃতাগুলির প্রসঙ্গে এসে মার্জিনে পেনসিল দিয়ে লিখেছিল— বোগাস। একটু আগেই জীবের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করতে চাইছিল। এখন আবার বিগতস্পৃহ হতে চাইছে। বিগতস্পৃহা কি কর্মবিমুক্ততাও নয়? ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা যদি নাই থাকবে মানুষের তবে আর বেঁচে থাকার জন্য এত সংগ্রাম কেন?



মাধুরের গড়ে ছটা পুকুর ছিল, এখন দু'টি আছে। চারটি পুকুর বুজিয়ে চারটি বাড়ি হয়েছে। মাঠ ছিল তিনটি। একটিতে লোকনাথাবার মন্দির হয়েছে। আর একটির ওপর শিগিরি ক্লাব উঠবে। সেনদের জমি ছিল ওটা, বিক্রি হয়ে গেছে। বিশাল ব্যবসাদার ছিল সেনরা এক সময়। বিকাশের মনে আছে, ছোটবেলায় সেনদের দোতলা বাস দেখেছেন তিনি। জাহাজও ছিল তাঁদের। এই এলাকায় সেনদের বাড়িটাই সবচেয়ে বড়। প্রায় জাহাজের মতো। বাড়িটার দখল নিয়েছেন অরুণ সেন। সেনদের ব্যবসা যিনি বিশালতর করে তুলেছিলেন, তাঁর নাম ছিল বিজয়সেন সেন। একটি ছেলে ছিল তাঁর। দেবেশ্বর সেন। দেবেশ্বরের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। অরুণ, বরুণ, হিরণ এবং অল্পপূর্ণ আর মহামায়া। ব্যবসা ধরে রাখা বলতে যা বোঝায়, এ পর্যন্ত অরুণ সেনই তা পেরেছেন। অত বড় করে না হলেও কম কিছু নেই। মাধুরের গড়ে একটাই মাঠ থাকবার মতো সুদৃশ্য হোটেল, রাজেশ্বরী, অরুণ সেনের। ইদানীং রাজেশ্বরীতে নানা রকম উৎসব হয়। উৎসব বলতে, বিয়ে-অল্পপ্রাশন। নিজেদের বাড়িতে এ সবের কামেলা আজকাল অনেকেই পোহাতে চায় না। বিশেষত যাদের ঘরবাড়ি ছোট। আগে বাড়ি ছোট হলে সামনের রাস্তায় প্যাভেল হত। অথবা সংলগ্ন মাঠ থাকলে মাঠে। এখনও হয় না তা নয়। কিন্তু কমে এসেছে। প্যাভেলের তলা দিয়েই তখন গাড়ি যাতায়াত করে। পথচলতি মানুষ সানাইয়ের ধ্বনি শুনতে পায়। উলুধ্বনি হাঁকাতাক শুনতে পায়।

এই এলাকায় বিয়ের জন্য রাজেশ্বরী ভাড়া দিচ্ছেন অরুণ সেন। রাজেশ্বরী ভাড়া বাঁওয়া হোটেল রাজেশ্বরী নয়। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে লোক এসে এখানে থাকতেই পারে শুধু। বৃদ্ধ বিনয় খাড়া বহুদিন ধরে হোটেলের দেখাশোনা করেন। ছেলে মোহনই হোটেলের বয়ের কাজ

করে দেয়। মেদিনীপুরের লোক বিনয় কণে এখানে এসেছিলেন বিকাশের খোঁস। নেই। হোটেলেরই একতলায় তাঁরা থাকেন। কখনও মাধুরের গড়ে ঘনজীবনে বা সঙ্গীতের ভাঁসে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়নি। রাজেশ্বরীর সাননে থাকা চায়খাটিতেই এ পর্যায়ের সন্ধ্যায়েরি দুগোঁসব হয়। ভোগ রান্না ইত্যাদির ব্যবস্থা রাজেশ্বরীতেই। বিনয় বলে প্রথম ঘর খুলে সেতয়া, ঘর পরিষ্কার করানো ইত্যাদি দায়িত্ব পাণ্ডন করেছেন ঠিকই, কিন্তু ওই পর্যন্তই। সন্ধ্যারি আশ নেননি কখনও।

কত রকম মানুষ এই মাধুরের গড়ে। অল্পত। অন্যরকম। অরুণ সেন নিজেই কি কম অল্পত। হোটেল চালিয়ে, গেল্লির কারখানা, বড়শাজুরের কাপড়ের দোকান সামলানোও তাঁর অল্পত খোঁস। সিনেমার প্রযোজনা। তাঁর প্রযোজিত বেশ কয়েকটি ছবির নাম একতাকে বলে দেওয়া যায়। এ জন্য তাঁকে হৈকে রাখবার লোকের অভাব নেই। নানা রকম স্বার্থে কিংবা কোনও স্বার্থের সন্ধান করা যায় কি না এমনই চিন্তায় বহু লোক তাঁকে হৈকে ধরে। দীর্ঘদিন ধরে, আর ত্রিশ বছর ধরে অরুণ সেনের গায়ে যিনি চিরস্থায়ী হয়ে সেগে আছে, তাঁর নাম পরেশ বোস। বিকাশ এই মানুষটিকে দেখেও কম আশ্চর্য হন না। মাধুরের গড়ে পরেশ ছোটবেলা থেকে ছিলেন না। ওই বছর ত্রিশেক আগে অরুণ সেনের হাত ধরেই তাঁর আগমন। প্রথমে ওই বিশাল বাড়িতেই তাঁরা থাকতেন। লোকে মনে করেছিল অরুণ সেনের কোনও দুঃস্থ আত্মীয় হয়তো। কিন্তু অরুণ সেন যত সহজে কোনও চাটকারকে আশ্রয় দিতেন, তত সহজে কোনও আত্মীয়কে নয়। ইতিমধ্যেই দুই ভাইকে তিনি পথে বসিয়েছিলেন। কিংবা তাঁরা নিজেরাও শখ করে পথে বসতে পারেন। পরস্পরের মধ্যে নানান মামলা কুলছে এখন। বিষয়-সম্পত্তিজনিত মামলায় কেউ সোঁচী বা নির্দোষ হয় না। যে যেমন পারে ছুটে নেয়। অন্য কেউ হলে লোকে বলত, দেবেহিস, অমুকের সমস্ত সম্পত্তি কেমন আত্মসাৎ করল। কিন্তু এ হল তিন ভাইয়ের মামলা। বরুণ আর হিরণ সম্পর্কে এখনকার মানুষের কোনও সহনুভূতিও নেই। বরুণ অতি উগ্রাসিক। ধনবান পিতার পুত্র হিসেবে তাঁর গর্বের সীমা নেই। সাধারণ যে-কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাঁর মাথাটা পেছন দিকে হেলে যায়, মুখভর্তি পানের রস সামলাতে সামলাতে তর্জনী তুলে কথা বলেন তিনি। পানের রস ভরা মুখের অপরূপ উচ্চারণে সব কিছু নস্যাত করে দিতে চান। যথা যাক, ছোটরা তাঁর কাছে চাঁদার জন্য গেল। বলল—কাকু চাঁদা।

বরুণ তখনই মুখ তুলে ফেলবেন, একটু চুন ছোঁয়াবেন জিভে, চাঁদ দেখলে কুকুর যে-ভাবে টেনে টেনে ডাকে, সে-ভাবে বলবেন, হ্যাঁ? চাঁদা? কী হয়ে চাঁদা ডিয়ে?

—কাকু সরস্বতী পূজো... কিংবা জলসা... কিংবা কালীপূজো।

—হ্যাঁ টাকা কি খোলামকুই? চাইলেই পাওয়া যায়? হয়ে না হয়ে না। যাও যাও।

বরুণ গজগজ করেন, কতবার বলেছি, আমি চাঁদা দিই না। কতবার বলেছি, তবু চাই চাই।

এরকম হয়। প্রতিবার হয়। কিন্তু ছোটরা তবু যায়। প্রত্যাশা করে। কোনওদিন মত ফিরতেও পারে। কিংবা তাদের কাছে এটাও একটা খেলা। মাধুরের গড়ে খুব সাধারণ গৃহস্থের অবস্থাও বরুণের চেয়ে ভাল। কিন্তু বরুণ তা মনে করেন না। বরুণ মোক্ষদমা মিটে গেলেই তিনি যখন প্রচুর টাকা পাবেন তখন তাঁর হাত গৌরব ফিরে আসবে— স্বপ্ন দেখেন বরুণ। দাদার মতো অ্যাধাসেভারে চাপছেন, ঠাকুরদার মতো জাহাজ কিনছেন। এবং... এবং... সিনেমায় বিনিয়োগ করছেন। হ্যাঁ, অবশ্যই, আর কিছু না হোক, অ্যাধাসেভার না হোক, সিনেমায় বিনিয়োগ তাঁকে করতেই হবে। তাঁর মুখে পানের রসের সঙ্গে তুমুল ঈর্ষা জড়িয়ে যায়। ঘৃণা জড়িয়ে যায়। দাদা একা সব ভোগ করবে কেন? কোন অধিকারে?

কবে এইসব মামলা শুরু হয়েছিল? বোধহয় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে। তখন ছোট ছিলেন বিকাশ; সম্পত্তি বিষয়-আশয় নিয়ে ভাবার মানসিকতা ছিল না। কিন্তু সেইসব মামলাব নিষ্পত্তি আজও হয়নি। যৌবনের প্রাকলয় থেকে ঈর্ষা করতে করতে, প্রত্যাশা করতে করতে, স্বপ্ন

দেখতে দেখতে আজ কেউ যাটোখণ্ড কেউ পঞ্চাশোখণ্ড। কোনওদিন কি এ মামলা মিটেবে?

বকশের একেবারে বিপরীত চরিত্র হিরণ। বড়লা অরুণ সেন সম্পর্কে তিনি খুবই অস্বাভাবিক। হিরণকে সুস্থ অবস্থায় কখনও দেখা যায় না। স্নোকে বলে, সেই যে ছোটবেলায় বোতল ধরেছিল, সে-নেশা আর গেল না। শুধু দুধের বদলে এখন স্নোতলে মদ থাকে। বিকাশের মাঝে মাঝে মনে হয়, কুস, সে-সময় কি দুধের বোতল ছিল না?। যখন হিরণ ছোট ছিলেন? বিস্ময়ে বিকাশ? ওই পঞ্চাশ-বাহান বছর আগে শিশুদের তিনকেই নিশ্চয়ই দুধ খাওয়াতো হত। কিন্তু মানুষ মজা করার সময় অত কিছু খেয়াল রাখে না। আর হিরণের উল্লসের আরও একটা মজা লুকিয়ে থাকে সব সময়। অরুণ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলে হিরণ বলেন, দাদা? দাদার মতো লোক হয়? অরুণকে দাদা রাখছে না? তার দুই ছেলে হিরণ আর বনিজকে মানুষ করছে না? বোনটার জন্য বিয়েই করল না সারা জীবন।

হ্যাঁ। এটা একটা কথা বটে। অম্পূর্ণ বড় ঘরে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাঁর যখন বৈবাহ্য এল তখন স্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে মারধরও করে। ভাতারখাকি, রাফসী, ভাইনি, এইসব বলে নিত্যা গালাগালি করা হত তাঁকে। তাঁর ছোট ছোট দুই ছেলে হিরণ আর বনিজকে কেড়ে তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। অরুণ সেন সমস্ত প্রভাব খাটিয়ে তাঁর ভাগ্যেদ্বয়কে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। বোনের হাতে নিজের সংসারের ভার তুলে দেন। বোনের নিরাপত্তার অভাব হবে বলে, বোন সংসারে আশ্রিতাবৎ হয়ে যাবে বলেই কি তিনি বিয়ে করেননি? এ কথা নিজের মুখে কারওকেই বলেননি তিনি। কিন্তু লোকে এভাবেই নিতে পছন্দ করেছে। নইলে, সফল, ধনী, সুপুরুষ অরুণ সেন বিবাহ করবেন না কেন?

লোকে হিরণকে অন্যভাবে খোঁচায়। বলে, কিন্তু ধরো, তোমাদের বোনকে আশ্রয় দিলেও তোমাদের দু' ভাইকে তো ঘরছাড়া করল অরুণ? সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করল তো?

—কোন শালা বলে?

জড়ানো, স্থলিত জিহ্বে প্রতিবাদ করেন হিরণ। হারুর স্টেশনারি দোকানের সামনে, কিংবা ব্রজগোপালের ওষুধের দোকানে আজ্ঞা হয়। হিরণ বলেন, আমার দাদা তো আমাদের ঘর থেকে বের করেনি। বলেছে, তোরা নিয়ম মেনে থাক। সংসারের একটা লক্ষী-অলক্ষী আছে। আমার অত বড় দাদা কত মদ খায় কিন্তু কেনওদিন এক ঘোঁটা মাতলামি করেছে? কিন্তু আমি করেছি। আরে অত সফিস্টিকেশন আমার ভাল লাগে না। শালা, মদ খেয়ে যদি না চোলাব, মেয়েছেলে ধরে নাই ক্ষুণ্ণি করব, তা হলে মদ খাবার কী মানে? তাই নিজেই ও বাড়ি ছেড়ে দিলাম। ধূস। আর মেজদাটা একটা ঢামলা। ওর কী করে চলে জানেন? ওই আমার বড়দার টাকায়।

—তোমার কী করে চলে হিরণ?

—ওই আমার বড়দার টাকায়।

লালন-পালন করছেন বটে অরুণ সেন। কিন্তু লোকের খোঁচানোর স্বভাব যায় না। তারা বলে, কিন্তু সম্পত্তি? অত বড় সম্পত্তি থেকেই তো এইসব খরচ জোগায় অরুণ? এতে তো তোমাদেরই ভাগ।

—কোন শালা বলে?

আবার প্রতিবাদ করেন হিরণ।

—আমাদের সম্পত্তি এখন আদালতে টুসটুস করে কুলছে। পাকা আমের মতো। আমরা হাঁ করে আছি। আমটা দুলছে দুলছে। এই বুঝি পড়ল। কার দিকে পড়ে? কার দিকে? দাদার যা ইনকাম সব ওর নিজের করা। আমি সাক্ষী আছি। আমি। আমার দেবতার মতো দাদার গারে তোমরা কলঙ্ক লেপন কোরো না।

কইমাছ কিনে বাড়ি ফিরছেন হিরণ। থলে থেকে লাফ দিয়ে কইমাছ বড় নর্দমায় পড়ল।

হারুর দোকান থেকে এক টুকরো কাগজ আর পেন চেয়ে কাগজে খস খস করে লিখে নর্দমায় ফেলে দিলেন হিরণ।

—কী করলেন হিরণদা? হারু প্রশ্ন করেছিল।

হিরণ বলেছিলেন, আমার বাড়ির ঠিকানাটা মাছটাকে দিয়ে দিলাম। ড্রেনটা আমার বাড়ির সামনে দিয়েই গেছে তো।

কথা নেই, বার্তা নেই, মানোদা ঝিকে ঘরে তুললেন হিরণ। পাড়ায় গেল-গেল রব। ছি ছি! কী ঘেন্না! শেষ পর্যন্ত ঝি-চাকর? ছি ছি! এ পাড়ায় আর বাস করা যাবে না। মুখ টেপাটোপি। হাসাহাসি। পাড়ায় জোট হল— ওকে পাড়াছাড়া করো।

কিন্তু কার পাড়া? কে ছাড়া করে? হারুর দোকানে লোকজন জমা হয়ে হিরণকে ডাকল, হিরণ। এ তুমি কী করছ? মদ খাচ্ছ খাও। কিন্তু এটা একটা ভদ্র পাড়া। এখানে তুমি ঝি-চাকর ঘরে তুলছ?

হিরণ প্রথমে অবাক হন। তারপর বলেন, অ। মানোদা? তাতে কী হয়েছে? মানোদা ঝি বলে কি মানুষ নয়? ওর কি মন নেই?

মানোদা যাচ্ছিল পথ দিয়ে। লোকে দেখল, হ্যাঁ, মন তো আছেই, মানুষ যখন, শরীরও আছে মানোদার। হিরণ ডাকলেন, অ্যাই। অ্যাই মানো। শোন এ দিকে?

মানোদা মুখ ঝামড়াল।

—অ্যাকোন ডেকোনি তো। কাজে যাচ্ছি বলে।

—অ্যাই হারামজাদি। শোন।

হিরণের বাঘের গর্জন। মানোদা পায়ে পায়ে আসে।

—কী বলতিছ। বলো। আমার দ্যার হইয়ে যাইচ্ছে।

—অ্যাই দ্যাখ। অ্যাই এনাদের দ্যাখ। ঐদের চিনিস?

—চিনবনি কেন গো? এনাদের বাড়িতি তো কাজ করে খাই।

জনতা ভাঙতে শুরু করেছে তখন। পঞ্চায়েতি জোট থেকে যে-যার মতো মুখ রক্ষা করতে ব্যস্ত। সত্যি! হিরণকে নিয়ে পারা যায় না। দু' কান কাটা। নির্লজ্জ। ওকে নিয়ে মাথা ঘামানোটাই ভুল হয়েছে।

হুত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও কেউই চলে গেল না ওখান থেকে। চাক ভাঙতে গেলেও মৌমাছির। যেমন ভাঙা চাক ঘিরে গুনগুন করে, তেমনই করতে লাগলেন ভদ্রনোকেরা। হিরণ বললেন, শোন। এইসব বাবুদের পাড়ায় তুই উঠেছিস। তুই এখন ভদ্রলোক, বুঝেছিস? তুই আর ঝি-কাজ করতে যাবি না।

—ইঃ! কাজ করতে যাবনি! আমি জন্ম-ঝি বুয়েছ? আমার মা ঝি ছিল। আমিও ঝি। হাজার সাবানজলে ধুলেও আমার গা থেকে ঘামের গন্ধ যাবেনিকো। বলে না— দু' দিনের রানি।/ তার কত ফড়ফড়ানি। বলি, আজ তুমি আমারে ঘরে রেইখেচ। কাল যে নাতি মেরে বার করে দেবেনি তা কে বলতি পারে? তখন আমি কোথায় ভাতার খুঁজতি যাব শুনি?

গর্জে উঠেছিল হিরণ, কী এত বড় কথা? আমি তোকে লাথি মেরে বের করে দেব? মানো? এত বড় কথা বলতে পারলি তুই? চল। তোকে আজই বিয়ে করব আমি। এখনি করব।

মানোদাও গর্জে ওঠে, ও কথা বোলোনিকো। আমায় বিয়ে করা ভাতার আছে। তাকে কি ফেলে দিয়ে যাব? আর আমারে বে করলি আর এ পাড়ায় থাকতি হবে না। ভদ্রনোকেরা তোমারে ছিড়ে খাবে। শোনো, অ্যাই পরিষ্কার কইলুম, তোমার ঘরে আমি আর থাকবনি। আমি ঝি মানুষ, আমারে তেমনি থাকতি দাও। বাবারে বাবা। সব ভদ্রনোক গো...

মানোদা মিলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোকের পাড়ায় ক'দিন হিরণ আর মানোদা ছাড়া কোনও কথা ছিল না। লোকে বলে, ক'দিন নাকি হিরণকে বেশ উদাস-উদাস লাগত। এ পাড়ায়

হিরণের গল্পের শেষ নেই। একদিন একটা ছোট ভিথিরির ছেলে হাকব মোকানে এসে হাত পাতল। অনেকেই ছিল, কেউ পাতা দিল না। হিরণ পকেট থেকে লশ টাকার নোট কেঁচু করে সন্ন্যাসীর মতো মুখ করে ছেলেটির হাতে দিলেন। ছেলেটি নোট নিয়ে জোঁ-দোঁজ পাছে কাবু ভুল করে দিয়ে থাকেন। পাছে ফেরত চান। হাক বলেছিল, সে কী হিরণদা। একেবারে দশটা টাকা দিয়ে দিলেন।

—দিলুম।

হিরণের মুখে মায়াবী আলো, দাদার পয়সায় প্রতিপালিত মনুষ্য মানুষ। বললেন, কুকলি হাক ছেলেটাকে দেখে বড় মায়া জাগল রে। কত জায়গায় কত মোকেশ সঙ্গে শুই। ভিথিরি-টিথিরিও বাদ যায় না। আমার কত সন্তান এভাবে ভিক্ষে করে যাচ্ছে যে জানে।

হাক চূপ। এভাবে কেউ নিজের সম্পর্কে বলতে পারে? হিরণ পারেন। হিরণ মদ্যপ। হিরণ বেপারোয়া। হিরণ পারেন। তিনি যে-কোনও মানুষকে ক্ষমা করতে পারেন। যে-কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। শুধু পরেশকে সহ্য করতে পারেন না। বড়দা, মেজদা নয়। মানোদার ভাতার নয়। কোনও ভিথিরিণী নয়— হিরণের একমাত্র শত্রু পরেশ বোস। বিকাশের মনে হয়, হিরণের নেশাগ্রস্ত সপ্তার আড়ালে একজন শুদ্ধ সুন্দর মানুষ আছেন। তাঁর যত্নতত্ত্ব গতিবিধি, যেমন-তেমন জীবন-যাপন— সেখানে কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি।

মৌখিক আলাপ ছাড়া পরেশ বোসের সঙ্গে কোনও ঘনিষ্ঠতা হয়নি বিকাশ বা রঞ্জনদের। বিনয় ধাড়ার মতো পরেশও এ পাড়ায় চিরদিন অলগা হয়ে রইলেন। এ পাড়াতেই জীবন-যাপন, অথচ ভাব এমন, যেন দু'দিনের জন্য বেড়াতে আসা। এ দিক থেকে অতুলনীয় বলা যায় আনিসুজ্ঞামানকে। বছর আট-দশ হল এই মাথুরের গড়ে এসেছেন আনিসুজ্ঞামান। ইতিমধ্যেই তিনি এ পাড়ার একজন হয়ে উঠেছেন। বিকাশ দেখেছেন বাস নিবিশেষে মিশে যাওয়ার গুণ আছে আনিসুজ্ঞামানের মধ্যে। বছর তিনেক আগে পর্যন্ত সেই আগুন হয়ে যাওয়া সময়ে অনেক ছাত্রকে সাহায্য করেছিলেন আনিসুজ্ঞামান। নিজের বিপদের ক্বী থাকা সত্ত্বেও তাদের আশ্রয় দিয়েছেন ক্ল্যাটে। অধ্যাপকদের নিজেদের জীবনেরও কোনও নিরাপত্তা ছিল না তখন। কোথাওই কোনও নিরাপত্তা ছিল না। বাটের দশকের শেষ থেকে যে-অস্থিরতা পশ্চিমবঙ্গে গ্রাস করেছিল তার জন্য সাধারণ মানুষ একেবারে প্রস্তুত ছিল না। ১৯৬৯ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচন হল। যুক্তফ্রন্ট সরকার এল। বিভিন্ন দলগুলির পারস্পরিক হৃদয়ের মধ্যে প্রশ্ন উঠল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রকৃতি ও যুক্তফ্রন্টের একা নিয়ে। মাত্র তেরো মাস কোনওক্রমে টিকে থাকার পর যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হল ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হল। এক বছর পর ১৯৭১ সালে এল আবার এক নির্বাচনের সময়। সেও এক মার্চ মাস। ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছিল শ্রমিকদের মার্কসবাদী ট্রেড ইউনিয়ন সি আই টি ইউ। গড়ে উঠেছিল ছাত্র সংগঠন এস এফ আই। সে-সময়েই কংগ্রেসেও দেখা দিয়েছিল ভাঙন। সংগঠন কংগ্রেস এবং শাসক কংগ্রেস। সেই সময়ই শুরু হয়েছিল গুপ্ত হত্যার রাজনীতি এই বাংলায়। এই বাংলায় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এবং সেই সময়ই নেওয়া হয়েছিল ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি পদক্ষেপ—এক, রাজন্যভাতা বিলোপের সিদ্ধান্ত, দুই, চোদ্দোটি দেশীয় ব্যান্ড জাতীয়করণ করা। কিন্তু এ সময়ই শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস ও হত্যা। নির্বিচার হত্যা। যারা পরিবর্তন আনবে বলে বিপ্লব করতে চেয়েছিল তারাও নিয়েছিল খতম নীতি, যারা দমন করতে চেয়েছিল তারাও নিয়েছিল অসংখ্য মৃত্যুর পরোয়ানা। তারই মধ্যে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হল। বরানগরে বাংলা কংগ্রেস হেরে গেল। কিন্তু কংগ্রেসের সমর্থনে বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে আবার তৈরি হল কোয়ালিশন সরকার। আবার নতুন করে আগুনের হলকা এসে লাগল। উত্তাপ ছড়াতে লাগল প্রতিদিন, প্রতিমুহুর্তে। আগস্ট মাসে কাশীপুরে ঘটে গেল এক বীভৎস গণহত্যা। টানা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে



কালীপুরে একটি নারকীয় উত্থান ও তাণ্ডব চলেছিল সে-সময়। পারস্পরিক কন নিয়ে— বুনের বদলা খুন— জগতে জগতে কংগ্রেস কর্মীর হত্যাকাণ্ডী নরকখানসের ওপর বদলা নিতে গিয়ে সে-দিন মারা হয়েছিল প্রচুর অরাজনৈতিক, সাধারণ, নিরীহ মানুষকেও। তাদের মধ্যে বিশেষ ও স্থূল পড়ারারও বাদ ছিল না। যারা এ সব হত্যা করে চলেছিল তারা কি জানত না, এইসব বালক, কিশোর বা সাধারণ নিরীহ মানুষেরা কংগ্রেসকর্মী হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয়? নিশ্চয়ই জানত। তবু তারা তা করেছিল কারণ খবরে খবরের জন্য দেখা হত্যা, হত্যা। আর এইসব প্রতিধ্বংস বা প্রতিহতায় শুধু শোধ নেবার বাসনাই লুকিয়ে থাকে না। খাতিয়ে আপন শক্তির নিশ্চিততর বহিঃপ্রকাশের ইচ্ছা। যেন আশ্রম খেতে খেতে বলা— ভুই কী পারিস? দ্যাখ— তোর চেয়ে আমি অনেক বেশি পারি। ১৯৭২ সালে আবার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের দাবি উঠল। আবার আরও একটি মার্চ মাস। ইতিহাসের পাতায় আবার নতুনতম সংযোজন। এ বারে ক্ষমতায় এল কংগ্রেস। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই শাসকজনল কার্যক্রম হল। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরি অবস্থা জারি করা হল দেশ জুড়ে। আর এই কয়েক বছরে নির্মাতিত হল, নির্মীড়িত হল, মৃত্যুর মুখে চলে যেতে লাগল হাজার হাজার মানুষ। কেউ যুবক, কেউ তরুণ, কেউ শিল্পী, কেউ অধ্যাপক বা সাংবাদিক। সংবাদপত্রের বিবৃতির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হল। মার্কস, লেনিন বা এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ হল। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নিষেধের আওতায় পড়লেন। ভারত স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে ভুলে গেল। এরই মধ্যে এ বছর জানুয়ারিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে নির্বাচনি লড়াই ঘোষণা করেছে সংগঠন কংগ্রেস, ভারতীয় লোকদল, সোস্যালিস্ট পার্টি ও জনসঙ্ঘ দল। তৈরি হয়েছে জনতা পার্টি। জ—অ—ন—ও—তা—আ পার্টি।

সেই নির্বাচন সমাপ্ত। জরুরি অবস্থা এখনও জারি আছে। কিন্তু কিছুটা শিথিল করা হয়েছে নির্বাচনের জন্য। মিছিল ও প্রচারণার হাওয়া বন্ধ। বিকাশ প্রস্তুত। তাঁকে নির্বাচনি কেন্দ্রে দায়িত্ব নিয়ে যেতে হবে। কেমন হবে এ বারের নির্বাচন? কী হবে এই নতুন ইতিহাস? সাধারণ লোকের কোনও নিশ্চিত ধারণা নেই। তারা শুধু এটুকু অনুভব করতে পারে যে বিগত আট বছরের জের এখনও কাটেনি। লোকসভা নির্বাচন হলে জুন মাস নাগাদ বিধানসভা। আপাতদৃষ্টিতে জনজীবন স্বাভাবিক। স্থির। উত্তেজনাহীন। কিন্তু বিকাশ নিজের জীবন দিয়ে দেখেছেন, রাজনৈতিক ঝড় হঠাৎ আসে, তার উত্থান অতি ধীর। গোপনীয়। স্বদম্পন্দনের চেয়েও অসোচর তার পদধ্বনি। কিন্তু তা হঠাৎ উদ্ভিত হয়। তীব্র শক্তিতে ভেঙে-চূরে দেয় প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। যেমন বিকাশ হয়েছিলেন। যেমন প্রণবেশ হয়েছিলেন। বিকাশ আকাশের দিকে তাকান। কালচে দু'খণ্ড মেঘ ভেসে যাচ্ছে। বৈশাখ চলে এল প্রায়। যে-কোনওদিন কালবৈশাখী হবে। বাজারে কাঁচা আম উঠেছে। আকাশে মেঘ ভাসছে। ভেসে যাচ্ছে সময়ের মতো। জীবনের মতো। ইতিহাসের মতো।

লক্ষীর স্থল এসে গেল সামনে। দরজা খোলা। তার মানে শেফালির মা কাজ করছে। বিকাশ উঁকি দিলেন ভেতরে। সমস্ত বইপত্রের ছূর্ণ নামিয়ে বাঁট দিচ্ছে শেফালির মা। বিকাশকে দেখেই ঘোমটা টেনে ছুটে এল সে। একটা চেয়ার ঝেড়েমুছে বলল, বসেন। দাদা।

বিকাল বসলেন। তাঁর খুব জলতেষ্টা পেলে। বসলেন, এক গ্রাস জল দিতে পারো?

—এই আনি।

ছুটে গেল শেফালির মা। বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এল। কুঁজো থেকে ঠাণ্ডা জল ঢেলে গ্রাস এগিয়ে দিল বিকাশের দিকে। বিকাশ হাতে জল নিয়ে ঘাড়ে মুখে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর একটানা সবটুকু জল খেয়ে বসলেন, আর একটু দেবে?

আরও এক গ্রাস জল দিল শেফালির মা। বিকাশ দেখলেন, বয়সের ছাপ পড়েছে শেফালির মার মুখে। দারিদ্র্য, পরিশ্রম, ক্লান্তি সব মিশে আছে। বেশ সুশ্রী ছিল শেফালির মা তখন। যখন

প্রথম এসেছিল। একটা নদ, তীর, লঙ্কারূপ ভাব থাকত মুখে আর ব্যবহারে। তাতে আরও সুন্দর লাগত তাকে। এখনও মাথায় একটা বিশাল ঝোঁপ। জীবন মানুষকে ঘোরা বেঁকে কোথায় এনে ফেলে। দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলা থেকে এসে উদ্ভাস্ত কলোনিতে মূল ঠিকোঁছিল শেফালির মা-রা। মল্লিনাথ ভাত্তাচারের গ্রাম সম্পর্কে জেনা ছিল তারা। মল্লিনাথই উদ্ভাস্ত কলোনির ওই ঘরটা জুটিয়ে দেন। বহুদিন ওদের খরচপত্রও জুটিয়েছিলেন। তখন মল্লিনাথের সবে ডাক্তারি পড়া শেষ হয়েছে, ভাল করে পসার জমেনি। বিকাশ কলোনের দেয়তোয়। চল্লিশের দশকে, সেই সময়ের কথা, যারা দেখেছে, কেউই ভুলতে পারবে না। কত মানুষ যে বিষয়-সম্পত্তি হারিয়ে নিশ্চে হয়ে গেছে তখন। সমস্ত হারিয়ে, শুধুমাত্র বাঁচার জন্য, দু' মুঠো ভাতের জন্য যা পেয়েছে তাই করেছে। কুল মাস্টার গান্ধী বিক্রি করেছেন। কলের কই পনের বাড়িতে বিগিরি করেছে। কত ভাল মেয়ে বিক্রি হয়ে গেছে। কত মেধাবী ছাত্রের পড়া হয়নি।

যারা আগে-ভাগে হাওয়া দেখে পাততাড়ি গুটিয়ে নিখিল ভারাই একমাত্র মনমোহনা বাঁচিয়ে চলতে পেরেছিল তখন। সেই বড় থামতে না-থামতেই কতবার যুদ্ধ হল। কতবার রায়ে লাগল, কত রকম আন্দোলন হল দেশটায়। বিকাশ ভাবেন, মানুষের জীবন চিরকালই কি এরকম অস্থির?

দ্বিতীয় প্লাসের পুরো জলটা খেলেন না বিকাশ। খানিকটা দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা চারাগুলোতে ছিটিয়ে দিলেন। শেফালির মাকে বললেন, পুরনো কাগজ জমিয়েছ?

—হ। প্রায় শাষ হইল বইলা।

—আমি দেখি নিতাইকে যদি পাই ত্রো পাঠিয়ে দেব।

—নিতাইরে আমি কহিসি। সকাল সকাল আমার লগে দাখা হইসিল। হায আইয়া লইয়া যাইব।

বিকাশ উঠে দাঁড়ান। তাঁকে গাছগুলো লাগাতে হবে। তাঁর এই গাছ লাগানোর ব্যতিক নিয়ে অনেক হাসাহাসি করে। কিন্তু বিকাশ চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পান— মাথুরের গড়ে আর একটিও বড় গাছ নেই। সব গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। সব পুকুর বুজে যাচ্ছে। সব মাঠ ইটে ভর্তি। শুধু গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ি। অনেক অনেক প্রাণহীন বাড়ি।

আর একটু এগোলেই ডান হাতে ক্লাব। নীলোফা একটা বিশাল ম্যানিগ্রান্টের ভাল হাতে নিয়ে ফিরছিল। এখন বেশ গরম। নীলোফা একটা ছাই রঙের বোরখায় নিজেকে ঢেকে রেখেছে। কারওকেই মুখ দেখায় না মেয়েটি। বিকাশ শুনেছেন ছোটবেলায় বিব্রীভাবে পুড়ে গিয়েছিল নীলোফা, মুখটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই আর বিয়ে দেওয়া যায়নি। বিকাশের অদ্ভুত লাগে। ছেঁতীতে আনিসুজ্জামানের মুখটাও ক্রমশ বীভৎস হয়ে উঠেছে। নীলোফা কতখানি পোড়া বিকাশ জানেন না, কিন্তু অনেকটাই হবে তা অনুমান করেন। কাছাকাছি আসতেই নীলোফা বলল, ওগুলো কী গাছ কাকু?

বিকাশ মজা পান। তাঁকে আনিসুজ্জামান ডাকেন দাদা। বিকাশদা। আর নীলোফা ডাকে কাকু। পাড়াভৃত্তো সম্বোধনগুলোয় সত্যিই কোনও মাখামুতু নেই। বিকাশ তাকালেন, খুব মিষ্টি কষ্ট মেয়েটির। গান গাইলে বেশ লাগবে শুনতে। কিন্তু ও তো কখনওই মুখ বলে গাইতে পারবে না। আনিসুজ্জামান একটি সেতার কিনে দিয়েছেন বোনকে। নীলোফা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত মিথিলেশ ব্যানার্জির কাছে সেতার শিখতে যায়। বিকাশের ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকেন মিথিলেশ। সেতারি হিসেবে মিথিলেশের নাম আছে। আকাশবাণীতে প্রায়ই অনুষ্ঠান করেন। দেশ-বিদেশে ডাক পান। কোনও অহংকার নেই মানুষটার। একটু আপনভোলা গোছের। একটা মাত্র ছেলে ওঁদের। মুখা। মানুষ হল না ছেলেটা। এত বড় মানুষের ছেলে, এখন নাকি দেশা করে বেড়ায়। কে নাকি তাকে খারাপ পাড়াতেও দেখেছে। আশ্চর্য। এ খবরটা কে রটায়? খারাপ

পাড়ায় অন্যকে যে দেখতে পায় সে তো নিজের সেন্যানে গিয়েছিল স্বজন কোথা যাব।

বিকাশ গাছগুলো সোজা করে ধরলেন। কালেন, সব বেলার, আকাশমণি আর কৃষ্ণচূড়া।

নীলোফা মিষ্টি করে বলে, একটা কৃষ্ণচূড়া আমার সেকেন?

—তোখায় লাগ্যাবে?

আমাদের বালকনিত্যে অনেক কটা টিপ করেছি আমি। একদিন আসবেন কাকু, দেখার।

বিকাশ বলেন, তুমি টিপে কৃষ্ণচূড়া লাগাতে চাও? হতে না তো।

—হবে কাকু। আমি একটা বনসাই—এব বই আনিয়েছি। গাছটা আমি বনসাই করব।

বিকাশ, প্রায় শিশুর মতো, হাতটি নিজের পেছনে লুকোন। তাঁর জুঁকিতে যায়। সমস্ত ও অসমস্ত গলায় বলেন, বনসাই? না না। বনসাই আমি পছন্দ করি না।

—কেন কাকু?

—না। একটা গাছের স্বাভাবিক বাড় কৃচ্ছিক বন্ধ করে রাখেন করে রাখা, এ আমি সহ্য করতে পারি না।

—কেন কাকু? ছোট ছোট গাছে লেবু ফুলবে, পেয়ারা ফুলবে—ভাল লাগে না?

রঞ্জন কয়েকটা বই হাতে করে আসছিলেন। বিকাশকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নীলোফার কথা শুনতে শুনতে বললেন, কী নিয়ে এত কথা?

নীলোফা জেদি মেয়ের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বোরখা নাড়িয়ে বলে, আপনি বলুন কাকু, বনসাই কি খারাপ?

রঞ্জন কিছু বলার আগেই বিকাশ হঠাৎ চটে ওঠেন। এত তর্ক করছে কেন মেয়েটা? একটা স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে দাবিয়ে খামিয়ে রাখার প্রচেষ্টা কখনও ভাল হতে পারে না। সুন্দর হতে পারে না। তিনি গলা চড়িয়ে বলেন, খারাপ। অবশ্যই খারাপ। বণু কী বলবে? আঁ? আমি বলছি? একটা বড় গাছের বনসাই করে রাখা রীতিমতো অপরাধ। একেবারে অপরাধ। তোমাকে যদি কেউ শিশু হয়ে থাকবার জন্য হাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখত?

নীলোফা মরিয়ার মতো বলে, মানুষ আর গাছ?

—হ্যাঁ। মানুষ আর গাছ।

বিকাশ চোঁচান। তাঁর গলা সীমা ছাড়িয়ে যায়, এখনও গাছকে ভালবাসতে শেখেনি, বগান করছে।

রঞ্জন বিকাশের হাত ধরে টানেন। আজকাল বিকাশ মাঝে মাঝেই এরকম চটে ওঠেন। রঞ্জন ব্যোঝেন—শাস্তি নেই বিকাশের। তিনি নীলোফার দিকে তাকিয়ে বলেন, কিছু মনে কোরো না মা। তুমি বাড়ি যাও।

নীলোফা নিশ্চেষ্টে চলে যায়। রঞ্জন বিকাশকে জিজ্ঞেস করেন, কোনদিকে যাবি?

—ওই ক্লাবের দিকে।

—চল।

দু'জনে কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটেন। বিকাশের হাতের শাবলে ঠং ঠং শব্দ হয়। বিকাশ সেটিকে লাঠির মতো ব্যবহার করছেন এখন। রঞ্জন বলেন, ওইটুকু মেয়েটাকে ওভাবে বললি কেন? বেচারী।

বিকাশ চুপ করে থাকেন। সত্যি কাকুটা ঠিক হয়নি। জাপানি বনসাই এখন অনেকেই করে। বিকাশ কি তা বন্ধ করতে পারছেন? আসলে সকাল থেকেই বিকাশ অস্থির হয়ে আছেন। গ্রন্থবেশের ছেলটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। দারুণ মনে পড়ছে ছোট খোকাটাকে। সকালে যাওয়া হয়নি। বিকাশকে চুপ করে থাকতে দেখে রঞ্জন বললেন, আমি যাই রে। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার রিলেটা পুনব।

—বই কোথা থেকে পেলি?

—লাইব্রেরি থেকে।

—রবিবার লাইব্রেরি?

—না। ফুটকে বলেছিলাম। ও নিজের বাড়িতে নিয়ে রেখেছিল কাল। আমার তো সময় হয় না।

মাঠের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন দু'জনে। এ দিকটায় দুঃখদার বাড়ি। দুঃখদার ছেলে রঞ্জন গান গাইছে। ভাল গায় রঞ্জন। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সে চর্চা করে। এ পাড়ায় আরও একটি ছেলেও ভাল গায়। পরেশের ছেলে অনুপম। অনুপম ভাল গাইলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পরেশ নিজেও খুব ভাল গাইতেন আগে। কিন্তু রঞ্জন এই সুর বোঝায় পেল। দুঃখদার কোনদিন গান গাইতেন বলে শোনা যায়নি।

রঞ্জনকে পেয়ে বিকাশের ভাল লাগছিল। আরও একটু কথা বলার জন্য তিনি বললেন, প্রণবশের ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না, শুনেছিস।

—সে কী? শুনি নি তো। কবে থেকে।

—আজ সকাল থেকে। ফারাক্স থেকে আসছিল। প্রমবেশ আর ওর বউ বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ দেখে ছেলে নেই।

—প্রণবশ কোথায়?

—ভায়রার বাড়ি গেল। ভবানীপুরে।

—আমাদের ছেলেগুলোকে তো জানানো দরকার। সাহায্য করতে পারত। আর কাকেই-বা জানাবে, ভাল ছেলেগুলোই চলে গেল। এখন সব স্বার্থপর। স্বার্থপর আর নেশাখোর। মল্লিদার ছেলেটা তো মরেই গেল।

হঠাৎ আশ্চর্য আলোয় মন ভরে গেল বিকাশের, রঞ্জন কি দেবার্চনের কথাই বলল না? ভাল ছেলে। হ্যাঁ। ভাল ছেলে তো ছিলই দেবার্চন। সে চলে গেছে। আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে চলে গেছে। মানুষের জন্য ভাবতে গিয়ে, মানুষের গুলিতে মরে গেছে। কিন্তু যারা চিন্তা-জানত তারা আজও ভালবাসে তাকে। বাসবেই তো। সে তো নেশা করে মরেনি! অন্যায় করে মরেনি।

অন্যায় নয়? বিকাশের মধ্যে কেউ ফুঁসে ওঠে। ষে-পথ ওরা নির্বাচন করেছিল, অহিংস ভারতের ঐতিহ্য ধুলোয় মাড়িয়ে যেভাবে ঘোষণা করেছিল—বন্দুকের নলই প্রকৃত ক্ষমতার উৎস, সে-পথ অন্যায় নয়?

রঞ্জন চলে গেছেন। বিকাশ মাঠ পেরুতে পেরুতে ভাবেন—না। অন্যায় নয়। ভুল হতে পারে কিন্তু অন্যায় নয়। তা হলে রাশিয়ার সশস্ত্র অভ্যুত্থানও অন্যায়। স্বাধীনতার আগে সশস্ত্র বিপ্লব অন্যায়। সুভাষ বোসের পথ অন্যায়। না। অন্যায় করেনি দেবার্চন। কারণ ওরা মানুষের জন্য ভেবেছিল। দেশের জন্য ভেবেছিল। ক্ষমিক হলেও প্রিয়তম স্বপ্নের জন্য ওরা প্রাণ দিয়েছে।

রেললাইনের পাড়ে গোবর কুড়োচ্ছিল ফুলরেণু। ক্লাবের ছায়ায় বসে সে জিরোতে লাগল। ক্লাবের দরজা বন্ধ। অর্থাৎ ভিতরে লোক আছে। বিকাশ ক্লাবের পাশ দিয়ে গাছ পুঁততে গেলেন। এত রোদে গাছগুলো শুকিয়ে না যায়। আরও সকালে লাগালে ভাল হত। মকবুলকে বলা আছে বিকাশের। বিকেলে ও এসে বাঁশের ঘের দিয়ে যাবে এখানে। কিন্তু এগুলোতে ভাল দেওয়া দরকার। জল আনতে গেলে যেতে হবে সেই দুঃখদার বাড়ি। এই রোদে আবার পুরো মাঠ পেরুতে হবে। বিকাশের মনে হল ক্লাবে জল পাওয়া যেতে পারে। কিংবা ছেলেগুলো যদি দুঃখদার বাড়ি থেকে জল বয়ে দেয়। তিনি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ালেন। ফুলরেণু প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে বলল, কী করো বাবু? কী করো?

—এই একটু জল নেব। ভেতরে ওরা আছে না?

—আছে তো। গাছে জল নেবে নাকি?

—হ্যাঁ।

—ও দরজা খুলো না বাবু গো।

—কেন বলো তো?

—ওখানে দাদাবাবুরা নেশা করছে যে। তোমার মতন বড়মানুষ ওখানে যেয়ো না। তারা তো নিজের মধ্যে নেই। মান রাখবে না। আপনায়।

বিকাশ থমকে যান। ক্রাবথরটা নেশার জায়গা হয়ে উঠেছে শুনেছিলেন বটে তিনি। এবং আর সবার মতো এড়িয়েও গিয়েছিলেন। হঠাৎ অসহ্য ইচ্ছে হল তাঁর। কী নেশা করে দেখারেন। ফুলরেণুকে বললেন, ওরা কী নেশা করে বলো তো?

—জানো না বুঝি? আই আমনি করে ধরে আর আগুন ছেলে ঘুঁ দেয়। সেখান থেকে চাও?

বিকাশ মাথা নাড়েন। ফুলরেণু চোটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ করতে বলে রেললাইনের ঢালের দিকে এগিয়ে যায়। বিকাশ তার পেছনে এগিয়ে যান। চলনের অভিযান্ত্রে ফুলরেণুর কুঁজটি ওঠে নামে। বিকাশ দেখেন, রেললাইনের ওপারে ধু ধু জলাজমি। শেষ দেখা যায় না। ডানদিকে তাকালে রেলের সিগনাল চোখে পড়ে। বাঁদিকে মাঠ পেরিয়ে রেললাইনের সমান্তরালে আরও কিছু বাড়ি। এই এলাকাকেও আগে মাথুরের গড় বলা হত। এখন নতুন নাম হয়েছে আশ্রমপাড়া। ও দিকে লোকনাথবাবুর মন্দির ও আশ্রম। ও দিকে রেল লাইনের তলা দিয়ে আড়াআড়িভাবে একটা রাস্তা গেছে। পি ডাব্লু ডি রোড আর বি টি রোডের যোগাযোগ। রাস্তা থাকায় রেলের ছোট ব্রিজ হয়েছে ওখানে। লোকে বলে মরণ ব্রিজ। গোত্র বাচুর মানুষ—অনেক কাটা পড়েছে ওইখানটায়। ওই রাস্তা পেরোলে ফটিক বিল। বিস্তৃত ওই বিলের ধার ঘেঁষে বস্তি। ঘন। নোয়া। জনবহুল বস্তি। আর অন্য পাশে খাটাল।

আশেপাশে মানুষ নেই। মাঠের অন্য পাড়ে লাইব্রেরি। সারাদিন নাটু আর সুলেখাদি ওখানে নিজের কাজ করে। বিকাশের মনে হল, নেশা করার পক্ষে এর চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হয় না।

ক্রাবথের পেছন দিকে ঘুরে একটা ছোট জানালার কাছে এসে থামল ফুলরেণু। তারপর রেললাইনের ঢাল বেয়ে একটা জায়গায় বসে পড়ল। মাঠের তুলনায় রেললাইন অনেক উঁচুতে। বিকাশ ফুলরেণুর ইশারা অনুযায়ী ঢালে উঠে পড়লেন। ফুলরেণু ইশারা করে হাত নেড়ে বলল, বোসো। বসে পড়ো।

তার মুখে শিশুর আনন্দ। বুব গোপনে পরমাখীয়েকে প্রিয় জিনিস দেখালে শিশুদের যেমনি খুশিতে আলোকময় লাসে তেমনি দেখাছিল ফুলরেণুকে। সে ফিসফিস করল, ওই দ্যাখো বাবু।

কে কে ওরা? বিকাশ রোদ্দুর থেকে চোখ আড়াল করলেন। চারজনকে চিনতে পারলেন। মিথিলেশের ছেলে মুখায়। সুধীর পালের ছেলে কাজল। গোপাল কুণ্ডুর ছেলে সুজন আর মোহবাড়ির অমিতাভ। বাকিদের চিনতে পারলেন না। মোট ন'জন ছেলে গোল হয়ে বসে নেশা করছে। মাঝে মাঝে দেশলাই বা লাইটার জ্বলে উঠছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। কোনও দিকে তাদের মন নেই। প্রচণ্ড রোদ্দুরে বিকাশের চোখে ধাঁধা লেগে বাচ্ছিল। তিনি উঠে পড়লেন। ফুলরেণুও মাথায় কাপড় চাপা দিয়ে গোবর কুড়োতে গেল। বিকাশ আশ্চর্য হয়ে ফুলরেণুর দিকে চেয়ে রইলেন। রোগা, কুঁজো, নড়বড়ে ফুলরেণু। সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে গোবর কুড়ায় আর খুঁটে দিয়ে, গুল দিয়ে বিক্রি করে। হারিত্র সত্ত্বও সে চমৎকার হাসে। প্রতিবৃদ্ধতা সত্ত্বও সে কাজ করে। তার সাধামতো, এই সমাজে, ফুলরেণু প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করে। কিন্তু ওদের অবস্থা? মিথিলেশ সেতারি। গোপাল কুণ্ডুর বিরাট কাপড়ের দোকান বাজারে। সুধীর পাল ও মোহদের বড় বড় ব্যবসা। টাক, বাস, জমি-বাড়ি। পয়সা গুনতে গুনতে দিন-রাত কেটে যায়। খাওয়া-পরাই চিন্তা নেই। নিরাপত্তার ভাবনা নেই। ওদের ছেলেরা নেশা করে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে। বিকাশ ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেন। তাঁকে গাছে জল দিতে হবে। মাঠ পেরোতে পেরোতে তাঁর মনে হয়—মানুষ আসলে কী চায়? শুধু

উপভোগ? জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দিয়ে চলতে চলতে শুধু শরীরের সুখ বিহার? তা হলে মানুষ কাজ করে কেন? শুধু খাবার জন্য? শুধু ভরণ-পোষণের জন্য? কোনও রিপু কি তারকে তাড়িয়ে বেড়ায়? নাকি কিছু পেতে চায় সে? নাকি কাজ করা মানুষের স্বাভাবিক মতোই আবশ্যিক স্বাভাবিকতা? ওই যে ফুলরেণু? ও তাকে ভিক্ষে করেও বেতে পারত। কিছু ও সারাদিন এত পরিশ্রম করে কেন?

ছোট খোকা বলেছিল, আমরা কাজ করছি বাবা। অনেক বড় কাজ। কী ছিল সেই কাজ? এই চলতি নিয়মকে উল্টে দেওয়া? শোষণবিহীন, স্বার্থবিহীন সমাজ গড়ে তোলা? যেখানে ফুলরেণুর মতো মানুষও পরিশ্রমের যথাযোগ্য মূল্য পাবে? কই, দেবার্চনের বাবা হয়ে তাঁর ছেলে একবারও ইচ্ছে হয় না কিছু করি? বস্ত্রিতদের জন্য? শোষণিতদের জন্য? তবুও বয়স হলে উত্তেজনা থিতুয়ে আসে। কর্মচাঞ্চল্য কমে যায়। দেবার বা বোকার ইচ্ছেও কি কমে যায়? এতদিন ধরে শুনেছেন ক্লাবে নেশা করা হয়—কখনও আসেননি কেন? এই বেশ আছি গোছের স্থাপুবৎ প্রক্রিয়ায় তিনিও কি জাকুর মতো প্রাণধারণই করছেন না শুধু? তা হলে তাঁকে এক প্রকার জড়ই বলা যায় কারণ স্থবিরতা ও নিষ্প্রাণতার মধ্যে মূল তফাত কিছুই নেই। মানুষের জিজ্ঞাসার উৎসও কি তবে কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়া? যৌন ইচ্ছার মতো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে হ্রাস পায়? অদ্ভুত কিছু কথা মনে পড়ে বিকাশের। কে বলেছিল এই কথাগুলো? নাকি পড়েছিলেন? কথাগুলো আশ্চর্য। এবং সত্যি। কিন্তু সহজবোধ্য নয়। তিনি ভাবতে থাকেন—তুমি কি সাধারণ? তবে তোমার কর্তব্য শুধু পরিবারের প্রতি। তুমি কি আরও একটু বেশি? তোমার কর্তব্য তবে সমাজের প্রতি। তারও বেশি কি তুমি? তা হলে তুমি দেশের। আর যদি তার চেয়েও বড় হও তবে পৃথিবীর প্রতি তোমার কর্তব্য। আর তুমি যদি সব ছাড়িয়ে যাও, সবার চেয়ে বৃহৎ আর মহান হয়ে ওঠো তবে তোমার কর্তব্য তোমার নিজের প্রতি।...

—তুমি কী?

—আমি কী?

—তুমি কে?

—আমি কে?

—কী তোমার কর্তব্য?

বিকাশ মনে মনে স্থির করেন, পুলিশে জানাবেন তিনি। ওরা সমাজবিরোধী কাজ করছে। খারাপ নেশা করছে। ওই নেশার জন্য মস্তিদার ছেলে চলে গেল। হঠাৎ চমকে উঠলেন বিকাশ। পুলিশ! আবার তিনি পুলিশের কথা ভাবছেন।



সকাল সাড়টায় প্রণবেশ বিকাশের দরজায় বেল বাজালেন। বিকাশ তখন সবে প্রথমবারের চা শেষ করেছেন। সকালে একবারে দু'কাপ চা খাওয়া বিকাশ ও লক্ষ্মীর বহুকালের অভ্যাস। বেলের শব্দে অবাকই হলেন দু'জনে। অন্ধর মা কাজে আসে অটটায়। তার আগে আর বেল দেবার মতো কেউ নেই। লক্ষ্মী চা ঢালছিলেন। বিকাশ উঠে দরজা খুললেন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রণবেশ। পেছনে জুই। প্রণবেশের চুল এলোমেলো, চোখের নীচে গভীর কালি। জুইয়ের মুখ-চোখ ফোলা। কাল থেকে বোধহয় তারও চুলে চিরুনি পড়েনি। যুমও যে হয়নি তা বলে দেবার দরকার হয় না। দেবার্চনের সময় কতদিন ঘুমাননি বিকাশ ও লক্ষ্মী? কতদিন?



বিকাশ বললেন, খোঁজ পেলে কিছু?

—না, বিকাশদা।

লক্ষ্মী ততক্ষণে এসে নাঁড়িয়েছেন দরজার কাছে। বললেন, ভেতরে এসো প্রণবেশ। কী যেন নাম তোমার বউয়ের?

—জুই।

—হ্যাঁ, জুই এসো।

প্রণবেশ ও জুই ঘরে এলেন। বসার ঘরে সোফার ওপর একগাঢ় কাপড়-জামা ভাঁজ করা। সব অন্ধর মা এসে গোছাবে। শুধুমাত্র রান্না করা ছাড়া ঘরের কোনও কাজই লক্ষ্মী করেন না। রান্নার জন্যও লোক রাখা হয়েছে অনেকবার। কিন্তু দৈবাশিস বর্জিরের লোকের হাতে খোতে ঘোঁষা পায়। বিশেষ করে কারও গায়ের রং যদি কালো হয় তবে খুব নাকি মনে হয় তরকারি বা মাছের ঝোলের রংও কালো হয়ে গেছে। বিকাশ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হোটলে কেমন করে খাস? সে বলেছিল—হোটলে তো দেখতে যাচ্ছি না কে রাঁধছে। লক্ষ্মীর গায়ের রং খুব ফরসা নয়। কালোও নয়। মাজা মাজা। বরং বিকাশকে ফরসা বলা যায়। ছোটবেলায় নাকি দুগ্ধবল ছিলেন তিনি। নামও ছিল ধলু। রংটা এখন পুড়ে গেছে। পৃথিবীতে রক্তের মূল্য এতটুকু ফুরোয়নি এখনও।

প্রণবেশ আর জুইকে কোথায় বসতে বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না বিকাশ। লক্ষ্মীই বললেন, ওদের খাবার টেবিলে নিয়ে এসো।

লক্ষ্মীর জাতপাতের মানামনি আছে। সবাইকে খাবার টেবিলে বসানো পছন্দ করেন না। বিকাশকে তাই খুবই সতর্ক থাকতে হয়।

প্রণবেশ আর জুই বসলেন। বিকাশও বসলেন। জুই বসেই দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। বিকাশ কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। চুপচাপ কিছুক্ষণ কেটে গেল। লক্ষ্মী ত্রোতে চায়ের পট, কাপ আর এক স্ট্রেট বিস্তি নিয়ে এলেন। কাপে চা ঢেলে সবার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। বিকাশ দেখলেন, অনেকদিন পর এ বাড়ির খাবার টেবিলে চারটে চেয়ার ভরা।

বিকাশের আত্মীয়স্বজন খুবই কম। এ বাড়িতে তাঁরা কালেভালো আসেন। শেষ এ বাড়িতে কবে কোন আত্মীয় এসে বাস করে গেছেন বিকাশ মনে করতে পারেন না। কোনও আত্মীয় এলে খুব অসন্তুষ্ট হন লক্ষ্মী। হয়তো আত্মীয়রা তা টের পেয়েছেন। এ ছাড়া সবাই এখন ব্যস্ত। দেবার্চনের খবর শুনে বিকাশের দাদারা ছুটে এসেছিলেন। নিজের দাদা নন কেউ। জ্যেষ্ঠভ্রাতা-শুভভ্রাতা। লক্ষ্মী পাশের ঘর থেকে চিৎকার করেছিলেন—“মজা দেখতে এসেছে সব। মজা! ছেলে মরেছে। দেখি কেমন নাটক হচ্ছে।” শোকে পাগল হয়ে আছেন মনে করে দাদারা কোনও কথা বলেননি। কিন্তু বিকাশ বোঝেন, শোকের মধ্যেও ওভাবে কারওকে বলা যায় না। অত শোকের মধ্যেও লক্ষ্মীর সে-দিনের আচরণ বিকাশ কমা করতে পারেননি। লক্ষ্মী সাধারণতই একটু কড়া, কটুভাষী।

প্রণবেশ অনামনকভাবে চায়ে চুমুক দিলেন। জুই মুখ থেকে হাত নামিয়ে অপলক তাকিয়ে আছেন চায়ের দিকে। যেন চায়ের কাপটা ঠিক দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। তলিয়ে গেছেন কোনও অজানা দেশে। লক্ষ্মী বললেন, এই যে, কী যেন নাম তোমার, জুই, চা খেয়ে নাও।

জুই মুখ তুললেন না। লক্ষ্মী বললেন, খাও, খাও, চা-টা খাও। যা হয়েছে সে তো বোঝাই যাবে আজ। নয়, কাল।

এতক্ষণে মুখ তোলেন জুই। অবরুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করেন, তার মানে?

বিকাশ এ বার খুব কাছ থেকে তাঁর দিকে তাকান। জুইয়ের গাল দু'টিতে জল মুছতে থাকার ল্যাগে দাগ। চোখ দু'টি রক্ত। অসম্ভব বেদনাও এক মাহের ছবি বিকাশের সামনে। লক্ষ্মীর কথায় বিকাশের ভয় করে। ও কি ইচ্ছে করে এভাবে বলছে? ইচ্ছে করে? ও এত নিষ্ঠুর?

তাড়াতাড়ি, এ প্রসঙ্গ সামাল দিতে বিকাশ বলেন, কোথায় কোথায় বুঁজলে-প্রণবশ?

—অনেক জায়গায় বুঁজছি বিকাশদা।

তার কথা শেষ না হতেই লক্ষী বলে ওঠেন, মগটা দেখেছ? শিয়ালদা মর্গ? হোসে কিছু হলে ওখানেই আনবে।

বিকাশ ফিগু হয়ে ওঠেন এবার। অসহিষ্ণু হয়ে বলেন, তুমি থামবে?

লক্ষী ভুক বুঁচকেন। তারপর বলেন, কেন? কিছু ভুল বললাম?

বিকাশ বলেন, মর্গে খোঁজার কী আছে? ছোট ছেলে কোনও বেদালে কোথাও নেমে পড়েছে। কেউ ঠিক পৌঁছে দেবে দেখো। তোমার ছেলে ঠিকানা বলতে পারে, প্রণবশ?

প্রণবশ মাথা নাড়েন। তার গলায় স্বর ফোটে না। একটুখানি বেশে এল। পরিষ্কার করে বলেন, বউদি ঠিকই বলছেন। মর্গে দেখা উচিত।

বিকাশ তীব্র প্রতিবাদ করেন, না। মর্গে যেতে হবে না। আমি বলছি।

প্রণবশ ফের বলেন, না বিকাশদা। আমি তো সে-কথা বলতেই এসেছিলাম। হাসপাতালগুলো কাল আমরা খোঁজ নিয়েছি। আমার ভায়রা শেয়ালদায় এসে ওর এক রেলওয়ে অফিসার বন্ধুকে ধরে কাছাকাছি স্টেশনগুলোতে খবর নেবার চেষ্টা করেছে। শুধু মর্গটাই বাকি আছে। আপনার অফিস যাবার পথে একবার যাবেন আমার সঙ্গে?

বিকাশ নিরুপায় ও শান্তভাবে বলেন, যাব।

প্রণবশ ক্রান্ত গলায় বলেন, আমরা সকালে উঠেই চলে এলাম এই ভেবে যে ও যদি ফেরে, যদি দরজার তালা দেখে কাঁদে, অন্য কোথাও চলে যায়—

তার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। তখন ছুঁই কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে বলেন, ও আসবে না। ও আসবে না। তোমার জন্য এরকম হল। তুমি ওকে চাওনি।

তার সজল চোখও ক্রমে জলন্ত হয়ে ওঠে। চিৎকার করে তিনি বলতে থাকেন, জানেন বউদি, জন্মের সময় ওর ক্রেফট প্যালেট ছিল। অলজিভও ছিল না। ক্রেফট প্যালেট অ্যান্ড হেয়ার লিপস। ওই অবস্থায় আমি ওকে দুখ খাইয়েছি। বারবার ওর অপারেশন হয়েছে। রাতের পর রাত জেগে কত কষ্ট সহ্য করেছে। ওর আর কী? ও বাগ্নাকে সহ্য করতে পারত না তখন। বাপের বাড়িতে ওর আসার কথা থাকলে বাগ্নাকে আমি অন্য পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে রাখতাম।

প্রণবশ মুখ চাকেন। কোনও প্রতিবাদ করেন না। বিকাশ যেন বুঝতে পারেন প্রণবশ বলতে চান, আমাকে ভুল বুঝো না। সন্তানের ওই বিকৃতি আমি সহ্য করতে পারতাম না। কিন্তু আমি ওকে ভালবাসি।

বিকাশ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াছেন। আঁটটা বাজে। নটায় বিকাশের গাভি আসে। তিনি ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে দশটায় বেরোন। কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। শেয়ালদায় নামলে সময় তো একটু লাগবেই।

প্রণবশও উঠে দাঁড়ান। লক্ষীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তবে আমরাও উঠি। নটা নাগাদ চলে আসব বিকাশদা।

লক্ষী বলেন, হ্যাঁ। আর কী বলব ভাই। কার যে কী কপাল। ভগবানকে ডাকো। মনকে শান্ত করো।

বিকাশ বাধকর্মের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন লক্ষী এভাবে কথা বলছে কেন? ও কি কোনও মজা পাচ্ছে? অন্যকে কষ্ট পেতে দেখার নিষ্ঠুর আনন্দ? আশ্চর্য, একজননের গণনা অন্যকে এভাবেই সমৃদ্ধ করে। একজননের দুঃখ অন্যকে সুখ দেয়। মানুষ দুঃখের আশুনে পুড়ে পুড়ে সোনা হয় না সবসময়ই। করলোও হয়। যেমন লক্ষী।

বিকাশ শাওয়ার খোঁজেন ও নীচে মাথা পেতে দেন।

# টুটুটুটু

সব ছুয়ার মজা ভর্তি। বাড়তি দেহগুলি খোলা মেখেয়। বখেই আছে নেই শরীর। পচনশীল শরীরের দুর্গন্ধ গা গুলিয়ে যায়। এখানে ওখানে জড়ে করা মানুষের শব। কোথাও একা একজন। কোথাও একসঙ্গে পাঁচটি-ছটি। বরফের চাই বেওয়া কনিষ্ঠিত লেহ। একটি শরীর থেকে চামড়া খসে আসছে। অন্যটির খুলির ওপরটায় ছালচামড়া নেই। অসহ্য মাদা মস্তক। মোটা মেসি ইদুর বৌড়ে বেড়াচ্ছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। ওরা কি শব খায়? মানুষের শব খেয়ে এরকম চমৎকার স্বাস্থ্য কি ওরা অর্জন করেছে? কয়েকটি কূলে ওঠা লেহ। মুখ দেখে আর বোঝা যাবে না ইনি কে ছিলেন। আশ্চর্য! এইসব দেহগুলির খোঁজে কেউই আসেননি? কোনও আত্মীয়স্বজন? এমন মানুষও কি হয় যার কেউ থাকে না? একজনও না?

প্রণবেশ্বর চোখে জল আসছে। তাঁর ভায়রার বন্ধু রেজওয়ে অফিসার সঙ্গে আছেন। প্রণবেশকে বোঝাচ্ছেন, শুণু শুণু ঘুরছেন। আমি খোঁজ নিয়েছি। ওরকম কেউ নেই।

প্রণবেশ চোখ মুছছেন। ভূতগল্পের মতো বুজছেন মৃত মানুষদের মুখ। তাঁর শুণু মনে হচ্ছে, এখানে কোথাও কি নীলাশ্রি আছে? নীলাশ্রির পাশে বাগা? এইরকম ছালচামড়া উঠে গেছে ওদের? খুলি ফেটে গেছে? কিন্তু নীলু বা বাগা পরস্পরকে কেমন করে চিনবে? কী করে পাশাপাশি শোবে তারা? বাগার বখন দেড় বছর, তখনই তো নীলু...

বিকাশ প্রণবেশের কাঁধ জড়িয়ে ধরেন, চলো। আর এখানে নয়।

প্রণবেশ যেন গাড়ি ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে চান। আপন মনে বলেন, ও নেই। ও নেই তবে।

বিকাশের মনে হল, ওকে হুঁজে পাওয়াই কি একমাত্র ব্রত ছিল প্রণবেশের? যেখানে হোক, যে অবস্থায় হোক, এমনকী এই মর্গেও? স্বকথাকে রোদে এসে দাঁড়ালেন তিনজনে। বিকাশের মনে হল, শরীরে রোদ্দুর পড়ার অনুভূতিতে এত ঝরঝরে কখনও লাগেনি। ওইটুকু সময় মর্গের ভেতরে থাকতে থাকতে সমস্ত শরীর রৌদ্রগ্নাত হবার জন্য অকুলিবিকুলি করছিল।

প্রণবেশ পকেট থেকে ক্রমাল বার করে মুখ মুছলেন। বিকাশের দিকে ফিরে বললেন, অনেক কষ্ট দিলাম বিকাশদা।

—কষ্টের কথা নয়। কিন্তু তুমি কি একা যেতে পারবে?

—চলে যাব। ট্রেন ধরে বরানগরে নেমে যাব।

বিকাশ মাথা নাড়েন। অফিস যেতে আর ইচ্ছে করছে না। কিন্তু সোমবার, অনেককে আসতে বলেছেন। আগুে আগুে গাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন তিনি। সরকারি গাড়ি বলে অনেকটা আনা গেছে। অন্য গাড়ি হলে সেই কার পার্কিং-এ রাখতে হত। একটি ছেলে কাগজ বিক্রি করছিল। বিকাশের মনে পড়ল আজ কাগজ পড়া হয়নি। তিনি ছেলেটিকে ডাকলেন। একটি স্টেটসম্যান নিলেন। গাড়িতে যেতে যেতে পড়া যাবে। নিজের চারপাশে মর্গের গন্ধ পাচ্ছিলেন বিকাশ। কবজি নাকের কাছে এনে ঝুঁকলেন একবার। মনে হল শাটে গন্ধ হয়ে গেছে। অল্প দূরে শেরালদা চব্বরের সবজি বাজার। একপাশে জমে থাকা সবজি ও ফল-পাতার পচনশীল কুপ। তার থেকেও দারুণ দুর্গন্ধ আসছে। চারপাশে শ'য়ে-শ'য়ে মানুষ। কারও কোনও বিচলন নেই। কারও নাকে ক্রমাল নেই। বিকাশ নাকে ক্রমাল চাপলেন। ক্রমালেও পচনশীল শবের দুর্গন্ধ লাগল। তিনি বড় বড় পা ফেলে এগোলেন। এই পরিবেশ থেকে চলে না গেলে এই গন্ধ তাঁকে ছাড়বে না। বিকাশের হঠাৎ মনে হল মৃত ও জীবিত শরীরের মাঝে মাত্র একটি শব্দের ব্যবধান—

প্রাণ। প্রাণ কী? জ্ঞানের না বিকাশ। কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রিয় লভ্যার প্রাণহীনতার হাহাকার নতুন শব্দে বয়ে যায়। সেই শব্দ অনেকটা যান্ত্রিক শব্দের তীব্র বাশির মতো। এভাবেই প্রাণহীন করে দিতে থাকে। সবসুদ্ধ বিকাশ গাড়ির দিকে এগোন।

বিকাশের ড্রাইভার ভানু প্রায় চার বছর হল এ গাড়ি চালাচ্ছে। এর আগে বিকাশ জিপ পেতেন। আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাঁকে জিপে বসে অফিস যেতে হত। চার বছর হল তিনি গাড়ি পাচ্ছেন। বিকাশের মনে হয়, এ গাড়ি অনেকটা তাঁর পুত্রশোকের প্রতিরূপ। অথবা সব কিছুকে দেবার্চনের মৃত্যুর নিরিখে দেখা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর শেষ পদোন্নতির সঙ্গে সতিহি জড়িয়ে আছে ছোট খোকা। বিকাশের মনে আছে, সেই সময় আরই অফিসে আসতেন না তিনি। কাজ করতে ইচ্ছে করত না। নবমাল চেলের জন্য প্রকাশ্যে শোক করার সাহসও ছিল না তাঁর। কিন্তু সবসময় রক্তের গন্ধ পেতেন। কোনও না কোনও ভাষণা থেকে বাতাস সেই গন্ধ বয়ে আনত। মাঝে মাঝে মনে হত, বেঁচে থেকে কী লাভ। দে-দেশের প্রশাসন ঘরে ঘরে গুলি ছোড়ে সে-দেশে বেঁচে থেকে কী লাভ। বিকাশ তখন একা একা রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন। একা একা। দিকভ্রান্তের মতো। হঠাৎ চোখে জল আসত। হঠাৎ মনে হত, ওই তো ছোট খোকা। একদিন মানিকতলায় নেমে পড়েছিলেন। সঙ্গে সেন আর ত্রিপাঠী ছিলেন। সেই সময় বিকাশের কোনও আচরণের জন্য কেউ প্রশ্ন করতেন না। মানিকতলা আসতেই বিকাশ বলেছিলেন, এই, জিপটা ধামাও তো। নামব।

জিপ থেমে গিয়েছিল। তিনিও নেমে বলেছিলেন, আজ আর যাচ্ছি না সেন।

সেন সামান্য মাথা নেড়েছিলেন। জিপ চলে গিয়েছিল। জিপ চলে যাবার পরে বিকাশের মনে হয়েছিল—কেন এলাম এখানে?

অনেকক্ষণ তিনি কিছুই ভেবে পাননি। শেষে বিবেকানন্দ রোড ধরে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। হেদুয়া পার্কে গিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন দু'ঘণ্টা। চুপচাপই কি? না। সঙ্গে একটা ছোট নোটবই ছিল। পুলিশ যে-দিন বাড়ি সার্চ করতে আসে সে-দিন ওরা আসার আগেই ছোট খোকার টেবিল থেকে ছোট ছোট কয়েকটা ভায়রি সরিয়ে ফেলেছিলেন বিকাশ। তাড়াতাড়িতে লক্ষ্মীর স্কুলের বইপত্রে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। পুলিশ খুব একটা তছনছ করেনি। শুধু ছোট খোকার টেবিলটাই দেখেছিল। যাবার আগে বরানগর থানার বড়বাবু বলেছিলেন—সব কাজ সবসময় করতে ভাল লাগে না মশাই। আপনিও সরকারি চাকরি করেন। আমিও করি। বোঝেনই তো।

বড়বাবু চলে যেতে লক্ষ্মী ঠাকুর প্রণাম করেছিলেন। দেবার্শিসকে বন্ধুতে মামার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোনও সন্দেহজনক কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাতেও ছোট খোকার মৃত্যু ঠেকানো যায়নি। সে-দিন, গভীর রাত্রে নোটবইগুলো বার করে উল্টে-পাল্টে দেখেছিলেন বিকাশ। কিছুই ছিল না তেমন। বেশির ভাগই কবিতা। কয়েকটি কোটেশন। বিকাশের মনে আছে, একটি কবিতা ছিল—

আজ রাতে না গেলেও  
আগামী কাল রাতে  
আমি জেগে যাব।...  
অন্তরের একটি পাতাও নড়ছে না  
অচৈতন্য ঘুমের মতো আমার মন  
শান্ত  
নির্বিকার।

আমার মন

শান্ত

নির্বিকার ;  
 কারণ, নবজাত শিশুর মত  
 নীল আকাশ আমি দেখছি।  
 কাল  
 শহরের ময়দানে আমি হেঁটে গিয়েছিলাম।  
 হেঁকে বসেছিলাম ;  
 “আমাদের ভাইবন্ধুদের আমরা যেন না মরি,  
 যেন শয়তানের হানো  
 না মরি।”



পরের পাতাতেই লেখা ছিল আরও একটি কবিতা।

প্রিয়তমা আমার,  
 তোমার শেষ চিঠিতে  
 তুমি লিখেছো :  
 মাথা আমার বাধায় হিঁড়ে যাচ্ছে  
 দিশেহারা আমার হৃদয়।  
 তুমি লিখেছো :  
 যদি ওরা তোমাকে ফাঁসি দেয়  
 তোমাকে যদি হারাই  
 আমি বাঁচব না।

তুমি বেঁচে থাকবে, প্রিয়তমা বধূ আমার,  
 আমার স্মৃতি ভালো ধোঁয়ার মত হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে  
 তুমি বেঁচে থাকবে, আমার হৃদয়ের রক্তকেশী ভগিনী,  
 বিংশ শতাব্দীতে  
 খুব বেশি হলে এক বছর  
 মানুষের শোকের আয়ু।

কবির নাম কোথাও লেখা ছিল না। কবিতার নামও নয়। কিন্তু বিকাশের মনে হয়েছিল দেবার্চন সত্যদ্রষ্টা ছিল। এক বছরের মধ্যেই কি বিকাশ, লক্ষ্মী, দেবশিশু স্বাভাবিক হননি? সেই সময় বিকাশের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল সময় পেলেই নোটবইগুলো পড়া। না, নোটবইগুলো নয়। একটি মাত্র নোটবই। যাতে সে কয়েকটি কবিতা আর কোটেশন তুলে রেখেছিল। সে-দিন, ছেদুয়ার পার্কে বসে ওই নোটবইটাই তিনি পড়ছিলেন। তাতে লেখা ছিল—কমরেড চারু মজুমদার লাল সেলাম।

লেখা ছিল— কমরেড কৃষ্ণভক্ত শর্মা লাল সেলাম।

লেখা ছিল— এই ভূয়ো শাসনব্যবস্থা মনি না।

— এই ভূয়ো শিক্ষাব্যবস্থা মনি না।

— এই ভূয়ো সমাজব্যবস্থা মনি না।

— ভারতবর্ষে চাই সার্বিক জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন।

— এই আন্দোলনকে যারা বর্ধ করতে চায় তারা জনগণের শত্রু।

— শ্রেণীশত্রু।

— শ্রেণীশত্রু খতম কর।

লেখা ছিল— অকংগ্রেসি গণতান্ত্রিক সরকারের ভূমি আওতায় কেন আমরা বিজ্ঞান না হই। আমাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতি অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদি সংগ্রাম এবং পাটি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার রাজনীতি জনসাধারণের মধ্যে বলিষ্ঠভাবে নিয়ে যেতে হবে।

এই সমস্ত কথাই বিকাশ আজও পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে করতে পারেন। কারণ সেবার্চন, বিকাশের ছোট সন্তান, কী ভাবত, কোন স্বপ্নে মশগুল হয়ে নিজের কীকন দিতেও সে প্রস্তুত ছিল, তা বোকার নিরস্তর চেষ্টায় ওই নোটবুকগুলি পড়তে পড়তে বিকাশের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। চারক মজুমদার—বহুবীর প্রেস্তার ও অন্তরীণ হওয়া চারক মজুমদার—কোনওদিন বিকাশের মনে কোনও গাঢ় ছায়া ফেলতে সক্ষম হননি। তিনি কেমন করে সেবার্চনকে দীক্ষিত করে ফেললেন। হয়তো সেবার্চনই, হয়তো নীলাদ্রি, কেউ কিংবা কয়েকজন বিদ্যাভারতী স্কুলের গায়ে লাল রঙে লিখে দিয়েছিল— চাঁদের চেয়ারমান আমাদের চেয়ারমান।

লিখেছিল—বন্ধুকের নল সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

সেবার্চনই কি লেখেনি ওইসব? একজন লিখলেই কি হাজারজনের লেখা হয়ে যেত না ওই সময়? সেই রাতগুলোর যখন সেবার্চন ফিরত না, সেই বিকাশের জেগে থাকার রাত, লক্ষ্মীর দোষারোপ শুনতে শুনতে অপরাধীর মতো, কিংবা কুকুরের মতো, কিংবা ভাবলেশহীন পাগলের মতো নিদ্রাহীনতা—তখনই কি এইসব লেখেনি ওই ছেলে? কারণ তার নোটবইতে লেখা ছিল—

চারক মজুমদারের নির্দেশ : চেয়ারমান মাও আমাদের শিখিয়েছেন বিপ্লবী পাটি চাই : মার্কসবাদী কার্যদায় তৈরি একটি বিপ্লবী তাদের ভিত্তিতে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কার্যদায় তৈরি একটি বিপ্লবী পাটি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যাপক জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও তার শিকারী কুকুরদের পরাজিত করা অসম্ভব।

কিন্তু তারপর কী ছিল? কয়েকটি পাতা বাদ দিয়ে লেখা ছিল— কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং বিপ্লবী সংগ্রামগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু এই স্তর পার হয়ে যাবার পরও যদি পাটি প্রতিষ্ঠায় দ্বিধা থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই সে-দ্বিধা আসছে ভাববাদী চিন্তা থেকে। এই ভাববাদের প্রভাববশেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা চাইছি এমন একটি পাটি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালাতে, যা সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদ থেকে মুক্ত। এ হল সম্পূর্ণ ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি হার সঙ্গে দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

এরপর আর কোথাও কিছু লেখা ছিল না। শুধু ছিল একটি বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। নোটবই-এর বাকি পাতা ছুড়ে। কেন ছিল? কোথাও কি কোনও দ্বিধা ছিল ছোট বোকার? অনেকক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনও সমাধান পাননি বিকাশ। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন একসময়। ফের বিবেকানন্দ ব্রোড ধারে আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে হেঁটেছিলেন। কাঁধে ব্যাগ জুলিয়ে বিকাশের আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল একটি মেয়ে। বিকাশ প্রথমে তাকে খেয়াল করেননি। রামমোহনের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই মনে হল হঠাৎ চারপাশটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কারা যেন দৌড়ে পালাচ্ছে। কারা যেন লুকিয়ে পড়ছে। হঠাৎই একটি ছেলে হাঁকাতে হাঁকাতে মেয়েটির পাশে এসে বলল, আমি আদিত্য। একটু হাঁটব আপনার সঙ্গে, কেমন! আপনার নামটা বলুন। তাড়াতাড়ি।

বিকাশ অবাক। এ সব কী হচ্ছে? কিন্তু ছেলেটিকে দেখে মনে হচ্ছে না ও মেয়েটিকে অসুবিধে ফেলতে চায়। মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বিকাশ শুনতে পেলেন— শিপ্রা। শিপ্রা নাথ। আপনার কী? আদিত্য কী?

—সেনগুপ্ত। সেনগুপ্ত। কোন ইয়ার? কলেজ তো?



—হ্যাঁ। সেকেন্ড ইয়ার। বটানি। স্কটিশ। আপনি?

—সিটি। সিটি। সেকেন্ড ইয়ার। ইংলিশ। শুনুন আমি স্কটিশে গিয়েছিলাম। সেইখান থেকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছি, কেমন? একটু আগে গলিতে বোমারাজি হয়েছে। বোধহয় লাশও পড়েছে।

আদিত্যর কথা শেষ হল না। বেশ ক'জন পুলিশকে ছুটে আসতে দেখা গেল। একজন এদিকে তাকিয়ে বলল— ও দিকে যাবেন না। এই যে দাদা, এই যে ভাই দিদিকে নিয়ে সরে পড়ুন। তিনটে পড়েছে হারাধন বোস লেন।

পরে অনেক ভেবেছিলেন বিকাশ। আদিত্যও কি নকশাল? তখন, মাত্র পাঁচ বছর আগেও পুলিশের রোষে পড়ার জন্য নকশাল হবার কোনও দরকার ছিল না। শুধু যুবক হলেই চলত। কিংবা তরুণ। কিংবা বালক। বালকরাও কি খুন হয়নি তখন? চোদ্দো-পনেরো বছরের, বোলো বছরের বালকরা?

আরও একটি ঘুমহারা রাতে বিকাশ অনেকক্ষণ শিপ্রা আর আদিত্যর কথা ভেবেছিলেন। ওরা তো কেউ অপ্রস্তুত হল না। কত সহজে, কত দ্রুত যা যা জানার জেনে নিল। তার মানে ওরা অভ্যস্ত! শিপ্রা নামের মেয়েটি, আদিত্য নামের ছেলেটিকে এক মুহূর্ত আগেও চিনত না। অথচ কীরকম আড়াল করে দিল, আগলে নিল! ওর একটা সম্মতি বা অসম্মতির ওপরই কি আদিত্যর সবটাই নির্ভর করছিল না! সে-দিন বিকাশ নতুন করে পৃথিবীকে দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ওই মেয়েটি, শিপ্রা, সরাসরি পার্টি না করেও যার মনের মধ্যে ওইসব ছেলেদের জন্য দুকূল প্লাবন সহানুভূতি ছিল, সে, এই বিকাশ, লুকিয়ে ছেলের নোটবই পড়ে তার কলেজের দিকে হেঁটে যাওয়া বিকাশ, সে, এঁরাই কি জনগণ নয়? জনগণের সহানুভূতি তো সত্যিই ছিল তা হলে ওই দুনিয়া উল্টে দিতে প্রয়াসী ছেলেগুলোর ওপর! তবু কেন মরে গেল দেবার্চন? কেন মরে গেল!

লক্ষ্মী বরং অনেক শক্ত ছিলেন সেই সময়। বলেছিলেন, ভাবো, ও একা গেছে। ভাবো, সময়মতো বড় খোকাকে আগলাতে পেরেছি আমরা। তোমাকে প্রণবশের মতো, উদ্বাস্ত কলোনির বিনয় মাস্টারের মতো ছেলের জন্য দিনের পর দিন থানায় থাকতে হয়নি। ভাবো।

হ্যাঁ। ভেবেছিলেন বিকাশ। বোধহয় এ ভাবেই দেখতে হয় জীবনকে। এ ভাবেই ভাবতে হয়। নইলে বাঁচা যায় না।

এর ক'দিন পরপরই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডায়রেক্টর সান্যাল ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিকাশকে। বলেছিলেন, ভাল খবর আছে আপনার জন্য।

বিকاش নীরবে চেয়েছিলেন। এই মুহূর্তে ভাল খবর আর কীই-বা হতে পারে তাঁর?

সান্যাল খুব সহানুভূতির সঙ্গে বলেছিলেন, আপনার অবস্থা আমরা বুঝি বিকাশবাবু। সবারই তো ঘরে ছেলে-পুলে আছে। বাবা-মায়ের বশে আজকাল আর কেউ থাকতে চায় না। কিন্তু আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়। অভিজ্ঞতাও আমার বেশি। আরে আমার বাবা সারাজীবন স্বদেশি করতে গিয়ে জেল খাটলেন। আমরা প্রায় খেতে পেতুম না। মা গয়না বিক্রি করে করে আমাদের খাওয়াতেন। একদিন কী হল জানেন? শাড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মায়ের আর পরনের শাড়ি নেই। শেষে বিয়ের বেনারসি বার করে পরলেন মা। আমার এখনও মনে আছে। মায়ের হাতে শুধু লোহা আর শাঁখা। আমাদের জন্য চিচিপের তরকারি আর ভাত রাঁধছেন মা। দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মায়ের পরনে বেনারসি শাড়ি। আমার তখন মনে হয়েছিল, মাকে ভারতবর্ষের মতো লাগছে। ক্লিষ্ট। ক্রন্দসী। কিন্তু সুন্দর। সম্পূর্ণ রিক্ত কিন্তু আসলে যেন রিক্ত নয়।

বিকاش চুপ করে ছিলেন। কিছু বলার ছিল না তাঁর। সান্যাল বলেছিলেন, এখনকার ছেলেরা এ সব বুঝবে না। স্বাধীনতা পাবার কষ্টটা বুঝবে না। আরে এতদিনের শোষিত দেশটাকে তৈরি

করতে সময় লাগবে না? তার আগেই ছালিয়ে পুড়িয়ে দিল। যাই হোক, আপনার দুঃখ আমি বুঝি।

বিকাশ কাতের পেপার ওয়েট খুরিয়ে যাচ্ছেন। তখনও একটা কথাও বলেননি। ভাবছেন না। জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে পারেনি ছোট বোকা। ওই ছোট, বিবশেষর সামনে বসে আছে যে-লোকটা, সে দেবার্চনের জনগণের বাইরের লোক। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাবার জেল খাটার কথা আজ সে সগর্বে বলতে পারছে। এ সৌভাগ্য বিকাশের কোনওদিন হবে না। কোনওদিন তিনি গর্বের সঙ্গে চেয়ারের উল্টোদিকে বসা কোনও লোককে বলতে পারবেন না—আমনি ছেলে নকশাল ছিল। দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, সবাইরা কৃষক ও শ্রমিকের জন্য প্রাণ দিয়েছিল।

সান্যাল তখন বলেছিলেন, ই্যা বা বলছিলাম, আমার পরামর্শ শুনুন। কাতের থেকে পালিয়ে বেড়াবেন না। ওতে কোনও লাভ হয় না। বরং কাতে ভুখ দিল। সে-বলে আসতে আসতে সব লড়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া আপনার আরও একটি ছেলে আছে। স্ত্রীও আছে। তাঁদের জন্যও ভো ভাবতে হবে। আপনার স্ত্রী যেন কী করেন?

এই প্রথম কথা বলেছিলেন বিকাশ, ই্যা, একটি স্কুল চালান।

—বাঃ নিজের স্কুল?

—ই্যা।

—কিন্তু এরকম স্কুল কেন? কোন ক্লাস পর্যন্ত?

—আমাদের পাড়াতায় ছোটদের ভাল কোনও স্কুল নেই। একটা মাত্র আইমারি স্কুল, তাতে পড়াশুনো হয় না। বাচ্চাদের সেই নরেন্দ্রনাথ বা রামকৃষ্ণ মিশনে দিতে হয়। অথবা বিদ্যাতখন। সবগুলোই পাড়া থেকে বেশ দূরে। এটা হওয়াতে সুবিধে হল যে ব্রি-ফোর পর্যন্ত এখানে পড়ে সব বড় স্কুলে যায়।

—বাঃ বেশ। কতদিন ধরে করছেন?

—প্রায় দশ বছর।

সান্যাল আর কথা বাড়াননি। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলেছিলেন, শুনুন, মন্ত্রী আপনার ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন।

—কেন?

প্রথমা ছিটকে বেরিয়েছিল বিকাশের মুখ থেকে। কিন্তু ভয় ও নৃশিঙাও কি মিশেছিল সেই পাশে? বিকাশ বাইরের নিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেছিলেন। আজ বিকাশের মনে হয়, যত দুঃখই থাকুক না মানুষের—নিরাপত্তা এতটুকু বিদ্রিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা মানুষকে তীক্ষ্ণভাবে সচকিত করে দেয়। নিরাপত্তার বোধই সম্ভবত মানুষের অদ্বিতীয় প্রবৃত্তি! সে-দিন বিকাশের মুখে সেই প্রবৃত্তি ফুটে উঠেছিল নিশ্চয়ই। কারণ সান্যাল হেসেছিলেন। বলেছিলেন, ভয় নেই, ভাল খবরই পাবেন।

তারপরই দ্রুত ঘটে গিয়েছিল সেইসব। মন্ত্রী নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিকাশকে। দেবার্চনের প্রসঙ্গে কোনও কথা তোলেননি। শুধু বলেছিলেন— গলদার চাষ করার জন্য কয়েকটি প্রজেক্ট পেয়েছি আমরা মাহেশ্বরী গ্রন্থের সঙ্গে কোলাবোরেশনে। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি শাখা খোলা হচ্ছে। সান্যাল তার ডায়েরিরই হবেন। আপনাকে আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডায়েরিরের পদে নিতে চাই। সান্যালের খুবই ভাল রেকমেন্ডেশন আপনার পক্ষে। পিসি কালচারের ওপর ট্রেনিংও তো নেওয়া আছে আপনার? আপনি কি রাজি আছেন?

ই হা হয়ে গিয়েছিলেন বিকাশ। মন্ত্রী স্বয়ং ঘরে ডেকে বলছেন, আসুন, এই চেয়ার দিলাম, আপনি বসতে চান। বিকাশ মাথা নেড়েছিলেন। রাজি। তারপর দ্রুত, অতি দ্রুত অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিল। দমদমে মাছ চাষের গবেষণার জন্য নতুন কেন্দ্র তৈরি হচ্ছিল। সেখানেই দপ্তর

বদলজল বিকাশের। তিনি গাড়ি পেলেন। মাইনে বেড়ে গেল। লক্ষ্মী বুশি। পরপর অনেক জিনিস এল বাড়িতে। পুরনো চৌকি বদলে নতুন ঘটি হল। একটা টিপ রেফরজার কেনা হল। পর্দাগুলো ঝকঝকে, ভারী, শৌখিন হয়ে গেল। শুধু একা, দেবানি, সন্মিক কুমক। একটি আয়েলসনের প্রপ্ন নিয়ে জেগে রইল সারারাত। ছবির মধ্যে। রুমণ ধুলো জামতে থাকার কাচের উল্লাহ। কোনও কোনও রাতে, যখন বিকাশ এসে ছেলের ছবির সামনে দাঁতান, মাধবী অথবা জুই ফুলের গছ লাগে নাকে, কিংবা নিম ফুলের, তাঁর মনে পড়ে—

তুমি বেঁচে থাকবে, প্রিয়তমা বধু আমার,  
আমার স্মৃতি কালো ধোঁয়াঃ মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।  
তুমি বেঁচে থাকবে, আমার হৃদয়ের রক্তকেশী তুণিমা,  
বিশ শতাব্দীতে  
খুব বেশি হলে এক বছর  
মানুষের শোকের আয়ু

মধ্যরাত্রি, বিকাশ নামের এক পিতা, সেবার্চনের চোখে যার অবস্থান— আমলাতন্ত্রের বাহক— একা একা বিড়বিড় করে উচ্চারণ করেন

বিশ শতাব্দীতে  
খুব বেশি হলে এক বছর  
মানুষের শোকের আয়ু



যাত্রচালিতের মতো ট্রেন থেকে নামলেন প্রণবেশ। ফাঁকা স্টেশন। স্বাভাবিক সমতল থেকে অনেক উচুতে বলে, বি টি রোডের শরীর থেকে অনেক সিঁড়ি উঠে গিয়ে স্টেশনে উঁকি মেরেছে বলে একটু অন্য ধরনের এই অবতরণক্ষেত্র। চওড়া কাঠের স্লিপার ডেলা ট্রাটফর্ম। মাঝে মাঝে বড় বড় ফাঁক। একটু মন দিয়ে না ইটিলে পা ঢুকে যেতে পারে। প্রণবেশ হোটট খেতে খেতে এসেছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল অফিসে কিছুই জ্ঞানানো হয়নি। বাপ্পা যদি কোনওভাবে আবার ফরাক্ষা চলে যায়। কিছুক্ষণ দ্রুত ইটিলেন ট্রাটফর্মের ওপর দিয়ে। তারপরই মনে হল, এভাবে সবাইকে বলে কোনও লাভ নেই। গভীর অবসন্নতায় স্টেশন থেকে বি টি রোড পর্যন্ত ওই অসংখ্য সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে প্রণবেশের মনে হল রাস্তা পেরিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছনো আর সম্ভব নয়। নিজেই নিয়ে মাঝে মাঝে অসহায় বোধ করেন প্রণবেশ। নিজেই খুব একা ও নিঃসঙ্গ লাগে। এক গভীর আত্মকরুণায় মন বিকল হয়ে যায়। বাবা স্বত দিন ছিলেন, দূরের মানুষ হয়েছিলেন। গভীর। আত্মমগ্ন। পড়াশুনো নিয়েই থাকতেন। বিদ্যালয়পর কলেজের রাশভারী অধ্যাপক ছিলেন তিনি। মা ছিলেন চিররুগ্ন। প্রতি দিন কোনও না কোনও অসুখ তাঁকে কাবু করে রাখত। প্রণবেশের অনেক দিন পর নীলাত্রি এসেছিল পৃথিবীতে। প্রায় দশ বছর পর। প্রণবেশ এখন বৃকতে পারেন, রুগ্ন মায়ে র গর্ভে আরও একবার সন্তান আসা তাঁর শরীরের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নীলুর বয়স যখন বারো, মা চলে গেলেন। প্রণবেশের মনে আছে, মায়ে র দুটি রক্তশূন্য পা। কারা যেন বলছিল—কী ভাগ্যি! সধবা গেল।

কারা যেন আলতা পরিয়ে দিয়েছিল পায়ে। কপালে বড় করে সিঁদুর দিয়েছিল। মায়ে র সেই মুখ এখন আর প্রণবেশের মনে পড়ে না। শুধু মনে হয়, দুটি পা—সাদা। নীল শিরা-উপশিরা

সমত। লাল আলতায় ঘেরা। সেই থেকে খুব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল ভাই। হয়তো চারজন মানুষই নিজের মতো করে একা হয়ে গিয়েছিল। রূপ হলেও পারস্পরিক সম্পর্কের সত্ত্ব সূতোটা বেঁধে রেখেছিলেন মা—প্রণবেশ তখনই সেটা উপলব্ধি করতেন। প্রণবেশের বাবা সচ্চিদানন্দকে দেখে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায়নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনিও নিঃশ্ব হয়ে গিয়েছিলেন। মা রূপ হওয়ায় প্রণবেশের ছোটবেলা থেকেই বাড়ির বাবাবা মা সংসার সামলানোর ভার ছিল সন্ধ্যামাসির ওপর। একটা পা খোঁড়া ছিল বলে সন্ধ্যামাসির বিয়ে হয়নি। সংসারে কোথাও তাঁর সমালব্ধের জায়গা ছিল না। সচ্চিদানন্দ আর ইলা, প্রণবেশ ও মীলানির বাবা ও মা তাঁকে সেই জায়গাটি দিয়েছিলেন। অনেক বড় হয়েও প্রণবেশ জানতেন সন্ধ্যামাসি তাঁর মায়ের সহোদর। পরে জেনেছেন, সন্ধ্যামাসি মায়ের পাকড় মেরে। ছোটবেলার বকুলফুল।

সন্ধ্যামাসির সঙ্গে মায়ের কোনও দিন ঝগড়া হয়নি। মাঝে মৃত্যুর পর ভাইকে মায়ের আখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। 'তারা দু' ভাই-ই সন্ধ্যামাসিকে ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁকে কোনওভাবে মা বলে ভাবা যেত না। কোথায় কম ছিল প্রণবেশ জানেন না। হয়তো সন্ধ্যামাসির প্রতি বাবার আচরণের সসম্মত দূরত্ব তাঁকে বাবার ছেলের চেয়েও কিছুটা দূরে ঠেলে রেখেছিল। কিংবা, সন্ধ্যামাসির নিজের ক্ষেত্রও বলা যায়। মা বেঁচে থাকতে, সংসারের সমস্ত কাজ সম্পর্কে মাকে জিজ্ঞাসা না করে তাঁকে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়নি। পরম ভদ্রতায়, পরম বিনয়ে আশ্রয়দাত্রীর কাছে স্বঘোষিত অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তিনি। মায়ের মধ্যেও সেই পরিমিতিবোধ ছিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল বলেই কেউই কারও সীমা ভাঙার জন্য ব্যস্ত হননি। তাই ছোট ছেলে দুটির চেয়েও তিনি সন্ধ্যামাসিই হয়ে রইলেন আজীবন। প্রকৃতপক্ষে, মায়ের ছায়ার মতো কাটিয়েছিলেন পঁচিশ বছর। মাঝে মাঝে ভাইয়ের বাড়ি যেতেন। তখন মাকে খুব অস্থির দেখাত। বলতেন, সন্ধ্যা নেই। বাড়িটা ফাঁকা লাগে।

সন্ধ্যামাসির হাতখরচ ইত্যাদিও নিশ্চয়ই তিনিই জোগাতেন। কিন্তু সেই সম্পর্কে কারওকে কোনও কথা উচ্চারণ করতে শোনা যায়নি। হয়তো মা ও সন্ধ্যামাসির এত সুন্দর সম্পর্কের জন্য, কিংবা প্রত্যেকেরই অতুলনীয় ভদ্রতাবোধের জন্য কোথাও কোনও গোলমাল ছিল না। গোলমাল লাগল, জুই আসার পর।

স্টেশন থেকে নামার সিঁড়ির প্রান্তে এসে মল্লিনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল প্রণবেশের। ওপর দিয়ে একটা ট্রেন চলে যাচ্ছিল তখন। সেই শব্দে প্রণবেশের হঠাৎ মনে হল মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। অশ্রুচর। এতক্ষণ মনে হয়নি তো। প্রণবেশের কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। মল্লিনাথও অন্যমনস্ক পা ফেলে আসছিলেন। স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে একজন নেমে আসছেন, আর একজন উঠছেন, দুই পুত্রশোকাতুর পিতা। মল্লিনাথ ষাট। প্রণবেশ পঁয়ত্রিশ। মল্লিনাথও মাথায় হাত রাখছেন। হয়তো তাঁরও মাথার যন্ত্রণা করছে। একটি বিচ্ছিন্ন ছবির মতো এই সিঁড়ি, ওই বি টি রোড, মাথার ওপরকার আকাশ এবং কিছু দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ভ্রাম্যমাণ চিল এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে। পঁচিশ বছরের ব্যবধান সমেত দুটি মানুষ পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছেন এবং কথা বলার অনিচ্ছা বা অন্যমনস্কতায় মাথার যন্ত্রণা নিয়ে পরস্পরকে কুশল বিনিময় না করে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু কুশল বিনিময় না করলেও তাঁদের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে এক মুহূর্তে মুছে দিচ্ছে পুত্রশোকের ভারী পাথর।

প্রণবেশ রাস্তা পার হলে। একটা ওবুথ খাওয়া দরকার। তিনি ব্রজগোপালের দোকানে গেলেন। দিবোন্দুও আজ দোকানে আছে। ওবুথটা দিতে দিতে দিবোন্দু বলল, ছেলের কোনও খবর হল প্রণবদা?

প্রণবেশ মাথা নাড়লেন। বললেন, এক গ্রাস জল হবে?

এক গ্রাস জল দিয়ে দিবোন্দু বলল, দরকার হলে বলবেন প্রণবদা। কোথাও যেতেটেতে হয় যদি।

কোথায় যেতে হবে? কোথায় যাওয়া যায়? এরা কোন জায়গার সন্ধান হাতে চাইছে? ভারতে মাথা কিম্বদন্তি করে। চকিতে, ইথার তরঙ্গের মতো অথবা কল্পমাল্য অবতরণ ফুটে ওঠে মল্লিনাথের মুখ। দ্বন্দ্ব। ভাঙাচোরা। শোকের মুখ। পিতার মুখ। বা বুঝি-না-কখনও কখনও সমর্থক। পিতৃত্বের সেই অসহ শোক ক্রমে প্রণবেশেও ছুটিয়ে যায়। টালমাটাল পাতে তিনি বাড়ির দিকে হাটেন।

হারুর লোকান পেরিয়ে যেতে যেতেই হারু ডাক দেয়, ও প্রণবদা, ছেলের খবর পেলেই? প্রণবেশ ক্রান্ত মুখ তুলে হাসেন। মৃদু, এক চিলতে হাসি ঠোঁটের তলায় বিশালনক ভাবে ফুলতে থাকে। যেন ছাদের কানিশ ধরে ফুলতে থাকা মৃদুজীবিত যুবক, যে পাড়ে বেলে বাঁচানো একেবারেই অসম্ভব। মনে মনে প্রণবেশের বাঁধা ছাড়ে যায়। সবাই কোন-গোছে তা হলে? এখন তাঁকে অজ্ঞত প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য তৈরি হতে হবে। তিনি এগিয়ে যান। লক্ষীর ফুল পেরুতে না-পেরুতেই পেছনে গাড়ির তীর শব্দে চমকে ওঠেন তিনি। তাকিয়ে দেখেন—পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অবসরতা কেটে যায়। প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্ত্র টান টান হয়ে ওঠে। পথের একপাশে সারে দাঁড়ান তিনি। পুলিশের গাড়ি তাঁর প্রায় গা ঘেঁবে এগিয়ে যায় কারণ পাড়ার ভিতরকার এই রাস্তাগুলি গলির চেয়ে চওড়া হলেও এখানে কোনও ফুটপাথ নেই। রাস্তা তৈরি হওয়ার সময় কেউ মনে রাখেনি একদিন প্রণবেশ পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবেন, হারিয়ে যাওয়া ছেলের জন্য শোকে বা দৃষ্টিভ্রান্ত তাঁর মাথা যন্ত্রণায় ছিড়ে যাবে, ভাঙলরিশায়ে এটিকে মহিগ্রনও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে হয়তো, কিংবা নিউরোসিস, আর এমনই অবস্থায় কোনও পুলিশের গাড়ি তাঁর প্রায় গা ঘেঁবে চলে যাবে। এবং তখনই প্রণবেশ লক্ষ করবেন, একা জিপ নয়, পেছনে ইদুরকলের মতো কালো বড় বাঁচটা। এবার প্রণবেশকে লক্ষীর ফুলের সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াতে হল নইলে ওই ইদুরকল গাড়ি তাঁকে চাপাও দিয়ে নিতে পারে এবং তখনই লক্ষী ও আর দু'জন শিক্ষিকা ফুলের বারান্দায় এলেন—প্রত্যেকের চোখে মুখে জিজ্ঞাস্য একটাই প্রশ্ন—পুলিশের গাড়ি কেন? অ্যা? পুলিশের গাড়ি কেন?

এ পাড়ায় পুলিশের গাড়ি আসত বটে নিরমিত, বাঁচা ছাড়া কিংবা বাঁচা সমেত তিন-চার বছর আগেও, নকশাল ধরতে আসত, বাছবিচার না করে, ধোঁজখবর না করে, সমস্ত যুবক বা তরুণকে বা বালকদেরও যাদের সদা তরুণ বলা যায়—ওই বাঁচায় পুরে নিয়ে যেতে চাইত। কেন-না নকশাল কে বা কে নয় তা বাইরে থেকে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। নকশাল হওয়ার প্রাথমিক শর্তই ছিল তরুণ হওয়া, পুলিশ এরকমই ধরে নিতে চেয়েছিল এবং ভীষণই ভয় পেয়েছিল নিশ্চয়ই ওই সমস্ত পুলিশ বা পুলিশের চালক বা চালকদল। কারণ তারা সমস্ত তরুণকেই ঝাড়ে-বাঁশে নিঃশেষ করতে চেয়েছিল, যেন ছোঁয়াচে ব্রোণের মতো আন্দোলনের স্বপ্ন একজন তরুণের থেকে অন্যজনে না যায়। ওরা বুঝে তাড়াহুড়ি মরে যেতে পারে। আর তাঁর ভাইরাসের মতো সংক্রামক ওই স্বপ্নের ধাক্কায় সারা পৃথিবীর ইতিহাস পাণ্টে যাওয়ার সজ্জা না দেখা দেয়। তাই, তখন ওই ইদুরখরা গাড়ি সমেত যখন তখন পুলিশ এসেছে এ পাড়ায়, অনেকটা বৃদ্ধি করপোরেশনের কুকুরখরা গাড়ির মতো আচরণ—হবে নাই-বা কেন? কুকুর না-ভাবলে, ইদুর না-ভাবলে, একেবারে খোদ মানুষ ভাবলে ওদের খাঁচায় তোলা এবং মাঠে-ময়দানে-রাস্তায়-গলিতে গুলি করে মারা সম্ভব হত না, কিছুতেই সম্ভব হত না তাদের পক্ষে।

তখন প্রণবেশের মনে আছে, বিকাশদার বড় ছেলে দেবশিসকে বসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর সবাই কোথায় গিয়েছিল? প্রণবেশের একবার মনে হয়, তাঁর ছেলের খোঁজে পুলিশের এই আগমন বৃদ্ধি-বা। না, তখনই এই ভাবনাকে তিনি খারিজ করে দেন, কারণ, বাস্তব সম্মুখে ওই কালো খাঁচাগাড়ির কোনও সম্পর্ক আদর্শেই থাকতে পারে না। আর তাঁর এই ভাবনা-চিন্তার মুহুর্তেই পুলিশের গাড়ি পাড়ার নিজস্ব চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভেতর থেকে সুসভ্য চেহারার একজন, হয়তো, এসে আই, বেরিয়ে লক্ষীর ফুলের দিকে আসেন।



প্রবেশ এবং লক্ষীসহ তিন জন স্থাপনও তাঁর প্রতীক্ষা করেন। পুলিশের আগমন অসম্ভব ও অবিচল মনে হয়। সাধারণ ও স্বাভাবিক পদক্ষেপগুলি ক্রমশ বৃহৎ হতে থাকে এবং বৃহত্তর। প্রত্যেকেই, স্বভাবগত ভাবে, যে-স্বভাব আয়ত্তে এগোছে কিংবা কয়েক বছরের পুলিশজর্জর, উদ্বেগ বোধ করেন এমন কোনও প্রস্তাব কখনো করেন যার উত্তর আরও জানা নেই। ছেলেমেয়েরা কুলে-কলেজে যাওয়ায়, পুরুষেরা অফিসে যাওয়ায়, সবাই পাড়ায় নিম্নোক্ত জনশূন্যতা, তারই ফাঁকে সুসভ্য পুলিশটি এসে গাঁড়ান। তাঁর চোখেমুখে এখনও ঘরের ছেলের ছাপ লেগে আছে। পুলিশি ক্রুরতার ছায়া পড়েনি। সে কি সত্য পুলিশে যোগ দিয়েছে? হতে পারে বটে। গত কয়েক বছরে অনেক তরুণের সঙ্গে গুলিবিদ্ধ পুলিশের মৃত্যুর কথাও শোনা গেছে। সেই সব শূন্য জায়গা ভরাট করতে কিছু নতুনকে সংগ্রহ করা হতেও পারে। প্রবেশ অনুমতি করার চেষ্টা করেন। কত হবে বয়স? পঁচিশ, ছাব্বিশ? নীলাহির মতোই প্রায়। তিনি বড় করে বায়ু টানেন—বাক, ওই বয়সের মানুষেরা এখনও আছে তা হলে। কিন্তু অস্ত্র জিইয়ে রাখা হয়েছে যাতে নিজেদেরই যন্ত্রাংশের হাতল টানার জন্য তাঁদের ব্যবহার করা যায়।

—মাথুরের গড় স্পোটিং ক্লাব কোন দিকে?

পুলিশ প্রবেশের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। কিন্তু উত্তর দিচ্ছেন লক্ষী—অনেকটা রেডিঘোরে সম্প্রচারিত ফুটবলের ধারা-বিবরণীর মতো শোনায় তাঁর কথা। তিনি বলে চলেন, হ্যাঁ, গাড়ি নিয়ে চলে যান, ডান দিকে, সেখানে অন্য একটি রাস্তা ধরে সোজা বাঁ দিকে, কিছুটা গেলে একটা মাঠ, মাঠের গা ঘেঁষে রেললাইন। লাইনের ধারে ওই...ওই...

তাঁর স্বর ক্রমে উৎসাহী ও প্রাণবন্ত হতে থাকে। এবং দায়িত্বশীল। যেন চিন্তার গহনে উপলব্ধি হয়েছে যে মাথুরের গড় স্পোটিং ক্লাবের সঙ্গে তাঁদের কারও কোনও স্বার্থসম্পর্ক থাকতে নেই।

পুলিশ জিপ গতিশীল করে। ততক্ষণে কাছেকজন কৌতূহলী মানুষ ভিড় করেছেন। অনেকদিন এ পাড়ায় পুলিশ আসে না। সকলেই চোখে-মুখে প্রশ্ন একে এগোন। পুলিশের লক্ষ্য তবে পুরনো ক্লাব! প্রবেশ দেখেন, বেশির ভাগই দোকানের লোক, কিংবা হিরণের মতো কিছু কর্মহীন পুরুষ। গোটা দল এগিয়ে যায়, প্রবেশও যান তাঁদের সঙ্গে, এমনকী লক্ষীও যান, সঙ্গে থাকেন ‘আদর্শ শিশুপাঠ’ অর্থাৎ লক্ষীর স্কুলের সহপ্রধানা মালতীদি। মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁরা অস্ত্র একটা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। পুলিশের নীরব বন্দুকের সামনে একে একে বেরিয়ে আসছে এ পাড়ার গোপাল কুণ্ডুর ছেলে সূজন, সুধীর পালের ছেলে কাজল, ঘোষাবাবুর ছেলে অমিতাভ, মিথিলেশ ব্যানার্জির ছেলে মুখ্য। তারপর আরও একজন, আরও একজন, ওই দেখো, আরও একজন। ওরা কে? কেউ ওদের চেনে না। কিন্তু কেউ কেউ চিনেও ফেলে। ওরা দক্ষিণেশ্বরের নাম করা মস্তান গোপলা, চেরি আর কালু। ওরা এখানে। এই ক্লাব? ওরা তো... ওরা তো... শোনা যায় কারও পেটে ছুরি বসাতে হাত কাঁপে না গোপলার ... আর চেরি, যে-কোনওদিন, শুধু হাত ধরে এসে বলে—এই একটাকে ফেলে এলাম তো—

হাত উঁচু করে হেঁটে আসছে সব। হাতগুলি যেন ওদের স্ববশে নেই। শূন্যে ঝুলছে। ঝটপট করছে। এমনকী ওরাও যেন হটিতে গিয়ে উলে যাচ্ছে বারবার। চোখ ঝুলতে পারছে না। দুলতে দুলতে, অসুস্থ প্রত্যঙ্গ সমেত, একজন একজন করে উঠে আসছে ইদুরের খাঁচায়। ওরা নেশা করছিল তা হলে। কী যেন খাচ্ছিল। নতুন নাকি এসেছে বাজারে। হিরোইন—একজন বলল। তখন কে যেন শুধরে দিল—না ব্রাউন সুগার। না না ট্যাবলেট—খানকৈ খাচ্ছিল—কলল আরেকজন। না। ওটাকে বলে—হেরোইন। খুবই প্রত্যায়ের সঙ্গে বলল আরেকজন। তাঁর প্রত্যয় বৃদ্ধি অন্য সবাইকে বানিয়ে দিল।

তখন উঁচু-নিচু হতে থাকে কুঁজ নিয়ে নড়বড় করতে করতে ওখানে এসে দাঁড়াল ফুলরেণু। তাঁর হাত দু’টি গোবর ভরা। দু’চোখে বিষময়। পুলিশ এসেছে তা হলে! পুলিশ! কিন্তু কী করেছে ওরা। নেশাই তো করছিল। ওরা তো কোনও ক্ষতি করেনি। মাতলামো করেনি। বস্তিতে তো



কতই নেশা করে মানুষ। এমনকী রেলব্রিজের পাশে ওই ক'টা মোপাতি ভাঁর মধ্যেও চোলাইয়ের ঠেক আছে। কই, পুলিশ তো কখনও কারওকে ধরে না। সে আর কৌতূহল ধরে বাঁধতে পারে না। সরাসরি প্রশ্ন করে, অ পুলিশবাবু, দাদাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছ কেন গো?

নবনিযুক্ত পুলিশের গম্ভীর মুখের রেখা টান টান হয়ে থাকে। তিনি ক্রোধভার অনুসন্ধান শেষ করেছেন। বলমলে রোদ মেখে একটি সুদীর্ঘ মালগাড়ি ক্রমে গার হয়ে যায়। ততক্ষণ এই জনতা, পুলিশ ও নেশাখোরদের চিত্রটি স্থির হয়ে থাকে। এরই মধ্যে কোনওভাবে খবর হটে যায়। বিশ্বজ্বর ঘোষ ও গোপাল কুণ্ডকে খায় ছুটে আসতে দেখা যায়। জনতা তাঁদের দিকে ফেরে। লক্ষী ফুলের দিকে ফেরেন। বিশ্বজ্বর লক্ষীকে বলেন, কী হল বলুন দেখি। পুলিশ কেন।

লক্ষী কিছু বলার আগেই তরুণ পুলিশকর্মী বাধা দেন, এক মিনিট। আগুন লাগে না।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বিশ্বজ্বর ঘোষ ও গোপাল কুণ্ড তাঁকে ঘিরে ধরেন। জনতা আরও এগিয়ে আসে। কুণ্ড ও ঘোষের কাছের প্রার্থনা শোনা যায়, সার! কী হল সার! কেন ধরে নিয়ে যাচ্ছেন সার।

তাদের হাত দুটি জোড় হয়ে যায়। ঘাড় কঁজো হয়ে আসে। মেরুদণ্ড তদবধি সোজা। পুলিশের ভারপ্রাপ্ত তরুণটি বলেন, আপনারা কে? কুণ্ড ও ঘোষ সমস্তরে তাঁদের পিতৃহ ঘোষণা করেন। তরুণ বলেন, ধন্যায় আসুন। এখানে কোনও কথা হবে না।

অতঃপর তাঁদের মেরুদণ্ড বেকে যেতে থাকে। ভারপ্রাপ্ত তরুণ পুলিশ এবার ঘোষণা করেন, এখানে এই ক্রাবে আমি কিছু জিনিস পেয়েছি যেগুলো সর্বসমক্ষে আমি সিজ করে নিচ্ছি। আপনারদের মধ্যে থেকে যে-কোনও পাঁচজন আসুন। সাক্ষী দিন। আমি সিজার লিস্ট তৈরি করছি।

ভিড়ে একটি চাকলা তৈরি হয়। কুণ্ড ও ঘোষ ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকেন। পুলিশের লিস্ট। তাতে সই। পুলিশে হুঁলে অটোরো ঘা—কেই-বা তা না জানে। পুলিশের কঠ অব্যাহ শোনা যায়—আপনারা কেউ চলে যাকেন না।

তিনি প্রশ্নবোধকে বেছে নেন। এই মুখ, একটু আগে, দেখা ছিল। প্রশ্নবোধ এগিয়ে যান। তাঁর হাত-পা কাঁপতে থাকে। পুলিশের নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কে স্নায়ুগুলি শিথিল হয়ে যায়। তবু তিনি এগোন এবং সিজার লিস্টে সই করেন। একে একে সই করেন হিরণ, হারু, দিবোদু। তখন হাঁক-ভাক করে সেখানে পৌঁছে যান কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)-র আঞ্চলিক নেতা শ্যামাকান্ত। কয়েকজন সাদৃশ্য সমেত 'কী হয়েছে—কী হয়েছে' বলতে বলতে উপস্থিত হন তিনি এবং বৃহত্তম শব্দে শব্দে সিজার লিস্টে হাত বাড়ান। পড়তে থাকেন। ছুরি-ছোরা-বন্দুকের তালিকা দেখে কপাল কঁচকে যায় তাঁর। বলেন, খুব জোরের সঙ্গে, জনতাকে শুনিছে—কী? এইসব রাখত? ক্রাবটিকে শরতানির জায়গা করে ছেড়েছিল? আমি এবং আমার ছেলেরা আপনার সঙ্গে আছে। আমাদের কর্তব্য যে-কোনও অন্যারে অবিচারে পুলিশ ও প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সাহায্য করা। আপনি আজ যা করলেন তাতে মাথুরের গড় উপকৃত হল। এরপর এর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় আমরা দেখব।

প্রশ্নবোধের মনে হল, শ্যামাকান্ত বক্তৃত্তা অভ্যাস করছেন। ভোট এসে গেছে। শ্যামাকান্ত উত্তেজিত। এ পাড়ায় তিনিই প্রথম সি পি এম নেতা।

পুলিশ ক্রাব সিল করে গাড়িতে গতিশীলতা দেয়। মাঠের বুকে চাকার দাপ রেখে ধীরে ধীরে বেরুতে থাকে ইদুরভ্যান ও জিপগাড়িটি। তখন কংগ্রেসের অনিল সামন্তকে দু'তিনজন সমেত ছুটে আসতে দেখা যায়। ভোট এসে গেল বলে অনিল সামন্ত বাস্ত ও তৎপর। এ পাড়ায় শ্যামাকান্তের চেয়ে তাঁর প্রভাব অনেক বেশি। খানিকটা অভ্যাসে, খানিকটা ঐতিহ্যগত সংস্কারে এ পাড়ায় বেশিরভাগ মানুষ কংগ্রেসে আস্থাবান। যে-কোনও ভুল ও স্বার্থপ্রসঙ্গিত সিদ্ধান্ত তাঁদের পীড়িত করে না এমন নয় কিন্তু গ্রাস, নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতা কাটাতে তাঁরা এই

ঐতিহাসিক দলের প্রত্যেক মত ও বাক্যের পেছনে শাস্তি ও কল্যাণ আশ্রয় অনুসন্ধান করেন।  
 ব্যক্তি হিসেবে অনিল সামন্তের পরিচয়ে কালি লাগেনি। সকল নেতার মতোই সারাক্ষণ মুখে  
 সামন্তপ্রভুজেনোচিত নির্বিকার কর্তৃত্ব তিনি জারি রাখতে আসেন। দেবিত্তে এসেও হঠাৎকু  
 অপ্রতিভ না হয়ে অনিল সামন্ত হাত দেখান। পুলিশের জিপ খেমে যাক। তিনি বাসুদেব  
 পোদ্দারকে নিয়ে জিপে উঠে বসেন। শ্যামকান্তের মুখ ঝুলে যায়। ভোটে মাত্র তিনদিন আগে  
 পুলিশের জিপে অনিল সামন্তের এই অনায়াস উত্তরণ জনগণের কাছে তাকে প্রকটই তুচ্ছত্বপূর্ণ  
 করে তোলে। আর এইসব দেখতে দেখতে প্রণবেশের দায়ুগুলি ক্রমশ কর্মক্ষমতা হারায়। তাঁর  
 চারপাশে অন্ধকার নেমে আসে। তিনি ধীরে ধীরে পড়ে যেতে থাকেন। তাঁর মনে হয়, অসীম  
 অনন্ত অন্ধকারে তাঁর পতন হচ্ছে। কোনও কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছেন তিনি। ধামতে  
 চাইছেন—কিন্তু পারছেন না।



কোনও এক গাঢ় স্বপ্নের মধ্যে কিংবা হয়তো অন্য পৃথিবীর কোথাও ভাসতে ভাসতে প্রণবেশের  
 মনে হল সচ্চিদানন্দ এসেছেন। ও বাবা। বাবার পাশে কে। সন্ধ্যামসি। সন্ধ্যামসি কী বলছ?

তোর মাকে দেখতে পাচ্ছিস না পুনু? ওই তো মা।

মা! মাগো! তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

কপালে একটি শীতল স্পর্শ পান প্রণবেশ। আঃ! মা তুমি, না? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না  
 কেন?

—এই তো আমি। পুনু! সন্ধ্যা আছে আর আমি থাকব না?

—মা! বাবা! সন্ধ্যামসি!...

প্রণবেশের কণ্ঠ চেপে যায়। ভীষণ কান্না পায় তাঁর। কত কিছু বলার আছে। কত ভার জমে  
 আছে। কত দুর্ব্বল কষ্ট। কোনওক্রমে তিনি উচ্চারণ করেন—ও চলে গেছে মা।

—কে? কে চলে গেছে?

—নীলু চলে গেছে মা। নীলু নীলু নীলু...

তখন সচ্চিদানন্দের ভারী কণ্ঠ শোনা যায়—পুনু। পুনু তোর ছেলে হাসছে দেখ। তোর ছেলে  
 কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে। পুনু—

প্রণবেশ চোখ মেলতে চান। কই আমার ছেলে কোথায়? বাবা। তুমি জুইকে একটু বুকিয়ে  
 বলবে? আমার ছেলেকে আমি ভালবাসি। ওর দিকে যে তাকাতে পারতাম না সেটা ওকে ঘৃণা  
 করে নয়। সেটা কষ্ট হত বলে। খুব কষ্ট হত বলে। ব্রেকস্ট প্যালেট অ্যান্ড হোয়ার লিপ্‌স। বাবা—

—দেখ, পুনু, চোখ খোল। তোর ছেলে। পুনু—

একরাশ আলোয় প্রণবেশের চোখ খাঁদিয়ে যায়। ক্রমে সচ্চিদানন্দের মুখ মিলিয়ে যায়।  
 সন্ধ্যামসির মুখও নেই। শুধু এক শীতল প্রশান্তির রেশ সারা কপাল জুড়ে। প্রণবেশ ডাকেন—  
 মা—

জুই মুখ বৌকান।

—শুনছ। শুনতে পাচ্ছ। ও ফিরে এসেছে। বাবা ফিরে এসেছে। ওঠো। চোখ খোলো।  
 দেখো। ও ফিরে এসেছে।

প্রণবেশের মতো তড়িৎ খেলে যায়। তিনি ধড়ফড় করে উঠে বসতে চান। ডাক্তার শিবতোষ

তার কাঁধ ধরে শুইয়ে দেন। মাথার কাছ থেকে বাত্মা সরু করে তাকে, বাত্মা। আমি। বাত্মা—

তার শীতল হয়ে যাওয়া হাতে সে প্রণবশের নলটি স্পর্শ করে। প্রণবশ বুকে পড়েন না এখন সময় বক্ত। বুকে পড়েন না ঘরে কত লোক জমে আছে। বাত্মার হাত তিনে তাকে বুকে সাপটে নেন তিনি। তারপর কাঁধ ভেঙে কাঁদেন। তার কান্নার ওঃ ওঃ শব্দে হে হে শব্দে বাত্মাও কুঁপিয়ে গঠে। সমবেত মেয়েরা চোখে আঁচল চাপা দেয়। সমবেত পুরুষেরা হাতা দেওয়ালের দিকে চেয়ে আবেগ সংবরণ করে। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠেন জুই—ওঃ ভগবান! তার মন অনুতাপে পুড়ে যেতে থাকে। মনে পড়ে সকালে তিনি কত বিরক্ত করা প্রণবশকে বলেছেন।

আবেগপূর্ণ কিছুটা প্রশমিত হলে লোকেরা যে-যার বাড়ি যায়। প্রত্যক্ষ, যা-কিছু ঘটছিল, তার মধ্যে অন্যান্য পরিবারও জুড়ে গিয়েছিল। এখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আবার। আবার চুকে পড়ছে নিজের বস্ত্রে। যদি, এই ঘটনাত্মক বিয়োগান্তে পৌঁছত, তার বেশ দীর্ঘকাল ভেঙ্গে থাকত প্রতিটি বস্ত্রে। সুখের গল্প ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়। সুখের গল্প বাড়তে থাকে।

—সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

ডাক্তার শিবতোষ পালস্ পরীক্ষা করতে করতে বলেন, সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকো ক'দিন পুন্য।

প্রণবশ হাসেন, বিশ্রাম আর কি? সাতদিনের ছুটি নিয়েছিলাম। এখনও ছ'দিন বাড়িতে আছি।

—না, বিশ্রাম মানে বেড রেস্ট। প্রেশারটা খুবই নেমে গেছে। আমি কেনও ওষুধ দিচ্ছি না। শুধু ট্রান্সফুইলাইজার দিলাম। একটা চাপ গেছে তো। বিশ্রামে সেরে যাবে। আর বাজারটা জারও করতে যাবে না একদম। ভাল করে খাও আর ঘুমোও।

জুই শিবতোষের হাতে ভিজিটের টাকা দিতে যান।

শিবতোষ টাকা নিয়ে চলে যেতে যেতে বলেন, সন্ধ্যাবেলা আসব আবার।

প্রণবশ সেছেন, জুই হাসছেন। বাইরে বাত্মার গান শোনা যাচ্ছে—তুমি ধনা ধনা হে। তোওমারি গেএহে পাআলিছ স্নেহে—তুমি ধনা ধনা হে—সবকিছু কত স্বাভাবিক। অথচ কালই এসময়...। প্রণবশ আর ভাবতে পারেন না। চোখ বন্ধ করেন। জুই কপালে হাত রাখেন। জিজ্ঞেস করেন, কী যাবে? সকালে?

ধীরে ধীরে চোখ খোলেন প্রণবশ। বলেন, ওকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলে?

—না।

জুইয়ের মুখে অঙ্গকার নেমে আসে।

—কে দিয়ে গেল? নিজে এসেছে?

—একটা লোক।

—সে কোথায়?

—চলে গেছে।

—কেন?

—বলল, স্টেশনে সোকান আছে। খুলতে হবে। ভোরবেলা চলে গেল। ও নাকি কালনার নামে গিয়েছিল। জানো?

জুইয়ের গলা ধরে আসে। দু'চোখে জল। প্রণবশ অবাক হন।

—কালনার! আমরা অন্তঃকণ টের পাইনি।

—ওই লোকটা না দিয়ে গেলে কী হত বগো তো?

—আমাদের বাড়ি খুঁজে পেল কী করে? ও ঠিক ঠিক ঠিকানা বলতে পেরেছিল?

—ও নাকি হাঁকা স্টেশনে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর লোকটা—কী ফেন নাম বলল—

পাঁচু—পাঁচুগোপাল স্টেশনে ওর দোকানের সামনে বোকে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। ও নাকি ডেকে বলে—কাকু আমাকে একটু জল দেবে?

—বোধহয় ভয় পেয়েছিল, না?

—হ্যাঁ। পাঁচুও তাই বলল। ওর ভয় পাওয়া যুব দেখে আর কোনও ট্রেন স্টেশনে নেই দেখে পাঁচুর সন্দেহ হয়। সে তখন বাগ্নাকে নানা ককম প্রশ্ন করে। বাগ্না তাকে সবুজ গল্প বলেছে জানো?

—কী বলেছে?

জুই চারপাশ দেখে নেন। তারপর বলেন, বলেছে, আমার মা আমাকে ভালবাসে না, তাই আমি চলে এসেছি।

—সে কি!

—আম্মা বলো, আমি কি ওকে ভালবাসি না? এই কথা ও বলতে পারল?

—তারপর?

—আর বলেছে, আমার একটা দাদা ছিল। মা তাকেও ভালবাসত না। একদিন দাদাকে খুব মেরেছিল তাই ও মরে গেছে। আমি যদি বাড়িতে থাকি, আমাকেও মেরে ফেলবে।

—সে কি? তারপর?

—পাঁচুগোপালের সন্দেহ হয়েছিল। ও এরকম আরও দেখেছে। অনেক বাচ্চা পালিয়ে পালিয়ে স্টেশনে আসে, আর তারা এরকম বানিয়ে অনেক কথা বলে। আম্মা, বাগ্না কেন এরকম বলবে? বলো? কেন বলবে?

জুই দু'হাতে মুখ ঢাকেন। ছেলে শুনে ফেলতে পারে ভেবে জোরে কীদতে পারছেন না। কিন্তু কামার দমকে তাঁর সারা শরীর ফুলে ফুলে ওঠে। প্রণবেশের মনে হয়, নীলাত্রি ছোটবেলায় এরকম বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলত। কিন্তু সেগুলো শুনে ভাল লাগত— দু'একটা প্রণবেশের মনে আছে। একদিন বলেছিল—আমি ঘুড়ি ওড়চ্ছি। আর একটা এরোপ্লেন যাচ্ছিল। পাইলটটা কী করল জানো? হাত বাড়িয়ে আমার ঘুড়ি নিয়ে দৌড়।

প্রণবেশ খুব হেসেছিলেন সে দিন। গল্পটা সকলকে করেছিলেন। তাতে খুব অভিমান হয়েছিল নীলুর। বলেছিল, তুমি সবাইকে বলে দিলে কেন? তোমাকে আর কিছু বলব না।

প্রণবেশ ভাইকে বুঝিয়েছিলেন, আম্মা, পাইলট তোমার ঘুড়ি নিয়ে গেল আর সে-খবর তুমি মাঝে কলবে না?

তখন হেসেছিল সে। বলেছিল, আরেকদিন কী হয়েছিল শুনবে?

—কী?

—সেবার্চনদের নাড়াছাড়ে উঠেছিলাম। তখন একটা ভূত আমাদের তাড়া করেছিল।

—হাঁ! ভূত! কেমন দেখতে?

—ওই হায়ার মতো। দাদা। সেবার্চন বলছিল নিমগাছে নাকি ভূত থাকে।

কী শিশু ছিল নীলুটা! কী সুন্দর ছিল! প্রণবেশ জানেন—অনেক শিশুই কল্পনাপ্রবণ হয়। কিন্তু বাগ্না এ সব কী বলেছে? তিনি জুইকে প্রশ্ন করেন, এর মধ্যে ওকে মেরেছিল নাকি?

জুই মুখ তোলেন। বলেন, কখনও কখনও চড়-চাপড় মারি। কিন্তু সে কে না মারে বলো? ওই পাঁচু কিছুতে বিশ্বাস করবে না আমার কোনও ছেলে আর ছিল না। কী ভাবল লোকটা।

—ও কী ভাববে? তারপর? ও কি করল?

—ও নাকি বাগ্নাকে বলেছিল, আম্মা মা তো তোমাকে ভালবাসে না, কিন্তু বাবা! বাবা ভালবাসে?

—কী বলেছে বাগ্না?

—বলেছে—বাবা? হ্যাঁ। ভালবাসে। কিন্তু আমার কাছে তো থাকেই না। তোমাকে কতবার

বলেছি কলকাতায় ট্রান্সফারের চেষ্টা করো, বাগ্নার তোমাকে দরকার। এখানে, এই একা বাড়িতে ও আবোলতাবোল কল্পনা করছে।

প্রণবেশ চুপ করে যান। তাঁর মনে পড়ে, জুইয়ের সমস্ত সংলগ্ন সমস্ত আচরণ—সন্ধ্যামাসির সঙ্গে, নীলান্দির সঙ্গে। তাঁর বলতে ইচ্ছে করে—একা তো ওকে থাকতে হত না। জুই। তুমিই একা হতে চেয়েছিলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয় না। খুব অবসর লাগে প্রণবেশের। তিনি সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ টানেন—লোকটিকে আসা-যাওয়ার ভাড়াটা দিয়েছিলে।

—দিতে চেয়েছিলাম। নেয়নি। বলল, ছেলেকে মা-বাবার কাছে ফিরিয়ে নিলাম, এই কথা কত। বলল, ওকে মারধর করবেন না মা।

প্রণবেশ হির করেন, পরে ছেলের সঙ্গে কথা বলবেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ জড়িয়ে আসে। তন্ময় আশ্রয় হয়ে যান তিনি। তাঁর মনে পড়ে স্বপ্নে বাবাকে দেখেছেন। সন্ধ্যামাসিকে দেখেছেন। বাবা বাগ্নাকে তিরিয়ে দিচ্ছেন। কী আশ্চর্য। তখন বাগ্না সত্যি এসে গেছে। স্বপ্নের কথা জুইকে বলবেন বলে চোখ খুললেন প্রণবেশ। জুই নেই। প্রণবেশ আবার চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর মনে পড়ল, স্বপ্নে মাও ছিল। কিন্তু মার মুখ দেখা যায়নি। কেন যায়নি? আস্তে আস্তে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে প্রণবেশের। জুই যখন এল এ বাড়িতে, তখনকার কথা।

যেমন সাধারণত বলা হয়, নতুন বউ বাড়িতে এলে, শোনো, এ তোমার অমুক, একে তমুকভাবে দেখবে, তেমনি করে সন্ধ্যামাসি সম্পর্কে কেউ জুইকে বলে দেয়নি, শোনো, ও সন্ধ্যা, ও আমাদের সবার আপন, তুমিও ওকে নিজের বলে ভাববে। বলেনি, কারণ বলার লোক ছিল না। ইলা অর্থাৎ প্রণবেশের মা থাকলে হয়তো বলতেন। কিন্তু সজ্জিদানন্দের পক্ষে, এত কথা, এত সাধারণ সাংসারিক কথা বলা সম্ভব ছিল না। ইলার মৃত্যুর পর সজ্জিদানন্দ আরও গুটিয়ে গিয়েছিলেন। আরও গভীর হয়েছিলেন। বেলুড়ে বা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে বসে থাকা বেড়ে গিয়েছিল। প্রণবেশের বিয়ের ব্যাপারটায় সন্ধ্যামাসিই জোর করেছিলেন। বলতেন, ঘরে বউ না থাকলে লক্ষ্মীছাড়া লাগে।

কেউ প্রতিবাদ করেননি। প্রণবেশও না। প্রণবেশ তখন সদ্য শিবপুর থেকে বেরিয়েছেন। কলেজের গল্প যায়নি গা থেকে। পাত্রী খুঁজতে খুঁজতে প্রায় দেড় বছর কেটে গেল। ফারাক্কা ব্যারেজে প্রণবেশের চাকরি আর জুইয়ের আসা প্রায় একই সঙ্গে।

সন্ধ্যামাসিকে প্রথম থেকেই গ্রহণ করতে পারেননি জুই। শাস্তি নন কিন্তু শাস্তির মতো সংসার আগলে থাকা মানুষটাকে তাঁর খুব ষড়্ভিত্তি মনে হত। কিংবা অন্য সকলের তাঁর প্রতি সম্মান, তিনি যে ইলার সহোদরার চেয়েও বেশি ছিলেন জুই তা বুঝতে চাননি। একটি হৃদয়, কাকে কতখানি জায়গা দেবে, কাকে প্রকৃতপক্ষে আত্মীয় ভাববে, কাকে নয় তার সন্ধান শুধু সে-ই জানে। অন্যরা তার নাগাল পায় না কাছাকাছি থাকলে অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে একটি অনুমানমাত্র সম্ভব।

গুরুতাই জুইকে রামাবাগ্নার মতো ভারী কাজ দেওয়া হরনি। জুই একদিন বলে বসলেন, আমি কিন্তু সবই পারি মাসিমা।

সন্ধ্যা বলেছিলেন, পারবে বৈকি মা। আমাদের দেশে মেয়েরা বারোতাই সব শিখে নেয়। করবার দিন তো তোমার পড়েই আছে। যতদিন পারি, করে দিই।

জুই হঠাৎ বলেছিলেন, যতদিন পারার কী আছে? আসলে আপনি দখল ছাড়তে চান না, তাই বলুন।

সন্ধ্যা দুঃখ পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, দখল ছাড়তে চাই না? সে কি গো? এ সব কি আমার নিজের? সব তো তোমারই। বেশ তো। তোমার যখন রামার ইচ্ছা, কাল থেকে তুমি রেঁধো।

আর রামাবাগ্নার ঢোকেননি সন্ধ্যা। রামা ছড়াও সংসারের বিস্তার কাজ পড়ে থাকে। খুঁজে

বুজ্জে সে-সবই তিনি করতেন। কাজ ছাড়া শুধু শুধু বাসে থাকার স্বভাবও ছিল না তাঁর। আর কিছু না হলেও সচ্চিদানন্দের ঘরে বইয়ের তাক থেকে বই পেড়ে খুলো খাড়াতেন। সেখানপড়া জানতেন সন্ধ্যামাসি। পড়াশুনোয় আগ্রহও ছিল। সচ্চিদানন্দের বই বরার অনুমতি পেতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। শরৎচন্দ্র, বক্রিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাগঙ্গর, বিজুতিভূষণ—সবই তাঁকে পড়তে দেখেছেন প্রণবশ। কোনও কোনও দুপুরে মাকেও পড়ে শুনিয়েছেন সন্ধ্যামাসি।

—শোন ইলা। এই জায়গাটা পড়ে দেখবি একবার।

ইলা পড়তে ভালবাসতেন না। বলতেন, তুই পড় সন্ধ্যা। আমি শুনি।

সন্ধ্যামাসি পড়ছেন। ইলা শুনছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস—

“... বুজ্জের সনির্বন্ধ আবেদন ও নিবেদন এবং পুনঃ পুনঃ উদ্বেজনা অত্যাশঙ্ক যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। যে মিথ্যা সম্মান, জীতি ও শ্রদ্ধা সে তাহার এই নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃব্যসম বুজ্জের নিকট হইতে এতকাল শুধু প্রতারণার স্বার্থে পাইয়া আসিয়াছে, সেই লোভেই এই তাহার একান্ত দুঃসময়ে কঠোরতা করিয়া অপ্রতিহত বলে সুরেশের নির্জন শয়নমন্দিরের দিকে ঠেলিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, এমনি এক বাড়-জল-দুর্দিনের রাগ্নিই একদিন তাহাকে স্বামীহারা করিয়াছিল, আজ আবার তেমনি এক দুর্দিনের দুরতিক্রমা অভিশাপ তাহাকে চিরদিনের মত সীমাহীন আচ্ছকারে ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছে। কাল অসহ্য অপমানে, লজ্জার গভীরতর পক্ষে তাহার আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া যাইবে, ইহা সে চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু তবুও আজিকার মত ওই মিথ্যাটাই জয়মাল্য পরিয়া তাহাকে কোনমতেই সত্য প্রকাশ করিতে দিল না। আজ জীবনের এই চরম মুহূর্তে অভিমান ও মোহই তাহার চিরগম্ভীর হইয়া রহিল। সে বাধা দিল না, কথা কহিল না, একবার পিছনে চাহিয়াও দেখিল না—নিঃশেষে ধীরে ধীরে সুরেশের শয়ন-কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।...”

সেইসব পাঠ চ্যনের মুহূর্তে দুটি মানুষের কাছাকাছি চলে যাওয়া—একজন পড়েন, একজন শোতা—পরস্পরের মধ্যে কত নিবিড় আনুগত্য থাকলে তা সম্ভব হয়, জুই কোনওদিন তা বুঝবেন না। আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার নিজস্ব সীমা নির্ণয় করে দেওয়া এবং সেই সীমার মধ্যেই পরস্পরের সম্মান অবস্থান কত বিশাল হৃদয় থাকলে সম্ভব হয়, তাও জুই কোনওদিন জানবেন না। প্রণবশ জানেন, পৃথিবীর বেশির ভাগ মেয়ের মতোই জুই মাতৃদুঃ জানেন শুধু আপন সন্তানের জন্য, প্রেম জানেন শুধু স্বামীরই জন্য, তাঁর জগৎ ও পরিবারে তফাত এটুকুই যে জগৎ-বোধের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস সমাসীন। অর্থাৎ জুই অতি সাধারণ, একেবারে গড়পড়তা মেয়ে। এই সাধারণ উপলব্ধির বাইরে তাঁর আর কোনও অনুভব নেই। এর বাইরে অন্য কোনও সম্পর্ক, কোনও সংযোগের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। প্রণবশ মোটামুটিভাবে তা মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে কীরকম শূন্য লাগে তাঁর জুইকে। সাধারণকে সাধারণ বলে গ্রহণ করার মধ্যে সন্তি আছে কিন্তু তৃপ্তি নেই। যদি কেউ বিশালে ও বাতিক্রমে অভ্যস্ত থাকে, তবে সেই তাঁর সাধারণ্য। তাঁর বাইরেরকার যা-কিছু বা তাঁর চেয়ে ক্ষুদ্রতর কিছু গ্রহণে বড় কষ্ট। চিন্তার রঞ্জে রঞ্জে ঢুকে যেতে থাকে সমালোচনা। পারস্পরিক প্রিয়ত্ব ঘুচে যায়। আপনজনকে কিছুতেই ভাবা যায় না যথার্থ আপনজন বলে। তখন নিজেকে একাও লাগে। মনে হয়, কোথাও কিছু নেই। সচ্চিদানন্দ নেই। ইলা নেই। সন্ধ্যামাসি নেই। নীলু নেই। নেই। নেই। নেই। সাধারণ দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়। সচ্চিদানন্দের বইগুলো কীটে দংশন করে। খুলোর আন্তরণ পড়ে যায়। অথচ ওখানকার চেনা বইগুলি, সন্ধ্যামাসি যেগুলি বেশি করে পড়তেন—দেখলেই প্রণবশ তাঁর কঠোর শুনতে পান। বিজুতিভূষণের ‘অপরাজিত’ পাঠ করছেন তিনি

“...ছাদে কেহ নাই, নুরের নদীর দিক হইতে একটা ঝিরঝিরে ছাওয়া



বহিতেছে। দুদিন যে কি খটিয়াছে তাহা যেন সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে নাই—আজ বুঝিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বেও সে ছিল সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য। জগতে সম্পূর্ণ একাকী, মুখের দিকে চাহিনার ছিল না কেহই। কিন্তু আজ তো তাহা নয়, আজ ওই মেয়েটি সে কোথা হইতে আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে, মনে হইতেছে যেন ও জীবনের পরম বন্ধু।....

প্রণবেশের বন্ধু নেই। সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। শুধু একাধিনি টান। সুইয়ের জন্য অতি অল্প। সামাজিক দায়বদ্ধতা। বাকিটুকু, বা জীবনের জন্য দরকার, তার সবটাই বন্ধুর জন্য। ছেলেকে চুষন করার, ছেলেকে ঠুঁয়ে থাকবার আশ্চর্য সুখ। প্রণবেশ মাঝে মাঝে কলহাকার বিজৃত জলরাশির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবেন—এটুকুই কেনও মনুষ্যকে দাঁড়ান দাঁড়িয়ে রাখতে পারে।

সন্ধ্যামাসি মাঝে মাঝে সজ্জিদানন্দের ইংরাজি বইয়ের সংগ্রহগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। দুঃখ করে বলতেন, ওই ভাষা যদি জানতাম।

প্রণবেশ একদিন বলেছিলেন, জানোই তো।

সন্ধ্যামাসি হেসেছিলেন। বড় বিয়র হাসি। বলেছিলেন, খুব। ওকে কি জানা বলে? ওটা অক্ষর চেনা। আমি অক্ষরটাই চিনি রে। শব্দের মানে করতে পারি না।

প্রণবেশ কথাটার মানে করতে পারতেন না। পরে বুঝেছিলেন, জীবনের অনেক উপলব্ধিই একটি নির্দিষ্ট বয়সের জন্য অপেক্ষা করে। প্রথম বর্ণপরিচয়ের পর, আ-কার ই-কার যখন শেখা হয়ে গেল তখন মনে হত, এই তো কেমন সব পড়তে পারছি। তারপর যুক্তাক্ষরের দেওয়াল ডিঙিয়ে হাতের কাছে যা পাওয়া যেত তাই পড়ে ফেলার আশ্চর্য আনন্দ আর নেশায় মন ভরে যেত। কত কিছুই তো বোঝা যেত না তখন। যেত না যে তা নিয়ে কোনও দুঃখ ছিল না কারণ সেই জ্ঞানটুকুও তখন হয়নি। তারপর যখন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শেখা হয়ে গেল, তখন মনে হল, এই তো, এর বইরে অস্ত্র কী হতে পারে। কিন্তু আস্তে আস্তে জ্যামিতির গোপন নকশায় প্রবেশ করতে হল। ত্রিকোণমিতির আশ্চর্য ছন্দ জানা গেল। আর জানু সমাধানের মতো বীজগণিত। প্রণবেশের মনে হল আলদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটা হাতে এসে গেছে। যে-কোনও সমস্যা কী আশ্চর্যভাবে সমাধান করে দেয় এই বীজগণিত। প্রথম যে-দিন অস্ত্র স্যার স্কুলে বীজগণিত শেখালেন—ধরো  $x$ । কেন ধরব? কেন  $y$  নয়?  $z$  নয়? হ্যাঁ, ধরতেই পারো।  $y, z, a, b, c$  যা খুশি। এমনকী  $k, \phi, \pi$ -ও ধরতে পারো। আসলে  $x$  মানে সমাধান।  $x$  মানে উত্তর।  $x$  মানে যে-কোনও সংখ্যা।  $x$  হল বীজ। ধরো বটগাছের দশটা বীজ তুমি রোপণ করে দিলে। কী হবে বলে? কী গাছ হবে? কেন? বটগাছই হবে। হ্যাঁ। তা হলে দেখ। এই  $x$  হল ওই বটফলের বীজের মতো।  $x$ -এ সংখ্যা পুরে যে-কোনও নিয়মেই তাকে ফেলে দাও না কেন, সে দিবা একটা মানানসই গাছ তৈরি করে ফেলবে। প্রণবেশ, সেইদিন  $x$  মানে বীজ, মানে এক আশ্চর্য প্রদীপ শিখে, রাস্তার ওই প্রান্ত থেকে চিৎকার করতে করতে এসেছিলেন, মা মা মা.....

—কী রে?

সন্ধ্যামাসি আর মা উদ্বিগ্ন মুখে বারান্দায় এসেছিলেন।

—কী হয়েছে রে? ওমনি ছুটছিস কেন? চেষ্টাচ্ছিস কেন?

প্রণবেশ উত্তেজনার হাঁফাচ্ছেন। আনলে হাঁফাচ্ছেন।

—মা, হাবুল স্যার আজ আমাদের হ্যালজাবরা শিখিয়েছে মা। আমি আজ হ্যালজাবরা শিখেছি।

সন্ধ্যামাসি অবাক হয়েছিলেন। বলেছিলেন, জাবরা টাবরা কি বলিস পুন? তাদের কি জঙ্গল-জাবরাও পড়ায়?

—হ্যালজাবরা মা।  $x$  দিয়ে অস্ত্র।

খুব হতাশ হয়েছিলেন সন্ধ্যামাসি। অন্ধ শিখে কেউ এরকম লাফায়। কিন্তু সচ্চিদানন্দ, সেই প্রথম, গাঙ্গীরের মুখোশ ফেলে হেসে প্রণবশব্দকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। প্রণবশব্দ হটফট করছিলেন নামার জন্য। সচ্চিদানন্দ কেন যে সে-দিন সে-সময় বাড়িতে ছিলেন আজ আর তা মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, তিনি শুধবে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, হ্যালোবাবা নয় পুন, আলোজ্ঞতা, বীজগণিত।

তখনও মনে হয়েছিল, এই তো, এরপর আর কী থাকতে পারে? কিছু নেই। কিন্তু ভুল ভেঙেছিল যখন ক্যালকুলাস শিখেছিলেন। মনে হয়েছিল, গণিত এক সুন্দর হয়। এমন ছনোমায় হয়। বুকেছিলেন, শেষ নেই। কোনও শেষ নেই এর। নতুন উপলব্ধি হয়েছিল। মনে পড়েছিল সন্ধ্যামাসির কথা। বর্ণ জানি। শব্দ জানি না তো। সারাজীবনকেই এমনই মনে হয় প্রণবশব্দের। বর্ণ জানা। শব্দ জানা নেই। প্রতিবারই নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সমর মনে হয় এটাই শেষ, এটাই জীবনের চরম প্রাপ্তি। কিন্তু তারপর আবার কিছু ঘটে। আবার কিছু আসে। নতুন উপলব্ধি। নতুন কোনও বোধ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা বদলায়। গানের মতো। ছবির মতো। কবিতার মতো। “আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা, ...” প্রণবশব্দের মনে পড়ে—ছোটবেলায় এই গানটি শুনলেই তাঁর কল্পনায় অসংখ্য প্রজাপতি উড়ত। তাদের সূর্যমুখীর পাপড়ির মতো হলুদ-হলুদ ডানা। আজ আর ওই গানের সঙ্গে ওইসব প্রজাপতির অনুশঙ্গ নেই। আজ অন্য এক আলোর জন্য হৃদয় বানখান। বর্ণ জানি। শব্দ জানি না। শব্দ জানি, কিন্তু কই, শব্দ-বর্ণ-গন্ধের ব্যঞ্জনাতে হুঁতে পারলাম কোথায়। সময় আসে। থামে। বিচিত্র চিন্তন দিয়ে ভেসে যায়। জীবনের বিচিত্র গামিতিক অধ্যায় পরতে পরতে খুলে বেতে থাকে। সন্ধ্যামাসি কত দূর বুকে বলেছিলেন কথাগুলো? কে জানে? অনেক পড়তেন ত্রে, অনেক জানতেন, বুঝতেন। সেই পড়া নিয়ে বলতেও ছাড়েননি জুই। একদিন বললেন, কোনও কাজের নাম নেই। শুধু বই পড়া। কারও আশ্রয়ে আছেন, একটু কৃতজ্ঞতাও তো থাকে মানুষের।

কোঁরা সন্ধ্যামাসি। ক্রমশ পুরনো মুন্ডির মতো মিহিয়ে যেতে থাকলেন সংসারে। জুইকে খুশি রাখতে গিয়ে সর্বস্ব হারালেন। আসলে জুইকে খুশি করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। যে খুশি হতে চায় না, তাকে নিয়ে কী করা যাবে?

সচ্চিদানন্দের ভাত খাওয়ার সময় সন্ধ্যা বসে থাকেন। বিজলি পাখা আছে। তবু হাতে তাল পাতার পাখা নিয়ে মাছি তাড়ান। জুইয়ের আপত্তি—ওনার বসার কী আছে? আমিই তো থাকি। প্রণবশব্দ বলেছিলেন, ওটা মাসির অভ্যাস।

—অভ্যাস? বরাবর কি উনিই এটা করতেন, মা করেননি?

জুইয়ের স্বরে অন্ধকার ছিল। প্রণবশব্দ স্পষ্ট তা টের পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, মা যতদিন পেরেছে করেছে। মাসিও করত। মা নেই, তাও তো কতদিন হল।

—যত সব।

জুই গজ গজ করেছিলেন। তেতো গলায় বলেছিলেন, তা মাযের জায়গাটিই উনি নেবার চেষ্টা করেছিলেন নাকি? আবার ঢং করে ভাল ভাল বই পড়া হয়।

—জুই!

প্রণবশব্দ অধৈর্য হয়েছিলেন। তুমি কী বলছ?

—কেন? বলব না কেন? বুকতাম যদি নিজের মাসি হতেন। তাও তো নন।

—উনি নিজের মাসির চেয়ে কম কিছু নন জুই। ওঁকে এভাবে বোলো না।

—কেন বলব না? তোমাদের বাড়ির সবই অদ্ভুত।

—কী অদ্ভুত?

—উনি কেন তোমার বাবার জামাকাপড় অচেন?

—কাচতেই পারেন। তাতে কী?

—কেন? ফুলি আসে, সবার জামা কাচে, ওকে দেওয়া যায় না?

—বাবা সাদা জামাকাপড় পড়েন। ফুলির কাচা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে না। তাই—

—তাই—

জুই উত্তেজিত হয়েছিলেন। হাত নেড়ে বলেছিলেন, তাই আভারওয়ারটও কেচে দিতে হয়, না?

প্রণবেশ চোখ বন্ধ করেছিলেন। দু'কানে গরম গলিত স্নোহা ঢেঁলে দিচ্ছিল কেউ। এ কোন অশুচি বিষ! জুই এসব কী ভাবছেন? আভারওয়ার? সেভাবে কখনও আলোচনা করে দেখা হয়নি পোশাকটাকে। গেঞ্জি পাজামা ধুতির সঙ্গে ওটাও তলে গেছে জিরকাল। প্রণবেশ নীরব। শুভ। কিন্তু জুইয়ের মধ্যে ফেনিয়ে উঠছিল বিষ। তিনি বলে চলেছিলেন, জীবনে কিনি পত্রপুস্তকের ডেভরের জামা কেউ এভাবে কাচে। যত সব সেক্স-স্টার্টড পারভার্টেড উওম্যান।

প্রণবেশের মনে পড়েছিল, জুইয়ের একটি বিষয় ছিল সাইকোলজি। মনস্তত্ত্ব। জুই তো তাঁর জ্ঞান ফলাবেনই। জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা। এই পৃথিবীকে যে যেমন দেখে।

কিন্তু সে-সিন, জুইয়ের বিষ, দরজা গলে দেওয়ালের কুটো দিয়ে সন্ধ্যার কানে পৌঁছেছিল। আজ প্রণবেশের মনে হয়, জুই ইচ্ছে করেই, জেনেগুনেই— যে সন্ধ্যা ওখানে আছেন, কথাগুলো বলেছিলেন। পরদিন সন্ধ্যামাসি—সহজ, সুন্দর, ব্যক্তিগতপূর্ণ সন্ধ্যামাসি—রাত্রের খাবার টেবিলে সচ্চিদানন্দের সামনে, নীলাগ্রির সামনে, প্রণবেশ ও জুইয়ের সামনে বলেছিলেন, নীলু। সবাইকে বলি তবে?

—বলো মাসি।

নীলাগ্রি ভাত মাখছিল। তার মুখ নিচু। সচ্চিদানন্দ তাকিয়েছিলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু বোকা যাচ্ছিল, এমন কোনও বিষয়, যা নীলাগ্রি আর সন্ধ্যামাসির মধ্যে আলোচিত হয়েছে, যা এখন প্রত্যেককে অবহিত করা হবে।

সন্ধ্যামাসি ধীরে ধীরে বলেছিলেন, সেক্স-স্টার্টড পারভার্টেড উওম্যান—

সচ্চিদানন্দের হাত ধোমে গিয়েছিল। প্রণবেশ ও জুই একই সঙ্গে চমকে উঠেছিলেন। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে বলেছিলেন, কথাটার মানে আমি নীলুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। নীলু বলেছে।

জুইয়ের জিভ শুকিয়ে গিয়েছিল। কোনওমতে বলেছিলেন, তার মানে...তার মানে...আপনি কাল...লুকিয়ে...সন্ধ্যামাসি খামিয়ে দিয়েছিলেন জুইকে। বলেছিলেন, লুকিয়ে নয়। বাধ্য হয়ে। বাধ্য হয়ে আমি কাল সব শুনেছি। বিশ্বাস না হয় নীলুকে জিজ্ঞেস করে দেখো। ও তো আমার কাছেই ঘুমোয়। আমরা চেষ্টা করবও না শুনে থাকতে পারিনি। আর তো কোনও ঘর ছিল না যে পালিয়ে বাঁচব। একমাত্র বড়বাবুর ঘর ছাড়া।

সকলের খাওয়া থেমে গিয়েছিল। সচ্চিদানন্দ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, কে? কে বলেছে এ কথা?

প্রণবেশ মাথা নিচু করে আছেন। জুই হির। সন্ধ্যামাসির চোখ থেকে জল পড়ছে। কিন্তু স্বর নিস্তরঙ্গ। তাঁর কোনও আবেগ নেই। শুধু অতল অপার কণ্ঠে তিনি ডুবে যাচ্ছিলেন। বলেছিলেন, পুনর বউ এ কথা বলেছে বড়বাবু। আমার সম্পর্কে বলেছে। আমি তো ইংরাজি জানি না, তাই নীলুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

সচ্চিদানন্দ কাঁপছেন। —আর কী? আর কী বলেছে পুনর বউ?

—বলেছে, আমি জোর করে ইলার জায়গা দখল করেছি। ওর শাশুড়ির জায়গা। বলেছে আমি আপনার জামাকাপড় কাচি কেন—। শোনো বউমা। তুমি অনেক লেখাপড়া করেছে। অনেক জানো। আমি তোমার মতো জানি না। কিন্তু আমি যা জানি তাও তোমাকে জানতে হবে। বড়বাবু আমার কাছে সেবতার মতো। তাঁকে আমি কখনও মানুষ জ্ঞান করিনি। তোমার শাশুড়িকে আমি সহোদরার মতো ভালবাসতাম। নীলু আর পুনু আমার পুত্রাধিক। আমার তো

কেউ নেই। যারা আপন ছিল তারা পরের মতো ব্যবহার করত বলে ইলা আমাকে তার সংসারে নিয়ে এসেছিল। এই পরিবারকে আমি আজও নিজের বলে জানি। আমি বুঝেছি তুমি আমাকে পছন্দ করো না। তা বেশ। পুন সুখে থাক। তোমরা সুখে থাকো। আমি এ সংসারে আর থাকব না।

সচ্চিদানন্দ যাওয়া ফেলে উঠে পড়েছিলেন। একে একে সন্ধ্যা প্রণবেশ আর নীলান্দিও। শুধু ঐটো হাতে একা একা বহুক্ষণ বসেছিলেন জুই। কেঁদেছিলেন। প্রণবেশ একটি কথাও বলেননি। সেটাও ছিল জুইয়ের রাগ। বলেছিলেন, তুমি একটি কথাও বললে না।

—কী বলব? প্রণবেশ প্রশ্ন করেছিলেন।

—উনি চুপি চুপি সব শুনলেন। এত কথা বললেন। তুমি কিছু বললে না।

প্রণবেশ বলেছিলেন, আমি তো অমানুষ নই। অকৃতজ্ঞ না। বরং তোমাকে বলছি, জুই, যাও, মাসির কাছে ক্ষমা চাও।

না। জুই ক্ষমা চাননি। সকাল থেকে মাসিকেও আর পাওয়া যায়নি। কিছুই না নিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন। তাঁর বিছানায় শরৎচন্দ্র ছিল। বিভূতিভূষণ ছিল। তাঁর আলনায় শাড়িগুলি তেমনই ভাঁজ করা ছিল। তাঁর চিকনিতে তেলের গন্ধমাখা দু'একখানি চুল তখনও লেগে আছে। খরময় তাঁর উপস্থিতির টটকা চিহ্ন, যেন ডাকলেই সাজা দেবেন। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে বলবেন, কী বলছিস, পুনু?

প্রণবেশ খুঁজতে চেয়েছিলেন। সচ্চিদানন্দ দেননি। বলেছিলেন, সে তো হারিয়ে যায়নি। হারিয়ে পড়েছে। তাকে আর খোঁজা কেন?

তিনি জুইকে ডেকেও কিছু বলেননি। জুই তখন বাগ্নাকে নিজের মতো বহন করছেন। একদিন নিজেই তিনি বাপের বাড়ি যেতে চাইলেন। কেউই বাধা দেয়নি। প্রণবেশও না। সন্ধ্যামাসিকে আড়িয়ে জুই যেন একেবারে অনাকাক্তিক হয়ে পড়েছিলেন সংসারে। প্রণবেশের সঙ্গেও তাঁর স্বাভাবিক সম্পর্ক আলগা হয়ে গিয়েছিল। তিনি চলে গেলেন। এরপর ছিল প্রণবেশের পালা। বাবার কী হবে? নীলান্দির? প্রণবেশকে চলে যেতে হবে ফারাক্কায়ে। আশ্চর্য জটিল পরিস্থিতি। প্রণবেশের মনে হয়েছিল, ইলা ছিলেন সংসারের বন্ধন। তাঁর চলে যাওয়ায় সবই একটু আলগা আলগা হয়ে পড়েছিল বটে কিন্তু মূলত গড়নটি ছিল নিটুট। সন্ধ্যা চলে যেতে সব ভেঙে পড়ল। তিনি ছিলেন খুঁটির মতো। তাঁর অনুপস্থিতিতে সবই ধসে পড়ল। প্রণবেশ বাবা আর ভাইকে ফেলে যেতে রাজি ছিলেন না। তখন সচ্চিদানন্দই পরিস্থিতি সামলেছিলেন। সেচ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন তাঁর বন্ধু। তাঁকে বলে, জুইয়ের শরীর খারাপের কারণ দেখিয়ে তিন বছরের জন্য কলকাতায় বদলি করিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রণবেশকে। তিন বছর। প্রণবেশের জীবনের ষড়যন্ত্রময় তিন বছর। সব ষোয়ানোর তিন বছর। ওই তিন বছরে প্রণবেশ সন্ধ্যামাসিকে হারালেন। সচ্চিদানন্দকে হারালেন। নীলান্দির হারালেন। আশ্চর্য। এরকমও কি হয়? তখন ঘরে খুঁটাটি শব্দ পেলেন প্রণবেশ। চোখ খুললেন। দেখলেন বাগ্না ওর টিনের গাড়ির কলকজা খুলে ফেলেছে। আর আসের মতো হুড়তে পারছে না। মগ্ন হয়ে জোড়া দেবার চেষ্টা করছে। প্রণবেশের, ছেলেকে দেখে, অর্ধেক ক্লান্তি চলে গেল। মনে হল, ওই তিন বছরে শুধুই হারাননি। পেয়েওছেন।

মগ্ন থাকলেও, অনামনস্ত থাকলেও, কেউ তাকিয়ে আছে বুঝতে পারা যায়। প্রণবেশ বাগ্নাকে দেখছিলেন। বাগ্নাও মুখ তুলে বাবাকে দেখে নিল একবার। শান্ত নরম চোখ। একটু যেন বেশি গভীর। যেন খুম জড়ানো। হাফ প্যান্টের নীচে বেরিয়ে আছে মসৃণ দুটি পা। খোলা গায়ে নরম নরম আদুরে আন্তরণ। ঠোঁটের ওপর বিকৃত সেলাই। তার জন্য ঠোঁট একটু বাঁকা লাগে। একটু চাপা লাগে। ক্রেস্ট প্যান্টেট অ্যান্ড হেয়ার লিপস মোরামত করা বাগ্না। আপনমনে নিজের গাড়ি মোরামত করছে এখন। প্রণবেশ ডাকলেন, বাগ্না—শোন।

বাগ্না উঠে কাছে এস। তার হাতে যন্ত্রাংশ দেখছে।

প্রণবেশ বললেন, কী ভাবছিস।

বাগ্না হাত মেলে দেয়।—এটা লাগিয়ে দেবে?

প্রণবেশ হাসেন। বলেন, ওটা আর লাগানো যাবে না। আর একটা এনে দেব বিকেলবেলায়।

—বাহ রে! কেনন করে আনবে?

—কেন রে?

—তোমাকে বুদ্ধি ডাক্তারকাকু শুয়ে থাকতে বলেনি?

আলজিত ছিল না বাগ্নার। পরে অপারেশন করে সেই আলজিত তৈরি হয়। বাগ্না এখন কী চমৎকার কথা বলে!

প্রণবেশ বলেন, আচ্ছা, আমি নয়, মা এনে দেবে।

—মা দেবে না।

—কেন?

বাগ্না চুপ করে থাকে। প্রণবেশ এক হাতে ছেলেকে স্পর্শ করেন। ছেলেও বাবার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। বেলা বাড়ছে। শুতে থাকতে খুব ভাল লাগছে তা নয়। তবু, আলস্যও আর কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। প্রণবেশ বলেন, বড় হয়ে তুই কী হবি, বাগ্না?

—কি জানি।

—কী ইচ্ছে করে?

—ওই, অনেক দূরটা দেখতে ইচ্ছে করে।

—অনেক দূরটা মানে কি?

—ওই যে ধানক্ষেত। তারপর অনেক দূরে দূরে গাছ। বাড়ি। তারপর কোথায় শেষ হয়ে গেল। ধানক্ষেত কোথায় শেষ হয় বাবা?

—বেখানে রাস্তা থাকে।

—সব ধানক্ষেতের পরই রাস্তা?

—হ্যাঁ, বাগ্না, তুই ট্রেন থেকে নেমে গেলি কেন রে? তোকে কেউ ডেকেছিল?

—না তো।

—নেমে গেলি কেন?

—এমনি। মনে হল।

—তোর ভয় করল না? অঙ্ককারে। একা একা?

—করল তো, যখন ট্রেনটা চলে গেল।

—তুই যদি হারিয়ে যেতিস বাগ্না? তোকে যদি আর খুঁজে না পেতাম?

—আমাকে ফারাক্সা নিয়ে যাবে, বাবা?

—এই যে ফারাক্সা থেকে ঘুরে এলে।

—আমি ফারাক্সায় থাকব বাবা। কত বড় নদী আছে ওখানে। আর কত দূর আছে।

প্রণবেশ চুপ করে ভাবেন। ও দূরের কথা বলে কেন? দূর ওকে টানে কেন? ও তো শিশু। এই ইন্টার শহরে ওর জন্ম। ও কী করে নদীর জন্য কাঁদে? তিনি বলেন, ওখানে ভাল স্কুল নেই বাগ্না। তুই কোথায় পড়বি?

বাগ্না চুপ করে থাকে। তারপর কী মনে করে একটি পা বাবার গায়ে তুলে দেয়। এক হাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলে, মাকে বলে দেবে না তো? বাবা?

প্রণবেশ সম্মুখ হন। কী বলবে বাগ্না? যা ওর মাকেও বলা যাবে না? তিনি ছেলেকে জড়িয়ে নিয়ে বলেন—বলব না।

বাগ্না বলে, মা আমাকে ভালবাসে না।

—ছি ছি। এ কথা বলতে নেই। মা তোমাকে খুব ভালবাসে।

—তা হলে মা আমাকে খেলতে দেয় না কেন? ক্রাবের মাঠে বুকুন যায়। পিটু যায়। আরও কত সব আসে। মা আমাকে যেতে দেয় না কেন? আমাকে একটা চুড়ি-লাটাইও দেয় না। ছাতে যেতেও দেয় না। বুকুনের মা বুকুনকে অ্যাস্তো বড় একটা লাটাই আর মহাচুড়ি-লঠনচুড়ি কিনে দিয়েছে।

বাগ্নার চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

প্রণবেশ ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ভাবেন, জুই এরকম করে কেন? খুইটুকু ছেলে, কত খেপতে দেয় না কেন? বাগ্নার পড়াশুনা নিয়ে খুব চিন্তা খুইয়ের। এখনই কী? আর বাগ্না খুব চঞ্চলও নয়। রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ছে সে। জুই কি একটা বাড়িখাটি করেছে না?

পরে কথাটা তুলেছিলেন প্রণবেশ। জুই বলেছিলেন, তুমি তো ফারাক্কায় বসে থাকো। ছেলের বক্তি এখানে একা আমাকে পোয়াতে হয়। এমন থেকে নজর না দিলে ছেলে বয়ে যাবে। তোমার ভাইকে তো দেখলে।

প্রণবেশ চুপ করে যান। তাঁর কথা বাড়তে ইচ্ছে করে না। মনে মনে ভাবেন—নীলাম্রি কি বয়ে গিয়েছিল? তুমি কী এটা ঠিক বললে জুই? সমাজটাকে নতুন করে, সুন্দর করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখাটা কি ভুল? বয়ে যাওয়া? এতগুলো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে—সবাই তা হলে বয়ে গিয়েছিল? নীলাম্রির জন্য প্রণবেশের কষ্ট হয়। তখন, জুই বলেন, বাগ্নাকে নিয়ে বিকেলে একবার ভবানীপুর যাব আমি।

—কেন?

—ওখানে মল্লিকার চেনা এক জ্যোতিষী আছেন। তাঁকে দিয়ে বাগ্নার ছকটা করিয়ে নেব। তুমি যেতে পারবে তো?

প্রণবেশ বললেন, ছক! জ্যোতিষী! এ সব তুমি কী করছ জুই! বাবা এ সবার ভীষণ বিরোধী ছিলেন জানো।

—ছিলেন কারণ বাবার জীবনে কোনও সমস্যা ছিল না।

—ছিল না। তুমি বাবার ষ্ট্রাগলটা জানো?

—আমার জন্মের দরকার নেই। তুমি যাবে কি না বলে। আর যেতে তোমাকে হবেই। কারণ, মল্লিকা বলে দিয়েছে, উনি বাবা-মায়ের হাতও দেখতে চাইবেন।

প্রণবেশ কথা বাড়ান না। বিরোধিতাও করেন না। নিজের মনে ভাবেন, কোনও কি মানে আছে এ সবার? সত্যি? মানুষ যদি জন্মের সঙ্গেই তার ভাগ্য নিয়ে আসে, যদি তা প্রাকনির্ধারিত বিষয় হয় তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের কী প্রয়োজন? ভবিষ্যতে অনিবার্যভাবে কী ঘটে যাবে তা আগে থেকে জানে উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ কি? যদি তা পাল্টানোই না যায়!

কথাগুলি জ্যোতিষকে না বলে পারেন না প্রণবেশ। জ্যোতিষ, ক্ষিতীন্দ্রমোহন, বক্ষু মানুষ, গলার ক্রমাক্ষের মালা, কপালে চন্দন, পান খেতে খেতে বলেন, না। ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ জন্মায় না। মানুষ জন্মায় ভাগ্যচক্র নিয়ে। অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব নিয়ে। সেই প্রভাব এবং পুরুষকার অর্থাৎ ক্রমগত গ্রহনক্ষত্র এবং ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

—আপনি বিশ্বাস করেন?

ক্ষিতীন্দ্রমোহন হাসেন। বাগ্নার হাত দু'টি নিরীক্ষ করতে করতে বলেন, আমি বিশ বছর ধরে এ সবার চর্চা করি। বিশ্বাস না করলে করব কেন? আর তুমি ভেবো না এটা আমার প্রফেশন। প্রফেশনালি আই ওয়াজ এ টিচার। ভূগোল বিষয়ে আমি পড়াতাম। অস্ত্রও আমার আকর্ষণ আছে। আর অ্যাস্ট্রোলজি অ্যান্ড পামিষ্টিও আমার নেশা। এই মহাকাশ এক অশ্চর্য শক্তির সূত্র গাথা। তার সব রহস্যের কিনারা হয়নি। অ্যাস্ট্রোলজি সেই রহস্যের একটা অংশমাত্র।

প্রণবেশ বলেন, কিন্তু সকলের সব কথা ফলে না। আপনি যে এত লোকের হাত দেখেছেন,



তাদের সব বিধান কি যথাযথ হয়েছে ?

ক্ষিতীন্দ্রমোহন হাসেন। বলেন, আমি তর্ক করব না। তোমার স্বাস্থ্য ভাল না লাগে তুমি হাত দেখিও না। তোমরা তো বিজ্ঞান-পড়া ইঞ্জিনিয়ার। তোমাদের রানানো জিজ্ঞাস্য কি কখনও ভেঙে পড়েনি ?

জুই প্রণবশকে খামাতে চান। প্রণবশ চূপ করে যান। ছোট্ট বাচ্চা দু'হাত মেলে ধীরে ধীরে থাকে তার ভবিষ্যৎ গণনার প্রার্থীক্ষায়। ক্ষিতীন্দ্রমোহন ডাক করেন। নন্দা একমুখো-বিষেক্ষো পাতা ভরে যায়। শেষে একসময় বলতে শুরু করেন, মধ্য নক্ষত্রে জন্ম। সিংহ রাশি। রাশ্মিসংগে। অধিযোগ। গ্রহাধিপতি রবি নীচস্থ। তাকে দু'টি দিচ্ছে কে ? রাহু। আর মনস্বিরকারক গ্রহ কে ? চন্দ্র। সে বসে আছে কোথায় ? না শনির ঘরে। তাকে দু'টি দিচ্ছে মঙ্গল।

তিনি গণনা করে যান। জুই পাশে মুখে শোমন। প্রণবশ নিবিকার। তার মনে হয়, এও কি ভাগ্যে লেখা থাকে ? এই জ্যোতিষের কাছে আসা ?

### সতেরো

চাল থো কবেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। শেফালির মার কাছে আর চাইতে পারে না রামিকা। একজনের কাছ থেকে আর কত সাহায্য নেওয়া যায়। রামিকা আরও চার দিন চার ঘর থেকে চাল ধার করেছে। এখানে সবারই দিনটানা সংসার। কে আর বাড়তি কারওকে দেবার স্বপ্নটি রাখে। তবু রামিকা পোয়াতি বলে, তার স্বামী আসছে না বলে, ঘরে তার ছোট ছেলেটি—সে বানিকটা সহানুভূতি পায়। হয়তো—বা কেনও গিন্নি নিজের বরাদ্দ থেকেই দু'মুঠো চাল দিয়েছিল তাকে। সে বড়ই বিনয়ের সঙ্গে বলেছে, তেনি ফিরা আইলে দিয়া যামু দিদি।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন। কার্তিক আসছে না। কেনই—বা আসছে না সে। না হয় মারতই তাকে কার্তিক। না হয় এমন ভরা মাসেও যতখানি সম্ভব শরীর দিত সে কার্তিককে। কিন্তু এই তীব্র খিদে আর সহ্য হয় না। নাড়ি পাক দেয়। মুখে নোনা জল উঠে আসে। সম্ভানের পেট ভরাতে পারে না। কম-কম রান্না করে। একজনের খাবার দু'জনে খায়। একবেলার খাবারে চালিয়ে নেয় দু'বেলা। বানিকটা ভাত শেফালির মা রোজই দিয়ে যায় তাকে। তাতেও কুলোয় না। মানুষের এতটুকু পেটের খলি। কিন্তু তাতে সময়ের সমান খিদে। কত যে খিদে তার তল মেলা ভার।

শেফালির মা স্থলে চলে গেলে রামিকা চুপি চুপি পিছনের পুকুরে চলে যায়। একটি সজনে গাছ, জালের ওপর বাঁকা হয়ে কুঁকে পড়েছে, তার থেকে পাতা তুলে আনে। উঁটী পেড়ে নেয়। উঁটার খোঁজে অনেকেই তরু-তরু থাকে। তাই একটি-দুটি মহাভাগ্যে মিলে যায় কখনও। নইলে শুধুই পাতা।

তেল ফুরিয়ে এসেছে। কাচের বোতলে তলানি। সবই ফুরিয়ে আসে কোনও না কোনও দিন। নিয়মমতো জুগিয়ে না গেলে রাজভাগ্যও খালি হয়ে যায়।

ওই তলানি থেকে একটুখানি তেল নিয়ে কড়াইতে মাখিয়ে নেয় রামিকা। সজনে পাতা ভাজে। ভাত গ্রাঘ পুরোটাই পলাশের জন্য রেখে নিজে সামান্য ভাতে অনেকটা সজনে পাতা ভাজা মেখে খায়। গলা দিয়ে নামতে চান না। কিন্তু বিদের ছালা বড় ছালা। এক এক সময় রাধিকার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দেয়। কিংবা ওই পুকুরে ডুবে মরে। মরেই যেত হয়তো পলাশ না থাকলে। অথবা কখনও মৃত্যুর অদম্য ইচ্ছের মুহুর্তে উঠানে তুন তুন সাইকেল বেজে ওঠে।

ওমনি আর মরতে ইচ্ছে করে না। মরার ইচ্ছে পালিয়ে গিয়ে আশ্চর্য আকাশের তার অন্তর্য  
 ক্রিষ্ট শরীর সজাগ হয়ে ওঠে। দরজা ফাঁক করে দেখে সে। বাইরের ভূমি পুরমেশ। নিজের  
 ঘরে যাচ্ছে। নিচু উঠোন থেকে উচু নাওয়ায় সাইকেল তুলতে সে মনোযোগী হয়েছে।  
 পরমেশ—কী সুন্দর। কী আশ্চর্য দীপ্তি ওর। রাধিকা মুগ্ধ হয়ে যায়। আর কিছু নয়। একটু কথা  
 যদি বলত রাধিকার সঙ্গে। যদি তার দুঃখে একটু দুঃখ পেত। আশপোতা আশভাজা সজনে পাতা  
 চিবিয়ে রাধিকা শুয়ে শুয়ে একটি আশ্চর্য আকাশ প্রার্থনা করে যেখানে-কালো গাছের নেশ উড়ে  
 এসে এলোমেলো করে দিচ্ছে কদমের পাতা। যমুনার জল মুহুর্তে কালো হয়ে গেল সোমের  
 ছায়ায়। সেই কালো জলের মতো বা মেঘেরই মতো শ্রীকৃষ্ণ আকাশ-বাতাস মত্তিছে বাঁশি  
 বাজাল বনে। অহা! বাঁশি শুনে রাধা বইতে পারে না ঘরে। ছুটে যায়। কেনও দিকে যেয়াল  
 নেই গো তার। আঁচল লুটিয়ে পড়ছে। পায়ে কাদা লাগছে। ওই কুন্ডি দু'টি কটাও ছুটে গেল  
 সুকোমল শ্রীচরণে। রাধা কিছু দেখছে না, কিছু বুঝছে না, শুধু ছুটে যাচ্ছে। একবার তাকে দেখার  
 জন্য। একবার তার অসামান্য বৃকে কাঁপে দেবার জন্য।

রাধিকা পরমেশে কৃষ্ণ দেখে। নাকি পরমেশে শমসের দেখে। নিজে সে শ্রীরাধিকা স্বয়ং।  
 তখন কার্তিক বৃষ্টি-বা আয়ান ঘোবের জাডগা নেহ। এক অলক হাওয়া এসে কাঁপিয়ে পড়ল  
 ঘরে। ধুলোর গন্ধে ঘর ভরে গেল। বাইরে উঁকি দিচ্ছে রাধিকা। ও মা গো! কালো মেঘে ছেয়ে  
 গিয়েছে আকাশ। কখন এত মেঘ করল। বৃষ্টি কালবৈশাখী আসছে। রাধিকা অসহায়ভাবে  
 তাকায়। এখন পলাশের ঘরে ফেরার সময়। সে কি ঝড়ের মধ্যে পড়ল? সে কি ভিজে যাবে?  
 দিশেহারা হয়ে নৌডবে রাস্তা দিয়ে? গাড়িগুলি উন্মাদ পার হবে পথ আর লক্ষণ করবে না  
 পলাশ ছেলোটি কেনন অন্ধ ও বাবুল হল ঝড়ে। রাধিকার মাতৃবৃকে নানা ভয় টালমাটাল। কাল  
 পলাশ বলছিল—মা, বাবা আসে না কেন?

রাধিকা কী বলবে। কেন আসে না। তার মন নানা শঙ্কায় আচ্ছন্ন। কোনও বিপদে পড়েনি তো  
 মনুষ্যটা। কেনও অসুখ-বিসুখ করেনি ভো? তেমন হলে নিশ্চয়ই খবর দিত কেনওভাবে?

তখন বড় বড় ফঁটায় বৃষ্টি নামে। দু'-একটি রাধিকার কপালে এসে পড়ে। চড়বড় করে শব্দ  
 হয়। পলাশ ভিজতে ভিজতে, হাসতে হাসতে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে মাকে। রাধিকা একটু  
 পিছিয়ে যায়। বলে, থাকাইস না। থাকাইস না।

পলাশ অভিমানী হয়। ঠোট ফুলিয়ে বলে, থাকাইলাম কই।

তার হাসি মিলিয়ে গেছে। চোখ ভ্রান। রাধিকা ছেলের মুখ চুম্বন করে। বলে, হ। তর ভাই  
 আইতাসে না?

পলাশ এবার হাসে। তার মুখের মেঘ কেটে যায়। বলে, না। বুইন আইব মা। আমার বুইন  
 ভাঙ্গাগে। মা, কাইল আমাগো ইসকুল ছুটি দিসে।

রাধিকা আঁচল দিয়ে পলাশের মাথা মুছে দিতে দিতে বলে, কান?

পলাশ বলে, মুসলাগো যান কী আসে?

—আরে। এমুন কৈতে হয় না। হয়লরে মান দিয়া কথা কইতে শিখো।

—ক্যান। আমি কী কইলাম মা?

—মুসলা কয় না, কয় মুসলমান।

—আমাগো ইসকুলে হয়লেই মুসলা কয় মা। গো-খেকো, নেভে, আগা-কাটা হেই-ও কয়।

—কউক। তুমি কইবা না। খারাপগুলা নিবা ক্যান! কড়িরে অপমান করতে নাই। তাইলে  
 তাগো অপমান আমাগো গায়ে ফিরা আইব।

—হ মা। কমু না।

—অখন মুসলমানগো কী?

—মহরম আসে কয়।

—অ, হইব। যা জামা খুল। ঠাণ্ডা লাগব।

পলাশ জামা খোলে। সদা মোহা চুলগুলি খাড়া খাড়া হয়ে আছে। রাধিকা ছেলের দিকে স্নেহে তাকায়। কী সুন্দর তার ছেলে। কী গভীর আর মিষ্টি। একটু বড় করাব সামর্থ নেই। কেন নেই? ভাবে রাধিকা। এবং আবারও আনমনা হতে থাকে। কাল মরেন। হয়তো-না। রাধিকা জানে না। কিছুই জানে না এখন। কোনও কিছুই বোঝ রাখে না। আগে তাদের গায়ে মহরমের দিন শমসেরদার কত কী করত! সাতদিন আগে থেকে তরোয়াল বেলা, লাঠিখেলার মহড়া। কী সুন্দর তাজিয়া বানাত ওরা! অত সুন্দর জরি আর রাংতার আলার কোথায় যে পত। আর মহরমের দিন কী তাদের আশ্বাসন! হায় হাসান-হায় হোসেন! করতে-করতে বুকে চাপকু মারা। পরস্পরের সঙ্গে লাঠিতে-তরোয়ালে লড়াই। দেখে মনে হত যেন সাজা সাজা লড়াই। অর্থাৎ কেউ কারওকে এতটুকু আঘাত করত না। গায়ের পথে পথে ঘোরা হয়ে গেলে নিকেলাবেলা ইটিকুটুমের মাঠে নশগায়ের তাজিয়া জড়ো হত। ওখানেও আর এক প্রস্থ যুদ্ধ যুদ্ধ রব। শেষে সজ্জাবেলায় সবাই ঘরে ফিরত। তাদের গায়ের তাজিয়া শমসেরদাদের উঠোনে রেখে দিয়ে যেত করেকজন।

সেই সময় সেই তাজিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল ও লাঠি নিয়ে লড়াই করতে করতে যাবার সময় শমসেরকে যেন চেনা যেত না। শমসেরও যেন চিনতে পারত না রাধিকাকে। অথচ অন্য সময় শমসের কড়া নজর রাখত রাধিকার বাড়ির দিকে। কখন রাধিকা একটু একা হয়! কখন একটু বেরিয়ে আসে। সে-বার খুব রাগ করেছিল রাধিকা—কান! আমাদের ডাকো কান? শমসেরের স্বর কাতর। আকুল। বসেছিল—আর কারে ডাকুম ক’!

—কান! হেইদিন যেমন চিনতে পারল না।

—কুনদিন তরে চিনি নাই। রাধু। আল্লার কিরা। তরে চিনুম না হেই আবার হয় নাকি।

—সইতা কও?

—সইতা। সইতা।

রাধিকা মাথা দোলায়। ঠোট টিপে হাসে। এই কাতর প্রার্থনা, এই ব্যাকুলতা ভাল লাগে তার। কেন যে লাগে সে বোঝে না। একবারে সম্প্রতি, খুব গোপনে এই ভাল লাগার শুরু। কাকিকে লুকিয়ে শমসেরের সঙ্গে এই কথা বলা—এর চেয়ে বেশি সুখ আর কিছুতে নেই। সামান্য দুটি-একটি কথা হয় কিন্তু সারাদিন মনের মধ্যে তার রেশ গুন গুন করে। শমসেরকে দেখলেই মনে মনে গলে যায় রাধিকা। ভাল লাগায় ভেসে যায়। শমসেরের দাতি ঘনিষে ওঠা গালে কৃষ্ণমেঘের সন্ধান পায় সে। বর্ষা তার প্রিয়। এত কষ্ট বর্ষায়—তবু বর্ষা প্রিয়। কৃষ্ণমেঘ প্রিয়। আর মেঘের মতো শমসের। তার পাগল পাগল লাগে। তবু, সব গোপন রেখে, নিভৃত রেখে সে বলে, হেইদিন তাজিয়ার লগে লগে ঘাইতেয়াসিলা। আমি কাকির লগে খাড়াইয়াসিলাম। ক—ত দ্যাখলাম তোমারে। ক—ত চাইয়া রইলাম। তুমি নি আকবারও দ্যাখলা।

শমসের বিস্ময় হাসে। বলে, হেইদিন চাইতে নাই। ওই সময় চাইতে নাই। গুন রাধু, যেই কাম যখন করন লাগে তখন নিষ্ঠা ভইরা মন লাগাইয়া করন লাগে।

গভীর ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল শমসের। তার মুখে বেদনার ছায়া পড়েছিল। রাধিকা তার কারণ বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তখন তার বাবার কথা মনে পড়েছিল। পদাবলী পড়তে পড়তে বাবার মুখও ঠিক ওইরকম হয়ে যেত। বিষয়। গভীর। যেন-না চিন্তাচ্ছন্ন। সে-দিন অসহ্য কষ্টে—কেন তার উৎস, কোথায় তার বাস রাধিকা জানত না—শুধু কষ্ট বুঝেছিল, বুঝি-না সে প্রথম সুখাংশের কষ্ট, সোজা সে তাকিয়েছিল শমসেরের দিকে। অসহ্য বেদনায় হাত পা কাঁপছিল তার। কষ্ট সে তো কম পায়নি জঘাঘা। পাগল মাকে নিয়ে, আধপাগল ভবঘুরে বাবাকে নিয়ে মুখরা কাকির হাতের নীচে থাকতে থাকতে কষ্টই কি তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল না? তবু, সে-দিনের কষ্টের কোনও তুলনা নেই রাধিকার জীবনে। সারা জীবনে

গোপন সম্পদের মতো আগলে রাখার কষ্ট সেটি। ওইসব কষ্টের তলায় লুকনো থাকে এক অসহ্য সুখানুভূতির স্বর যা কষ্টের থেকে আলাদা করার কোনও উপায় নেই। সেদিন তাকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে শমসের মম্বিত স্বরে বলেছিল, ফালফালিহিয়া কী দ্যাখস?

চোখ নামিয়ে নিয়েছিল রাধিকা, না। কিসু না।

শমসের এগিয়ে এসেছিল। রূপসীর পাড়ে ওই বাকড়া জামরুল গাছের তলায় সে আর শমসের ছাড়া কেউ ছিল না। বাঁ বাঁ নুপুরে অলস মনুষেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। কর্মবাস্ত লোকেরা কেউ শমসের আর রাধিকার খোঁজ করেনি। শমসের তার আবেগ গভীর কালে রাধিকাকে ডেকেছিল। তার মসৃণ হাত রেখেছিল রাধিকার কাজ করা, আমায়ের শমসের হাতে। রাধিকা প্রায় মরে যান্ছিল তখন। অথবা অসহ্য ভাল লাগায় রূপসী নন্দ থেকে নন্দুতর হয়ে উঠে যান্ছিল হাওয়ায়। পুরুষের হাত এত নরম হয়? এত মসৃণ? ওদের চওড়া হাড় দেখে, চওড়া বুকে-পিঠ-কাঁধ দেখে, ওদের মোটা ভারী স্বর শুনে মনে হয় ওদের মধ্যে একটুও কোমলতা নেই। কিন্তু সে-দিন রাধিকা বুঝেছিল, পুরুষের করতলও কখনও কখনও বুঝে আশ্চর্য কোমল ও মসৃণ। কখনও স্বপ্নময়! অসহ্য সুখানুভূতির কণায় ভরপুর। শমসের স্পর্শ না করলে, রাধিকার বুকের তলায় তা এতখানি করে লুকিয়ে না থাকলে সে কোনওদিন এসব বুঝতে পারত না। কার্তিক তেমন পুরুষ নয়। কার্তিক প্রেমহীন। স্বপ্নহীন। অতি সাধারণ।

সে-দিন, অসহ্য সুখের কষ্ট দাঁতে দাঁত চোপে সহ্য করতে করতে সে বলেছিল, কী কও।

শমসেরের চোখগুলি আশ্চর্য ভালবাসায় লাল তখন। গালের হাড়গুলি দুটোয় ভরপুর। সে বলেছিল, রাধু, তরে বিয়া করুম আমি।

রাধিকা চমকে উঠেছিল। এ কী বলাছে শমসেরদা। সে হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য হটফট করেছিল। শমসের ছাড়েনি। যেন বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল, কতখানি করে সে রাধিকাকে ধরে রাখতে চায়। যেন ছাড়তে না হয় কোনওদিন। যেন কোনওদিন যেতে দিতে না হয়। বলেছিল, কথা কইস না ক্যান? রাধু? বিয়া করবি না আমারে? ক'। ক' না।

রাধিকা জবাব দেয়নি। কোনও জবাব জানা ছিল না তার। কোনওক্রমে বলেছিল, কে কুনখানে দেইখা ফলাইব। আমারে ছাড়ো শমসেরদা।

—ছাড়ুম। তুই ক'। আমারে বিয়া করবি ক'।

—আমি কইতে পারি না। আমি কী জানি কও। ছাড়ো। আমারে ছাইড়া দাও শমসেরদা। কাকিয়ে দ্যাখলে আমারে কইটো ফলাইব।

শমসের হাত ছেড়ে দিয়েছিল। তার চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, তর কাকি তরে ব্যাবাক কষ্ট দ্যায়, না?

ইঠাং রাধিকার কাছে শমসের সমস্ত কষ্টের নির্দোষ প্রতিভাত হয়েছিল। তার কষ্টের কথা এভাবে আলাদা করে কেউ ভাবেনি এর আগে। সে তার নিজের কষ্ট নতুন করে শমসেরের চোখে প্রতিফলিত হতে দেখেছিল। ব্যাখ্যা উপছে বলে ফেলেছিল, আমি মইয়া যামু শমসেরদা। রূপসীর জলে মড়ি-কলসি লইয়া ডুব দিমু। আমার আর সইয়া হয় না।

শমসেরের চোখ জলে উঠেছিল। বলেছিল, ক্যান? আমি থাকতে মরবি কুন দুঃখে? রাধু, তুই মুসলমান হইলে তরে আইজৈ লইয়া ঘরে তুলতাম। আইজৈ বিয়া করতাম তরে। বাবায় তরে আদরৈ করত। তর আর কষ্ট হইত না।

রাধিকা নিজস্ব সরল বুকে মুখ নামিয়ে এনেছিল। যেন-বা আবেগে, যেন-বা লজ্জায়, যেন-বা সুখ-দুঃখ আলাদা করতে না পারার অনুভূতিতে নিজের মুখ লুকোতে লুকোতে বলেছিল—আর কইয়ো না। আর কিসু কইয়ো না গ। আমার ডর করে।

দামাল হয়ে উঠেছিল শমসের। ক্রোধী ও তুমুল। বলেছিল—কীসের ডর তর? কারে ডর? রাধু, আমার কী মনে লয় জানস?

রাধিকা তার নরম, দুর্বল স্বর আত্মসমর্পণে মেশাতে মেশাতে বলেছিল—না? কী মনে লয়?

—তবে যারা কষ্ট দিতাসে, ব্যাদনা দিতাসে, ত্যাগো ক'হিঁ! ফ্যালাই!

—না, না। এমন কথা কইয়া না। আমার কষ্ট নাই গা। কনো কষ্ট নাই।

মাঝখানে কষ্ট রেখে তারা পরস্পরের দিকে গভীর তাকিয়েছিল।

হঠাৎ জামরুলের ডালে কটপট শব্দ হয় তখন। তারা দুজনের চোখ ভেঙে। দু'টি ছাতারে মারামারি করতে করতে মাটিতে নেমে এসে ধুলো ওড়ায়। রাধিকা শমসেরের উপস্থিতি তারা গ্রহণ করে না। রাধিকা চোখ বড় বড় করে বলে, দাখসেনি কাইন্। অর্থাৎ আমারে মাইরা ফালানের লাখান করে।

তার একটু আগেকার কষ্ট আর নেই গলায়। বরং বিস্ময়। বরং আলোকসুন্দর চাপলে সে শমসেরের কাছ ঘেঁষে আসে। রূপসী নদীতে রোদুর ভেসে যায়। কক কক করে। চোখ ধমিয়ে নেয়। শমসের মৃদু হেসে বলে, অরা মারামারি করে নাই।

—তাইনে?

রাধিকা পূর্ণ চোখে প্রশ্ন করেছিল শমসেরকে। শমসের জামরুল গাছে ঠেস দিয়ে, বকের ওপর হাত দু'টি মুড়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন কোনও অমোঘ কথা এখনি সে উচ্চারণ করবে। রাধিকার প্রশ্নের উত্তর তৈরি হওয়ার আগেই ছাতারে দু'টি আবার ঝটপট করে উড়ে গিয়েছিল গাছে। শমসের বলেছিল, চাইয়া দাখ। অর্থাৎ ভালবাসতেযাচ্ছে। একখান মাইয়া, একখান ব্যাটাছেইলা।

খুব লজ্জা পেয়েছিল রাধিকা সে-দিন। এক ছুটে জামরুলতলা থেকে পালিয়ে এসেছিল। শমসের বাধা দেয়নি। তেমনই বকের ওপর হাত রেখে, জামরুল গাছে হেলান দিয়ে রাধিকার হরিণী পালিয়ে যাওয়া দেখেছিল সে। আর রাধিকা বাড়ি ফিরে দেখেছিল, তার পাগলিনী মা উঠানে বসে দুলছে। মাটিতে কাঠি দিয়ে আঁক কটছে। মায়ের পাশে বাটিতে ডালবাটা। তেল মাখানো তিনের পাত। রাধিকা বুকেছিল, ডাল ফাটানোর কাঠি দিয়েই আঁক কটছে মা। বড়ি দেবার আগে আবার উদাস হয়ে গেছে। সেই ফাঁকে শালিক চড়ই ডালবাটা ভোজ্য দিচ্ছে। রাধিকা এ দিক-ও দিক তাকিয়েছিল। এ দৃশ্য কাকি দেখলে অনর্থ করবে। রাগের মাথায় মেরেও বসতে পারে মাকে। কাকির হাতে প্রায়ই মার খায় মা। অথচ সারাদিন মাকে দিয়ে সমস্ত কাজ করিয়ে নেয় কাকি। রাধিকা যা করে তার বাইরে সমস্ত গৃহস্থালি। শুধু মার ওপর ভরসা করে রান্নার ভার দেওয়া যায় না। কিন্তু কাকি সমস্ত কাজ মা নির্বিবাদে করে। কিন্তু এক-এক দিন বিকল বিগড়ানো যন্ত্রের মতো হয়ে যায়। কিছুতেই উঠতে চায় না। সব কাজ ফেলে রাখে। কোনও গোপন দুঃখে বা রাগে ঘাড় ঝুঁজে জিন্দি মেয়ের মতো বসে থাকে। সেইসব দিন কাকির মাথায় আগুন জ্বলে যায়। রাধিকাকে যা-তা করে বকাবকি শুরু করে। মাকে মারে। মার চুলের রাশি ধরে মাটিতে মাথা ঠুকে দেয়। মা কাঁদে—আঃ! আঃ! তবু কাজ করে না। যেন যুদ্ধ ছুড়ে দেয় কাকির সামনে। কোনও কোনও দিন হাল ছেড়ে দিয়ে কাকিও কাঁদতে বসে। উনুনে জল ঢেলে দিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ফোঁপায়। রাধিকাই তখন ফের আগুন ছালে। অনেকগুলি পেটের জন্য খাবার ব্যবস্থা রাখতে হয়। উনুন নিবলে চলবে কেন? কাকা থাকবে। কাকার তিন ছেলে। কাকি। মা। রাধিকা। কোনও কোনও দিন সত্যসাধন।

সেইদিন হাঁকাতে হাঁফাতে মার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাধিকা। পিঠময় ছড়ানে চুল সাপটে খোঁপা করে নিতে গিয়েছিল। মা মাথাটা ঘুরিয়ে নিল একটু। রাধিকা এক হাতে তার মাথা চেপে ধরে খোঁপা করে দিল একরকম। মা দুলাতে থাকল। রাধিকা মায়ের গা ঘেঁষে বসে হাত দিয়ে ডাল ফাটাতে থাকল। বড়িগুলো দিয়ে ফেলতে হবে। নইলে কাকি ঠেঁচাবে।

পজাশ হাজা মারে রাধিকাকে। মা। মা। অমা।

—হ।

রাধিকা কোনও এক অজুত জগৎ থেকে ফিরে আসে। পলাশ বলে, মা! খিদে লাগে।

—হ, বাবা! এই সেই খাইতে।

শেফালির মা'র দেওয়া ডাল ভাত তরকারি সে ছেলের পাত্রে তুলে দেয়। ছেলের চোখে তৃপ্তি দেখতে পায় সে। খাবার দেখে পলাশ সত্যি খুশি। সে বলে, হ মা! ক্যান্ডি! অ্যান্ড ভাত আমি খামু কী কৈরা!

সে মায়ের মুখ দেখে। যেন-বা শুকনো ঠেকে। সে বলে, আমার লগে তুমিও দুইটা খাও মা।

—আমি খাইসি। তুই খা বাবা।

—আমার লগে দুইটা খাও। অ মা! আমারে ভাতটা মাইখা নিরা?

রাধিকার মুখ জলে ভরে যায়। একক্ষণ সে সামান্য ভাত ও সবজেনপাতা ভাজা খেয়ে আছে। ডাল ভাতের গন্ধে এখন তার মুখ স্বাদু জলে ভরে যাচ্ছে। সে আর কথা বাড়ায় না। ভাল দিয়ে ভাত মেখে ছেলের মুখে তুলে দেয়। বড় গ্রাসে মুখ ভর্তি হয়ে যায় ছেলের। সে তার ছোট হাতখানি মায়ের ঠোঁটে রেখে মাথা নাড়ে। এবারে নিজের মুখে গ্রাস তোলে রাধিকা। তাজাতাড়ি চিবিয়ে পেটে চালান করে দেয়। ছেলের মুখের ভাত ফুরোবার আগে আরও এক গ্রাস নিজের মুখে ত্রোলে। হঠাৎ তার মনে হয়, এ কী করছে সে। এ ভাত সে তো ছেলের জন্য রেখেছিল। এখন নিজেই গোত্রাসে খেয়ে ফেলাছে কেন। তখনই পেটের মধ্যে চিনচিনে বাধা অনুভব করে সে। কিন্তু আমল দেয় না। ছেলের মুখে ভাত তুলে দেয় ফের। খাওয়া শেষ হলে এঁটো তুলে কলতলায় পা বাড়ায়। তখন ভেজা কাপড়ে হাঁসফাঁস করতে করতে উঠানে ঢোকে শেফালির মা। রাধিকাকে বলে, অ বাবু। আমারে খর থিকা একখান শুকনা কাপড় আইন্যা দে।

তার কথা ফুরোতে না ফুরোতে হড় হড় করে বমি তোলে রাধিকা। শেফালির মা তাজাতাড়ি এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। বমির গন্ধে তার গা গুলিয়ে ওঠে। পলাশ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে এই দৃশ্যের দিকে। এত প্রিয় ভাত, এত আশার ভাত, বমিতে তুলে দিতে হল মাকে—তার কষ্ট হয়! আর শেফালির মা দেখতে পায়, জলের সঙ্গে, ভাতের সঙ্গে উঠে আসছে অনেক কালো-কালো সবুজ-সবুজ কণা। ভেজা আঁচল দিয়ে রাধিকার মুখ মুছে দিতে দিতে সে শ্রম করে, কী খাইসিলি? তবে যে ভাত দিসিলাম খাইস নাই?

রাধিকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। শেফালির মা বমিতে জল ঢালতে ঢালতে বলে, ওইগুলো কী?

রাধিকা হাঁফাতে হাঁফাতে দাওয়ায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়ায়। জবাব দেয় না। অবশেষে শেফালির মা'র জিজ্ঞাসা ঘোরানোর জন্য বলে, খাড়াও। তোমার কাপড়খান আইন্যা দেই।

শেফালির মা'র মুখ শক্ত হয়। বলে, র। আনিস অনে। অহ্ন ক দেহি। কী খাইসিলি।

—কী আর। সইজন পাতা ভাজা।

—আবার ওই পুখুরে গেসিলি তুই? হারামজাদী মাইয়া। তবে কই নাই প্যাট লইয়া পুখুরে যাবি না? বাইর হ। যা। আমার সামনের থিকা যা। আমার কাছে আর আওন লাগব না তর। যা।

দু'হাতে মুখ চেপে কঁদে ফেলে রাধিকা। বলে, হ। যামু। যমের বাড়িই যামু আক্কেরে।

তখন পরমেশ ক'টি বাসন নিয়ে কলতলায় আসে। রাধিকা তাকে দেখেনি। সে বলে যায়, কেউ কি দ্যাখসে চোখ তুইল্যা? হ্যায় গ্যাসে তো গ্যাসেই। আর আওনের নাম নাই। দড়ি-কলসি লইয়া তুইল্যা মরুম পুখুরে।

পরমেশ অবাক হয়ে যায়। ইশারায় শেফালির মা'র কাছে বৃত্তান্ত জানতে চায় সে। শেফালির মা বিরক্ত হয়ে বলে, কী আর কমু! অর যেতুন কপাল। যত আইসা জুটব আমার লগে।

সে ভেজা কাপড় সাপটে খরে চলে যায়। পরমেশ বাসন নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে, কী হয়েছে বউদি? ও বউদি? কাঁদছেন কেন?



এই প্রথম পরমেশ কথা বলছে রাধিকার সঙ্গে। মুখ থেকে হাত সরান রাধিকা। প্রায় অবিশ্বাসে তাকায়। এবং সামনে সত্যি পরমেশকে প্রত্যক্ষ করে দু'হাতে মুখ আগলে আবার কাঁদতে শুরু করে।

বৃষ্টি কমেছিল কিছুক্ষণ। আবার ঝমঝমিয়ে শুরু হয়। যেন রাধিকার সঙ্গে বর্ষার তুমুল প্রতিযোগিতা।

পরমেশ তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠে যায়। রাধিকাও চোখ মুছতে-মুছতে যাবে আসে। পরমেশ তাকিয়ে থাকে রাধিকার দিকে। মা হতে চলেছে এমন মেয়েকে এভাবে কাঁদতে দেখে তার কষ্ট হয়। কার্তিকের খবরাখবর সে জানে। অনেকদিন বাঁচি আসেনি কার্তিক। রাধিকা এ অবস্থায় নিশ্চয়ই অসহায় বোধ করছে তার জন্য। এবং কাঁদছে। সাম্প্রতিক, বুরই সাম্প্রতিক।

সন্ধ্যায় পরমেশকে ডেকে পাঠাল শেফালির মা। শ্যামল আর কমলও মায়ের সঙ্গে বসল। শেফালির মা পেঁয়াজ, আদা, ধনেপাতা, তেল ও নুন দিয়ে মুড়ি মেখে দিয়েছে তিনজনকে। কমল বলল, বাবায় কই মা?

শেফালির মা বড় গামলায় মাখা মুড়ির থানিকটা একটা ছোট বাটিতে তুলতে তুলতে বলল, তর বাবায় রোজ কই যায় জানস না?

—শীতলা মন্দিরে।

—হ। একবার তাস না পিটাইলে তেনির ঘুম আই না।

শ্যামল আরও এক বাটি মুড়ি মাকে আলাদা করতে দেখে বুঝেছিল, বাবা যখন তাস খেলতে গেছে তখন এ মুড়ি করে। তবু, মাকে রাগানোর জন্য সে বলল, বাবায় নাই। মুড়ি করার লিগ্যা তুগো তুমি মা? তুমি তো গামলা লইয়া বইবা।

শেফালির মা বলে, হ। বম্বু।

—তাইলে মুড়ি দ্যাও কারে?

পরমেশ মুখে একগাল মুড়ি ফেলে কী বলতে বাচ্ছিল। শ্যামল তাকে ইশারা করে। পরমেশ খেমে যায়। শ্যামল আবার বলে, অ মা।

এ বার শেফালির মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, সব খোঁজে তগো কাম কি? ঝাইতে দিসি, বা।

মাকে চটানোই শ্যামলের উদ্দেশ্য। কমল বুঝতে পারছে। সে হাসছে। শ্যামল বলল, মায় পরাণের মাইয়ার লিগ্যা লইয়া যাইব বুতলা পরমেশ।

শেফালির মা রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে যেন-বা ধরা পড়ার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায়। হাতে মুড়ির বাটি নিয়ে বারান্দায় যায় সে। নিজেরা পেট পুরে মুড়ি খাচ্ছে আর পোয়াতি মেছেটা খিদে চেপে শুয়ে থাকছে—এ শেফালির মার সহ্য হবে না। সে ঘর ছেড়ে বেরবার সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং হল। আকাশে এখনও মেঘ আছে। বিন্যূৎ চমকচ্ছে ধীরে ধীরে। রাধিকার দরজায় মৃদু ঠেলা মারল শেফালির মা। পলাশের সাজা পাওয়া গেল।

শেফালির মা বলল, পলাশ। বাবা। মুড়িগুলো খো দেহি লইয়া। তর মায় কই?

রাধিকা সাড়া দিচ্ছে না। দুপুরে গালমন্দ করেছিল শেফালির মা। রাধিকা পুকুরের পাড়ে গিয়েছিল বলে রাগ করেছিল। পুকুরে অপদাবতা থাকে। শিঙ-মাগুর-কৈ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পোয়াতি মেখলেই অদৃশ্য জাদুবলে জলের দিকে টানে আর তার পা হড়কে যায়। তখন সে ডুবে যেতে পারে। না ডুবলেও বিষাক্ত অসুখ তার শরীর ছেয়ে ফেলতে পারে। এ সবই অপদাবতার লোভী নিষ্ঠাসের কারণে। রাধিকা মানছে না। এই জীবনের প্রতি, সম্ভাবনের জন্ম দেবার প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ। বীতস্পৃহ। কিছু শেফালির মার উদ্দেশ্য কমে না।

রাধিকা দুপুরের কথা মনে রেখে চুপ করে আছে বলে শেফালির মা কষ্ট পায়। তখন মেজাজ ভাল ছিল না। কী বলেছে না বলেছে। তাই বলে সব মনে রাখবে মেয়েটা। একটু বুঝবে না?

নিজে যে কথা শুনাচ্ছে না, নিয়ম মানছে না। নিজের বিপদ নিজে ডাকছে—সেটা কিছু নয়। তার মনে পড়ছে, একবার একটা সবুজ ফিতের জন্য বাঘনা ধারডিল শেফালি। তখন সব কিছু কত অন্য রকম ছিল। ছায়াপিন্ড পুকুরঘাটে জীবনের সমস্ত বৃষ্টি বিছিয়ে থাকত। জল করার সময় ডুব-ডুব বেলা। কে কতবার ডুব দিতে পারে। জলে চোখ লাগ হলে কোঁচ নাক দিয়ে ঘন রস গড়াত। তবু খেলা ধামত না। ওইসব পুকুরে সব কিছু ভাসিয়ে দিতে চাইত মানুষ। ডুবিয়েও দিতে চাইত। সমস্ত দুঃখ, ক্রন্দ, অপমান। নিজেগাও ডুবত, যখন আর জীবনের তার বইতে পারত না। শেফালির মার মনে আছে, সুশীলাদি একদিন ডুবে মরল খুতখানিয়া। লোক তাকে নিয়ে নানা কথা কইল। গাঁয়ের সবচেয়ে পুরনো ঘাই রটাল—পাট হইসিল। আমার কাসে আইসিল খালাস করনের লিগা। আমি কইসি, পারকস না। খালাস করনে আমার কাম না।

পুকুরের জলে ডুবে নিজেই নিজেকে জীবন থেকে খালাস করে কেলেছিল সুশীলাদি। কে এই সর্বনাশ করেছিল তার? নাকি সেই, অমোঘ টানে সর্বনাশে ঢুকেছিল তা কে বলতে পারে। ছোটবেলায় বিধবা হয়েছিল সুশীলাদি। বৈধবোর কঠোর নিয়ম সে পালন করে চলেছে—এমনই জনত লোকে। কোন রকমে ঢুকে গিয়েছিল অসংযম। তার মৃত্যুর পর সন্ধ্যায় রাতে ঘাটের পাশ দিয়ে যেতে পারত না কেউ। সুশীলাদি নাকি জাপুরা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকে। হরতো-বা মরশোন্তরে জাপুরাফুলের গন্ধ বুক ভরে টেনে নিত সে। সেইটুকুই সুখ ছিল হয়তো। সেইদিন শেফালির ওরকম বাঘনায় খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছিল শেফালির মা। শেফালির মুখে ঠোনা মেরে বলেছিল—খাড়া। তার সবুজ ফিতা বিতাসি। সন্ধ্যা থিকা ঘ্যানর ঘ্যানর। থুইয়া আমু তরে জাপুরা গাছের তলে। পেট্রিয়ে ধরব।

কী বুঝেছিল শেফালি কে জানে! হয়তো গভীর অভিমান হয়েছিল তার। সন্ধ্যাবেলা নিজেই সে জাপুরাতলায় চলে গিয়েছিল। যখন ভাল করে বেলা পড়েনি, তখনই সাহসে ভর করে রাগের মাথায় সে চলে যায় সেইখানে। কিছু যখন অন্ধকার হল, যখন জাপুরার পাতাগুলিকে আলাদা করে আর চেনা গেল না, তখন খুব ভয় পেয়েছিল শেফালি। দারুণ ভয়ে সে কাঁপছিল। কাঁদছিল। গাঁয়ের আসমাদ চাচা ফিরছিল পুকুরের পাশের রাস্তা দিয়ে। সাহসের জন্য খ্যাতি ছিল তার। ভূত-পেড়ির পরোয়া করেনি কখনও। হঠাৎ অদ্ভুত ই ই ই ই বাগ্না শুনে তারও প্রথমে ভয় ধরে যায়। তবু সুশীলার পেট্রিকে দেখার আগ্রহে সে চলে এসেছিল জাপুরাতলায়। বন-বাদান্তে সে কম ঘোরেনি। কিন্তু ভূতের কামা শোনেনি কখনও। কোনও গোলমাল আছে বলে তার সন্দেহ হয়েছিল এবং সত্যি শেফালিকে আবিষ্কার করেছিল সেখানে। সে-ই তাকে কোলে করে বাড়ি পৌঁছে দেয়। জ্বর এসে গিয়েছিল শেফালির। আর মরমে মরে গিয়েছিল শেফালির মা। কেন সে একটু ধৈর্য ধরেনি? কেন একটু বোঝায়নি?

যদি বেঁচে থাকে শেফালি, যদি ভাল থাকে, তবে আজ তার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। তার কি মনে পড়ে সেইসব কথা? সুশীলার ভূতের গন্ধ? ভয় পাওয়ানো জাপুরা গাছ, শেফালির মার চোখে জল আসে। সে নীরবে বাটি নামিয়ে রেখে ঘরে যাবার জন্য ফেরে। রাধিকা তাকে তখন, মাসি।

শেফালির মা দাঁড়ায়। রাধিকা বলে, মাথায় ব্যাননা হইতাসে মাসি।

তার কথায়, ওই দু'খানি কথায়, শেফালির মার বিষণ্ণতা চলে যায়। সে স্নেহসিক্ত গলায় বলে, শুইয়া থাক। দুইগাল মুড়ি খা। আমি পরে আমুঅনে।

সে ঘরে যায়। কমল বলে, মা, তোমার মুড়িগুলান শুকইয়া চিমড়া মাইরা গেল। চিবাইবা কামনে? আমারে দুগা দিয়া দাও।

শেফালির মা হাসিমুখে দু'মুঠো তুলে দেয় ছেলের বাটিতে। তারপর নিজের মুখে এক মুঠো ফেলে বলে, মাইয়াদার কষ্ট আর লাখন যায় না। তরা কিসু কর।

তখন আলোচনা করে তারা। কার্তিকের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় অবাক হয়। সত্যি তো। একটা

পরসে সেই ঘরে, বাচ্চা নিয়ে, পোয়াতি অবস্থায় কী করে চলে মেয়েটার। সবার কাছে ধারকর্জ করেছে। সজনেপাতা ভাজা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এভাবে আর কতদিন। সেদিন উত্তরের ঘরের মুখরা রামিবুড়ি বলছিল, এখন মেসে যাচ্ছে। কদিন পর শরীর বিকোবে। মিনসেকে বাঁধতে শেখেনি। এ ব্যসেই যদি মিনসের টান আলগা হয় তবে আর বলি কি। বাচ্চালের মেয়েগুলো বাপু কেমন ধারা। বড় টিলেচালা। গা অজগা সংসারে।

কার্তিকের কাণ্ডজানহীনতা ও নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি জিহ্বাগ্রস্ত হয় তারা। যদি কিছু হয় মানুষটার। কোনও অসুখ-বিসুখ কিংবা দুর্ঘটনা। অনেক অলোচনা করে কার্তিকের কর্মফলে গিয়ে খোঁজ নেওয়া স্থির করে তারা। শ্যামল যত দূর জানে অকল্পিত স্টেশনের কাছে একটা কাঠগোলায় কাজ করে কার্তিক। কাঠগোলাটির নাম জ্ঞানে না অবশ্য। আর ওখানে এরকম গোলা অনেকই রয়েছে। তবু খোঁজ করলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে তাকে। পরমেশ মাধব পালের সাহায্য নেবার পরামর্শ দেয়। মাধব পাল রামিবুড়ির ছেলে। পরমেশ অনেকদিন তাকে কার্তিকের সঙ্গে আসা যাওয়া করতে দেখেছে।

অলোচনা ফুরোবার আগেই আলো ফিরে এল। শেফালির মা বিড় বিড় করে দু'হাত মাথায় ঠেকায়। শ্যামল শুনতে পায় মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানত করছে। পূজা দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। তার আবার সত্যজিহের কথা মনে পড়ে। ঈশ্বরচিন্তা মানুষকে দুর্বল করে দেয়। সে বলত। শ্যামল আজও এ বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। সে তার মাকে দেখেছে। চারপাশে অন্যদের দেখেছে। ঈশ্বর আছেন, তিনি পরম করুণাময়, মঙ্গলময়—এই বিশ্বাসে এই ভরসায় মানুষ তার কর্তব্যও করছে। হয়তো সাধ্যাতীত কাজের কৃকি নিচ্ছে কখনও। আসমুদ্র শোক সঁাতরে পেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন আছে, কেউ একজন আমার কথা ভাবছে, আমার সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার নিয়ে আমাকে শান্তি দেবার জন্য অতন্ত্র জগরণে আছে—এই ভরসায় কি গিরি লঙ্ঘন করছে না মানুষ? তবু ঈশ্বরের অঙ্গ সবসময় সূফল দেয় না। ঈশ্বরের কাছে পূজা-প্রার্থনার পরও, উপোস-ব্রত-নিয়ম পালনের পরও চরম সর্বনাশ ঘটে মানুষের। সেটাও পরম করুণাময় ঈশ্বরের গুণ ইচ্ছা, লক্ষ্য বা অতীন্দ্রা ধরে নেওয়া হয়। কিংবা নিজের কোনও পাপের প্রায়শ্চিত্ত—এমনই ব্যাখ্যা। মাকে মাঝে শ্যামলের মনে হয়, কেউই ভুল নয়। যে অথও আত্মায় বিশ্বাস করে সে নয়, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না সেও নয়। যার যার বিশ্বাস তার নিজের মতো। আসল কথা, মানুষ নিজেকে কীভাবে পরিচালিত করবে, কীভাবে নির্ধারণ করবে ন্যায়-নীতি, কীভাবে সে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করবে সেই পথ নির্ধারণ করা। শ্যামল মায়ের দিকে তাকায়। রাতের রান্নার আয়োজন করছে মা। এত পরিশ্রম করে মা, এমনই তার দুঃখ ও সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস—তবু কীরকম আলো করে রাখে ঘর। মার গায়ে আলো দেখে সে। বিশ্বাস করে—এ আলো স্নেহের। নৈঃস্বার্থের। এই দারিদ্রের মধ্যেও মা নিজের খাবার বন্টন করে খায়। এর চেয়ে বড় আর কী হতে পারে।



সুখা ছানিয়া কেবা                      ও সুখা ভেলেছে গো  
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।  
অঙ্কন গঞ্জিয়া কেবা                      খঙ্কন আনিল রে  
চাঁদ নিভাতি কৈল থেহা ৷

সে খেত্বে নিম্নাঙ্কি কেবা মুখ বনাইল রে  
জবা হানিয়া কৈল গণ্ড।  
বিশ্বকল জিনি কেবা ওল গায়েল রে  
ভুজ জিনিয়া করি-গুণ ॥

মগ হয়ে পাঠ করছে সত্যসাধন। যেন-বা তার পাঠ শুধু পাঠ নয়। সুতক আছে। হুত সুব। রা  
ঠিক গানের মতো নয়। কিন্তু সঙ্গীতই বৃষ্টি। যেন হির জলকে একটি ছুঁয়ে বিশেষ বোকাপন, তাকে  
চেউ বলা যাবে না কোনওমতে, তবু চেউ-ই তো।

লঠনের চিমনিতে কালি পড়েছে। আলো কম লাগছে ঘরে। সেই লাগছে আলোতেই পাঠ  
করছে সত্যসাধন। রাধিকা পাশে বসে আছে। একটি কাঁথা সেলাই করছে সে। নিজা-বাবার ব্যবহার  
কাঁথা। শিল্প-নকশার প্রয়োজন নেই। তবু মাছ করছে, ফুল-করছে। এ গাঁবে বিদ্যাব আসেনি  
এখনও। সকলে লঠনে অভ্যস্ত। সত্যসাধন পড়া ধামিরে চশমা মুছ মিল একবার। রাধিকা  
বলল, আলো কম লাগতেয়্যাসে, না বাবা?

—হ। আইজ লঠনগুলো মুছস নাই?

—না।

—দুফরে বৈয়া বৈয়া কী করস?

—আইজ বড়ি দিসি।

সত্যসাধনের চোখে স্নেহ ঝরে। মৃদু হেসে বলেন, বড়ি দিত পারস তুই?

—হ। পারস না ক্যান? সংসারে কন কামড়া না পারি কও?

রাধিকার গলায় প্রত্যয়। নাকি আসলে এর নাম ফোভ। রাধিকা স্কুল ছাড়তে চায়নি। কিন্তু  
পায়ের যেমন রীতি। কাকি কিছুতেই আর স্কুলে যেতে দিল না। কী হত গেলে? শহরে  
আজকাল সব মেয়ে স্কুলে যায়। সত্যসাধনের একটু মন ব্যাপ লাগে। মেয়ের খোঁপাটা একটু  
নেড়ে দিয়ে বলে, পারস বুজি? তাহিলে আর কি? তরে বিয়া দিয়া দেই রাধু?

—বিয়া।

রাধিকা চমকে ওঠে। বিয়া। বিয়া। আজকেই একজন বলেছে তাকে—তরে বিয়া করম।  
বিয়া। বিয়া। কী সুন্দর শব্দটা। কিন্তু কী ভয় যে লাগে। তার হাত পা হিম হয়ে যায়। বুকে সির-  
সিরানি ধরে। এই শব্দটা ক্রমশ গিরে ধরছে তাকে। তার হঠাৎ মনে হয়, পৃথিবীর সবাই সব  
কিছু জেনে গেছে। শমসেরের কথাগুলি শুধু জামরুল গাছ নয়, ছাতারে পাখিরা নয়, রূপসী নদী  
আর রাধিকা নয়— শুনে ফেলেছে সারা গ্রাম! সে কী করবে ভেবে পায় না। এক ফুঁয়ে লঠন  
নেবাতে চায়। লঠন দপ্ করে ঝলসে ওঠে। নেবে না। সত্যসাধন হা হা আতর্নাদ করে, করস  
কী। করস কী! আতুন-মাগুন লাগাইয়া এক কাণ্ড হইব অখন।

রাধিকা আমল দেয় না। আঁচল দিয়ে লঠনের মাথা টেনে আলগা করে জোরে ফুঁ দেয়। বলে,  
চিমনিডারে সাক কইরা আনি। তুমি কও।

আঁচল দিয়ে গরম চিমনি চেপে করেছে সে। কাপড় ভেদ করে ভাপ লাগছে হাতে। বুক দূর  
দূর করছে। পাশের ঘর থেকে ভাইনের পড়াশুনার শব্দ উঠছে। মা কোথায়? রাধিকা একবার  
রাগাঘরে উকি দেয়। মা দু'হাঁটুর ভাঁজে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। রাধিকা একটু স্বস্তি বোধ করে।  
মা তা হলে কাজ করছে এ বেলা। বাবা এসেছে। বাবার সামনেই যদি মাতে মারে কাকি। রাধিকা  
জানে বাবা তা হলে ভীষণ কষ্ট পায়। পদাবলী পড়তে পড়তে চোখের জল মোছে।

চিমনি মুছে ফিরে এল রাধিকা। সত্যসাধন অন্ধকারে বসে আছে। দেশলাই জ্বলে লঠন  
ধরিয়ে চিমনি বসিয়ে দিতেই উজ্জ্বল হল ঘর। সত্যসাধন বলল, রাধু—

—কও।

—আন্দারেরও ঘ্যান আপন আলো জ্বলে এমুন লাগে না তর?

—আল্লাহে আলো তুমি কই পাও বাবা?

—হ। পাই। তুই আলো নিবাইয়া গেলি গিয়া। আমার যান সব ছুঁইয়া গেল। আমার সব যান ফিরা আইল একটুস একটুস কইরা।

বাবার কথার কোনও মানে বোঝেনি রাধিকা। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে মানুষতো বেরুতে পাবেই। এ আর নতুন কি? সত্যসাধন একটা বড় স্বাস ছাড়ে। আব্বার নিজের নিকটেই টেনে নেয়। আব্বার আগের সুরের রেশ ধরে সে। রাধিকার ভাল লাগছে সেই সুর। কেন ভাল লাগছে সে জানে না। বলে, বাবা। আমারে বুজাইয়া দিবা।

—কী?

—ওই যে পড়তেয়সিলা?

সত্যসাধনের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়। সে বলে, সুধাময় শ্যামে যেন অমরজ্যোতিঃলালিত নীলকণ্ঠ পাখিটি। যেন চাঁদ নিংড়ে বের করে আনা একগুণ স্থির স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না।

সুধা ছানিয়া কেবা                      ও সুধা ঢেলেছে ঘো

তেমতি শ্যামের ডিকল দেহা।

অগ্নি গঞ্জিয়া কেবা                      বগ্নন আনিল রে

চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা ॥

—কী সুন্দর লিখে বাবা। কী সুন্দর কর?

—সেই স্থির স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না দিয়ে মুখ তৈরি হল তার। অব্বার আভা লাগল গালে। পাকা পুট বিশ্বফলের দানা দিয়ে গড়ে উঠল ঠোঁট। হাতের শুঁড়ের সুগোল মসৃণতায় হাত তৈরি হল—

সে বেহা নিঙ্গাড়ি                      কেবা মুখ কনাইল রে

জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।

বিশ্বফল জিনি কেবা                      শুষ্ঠ গড়িল রে

ভুজা জিনিয়া করি-শুণ্ড ॥

রাত গড়িয়ে গেছে। কেউ কোথাও জেগে নেই। রাধিকার পাশে পাগলি মা। মূরে রূপসীর অবিক্রম ভেসে বাবার টান। মা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? রাধিকা টের পাচ্ছে না। সে ভাবছে। জমাট জ্যোৎস্নার মতো মুখ। স্নিগ্ধ। নিম্পাপ। সে মুখ শমসেরের। কালো চকচকে গাল। যেন খোর রক্তবর্ণ জবার পাপড়ি। পাকা বিশ্বফল ঠোঁট। শমসেরের ঠোঁট কেমন? হাত কেমন? গলা কেমন? বুক? হ্যাঁ। বুকোও বর্ণনা আছে ওখানে। রাধিকার মনে পড়ছে— পাখাণ কেটে রক্ত বসিয়ে দিয়েছে কেউ। রক্ত কোথায়? ঢালা হাড় সজ্জাত বৃকে রক্ত বলবে কাকে?

বিস্তারি পাখাণে কেবা                      রতন বসাইল রে

এমতি লাগয়ে বৃকের শোভা

দাম-কুসুমে কেবা                      সুধমা করেছে রে

এমতি তনুর দেখি আভা ॥

রাধিকার বৃকের মতো সিরসির করে। শমসেরের সেই স্পর্শ— আশ্চর্য নরম, উষ্ণ, ভেজা স্পর্শ তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। একা একা, প্রাণ ঘুমন্ত মানুষের মতো স্থির হয়ে জেগে রাধিকা ক্রমশ মরে যাচ্ছে তখন। নানা রকম স্বপ্নে মরে যাচ্ছে। তার কানে বাজছে— 'তরে বিয়া ককম রাধু। বিয়া ককম তরে।' বিয়া বিয়া বিয়া— আশ্চর্য শব্দ বৃকে করে ঘুমিয়ে পড়ে রাধিকা। জীবন ও মরণের সীমানা চুকিয়ে সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত স্বাদ নিতে ইচ্ছে করে তার। আর ঘুমের মতো ইচ্ছাগুলি স্বপ্ন হয়ে যায়। সেই স্বপ্নে ছাতারে পাখিরা। সেই স্বপ্নে শমসের। আর শমসেরকে ঘিরে কেঁটাকুরের অঙ্গ কর্ণন। রাধিকার চোখের পাতাগুলি কাঁপে। শিথিল হাত মুঠো হয় একবার। ঘুমের মতো নড়াচড়া করে সে। পাশ ফিরে জড়িয়ে ধরে পাগলি মায়ের গলা। রাধিকার ঘুম গাঢ় হয়।

পরপর অনেকদিন শমসেরকে দেখতে পেল না রাধিকা। নদীর ঘাটে অকারণে হুস খেতে কাকির বকুনি খেল কতদিন। কতদিন জামরুল গাছের নীচে বসে ছাঁতাইয়ের ডাক শুনল, ছটোপাটি দেখল, কিন্তু শমসের এল না। সে কি টের পায়নি, গন্ধ পায়নি, রাধিকা অপেক্ষা করছে? শমসের রাধিকাকে প্রায়ই বলত— যখন আরও ছোট ছিল তারা— বেলে বেড়াত মাঠে-ঘাটে—লুকোচুরি খেলার সময় শমসের ঠিক রাধিকাকে খুঁজে পেত যেত। রাধিকা বলত— তোমার লগে পারি না! শমসেরনা! লুক্কাইসেই বুইজা বাইর কইরা ফসলাও। শমসের বলত— কেমন কইরা তরে পাই, ক?

—কামনে পাও?

—গন্ধ শুইক্যা পাই। তর চুলের গন্ধ। শরীরের গন্ধ। এমন মিঠা লাগে।

—আম্বকের হারাইয়া যামু তখন আমারে কই পাইবা? গন্ধও পাইবা না।

—কই যাবি? আ? কই যাবি? যেইখানৈ যা, তরে গন্ধ শুইক্যা বাইর করগম।

একদিন আর থাকতে না পেরে ফন্দি করল রাধিকা। চারটি কাঁচা আম পেড়ে শমসেরের বাড়ি চলে গেল তার বোন লায়লিকে ডাকতে।

শমসেরের মা সিমুই রোদ্দুরে দিচ্ছিল উঠোনে। রাধিকাকে বলল, যা, লায়লি ঘরে আসে।

রাধিকা ঘরে গেল। শাকিনা মেহেন্দি পরিয়ে দিচ্ছিল লায়লিকে। রাধিকা বলল, কাঁচা আম খাবি লায়লি?

লায়লি মুখ তুলছে না। শাকিনার নকশার দিকে তাকিয়ে আছে। পাছে নড়ে যায়। তা হলেই শাকিনা খেঁকিয়ে উঠবে। মুখ না তুলেই সে বলে, কুনখান থিকা আনলি?

—আমাগো গাসের।

—তগো গাসের আম খাইতে মিঠা। পরে খামু। তুই রাইখা যা রাধু।

শাকিনা বলে, সইতাকাকাগে যান দ্যাখলাম কইল।

রাধিকা বলে, হ। বাবায় অহিসে দুইদিন হয়।

কথা থেমে গেল। কেউ কিছু বলছে না। রাধিকা উশখুস করছে। শেষে বলেই ফেলল, শমসেরদারে দেখি না?

শাকিনা বাকা চোখে তাকায়। বলে, ক্যান? শমসেররে মিয়া তর কুন কামডা?

রাধিকা অপ্রস্তুত বোধ করছে। ভয় পাচ্ছে। শাকিনা কি সব বুঝে ফেলল? জেনে ফেলল? সে যে শমসেরকেই খুঁজছে তা কি জানে সবাই? ইস— কেন যে শমসেরের নাম করল। সে তাড়াতাড়ি বলে, না। আমার আর কুন কামডা? বাবায় কইল, বা রাধু, শমসেররে ডাইকা আন। পোলাডা কয়, কাকা আমারে চুন তবলা বাজান শিখাও। তাই জিগাইতেয়াসিলাম।

শমসের তবলা বাজানো শিখতে চায়, এ খবর সত্যি। সে আর কথা বাড়ায় না। লায়লি বলে, দাদা ঢাকায় গ্যাসে গিয়া।

—ক্যান?

—কলেজে ভর্তি হইব। বাবায় কইসে জমিজমা আমি দ্যাখতেয়াসি। তুই ঢাকায় যা গিয়া। পড়। দুই চাইরখান পাস কইরা জমিজমা ধরবি।

রাধিকা উঠে পড়ল। বিরস গলায় বলল, যাই তাইলে। বাবারে গিয়া কই।

মন খারাপ হয়ে গেল তার। ঢাকায় যাবে, শমসেরদা তাকে একবারও বলে গেল না কেন? শুধু শুধু একগাদা মিথো বলল সে। শাকিনাটা কেমন যেন। শুধু টাঁরা-বাকা কথা। তার একবার ইচ্ছে হল ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে শমসের কবে ফিরবে। কিন্তু পারল না। একা একা রূপসীর দিকে হাঁটতে লাগল সে। ক দিন বৃষ্টি হয়েছে। তাতেই রূপসীর জল বেড়ে গেছে। জামরুল গাছের তল ছুই-ছুই করছে। সালতিগুলো বের করার সময় হয়ে এল। ক দিন পর পুরোপুরি বর্ষা নেমে গেলে অনেকদিন আর মাটি দেখা যাবে না। খাল বিল নদী পুকুর উপড়ে একাকার করে



দেবে জমি পথ উঠোন বাগান। সারা গ্রাম জলে ভাসবে। সালতি নিয়ে এ দিক-ও দিক করবে সবাই। খাওয়ার কষ্ট। জলের কষ্ট। উনুন জ্বলতে চাইবে না। প্রচুর মাছ পাবে সকলে কিন্তু সেই মাছ জ্বলে দিতে হবে কারণ মাছ ভাজার মতো তেলও পাওয়া যাবে না। সকলেই তাঁড়ারই প্রায় শূন্যে ঠেকবে তখন। গোত্র-বান্ধুদের ক্ষুরে খা হবে। গলা ফুলবে। নানা রকম আত্মহা। মানুষেরও রোগ-বালাই বেড়ে যাবে। রূপসী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তখন।

খিলপাটনি গ্রাম থেকে সরাসরি মাথুরের গড়ের এই উদ্ভাস কলানিতে ফিরে এল রাধিকা। শ্রুতির ভেতরই যেন সে জেগে ছিল। ঘুমিয়ে পড়ল এখন। যখন সে বাস্তবে এল। কর্মমানে ফিরল। এই কঠিন বর্তমান সম্পর্কে নিমিত্ত না থাকলে সে বাঁচবেই বা কী করে।

কার্তিকের খবর পাওয়া গেছে। সরাসরি তারই সঙ্গে কথা বলে এসেছে মাধবপাল। কার্তিক দায়িত্ব অস্বীকার করেনি। এখন আসতে পারার অক্ষমতা জানিয়েছে। না। কোনও কারণ দর্শায়নি সে। কাজের দোহাই দিয়েছে। মাধব পালের সঙ্গেই, হৃদয়পুরে আর একটা বিয়ে করেছে কার্তিক। নাকি সে কোনও মেয়েছেলের সঙ্গে থাকছে আজকাল। যে কাঠগোলায় কাজ করে কার্তিক তারই একজন সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছে মাধবকে। কিন্তু কার্তিক নিজেকে কিছু বলেনি। সে মাধবের হাতে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে রাধিকাকে দেবার জন্য। রাধিকা টাকা নিয়ে চুপ করে বসে আছে। শ্যামলদের ঘরে শ্যামল, কমল ও পরমেশ্বর মুখ রাগে টান টান। আশ্চর্য। আবার বিয়ে করেছে লোকটা। বুড়ো ভাম। বউটাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে ওখানে মজা লুটছে। একটা কচি মেয়ের সর্বনাশ করে আর এক জনকে জুটিয়েছে। শেফালির মা এক কোণে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসেছে। কাঁদছে। শব্দ নেই। ডরা গঙ্গার মতো অফুরন্ত জল। মানুষের কান্না ফুরোবার নয় বলেই বোধহয় অশ্রুর উৎস কোনওদিন শুকায় না।

নির্বাক হয়ে আছে শেফালির মা। ভাবছে। যেমনই হোক কার্তিক— বুড়ো-বুরো-নিষ্ঠুর— এতদিন রাধিকার গতি কী হবে তাই নিয়ে ভাবতে হয়নি। কিন্তু এখন সামনে শুধুই অন্ধকার। কার্তিক যদি ফিরে না আসে ছেলেপুলে নিয়ে কী করবে মেয়েটা।

আর সকলের রাগ ক্ষোভ দুঃখ প্রত্যক্ষ করে রাধিকা নিজের ঘরে বসে ভাবছে— এটা কি খুবই দুঃখের কথা, শোকের কথা যে কার্তিক হৃদয়পুরে আলাদা বিয়ে করেছে? আপাতত পঞ্চাশ টাকা পেয়ে তার আর যেন দুঃখ নেই। কিংবা কার্তিক সম্পর্কে, প্রকৃতপক্ষে, মুখ-দুঃখের কোনও বোঝাই নেই তার। তার কপাল খারাপ— শেফালির মা বারবার বলে এ কথা। কিন্তু খিলপাটনি গাঁয়ে এমন কপাল কি আর দেখেনি সে? শ্যামলীদির ছেলে-পুলে হাঙ্গিল না বলে তাকে বাপের বাড়িতে রেখে গেল তার বর। আবার বিয়ে করল। শাকিনার কথাই ধরা যাক। সেও ছিল তালাক-পাওয়া দুঃখী মেয়ে। সেইসব তালাক পাওয়া বা স্বামীতে ফিরিয়ে দেওয়া মেয়েদের কান্না অনেকদিন ধ্বনিত হয়েছে খিলপাটনি গাঁয়ে। হিন্দু আর ক'মর ছিল খিলপাটনিতে! বেশির ভাগই মুসলমান। তাদের প্রায় ঘরেই মেয়েরা তালাক পেয়ে ফিরে আসে। কখনও আবার তাদের বিয়ে হয়। কখনও হয় না। অনেক সময় সন্তান সমেত ফেরত আসে তারা। রাধিকা দেখেছে, হিন্দু মেয়েরা একবার সন্তান দিতে পারলে বেশ খিটু হয়ে যায় স্বস্তরবাড়িতে। সম্পর্ক যতই কোনালে-কুড়ুলে হোক, যতই অবহেলার হোক, স্বস্তরবাড়ির স্থান পাকা। বৃদ্ধি সন্তানের মাধ্যমে তারা দৃঢ় শেকড় চারিয়ে দেয় ওই পরিবারে। মুসলমান মেয়ের সেই জোর নেই। কোথাও স্থিতি নেই তাদের। ইঠাৎ হাসি পায় তার। নিজের কতটুকু স্থিতি সে দেখতে পাচ্ছে এখন? হিন্দু মেয়ে সে, সন্তানবতী এবং সন্তানসম্ভবা— এমতাবস্থায় কার্তিক অন্য মহিলা নিয়ে সহবাস করছে। খোঁজ রাখছে না রাধিকা আর পলাশ মরল না বাঁচল। পাড়া-প্রতিবেশী তার খবর বুঁজে আনছে। দয়াভিক্ষা চাইবার মতো বা প্রাণভিক্ষা চাইবার মতো তারা এনে দিচ্ছে রাধিকার রাহা খরচ। সুতরাং তার ও শাকিনার স্থিতিহীনতার কোনও তফাত নেই। সে অনিবার্য পরিণামে ভাবে— সে যদি শমসেরের বউ হত, এ অবস্থায় শমসের কি তাকে ছেড়ে চলে যেত? তালাক দিত তাকে?

না না। দিত না। শমসের কখনও এরকম করতে পারত না। সে অমারকম ছিল। সে তো ভালবাসত রাধিকাকে। অতল গভীরতায় ভালবাসত। তেমন ভালবাসা আর খেঁড়ই দেখে কি রাধিকাকে? কোনওদিন? ভালবাসা। ভালবাসা। ভালবাসা। ভালবাসা। ভালবাসার মূল কথা এটাই। এটি থাকলে হিন্দু বলে। আর মুসলমান, বৌদ্ধ বলে, জৈন বলে। আর খ্রিস্টান— সে কোনও সংসারই ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে পৃথিবী অলঙ্কৃত করে। ভালবাসা না থাকলে সব শেষ। সবই আত্মগী ও ভঙ্গুর।

কার্তিকের তো ভালবাসা নেই। মায়া নেই। শুধু শরীরকে দলে পিঠে আশ্রয় নিয়ে সে জ্বলন্ত অঙ্গুর হয়ে যায়। সে-ই এ সব পারে। যে কখনও দুয়ার তৈলে ঘরে এল না সে কেমন করে বুঝবে আগুনের কী টান। কার্তিক রাধিকার বাইরেটাই দেখল শুধু। শরীরটাই দেখল। কিন্তু চিনল বলা যাবে না। কার্তিকের হাতের তলায় রাধিকা কোনওদিন জাগেনি যেমন আগুনের কথা ছিল তার বসন্ত-শরীরের। তার মনে আছে, খিলপাটনি গায়ে তাদের গাভীগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল যাতে একটি গাভীন হয়ে দুধ বন্ধ করলে অন্যটির বাচ্চা দিয়ে দুধেল হওয়ার সময় আসত। মনে মনে তুলনা করে ফেলে রাধিকা। কার্তিকের হিসেবটাও অনেকটা সেইরকম। হঠাৎই আহত অপমানে দম্বে যায় সে। নিজেকে ওই গোয়ালের গাভীগুলির চেয়েও অসহায় ও নিঃশ্রোয়জন লাগে। এই ছেলে নিয়ে, গর্ভস্থ সন্তান নিয়ে কীভাবে দিন চলবে তার? শেকালির মায়ের মতোই দুঃখী হয় সে। নিজের পোড়াকপালকে কক্ষণ করে। হাতের পঞ্চাশ টাকা পেশণ করে অনেকক্ষণ। দোমডায়। অসহ্য গরমে হাঁস-ফাঁস করে। ভারী শরীর ছিগুণ গরম হয়ে যায়। অসহায়তায়, অপমানে, যন্ত্রণায় পাগল-পাগল লাগে রাধিকার। ঘরের ছোট জানালাটি দিয়ে বাইরে উঁকি মারে সে। অঙ্গুরের জমে আছে পুকুরে। ওখানে অপদেবতার বাস। সে মনে মনে অপদেবতার কাছে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুকামনা করে। সে যদি ভূমিষ্ট হয়, আর রাধিকা তাকে খাওয়াতে ও প্রতিপালন করতে না পারে, তবে সে এমনিতাই মারা যাবে। সেই মৃত্যু দেখার চেয়ে সে আগেই মরতে চায়। অসম্ভব অসহ্যে ভাবনা তার চোখে জল আসে। পলাতকের মতো খিলপাটনি গায়ে ফিরতে চায় সে। শমসেরের কাছে ফিরতে চায়। স্বপ্ন দেখে— শমসেরের হাত ধরে পালিয়ে যাচ্ছে। কোথায়? জানে না কেউ। শমসের বলেছে— ‘তরে বিয়া করুম রাধু।’ শমসের ঢাকায় চলে যাচ্ছে। রাধিকা কাঁদছে।

তখন, সারা আকাশ, শমসেরময় হয়ে আছে রাধিকার। সে শমসেরে জাগে, শমসেরে ঘুমোয়। শমসেরে মরে আবার বাঁচে শমসেরের জন্যই। সে যখন গোয়াল পরিকার করছে, মনে হচ্ছে, ওই তো ওই কোণে শমসের। সে রূপসীর পাড়ে যাচ্ছে, জামকলতলায় বসছে, যেন এই পায়ে শব্দ পেল শমসের আসছে। আকাশ ভেঙে বর্ষা নামল। রূপসীর গর্ভ উপচায়। উঠোনে জল। জমিতে জল। পথে জল। পানি, পানি, পানি— সর্বত্র। জলে জলময় ভুবন। শমসেরদা, তুমি কেমন করে এই পানিপথ পেরিয়ে আসবে? শমসেরদা, আমার কথা ভাবো না তুমি? শমসেরদা, শমসেরদা, ও শমসেরদা—

যে দিন হইতে            তোমার সহিতে  
পহিলে হয়েছে দেখা।  
সে সব বচন            রয়েছে ঘোষণ  
যেমত শেলেরই রেখা ॥  
শপথ করিয়া            পীরিত করিলে  
তাহা বা রাখিলে কই।  
কে আছে ব্যথিত            কাহারে কহিব  
যে দুখে আমরা রই ॥

রাধিকা দিব্যরাত্রি শমসেরকে ভাবছে আর চোখের সামনে দেখছে শমসেরকে। পরমেশ্বর  
মধ্যে দেখছে। সকালবেলায় স্নান করছে পরমেশ্বর। রাধিকা দেখছে। খোলা গায়ে জল পড়ছে।  
আলো ঠিকরোচ্ছে। প্রতিটি নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশিগুলি ফুলে উঠছে। রাধিকা ভাবছে—

বিস্তারি পাখাশে কেবা রতন কসাইল রে  
এমতি লাগয়ে বৃকের শোভা।  
দাম-কুসুমে কেবা সুবমা করেছে রে  
এমতি তনুর দেখি আভা ॥  
আদলি উপরে কেবা কদলী রোপিল রে  
ঐছন দেখি উরুযুগ।

পরমেশ্বর কী সুন্দর! কিন্তু পরমেশ্বর কালো নয়। তাকে দেখে নীলকণ্ঠ পাখির কথা মনে পড়ে  
না। সে বুদ্ধি শ্রীদৌরাস্বরূপ এখন। তার সাদা বৃকে পরিণত থানকুনি পাতার মতো রোম। নিপুণ  
হাতে বৃকে দু'খানি চুনি বসিয়ে দিয়েছে কেউ। গলা উঁচু করে জল ঢালছে সে গায়ে, কণ্ঠ জিনিয়া  
কেবা কণ্ঠ বনাইল রে— পরমেশ্বর ভিজছে। রাধিকাও ভিজছে মনে মনে। ভিজে একসা হয়ে  
শব্দের মতো কণ্ঠে ঠোট ভুবিয়ে দিচ্ছে। ওই কণ্ঠে ওই উঁচু হয়ে থাকা হাত পান করার কথা  
ভাবতে ভাবতে হাতুড়ি দিয়ে কয়লা ভাঙছে রাধিকা। ১ং ১ং ১ং। এ সব কাজে কষ্ট হয় এখন।  
ভারী শরীর। পেটের মধ্যে সম্ভান বলবল করে। পেটের বাইরে সমস্ত অপদেবতার কুট-কচালি।  
মনের মধ্যে টল টল করে স্বপ্ন, স্মৃতি এবং স্বপ্ন মাথানো স্মৃতিকোরক। আজ রাধিকার ভাল  
লাগছে। কষ্ট করতে ভাল লাগছে। অনেকদিন পরে আজ কারও কাছে কিছু চাইতে হবে না।  
কক্কার দান, দয়ার খাবার খেতে হবে না। উনুনে আঁচ দিয়ে বাটি হাতে ঘরে ঘরে যায় রাধিকা।  
চাল শোধ করে। কার্তিকের অবহেলা ও অপমান থেকে সম্ভান সংগ্রহ করে সম্ভান নিয়ে বাঁচতে  
চায়। বাজার করে দিয়ে গেছে শামল। চাল, ডাল, তেল, নুন, চিড়ে, চিনি পুইডাটা, কুমড়া,  
আলু আর বিস্তে। আজ পুইডাটার চাচ্ছি আর ভাত। শেফালির মাকে পুইডাটা রান্না করে দেবে  
রাধিকা। তার মনে হচ্ছে একটু কচো চিংড়ি যদি আনাত। একটি দিন সুস্থান রান্না করে বাতিভর্তি  
পুইচাচ্ছি দিত শেফালির মাকে। ভাত না। ডাল না। তার জেহ, কক্কা, দয়া ও প্রতিদিনের  
ভালবাসার ভাতের বিনিময়ে রাধিকা শুধু এটুকুই দেবার সংকল্পে অসীম তৃপ্তি পাচ্ছে এখন।  
আজ হাঁড়িতে বেশি করে চাল দেবে। পলাশের জন্য একটা আলুসেদ্ধ। তারপর? এই চাল  
ফুরিয়ে যাবে একদিন। আলু ফুরোবে। পুইডাটা, বিস্তে, কুমড়ার পরিবর্তে সবজির কুড়িতে  
পড়ে থাকবে কয়েকটি শুকনো লম্বা। রাধিকা যত্ন করে সেগুলির বেটা ছাড়িয়ে রেখেছে। তাই  
সহজে পচন ধরবে না। কিন্তু সবই বে ফুরিয়ে যাবে— তার উদ্বেগ সে কী করে অস্বীকার  
করবে। যেমন মুহু উখাদ যৌরন থেকে দ্রুত ফুরিয়ে যায় আয়ু এবং পৌছে দেয় অনিশ্চয়  
অনাকাঙ্ক্ষিতের বর্ধকো। তেমনই, সাময়িক সম্পন্নতার ভাঁড়ার থেকে চাল শোধ করে এসে  
রাধিকা আবার কয়লা ভাঙতে বসল। অন্যমনস্কতায় নখে হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। বাথায় কাতর  
হল সে। উঃ শব্দ হল মুখে। একটি হাত দিয়ে অন্য হাত চেপে ধরল। পরমেশ্বর গা মুছে সূর্যস্তব  
করছিল। প্রণাম শেষ করে বলল, কী হয়েছে বউদি?

—হাতে বাড়ি দিসি।

—আহা! জল দাও। জল দাও বউদি। রক্ত পড়ছে? রাধিকা হাত মেলে ধরল। না। রক্ত  
পড়ছে না। তবে টন টন করছে। জলের ধারা দেবে বলে কলের কাছে এগিয়ে এল সে। পরমেশ্বর  
পাশে দাঁড়াল। বড় পেছল জায়গাটা। রাধিকার পক্ষে বিপজ্জনক। সে বলল, সাবধানে বউদি।

সে কিছু না করে চুপ আছে। খেমে আছে। ফেন রাধিকা যত্নে হাত ফুলে কিনা, যথায়  
আরাম পেল কিনা দেখার দায়িত্ব তার। এমনকী রাধিকা ঠিকমতো উঠান পেরুল কিনা সে

দেখার দায়ও তার ওপর বর্তায়। রাধিকা আজল থেকে পরমেশকে মেয়েছে ইত্যাদি, কতদিন। অবশ্য এখন, পরমেশ তার পাশে, সে লজ্জায় গুটিয়ে যাচ্ছে। পরমেশের মিকে তাকাতে পারছে না। কিন্তু তাকাতে ইচ্ছে করছে। ইস! তার আঙুলটা কেন ঝেঁচে গেল না! কেন নরদর খায়। রক্ত বইল না। পরমেশ হয়তো ছুটে আসত তাহলে। একটু ছুঁত রাধিকাকে। রাধিকার হাত নিজের হাতে ধরে থাকত।

রাধিকা মুখ তুলতে পারছে না। রাধিকা যেতেও পারছে না। তার ইচ্ছে করছে পরমেশের ওই চেয়ে থাকার সামনে অনন্তকাল স্থির থাকতে। যেন-বা, সত্যসাক্ষদের পদ্ম-পাঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেমে এসেছে সেই কবেকার আবুল ইছার ঘনি—

কানু সে জীবন      জাতি প্রাণ ধন  
এ দুটি নয়ান-তার।  
হিয়ার মাঝারে      পরাণ-পুতলি  
নিমিখে নিমিখ হারা ॥  
তোরা কুলবতী      ভজ নিজপতি  
যার মনে যেনা লয়।  
ভাবিয়া দেখিলাম      শ্যাম বধু বিনে  
আর কেহ মোর নয় ॥

এই অংশ পড়তে পড়তে সত্যসাক্ষন ভাবাবিষ্ট হয়ে যেত। তার চোখে জল আসত। আহা! কেমন সব ভুলে, সব ভুঙ্ধ করে, ভয়-ভাবনা জলাঞ্জলি দিবে ভালবেসেছিল মেয়েটা। রাধা— সে তো স্বয়ং লক্ষ্মী। কৃষ্ণ— সে তো বিষ্ণু স্বয়ং। নারায়ণ। নারায়ণের পাশে লক্ষ্মীর বাঁধা জায়গা। রাধিকা ভাবত, ও, রাধার বেলায় সব মাপ। মোটেই ভাল চরিত্রের মেয়ে নয় সে। স্বামী থাকতে অনজনে পিরিতি করে। তারে কামনে ভাল কই। কিছু স্বীকার করতেই হবে। সাহস ছিল শ্রীরাধার। এসব ভাবতে ভাবতে রাধিকার চোখে আসলে অসামান্য হয়ে উঠেছে শ্রীরাধা। কী সাহস! কী আশ্চর্য প্রত্যয়! সরাসরি বলছে— আমি ভালবাসি ওকে। আর কিছু নয়। লোকভয় নেই। নিন্দার পরোয়া নেই। কারওকে অস্বীকার করেনি। বলছে— হ্যাঁ, স্বামী আছেন আমার। স্বস্তরকুলে বাস আমার। নন্দিনী গ্রহরারত। তবু আমি কালা বিনা অন্ধ। কানু বিনা মৃত। কৃষ্ণ বিনা আমার জীবন যেন-বা অর্থহীন। তোমরা কুল মানো। নিচম মানো। শাসন মানো। আমি মানব না কিছুই। যে শাস্তিই আমাকে দাও— আমার ওকে চাই। ওকে। শ্রীরাধাকে ভালবেসে ফেলেছে রাধিকা। কী সাহস। কী প্রত্যয়। কই সে তো পারছে না। কাকির ভয়ে সিটিয়ে আছে সর্বক্ষণ। অথচ সে তো চায় শমসেরের জন্য কুল ছাড়তে, গ্রাম ছাড়তে, এমনকী ধর্ম ছাড়তেও। কিছু বলতে পারল কই!

রাধিকা আবার ভুবেছে। ফিলপটনি গাঁয়ের স্মৃতিতে ভুবেছে। সে-গাঁয়ের উঠানে জল ভরে গেছে। সালতিগুলি বাঁধা আছে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে। পেয়ারা গাছের সঙ্গে। সত্যসাক্ষনকে বেতে দিয়েছে কাকি। যেতে বসিয়ে বলছে— পোলা দ্যাছেন। মাইয়া ডাগর হইসে। অর ভাব-চলন আমার মনে ভাল লয় না। কুন্দিন কী কইরা বসব। মুখ দাখাইতে পারুম না কারুরে।

সত্যসাক্ষন বিন্ময়ে তাকিয়ে আছে। কী করেছে রাধিকা। খারাপ কিছু? ওকে যে বোধবার কেউ নেই। মা সব বোঝাবুঝির বাইরে। কাকি শ্বেহ জানে না। শাসন করে শুধু। কাকি উদাসীন। নিস্পৃহ। মাসি-পিসি নেই। সত্যসাক্ষন নিজে ঘুরে বেড়ায় আপনভোলা। চাল-চলন ঠিক না থাকলে পাড়া-পড়শি নিন্দে-মন্দ করবে। নালিশ-সমালোচনা করবে। কাকি বলছে, শমসের ছোকরাভা অর আগে-পিসে ঘুর ঘুর করে। কী করতেন্যাসে কাডা জানে।

রাধিকার বুক দূর দূর করছে। কাকি বাবাকে খেতে দিয়ে এইসব বলছে। রূপসীর ওপর দিয়ে কোনও বড় নৌকা গেল বুঝি। জল দুলছে। ছপ ছপ শব্দ হচ্ছে। রাধিকা পিছনের ব্যায়ামার আড়ি পেতেছে। তার খুঁড়তুতো ছোট্টভাই শব্দর তাকে ডাকছে, দিদি। অই দিদি। শমসের দাদায় ভরে যাইতে কয়।

নিজের অগাধে মুখে আঙুল উঠে আসে রাধিকার, চুপ। চুপ য্যা। কাকি শব্দর।

শব্দর হাসছে, হি হি হি। শমসেরদায় তরে ভাঙা মন্দিরে যাইতে কইসে। বিকাসে চাইরটার সময়। দিদি। গাছে দুইখান প্যাঁয়রা ডাসা হইসে। আনায়ে গাইডা-সে।

কী কথা হয়ে গেল কাকিতে-বাবাতে। সব কথা খসে খসে পালিয়ে যাচ্ছে। শব্দরের বকবকানিতে শোনা যাচ্ছে না। সে বিরক্ত হয়ে বলছে, হা। দিনু অসে। অখননা।

—না। আমারে অখনে দিত হইব।

—আঃ। জ্বালইয়া মারে দ্যাখো।

—অ। দিবি না? অখন দিবি না? দাড়া। মাংরে কইয়া দিমু। সব কইয়া দিমু।

সম্মত হচ্ছে রাধিকা। কী বলে দেবে ও? মন্দিরতলায় যাবার কথা? আড়ি পেতে কথা শোনার খবর? সে তাড়াতাড়ি শব্দরকে কাছে টানছে। মিষ্টি করে বলছে, রাগ করস কান? আমার মাথা থা। দিমু কইসি না?

শব্দরের চোখ ছল ছল করে, হা। তুই কইস পরে দিবি। দাদায় দেইখা ফালাইল আমার খাওনের লিগা থুইব?

রাধিকা বিপদে পড়ে। এই ভেজা গাছ— চড়ার উপায় নেই। এই বর্ষায় কোথাও একটা ডাং পাবার উপায় নেই। সে বলে, কী দিয়া পাড়ুম ক'।

—চালে উঠ।

—উইঠা হাত পামু?

—হা। পাবি। নাইলে আমারে চালে তুইল্যা দে। আমি পাইড়া নিমু।

রাধিকা সম্মত হয় না। এই ভেজা চালে শব্দরকে তোলা উচিত হবে না। সে বলে, হা। তব আর উইঠ্যা কম নাই। আমিই উঠতেয়াসি। দাখা।

শব্দর রাধিকার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পেয়ারা দেখাচ্ছে। এই গাছটা অদ্ভুত। সারা বছর ফল দেয়। কাকড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেওয়াল বেঁধে। তার ডালপালা সব চালে বিছিয়ে দিয়েছে। রাধিকার নানা ভয়ে বুক সিরসির করছে। সে আবার জিজ্ঞেস করছে, আর কী কইল শমসেরদায়?

—কইল, তর দিদিরে ক গিয়া চাইরটায় মন্দিরতলায় আইব। আমি কই— কুন মন্দির? শমসের দাদায় কয় ভাঙা মন্দিরে ক'।

—হা। আর কী কইল?

—আমারে লঞ্জনছ দিয়া কইল, ঢাকার থিকা আনছি। খাইয়া দাখ।

—খাইলি?

—হা। কী মিষ্টি যে লাগে। তরেও দিবে কইসে। যাইস।

রাধিকার হাসি পাচ্ছে। ভয়ও করছে। শমসের কেন শব্দরকে দিয়ে ডাকতে গেল? শব্দর যদি বলে দেয় কাকিকে? সে আর পারছে না। যা হবার হবে। আঁচলটা শক্ত করে বেঁধে নিল সে কোমরে। একটা পা জানালায়, একটা খুঁটিতে। চালের কাঠ ধরে সে শরীরটা শূন্যে ভাসিয়ে দিল। শুধু হাতে ভর দিয়ে চালে উঠছে। হাত কাঁপছে। ভেজা চাল। ভেজা কাঠ। বাঁ হাটু ভাঁজ করে চালে রাখছে রাধিকা। ডান পাও টেনে নিল। এখন চালের ওপর সে উবু। শিকার পর্যবেক্ষণরত কেডালীর ভঙ্গি। টলে টলে উঠে দাঁড়াচ্ছে এখন। দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে ভারসাম্য বজায় রাখছে। পেয়ারা গাছের ডালে খাড়া লাগল। জল পড়ছে। রাধিকা ভিজ্জে গেল। কোথায় পেয়ারা?

কোথায়? হ্যাঁ। চোখ আছে বটে ছেলেটার। দু'টি ডাঁসা পেয়ারা ডালপাতার আঁড়ালে বুলছে। পাতাসুদ্ধ ছিড়ে নিল সে। কী সুন্দর গোল মসৃণ পেয়ারা! একটি খেতে লোভ হচ্ছে তার। বলছে, আমি অ্যাকখান লই?

—না, না-আ-আ। শঙ্কর উবু হয়ে বসে পড়েছে। গলা তুলে আপত্তি করছে। না-আ-আ। আমি দিমু না।

রাধিকা তবু বলছে, অ্যাকখান দিবি না? শঙ্কর?

—না। দিমু না। আমি দ্যাখসি। অই দুইখানৈ আমার। দে আমারে দে। অ মা...সে বুঝি আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে চায়। রাধিকা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে চালে উঠেছে দেখলে কাকি চিল্লাবে। তার আর দু'টি ভাই সালতি নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছে। সেও যেতে চেয়েছিল। গিয়েওছে গত বছরে। কিন্তু এ বার কাকির মানা। ধিসি হইছস। অখন ড্যাং ড্যাং কইরা মাছ ধরতে যাওন। সে অতএব শঙ্করকে থামাতে চায়, লমু না। লইতাছি না। তর প্যায়রা তুই খা। ধর।

সে শঙ্করের দিকে পেয়ারা ছুঁড়ে দিল। শঙ্কর লুফে নিল ঠিকঠাক। হঠাৎ কী মনে হল তার, বলল, আইছা। অ্যাকখান তুই খা।

—না। লাগব না।

কাকির চিংকার শোনা গেল তখন। শঙ্কু— অ শঙ্কু—!

যাইতাছি—। শঙ্কর ছুট লাগাল। পেয়ারার ডালপালা থেকে মুখ তুলল রাধিকা। আঃ! চোখ জুড়িয়ে গেল তার। জল জল জল। দিগন্তবিস্তৃত পানি। ঘরবাড়ি জেগে আছে শুধু। রূপসীর পাড় দিয়ে দূরে দূরে বড় বড় বাঁশ পোঁতা। নদীর সীমাচিহ্ন। নইলে নদীর সঙ্গে পারের কোনও তফাত নেই এখন। এইসব বাড়িঘর যেন জলেই নির্মিত হয়েছিল কোনওদিন। আকাশে মেঘ আছে। কিন্তু ভারী বর্ষণ হবার মতো নয়। মেঘের ছায়ায় জলকে যেন শান্ত গভীর আর বিষম লাগছে। কী এক দুঃখ যেন ছড়িয়ে আছে চারপাশে। রাধিকা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। জন্মাবধি প্রতি বর্ষায়ই এ দৃশ্য সে দেখে আসছে। কিন্তু এ যেন প্রথম দেখা। দূরে জামরুল গাছ ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে জেগে আছে। তার তলায় বিষম শ্রীরাধাকে দেখতে পাচ্ছে সে। কৃষ্ণ আসেনি বলে একা নিরানন্দ হয়ে আছে বুঝি। শমসেরদা তুমি আমারে আইজ মন্দিরতলায় ডাকলা ক্যান? এই বর্ষায় এই জলে তুমি আইলা কেমন কইরা? শমসের এসেছে। শমসের ডেকেছে। রাধিকার আনন্দে ছুটে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কোনও আনন্দ হচ্ছে না কেন তার? নাকি কাকির ওইসব কথায় অজানিত ভবিষ্যের সম্ভাবনায় তার মন ভার হয়ে গেছে! তার মনে পড়ে

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা

কেমনে আইল বাটে।

আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া

দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

সই, কি আর বলিব তোরে।

বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া

আসিয়া মিলিল মোরে ॥

শমসেরদা। আইজ তুমি আমারে মন্দিরতলায় যাইতে কইলা ক্যান?

সত্যবন্ধু ফিরছে। বাঁশের লগি ঠেলেঠেলে এগিয়ে আসছে সালতি নিয়ে। ডাকছে— রাধু। অ রাধু। দড়িখান কই? অ রাধু—। রাধিকা নামছে। দ্রুত লাফ মারতে চাইছে। না, লাফানো যাবে না।



শরীরটা খুলিয়ে দিয়ে জানালায় পা রাখল সে। শরীর মুচড়েছে। পেরেকের লেখে শাড়িটা ছিঁড়ে গেল বানিক। খোঁপা খুলে গেল। সে ছুটছে। কাকা ডাকছে। সে ছুটছে। সালতি বাধবার দড়িটা কোথায়। কাকি গাভীর মুখে দেখছে রাধিকাকে। জেখ পাকাচ্ছে।

—চালে উঠসিলি?

—হ।

রাধিকা দড়ি এগিয়ে দিয়েছে। সালতি বাঁধছে সত্যাবদু।

— তরে কি কইসি। খিঙ্গি হইছস। অজ্ঞায়গায় কুজায়গায় যাকিনা।

রাধিকা ঝাঝিয়ে উঠছে।

—কুনখানে গেসি? কুনখানে যাইতে দাখসে আমারে? সন্ধান খিরা খালি দুখ নাতা দাত। কাকির চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে। নাকের পাটা ফুলছে। দাঁতে দাঁত পিষছে সে। হিস হিস করছে— কী-ই। আমার বাবি। আমার পরবি। আমায়েই তাইরখান কতা কবি। হাতছাপাইন্যা শত্রু সব। তগো লিগা গতর সাইরা ফাললাম আর তরা—। কহ না

মাইয়ার উঠে তুন

মায় পায় না মন

পোলার উঠে দাড়ি

ঘুরে বাড়ি বাড়ি

তোমার হইল ওই দশা। খাড়াও। তোমার কুড়কুড়ানি বাইর করম।

কুড়কুড়ানি। কাকির প্রিয় শব্দ এটা। রাগ হলেই বলবে, কুড়কুড়ায়? কী কাম করস সন্ধান খিকা? আটি বানছ?

ঘরে মা তখন দুলে দুলে কাঁদছে। আজ আবার মা'র অকর্মণ্যতা এসেছে। কাকির মেজাজ চড়ে আছে তাই। এই জলে মা অকর্মণ্য বসে থাকলে কাকির রাগ হওয়ারই কথা। রাধিকা মা'র দিকে দেখল। কী দুঃখিনী মুখ। রাধিকার মনে হল, কৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, চিরদিনের জন্য, এমনই কি হয়ে যায়নি তখন রাধিকা? এমনই ক্রিষ্ট? বিধুর? ক্রন্দসী? অকর্মণ্য?

ওহে বড়াই তাহার বিখম ছারা।

কিছু নাহি খায়                      সে তেজয়ে কার  
পাঁজ হৈয়াছে সারা ॥

শুনি কি না শুনি                      যেন সক বাণী  
যেন কথিরের ধারা।

কনক বদন                              হৈয়াছে মলিন  
চকিত লোচন তার ॥

শ্রবণ নয়ন                              করে অনুক্ষণ  
যেনক শায়ণ ধার।

নেতের বসনে                          মুহিবে কেমনে  
এত বল আছে কার ॥

মন্দিরতলায় ঝুপসি বটগাছের নীচে সালতি ভিড়িয়েছে দু'জনে। রাধিকা বলছে, আমায়ে মন্দিরতলায় ডাকলা কান?

—তর লগে কথা কমু রাধু। তরে দেখুম।

ক্রমশ মেঘ নেমে আসছে। অন্ধকার ক্রমশ ঢুকে পড়ছে বটগাছের তলায়। সালতির নীচে পাক খাচ্ছে স্বাধীন সাবলীল মাছ। মন্দিরের শিবলিঙ্গ আগলাতে আগলাতে ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে বেলপাতার গুচ্ছ। আর রাধিকা, যত সময় সে শমসেরের জন্য প্রতীক্ষা করেছে, যত সময় সে

শমসেরকে চেয়েছে, বত সময় শমসেরের জন্য মিথ্যাচার করেছে সেইসব সময়ের সমষ্টিগত অভিঘাতে, সেইসব না পাওয়ার মুহূর্তের ফোভে ঘরশায়, বুড়ি বা কিছু আভিমান ভূমিতে চোখে ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে। তার বকের তলায় কোনও প্রাণ যদি থাকে, কোনও জীব যদি থাকে তার সে যেন দেখতে পাচ্ছে উপস্থানে রূপসীর সঙ্গে, এই মুহূর্তে রাধিকার কোনও পার্থক্য নেই। তবু আপাতভাবে তাকে শান্ত দেখায়। নিশ্চয়ও কিছুটা। শমসেরের প্রতি, এখন নিরাসক্তি কুটিয়ে তুলতে, রাধিকা থেকে তারুণ্যের উন্মোচনে বোঁছনো ওই মোহে সম্পূর্ণভাবে সফল। তার সালতি দুলছে। মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। বটের বুড়ি ধরে তারা দু'জন মো-আর-সাহাবি সামলাচ্ছে। রাধিকা দেখছে। শমসের, কেমন অনবকম দেখায় তাকে। ঢাকায় থিয়ে, কলেজের ভর্তি হয়ে তাকে কেমন পরিপাটি লাগছে। তার হালের লাড়ি আরও গাঢ়। আরও পৌকসের। তার পাঞ্জরের গড়ন বিকশিত হচ্ছে। শমসের, সাঁপুকে বেহন বিন দ্বারা মাপিনীকে বশীভূত রাখে, মুগ্ধ রাখে, তেমনি যে-বাশি এখনও বাজেনি, তারই দ্বারা রাধিকাকে বশীভূত রাখছে। আর রাধিকা তাকিয়ে আছে। শমসেরকে দেখছে। শমসের তাকিয়ে আছে। রাধিকার উড়ে চুল, নিপুণ ঠোঁট আর চাপা নাকের সমন্বয়ে চোখ দু'টি দেখছে। রাধিকা তুই কেন কাজল দিসনি চোখে? শীর্ণ কণ্ঠ তার নির্যাতন। রাধিকা কেন এক ছড়া হার, হয়তো গিলটিরই হল, হয়তো পুতির, গলায় দিসনি তুই! শীর্ণ, রক্ত হাত দু'খানি তার, ক'খানি কাচের চুড়ি কিনে দেয়নি কেউ তোকে? হলুদ ব্লাউজে কাঁধ ঢেকে আছে। লাভণ্য এত। সৌন্দর্য এত! শমসের দেখছে। রাধিকা, থেমে থাক। মুহূর্তের তল থেকে বলল—ঢাকায় গ্যালা, কইয়া গ্যালা না কয়ন?

জল পড়ছে। বট পাতার থেকে বরে পড়ছে। না। ওই আবার বৃষ্টি নামল।

—রাধিকা, তুই কি চেয়েছিলিস্ আমাকে? খুঁজেছিলিস্?

—হ্যাঁ। খুঁজেছিলাম।

—কোথায়?

—রূপসীর পারে।

—আর কোথায়?

—জামরুল গাছের তলায়।

—আর কোথায়?

—তোমাদের আঁতিনায়।

—আর কোথায়?

—অন্ধকারে। একলা। স্বপ্নে।

—আর কোথায়? বকের ভেতর? সেখানে খুঁজিসনি? আমি যেমন তোর গন্ধ পাই। রাধিকা।

তুই তেমন গন্ধ পাস না আমার?

বৃষ্টি পড়ছে। দু'-এক ফোঁটা। এবার চড়বড় করে। এবার জোর ধারায়। রাধিকা ছটফট করছে। সে যদি ভিজে যায়, ভিজে বাড়ি ফেরে, কী হবে? সে শমসেরকে আহ্বান করে, চল, সালতি বাইক্কা মন্দিরে যাই।

শমসেরের কানে বাজে— চল যাই... চল যাই... যেন-বা রাধিকা তাকে জীবনের মহাযাত্রায় যাবার ডাক দিচ্ছে। যেন, এই বর্ষন, এই টই-টবুর পানি, এই রূপসি বটতলা আর ভাঙা মন্দির— মহাবিশ্ব ও মহাকালের মতোই অমোঘ ও পূর্বনির্দিষ্ট। শমসের ও রাধিকার জীবনে এর বাইরে আর কিছু ঘটার কোনও উপায় নেই। এক নিরুপায় উপলব্ধি শমসেরকে আচ্ছন্ন করে। সেই নিরুপায় অবস্থা এক নারীর প্রতি এক পুজয়ের উন্মাদ অবস্থায়। তান— যা থেকে— শমসের টের পায় সে আর নিজেকে পৃথক স্বীকার করতে পারবে না। রাধিকা বাদ দিয়ে সে এক অসম্ভব। বকের ভেতরকার নিটোল মহামমুরী মতো।

ফের রাধিকার স্বর ছিটকোয়— চুপ কইর কী দ্যাছো? অ শমসেরদা। আস, আস।

আস-অ-অ-অ—আমু-উ-উ। আইতামি—ই-ই-ই।

বুকের ভেতর থেকে এই স্বীকৃতি ঠেলে উঠতে চায়। কিন্তু বাইরে দ্বিধা আসে।

শমসের ইতস্তত করে, যামু না। আমি যামু না।

—ক্যান? আইসো। ভিজ্যা যাইবা।

মন্দিরের গায়ে সালতি ভিড়িয়ে বারান্দায় উঠে পড়ে রাধিকা। মন্দিরের খুঁটির সঙ্গে সালতি বেঁধে নেয়।

—আস। আইস্যা পড়ো।

তাড়া দেয় সে। শমসের ভিজে যাচ্ছে। সেও লাফিয়ে উঠে আসছে মন্দিরে। দড়ি বাঁধছে রাধিকার দড়ির সঙ্গে। আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের ঝাড়। মেঘ ডাকছে, শমসের ভাবছে। এত বেলায় এখানে রাধিকাকে আনা ঠিক হয়নি। এই বৃষ্টি কখন থামবে কে জানে! রাধিকা ভাবছে শঙ্কর যদি বলে দেয়? যদি তার ফেরার দেরি দেখে কাকি চোঁচামেচি করে আর শঙ্কর বলে দেয়—দিদি মন্দিরতলায় আছে। শমসেরদার সঙ্গে আছে!

প্রবল হাওয়া উঠছে। বৃষ্টির ছাঁট এসে ভরিয়ে দিচ্ছে মন্দিরের বারান্দা। হাওয়ায় শিবলিঙ্গের চারপাশের বেলপাতা ছড়িয়ে যাচ্ছে। রাধিকার শাড়ি উড়ছে। শমসের রাধিকার হাত ধরছে। আঃ। রাধিকা ডুরতে শুরু করল। কাকি নেই। শঙ্কর নেই। এই বাদলবাতাস আর রাধিকা। এই বৃষ্টির শব্দ আর শমসের। রাধিকা শমসেরের হাত আঁকড়ে ধরছে। শমসের ভুলে যাচ্ছে সে কোথায়, ভুলে যাচ্ছে এই মন্দিরে তার আসার কথা নয়। তার জ্বর আসছে। সে তার ডান হাত তুলে দিচ্ছে রাধিকার কাঁধে। রাধিকা শক্ত। আড়ষ্ট। তার মুখ শমসেরের বুকের কাছে। তার মুখ এমন জায়গায় যার একটু নীচে পাথর কঁদে বসানো আছে দু'খানি আশ্চর্য চুনীরত্ন। সে শমসেরের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে। কেমন এ গন্ধ? ধূতরো ফুলের মতো বুঝি। না না, জারুল ফুলের মতো। না। তার গন্ধ বুঝি-বা কোনও আশ্চর্য স্বপ্নের। এখন আর কোনও ব্যবধান নেই। শমসেরের শরীরের সঙ্গে মিশে আছে রাধিকা। এত শান্তি! এত শান্তি! তার ঘুম পাচ্ছে। শমসেরের সারা শরীরে রক্ত চলাচলে পাগলা ঘোড়ার খুরের শব্দ। সে, তবু, বেহিসেবী হচ্ছে না, ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে আনছে। রাধিকার ঘাড়ের কাছে ছোট চূর্ণ চুলের গুচ্ছে ঠোট ডুবিয়ে দিচ্ছে। আঃ। রাধিকার সারা শরীর সিরসির করছে। সে বুঝি তা প্রতিহত করতে চায়। সে শমসেরকে শক্ত করে ধরছে। সারা শরীর টানটান করছে। তার স্তন তীক্ষ্ণ হয়ে ঢুকে যাচ্ছে শমসেরের পাজরে। সে বলছে—ছাড়ো। ছাইড়া দ্যাও। শমসের তার দাড়ি ঘষে দিচ্ছে রাধিকার গালে। ঠোট নেমে আসছে রাধিকার শুকনো উদ্বিগ্ন ঠোটে। আদিম স্বপ্নরা জেগে উঠছে তখন। শমসের নিজের ভেতরকার পুরুষ সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে। তার পুরুষাঙ্গে অদম্য রক্তচলাচল। রাধিকাকে বুকে সাপটে, সমস্ত সুখ, সমস্ত আনন্দ উপলব্ধি করতে করতে অন্ধকারে ক্রমশ ডুবে যেতে থাকা শিবলিঙ্গের দিকে চোখ রেখে শমসের, এই প্রথম লিঙ্গপূজা সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা তৈরি করছে। সমস্ত প্রতীকের আড়ালে, আয়োজনের আড়ালে, অপার আনন্দের উৎসার লুকিয়ে থাকা মানবদেহকে মনে মনে, শ্রদ্ধা করছে শমসের। উপলব্ধিকে শ্রদ্ধা করছে। প্রেমকে শ্রদ্ধা করছে। অন্য ভাষায়। অন্য প্রক্রিয়ায়। তবু, এই প্রথম তার মনে হচ্ছে, সব মানুষই আসলে একটিই বস্তুর জন্য আরাধনা করে। তার নাম আনন্দ। সে ধীরে ধীরে রাধিকাকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে দিল। শরীরী আহ্বান উপলব্ধি করতে করতে সে ভাবছে—এই অপার আনন্দ—যা সে পেয়েছে এই প্রথমবার—তার জন্য বেহিসেবী হওয়া চলে না।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। রাধিকা বিহ্বল চোখে দেখছে। কী হল! যেন এতদিন, যা কিছু ঘটেছে সব, সত্য ছিল না। আজ এই বর্ষায়, জলমগ্ন সময়ে, এই সন্ধ্যায়, কোনও নতুন সত্যে তারা পা রাখছে। শমসের বলছে, তরে বিয়া করুম রাধু। কইলৈ ঢাকায় যামু গিয়া আমি, তুই পথ চাইয়া থাকবি না? রাধু?

রাধিকা ফিসফিস করে বলাছে, হা। বইয়া থাকুম। তোমার লিগ্যা। হা। অপ্যাক্ষ ককম তোমার লিগ্যা। হ—

শমসের পরম যত্নে হাত ধরে রাধিকাকে নামিয়ে দিচ্ছে সালতিতে। কেন, এই মুহূর্ত থেকে, রাধিকার, শমসেবের যত্ন একান্ত প্রয়োজন। দু'টি সালতি ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দূরে চলে যাচ্ছে। দূরে, আবছা অন্ধকারে বাঁশের সীমানা দেওয়া রূপসী। রাধিকা সেখানে—একবারি সালতি ভেঙ্গে যায়। কে যায়! তার বুকি লগি নেই। তার বুকি অঁচল উঁচুয়ে রাধিকার নড়র বায়ে। মল যায় না। বৃষ্টি এখনও পড়ছে। ঝির ঝির পড়ছে। রাধিকাকে স্পর্শ না করে শুনো মিলিয়ে যাচ্ছে তারা। বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। রাধিকা ভাবছে। ভাবছে। ভাবছে।

আঁখি ঢুলু ঢুলু      ঘুমেতে অঁকুল  
জাগিয়াছ বুকি নিশি।  
রসের ভরেতে      অঙ্গ নাই ধরে  
বসন পড়িছে খসি ॥  
এক কহিতে      আন কহিতেছ  
বচন হইয়া হারা  
রসিয়ার সমে      কিবা রস রঙ্গে  
সঙ্গ হয়েছ পাৱা ॥



আমার নাম তৃণাকুর কেন রেখেছিল, মা?

—সত্য বলে।

—কী সত্য?

—তৃণাকুর জন্মায়। দলিত হয়। কিন্তু ধবংস হয় না।

—আর?

—তৃণাকুর বিদ্ধ করে। মানুষদের বিদ্ধ করে।

—তুমি কোন সত্যের জন্য ব্যগ্র ছিলে মা? বিদ্ধ করার জন্য, নাকি জন্মে, দলিত হয়ে, ধবংস না হবার জন্য?

—দুই-ই।

—কিন্তু আমি তো একটা আলাদা মানুষ মা। আমার একটা পৃথক সম্ভা আছে। তৃণাকুর। এই নাম রেখে তুমি আমাকে বিদ্ধ কর দিয়েছ। আমি কোনওদিন, কারও সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারিনি। ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি। এই নামটার মধ্যে একটা হলুদ বিবর্ণ জ্বলে যাওয়া, যা-বা হয়ে যাওয়া একলা তৃণভূমি আছে। আমাকে তুমি একলা করে দিলে কেন মা?

যিনি মা তিনি কিছুটা নিরাসক্ত, কিছু-বা ভুবে থাকা কোনও প্রাচীন যন্ত্রণায়। যে-যন্ত্রণাকে কোনও প্রশ্ন বিদ্ধ করে তুলে আনে না কোনও যথার্থ উত্তর। ঘরের দেওয়াল থেকে বিক্ষিপ্ত আলোর কণা অনিবার্য রচনা করে মা ও ছেলের মুখের প্রথাসিদ্ধ অন্ধকার। একলা একই রক্তমাংস হয়ে থাকা দু'টি বিদ্ধির মানুষ। বিদ্ধির কিন্তু নিকট। পরস্পর শোনে পরস্পর নিকটজনকথা।

—তুই আমার প্রতিবাদ ছিল তখন।

—কীসের বিরুদ্ধে?

—মৃত্যুর বিরুদ্ধে; তুই আমার সত্যের প্রতিষ্ঠা ছিলি।

—কোন সত্য?

—জীৱনসত্য। জীবনের চেয়ে বড় কিছু নেই, এই সত্য।

—কিন্তু কেন তুমি বুঝতে পারিনি মা, তুমি আমাকে, তোমার সোপেন জন্ম, উপলব্ধির জন্ম, এই আমাকে, তুমি, ব্যবহার করেছ। তৈরি করেছ। আমাকে বীকার করোনি। আমার নিজস্বতা স্বীকার করোনি।

—না। তোমাকে ব্যবহার করিনি আমি। আমি বিশ্বাস করোছি, তুমি আমার সত্যের অংশ। যখন আমার মৃত্যুর ইচ্ছে জাগত তখন জীবনের কাছে আমি তোকে প্রার্থনা করতাম। আমার জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু জীবনের টানে, তোকে সৃষ্টি করে, তোর ভিতর, আমার জীবনকে আমি চারিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। আমার লালিত জীবনবোধ যখন মিথ্যে হয়ে যাচ্ছিল, তখন ওই বোধের প্রতি অসীম মায়ায়, তোর মধ্যে আবার আমি তা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম।

—তার মানে, নিজের স্বার্থে তুমি আমাকে ব্যবহার করেছ।

—স্বার্থ! এর নাম স্বার্থ? এর নাম মাতৃহৃৎ। যুগ যুগ ধরে নারী যাকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে। যুগ যুগ ধরে, এই একটি মাত্র উপলব্ধি, যা কেউ নারীর থেকে কেড়ে নিতে পারেনি। আমি আমার সন্তানের মধ্যে নতুন করে জন্ম নিয়েছি। এ তো স্বার্থ নয়! এ তো অধিকার। আমার সৃষ্টির প্রতি আমার অধিকার।

—সৃষ্টির প্রতি মানুষের ততদিনই অধিকার, যতদিন সে নির্মিত হচ্ছে। নির্মাণ হয়ে গেলে, সৃষ্টি তার নিজের।

—এটা কবিতার ক্ষেত্রে সত্য। শিল্পের ক্ষেত্রে সত্য। জীবনের ক্ষেত্রে সত্য নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্য নয়। তুই আমার ছেলে। আমার সন্তান। এই পৃথিবীতে তুই যেখানেই থাক, তোর এই আমার হয়ে থাকা কে কেড়ে নেবে? এমনকী তুই নিজের তা কেড়ে নিতে পারিস না। অপত্য। সম্পর্কের কাছে, সব দাবি ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত এই বোধটুকুই বেঁচে থাকে। এই অধিকারবোধ। এই অধিকারের সীমাবদ্ধতা মানুষের ক্ষেত্রে কখনও সত্য নয়।

—মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য। মা। তুমি চিরকাল আমাকে তোমার সম্পত্তি হিসেবে ভেবেছ। আর আমিও, শুধুমাত্র, তোমাকে আঘাত দেব না বলে, তোমাকে অমান্য করব না বলে তোমার সম্পত্তি হয়ে থেকেছি, কিছু এখন আমি জ্ঞান। আমার মনে হয়েছে, আমি একজন অসম্পূর্ণ মানুষ।

—তোমার ধারণা ঠিক নয়। তুমি একজন সং, শিক্ষিত, দায়িত্বশীল নাগরিক। তুমি একজন সম্পূর্ণ মানুষ। আমি তোমাকে তৈরি করেছি।

—আমি তোমার হাতে তৈরি হয়েছি মা। গড়ে উঠিনি। আমি কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে, দু'টি কথা বলার পর আমার কথা ফুরিয়ে যায়। আমি তখন বইয়ের মধ্যে ডুবে যাই। বই। বই ছাড়া আর কোথাও ঢুকতে পারি না কেন আমি? কিছু ভেদ করতে পারি না কেন? ছোটবেলায় তুমি যখন আমাকে খেলতে বারণ করত, আমি মাঠের দিকে চেয়ে থাকতাম। আমার খেলতে ইচ্ছে করত। সবাই খেলত। শুধু একা আমি পুরনো বাড়ির বারান্দায়। আমি বই পড়তাম।

—তোমার যে কথা ফুরিয়ে যায় সে-সেই তোমার নয়। তুমি গভীর এবং পরিণতমনস্ক বলেই সমান গভীরতার মানুষ সন্ধান করো। আর না পেলেই তোমার কথা ফুরিয়ে যায়। এমন কারওকে যখন পাবি মাতৃ, যার মধ্যে তোর মনোবৃত্তির কম্পাঙ্ক খুঁজে পাবি, দেখবি তোর কথা ফুরোচ্ছে না।

—কাকে পাব মা? কবে পাব?

—সে আমিও বলতে পারি না। তবে পাঁবে সেই ভরসা রাখো। আমার মনে আছে যাক্স, বন্ধু তোমার কোনওকালেই বেশি নেই। অনেকদিন পর্যন্ত আমারওই তুমি বন্ধু ছেলেছিলে।

—পড়ার বন্ধু মা। তুমি আমার মধ্যে পড়া ঢুকিয়ে দিয়েছিলে।

—অনেক বই কিনে দিয়েছি আমি তোমাকে। কত কষ্ট করে সংসার চালাতাম/তখন। এ জির-র পে স্বেল ভাল ছিল না। তোমার বাবা কোনও কাজকর্ম করতেন না। তারই মধ্যে তোমার জন্য আমি সব করেছি।

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আমাকে খেলতে দাওনি।

—নিইনি কেন তুই জানিস না? জন্মের সময় তোর পা দুটো কমজোরি ছিল। প্রথমে বোকা যায়নি। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও তুই যখন হামা দিলি না, আমার ভাবনা হল। জনেকে বলল, কেউ কেউ একেবারে দাঁড়ায়। কিন্তু তোর দাঁড়ানোর সময়ও পেরিয়ে গেল। তুই বলিস। কথা বলিস। হাসিস। কিন্তু দাঁড়াস না। তোর বাবাকে বলে বলে রাজি করতে পারিনি। শেষে আমিই তোকে নিয়ে একদিন মেডিক্যাল কলেজে চলে গেলাম। তখনও আমাকে চাকরিতে যেতে হয়নি। তোর বাবা চাকরিটা তখনও করতেন। ডাক্তার তোকে দেখে বললেন, একটি বিশেষ ধরনের জুতো পরিয়ে তোকে ইটাতে হবে। রোজ। বিশেষ ধরনের মালিশ করতে হবে। সেই আমার কাজ হল। স্প্যাসটিক এইড। তখন, তুই যখন ছোট ছিলিস, ভাল চিকিৎসা ছিল না এ সবে। রোজ সংসারের কাজ করে তোকে নিয়ে বেরোতাম। রোজ মেডিক্যাল কলেজ। ডাক্তার আমায় বলেছিলেন, দুর্বল পা। খুব চাপ যেন না পড়ে। স্বাভাবিক ইটাচলার বাইরে বেশি খেলাধুলা দৌড়বীপ যেন না হয়।

—ভুল ছিল। ভুল ছিল মা। আমি একটি মেডিক্যাল জার্নালে পড়েছি। এরকম হলে বাচ্চাকে স্বাভাবিক জীবন দিতে হয়। তাকে মাঠে ছেড়ে দিতে হয়। অন্য বাচ্চাদের মধ্যে খেলতে দিতে হয়। তাতে সে মানসিক বল পায়। আত্মবিশ্বাস পায়। সেই সঙ্গে পেশির প্রচুর সঞ্চালনে পেশি তার স্বাভাবিক জোর অর্জন করে।

—চিকিৎসার ধরন বদলেছে মানুষ। দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে। কত রোগই তো আগে জানতুম সারে না। এখন শুনি সারে। কত রোগের জো নামই শুনি। এখন শুভতে পাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলায়। তখন আমি যা করেছি, ডাক্তারের পরামর্শে তোর ভালর জন্যই করেছি।

—কিন্তু আমার কী হবে মা? আমি যে বই ছাড়া আর কিছুই জানি না? তোমার মনে আছে, মা, সেই কোন ছোটবেলায় খেলতে যেতে পারি না বলে আমি কাপাকাটি করেছিলাম। তুমি আমায় অবনতাকুরের ‘রাজকাহিনী’ কিনে এনে দিলে। সেই সময় কতবার করে সে বই পড়েছি। ভাল লাগার জায়গাগুলো আজও আমার মনে আছে। সেই, তোমার মনে আছে মা, বাগ্মার আত্মপরিচয় পাবার ভাষণটা? কী সুন্দর! কী করুণ!

\* ... বাগ্মা বড় হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু সুতোয় বাঁধা তামার কবচটি তাঁর গলায় যেমন, তেমনই ছিল—অনেকদিনের অভ্যাসে মনেই পড়ত না যে, গলায় একটা কিছু আছে। আজ যখন হীরামোতির কুড়িগাছা হারের নীচে থেতে সেই পুরোনো কবচখানি পায়ের তলায় ছিড়ে পড়ল, তখন বাগ্মা চমকে উঠে ভাবলেন এ কি! এতদিন আমার মনেই ছিল না যে এতে লেখা আছে আমি কে, কোথায় ছিলাম। আজ সব সন্ধান পাওয়া যাবে! বাগ্মা প্রফুল্ল-মুখে সেই তামার কবচ মহারানীর হাতে এনে দিয়ে বললেন—“পড় তো শুনি।” বাগ্মা নিজে এক অক্ষরও পড়তে জানতেন না। মহারানী বাগ্মার পায়ের কাছে বসে পড়তে লাগলেন। কবচের এক পিঠে লেখা রয়েছে—“বাসুদেবন ত্রিকুট পর্বত, নগেন্দ্রনগর, পরাশর-অরুণা।” বাগ্মা হুসি মুখে রানীর কাঁধে হাত রেখে বললেন—“এই আমার ছেলেবেলার দেশ, এইখানে কত খেলা খেলেছি!” ...



—কী আশ্চর্য মাস্তু। কী সুন্দর মনে আছে তোর!

—মা, তখন ‘বাগ্নাদিত্য’ পড়তে পড়তে আমি মনে মনে বাগ্না হয়ে উঠতাম। ‘গোহ’ পড়তে পড়তে গোহ।

মা দেখছেন ছেলেকে। মনে মনে বলছেন—‘এখনও তুই বাগ্নাদিত্য হয়ে আছিস মাস্তু। তোর মুখে সেই পরাশর-অরণ্যের মায়া।’ কিন্তু মুখে কিছুই উচ্চারণ করছেন না। তাঁর বুকের তলায় আছে এক কঠিন স্তর, যা জীবনকে বাঁচবার জন্য যুদ্ধ করতে করতে রচিত হয়েছে। পায়ের তলাকার শক্ত অনিবার্য কড়ার মতো। কিন্তু সেই কঠিন্যের আড়ালে এক টলটলে পুকুর আছে। গাঁয়ের ঠাণ্ডা ছায়া-ছায়া তালপুকুরটির মতোই। সেইখানে জীবনেরই জন্য ভালবাসা রাখা। সেইখানে মা ভাবছেন— তোকে কে বুঝবে, আমি ছাড়া? বলছেন—

—আর ‘আলোর ফুলকি’? তোর ‘আলোর ফুলকি’র কথা মনে নেই? আমার খুব ইচ্ছে করে তোর মেয়েকেও ওই বই দিই একখানা। ওই বই পড়ে তুই কীরকম মোরগ পোষার বায়না করেছিলি?

—হ্যাঁ মা। ওই বইটা পড়ার পর থেকে আজও যেন মনে হয় পাখিদের সব কথা আমি বুঝতে পারি। সব সংলাপ। সোনালিয়া আর কুঁকড়োর জায়গাগুলো মনে আছে মা?

‘... ... ছোটো কোণটিতে চূপচাপ বসে থেকেও যে সবই খুব বড় করে দেখা যায় আজ সোনালি সেটি বুঝে অবাক হল।

কুঁকড়ো বলেন, “সব জিনিসকে যদি তেমন করে দেখতে পার তবে সুখদুঃখের বোঝা সহজ হবে; অজানা আর কিছু থাকবে না। ছোটো একটি পোকের জন্ম মরণের মধ্যে পৃথিবীর জীবন আর মৃত্যু ধরা রয়েছে দেখো, একটুখানি নীল আকাশ ওরি মধ্যে কত কত পৃথিবী জ্বলছে নিভছে।”... ...’

তোমার মনে হত না মা, ওই মুরগিদের মধ্যে সত্যি ওরকম কথা হয়? ওমনিই ওদের রাগ অভিমান ঈর্ষা ও চক্রান্ত? ওই পাখিরা যখন মারামারি করে, এ পাড়ার কাক—ও পাড়ার কাক দেখলে ঠোকরায়, এই মোরগ ওই মোরগের ঝুঁটি চেপে ধরে, তখন আমার ওদের একেবারে মানুষের মতো লাগে। এই পাড়ায় পাড়ায় দ্বন্দ্ব, এই দখল, এই কামড়া-কামড়ি—একেবারে কি মানুষের মতো নয় মা?

—কী সুন্দর করে ভাবিস তুই মাস্তু। বোধহয় ছোটবেলা অত ভাল ভাল বই পড়েছিলিস বলেই এমনটা সম্ভব হয়েছে। তোর মেয়েকে আমি অবনঠাকুরের সব বই কিনে দেব।

—কিন্তু শর্মির যে বই পছন্দ নয় মা।

—তাতে কী? মাস্তু। তোর তো পছন্দ। তোর মেয়ে তোর পছন্দের কিছু শিখবে না?

—জানি না, মা। আমার মনে হয় আমি যা যা জানি, যা যা পছন্দ করি, চাই, আমি যা হয়ে উঠেছি—তার সবটাই ভুল।

—এরকম কেন ভাবছিস? মাস্তু, তোর কী হয়েছে?

—সকালে শর্মিকে তুমি কী বলেছ, মা?

—কই, কিছু না তো!

—শাড়ি নিয়ে কি কিছু বলেছিলে?

—শাড়ি নিয়ে? ও! হ্যাঁ! শর্মি নাচের স্কুল থেকে ফিরে শাড়ি ছেড়ে দলা করে আলমারিতে রাখছিল। তা আলমারির পাল্লা টানতেই ওমনি আরও চার-পাঁচটা দলাপাকানো শাড়ি গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। আমি শর্মিকে বললাম, এভাবে শাড়িগুলো রাখছ কেন? একটু ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখলেই তো পারো।

—শাড়িগুলো কার মা? তোমার, না শর্মির?

—আমার কেন হবে? এভাবে কথা বলছিস কেন মাস্তু? আমি কি রঙিন শাড়ি পরি?

—তাহলে শর্মির শাড়ি সে যেমন খুশি রাখুক, তোমার কি?

—ও! এটাও কি ব্যক্তিস্বাধীনতার গল্প নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু তুই তো জানিস, গুছিয়ে না রাখলে আমার ভাল লাগে না। আমি অফিস থেকে ফিরেও সব কিছু ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখতাম।

—সবাই তো একরকম হয় না মা। শর্মি শর্মির মতো, তুমি তোমার মতো।

—ও, এ বেলা কোনও ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই?

—কেন?

—যেমন ও ওর মতো থাকবে, এলোমেলো, অগোছালো। শাড়ি দলপাতিয়ে আলমারিতে ঠেলে দেবে। সারা দিনে খাবার টেবিল থেকে এটো খালাবাড়ি তুলবে না। আমার জুইলতার ওপর ব্রেসিয়ার মেলে রাখবে আর তার জল পড়ে আমার জুইফুল খেঁতলে যাবে, আর আমি, এ সমস্তই ওর ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে চুপ করে থাকব। কোনও কথা বলব না!

—কেন বলবে? এ তো ওরও বাড়ি মা। ওরও এখানে নিজের মতো থাকার অধিকার আছে।

—শোনো, আমি কথা বলব কারণ আমার নান্দনিকবোধ, পরিচ্ছন্নতাবোধ বিয়িত হলে প্রতিবাদ করাটা আমারও ব্যক্তিস্বাধীনতা। আর এটা ওর বাড়ি নিশ্চয়ই। কিন্তু আমারও কি বাড়ি নয়, মাস্তুল, আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগে, এই মাটিতে তোমাদের পুরনো বাড়িতে আমি পা দিয়েছিলাম।

—তুমি পৃথিবীতে আগে এসেছ, তাই ঘটনাক্রমে তুমি এ বাড়িতেও আগে এসেছ। তার জন্য তোমার অধিকার কিছু বেড়ে যায় না মা। এই পৃথিবীর ওপর একটি বৃক্ষের যা অধিকার, একটি শিশুরও তাই।

—সব কিছু জেনারেলাইজ করে ফেলিস তুই মাস্তুল। কিন্তু জীবন এরকম নয়। মানুষের চাওয়া-পাওয়ার বোধ এরকম নিয়ম মেনে, যুক্তি মেনে চলে না। ওই পুরনো বাড়িতে কত কষ্ট করেছি আমি। এ বাড়ি নতুন করে করতেও কি কম কষ্ট হয়েছে? তুমি জানো সব কিছু ম্যাজিকে হয়ে যায়নি। এর পিছনে আমার যথেষ্ট পরিশ্রম ছিল। এর প্রত্যেকটি ইট, প্রতি কণা সিমেন্ট, প্রতিটি গ্রিল, আমার নিজের পরিশ্রম জড়িয়ে তৈরি। এ বাড়ির পরিকল্পনা, মেঝের নকশা, জানালার মুখ—সব আমার করা। সুতরাং, এ বাড়ির প্রতি, আমার অধিকার কিছু বেশি আছে বটে। সেই অধিকার সম্পর্কের নয়। সময়ের নয়। মায়ার। ও একদিন রাগ করে কাচের গ্লাস ভুঁড়ল। আমার জানালার কাচ ভেঙে গেল। ও একদিন তোমার সঙ্গে বগড়া করে তালা ভুঁড়ে দিল, আমার মেঝের দ্বায়ে চিড় ধরে গেল। তুমি বলবে, রাগ করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। এবং প্রকাশভঙ্গিও যার যার নিজস্ব। ঠিক। তবে এও ঠিক ব্যক্তিস্বাধীনতাই মানুষের সেই শেষ ভয়ঙ্কর শব্দ যা পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যা পরস্পরকে হত্যা করায় না। উপলব্ধি করায় না। ব্যক্তিস্বাধীনতা নিষ্ঠুর আত্মকেন্দ্রিকতা ছাড়া কিছু নয় যদি তুমি এর সঠিক ব্যবহার না করো। তোমাকে বুঝতে হবে, কোথায় মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রয়োজন। বুঝতে হবে, তোমার স্বাধীনতার ইচ্ছা যেন অন্যের ইচ্ছাকে বাহত না করে। কারণ ওই দাবি তারও আছে। শর্মি যখন খুব সহজেই খুব খারাপ ভাষায় চিৎকার করে তোমার কাছে ক্ষোভ জানায়, তখন, এই পরিবর্তকে দৃষ্টি লাগে আমার। কিন্তু আমি কিছু বলিনি। বলা উচিত ছিল কারণ এখানে তার শিক্ষার অপূর্ণতা রয়েছে। মানুষ পরস্পরকে বিভিন্ন সময় বাধা দেবে, যখন প্রয়োজন। বাধা দেবে না যখন প্রয়োজন নেই—যেমন, সং ইচ্ছায়। সং অভিপ্রায়ে। সং কাজে। শর্মি নাচের স্কুল করতে চেয়েছে। আমি স্কুলে আপত্তি করিনি। আমি জানি, এ পাড়ায়, আমার পুত্রবধূ নাচে বলে, নাচের ক্লাসে যায় বলে, কানাকানি হয়। কিন্তু আমি ওইসব অর্থহীন কানাকানিতে গুরুত্ব দিই না। শর্মি চমৎকার নাচে। ও তো স্কুল করতেই পারে। আমার এই সমর্থনগুলো তোমাদের চোখে পড়ে না।

—কিন্তু তুমি ওকে চাকরি করতে বাধ্য দিয়েছিলে।

—না। তুল উপস্থাপনা কোনো না, এটাও নিখ্যাচায়া। সত্যের বিকৃতি। আমি বলেছিলাম সেও বছরের বাচ্চা রেখে এখন তোমার কাছে যাওয়ার দরকার নেই। অর্থের তো অভাব নেই আমাদের। মেয়ে একটি বড় হলে চাকরি কোনো। আমি নিজে দেখানো চাকরির কথা, সেখানে শর্মিকে বাধ্য দেব কেন? শর্মি চাকরিটা নেওয়ার মিষ্টর কি অনুবোধে হয়নি? বাবার কি অসুখে পাড়েনি সে? সে বছরই, হুমাসের মাথায়, আমি যদি রিটারার না করতাম, মিষ্টর কি ক্ষতি হত না? তোমরা জানো, মিষ্টর জন্যই আমি এক বছর আগে রিটারার করেছি। তাতে আমার আর্থিক ক্ষতি কিছু কম হয়নি।

—এতদিন পর তুমি টাকার কথা তুলছ যা?

—না। টাকার কথা নয়। কথা হল, শর্মি মেয়েকে ছেলে রেখে যে-টাকা উপার্জন করতে গেল তার চেয়ে বেশি টাকা আমি ওই মেয়েরই জন্য ছেড়ে এলাম। লাভ কী হল?

—কিন্তু প্রায়ই তুমি শর্মিকে অভিযোগ করো। ও সংসার দেখে না। শুধুই চাকরি করে। শুধুই নাচ করে। যা। ওর তড়াহতাড়ি বিয়ে হয়েছে বলে। না হলে এখন ওর বয়সী মেয়েরা বিয়েই করে না। সেভাবে দেখলে ও তো ছেলেমানুষ।

—দেখো। সে-দিন যখন আমি বলছিলাম, মেয়েকে এবুনি প্রাইভেট টিউটরের হাতে দিয়ে না, তুই বললি, মা, আমরা বড় হয়েছি, আমাদের শিক্ষণ আমাদের নিতে দাও। কোনটা তাহলে তোর যথার্থ উপলব্ধি? আধুনিক জীবনদর্শন একটি নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছে। আসলে নতুন নয়। কিন্তু সব পুরনো ভাবনাই তো নতুন করে আসে। তো, এই দর্শনের নাম আইডেনটিটি ক্রাইসিস। যথার্থ অন্বেষণলব্ধি না হলে মানুষ এ রোগে ভোগে। আমি ভুগতাম ছোটবেলায়। যখন একাদশোক্তা খেলতাম, মা বলত—বড় হয়েছ। অত লাজিয়ে না। যখন মা-রা গল্প করত, আমি শুনতে বসতাম। মা তাড়া দিত, তুমি এখানে কেন? যথেষ্ট ছোট আছ এখনও। বড়দের মধ্যে কী করছ? আমি চলে যেতাম। কষ্টও পেতাম। তার চেয়ে যৌটা বেশি হত, আমি হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম। আমি আসলে ঠিক কী? বড়, না ছোট? আমার কোনটা করণীয়, কোনটা নয়? আমি তখন আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভুগছিলাম। কথটা যদিও তখন জানতাম না। জেনেছি অনেক পরে। যখন জীবন বারবার এই সমস্যাটার সামনে আমাকে নিয়ে ফেলেছে যে আমি আসলে কী? আমি কে? আমি কেন? আমি কি ওটা? নাকি, আমি অন্যটা? আজ আবার আমার সেই সমস্যা। সেই আইডেনটিটি ক্রাইসিস। আমি বুঝতে পারছি না আমি তোমাদের কাছে কতটা কাজক্ষত, কতখানি কল্যাণকর।

—তুমি বাপারটাকে এত জটিল এত জটিল করে ফেলে না। আসলে তোমার অভিযোগগুলো শর্মিকে বিধছে। তুমি বলেছ ও সংসার দেখে না। সংসার তো তুমিই দেখছ। ও যদি চাল ভালের হিসেব নাই করে তবে আপত্তি কি?

—তোমরা ভুলে যাস যে আমার বয়স বাড়ছে। আমি দীর্ঘদিন চাকরি করেছি, সংসার সামলেছি, তোর এবং তোর বাবার দেখাশুনো করেছি। নিজের নিকে তাকইনি। নিজের সাধ-আশ্রদের কথা ভাবিনি। হতে পারে আমার অনেক ভুল হয়েছে। কিন্তু ভগবান জানেন, আমি জেনেশুনে কখনও তোদের কষ্ট দিতে চাইনি। তখন আমাকে চালের হিসেব রাখতে হয়েছে। টিফিন কিনে খাবার সামর্থ্য ছিল না। বোতলে দই পেতে চিড়ের পুঁলি নিয়ে অফিসে গিয়েছি। এখন, এই বয়সে তোমাদের মেয়েকেও আমি কম আগলাচ্ছি না। এখনও মিষ্ট তোমাদের ছেড়ে আমাকেই বেশি চেনে। আমারও তো বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। নিজের মতো করে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে। বাকি জীবনটা শেয়পিয়ার পড়ে, রবীন্দ্রনাথ, গ্যাটে, টলস্টয় পড়ে আর সেবস্ত্র বিখ্যাসের গানে বইয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

—বেশ। তোমার কথা মনে রাখব। শর্মিকেও বলব।

—আমার কথা বোধহয় তোরা একটু বেশিই বলাবলি করছিস মাঝু। আর মনেও রাখছিস।  
এতটা প্রয়োজন নেই।

—ঠিক আছে। কিন্তু তুমি শর্মির সাজপোশাক নিয়েও আর কিছু বলতে চেয়ে না।

—না। আমি তো সেরকম কিছু বলিনি। একদিন বলেছিলাম যাঁ মেথো না। ট্রাটে গালে যাঁ  
মাথা মানে তো নিজেকে অপমান করা। পরকে ভোলানো। নিজেকে ভোলানো।

—ও যদি নিজেকে সাজাতে ভালবাসে তোমার তাকে কী?

—না। আমার কি? কী সুন্দর দেখতে শর্মিকে। ও তো নিজেকে সাজাবেই। কিন্তু সাজ আর  
মেক আপ কি এক হল? সাজ তো কৃত্রিমতা নয়। সাজ হল শিল্প। আর মেকআপ হল কৃত্রিম।

—তোমার এই বিশ্বাস তোমারই ধাক না মা। ওকে ওর মতো থাকতে দাও।

—আমি কি তা দিচ্ছি না?

—না, তুমি মনে করো, তুমি যা ভাবছ তাই ঠিক। তুমি কেভাবে যা-কিছু দেখো সেটাই  
চূড়ান্তভাবে সফিস্টিকেটেড। কিন্তু সবসময় সেটা ঠিক নয়। তোমাকে একটা কথা বলার আছে।  
শর্মি বি আর সিং থেকে বি এন আর হাসপাতালে ট্রান্সফার হচ্ছে। ওখানে ও কোয়ার্টারও পাবে।

—ও।

—এখান থেকে বি এন আর যাওয়া তো সম্ভব নয়। বুঝতেই পারছ—

—যাবার দিন ঠিক করেছিস?

—হ্যাঁ। মানে, না। মানে আমরা বলছিলাম তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে তো?

—না। তোরাও জানিস আমি যাব না। তোরা যা। তবে মাঝু। বউয়ের কোয়ার্টারে থাকা।  
আমাদের সমাজে এতে কেউ তেমন অভ্যস্ত নয়। তোর অসুবিধে হবে না তো?

—এ সব তুমি কী বলছ মা? আমি কোয়ার্টার পেলে শর্মি কি যেত না? এখানে তফাত  
কোথায়?

মেওয়ারাল থেকে পিছলে পড়া, ছিটকে আসা আলো ফুরিয়ে গেছে তখন। মা এবং ছেলের মুখ  
অন্ধকার। মায়ের মুখের মৃদু বলিরেখার ওপর সেইসব অন্ধকার জমে কালোর প্রলেপ একটু  
বেশি গাঢ় করেছে। এখন আর আলোর ফুলকি নেই। গোহ, বাগ্নাদিত্য, পরাশর অরণ্য নেই।  
পাহাড়তলির মেরগ কোথাও দাঁড়িয়ে পরম বিশ্বাসের কথা শোনাচ্ছেন না বনের সোনালিয়াকে।  
বলছেন না— “পাছে ভুল হয়, সেই ভয়েই আমি জেগে উঠি।” বলছেন না— “... সুব বেসুর  
সব এক হয়ে ডাক দিলে যা চাই তা পেতে বেশি দেরি হয় না, ...” এখন সংসার— কুট ও  
জটিল টানের মধ্যে। এখন সম্পর্ক— পরস্পরকে না বোঝায়।

বহুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বললেন—

—না। শর্মি তো কথায় কথায় বলে, আমি যা খুশি তাই করব, তোমার খাই না পরি। এই মন  
নিজের কোয়ার্টারে গেলে আরও দুবার হয়ে উঠবে না তো?

## কুড়ি

চার বছর। চার বছর একা ছিলেন নীলিমা। এই চার বছরে অনেক কিছু দেখলেন তিনি। কে  
জানে, আর কত কী দেখবেন। আজ মাঝু আসবেন, চার বছর পর আবার এ বাড়িতে  
পাকাপাকিভাবে থাকতে আসছেন মাঝু। আজ সকাল থেকে নীলিমা ঘর ঝাড়পোছ করছেন।  
যদিও এ সবে প্রয়োজন ছিল না। নীলিমার বাড়ি এমনিতেই পরিষ্কার। খুল কালি ময়লা

অসোচ্ছলো ঘর-দোর নীলিমা দেখতে পারেন না। এ বাড়ির প্রতিটি ঘরে অনেক আলো-হাওয়া। এই যে চার বছর নীলিমা একা ছিলেন সেই সময়েও প্রতিদিন, নিয়মিত ঘর পরিষ্কার রেখেছেন তিনি। স্বতন্ত্র সঙ্গে মিলিয়ে পর্দা বদলেছেন। বিছানার চাদর বদলেছেন। ফটিক বিলের ধারে ওই বস্তি থেকে ময়না গোল্ড এসে নীলিমাকে সাহায্য করে যায়। বাচ্চা নীলিমা নিজেই করেন। আর সব কাজ ময়নার। ময়না মানুষ ভাল। তার ব্যঙ্গও ভাল। কিন্তু ব্যঙ্গেরই কথা হলো—অন্য বাড়িতে কাজ করতে যাবার তাড়ায় মাঝে মাঝে তার কাজে অবহেলা পাওয়া যায়। আর বড়ত চাইবার স্বভাব। নীলিমা মাঝে মাঝে খুবই বিরক্ত হল ময়নার ওপর। একটা কাকের ভাটি ভেঙে গেল, ওমনি ময়না বলবে—‘মানিমা, এই ভাটি ভাঙ্গা কাপ দিয়া আপনে কি করবেন? আমি লইয়া যাই?’ গোলাপের কাঁচায় লেগে সেমিন শাড়ির আঁচলটা ছিঁড়ে গেল। ময়না বলল—‘আপনি কি ছিঁড়া পরবেন? আমারে দিয়া দ্যান।’

নীলিমা মাঝে মাঝে বলেন—তোমাকে তো না চাইতেই সিই, বিই না ময়না?

—নান। আমি তো কই, আপনে না থাকলে আমার কী না জানি হইত।

—তা হলে এত চাও কেন? চাইবে না।

ময়না হাসে। সলজ্জ হাসি। ঝটি ঠুকে ঠুকে দু’খার বেঁড়ে নেয়। তর্ক করে না। কিন্তু আবার চায়।

গত বছর একখানা ফ্রিজ কিনেছেন নীলিমা। রোজ বাজার করার অনেক হাসামা। বৈধব্য সঙ্গেও তিনি মাছ-মাংস সবই খান। এ বিষয়ে তাঁর কোনও সংস্কার নেই। এ নিয়ে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে নিলে কম হয়নি। সে-সব শুনে নীলিমা দুঃখ পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু বিচলিত হননি। সমরেশ যখন মারা যান তখন তৃণাঙ্গুর কলেজে পড়ছেন। নীলিমার অনেকদিন চাকরি বাকি। বৈধব্য সম্পর্কে অনেক ভেবেছেন তিনি। বৈধব্যের বিধান কেন? এ নিয়ে কথাও বলেছেন অনেকের সঙ্গে। নীলিমার মেজবোন প্রতিমা বলেছিলেন—যে চলে গেছে তার শোক পালনের জন্য। প্রিয়তম মানুষের অনুপস্থিতির যে অসামান্য কষ্ট তার প্রতীকী পালনীয় বিধি।

—তা হলে কি নারী কখনও পুরুষের প্রিয় নয়? সে চলে গেলে পুরুষরা তো কোনও নিয়ম পালন করে না? সারা জীবন কোনও শোকচিহ্ন ধারণ করে না।

—পুরুষদের অনেক রাস্তা খোলা আছে। তারা আবার বিবাহ করতে পারে।

—মেয়েরা পারে না কেন?

—তুমি করবে? আইনত কোনও বাধা নেই।

—করব না। তবে সম্ভব হলে হয়তো করতাম। আমাদের সমাজে এই নিয়ম এখনও গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাই—। আমার ছেলের জন্য আমাকে ভাবতে হচ্ছে। আর আইনের কথা তুলিস না। কল্যাণকারী আইন তৈরি করেন কয়েকজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন প্রগতিশীল মানুষ। সেই প্রগতি উপলব্ধি করতে সাধারণ মানুষের কয়েক শতক কেটে যায়। বিধবা হওয়ার পর আবার বিয়ে করছে শুনলে মানুষ এখনও টারা চোখে তাকায় না?

—তা হলে তো সমাজ তুমি মানছই। মানলে পুরোটা মানবে না কেন?

—পুরোটা? সমাজের কোন নিয়মটা সম্পূর্ণ তা কী করে নির্ধারিত হবে? সমাজ প্রতিনিয়ত বদলায়। এই পরিবর্তনটা অদৃশ্য। সবসময়ই সমাজের কেউ কেউ কিছু নিয়ম মানে, কেউ কেউ মানে না। এই মানা আর না-মানার মধ্যে থেকেই একটা নতুন রীতি বেরিয়ে আসে। এটাই সমাজের নিয়ম। অনেক কিছু আপনিই বদলায়। কিন্তু অনেক নিয়ম বদলাতে হয় জোর করে। যেমন সতীদাহ বন্ধ করা হয়েছিল। যেমন বিধবাবিবাহ প্রচলন। কিন্তু সমাজের কোনও কোনও পাতার এত ভারী, এত জগদ্বন্দ যে সেই প্রচলন আজও টলছে না। তাদের কথাই ধর না। আজ থেকে একশো বছর আগে হলে তোরা কি এরকম স্নিভলেন্স ব্লাউজ পরে, ববছটি চুল নিয়ে, চোঁটে বং মেখে বেড়াতে পারতিস?

নীলিমার ছোট বোন চন্ড্রিমা নিজের ফিডেকটি ব্লাউজ পরা কাঁধ ঢাকতে ঢাকতে বলেছিলেন—শোক বলতে তো কিছু আছে। জাইবাবুর জন্য তোমার ভি সেটাও নেই।

—সত্যি বলব? নেই। তোর জামাইবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী ছিল জানিস? গোবা টিয়াপাখির মতো। ছোলা আর লংকা দেওয়া ছাড়া, মাঝে মাঝে দু-একটা হঠাৎকৈ বোল দেওয়া ছাড়া যার সঙ্গে আসলেই কোনও সংযোগ ছিল না। তার শোকেও কখনো যদি বলিস তা হলে তো বলতে হয় সম্ভানশোকের চেয়ে বেশি কিছু নেই। তার জন্য তো সমাজসারাদ্বারন বহমান কোনও চিহ্ন নির্ণয় করেনি, আসলে ভোগ্যবস্তু ছাড়া আর কোনওভাবে তো দেখা হয়নি মেয়েদের। তোমার বর মরে গেছে মানে—তোমার স্বামী মরে গেছে মানে—তোমার জমি এখন ধু-ধু নিখলা পড়ে থাকবে। আর কেউ এসে সে-জমি নখল নিয়ে অন্যায় হয়ে যাবে। মালিক একজনই। বিক্রি না-করা পর্যন্ত তো মালিক বদলায় না। সম্ভানের জন্যও তাই কোনও শোকচিহ্ন নেই। কারণ স্বামী থাকলে আবার সম্ভান উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু স্বামী না থাকলে আর একজন স্বামী—তওবা তওবা। হিন্দু বিধবাদের মতো নির্যাতিত অবহেলিত ও দলিত জাত পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

ঐ কুঁচকে গিয়েছিল প্রতিমার। রুমাল দিয়ে চেপে চেপে ঠোঁটের চারপাশ থেকে অতি সাবধানতার সঙ্গে ঘাম মুছে, যেন তাঁর লিপস্টিক টসকে না যায়, প্রতিমা বলেছিলেন—বৈধবা কিছু সংযমের জন্যও। আমিষ আহার বা রঙিন পোশাক, সাজগোজ, মানুষের সেক্স বাড়ায়, ভোগলিন্দা বাড়ায়। একজন বিধবার পক্ষে...সেইসব...

—অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক মানুষের হাত পা দুমড়ে ভেঙে দাও। নাক-মুখ বেঁতলে দাও।

—কেন?

—কেউ বিধবা মানেই তার স্বাভাবিক বোধ হত্যা করতে হবে কেন? শোক কারও চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু সামাজিক নিয়ম স্বামীশোক চিরন্তন করে তুলতে চায়। সতীদাহর চেয়ে বৈধবা যাপন কোনও অংশে কম নিষ্ঠুর নয়। প্রত্যেক বিধবার উচিত, অন্যদের মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করা।

—সে তুমি তোমার যা খুশি করবে। আমরা তো কিছু বলতে যাব না। সব নিয়ম মেয়েদের জন্য কেন! পুরুষদের কোনও কষ্ট নেই কেন! এ সব খুব উঠেছে আজকাল। ওরা যে দিনরাত ষেটেখুটে আমাদের মুখে অন্ন জোগায়, তার বেলা?

নীলিমা হেসেছিলেন। খুব কঠিন সত্য হলেও তাঁকে বলতে হয়েছিল—ও। অন্ন জোগালেই সাতখুন মাফ? তা হলে আর আমার দোষ কী?

—তার মানে?

—মানে আমিও তো তোমাদের জামাইবাবুর মুখে অন্ন জুগিয়েছি এতকাল।

—সে তোমার কপাল।

—মানলাম। আমার কপাল। কিন্তু নিয়মটা যদি এককম হয় যে আমাদের অন্ন জোগায় বলেই সমস্ত ইচ্ছে অনিচ্ছে, চাহিদা, ভাল-মন্দ লাগাকে পূর্ণ মূল্যে বিক্রিয়ে দিতে হবে তা হলে আমি বলব, তোমাদের হাতগুলোকে শুধু নখরপ্লনী আর চুড়ি পরার কাজে না লাগিয়ে অন্নসংস্থানের কাজে ব্যবহার করো।

চন্ড্রিমা আর প্রতিমা প্রায় একসঙ্গে বলেছিলেন—সে তুমি চাকরি করো বলে তোমার বরাবর গর্ব। তুমি মনে করো তুমি যা ভাবো সেটাই ঠিক। তুমিই সবচেয়ে বেশি প্রগতিশীল। আধুনিক।

নীলিমা হেসে বলেছিলেন—সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাই। আর চাকরি তোমারাই বা করো না কেন? বাবা তো তোমাদেরও সমান লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

—আমাদের দরকার নেই।

—বেশ। তা হলে আমার ব্যাপারে কোনও কথা বলতে এসো না। তোমার জামাইবাবুর জন্য



আমার কোনও শোক নেই। কোনও প্রতিবিধানও আমি মানব না। আমাকে চাকরি করতে হবে। শরীর ঠিক রাখতে হবে। ব্যালালড ফুড আমার সরকার। একাদশী করে বাস টেজিরে তোমাদের জামাইবাবুকে স্বরণ করার নাটক করতে করতে আমি দিন কাটাতে পারব না।

প্রতিমা বলেছিলেন—আমাদের অনেকেই কিছু তা হলে তোমার বাড়ি আমাকে না বাড়ি।

—তারা কারা?

—যেমন আমার শাশুড়ি। স্বস্তর।

—যেমন আমার ননদ। জা।

—নাই-বা এলেন। কী যায় আসে? আমার যখন অক্সিস যাবার জন্য মাত্র দু'টি শাড়ি ছিল, মাস্তুর পড়ার খরচের জন্য আমি যখন দশের পর দিন দুই অল্প কিছু খোঁজছি, অস্তুত হ'টা বর্ষ। আমি কারিয়েছি কিনা ছাতায়, তখন তোমাদের শাশুড়ি ননদরা আমাকে দেখতে আসেননি। তোমাদের সংস্কারের কোনও কারণ নেই। তোমাদের যদি নিজস্ব ভাবনা কিছু থাকে আমাকে জানিয়ে দিও।

তারপর সেই চমৎকার ঘটনাটা ঘটেছিল। কতদিন হয়েছে তখন, সমরেশ মারা গেছেন? এই বছর সেড়েও হবে হয়তো। এতদিন অশৌচ থাকার কারণে প্রতিমা বা চন্দ্রিমা কেউ তাদের পূজা-পার্বণে নীলিমাকে ডাকেননি। নীলিমাও যাননি তাঁদের বাড়ি। সমরেশ মারা যাবার পরই পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি গড়ার সংকল্প করেছিলেন নীলিমা। পরিকল্পনা আগেই ছিল। কিছু পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করতে যে-হাদ্যামা পোহাতে হয় তা সহিতে রাজি ছিলেন না সমরেশ। অস্তুত অলস ছিলেন তিনি। অস্তুত অকর্মণ্য। অসততা আছে বলে চাকরিটা হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। বেশ তো, অন্য কিছু করো। অন্য চাকরি দেখো। হ্যাঁ দেখ। হ্যাঁ দেখছি। যেরে চাল নেই। মাস্তুর স্কুলের পড়া। সন্ধ্যা খরচ হতে হতে তলানিতে ঠেকে গেছে। সমরেশের কোনও তাড়া নেই। মাঝে মাঝে নীলিমার কথাই বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যান। কোথায় যান নীলিমা জানেন না। কিন্তু কোনও কাজ জুটিয়ে ফেরেননি। সমরেশের বন্ধু ছিলেন অর্ঘ্য দত্ত। শেয়ালদায় বিশাল ছাপাখানা আছে তাঁর। প্রায়ই আসতেন। বকাবকি তবতেন সমরেশকে— বিয়ে করেছিস, বউ বাচ্চা আছে, কিছু একটা তো করতেই হবে তোকে।

—ভাল লাগে না।

একই উত্তর ছিল সমরেশের— ভাল লাগে না। কিছু ভাল লাগে না।

এক-একদিন রাগ করতেন অর্ঘ্য। তুই বাস না? ঘুমোস না? সে-সব ভাল লাগে? অত ভাল কাজটা ছেড়ে দিলি। তুই কি বলতে চাস ওখানে সবাই ঘুম নেয়? সং কেউ নেই? তা তুইই থাকতিস। অসতের মাঝে সততার একমাত্র নিদর্শন হয়ে। ঠিক আছে, কাজটা ছাড়লি, ছাড়লি— অন্য কিছু জুটিয়ে নে।

সমরেশ চুপ। মাঝে মাঝে নিজেই পাখর করে তেলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল লোকটার। অর্ঘ্য বলতেন—জানলেন বউঠান, কলেজ থেকে আমরা কতবার মিছিল করেছি। মাইলের পর মাইল হেঁটেছি। এই সমরেশ কিন্তু কোনওদিন যায়নি। বলত ভাল লাগে না। আরে এরকম কথা কেউ হৃদয়তে শুনেছে? স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, আমাদের তখন রক্ত কথা বলে, সুভাষ বোসের বক্তৃতা শুনলে মনে হত, আজই, এখনি, দু'দশটা ব্রিটিশ না মারতে পারলে জন্ম বৃথা। তখন এই হতভাগা বলত, আমার ভাল লাগে না। একটাই কাজ ও খুব ভাল জানে। পড়তে।

নীলিমা কাঁদেন। রাগ করেন। অনুযোগ করেন। কখনও ভালবেসেও বোঝাতে যান। সমরেশ ঘুমোন।

ঘুম থেকে জাগে পাশ ফেরেন। আলার ঘুমোন। কোনও কথা বললেই—আমার ভাল লাগে না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন। নীলিমা বোঝার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন—কিছু কী হয়েছে, যাতে তুমি চঞ্চল আছ, অস্থির আছ, আমাকে কি বলা যায়।

—কিছু হয়নি।

—তবে?

—আমার ভাল লাগে না।

—আমরা কোথায় যাব? কী করব? কে আমাদের দেখবে? তুমি মাস্তুর কাটা দাবেবে না?

সমরেশ নিরুত্তর। দেওয়াল হয়ে যান। ক্রমশ দেওয়ালের পরিসি বাড়ে। বিজ্ঞান বাড়ে। দেওয়ালের সঙ্গে নীলিমারও ব্যবধান বাড়ে। নীলিমার প্রথমে ভয় করেছিল। তারপর অভিমান হয়েছিল। তারপর আর ভয় করল না। অভিমান ধুয়ে গেছে। শুধু বাগ হল। তাঁর কাছে বাথরুমের কল জোরে খুলে দিয়ে হু হু করে কাঁদতেন নীলিমা। টিংকার করে জাস্তর শব্দের মধ্যে নিজের ক্রোধ প্রকাশিত করতে চাইতেন। একদিন আর-বাগও হল না। ঘোঁরা হল। লোকটাকে ঘৃণা করতে শুরু করলেন। তখনই ওই অর্ঘ্য দণ্ডই একদিন বললেন—এ জি বেঙ্গলে লোক নেবে। আমার চেনা আছে। আপনি কি চাকরি করবেন বউঠান?

নীলিমা সম্মতি দিয়েছিলেন। করবেন। অশ্চর্য হয়েছিলেন। কারণ তাঁর চাকরির খবরে নিরুত্তর ছিলেন সমরেশ। এতটুকু প্রতিবাদ করেননি। একবারও বলেননি, না, ওকে বাইরে বেরুতে হবে না। মানুষটাকে অভিশপ্ত লাগত নীলিমার। এক মাসের মধ্যে কাজটা হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম মাস্তুর খুব কল্লাকাটি করত। বাবা তাকে ছোট না। আদর করে না। বাবাকে একটা অচেনা নক্ষত্রের মতো লাগত তার। মা অফিস যাচ্ছেন, এ নিয়ে তার অভিমান ও উদ্বেগের শেষ ছিল না। আস্তে আস্তে মাস্তুরও মেনে নিতে শুরু করল। বড় হচ্ছিল। বুঝতে শিখল। নীলিমা পড়ি-মরি করে অফিস থেকে ফিরতেন। রান্না করতেন। ছেলেকে পড়াতে। সমরেশ আরও সুবিধে পেয়ে গেলেন। বাড়ি ছেড়ে বেরনোই বন্ধ করে দিলেন একেবারে। অর্ঘ্য মাঝে মাঝে আসেন, জোর করে একতড়া প্রুষ গছিয়ে যান। বলেন—বউয়ের পরসায় খাওয়া এখনও চালু হয়নি। অন্তত নিজের ভাতের খরচটা প্রুষ দেখে জুটিয়ে নে।

সেটাও ঠিকমতো করেননি সমরেশ, শুধু দুমোতেন। সিগারেট খেতেন। জানলা দিয়ে চেয়ে থাকতেন। আর বই পড়তেন। মাস্তুর খুল থেকে ফিরলে দরজা খুলে দিতেও নাকি বিরক্ত বোধ করতেন। মাস্তুর মার কাছে অনুযোগ করত।

সমরেশের মৃত্যুর তিন-চার মাসের মাথায় বাড়ির কাজ শুরু করেছিলেন নীলিমা। তাঁর শরীর বরাবর সুস্থ ছিল, এও ভগবানের একরকম আশীর্বাদ বলেই মনে করেন তিনি। চেনা দেড় মাসের ছুটি নিলেন। সেই সময় মল্লিনাথ খুব সাহায্য করেছিলেন নীলিমাকে। নিজের একতলাটা ছেড়ে দিয়েছিলেন জিনিসপত্র রাখবার জন্য। তৃণাকুর তখন অমল-কমলকে পড়াতে। দু'জনেই খুব ভাল ছাত্র ছিল। তৃণাকুর খুব প্রশংসা করতেন। দেড় মাসে বাড়ি উঠে গেল। মল্লিনাথই বলেছিলেন—নীচটা দোকান করুন। একটা গ্যারেজ বানান। ছেলে কোনওদিন গাড়ি কিনতে পারে। এখানে মশাব যা উপদ্রব। সোতলায় থকুন।

বাড়ি করতে অনেক খরচ হয়ে গিয়েছিল নীলিমার। সঞ্চয় ফুরিয়ে এসেছিল। মল্লিনাথ বলেছিলেন—আজকাল তো খুব ফ্লাট চলেছে। আপনার ছোট সংসার। ওপরটা ফ্লাটের মতো করে একটা পাশ বিক্রি করে দিন।

ভাল পরামর্শই বলতে হবে। অনেক দেখে শুনে আনিসুজ্ঞামানকে ফ্লাটটা বিক্রি করেছিলেন নীলিমা, তাঁর সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লেগেছিল নীলিমার। বয়সে প্রায় তৃণাকুরের মতোই। দু'জনেরই পেশা অধ্যাপনা। নীলিমার গভীর বিশ্বাস ছিল, অধ্যাপকদের কখনওই বিশ্বাস করে ঠকতে হয় না। নীলিমা ঠকেননি। প্রতিবেশী হিসেবে আনিসুজ্ঞামানের তুলনা নেই। ভাই-বোন থাকেন। নীলোফাও অতি চমৎকার মেয়ে। দু'জনেরই দুর্ভাগ্য। ঈশ্বর একই সঙ্গে ভাইবোন দু'জনকে বিফল করে তুলেছেন, এমন শোনা যায়নি। আনিসুজ্ঞামানের খেতী। নীলোফা দম্ভ।

আনিসুজ্ঞামানকে ফ্লাট দেবার জন্যও অধিযুক্ত হয়েছেন নীলিমা। মুসলমানের সঙ্গে এক

বাড়িতে থাকা নিয়েও তাঁর বৈধব্যের পর মাছ-মাংস খাওয়ায় মন্তব্য করে উঠেছিল। তবে তার তীব্রতা ততখানি ছিল না এ জন্যই যে মানুষের মধ্যে নীলিমা সম্পর্কে এই সহনশীলতা তৈরি হয়েছিল যে, নীলিমা, বিধবা হয়েও আমির আহার করতে পারেন যখন তখন মুসলমানের সঙ্গে থাকবেন, এ আর বিচিত্র কি। বরং নীলিমাতেই একরকম সৃষ্টিচর্চা বজা যায়। আর এ সব নিয়ে ভাবনা ঘটিয়েছিলেন নীলিমার বোন ও ব্রাহ্মবধূরাই। এই মাথুতের গড়-পাড়ায় কোনও আত্মোচ্চনা বা সমালোচনা হয়নি।

মাছ-মাংস খাওয়া নিয়ে ছেলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন নীলিমা। তৃণাকুর বলেছিলেন—আমার কোনও সংস্কার নেই। তুমি খাবে।

—অনেকে অনেক কথা বলছে। সেগুলো হোকোও ভাল হবে মাস্তুল। তখন মনে হবে না তো, মা এগুলো না করলেও পারত।

—না। হবে না। কারণ মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এইসব নিয়ম আমি মানি না মা।

নীলিমা নিঃশ্বাস ছিলেন। এবার নিঃশব্দ হলেন। মাস্তুলের কথা তাঁর ভাল লেগেছিল। বাড়ি করার ব্যাপারেও মাস্তুল পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন নীলিমা। বোনেরা বলেছিলেন—কালারশৌচে কোনও স্তব কাজ করতে নেই। নীলিমা বলেছিলেন—তা হলে তো মাস্তুল ফাইনাল পরীক্ষাটা এবার স্থগিত রাখতে হয়। ওর জীবনে এর চেয়ে স্তব আর এখন কী হতে পারে।

নীলিমা শোনেনি। তাঁরাও আড়ালে বহু সমালোচনা করে কাল যাপন করেছেন। বাড়ি শেষ হবার পর ঘটা করে গৃহপ্রবেশও করেননি নীলিমা। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পূজা দিয়েছিলেন। বোনেরা তাঁদের বাড়ির পূজা-পার্বণে একবারও নীলিমাতে ডাকেননি কিন্তু নীলিমার বাড়ি করা হয়ে গেলে দেখতে এসেছিলেন।

চন্দ্రిমা বলেছিলেন—তোমার বাড়িতে সবসময় কীরকম আঁশটে গন্ধ লাগে দিদি। একটু পুজোটুজো করো।

তৃণাকুর ছিলেন সামনে। বলেছিলেন—তাই নাকি? আঁশটে গন্ধ? আসলে গন্ধটা শুধু ঘরেই না, মার মুখেও তুমি পাবে। গায়েও পেতে পারো ছোটমাসি।

চন্দ্রিমা চোখ গোল গোল করে বলেছিলেন—তাই নাকি? কেন?

তৃণাকুর হেসে বলেছিলেন—বাঃ! মা বিধবা হয়েও মাছ-মাংস খায়, না? মার গায়ে একটু বেশি গন্ধ লাগে তাই।

একবারে নিবে গিয়েছিলেন চন্দ্রিমা। বলেছিলেন—তোর বড় কটাস কটাস কথা মাস্তুল। একবারে দিদির মতো।

সেই চন্দ্রিমার বাড়িতেই একবার নিমন্ত্রণের ডাক এল নীলিমার কাছে। সমরেশ মারা যাবার দেড় বছর পর। মানসিক সত্যনারায়ণ করেছিলেন চন্দ্রিমা। তাঁর ছেলের টায়ফয়েড হয়েছিল। সে সেয়ে উঠেছে। এখন তার মহিমায় পূজা। সঙ্গেবেলায় চন্দ্রিমার মানিকতলার বাড়িতে গেলেন নীলিমা ও তৃণাকুর। প্রচুর আত্মীয় এসেছেন চন্দ্রিমার। ছাদে পূজা হচ্ছে। প্রতিমাও এসেছেন। সঙ্গে প্রতিমার শাশুড়ি। কত যে লোক! পুরুষ মহিলা মিলিয়ে একশোজনের কম নয়। নীলিমারা যখন পৌঁছিলেন তখন পূজা প্রায় শেষ। পুরোহিত ঘোষণা করছেন—‘শান্তির জল।’ সকলে ছুঁছোঁড়ি করে কাছে বসছেন। শান্তির জল ফসকে গেলেই অশান্তি। মেয়েরা ব্রহ্ম দিয়ে পা ঢাকছে। বউরা কাপড় দিয়ে। পুরুষরা পাঞ্জাবি আর পাঞ্জামা পরেছে। অনেকে ধূতি। ছোটরা ছাড়া প্যান্ট-শার্ট পরা নেই কেউ। মেয়েদের পরিধানে তাঁতের শাড়ি বা সিন্ধ। পোশাকে-অশাকে, ধূপের গন্ধে বেশ একটা পূজার পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। সত্যনারায়ণের কাছে মেয়ে-পুরুষ সব গড় করছেন। মনে মনে কী কলছেন কে জানে। নীলিমা গড় করলেন না। দু’হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন। পূজা শেষ হয়ে যাওয়ায় এ ধারে-ও ধারে নানা রকম জটলা তৈরি হয়েছে। নীলিমার কানে এল একজন বলছে—অ! লাউবট! তাতে কেউ

কালোজিরে ফোড়ন দেয় নাকি।

কেউ তার জবাবে বলছে—তা আর বলছি কী? দেখি লাউ রাঁবে কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে।  
কললুম, রান্না না হয় করোনি বউমা। কিন্তু লাউঘট কি খাওনি কখনও?

—তা সে কী বললে?

—সে ন্যাকাপানা কথা শুনে তোমার গা জ্বলে যাবে। বলে কিনা, কেনটাকে কী বলে আমি  
জানি না মা।

—ন্যাকা। জানো না। বলি আমাদের কি কেউ কিছু শিখিয়ে দিয়েছিল? ইচ্ছে থাকলে আপনি  
হয়।

—তা তাকে দেখতে কেমন?

—ভাল। রংটা একটু চাপা।

—নাক চোখ?

—বেশ টানা টানা। গড়নটা একটু মোটার দিকে।

—গানটান জানে?

—হ্যাঁ। নাচও জানত। আমি বাপু বলে দিয়েছি। আগে যা করতে, করতে। এখন ও সব  
খিঙ্গিপনা চলবে না। নাচ আর করে না। গায়। সেও এক ঝামেলা বাপু। সময়-অসময় নেই।  
হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়বে।

—থাক থাক। একবারে বেশি কিছু বোলো না। একটা হলটলে আপনিই সব বন্ধ হয়ে  
যাবে।

—হ্যাঁ। আর কাজই বা কি? আর বড় নির্লজ্জ বুঝলে। কতবার বলেছি, বউমা শব্দ করে  
হেসো না। কানেই তোলে না। বর ঘরে এসেই গুজ গুজ আর হা হা হি হি।

—আজকাল বাপু সবই ওই। তা দিলে বুলে কেমন?

—সে আর কি। যা দিয়েছে সে তো মেয়েকেই। আমরা তো সঙ্গে নিয়ে সয়ে যাব না।

—কিন্তু সে যাই দিক, বউকে দিয়ে একটু কাজটাজ করাবে। আর কিছু না হোক রোজ অন্তত  
ষষ্ঠরের মশাবিটা টাঙিয়ে দিতে বলবে। প্রথম থেকে লাগাম না টানলে পরে আর সামলাতে  
পারবে না। তা আনলে না কেন বউকে?

—শরীর খারাপ।

—হবে নাকি? এত ত্যাগাতাড়ি?

—না। না। সেই শরীর খারাপ না।

—আ বুঝলুম।

নীলিমার বেশ লাগছিল শুনতে। কথা কুরিয়ে গেল ও দিকে। কিংবা হয়তো ফুরোয়নি।  
নীলিমা জানেন দুই শাস্ত্রভিতে বউয়ের নিন্দা শুরু করলে কখনও ফুরোয় না। দুই বউতে  
শাস্ত্রের নিন্দা করলেও তা অফুরন্ত। তবু তিনি খানিকটা এগিয়ে গেলেন। একপাশে পুরুষরা  
দাঁড়িয়ে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে কথা বলছেন। নির্বাচন, নাকি তা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের খেয়ালখুশি বা  
স্বার্থসাধন, তা নিয়েও তর্ক হচ্ছে। একজন বলছে—কংগ্রেস শেষ। ওরকম একটা জাতীয় দল।  
গান্ধি একেবারে শেষ করে দিয়ে গেল।

আরেকজন, সে বুঝি গান্ধিভক্ত, গলা তুলে বলল—শোনো, গান্ধি কী করে গেলেন এখন  
বুঝতে পারবে না। সে-কথা বলবে ইতিহাস।

—সব কথাই ইতিহাস বলে।

—যাই বলা ভারতবর্ষে কংগ্রেস এখনও অবিসংবাদী দল। এক কথায় যার একটা  
সর্বভারতীয় গ্রহণযোগ্যতা আছে।

—সে তুমি যাই বলা। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস শেষ। কোয়ানিশনও হবে না। এ বার

কমিউনিস্ট পার্টি আসবে।

—মুর! কমিউনিস্ট পার্টি আবার একটা পার্টি নাকি। একটা দল কতবার ভাঙল। দলটার কোনও নির্দিষ্ট নেতৃত্ব আছে? যে-দলের সাংগঠনিক স্থিতি নেই; আর্থিক স্বাধীনতা নেই, সে-দল কী করে ক্ষমতায় আসবে?

—শোনো, অত হেলাফেলা কোরো না। দলীয় মতভেদ কোরো নেই। কংগ্রেসে নেই? পার্টি বছরের মধ্যে কংগ্রেসে ভাঙন ধরবে, সেখাে নিশ্চয়।

—আরে মুর! কিছুই হবে না। এ দেশের মানুষ কংগ্রেস ছাড়া কিছু গোথে নাকি? কংগ্রেস শব্দটাই এখনও মস্ত্রের মতো কাজ করে। কমিউনিজম বুঝতে গেলে শিক্ষা দরকার। সে-শিক্ষা এ দেশে ক'জনের আছে? এ দেশে সবসময় যা কাজ করে তা হল নাম-মাহাত্ম্য। একটা ইমেজ। তা ছাড়া কোনও পার্টি কখনও জনগণের জন্য ভাবে না। ভাঙে নেতৃত্বের বিরোধে।

—তুমি কি বলতে চাও রাশিয়ায় আগে গণশিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তারপর বিপ্লব এসেছে?

—না। তা নয়। তবে রাশিয়ায় লেনিন ছিলেন। সে-রক্ষম নেতৃত্ব এ দেশে কোথায়? এ দেশে ওরকম গণ-অভ্যুত্থান কোনওদিন হবে না।

—কেন হবে না? এদেশে তেভাগা আন্দোলন হয়নি? তেলেকানা বিপ্লব হয়নি? প্রত্যেকটি অভ্যুত্থানেই কিছু নেতৃত্ব দিয়েছিল নিরক্ষর নিপীড়িত মানুষ। শোনো, প্রতিবাদের জন্য কেতাবি শিক্ষা প্রথম শর্ত নয়। প্রতিবাদ আসে ধারাবাহিক শোষণ, বঞ্চনা ও অপমান থেকে।

—তা হলে শিক্ষার প্রসার না হলেও চলে বলছ?

—না। তা কেন? শিক্ষা চেতনার দ্রুত স্বরূপ ঘটায়। আবার শিক্ষা চেতনার হত্যাকারী হিসেবেও কাজ করে।

—সে আবার কী!

—হ্যাঁ। কারণ শিক্ষা মানুষের কাজের পরিণতি অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ফলে মানুষ স্বার্থপর হতে থাকে। তেভাগা আন্দোলনের শেষের দিকটা ভাব। সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মধ্যে কি যায়নি? শেষের দিকে কিছু বুদ্ধিজীবীরা ওই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল।

—কি? কেমন আছ?

চমকে উঠলেন নীলিমা। ভাবতে ভাবতে খুবই অনামনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রতিমার শাওড়ি সামনে দাঁড়ানো। সঙ্গে চন্দ্রিমার নন্দ। নীলিমা হাসলেন। বললেন—ভাল।

প্রতিমার শাওড়ি কপট উদ্বেগে মুখ ভরিয়ে ফেললেন—না। মোটে ভাল দেখাচ্ছে না তোমাকে। আর তা তো হবেই। এই বয়সে অত বড় শোক। তার মধ্যে এত খাটুনি। খাওয়া-দাওয়াও তো ভালভাবে হয় না।

—খাওয়া-দাওয়া হয় না কেন?

—না মানে, বিধবা মানুষ, কষ্ট তো হয়। তার ওপর চাকরি-বাকরি করো।

নীলিমা হেসে বলেছিলেন—আমার কষ্ট হয় না। আমি তো সবই খাই।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ভদ্রমহিলার মুখ। বলেছিলেন—অ। তা হলে সত্যিই তুমি মাছ-মাংস খাও? কণাটা শুনে বিশ্বাস করিনি। আচ্ছা, নিজের মুখে কণাটা বলতে তোমা' লজ্জা করল না?

চন্দ্রিমার নন্দ বললেন—সবার তো লজ্জা সমান হয় না। কারও কারও লজ্জা থাকেও না।

নীলিমা বলেছিলেন—নিজের মুখে যেতে লজ্জা পাই না, বলতে কেন লজ্জা পাব মাসিমা?

—ছি ছি। তোমাকে দেখে ঘেঁষায় আমার গা কেমন করছে। হিন্দু বিধবায় মাংস খায় এ আমি ভাবতেও পারি না।

নীলিমা সহজ গলায় বলেছিলেন—আমাকে দেখতে আপনাকে কে বলল মাসিমা? আমি তো ডাকিনি। আমাকে দেখে শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন কেন আপনি? আপনি এখানে যেতে

এসেছেন। খেয়ে চলে যান।

—কি? এত বড় কথা? এত বড় অপমান?

প্রতিমা আর চন্ড্রিমা দৌড়ে এসেছিলেন এ দিকে। কী হয়েছে? কী হয়েছে? হারপাশে আরও কিছু কৌতূহলী মুখ। প্রতিমার শাশুড়ি বলছেন—বউমা। এরকম অপমান হেঁর বলেই কি আমরা এনেছিলে? ছি ছি, একুনি আমি চলে যাব।

চন্ড্রিমা অপ্রকৃত—কী হয়েছে মাসিমা? কী হয়েছে?

চন্ড্রিমার নন্দ প্রতিমার শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রতিমার শাশুড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন।

চন্ড্রিমার নন্দ বলছেন—তোমাকে তখনই বলেছিলাম বউদি। যাকে-তাকে খেলে না। যারা নিয়মকানুন ধর্মধর্ম মানে না...

নীলিমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠেছিল অপরিচীত কোভ। আশ্চর্য। তিনি তো কারও ক্ষতি করেননি। কারও নিজের ব্যাপারে নাক গলাননি। তা হলে? তবু নীলিমা হিত হয়েছিলেন। চন্ড্রিমা বলেছিলেন—তুমি কি একটু সহিতে শেখোনি নিদি? বয়স্ক মানুষটা একটু কি বলল না বলল অমনি দশ কথা বলে বসলে। ছি ছি। আমার বাড়িতে নিমন্ত্রিত মানুষটা!

নীলিমা বলেছিলেন—আসলে আমাকেই তোরা ডাকা উচিত হয়নি রে চাঁদু। তোরা নন্দ ঠিকই বলেছে।

এর পরও আর সবার মতো পাত পেড়ে সত্যনারায়ণের সিন্ধি খেয়ে এসেছিলেন নীলিমা। ইচ্ছে করছিল না। তবু মনে হয়েছিল, না খেলে, চন্ড্রিমার অপমান হয়। কিন্তু সারাক্ষণ মন ভার হয়ে ছিল। রাত্রে বাড়ি ফিরে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। না। তাঁর কোনও পাপবোধ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, বিধি-বিধানের মধ্যে নয়, পুণ্য ও কল্যাণের সবটাই নিহিত থাকে ভালবাসার মধ্যে। সত্যতার মধ্যে। সমরেশ বেঁচে থাকতেই নীলিমার তাঁর প্রতি টানের মৃত্যু ঘটেছিল। শোকপালন নীলিমা সারা জীবন ধরেই করছেন। আর কত? দাম্পত্য বলতে যা বোঝায় তা বোধহয় সাকুল্যে বছরখানেক যাপন করেছেন নীলিমা। আজ আর সে-সব নিয়ে ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ হয় মানুষের অর্পহীন সংস্কার নিয়ে। সমরেশের প্রতি একটুও প্রেম না থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি বৈধব্য পালন করতেন তবে ওই বৈধব্যই প্রেমের ধ্বজা হয়ে থাকত। মানুষের তাতেই শান্তি। ধ্বজা উড়িয়ে। প্রতীক চিহ্নিত করে। আসলের চেয়ে নকলের ফাঁদেই মানুষ ডুই রইল চিরকাল।

## একুশ

—তোমার কি কোনও ছোট নাম নেই?

কয়েকদিন পাশাপাশি বাস করার পর বলেছিলেন নীলিমা। আনিসুজ্জামান হেসেছিলেন। তাঁর হাসিটি চমৎকার। এই রোগচর্চিত মুখেও তাঁর হাসিটি সুন্দর নয়ন-সুখকর হয়ে ওঠে। বলেছিলেন—মেঠা। আমার নাম মেঠা। তবে ও নামে ডাকলে আমার খুব অস্বস্তি হবে মাসিমা।

—কেন?

—সবসময় আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়ে যাবে আর নিজেকে খুব ছেলেমানুষ লাগবে।



—তুমি তো ছেলেমানুষই।

—না মাসিমা। অধ্যাপকদের ছেলেমানুষ একধরম হতে চাই।

—বেশ। আমি তোমাকে ডাকব আমি বলে। আপত্তি নেই তো?

—না না। আপত্তি থাকবে কেন?

অনিসৃজ্ঞমানকে বেশ লাগে নীলিমার। প্রচুর পড়াশুনা ছেলেটির। যে-কোনও প্রসঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে। এতদিন পাশাপাশি বাস করছেন কিন্তু আর শর্যৎ কখনও তাঁদের সঙ্গে অসুবিধে হয়নি। নীলোফা মাঝে মাঝে চলে আসে এ বিকে। নানা রকম গল্প করে নীলিমার সঙ্গে। এক জায়গায় দু'জনেরই বেশ মিলে গেছে—গাছ করায়। নীলিমা তাঁর চওড়া বাগানকিতে অনেক গাছ করেছেন। নীলোফাও প্রচুর গাছ করেছে তার বাগানশায়। বাগান করা সম্পর্কে বেশ ভাল ধারণা তার। ইদানীং কনসাই সম্পর্কে নানা রকম পড়াশুনোও করেছে নীলোফা। কনসাই বাগান নীলিমারও ভাল লাগে, কিন্তু বড় খাটুনি। এখন আর অত খাটতে ইচ্ছে করে না।

অন্যান্য ঘর গোছগাছ শেষ করে নীলিমা ছেলের ঘরে এলেন। যাবার সময় ওঁরা সমস্ত আসবাব নিয়ে গিয়েছিলেন। নীলিমা বাধা দেননি কারণ সে সবই শর্মির বাবার দেওয়া ছিল। নীলিমার পুরনো খাটটা, শর্মি আসার পর লবিতে রাখা ছিল। মিষ্টুর খেলার জায়গা ছিল সেটা। সেই খাটটাই আবার ছেলের ঘরে দিয়েছেন নীলিমা। পুরনো চেয়ার-টেনিলটা ছাত্তের ঘরে তোলা ছিল। বিয়ের আগে পর্যন্ত তৃণাকুর ওটাতেই লেখাপড়া করতেন। নতুন বাড়ি করলেও আসবাবগুলি একই রেখেছিলেন নীলিমা। সে-সব আবার কাছে লাগছে। তৃণাকুরের বইয়ের টান দেখে তার ঘরের দেওয়াল জুড়ে বই রাখার তাক করে দিয়েছিলেন নীলিমা। তৃণাকুর, বি এন আর যাবার সময় বইগুলোই শুধু রেখে গিয়েছিলেন মায়ের জিন্মায়। অবশ্য, বই ছাড়া আর কীই-বা ছিল তাঁর।

আবার সেই পুরনো বাড়ি, পুরনো ঘর, পুরনো আসবাব। কিন্তু তৃণাকুর? তিনি কি সেই পুরনো মাতৃ হয়ে ফিরে আসতে পারছেন। নীলিমা বি এন আর যাননি। কারণ শর্মি একবারের জন্যও তাঁকে যেতে বলেনি। ওখানে মিষ্টুর জন্মদিন পালিত হয়েছে। তৃণাকুর অবশ্য তার আগে এসেছেন। বলেছেন—মা, তুমি যাবে তো? নীলিমা মিষ্টুর জন্য। কিনে রাখা উপহারগুলি তৃণাকুরকে দিয়ে বলেছেন—মিষ্টুরকে দিস। আমি আবার এতদূর যাব। শর্মির দেহ না।

তৃণাকুর কথা বাড়াননি। তাঁর চোখমুখে তৃপ্তি ছিল না। সুখ ছিল না। তিনিও যেন তেমন করে চাননি নীলিমা বি এন আর যান। নীলিমাও বুঝে হয়েছিল। ভেবেছিলেন—মাঝুটাও এমন। এত স্বার্থপর। দূরে গেলেই কি মায়ের সঙ্গেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মানুষ।

নীলিমা জানেন, শর্মিকে খুব ভালবাসেন তৃণাকুর। এবং, সেই ভালবাসা, অন্ধ। তৃণাকুরের কাছে, শর্মি যদি-বা কোনও অন্যায় করে, না বুঝে করে। শর্মি ছেলেমানুষ। শর্মি অপরিণত। কিন্তু নীলিমা নিজে, হয়তো একজন নারী বলেও, কিংবা হয়তো তৃণাকুরের মা বলেও টের পেতেন শর্মির জগতে তৃণাকুরের জায়গা একবারে একটুখানি। ভালবাসা পাননি বলে, ভালবাসা চেনার একটা তাঁর ইচ্ছে আছে নীলিমার। তাঁর চরপাশের মানুষের মুখে, দম্পতির মুখে তিনি সেই ভালবাসার সন্ধান করেন এবং তাঁর বিশ্বাস, যা ওই দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ থেকে জন্ম নিয়েছে, তা হল, মানুষ মানুষের সঙ্গে সহবাস করে মাত্র। ভালবাসে না। অসংখ্য শর্ত ও পরস্পরনির্ভরশীল সহবাস। অপরিস্রব লাভ ও স্বার্থসাধনের সহবাস। চোখ বন্ধ কবলেই তিনি দেখতে পান দীর্ঘ দূরতম প্রাপ্ত পর্যন্ত অসংখ্য প্রেমহীনতার মিছিল। তিনি নিজেও তার মধ্যে আছেন বলে তাঁর কষ্ট। কিন্তু তৃণাকুরও আছেন বলে তাঁর যন্ত্রণা।

তৃণাকুর, হয়তো-বা, যেমন বইয়ের পাতায় নিজেকে নিবদ্ধ রাখেন, যেমন একতরফা আনন্দরস বই থেকে সংগ্রহ করে নেন, তাতে ওই নিষ্পৃহ বই, সে কিছু অসাধারণ

অক্ষরসংবলিত অবস্থায় পাঠক নিরপেক্ষ নিম্পূহ ও উদাসীন থাকে, তৃণাকুরের রসপ্রাপ্তিতে বা অপ্রাপ্তিতে তার কিছু যায় আসে না, তেমনই শর্মি সম্পর্কেও এই একতরফা প্রেম তাঁর মধ্যে জাগিয়ে রাখেন।

এখানে, এই বাড়িতে, নীলিমা একজন প্রকৃষ্ট তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শর্মি সম্পর্কে তৃণাকুরের যতটুকু কম লাগত, ততটুকু নীলিমার কারণেই ঝটকে বলে তিনি মনে করতেন।

—মা, আজ শর্মি আমার জন্য খাবার আদে অপেক্ষা করেছিল। তুমি ওকে জোর করে খাইয়ে দিয়েছ কেন?

—জোর তো করিনি। আমি বললুম, মাস্তুর আসতে দেবি হচ্ছে। তোমার ক্রিমিকে পেয়েছে শর্মি? খেয়ে নেবে? সে তো আপত্তি করেনি।

—তোমার বোকা উচিত ছিল মা। ও আমার জন্য অপেক্ষা করেছে। তুমি নিজে না খেয়ে ওকে খাইয়ে দিলে। মা, আমি তো জানিই তুমি আমাকে ভালবাসো। তার জন্য তোমার খাবার টেবিলে অপেক্ষা না করলেও চলত।

—কিন্তু শর্মিকে, তোমার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য অপেক্ষা করতে হত, এটাই কি তুমি বলতে চাইছ?

—ঠিক তা নয়। তুমি যখন খেলে না, ও-ও না খেতে পারত। তা ছাড়া অপেক্ষার মধ্যে একরকম আনন্দ আছে মা।

—সে তো বললেই পারত, এখন খাবে না, খেল কেন?

—তা হলে তুমি ওকে জোর করত। তুমি যা ভাল বোঝো সেই মতোই তুমি এ বাড়ির সকলকে চালাতে চাও।

দু দিন আগে নীলোদ্ভাকে সঙ্গে নিয়ে সুপার মার্কেট থেকে পর্দা কিনে এনেছেন নীলিমা, মাস্তুর ঘরে এখন বকঝকে পর্দা খাকা দরকার। দুটি গাছ রেখেছেন জানালায়। এই জানালার পেছনেই একটি আমগাছের মাথা। কোনও বৃক্ষকে ওপর থেকে দেখতে বেশ লাগে নীলিমার। ফেন সেইসব বৃক্ষের সমস্ত রহস্য একবারে উন্মোচিত হয়ে যায়। তার কোনও ডালে পাখির বাসা, কোনও ডাল মঞ্জরিত হচ্ছে, কোনও ডালে বাসা বেঁধেছে ডেও পিপড়ের দল— সব বলা যেতে পারে। দীর্ঘ উন্নত, ব্যক্তিত্বশালী বৃক্ষকে তখন ছেলেমানুষ ও নির্ভরশীল দেখায়।

দরজার শব্দ হল। নীলিমা ডাকালেন। ময়না ঢুকছে। ময়না তার সরল যুযুধান মুখ নিয়ে প্রশ্ন করল— আইজ দাদায় আইব?

—হ্যাঁ।

নীলিমা, অনেক সময়ই ময়নার সঙ্গে নানাবিধ গল্প করে থাকেন। ময়নার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্য গড়ে উঠেছে বলা যায়। ময়না, এত দিনের পুরনো লোক, কিছুটা সরল কিছুটা লোভী কিছু মনের গভীরে সে সাদাসিধে সংসারী মানুষ। নীলিমার সঙ্গে তার সখ্য হওয়া স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু ময়নার দীর্ঘ সময়ের নানাবিধ সততা ও আনুগত্য নীলিমার মধ্যে একটি হালকা শ্রদ্ধার স্তর ও মায়া জাগিয়ে তুলেছিল। এই মাথুরের গড় ও ফটিক বিল বস্তির পাশাপাশি সহাবস্থানের মতো, পারস্পরিক অনিবার্য নির্ভরশীলতার মতো, নীলিমা ও ময়নাও এক বিশেষ সখ্য গড়ে তুলেছেন। নীলিমার কর্তৃত্বাব, ময়নার দাস্যতাব। তবু এই পৃথিবীতে এও এক সম্পর্ক।

ময়না চারদিক দেখতে দেখতে ঝাঁটা হাতে নিয়ে কাজ শুরু করে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে— কত কইরা পোজার বিয়া দিলেন। নাটনির স্যাণা করলেন। কিন্তু দ্যাখেন কপাল। বউদি আর আইবই না?

—না। কাল ওরা মিউচুয়াল ডাইভোর্সের জন্য আবেদন করেছে।

ময়না হাঁ করে আছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। মাসিমায় খটমট ইংরাজি কয়। ময়না জানে, এ পাড়ায় মাসিমাই একমাত্র মহিলা যিনি পুরুষদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে আপিস যেতেন। ময়নারা যে-কাজ করে, সে তো আলাদা। সে-কাজ তো পেটের দায়ে, বাধ্য হয়ে করা। ময়নার রর কুঁড়ে, অলস, মদ্যপ। ময়না কাজ না করলে ছেলেমেয়েগুলোকে কে খাওয়াবে! নীলিমা একদিন হেসে বলেছিলেন— তোর সঙ্গে আমার কোনও পার্থক্য নেই রে ময়না।

ময়না হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। বলেছিল— কী যে কন। আপনার কত ল্যাখাপড়া!

তবে ময়না দেখেছে মাসিমা মানুষটার কপাল খারাপ। মেসোমশাইকে দেখেছে। খুব খিটখিটে ছিল লোকটা। রোগ-বালাই নেই, তবু সারাদিন শুয়ে থাকত আর কারণে-অকারণে খিটমিট করত। এক-একদিন ভয়-ভয়ও করত ময়নার। একদিন মাসিমা আপিসে। দাদা কলেজে। ময়না ঘরে কাজ করছে। তখন ঘরবাড়ি এরকম ছিল না। মাসিমাদের পুরনো বাড়ি। ময়না বালতি এনে ঘর মুছছে। সমরেশ ডাকলেন— ময়না। শোন।

ময়না শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সামনে গেল। সমরেশ কিছুক্ষণ ময়নার দিকে চেয়ে বললেন— তোর স্বামী কী করে?

—ছুতারের কাজ।

—বাঃ সে তো ভাল কাজ। ভাল পয়সাই তো পায়।

—পাইলে কী হইব। মদ খাইয়া সব উড়াইয়া দ্যায়। সংসারে কিসু দ্যায় নাকি?

—তোর ভাল শাড়ি-ব্লাউজ নেই, না?

ময়নার মুখ নিচু। কাপড় খুঁটছে। বালিশের তলা থেকে তিনটে দশ টাকার নোট বের করেন তিনি। বাড়িয়ে ধরে বলেন— তোর ব্লাউজ ছেঁড়া। হুক নেই। তুই যখন ঘর মুছিস, আমি সব দেখতে পাই। চারটে ভাল ব্লাউজ কিনে নিস, কেমন?

সারা শরীর কঁপে উঠেছিল ময়নার। ভয়ে না লজ্জায় সে জানে না। টাকা নেবার জন্য সে হাত বাড়াতে পারেনি। সমরেশ ময়নার হাত টেনে টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন— যা। চলে যা। ওইসব দেখলে আমার কষ্ট হয়।

তিনদিন স্বস্তি পায়নি ময়না। বাড়ি ফিরে কেবলই মনে হচ্ছিল সে যেন কাকে ঠকাচ্ছে। এই টাকার কথা সে কারওকে বলতে পারেনি। কালীকে না। মনোকে না। পরদিন সে কাজে গেল না। তার পরদিনও না। অথচ, সে জানে, কাজে না গেলে খুব অসুবিধা হয় মাসিমার। কিন্তু সে, অদ্ভুত অসততার দংশনে জ্বলছিল। দু'দিন ক্রমাগত ভাববার পর সে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়— টাকাটা ওইখানেই ফেলে রেখে আসা উচিত ছিল তার। সমরেশ যদি-বা সহানুভূতিবশেই কিছু দিয়ে থাকেন, তবে মাসিমার সামনেই তা দিতে পারতেন। সে, এই ত্রিশ টাকার ভার বইতে পারেনি। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় মাসিমাকে সব খুলে বলেছিল। সে-দিন, অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন নীলিমা। ময়না বলেছিল— আপনে বিশ্বাস করেন। আমার কোনো দোষ নাই।

নীলিমা বলেছিলেন— আমি জানি, ময়না, শোন, কাল থেকে মাষ্ট্র কলেজে চলে গেলে তোর কাজ শেষ হোক বা না হোক তুই চলে যাবি। আবার বিকেলে ছটায় আসবি। পারবি না?

ময়না ঘাড় নেড়েছিল— পারুম।

সে ত্রিশ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিল নীলিমাকে। নীলিমা টাকাটা স্পর্শ করেননি। ময়না দেখেছে, সে যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনই দু'দিন পড়েছিল সেটা, টেবিলের ওপর ধূপদানি চাপা দেওয়া। পরে আর দেখেনি।

আনিসুজ্জামানের দরজায় বেল দিলেন নীলিমা। ভেতরে মশলা বাটার শব্দ হচ্ছিল। নীলোফা বাড়িতে কাজের লোক রাখে না। সব কাজ একাই করে। আনিসুজ্জামান দরজা খুলে দিলেন। হাসলেন নীলিমাকে দেখে। দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে বললেন— আসুন মাসিমা। আজ তো মাষ্ট্রদা আসছেন।

নীলিমা বসতে বসতে বললেন— হ্যাঁ। তাই এলাম। তোমার কলেজ কীটায় শেষ আজ?

—আপনার কখন লাগবে বলুন, আমি হাজির থাকব।

—আসলে, মাস্তু তো আজকাল ঠিকমতো ইটিতে পারছে না।

—ইটিতে পারছে না। সে কি।

—হ্যাঁ। ছোটবেলায় ওর পা দুটো কমজোবি ছিল। অনেক চিকিৎসা করে ওকে ইটিতে শেখানো হয়েছিল। বোধহয়, আবার কিছু সমস্যা হয়েছে।

—ওঃ। এ তো খুব খারাপ হল।

নীলিমা হাসলেন। অনিসুজ্জামান দেখলেন— হাসি দিয়ে দুখে ঢাকছেন মাসিমা। বললেন—  
ভাল আর কোন দিকে হল বলো তো। কাল ওরা ডিভোর্স আদালত করল।

—ওঃ। হয়ে গেল।

—হ্যাঁ। অদ্ভুত হয়ে যাবার কথা ছিল।

অনিসুজ্জামান বলেন— মাস্তুরার হাঁটার সমস্যাটা কত দূর।

—ইটিতে পারছে। কিন্তু পা তুলতে পা ফেলতে অসুবিধে হচ্ছে। একটু ঘষে ঘষে, ধীরে ধীরে ইটিছে ও এখন। ও তো বিকেলে আসবে, কুমি যদি তখন থাকে। ওকে তো আমি একা সিঁড়ি ভাঙতে সাহায্য করতে পারব না।

—হ্যাঁ, মাস্তুদা খুব মোটাও হয়ে গেছেন কিছু। ঠিক আছে মাসিমা। আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এসে যাব।

প্রায় সাতটা নাগাদ ট্যাক্সি চেপে তৃণাকুর মাথুরের গড়ে পৌঁছলেন। একটি মাত্র সুটকেস তাঁর সঙ্গে আর ডিকি ভর্তি বই। কেবল বই। এই ক'বজুরে তিনি বি এন আর-এর বাড়িতে আরও কিছু বই-ই মাত্র সংগ্রহ করেছেন। কোনওমতে দড়ি দিয়ে বেঁধে বইগুলি এনেছেন তিনি। ট্যাক্সি দাঁড়াতে দেখে ওপর থেকে নেমে এলেন নীলিম। ময়নাও এল পিছু পিছু। দাদা আসবে বলে সে অপেক্ষা করছিল। ওদের পেছনে অনিসুজ্জামান আর নীলোফা। ট্যাক্সির দরজা খুলে বেরোলেন তৃণাকুর। তাঁর মুখে অপ্রতিভ হাসি। বললেন— বইগুলো...

নীলোফা এগিয়ে এল। বলল— আমি আর ময়নাদি সব নিয়ে যাচ্ছি। আপনি ঘরে যান মাস্তুদা।

তৃণাকুর বললেন— ভাল আছিস নীলু? অনি, তুমি ভাল আছ?

নীলোফা বলল—ভাল।

তার মুখ দেখা যায় না। কিন্তু অতি মিষ্টি ও সুরেলা কণ্ঠ হওয়ায় সব সময় মনে হয় সে অতি প্রসন্ন। সব সময় হাসছে। তৃণাকুর পা ঘষে ঘষে সিঁড়ির দিকে এগোন। নীলিমা আর অনিসুজ্জামান তাঁর দু'পাশে দাঁড়ান। তৃণাকুরকে সিঁড়ি দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ছেলের ঘরে আলো নিবিয়ে বসেছিলেন নীলিমা। তৃণাকুর বাথরুমে। নীলিমা দু'টি শোবার ঘরের সঙ্গেই লাগোয়া বাথরুম করেছিলেন। ভাগ্যিস করেছিলেন, এখন মাস্তুর কত সুবিধে হচ্ছে। এ ঘরের ও পাশেই অনিসুজ্জামানের ঘর। তারও বাথরুম এ বাথরুমের উল্টোদিকেই। দু'টি ফ্ল্যাট একেবারে প্রতিবিম্বের মতো করেই তৈরি করা হয়েছিল তখন। তৃণাকুর বাথরুমের দরজা খুললেন। ভেতরকার হালকা আলোয় তাঁকে অতি বিষন্ন দেখাচ্ছে এখন। এ ঘরে কোনও আয়না নেই। বাথরুমের ভেতরেই একটি ছোট আয়না লাগানো আছে। পাশে দেওয়াল-বাগে দাঁড় কড়ার সরঞ্জাম, চিকুন, পাউডার— সব বেখে দিয়েছেন নীলিমা। তৃণাকুর চুল আঁচড়ে, গায়ে পাউডার দিয়ে বাথরুমের আলো নিবিয়ে এলেন। নীলিমার মনে হল, কবে, কোন যুগ আগে, এরকমই কোনও স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। আজ বেন, সেই স্বপ্নটাই টুকরো করে বসিয়ে দিয়ে গেল সময়। হয়তো তা নয়, হয়তো, যখন তৃণাকুরের বিয়ে হয়নি, এমনি করে ছুটির

সম্মুখলোয় দু'জনে বসে গল্প করতেন। তৃণাকুর কবিতা পড়তেন। তাঁর খুব প্রিয় কবি ইয়েটস। নীলিমার মনে আছে, একটি কবিতা শুনিয়েছিলেন তৃণাকুর, সেই কবিতার বিষয় ছিল একটি বেড়াল, যে, খোলা মাঠে পড়ে থাকা অপকণ জ্যোৎস্না গারে মাখছে। সে চাঁদ দেখছে। সে জানে না তার নিজস্ব চোখ চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে। শেষ লাইনগুলো মনে আছে নীলিমা—

Does Minnaloushe know that his pupils  
Will pass from change to change,  
And that from round to crescent,  
From crescent to round they range?  
Minnaloushe creeps through the grass  
Alone, important and wise,  
And lifts to the changing moon  
His changing eyes.

এই কবিতাটি শোনার পর থেকে বেড়ালকে আর তুচ্ছ করতে পারেননি নীলিমা। তাঁর সত্যিই মনে হয়েছে, বেড়ালরা জ্যোৎস্নায় লুটোপুটি খায়, চাঁদ দেখে। এবং এখন, এতদিন পর তাঁর আবার মনে হচ্ছে চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া চোখ, সে কি শুধু বেড়ালের? মানুষের নয়? মানুষ নিজেই কি জানে, নিজের অজ্ঞাতসারে তার চোখ কত বদলে যায়।

তৃণাকুর পা খসে ঘষে বিছানা পর্যন্ত এসে শুয়েছেন। জানালার পর্দা তোলা। বাইরের হালকা আলো ঘরে এসেছে। তৃণাকুর হাত দু'টি মাথার নীচে দিলেন। খুব অবসন্ন লাগছে। অথবা খুব শান্তিও। যেন কত বছর অজ্ঞান যুদ্ধ করার পর তিনি আজ বিশ্রাম পেয়েছেন। নীলিমার শাড়ির প্রান্ত তাঁকে স্পর্শ করছে। তৃণাকুরের বালকবেলার মতো লাগছে। তিনি বলছেন— আমার পা দু'টো ভাল হবে না মা?

—হবে।

—মা, ওরা আমাকে ঘ্রো পয়জন করেছে জানো।

—আপেও বলেহিস তুই মানুষ। এটা কি সত্যি?

—হ্যাঁ মা। মাঝে মাঝে ঘুম হত না আমার। মাঝে মাঝে পাগুলো কমজোর লাগত। তখন রঞ্জন ওযুধ দিত আমাকে।

—আর কোনও ডাক্তার দেখাসনি?

—না। শর্মি বলত রঞ্জন খুব ভাল ডাক্তার। ওর ওযুধ খেলেই চলবে।

—এরকম সন্দেহ কোরো না। তোমার তো পায়ে অসুবিধে ছিলই। রঞ্জনের প্রেসক্রিপশান এনেছ তো?

—না। ও তো কোনও প্রেসক্রিপশান দিত না। নিজে ওযুধ দিয়ে যেত। কখনও শর্মি আনত। মা এর চেয়ে তো ওরা আমাকে মেরে ফেলতে পারত।

—ওরা চাইলে তা করতেই পারত। আমি বুড়ো মানুষ, তোমার জন্য কিছুই করতে পারতাম না। কিন্তু ওরা তা করেনি। আমার মনে হয় তুই যা ভাবহিস তা ঠিক নয়। তোর সঙ্গে শর্মির মেলেনি অন্য কারণে। সেটা তুই বোঝার চেষ্টা কর। তোর পক্ষের দোষ নিশ্চয়ই কিছু আছে।

—মা। তুমি শর্মির হয়ে কথা বলছ।

—না। আমি নিরপেক্ষভাবে বলছি। এগারো বছর হল তোদের বিয়ে হয়েছে। এতদিন পর কেন এরকম হল?

—সময়টা কোনও কথা নয় মা। তুমি আর বাবা তো একুশ বছর পাশাপাশি ছিলে। তোমাদের সম্পর্কটাই কি কোনও দাম্পত্য ছিল?

—মা। ছিল না। তখন উপায় ছিল না বলে আমি ডিভোর্স করিনি। এখনকার মেয়েরা সহজে

কেন?

—তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

—তোর মধ্যে তোর বাবার মতো কিছু ব্যাপার আছে মাস্ত। তুই বড় ঘবকুনো। বইমুখী। হইছোমোড় করিস না। তোর মধ্যে একটা আলাগ আলাগা ব্যাপার আছে।

—এটুকুই মা? এটুকুই আমার জীবন আমাকে ছেড়ে চলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট?

—না।

এতক্ষণ সমস্তই যথাযথ ছিল। এতক্ষণ নীলিমা একজন আধুনিক মানুষ, নিজস্ব বিচারবোধ বিচ্যুত করেননি, এমনকী ছেলের কথাতেও। এতক্ষণ, সমস্ত সংলাপ দু'টি মানুষের মৌলিকতা নিয়ে বিরোধ ঘটায়নি। ঘটাবে না কখনও। সচেতন নীলিমা সুচিন্তা তৃণাকুর-পড়েছেন। সাম্প্রতিক পৃথিবীর চূড়ান্ত আধুনিক দু'টি মানুষ। নীলিমা মুছে ছিলেন। তৃণাকুর নীরব বিশ্লেষক সঞ্জয়, বিদুর। কিন্তু তারপরও প্রচ্ছন্নতার মতো ইতিহাস লেগে থাকে। থাকে সন্দেহ সংক্কার বোঝা ও অর্থহীন বিশ্বাসের আবর্জনা। একজনও তা থেকে মুক্ত নয়। তাই, মধ্যবর্তী নীরবতার চুকে পড়ে কত বস্তু। ভাঙা বেড়া দিয়ে শেরালের চুকে পড়ার মতো। কিছুক্ষণ নীরবতার পর তৃণাকুর নৈঃশব্দ্য ভাঙেন। দূরত্ব ভাঙেন। কোন দূরত্ব? তার দূরত্ব? মা ও ছেলের। ছেলের ও মায়ের। এ দূরত্ব সত্যিই কি থাকে কখনও? তৈরি হয়?

—তুমি জানো না মা। তোমাকে বলিনি। ও যখন এখানে ছিল তখন প্রবীরের সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক হয়।

—কোন প্রবীর? ওর নাচের স্কুলের সেই ছেলেটি?

—হ্যাঁ।

—ইস! কী রুচি। ছেলেটি একেবারে মেয়েনের মতো ছিল। দাড়িগোফ না থাকলে ওকে তো ছেলে বলে ভাবাই যেত না।

—শর্মি বলত, পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে শিল্পচর্চা করলে নাকি একরকম অপ্রতিরোধ্য রোমান্টিক সম্পর্ক তৈরি হয়। জীবনের পক্ষে সেটা খারাপ নয়।

—ও। একই হাসপাতালে কাজ করতে গিয়েই বুঝি আবার রঞ্জনের সঙ্গে রোমান্টিক সম্পর্ক হল শর্মির? কিন্তু হাসপাতালের পরিবেশ কি খুব রোমান্টিক? খুব শিল্পসুলভ?

—প্রবীর— জানো মা, নাচ ছেড়ে দিয়েছে। শর্মির জন্য। রঞ্জন আসার পর শর্মি একদিন আর প্রবীরকে পান্ডা দিল না। আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে বলল, প্রবীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় আমার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, এই উপলক্ষি ওর হয়েছে। একদিন বিছনায়, মা, খুব কাদতে কাদতে কথাগুলো আমাকে বলল। আমি বিশ্বাস করলাম। ভাবলাম বয়স বাড়ছে। বদলাচ্ছে শর্মি। প্রবীর কদিন খুব পাগলের মতো এল বি এন আর-এ। আমি যে কদিন ছিলাম, বসে থাকত, শর্মি কখন আসবে তার জন্য। শর্মি তখন স্কুলে যাচ্ছে না। একদিন প্রবীর বলে ফেলল, শর্মি আমার স্বাস্থ্যপ্রশ্রাসের মতো হয়ে গিয়েছে তৃণাকুরদা। ও পাশে না থাকলে আমার নাচ হয় না।...বেচারি প্রবীর। আমি বুঝতে পারছিলাম মা ওর আর কোনও বোধ কাজ করছে না। আমি যে শর্মির স্বামী, আমার কাছে যে এ কথাটা বলতে নেই, তা ও ভুলে গেছে। ওর জন্য আমার করুণা হল। কিন্তু তখন একটা দারুণ প্রতিশোধম্পূর্ণ কাজ করছে আমার মধ্যে। এর জন্য, এই প্রবীরের জন্য কতবার আমি আহত বোধ করেছি। কত রাত্রি ঘুমোতে পারিনি। এখন ও একটু পুড়ুক। কী বোকা ছিলাম মা আমি। বুঝতে পারিনি। একটুও বুঝতে পারিনি যে আসলে তখন আমি আর প্রবীর এক সঙ্গে রয়েছি। একই সঙ্গে পুড়ছি। আমি পুড়ছি দ্বিতীয়বার। শুধু প্রবীর বুঝতে পারছে। আমি পারছি না। আমার সর্বস্ব চলে যাচ্ছে।

নীলিমা স্তব্ধ হয়ে আছেন। এত কথা, এত কষ্ট বুকের মধ্যে ধরে রেখেছিল মাস্ত। নীলিমা বললেন— রঞ্জনের কথা? সে-কথা কখন জানলি?



—সন্দেহ ইচ্ছিল আমার। রঞ্জন প্রায় গোজ আসত। আর ওকে দেখলেই শর্মি বদলে যেত একেবারে। একেবারে নরম, আনুরে, মিষ্টি হয়ে যেত। ওকে দেখলে তখন গোঁবুলবে যে এই শর্মি রেগে গিয়ে থালা-বাসন ছোড়ে, গালাগাণি দেয়, সেতুফালে মাথা ঝোঁকে। সে-দিন বঙ্কল আসত সে-দিনগুলোর যেন আমাকেও একটু বেশি দয়া করত শর্মি। প্রেমের কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে মা। এপিডেমিকের মতো। সব মানুষের মধ্যেই সেগুলি ফুটে ওঠে। শর্মি যতবারই নতুন করে প্রেমে পড়ত, ততবার ওর মধ্যে ওই লক্ষণগুলি ফুটে উঠত।

একদিন ওকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম। খুব কাদল। বলল, তুমি আমাকে সন্দেহ করো। প্রবীরের কথা তো আমিই তোমাকে বলেছিলাম। তা কি আমি তোমার কাছে যত্নের সংধাক্ষেপে চেয়েছিলাম বলেই নয়। আজ যখন আমি সব জ্বলে তোমার কাছে থাকতে চাইছি তখন তুমি আমাকে সন্দেহ করছ। আমার পায়ে মাথা রেখে উপুড় হয়ে পড়ল। তুমি তো জানো মা, ওর কী সুন্দর চুল...। সে-দিন, খোলা চুলে, আমার পায়ে মুখ রেখে ও কাদছে, ওর চুলে আমার পা ঢেকে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম; ক'দিন নিজেকে খুব সুখী ও সফল লাগল। কলেজ থেকে ফিরে কোথাও যেতে আমার ভাল লাগত না। একদিন তবু শর্মি আর মিষ্টকে নিয়ে অ্যাকাডেমিতে নাটক দেখলাম। চিড়িয়াখানায় গেলাম। শর্মি সারাক্ষণ তোমার নিশ্চেষ্ট করত। আমি শুনতাম। প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করত। কিন্তু ভয় করত। প্রতিবাদ করলে যদি ও আবার বদলে যায়। আমার সুখের জন্য তোমাকে আমি তখন প্রতিদিন বলি দিয়েছি মা।

নীলিমার সাথে জল আসছে। কিন্তু সেই জল তিনি ছেলের কাছে লুকোতে চাইছেন। কেন এই কান্না? ছেলের সংসার ভেঙেছে সে তো কষ্টেরই। কিন্তু অল্প অল্প করে শুনতে শুনতে মনকে তিনি বেঁধে ফেলেছিলেন। তবু আজ খুব কান্না পাচ্ছে। তৃণাকুর বলছেন— একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি শর্মি নেই। সাধারণত ওই সময় ও ফিরে আসত। মিষ্ট ওর টিচারের কাছে পড়ছিল। বলল— মা তো রঞ্জনকাকুর বাড়ি গেছে।

শর্মি মাঝে মাঝে রঞ্জনের বাড়ি যেত। আমি আপত্তি করলে বলত— তোমরা বড় সেকেলে। টিপি কাল উত্তর কলকাতার মানসিকতা। ছেলেরা একা থাকে। মাঝে মাঝে গিয়ে একটু সাহায্য করলে কী হয়... আমাকে কিন্তু কোনও দিন যেতে বলেনি ওরা। আমিও ভদ্রতাবশত কথাটা কোনওদিন তুলিনি। সে-দিন আমি আমার পর পরই মিষ্টর টিচার চলে গেল। তার পড়ানো হয়ে গিয়েছিল। মিষ্টকে একা রেখে যেতে পারছিল না। টিচার চলে যেতে মিষ্ট এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল— ‘জানো বাবা, আজ না একটা জিনিস দেখে ফেলেছি।’ কী দেখেছিস— আমি জানতে চাইলাম। খুব ছোট তো নয় এখন। বলল, ‘তুমি মাকে বলে দেবে না তো?’ বলব না। আমি বললাম। মিষ্ট বলল— ‘রঞ্জনকাকু আজ মাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিল।’ আমি খামছিলাম মা। আমার গলা শুকিয়ে গেছিল। তবু, মিষ্টকে বললাম, তাতে কী হয়েছে মিষ্ট। আমিও তো তোমাকে চুমু বাই। ও বলল, ‘বা রে। তুমি কি লুকিয়ে খাও? রঞ্জনকাকু তো লুকিয়ে খাচ্ছিল। আমি স্পষ্ট শুনেছি কাকু বলছে— ‘আর পারছি না এ বার তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাব।’ মা বলল— ‘চুপ মিষ্ট আছে।’ কাকু বলল— ‘মিষ্ট ঘুমোচ্ছে। তা ছাড়া ওরও জানা দরকার।’ কী জানা দরকার? কী? ওরা কি বিয়ে করতে চায়? তখন আমার পায়ে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে। আমার ভয় করল। ওরা কি আমাকে মেরে ফেলবে? আমি মরে গেলে আর ওদের সামনে কোনও বাধা নেই। মিষ্টর কথা আমি রাখতে পারিনি। সরাসরি শর্মিকে বলেছিলাম। না হলে ও হয়তো আবার আমার পায়ে পড়ে যেত। আবার আমি ওর ঘন কালো চুল দেখে বা বড় বড় চোখ ভর্তি জল দেখে ভুলে যেতাম। শর্মি অস্বীকার করেনি। বলেছিল রঞ্জন ওকে বিয়ে করতে চায়। তখন ডিভোর্সের প্রস্তাব আমিই ওকে দিই।

—শর্মি এক কথায় মেনে নিল।

—না। কীদল। বলল, 'রঞ্জনকে ছেড়ে দেব। তুমি ভিত্তোভার্স কোরো না।' কিন্তু আর আমি বিশ্বাস করিনি মা। বিয়ের আগেও ওর প্রত্যাশনা বলে একজন ছিল। প্রত্যাশা রঞ্জন। আমি কি হাতের পাঁচ? বোধহয় একাধিক পুরুষ ছাড়া ও থাকতে পারে না। হ্যাঁ, আমি চুপচাপ। ঘরতুনে। কিন্তু আমি তো পাগল নই। অন্ধ নই। খাবার সন্তে আমার তুলনা কোরো না তুমি।

বিছানা ছেড়ে নামলেন নীলিমা। খাবারগুলো গরম করতে হবে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়েছেন তৃণাকুর। নীলিমা হিসেব করলেন। তিন মাস সময় আছে। কাল একরাত মল্লিনাথের কাছে গিয়ে পরামর্শ করে মাত্ত্বকে ভাতোর দেখিয়ে নেবেন।

## বহিঃ

মল্লিনাথের দিকে চিঠি এগিয়ে দিলে কমলেন্দু। মল্লিনাথ পড়ছেন।

ভাই।

আজকাল একটা লোক আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। যখন-তখন আমি তাকে দেখতে পাই রাস্তায়। মাঠে। ছানের কোনায়। বেঁটে আর গোল গোল চেহারা। ছোট ছোট করে ছাতি মাথার চুল। খোলা গায়ে ককরাকে পৈতে। হাট্টু পর্যন্ত বৃতি পরা। সে-লোকটা আমার দিকে কখনও সোজাসুজি তাকায় না। আমি জানি। লোকটার নাম রূপচাঁদ। আমাকে কেউ বলে দেয়নি। কিন্তু ও এলেই আমি বৃথতে পারি এ রূপচাঁদ।

অনেকদিন আগে আমার এক রূপচাঁদে অভিষেক আমাকে একজন জ্যোতিষের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। জ্যোতিষে আমার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু অভিষেক বলেছিল, ওই জ্যোতিষ, ক্ষীতিমোহন, যিনি একলা ভূগোলের শিক্ষক ছিলেন, কোনও ভ্রান্ত গণনা করেন না। আমি দেখতে গিয়েছিলাম তিনি কতখানি অভ্যস্ত। আমি অবাক হয়েছিলাম। আর তার কারণ আমার জন্ম সময় শুধে ছকবিচার করে তিনি প্রথমেই বলেছিলেন—তোমার মাতৃস্থান কুদৃষ্টিপূর্ণ। তাঁর মন্তিকবিকৃতি আছে।

সে-দিন ছক বিচার করতে করতে কিছুদূর গিয়ে বিচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন উনি। শুধু বলেছিলেন—তোমাকে বলি, চার বছর পর শনি তোমার কাছে নেমে আসছেন।

আমি হাসছিলাম। শনি নেমে এলে মহাকর্ষ ওলেট-পালেট হয়ে যাবে যে।

উনি ধমকে বলেছিলেন—হেসো না। যা বলছি তা শোনো। শনি তোমার কাছে নেমে আসবেন। কোনও পূর্বপুরুষকে স্বপ্নে পাবে তুমি। বার বার পাবে। জেনো, সে-তোমার কঠিন সময়। তোমাকে অতি সাবধানে থাকতে হবে। তুমি এখন থেকেই শনিবার উপবাস করো। যে কোনও শনি মন্দিরে পুজো দাও। আর একটি কাজ অবশ্যই কোরো। কোনও শনিবার একটি লোহার কড়াই কিনে সেটি কোনও সাত্বিক ব্রাহ্মণকে দান কোরো। আর মনে রেখো, উনিশশো সাতাত্তর সালের দশই মার্চ—সে-পর্যন্ত তোমার কঠিন সময়।

আমি তখনকার মতো ভুলে গিয়েছিলাম। উপোসও করিনি, পুজোও দিইনি। হ্যাঁ, মায়ের কথা উনি ঠিকই বলেছিলেন বটে। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না, পরে আমার এমনই মনে হয়েছিল। কিন্তু আজকাল রূপচাঁদকে আমি দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ এই আমার কঠিন সময়। আমি জানি, দশই মার্চ, উনিশশো সাতাত্তর, আমি মারা যাব। কীভাবে জানলাম? কে জানে? আমার মনে হয়। আমার আত্মরেখা ফুরিয়ে গেছে। এ জন্য জ্যোতিষের দরকার হয় না।

ডাক্তারিশাস্ত্র আমি যতটুকু পড়েছি, তাতে বুঝতে পারি, আমার নেশা করা বিকল কলকাতাগুলো আমায় আর বহিতে পারছে না। আমায় যেতে হবে।

আমার বাঁচতে ইচ্ছেও করে না। আমি পাড়া ছেড়ে দিরাছি তার কারণ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম বাবার জীবনটা আমার জীবনে ঢুকে পড়ছে। আমি ক্রমশ দাশ হব যাবি। শুধু আমাদের শরীরটা অপাদা। আমিও ডাক্তার হতে চলেছি। বাড়ির রান্না ঘেলে হিসেবে ওই পূজা আমার ওপর বর্তাবে। আমিও সারাদিন রোগী দেখে, সাবানাত করীর আয়োজন করব। আমি সংযম পালন করব আর আমার স্ত্রী, কষ্ট পেতে পেতে, যন্ত্রণা পেতে পেতে ভুলে যাবে কোন তারি জন্ম হয়েছিল। হ্যাঁ, আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান থাকতেই হবে, তাকে পুত্রই হতে হবে, না হলে এই পূজার দায়িত্ব আমি কাকে দিয়ে যাব।

তুই জানিস না, কিন্তু আমি জানি, কারণ, আমার তখন রোগের বুদ্ধি ছিল না কিন্তু দেখার বুদ্ধি ছিল। আর যা-কিছুই আমি দেখতাম, শুনতাম, তুই জানিস, আমি ভুলিনি। মেমোরি নিয়ে খেলতে খেলতে তুই বরাবর হেরে গেছিস আমার কাছে। তাই, আমি জানি, আমাদের মায়ের মস্তিষ্কবিকৃতির কারণ আমাদের বাবা। আমাদের মা তাঁর কাছে পুরুষ প্রার্থনা করলে রাতের পর রাত তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমার মনে আছে, মা কাঁদছেন, বাবা বলছেন—মাগী, না ঢেকালে ঘুম আসে না, না? লোহার শিক গরম করে... আমার রাগ হত। মা যা চাইছেন বাবা কেন তা দিয়ে দিচ্ছেন না। আমি যা চাই, তাই তো তিনি দিয়েছেন। পরে, যে-দিন বুঝতে শিখলাম, কী চাইতেন মা, আর বাবা দিতেন না। বলতেন—মাসি... বলতেন—বুঝতে পারছ না, পূজার জন্য আমাকে সংযত থাকতে হবে। ক্রীসদ ছাড়তে হবে... আমার বাবার ওপর ঘোমা হল। আমার ভয় করতে শুরু করল। ওই পূজা আমার ওপর চেপে বসবে। আমি সারাদিন পরিশীলিত মুখে রোগী দেখব বাবার মতো, সারা পাড়ার লোককে উপদেশ-নির্দেশ দেব, পরিবর্তে সাহায্য করব আর ভালমানুষ সাজব আর রাত্রে সমস্ত কুচি ও শিক্ষা ছিড়ে বেরিয়ে আসবে আমার আদি অন্ধ মানুষ, বাবার মতো, আমিও আমার বউকে বলব...।

আমি বাবাকে ঘোমা করি। রূপচাঁদকে ঘোমা করি। আমি কালীর ওই মূর্তিকে ঘোমা করি। ওর ওই মুণ্ডমালায় আমি রূপচাঁদকে দেখি, বাবাকে দেখি, এমনকী... এমনকী... আমাকেও দেখতে পাই। সব সময় মনে হয় ও কাঁচা মাংস এইমাত্র চিবিয়ে খেয়েছে আর মুখে সেই রক্ত লেগে আছে।

আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি চলে যাব। যেখানে যাব সেখানে কোন কালী আমায় গ্রাস করবে আমি জানি না। তাকে সাবধান করে গেলাম, এই পূজার তার কিছুতেই নিস না তুই। মরে যাবি।

ইতি

দাদা

২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭

মাথুরের গড় আর্থলেটিক ক্লাবের

হেরোইন আফডা থেকে

অষ্টাশে ফেব্রুয়ারি। অমলেন্দুর চূড়ান্ত অসুস্থতার দ্বিতীয় আগের দিন লেখা চিঠি। মজিনাথের মাথার চুল খসে পড়ছে। রক্ত-মাংস-ত্বক গলে পড়ছে। তিনি জ্বর ও নিঃশেষিত হয়ে আছেন। অজ্ঞান ছবি ও প্রশ্ন। অজ্ঞান আত্মধিকার। হ্যাঁ, এটা সত্যি তিনি মাথারীকে নোংরা কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করেছেন। মেরেছেন। একাধিক দিন। তাঁর সংযম অনিবার্য ছিল। রূপচাঁদ স্বপ্নে শাসন করতেন। কিন্তু মাখবী শুনতেন না। তিনি প্রবল ছিলেন। কারণ করা সম্বন্ধে তাঁর চাহিদা প্রবল হয়ে উঠত। কিন্তু মজিনাথের লিঙ্গোত্থান হতো না। ওই কাঠামো পাবার পর যতদিন স্ত্রী-সঙ্গম করেছেন ততদিন কঠিন মুখে এসেছেন ওই পুরুষ। হেঁটো মুক্তি পরা, খালি গা, গায়ে ককরাকে

পেতে। মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। কোনও কথা বলেন না। শুধু স্থির চোখে চেয়ে থাকেন। ওই পুরুষকে মল্লিনাথ চেনেন। তিনি রূপচাঁদ। তিনিই পরিবারে পূজার প্রচলন করেছিলেন। স্বপ্নে এই কালীকাঠামোর সন্ধান তিনি পান। প্রসন্নচারী ছিলেন তিনি। যোগী ছিলেন। তেজী ও নিয়মনিষ্ঠ, তাঁর কোনও ছবি এ বাড়িতে নেই। অমলেন্দু তাঁকে কেমন করে চিনতে পারল। হঠাৎ মল্লিনাথ কখনও রূপচাঁদের গল্প তাকে করেছিলেন আর সে নেশাগত অবস্থায় তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছে। কিংবা, কে জানে, রূপচাঁদ সত্যিই এই উত্তরপুরমাকে দেখা দিয়েছেন কি না।

কমলেন্দু বাবার মুখোমুখি বসে আছে। শান্ত। নীরব। অমলেন্দু রাতে তিনটে নাগাল মারা নিয়েছিল। আর সে-দিনই রাত তিনটেয় কমলেন্দুর বড় দরজার দান্দা মেটোছিল কেউ। কিন্তু কমলেন্দু দরজা খুলে কারওকে দেখতে পায়নি। সে-দিন, তার মনে আছে, সে ঘুমোয়নি, কারণ পরদিন তার পরীক্ষা শুরু হতে চলেছিল। আর সে রাতি ভেগে নেটি দেখছিল। সত্যিই কি অমলেন্দুর আত্মা এসে করাঘাত করে গিয়েছিল দরজায়?

ঈশ্বর বা আত্মা সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট ধারণা নেই কমলেন্দুর। জ্ঞান হওয়া অবধি সে দেখেছে তার বাবা প্রত্যেক অমাবসায় নিয়মনিষ্ঠ ও গভীর হয়ে যান। স্রীকান্ত কাকা এসে পূজো করেন এবং বাবা সেই পূজোর সামনে টান টান হয়ে বসে থাকেন যতক্ষণ না তা শেষ হয়। এ সব দেখতে দেখতে, কমলেন্দু, সুখে-দুখে মা কালীকেই স্মরণ করেছে এতকাল। সে জানে, যদি সে মুসলমান হত বা খ্রিস্টান তবে আল্লা বা যিশুর নামে প্রার্থনা করত। মানুষ নিজের বোঝা বইবার শক্তি চেয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন, এর একটা শুভ নিক আছে। ঈশ্বর নির্ভরতা মানুষকে খানিকটা ঘটনা নিরপেক্ষ করে। উদ্বেগ প্রশমিত করে। কিন্তু এখন কমলেন্দু বিভ্রান্ত বোধ করছে। দাদার মৃত্যু, দাদার অভিজ্ঞতা, মৃত্যুর সময় সম্পর্কে, বাবার আচরণ সম্পর্কে এবং রূপচাঁদ সম্পর্কেও তার ধারণা এক ধরনের অতিপ্রাকৃতিকতার মুখোমুখি তাকে টেনে এনেছে যা সে বিশ্বাস করতে চাইছে না। অথচ এই অদ্ভুত ঘটনা প্রবাহে সে, দাদার জন্য যথার্থ শোক পালনও করতে পারছে না। সে জানতে চায়। বুঝতে চায়। মল্লিনাথের কাছে তার বড় প্রশ্ন আছে। দাদা যাকে যেখানে সেখানে দেখতে পেত সেই লোকটি সত্যি যদি রূপচাঁদ হয়ে থাকেন তাহলে কোন স্বার্থে তিনি বংশানুক্রমিক তাজা করে বেড়াচ্ছেন? একজন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট হয়েও অমলেন্দু এ চাপ সহ্য করতে পারেনি। কমলেন্দু প্রযুক্তিবিদ হয়েও এ চাপ নিতে পারছে না। তার চোখের সামনে তার চির-চেনা বাবা কীরকম বদলে যাচ্ছেন। কমলেন্দুর মনে হয় মল্লিনাথের মুখ হঠাৎ ছুঁচলো হয়ে উঠল। ক্রমে দুটি শাণিত কুটিল চোখ বোরিয়ে এল। বড় বড় কান। তীক্ষ্ণ নাক। রোমশ হিংস্র শরীর। মল্লিনাথ নেকড়ে হয়ে গেলেন। কৃষ্ণবিদ্যাপ্রসিদ্ধ লাইকানথ্রপির মতো পশু হয়ে গেলেন তিনি। কমলেন্দু অসুস্থ বোধ করে। সে মল্লিনাথকে বলে—তুমি কি কালও পূজো করবে?

মল্লিনাথ বলেন—হ্যাঁ। করব। শোকের সঙ্গে পূজার কোনও বিরোধ নেই।

—দাদার চিঠির কণাগুলো কি সত্যি?

—কোন কথা?

—মাকে মারতে তুমি? খারাপ গালাগালি দিয়েছ? তোমার জন্যই মা...

মল্লিনাথের মুখচোখ কঠিন দেখায়। বুঝি-বা রূপচাঁদের মতোই লাগে তাঁকে। আকারে-প্রকারে নয়, কিন্তু অভিব্যক্তিতে লাগে। তিনি বলেন—তোমার মা সংযম বুঝতেন না। তোমরা দু'সন্তান আসার পরও তাঁর প্রবল কামবোধ ছিল। আমি তাঁকে সংযম অভ্যাস করতে বলেছিলাম। মেয়েরা মা হয়ে গেলে সংযমই তাঁদের মানায়। তিনি কোনও দিন সংযম বিষয়ে চেষ্টা করেননি। কিন্তু পূজার জন্য আমাকে তা পালন করতে হতো। তাঁর শারীরিক আকর্ষণ বেশি ছিল। জীবনকে তিনি শরীরে চিনেছিলেন।

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই কমলেন্দু বলে—আর তুমি জীবনকে অক্ষর ধরে জেনেছ! মা যা চাইতেন সেটাই স্বাভাবিক ছিল বাবা। সেটাই সংসার ধর্ম। আমাকে তুমি রূপচাঁদের গল্প শুনিয়ে না। একটা কথা স্পষ্ট বলে দিই তোমাকে, ওই পুজোর ভার আমার ওপর চাপিয়ে না। যে-পুজো মানুষের কল্যাণ করে না সে-পুজো করে লাভ কী?

মল্লিনাথের সম্ভ্রান্ত কণ্ঠ শোনা যায়। তিনি বলতে থাকেন—শোনো, ওরকম বলতে নেই।

—কী বলতে নেই? কেন?

—সে শুনতে পায়। রাগ করে। সে সর্বনাশ করতে পারে।

—কে শুনতে পায়? কে? সর্বনাশের আর কী বাকি আছে বাবা?

—রূপচাঁদ শুনতে পায়। স্বপ্নে ভয় দেখায় আমাকে।

—পুজোটা কাকে করো তুমি বাবা? কালীকে, না রূপচাঁদকে?

—শোন, কমল, সে-পুজার ঐতিহ্য শোন। রূপচাঁদদাদু স্বপ্নে দেবীকে পান।

—আমি জানি, উত্তরের ভিটে খুঁড়ে দেবীর কীসব পেয়েছিলেন তিনি!

—হ্যাঁ। দেবী তিনদিন স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন রূপচাঁদদাদুকে। ভিটে খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছিল এই কাঠামো। এর চারপাশে আমার শঙ্খলাগা সাপ জড়ানো কাঠের টুকরো। তার কাঠ পচে গিয়েছিল। নতুন কাঠের ওপর ওই আমার সাপ লাগিয়ে আবার কাঠামো প্রস্তুত হয়। দক্ষিণেশ্বরে, তাদের জন্মেরও আগে, ওই কাঠামোই আমি ভেসে আসতে দেখেছিলাম। দেখেই চিনতে পেরেছিলাম আমি আবার তুলে এনেছিলাম কারণ ওই কাঠামোর সঙ্গে অভিশাপ লেগে ছিল।

—অভিশাপ লেগে ছিল তো তুলে আনলে কেন? ভাসিয়ে দিলেই পারতে।

—দেশ ছেড়ে আমরা যখন কলকাতায় আসি তখন রূপচাঁদদাদুর বয়স আশী। ভিটে ছেড়ে তিনি আসতে চাননি কিন্তু বাবাকে বলেছিলেন ওই কাঠামো সঙ্গে নিতে। পুজার ভার গ্রহণ করতে। বাবা রাজি হননি। রূপচাঁদদাদু বলেছিলেন—নিলি না তো! ছ'মাসের মধ্যে মা তোকে টেনে নেবে। ছ'মাসের মধ্যে, রূপচাঁদদাদুরও মৃত্যুর আগে চলে গিয়েছিলেন বাবা, গঙ্গায় নাইতে নেবেছিলেন, আর ওঠেননি।

কমলেন্দুর হাত-পা শিরশির করে। অজানিত ভয়ে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তবু, একটি প্রতিরোধ নিজের ওপর জারি রাখে সে। বলে—আমি এ সব মানি না বাবা। দাদা কোনও অপরাধ করেনি। ওকে কেন মরে যেতে হল? ওই কাঠামো যে তোমারই তা তুমি কেমন করে জানলে?

—ও জিনিস আর হয় না। ওটা স্বপ্নে পাওয়া ছিল।

—কেন হয় না? স্বপ্নে তো আর কেউ পেতে পারেন। স্বপ্ন ছাড়াই কেউ বানাতে পারেন ওরকম কিছু। ওই কাঠামো যে রূপচাঁদদাদুই বানিয়ে ঢিবির নীচে পুঁতে রাখেননি তা কে বলতে পারে! প্রাচীন কাঠামো হলে ওই কাঠের অস্তিত্বই থাকত না। বাবা, যথেষ্ট হয়েছে এ সব। আজ আর পুজো-টুজো বন্ধ করো। দাদার জন্য কষ্ট হয় না তোমার? দুঃখ হয় না? ঈশ্বর যদি জিতক্রোধ না হবেন, পরম আশীর্বাদক না হবেন তবে তাঁর অস্তিত্ব রেখে কী লাভ! তুমি শেখাতে—এটা কোরো না, ওটা কোরো না—ঠাকুর পাপ নেবেন। কেন নেবেন বাবা? কেন আমাদের ভয় দেখাতে তুমি? যদি বলতে—ঠাকুর কষ্ট পাবেন, তাহলেও বুঝাতাম। যে-দিন তুমি পুজো করতে সারা বাড়ি থমথম করত। যেন কী এক কঠিন কাজ চলছে! এই কঠিন্য কেন! উদ্বেগ কেন?

—শক্তির স্বীকৃতি। সারা বিশ্ব-জগৎ যে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার কাছে প্রণত থাকা।

চমৎকার। যাঁর কাজ এই মহাসৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ, যিনি এতখানিই শক্তিদর, তিনিই অসহায়, অক্ষম মানুষের ওপর হিংসা ও ক্রোধ ছড়াচ্ছেন। তা হলে আর একটা সুদখোর, জোতদার, পুলিশ বা হিটলারের সঙ্গে ভগবানের পার্থক্য কী? ভয় পাবার এত কিছু মানুষের জন্য মজুত আছে যে



ঈশ্বর স্বয়ং, ত্রাতার ভূমিকা নিরপেক্ষভাবে পালন না করলে একদিন এই পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যাবেন।

—চুপ। একদম চুপ করো। তুমি নাস্তিকের মতো কথা বলছ। এই পরিবারের হেলে হয়ে তুমি ঈশ্বর সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছ।

—ঈশ্বর সম্পর্কে সন্দেহ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আছে। তোমারও আছে। কেবল তুমি প্রাণীকৃত করে না। বলতে পারবে তুমি, দেখাতে পারবে, ঈশ্বর সংস্কারহীন। ঈশ্বর নশ্বনের উদ্দেশ্যে, কারণ তিনি কলিত। মানুষ স্বীকার করলে তিনি আছেন। নইলে নেই।

—হি ছি। মূর্খের মতো কথা বোলো না। পূরণ পড়ো। বেদ, উপনিষদ পড়ো। ও সবের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পড়ো।

—সেগুলোও মানুষের তৈরি বাবা। সেগুলোও তর্কাতীত নয়।

—তুমি হিন্দুধর্মবিরোধী কথা বলছ। ওইসব পার্টিজানদের মতো কথা বলছ।

—বলছি, কারণ আমার মনেই থাকে না আমি হিন্দু। মনে পড়ে যখন কোনও ফর্ম ফিল আপ করি, আর আমাকে রিলিজিয়ন লিখতে হয়, তখন। কিন্তু সে অর্থে, আমি মনে করি, অনুশাসিত ছাড়া আমার কোনও ধর্ম নেই। একজন স্বাধীন, সজ্ঞান মানুষ জন্মগতভাবে ধর্ম বহন করবে কেন। জন্মের পর থেকেই আমাদের ওপর ধর্মীয় আচার-আচরণ প্রয়োগ করা হয়। কিছু না বুঝেই আমরা সব পালন করতে শিখি। এটা একধরনের জ্বরদস্তি। চাপিয়ে দেওয়া বিশ্বাস। অর্থাৎ শুরুতেই একজনের দত্ত-স্মৃতি বিকাশের ডানাগুলো ছেঁটে ফেলা হল। আমি জানি না আমি হিন্দু কি না। কিন্তু আমি হিন্দু হয়ে গেলাম।

—তোমার সঙ্গে কথা বলার আর কোনও অধিকার নেই আমার। প্রবৃত্তিও নেই। সম্ভবত, তোমার নাম কমলেন্দুই হবে কি না বা আমি মল্লিনাথ, আমার পরিচয় তুমি গ্রহণ করবে কি না, এটা জন্মের জন্যও আমার, তোমার বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল। যে-কথা তুমি আজ আমাকে বললে সে-কথা আমি অন্তত আমার পিতাকে বলতে পারতাম না।

—যথেষ্ট হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি। দাদার প্রত্যেকটি উপলব্ধি কত যথায় ছিল। দাদা যখন মারা যাচ্ছে, বাবা, তুমি তখন ডাক্তার হয়ে তা বুঝতে পারোনি, এ আমি বিশ্বাস করি না। অথচ তুমি ওর পাশে না থেকে, ডাক্তার হিসেবে বা বাবা হিসেবেও না থেকে, তুমি কাশী সাধনা করতে বসেছিলে। তুমি উন্মাদ। নিষ্ঠুর। এখনও এক মাস হল না ও গেছে। তুমি কিছুমাত্র শোকসন্তপ্ত নও। ভালবাসার ক্ষমতাই তোমার নেই। কিন্তু... কিন্তু... বাবা, তুমি কি এরকমই ছিলে? এরকমই? যখন আমাদের হাঁদা-ভোঁদার গল্প পড়ে শোনাতে? অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যান্ড বাংলা করে বলতে? বাবা—তুমি এরকম কেন হয়ে গেলে?

কমলেন্দু দু'হাতে মুখ ঢাকছে। দাদার জন্য যে-বেদনা, বাবার জন্য যে-কষ্ট, যে-আবেগ সে ধরে রেখেছিল, তার স্মরণ ঘটছে। কিন্তু মল্লিনাথ গভীর। হয়তো সত্যি কোনও কষ্ট, কোনও আবেগ তাঁকে স্পর্শ করছে না। কারণ তিনি মূর্খের রেখাগুলি কঠিন রাখতে সক্ষম হয়েছেন। হয়তো তিনি বিপন্নও কারণ তাঁর স্মৃতি কাজ করছে না। তিনি বুঝতে পারছেন না তাঁকে অ্যামনেসিয়া আক্রমণ করেছে কি না। অনেকদিন পর আজ তিনি চেঁচাবে বসেছিলেন। রোগীর ভিড় ছিল। কিন্তু নিদান দিতে গিয়ে ওখুঁদের নামগুলো ঠিক মনে করতে পারছিলেন না। আগে তাঁর কখনও এরকম হয়নি। মল্লিনাথ একই সঙ্গে কমলেন্দুর কথা, অমলেন্দুর কথা, মাখবীর কথা, রূপচাঁদ ও পূজার কথা এবং রোগী ও ওষুধের কথা ভাবতে লাগলেন। বললেন—তোমাকে আমি কিছুই জোর করে দিতে চাইব না। অমলকেও দিতাম না। হ্যাঁ, পরিবারের ইতিহাস তোমরা গল্পে গল্পে শুনেছ। এই কাঠামো ভেসে আসার কথা বললাম। আমার মনে হয়েছে, আমি পূজা নিতেছি। বলি সিই না। কিন্তু অন্য সব অনুশাসন পালন করি। রূপচাঁদাদুরও এমনই বিশ্বাস ছিল। তোমার ধারাবাহিকতা রাখতে ইচ্ছে করে ভাল, না হলে, আমার সঙ্গেই সব



শেষ হয়ে যাবে।

—না। শেষ হবে না। কারণ আমার পেছনে রূপচাঁদাদার দুঃস্বপ্ন রেখে যাবে তুমি। আমি কোনও দায়িত্ব নেব না। এ পুজো তুমি নিয়েছ, তোমাকেই বন্ধ করতে হবে। কাল তুমি পুজো করবে না।

—না। আমাকে বাধা দিও না। পুজা আমাকে করতেই হবে।

—হ্যাঁ, আমারই ভুল। তুমি তো পুজোই করবে। আর বাড়ির জোড়জোড় মরে যাবে, পাগল হয়ে যাবে, পাগিয়ে যাবে। তোমার তাতে কিছুই যায় আসে না। মাকে সাংসারিক জন্য তুমি কখনও ডাকারের কাছে নিয়ে গেছ? কোনও নাকিয়ার্টিস্ট বা লিডিয়োজিষ্টের কাছে? ভেবেছ যে মাকে স্বাভাবিক করে তোলা যায়?

—তোমার মায়ের এ পাগলামি সারবার নয়। ডাক্তারিটা আমার পেশা। আমি জানি।

—আমি মাকে চিকিৎসা করতে চাই বাবা।

—কোথায়?

—কানপুরে। আমি মাকে কানপুরে নিয়ে যাব।

—মাকে রাখবে কোথায়? হস্টেলে?

—না। ফ্ল্যাটে। আমাদের ক্যাম্পাস ইস্টারভিউ হয়েছিল। ইন্ডা পেট্রল আমাকে একটা অফার দিয়েছে। ভেবেছিলাম এবুনি চাকরিতে ঢুকব না। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছি। আমি মাকে নিয়ে যাব। ওরা আমাকে থাকার জন্য একটা ফ্ল্যাট দেবে।

—বেশ। তোমার মা যদি যেতে চান, যাবেন।

—মা যাবেন।

—কথা হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—তোমার মা যাবেন বললেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তিনি তো গত আটশ বছরে এ বাড়ি ছাড়া কোথাও কাটাননি।

—সেটা তো তোমার ভাববার কথা ছিল।

মল্লিনাথ আর কথা বাড়ান না। টান টান হয়ে সোফায় শুয়ে পড়েন। মল্লিনাথের বাড়ির জন্যই রাত্রি নিজেকে আরও গভীর, নিশ্চিন্ত ও প্রলব্ধ করে। দেওয়ালের সব টিকটিকি নিজেদের অনিশ্চিত প্রাণ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে এবং যাদের তাড়নায় লক্ষা রাখে পতঙ্গদের উড়ানে। কমলেন্দু, অমলেন্দুর ঘরে যায়। এ ঘরেই অমলেন্দু মারা গিয়েছিল। শূন্য খাট পড়ে আছে এখন। অমলেন্দুকে তার তেleshকও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে নয় হয়ে আছে খাট। নিম্গ্ৰাণ। ধূলিমলিন। দেওয়ালের আলমারিতে অমলেন্দুর বই। স্কুলে পেত আর সাজিয়ে রাখত এখানে। কমলেন্দু বইগুলোর দিকে চাইল। চিত্রির কথা তার মনে পড়ল। জ্যোতিষ ক্ষিতীন্দ্রমোহন কি সত্যিই বুঝেছিলেন দাদার আয়ু নেই? সত্যি কি রূপচাঁদিকে দেখতে পেত দাদা? নাকি বহুবার শোনা গল্প ও নেশাগ্রস্ত মস্তিষ্কে ঢুকে পড়া ভয় ও ঘৃণা মিলেমিশে দাদার সামনে তৈরি করত একটি ভাটিল ভ্রান্তি। কেউ কি বিশ্বাস করবে, এ সব হয়? কমলেন্দু দেওয়ালের দিকে তাকায়। দু'জনের ছোটবেলার ফটোগ্রাফ। বাঁধানো। অমলেন্দু হাসছে। কমলেন্দুর পিঠে হাত। কবে তোলা হয়েছিল ছবিটা? মনে করার চেষ্টা করল কমলেন্দু। এবং টের পেল, পিঠে আলতো করে হাত রেখেছে কেউ। আস্তে আস্তে মেরের চাপড় মারছে। কাঠ হয়ে গেল সে। সারা শরীর শির শির করতে লাগল। অস্বস্ত ভয় কিংবা কোনও অজানিত অনুভূতিতে ঘুরে দেখার শক্তিও হারিয়ে ফেলল সে। এক বালক হাওয়া পর্দা উড়িয়ে দিল। মাধবী ডাকলেন—কমল। এতক্ষণে মুখ ঘোরাতে পারল কমলেন্দু। মাধবী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কমলেন্দু ভেবে পেল

না, মা-ই তার পিঠে হাত ছুঁইয়ে আবার দূরে চলে গেছেন কি না। সে এগিয়ে এল। মাথবী ফিস ফিস করে বললেন—আলো নিবিয়ে চলে যায়।

আলো নিবিয়ে বেরিয়ে এল কমলেন্দু। মায়ের পাশে দাঁড়াল। মাথবী বললেন—আলো সহিতে পারে না। কষ্ট পায়।

—কে, মা? কার কথা বলছ?

—সে। সে আসে তো।

—কার কথা বলছ, মা? কে?

—অমল আসে রে। অমল রাজ আসে।

—মা, দাদা কেমন করে আসবে?

কমলেন্দু মাথবীকে জড়িয়ে ধরে। দেখে, কীরকম স্বাভাবিক লাগছে মায়ের চোখ-মুখ। একটি চিকিৎসা করালে সেরে উঠবেন মা—দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে কমলেন্দু। মাথবী বলেন—ও আসে। সত্যি। বিশ্বাস কর। আমার সঙ্গে কথা বলে। আসবে না, বল? ওর তো যাবার ইচ্ছে ছিল না। ওই রূপচাঁদ একে জোর করে নিয়ে গেছে।

—মা, দাদা আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। তুমি পড়বে?

—না, আমি জানি ও কী লিখেছে।

—কী?

—রূপচাঁদের কথা।

—কী করে জানলে মা?

—অমল বলেছে।

—কবে? মা, কবে?

—কবে যেন বলল, কবে..., ও তো আসে, অনেক কথা বলে, সব মনে থাকে না। কমল—  
—বলো মা।

—আমাকে নিয়ে চল।

—কোথায় মা?

—ভোর সঙ্গে। তুই যে বললি, আমাকে নিয়ে যাবি।

—একটা মাস সময় দাও মা। আমি জ্বলেন করি। ভ্রাটিটা পাই। তোমাকে নিয়ে যাব।

—কমল, কমল, এক মাস আমাকে ফেলে রাখিস না বাবা। আমাকে মেরে ফেলবে।

—কে তোমাকে মেরে ফেলবে মা?

—তোর বাবা। ওই রূপচাঁদের সঙ্গে ঘড় করে আমাকে মেরে ফেলবে।

—কেউ তোমাকে মারবে না মা। কেন মারবে? হঠাৎ কাদতে শুরু করেন মাথবী। আকুল, অসহায় কান্না। সেই কান্নার প্রলব্ধি তান বাতাসে কাঁপন লাগায়। কমলেন্দু দিশেহারা বোধ করে। মাকে ধরে বিছানায় বসিয়ে দেয়। তখন মজিনাথ ছুটে আসেন এ ঘরে। ধাক্কা মারেন মাথবীকে। তাঁর মুখে হাত চাপা দেন। বলেন—চূপ। একদম কাদবে না। চূপ।

কমলেন্দু মাথা নিচু করে। বাবার মুখে সেই নেকড়েটাকে দেখতে পায় আবার। মনে মনে স্থির করে, একমাস পরে নয়, এবারই নিয়ে যাবে মাকে, যা হোক কিছু ব্যবস্থা করবে। কিছু করবেই।

আজ অমাবস্যা। মজিনাথের পূজা এবং উপোস। সকালে চেষ্টার খুললেন তিনি। নিজেরই একতলার তাঁর বহুকালের চেষ্টার। হাসপাতাল আর চেষ্টার ছাড়া অন্য কোথাও তিনি বসেননি। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন। চেষ্টারে কিছু সময় রোগী দেখে বাকি সময়টা পূজা করবেন এই তাঁর ইচ্ছা।

অনেকদিন পর নীলিমা এলেন চেষ্টারে। ভৃগাকুরের কথা সবিস্তারে বললেন। খুব মন দিয়ে

শুনলেন মল্লিনাথ। নীলিমার সাহায্য দরকার। তাঁর মনে হচ্ছে কৃশাকুরের অসুবিধাগুলি সায়ুজনিত। কিন্তু কিছুতেই যথার্থ শব্দটি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর মনে পড়ছে দিউ—নিউ... নিউ...রো মনে পড়ছে না, ল মনে পড়ছে না। বন্ধ দরজার আটকে থাকা এক টুকরো পর্দার কোনার মতো হয়ে আছে চিন্তাশক্তি। খানিকটা বেরিয়ে আছে কিন্তু পুরোটিই বন্ধ দরজার ও পারে। কোনও ডাক্তারবন্ধুর নাম পর্যন্ত মনে করতে পারছেন না মল্লিনাথ। তাঁর মুখ-চোখ ক্যাকাসে হয়ে উঠেছে। কপালে খাম ফুটেছে। নীলিমা জিজ্ঞেস করছেন—শরীর খারাপ লাগছে? —না। আজ উপোস তো। ওই একটু... —

নিজেকে আড়াল করতে চাইছেন মল্লিনাথ। এবং ভ্রমার খুলে বার করে আনছেন পুরনো ডায়রি। পাতা ওপ্টালেন কয়েকটি এবং লিখলেন—ডাঃ শি কে মজুমদার। নিউরোলজিস্ট। ১৮, ডি এল রায় স্ট্রিট...।

রাত্রি দশটায় অমাবস্যা পড়েছে। সন্ধ্যা থেকে পূজার আয়োজন করছেন মল্লিনাথ। ভাবছেন। তিনি কি ভুল করছেন? সত্যি কি এ পূজা সাধারণ সংস্কার ছাড়া কিছু নয়? কিন্তু এ পূজা ছাড়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এত বছর ধরে, অমলেন্দুর জন্মেরও আগে থেকে এ পূজা করতে করতে সবটাই বেঁচে থাকার অঙ্গ হয়ে গেছে। তবুও মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগে কেন? কেন এইসব আয়োজন করতে করতে মনে হয়, কী যেন নেই, কী যেন হওয়ার কথা ছিল না। কেন ইচ্ছে করে—যদি সম্ভব হত, যদি হত, যদি এ পূজা বন্ধ করা যেত—তখন দৈববাণীর মতো অমোঘ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে কানে। তিনি শুনতে পান—

হে মানবজাতি, হে সামান্য শক্তিদর, দর্পিত উদ্ধত মানবজাতি, তোমাদের জানাই, আমিই ব্রহ্ম, আমিই জগতের উপাদানরূপা প্রকৃতি, আধার রূপ পুরুষ এবং অভিব্যক্তক কাল।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীযং মে ভিদ্ভা প্রকৃতিরষ্টথা ॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভাজিত হয়েছে। এই অষ্টধা বিন্যাস অপরা। আমার চৈতন্য প্রকৃতিকে তোমরা পরা বলে জানো। এই পরাশক্তিই জীবন। আর আমিই জীব। আমিই বিশ্ব। আমিই জড় আমিই চৈতন্য।... ..

মল্লিনাথ অমলেন্দুর অভিযোগ ভুলে যান। মৃত্যু ভুলে যান। স্ত্রীর অপ্রকৃতিস্থতা, কমলেন্দুর শ্লেশ ভুলে যান। তাঁর মনে পড়ে না যে তাঁর অধীত চিকিৎসাবিদ্যা তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বিদ্যার চেয়েও বড় বিদ্যা, অধ্যয়নের চেয়েও আরও বড় অধ্যয়নে নিমজ্জিত হন। তাঁর শ্রবণে আসে—

এই পরমা আদ্যাশক্তি শ্রুতি পাখে বিদ্যা, সর্বান্তর্যামিনী, সংসার-বন্ধ-বিনাশিনী।

অংপন ত্রিংশচলা শক্তি দ্বারা তিনি সৃষ্টি করেছেন এই জড় ও চৈতন্য, সং ও অসং,

তিনিই প্রতিপালন করছেন। আবার সংহারও করছেন তিনিই.....

আশ্চর্য সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে মনে মনে স্তব করেন তিনি। ক্রমশ দশ মহাশক্তির প্রতি তাঁর আনুগত্য রচিত হয়। ক্রমশ ঘড়ির কাঁটা দশটার দিকে এগিয়ে যায়। তিনি মনে মনে পরম ঈশ্বরীর স্মরণ নিয়ে বলতে থাকেন—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিনা ধূমাবতী তথা।

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলায়িকা।

এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিন্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

শান্তিতে ডুবতে ডুবতেও দম-ফুরনো মাছের মতো ভেসে ওঠেন মল্লিনাথ। তাঁর হঠাৎ কমলেন্দুকে দেখতে হচ্ছে করে। কেন যে করে তাও তিনি জানেন না। বাস্তব্য ব্যবস্থান শান্তির শব্দ হয়। কিন্তু মল্লিনাথের চারপাশ অতল নৈশশব্দে পাক খেতে থাকে। আর মল্লিনাথ শক্তিশব্দের ব্যবহার প্রজ্ঞা স্বরণ করে পূজার উদ্দেশে নিজেকে ঠেলে ফেন। তাঁর মনে পড়ে সেইসব বাক্য, সেইসব শ্লোক, মনে পড়ে সেই বিলম্বণ। ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসে রূপচাঁদ বলছেন আর অনারা শুনেছেন। কে কে ছিলেন তার মাথা? মল্লিনাথ নিজেকে হাতা আর কারওকে দেখতে পান না ওই ভিড়ে। খড়িতে দশটি বাজার নির্দেশ পাওয়া যায়। মন্ত্র সহকারে মল্লিনাথ আচমন সমাপন করেন। সূর্য্যোদয়ের পর আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হন। বৃন্দাবন ও মধ্যমা হৃদয়ে স্পর্শ করে উচ্চারণ করেন—ওঁ আং হ্রীং জ্যেং যং বং জং ঙং শং ঞং সং হ্রীং হং সং শ্রীমং শ্রীশান কালিকায়্যঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ... হঠাৎ তাঁর চোখ বন্ধ করা শরীর কেঁপে ওঠে। তিনি স্পষ্ট স্নাত্তে পান নারীকণ্ঠে তাঁর আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। শ্রীমং শ্রীশান কালিকায়্যঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি... তিনি চোখ খোলেন এবং উদ্ভাসপ্রায় হয়ে যান। তাঁর সামনে দেবী কালীর মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মাধবী। তাঁর চুল খোলা। চোখ লাল। বলছেন—মুখস্থ। আমার সব মুখস্থ। এতদিন ধরে শুনিছি কিনা। মল্লিনাথ স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলছেন—মাধবী, তুমি কেন এখানে এসেছ? যাও। ঘরে যাও।

তাঁর হাত কাঁপছে। পৈতেগাছা মুঠো করে ধরে তিনি নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছেন। মাধবী বলছেন—আমাকে পূজা করবে? আঁ? দেখো, আমিও কালী হতে পারি দেখো...তিনি শাড়ি খুলে ফেলছেন। শাড়ির প্রান্ত এসে ফুলের ওপর পড়ছে। তিনি ব্লাউজ খুলে ফেলছেন। ব্লাউজ মাঘের খড়্গে আটকে নমিত পতাকার মতো দুলছে। মল্লিনাথ বলে চলেছেন—মাধবী? কী করছ, মাধবী।

মাধবী বলছেন—আমায় পূজা করো। দেখো। আমাকে দেখো। আমি কালী হলাম কি না।

শায়া খুলে ফেলছেন তিনি। খোলা চুলে বিবস্ত্রা পাগলিনী মাধবীকে উলঙ্গিনী শ্যামার মতোই লাগছে। কিন্তু মাধবী শ্যামদেহী নন। তাঁর গৌরবর্ণে বিজলী ও প্রদীপের আলো পিছলানো। মল্লিনাথ দেখছেন। মাধবী কালীর খড়্গ তুলে নিচ্ছেন হাতে। খড়্গ থেকে ব্লাউজ বসে পড়ল ঘটের ওপর। পূজার আসনে বসেও মল্লিনাথ কেঁপে উঠলেন। আশ্চর্য অটুট দুটি স্তন মেলে, উলঙ্গ হয়ে, হাতে খড়্গ ধরে, জিত বের করে দাঁড়িয়ে আছেন মাধবী। স্থির। অপলক। তাঁর কোমরে শায়া বন্ধনের গাঢ় দাগ। তলপেটের ভারী খাঁজে সন্তান ধারণের অজস্র ফাটল। স্তন্য যেনি। স্নগ্ধ উজ্জতে সামান্য রোম। নিটোল পা। মল্লিনাথের রাগ প্রশমিত হয়ে কষ্ট উঠতে লাগল। তাঁর মনে পড়ল, মাধবী, তাঁর চেয়ে অস্তত আঠার বছরের ছোট। দেড় যুগ যাকে বলে। হুঁ দিয়ে প্রদীপ নিবিয়ে দিলেন মল্লিনাথ। মাধবীর শাড়ির একটি প্রান্ত স্থলস্থ ধূপকাঠির ওপর পড়েছিল। গোল গোল ফুটো হয়ে গেছে। মল্লিনাথ উঠে দাঁড়ালেন। মাধবীর হাত থেকে খড়্গ নিয়ে ফিরিয়ে দিলেন মাঘের হাতে। মাটি থেকে শাড়িখানি কুড়িয়ে নিয়ে উড়িয়ে দিলেন মাধবীর গায়ে। মাধবী বাধা দিলেন না। অনেক—অনেক—অনেকদিন পর, সেই প্রথম যৌবনকালের মতো গাঢ় স্বরে ক্রীকে ডাকলেন মল্লিনাথ—মাধু, মাধু, জিত ভেতরে নাও।

মাধবী লক্ষী মেয়ের মতো জিত তুলে নিলেন। মল্লিনাথ মাধবীর শায়া ও ব্লাউজ হাতে করে মাধবীর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এসে বললেন—পরো।

মাধবী, যেন ঘরে কেউ নেই, যেন আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এমনই ভঙ্গিতে মল্লিনাথের জড়িয়ে দেওয়া শাড়ি খুলে শায়া ও ব্লাউজ সমেত যথাযথ প্রক্রিয়ায় শাড়ি পরতে লাগলেন আবার। আঁচল বঁদিকে দিলেন, কুচি করলেন, পা দিয়ে চেপে-চুষে ঠিক রাখলেন কোল আঁচল। আর এতক্ষণ, মল্লিনাথ, এই ব্যসেও, পাগলিনী স্ত্রী ও পুরুষোক সমেত ভাবতে লাগলেন—যদি কমলেন্দু চলে আসে। যদি দেখে ফেলে।

আর কমলেন্দু, এ দিকেই আসতে গিছে, শাড়ি পরিধানরত্না মাঝে সেঁখ, বাবাকে দেখে, অনুমান করেছিল, পাগলিনী মা কোনও গোলমাল খাটিয়ে থাকবেন, বাবা কোনও অপ্রত্যাশিত অবস্থায় পড়ে থাকবেন— সে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল। এ বার ফিরে এসে বলল— তুমি ধুনো আনতে বলেছিলে। আমি ভুলে গেছি। লাগবে কি? পঞ্চদশাব দোকান এখনও খোলা আছে।

—আনবি? দ্যাখ তা হলে।

মাধবী অন্য ঘরে চলে যান। কমলেন্দু ধুনো আনতে যায়। মল্লিনাথ একলা বারান্দায় নিড়িরে ল্যাম্পপোস্টের পেছন দিকে জমে থাকা অন্ধকার বেঁধে। এ দিক থেকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের বড় বড় বাড়িগুলি নজরে আসে। তিনি ভাবতে থাকেন, কমলেন্দু যদি পূজা পছন্দই করে না তবে নিজেকে থেকে ধুনো আনতে গেল কেন। উচ্চশিক্ষার জন্য যার থেকে একটুখানি আশা উকি মারতে চায়। কিন্তু মল্লিনাথ নিজেকে শাসন করেন। আর নয়। আর কিছুতেই নয়। তাঁর নিজের সঙ্গেই এ পূজা শেষ করে যাবেন তিনি। কিন্তু কী করে শেষ করবেন, কী করে শেষ করতে হয়, তাঁর মাথায় আসে না। তখন কমলেন্দু ধুনো নিয়ে ফেরে। গুঁড়ো পাওয়া যায়নি। সে ঢাকা নিয়ে এসেছে। কাগজের মোড়ক মল্লিনাথকে ধরিয়ে দিয়ে সে চলে যায়। মল্লিনাথ পূজার ঘরে ফিরে যান। মাধবীর শাড়ি জামা লেগে সব ছড়িয়ে গেছে। সবই কি অপবিত্র হয়ে গেল? বোতল থেকে গঙ্গাজল নিয়ে সব কিছুতে ছেঁটাতে থাকেন তিনি। হঠাৎ তাঁর অবাক লাগে। পূজার উপচার সাজাতে ইতিমধ্যে তাঁর কোনও ভুল হয়নি। আর আজ তিনি ধুনো ছাড়াই পূজা শুরু করেছেন, এ কথা মনে ছিল না। আবার ভয় করে তাঁর। তিনি কি তবে ভুলে যাচ্ছেন? সবই ভুলে যাচ্ছেন?

ধুনো গুঁড়ো করার জন্য প্যাকেট সমেত মাটিতে রেখে চন্দনের পাটা দিয়ে আঘাত করেন তিনি। শব্দ হয়। ঘর কাঁপে। ধুনো গুঁড়িয়ে যায়। এবং একটি শব্দে তাঁর চোখ অটকে যায়। পুরনো খবরের কাগজের ঠোঙা চোখের সামনে ধরে তিনি পড়েন সেই শব্দ। ঠোঙার ভাঁজে কিছু হারিয়ে গেছে। কিন্তু ঘবার ঘবার উঠে গেছে। মল্লিনাথ তারই মধ্যে ঢুকে পড়েন—

...entered a house in Taltola, forced their way into an inner apartment and came upon three allegedly Naxalite youths who were sleeping there. According to the people of the neighbourhood, the officer... raiding party, presumably a spy, 'Isn't it Biplab Bhattacharya?' The spy replied, 'Yes'. Biplab was immediately shot dead and the other two... paper published a police version....

কাগজটি হাতে নিয়ে চূপ করে বসে থাকেন মল্লিনাথ। বিপ্লব ভট্টাচার্য, সেই বিপ্লব ভট্টাচার্য। সে ছাড়া আর কে হবে? বিপ্লব ভট্টাচার্য নকশাল। বিপ্লব ভট্টাচার্য শট ডেড। সেই তখনকার কাগজ এটা। কী কাগজ, বোঝার আর উপায় নেই। কিন্তু এ কাগজ স্পর্শ করে মস্তুর আগু, প্রত্যেক স্মৃতিকে পাশ কাটিয়ে মল্লিনাথের মনে পড়ে যাচ্ছে, হরিপাল থেকে ও এসেছিল। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে কলকাতায় পড়তে এসেছিল। নিষ্পাপ মুখ ছিল ছেলেটার। গাল থেকে যেন শৈশব মোছেনি। অনেকটা মালার মতোই। মালার হাত থেকে এসে একান্তরের স্বপ্নে ডুবে গেল ছেলেটা এবং মরে গেল। মালার মুখ মনে পড়ল মল্লিনাথের। অনঙ্গ মারা যাবার পর অনেক কষ্টে হরিপাল গার্লস হাইস্কুলের চাকরিটা পেয়েছিলেন মালা। মল্লিনাথই সাহায্য করেছিলেন। সেও কতদিন হল? পূজোর আসনে বসে মল্লিনাথ মালার কথা ভাবেন। সেই একান্তর সাল। কিংবা বাহ্যন্তর। কিংবা ত্রিযান্তর। ঘরে-বাইরে আগুনে আগুনে একাকার ছিল তখন। একান্তরের শেষে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ভারত। জরুরি অবস্থা ঘোষিত হল। এ দেশের প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিলেন—

...আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ...আমার

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ভারতের জনগণের ইচ্ছাবল্লী ইচ্ছাশক্তিই পাকিস্তানের এই বেপরোয়া ও বিনা প্রয়োজনের আক্রমণ নিশ্চিতরূপে ও চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করতে পারবে।.....

অজস্র বুলেট ছুটল। আর কয়েকনিমের যুদ্ধে মুক্ত হল বাংলাদেশ। তাঁদের এতদিনের বৈধ বা প্রতিবাদ, এতদিনের সহনশীলতা বা অন্তর্গত যুদ্ধ কিংবা ও ব্যাপক হলে যেমন ভাল একদিন। কিন্তু বুলেট থামল না। পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে মাঠেমাঠে বা বিচ্ছিন্ন করতে লাগল বালককে তরুণকে যুবককে। ধরা পড়তে লাগলেন বুবতীরা একা জেলের মতো অত্যাচারিত হতে লাগলেন। আর এইসব ঘটতে লাগল পশ্চিমবাংলায়। বিহারে। ওড়িশায়। পঞ্জাবে। দক্ষিণ ভারতে। মুক্ত বাংলাদেশ যখন প্রতিদিন আবিষ্কার করছে পাকিস্তানিদের ধ্বংস করে দেওয়া বাড়ির তলায় স্থূপ স্থূপ মৃতদেহ, আর নদীর পাড়ে পাকিস্তানির নিহতর গুলিতে বিদ্ধ দেহ খুবলে যাচ্ছে কাক, তখন এখানে, এই পশ্চিমবাংলার বা ওড়িশায় বা বিহারে বা পঞ্জাবে চলছে নিরন্তর হত্যালীলা। নকশাল মারা হচ্ছে। নকশাল পোড়ানো হচ্ছে। নকশাল দমন করা হচ্ছে পিটিয়ে, অত্যাচার করে। উল্টো করে মুলিয়ে। আর বিপ্লব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে, এ পাড়ার দেবার্চন, এ পাড়ার নীলাদ্রি, ও পাড়ার সত্যজিতের মৃত্যুতে, বা প্রত্যেকটি মৃত্যুসংবাদে মল্লিনাথ ঈশ্বরকে বারবার প্রণাম জানিয়েছেন তাঁর দু'টি পুত্র নকশাল হয়ে যায়নি বলে। তারা পুলিশের গুলিতে মারা যায়নি বলে। কিন্তু তাতে কী লাভ হল? বিপ্লবের মৃত্যুর পর মালার কাছে গিয়েছিলেন মল্লিনাথ। হরিপালে। মালা কাঁদেননি। শুধু বলেছিলেন— ওরা সব চলে গেল, মল্লিনা। আমাকে একা ফেলে চলে গেল। কেন গেল বলুন? একা থেকে আর কী করব আমি...

আজ মল্লিনাথও একা। ওরা সব চলে গেল। চলে যাচ্ছে। তিনি কালীমূর্তির দিকে তাকান। সে-মুখ কেমন নিশ্চল। আবার প্রদীপ জ্বালেন তিনি। কালীর মুখ উজ্জ্বল হয়। মল্লিনাথ আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠায় মন দেন।



মাকে নিয়ে চলে গেল কমলেশু। মাধবীও যত্নের মতো চলে গেলেন। মল্লিনাথকে কিছুই না বলে, পিছন ফিরে একটাবারও বাড়ির দিকে না তাকিয়ে চলে গেলেন। মনে মনে হিসেব করছিলেন মল্লিনাথ। কত বছর পর বেদনলেন মাধবী? পনেরো বছর? কুড়ি বছর? তবু এই চলে যাওয়া, এই বেগুনো অতি নিশ্চাপ, আবগকস্পন্দহীন। শুধু কালীতারা একা, বছরদিন ধরে এ বাড়িতে রাখে বলে, কাজ করে বলে, বা বসন্ত সে-ই প্রতিদিন ফটিক বিল বস্তি থেকে এসে মল্লিনাথের পরিবারের দায়ভার নেয় বলে, এই শূন্য বাড়ি সম্পর্কে বেদনাবোধ করতে থাকে এবং চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে—মাকে নিয়ে ভাড়াভাড়ি চলে এসো ছোড়সাবাবু।

মল্লিনাথ দেখলেন। চলে যাওয়া দেখলেন। কালীতারার কান্না দেখলেন এবং তাঁর চোখে পড়ল তাঁর বাগানে আগাছা জমেছে। বাগানে হাত দিচ্ছেন না সত্যকিন। যত্ন করছেন না। যত্ন না করলে আগাছা স্তো জমবেই। মল্লিনাথ আপনমনে মাথা নাড়েন। যত্ন না করলে মেঝেতেও শ্যাওলা ধরে, সেওয়ালে নোনা লেগে যায়, বাগানে আগাছা। যত্ন না করলে স্নান সম্পর্ক অভ্যাসে পরিণত হয়, বা অভিযোগে। পারস্পরিক আকাজিকত বসবাস সহবাস হয়ে ওঠে, কখনও কখনও অসহ-বাস। যত্ন, যত্ন, সর্বত্র যত্ন চাই। ক'দিন যা কিছুই অবহেলায় রাখা যাক—



সে স্নান হতে থাকবে।

বাগানের প্রান্তে কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুল—গুটি কয়েক ছাত্র আর দু'জন মাস্টারনি—মল্লিনাথই এই স্কুলের দেওয়াল রং করিয়ে দেন—সেও হয়নি কতদিন! সব কাজ পড়ে থাকছে। সব জায়গায় আগাছা ভরে যাচ্ছে। তিনি চেঁষারে যান। এবং আজও তাঁর ওষুধের নাম মনে পড়তে চায় না। আরও বেশি রোগী এসে পড়ার আগেই তিনি উঠে পড়েন। চেঁষারের দরজা বন্ধ করে ঘুরতেই দেখেন জুঁই দাঁড়িয়ে আছেন। বাগ্নার জ্বর এসেছে। মল্লিনাথকে ডাকতে এসেছিলেন জুঁই। মল্লিনাথ বিপন্ন গলায় বললেন—আমাকে আর ডেকো না বউমা। আমি আর রোগী দেখব না।

—কী হয়েছে, জ্যেষ্ঠামশাই?

—আমার কীরকম সব হচ্ছে! ওষুধের নাম মনে করতে পারি না। মাথার মধোটায় যন্ত্রণা হয়। খুব যন্ত্রণা। তুমি বরং শিবতোষকে ডেকে নাও।

ফিরে যাচ্ছিলেন জুঁই। পথে আনিসুজ্জামানের সঙ্গে দেখা হল। আনিসুজ্জামান কলেজ যাচ্ছেন। জুঁইকে দেখে হেসে বললেন—কি? ভাল তো?

জুঁই বললেন,—আমি ভাল। কিন্তু বাগ্নার জ্বর এসেছে। জ্যেষ্ঠামশাইকে ডাকতে এসেছিলাম। কিন্তু উনি অজুত কথা বললেন। মানুষটা শোকে প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। বাইরে থেকে তো বোঝা যায় না।

—কী বললেন, ডাক্তারদা?

জুঁই মল্লিনাথের কথাগুলি বলতে থাকেন আনিসুজ্জামানকে। আনিসুজ্জামানের কপাল কুঁচকে যায়। মল্লিনাথ কি অসুস্থ? জুঁই চলে গেলেন। আনিসুজ্জামানের অপরাধী লাগল। অমলেদু মারা যাবার পর আর একদিনও যাননি মল্লিনাথের বাড়ি। যাওয়া উচিত ছিল। শোকের সময় মানুষ মানুষকে আঁকড়ে নিতে চায়। একা ঘর অসহ্য লাগে তখন। ওই এক পাগল স্ত্রী নিয়ে মল্লিনাথের সন্তাপ আরও বেড়ে থাকবে বলে ধারণা হয় আনিসুজ্জামানের। কথা নয়, সান্ত্বনা নয়, শুধু একজনের সুস্থ সঙ্গ যদি পেতেন মল্লিনাথ তবে এ মুহূর্তে তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই তা মহামূল্যবান হয়ে উঠত।

আনিসুজ্জামান ঘড়ির দিকে তাকান। এখন দুকলে কলেজে দেরি হয়ে যাবে। তিনি স্থির করেন, ফেরার পথে বা একটু রাত্রের দিকে আজ একবার আসবেন। পাড়া থেকে বেরিয়ে পি ডব্লু ডি রোডের ধার দিয়ে বি টি রোডের দিকে হাঁটেন তিনি। তাঁর পাশ দিয়ে একটি সাদা অ্যাম্বাসেডার যেতে যেতে থেমে যায়। আনিসুজ্জামান দেখতে পান বিকাশ গাড়ির জানালা দিয়ে তাঁকে ডাকছেন। তিনি এগিয়ে যান। বিকাশ বলেন—কলেজ যাবে তো? উঠে পড়ো।

আনিসুজ্জামান বলেন—আমি গেলে আপনাকে তো ঘুরতে হবে।

—ঘুরব একটু।

আনিসুজ্জামান গাড়িতে উঠে বিকাশের পাশে বসেন। বিকাশ ড্রাইভারকে বি পি সি কলেজের রাস্তা বলে দেন। আনিসুজ্জামানকে বলেন—তারপর? খবর বলো।

আনিসুজ্জামান বলেন—ডাক্তারদার শরীরটা ভাল নেই।

বিকাশ বলেন—সে তো হবেই। অত বড় আঘাত।

—হ্যাঁ। উনি নাকি ওষুধের নাম ভুলে যাচ্ছেন।

—সে কি!

—হ্যাঁ। ভাবছি রাত্রে একবার যাব। আসবেন নাকি?

—দেখি, যদি তাড়াতাড়ি ফিরি। না হলে কাল সকালে একবার যাব।

—আপনার সঙ্গে আমারও একটু দরকার ছিল।

—কী?

—দুর্গা সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ আপনাকে পড়তে দেব।

—দিয়ে। তোমার সেই বইটি কী হল? সাধারণ জনজীবন ও সর্বধর্মসমন্বয় নিয়ে যেটা লিখছিলে। প্রকাশক পেনে ওটার জন্য।

—না। আমি ছোট একটা পুস্তিকা করেছি। কিন্তু সেটা কিছু নয়। কাজটা আমি বড় মাপে করতে চাই।

সুপার মার্কেটের পাশ দিয়ে এগিয়ে গুরুদ্বারের সামনে গাড়িটা বী দিতে বাক্‌ নিল। এবারে ডান দিকে অল্প গেলেই আনিসুজ্জামানের কলেজ। আনিসুজ্জামান কলেজের কাছে নামলেন। বিকাশ গাড়ি নিয়ে এগোলেন।

কলেজের পরিবেশটি ভাল লাগে আনিসুজ্জামানের। বি টি ব্রোড থেকে একটি সুতো বসতি অল্পই আশে-পাশে। বেশ শান্ত ও নির্জন। সামনেই একটি বিশাল ঝিল। প্রেমিক ছাত্র-ছাত্রীরা হাত ধরাধরি করে ঝিলের পাড়ে বসে গল্প করে। আনিসুজ্জামানের মনে হয়, এরকম একটি ঝিল, যাতে মাছ খেলা করে, পরিযায়ী পাখিরা উড়ে আসে, শ্রুত হাঁস পালক ভিড়িয়ে দেয়—এরকম একটি ঝিল যার গায়ে ব্রেকুর পড়ে আর যার পাড় ঘেঁষে গাছদের সারি ঘন ছায়া নামিয়ে দেয়—এই ঝিল থাকলে চঞ্চলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা তো প্রেম করতে চাইবেই। সেই সঙ্গে প্রাজ্ঞ বিদ্বান্, এমনকী আনিসুজ্জামানের মতো বাস্তবপ্রণয়ী মানুষেরাও ঝিলের ধারে বসে গুনগুনিয়ে দু'টি মনের কথা বলতে চাইবেন।

কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকলেন আনিসুজ্জামান। পোড়া বিল্ডিং-এর সামনে কিছু ছেলে জটলা করেছে। বাহাদুরের কলেজটাও আগুন লাগানো হয়েছিল। খুব বেশি ক্ষতি হওয়ার আগেই তা নেভানো সম্ভব হয়। সামান্য মেরামত করে ক্লাশও নেওয়া হয় ওই বিল্ডিং-এ। কিন্তু পোড়া দাণ এখনও সারেনি। সকলে নকশালদের দোখ দিয়েছিল তখন। কয়েকদিন খুব হামলা হয়েছিল তাদের ওপর। বোমাবাজি আর গুলি হোঁড়াছুড়ির জন্য কলেজ চত্বরে চারদিন ঢোকা যায়নি। মনোজ আর সৌমিত্র দু'দিন লুকিয়ে ছিল আনিসুজ্জামানের বাড়িতে। ভাল ছাত্র ছিল ওরা। নকশাল করত। ওদের বাড়িতে রাখার খুঁকি কম ছিল না। পুলিশ বা পাটিগুত্তা—যে-কোনও দিক থেকেই তিনি আক্রান্ত হতে পারতেন। তবু, যেহেতু, সব স্তরের ছাত্রদের সঙ্গেই তাঁর ভাল যোগাযোগ ছিল এবং এখনও সেইসব সম্পর্কগুলি বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে আর তা এমন পর্যায়েও যায় যে তেমন-তেমন ঘনিষ্ঠরা তাদের প্রেমে পড়ার খবরও বলে যায় আনিসুজ্জামানকে—ফলত তিনি তাঁর গোপন ভাবনার জায়গায় নকশাল ওইসব ছেলেদের জন্য আলাদা স্নেহ আগলে রেখেছিলেন এবং যদিও তারা এইসব শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না তবু তিনি তাদের জন্য নিজের দরজা খোলা রাখতেন এ কারণেই যে তাদের ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ার মতোই ছিল। ছোটখাট সামান্য সাহায্যই তিনি করতে পেরেছেন। আর তা করতে গিয়েই পেয়েছিলেন জামাল কৌশিককে, যে সরাসরিভাবে এই কলেজের ছাত্র ছিল না কিন্তু প্রায়ই আসত, এমনকী মাঝে মাঝে সে আনিসুজ্জামানের ক্লাশে গিয়েও বসে থেকেছে। সেও বেশিদিন নয়। কারণ ওরা ছিল ক্লাশভাঙার দল। অভিযোগ আর আন্দোলন, ঘেরাও আর বয়কট, বাস-ট্রাম পোড়ানো, কুলে-কলেজে আগুন দেওয়া ও জ্ঞানীগুণীজনের মূর্তি ভাঙার দামাল ও বিকৃত ইতিহাস তারা দেওয়ালে দেওয়ালে রচনা করে গেছে। যত অভিযোগ তারা উত্থাপন করেছিল সেগুলি অমূলক ছিল না কিন্তু সেইসব উত্থাপনের প্রতিকারের জন্য যে সময়, পদ্ধতি ও অস্থির ব্যগ্রতা তারা মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে নিয়েছিল তার মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি হয়নি। যদিও তাদের চাওয়ার মধ্যে কোনও স্বাদ ছিল না। শ্রমিক নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক-কৃষক সংগঠনকে দৃঢ় ও বৈপ্লবিক করে তুলতে চেয়েছিল তারা। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে শহরমুখী ও অসম অর্থবন্টনকে ক্রমশে চেয়েছিল। এককথায় থাকে বিপ্লব বলা যায়। আর আনিসুজ্জামানের বিশ্বাস, বিপ্লব কখনও পরিকল্পিত ভাবে, অল্প কয়েক ছক বেঁধে হয় না। বহু দিনের বহু বকল্লা ও শোষণের বিরুদ্ধে ছলে

ওঠা বিন্দু বিন্দু আগুন একদিন হু হু করে বাড়তে থাকে আর উঠলে ওঠে আর তৈরি করে দাবানল যেমন করে থিকি থিকি জ্বলা তৃণভূমি থেকে আগুন লাফিয়ে ওঠে গাছে আর পোড়াতে থাকে সমূহ বৃহৎ বৃক্ষ, লতা।

সেই সময় মনোজ আর সৌমিত্র আনিসুজ্ঞামানের খাবার টেবিলে বসে ফিসফিস করে বলেছিল—বিশ্বাস করুন স্যার, আমরা আগুন দিইনি।

আনিসুজ্ঞামান বিশ্বাস করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন হয়তো—না এই বিলম্বের প্রয়াস বিফল হবে কারণ এর শুদ্ধ আগুন ঢুকে গেছে উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনার আগুন। আর এই আগুন আগুনকে যায়। ধ্বংস আরও বড় ধ্বংসের দিকে প্ররোচিত করে মানুষকে। আর তখন সবাই সবাইকে সন্দেহ করে। অবিশ্বাস ও ঘৃণার লোহিত তপ্ত ধারায় মুখ শুকনো যায় মাটির।

আনিসুজ্ঞামান এখনও মনোজদের জন্য কষ্ট পান। মনোজ নেই। সৌমিত্র বহুদিন লুকিয়ে বেড়াবার পর প্রভাবশালী পিতার প্রভাবে চলে গিয়েছে বিদেশ, সাক্ষর করবে কোনও একটি ডিগ্রি এবং এ দেশে কোনওদিন ফিরে স্বাভাবিক জীবনব্যাপন করবে। কিংবা, ফে জ্ঞানে, হয়তো ফিরবেই না। সুখী থাকবে, বিদেশিনী স্নেহাস্রী স্ত্রীতে এবং তৃপ্ত থাকবে বৈদেশিক নিশ্চিন্ত মুদ্রায়। আর কৌশিক, আনিসুজ্ঞামানের প্রিয় গ্রামাল কৌশিকের কোনও খবর নেই। আর তারা সব, এই আগুন নিয়ে খেলা করার তরুণরা সব, এমনই ছিল যে নিজের থেকে খবর না দিলে তাদের খবর পাওয়া সম্ভব ছিল না কোনও উপায়েই।

আনিসুজ্ঞামানকে দেখে ছাত্রদের জটলা এগিয়ে এল। তারা একটি জলসা করতে চায় এবং তাতে আনিসুজ্ঞামানের সাহায্য প্রত্যাশা করে। আনিসুজ্ঞামান একবার পোড়া বিল্ডিংটার দিকে তাকান, একবার এইসব ছাত্রছাত্রীদের দিকে। না, এরা কেউ বিদ্রব করার কথা ভাবে না। কারণ বিদ্রবের পিঠে প্রচণ্ড মার তারা জেনেছে। দেখেছে, শুনেছে যে তার কোনওই সারবত্তা নেই শুধু আবেগে, অক্ষম আবেগে, জ্বলে মরা ছাড়া, এভাবেই নকশাল আন্দোলনকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে যে অপরিবর্তিত উদ্ভাটনা ছাড়া এ আর কিছুই নয়, একেবারে পাশেই বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ, এমনকী সইদুল নামের এক দশ বছর বয়সী বালক, হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল আর তার বিনিময়ে, প্রচুর গোলা-বারুদ, প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে লাভ করেছিল মুক্তি, ভিন্নতর রাষ্ট্রীয় মুক্তি, যা ঐতিহাসিক উৎসাহ ও উদ্দীপনার কারণ হয়ে ওঠে, কিন্তু তেমন কোনও প্রত্যক্ষ ফলাফল নকশাল আন্দোলন দিতে পারেনি। অতএব তা বার্থ বলে গণ্য হয় বা উপস্থাপিত হয় যাতে সমস্ত স্থূলিকের সম্ভাবনা নির্বাপিত করা যায়। আর তা যে সম্ভব, তা যে খুব সহজ প্রক্রিয়ায় করে ফেলা যায় তা আনিসুজ্ঞামান অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কিন্তু আপাত নিলিপ্ত অবস্থানে প্রত্যক্ষ করেন প্রতিদিন। অনুভব করেন। সেইসব বারুদের গন্ধ তার নাকে আজও লেগে আছে যা তারুণ্যের স্বপ্ন ও তেজ হয়ে দেখা দেয়। যা পৃথিবীতে ঘটিয়ে ফেলাতে পারে চূড়ান্ত বিদ্রব ও অবশ্যস্বাবী পরিবর্তন। যার কাঁপনে ও ধাক্কায় নোনা ইটের নীচে চাপা পড়ে মৃতের সভ্যতা। তবুও, কোথাও, অমর শয়তান হয়ে উঠে আসে মৃত্যুকামী শাসন ও মেধা। অস্ত্রে-অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত, পোড়া ছাই সমস্ত স্বপ্ন ও কল্যাণ কামনায় ছুট ও আত্মোৎসর্গ।

তাই, এখনকার যত তরুণ মুখ, তারা রাজেশ খান্না বা অমিতাভ বচ্চনের মতো চুল রাখে কিন্তু তাঁর অধ্যবসায় ও সং সংগ্রামের দিকে তাকায় না, তারা চুল রাখে এবং নাচে এবং প্রত্যাশা করে কোনও মিঠুন চক্রবর্তী হওয়ার কিন্তু এই হয়ে ওঠার আগেকার দীর্ঘ পথ অতিক্রমণ ও পরিশ্রম সম্পর্কে অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে। আগে বারা এসেছিল তারা ফলাফল দিতে পারেনি বলে বা হাতে পায়নি বলে, বা বলা উচিত প্রত্যাশিত সাফল্য ছিল না বলে, এরা এখন দেখছে শুধুই সাফল্য, শুধুই উজ্জ্বল ফলাফল যার কাছাকাছি পৌঁছানোর ইতিহাস সম্পর্কে তারা অন্ধকারে থাকছে এবং আনিসুজ্ঞামান টের পাচ্ছেন, পড়াতে গেলে, সব শূন্য মুখ। বাংলা অনার্স নিয়েছে তারা এবং জ্ঞানে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'শেখের কবিতা' উপন্যাসের বই কিনা, তারা ধারণা

করে, 'শেষের কবিতা' বুঝি-বা কোনও কবিতারই বই যা হঠাৎ প্রবীণনাথ ঠাকুর শেষবার লিখেছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু কী তারা জানে না এবং অনিসুজ্ঞামান এই পুস্তকটি এক ছাত্রীকে পড়তে নিয়ে বুকেছিলেন সে করেকপাতা উল্টেছে মাই এবং ফেরাও দিয়েছে। তিনি হতাশ হতে হতেও ভেবেছেন, এত সত্ত্বেও তিনি ক্রাশে মীর মশাররফ হোসেনের নামে কবিতা বা বলবেন সেই আশ্চর্য 'লাল শালু' উপন্যাসের কথা যার লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। অতএব তিনি এসেও প্রত্যাশিত নেটি দিতে থাকলেন এবং তারই ফাঁকে বৈষ্ণব পদাবলী পড়ানোর কাজে বসলেন—'এই পরিকার ভাষা, প্রেম এবং প্রেমজাত শরীরী বোধের চূড়ান্ত প্রকাশ যা আমরা বিদ্যাপতিতে দেখতে পাই, তা আছে শেলিতে, আছে ইয়েটস। আমি প্রত্যাশা করব যে তোমরা, ইয়েটস পড়েছ, অন্তত পড়েছ 'ফ্রেজি জেন' যা তাঁর সুবিখ্যাত রচনা। পড়েছ কি কেউ? কেউই? বাংলা অনার্স পড়ো বলে কি শুধু বাংলাই পড়ো জেমস? ইংরিজি পড়ো না।'

একটি মেয়ে সামনের বেঞ্চে বসে আছে। রোজই বসে। লাল সালোয়ার কামিজ পরা। কলেজে মেয়েরা শাড়ি কমই পরছে আজকাল। মেয়েটির স্রোতে তন্ময়তা ছিল আর তার কামিজের কাট এমনই যে বুকের অনেকখানি উন্মুক্ত। অনিসুজ্ঞামানের চোখ দার দার গিয়ে পড়ছিল ওইখানে এবং সেটা এ কারণে নয় যে ওই চেরা সুড়িপথ যা কোনও অজ্ঞাত গভীরে পৌঁছে যায়, অনিসুজ্ঞামানকে নিয়ে যাচ্ছিল যৌন উত্তেজনার মুখোমুখি। তাঁর তাকানোর কারণ ছিল এই যে তিনি ভাবছিলেন এতখানি মুক্তি তিনি সহিতে পারবেন কি না বা এ দেশের পুরুষরা তা সহিবার জন্য প্রস্তুত আছেন কি না। সেই সঙ্গে একথাও তিনি না ভেবে পারেননি যে মেয়েটি ভাগ্যবান যে তাকে কিছু লুকিয়ে বেড়াতে হয় না। অনিবার্যভাবে তাঁর মনে পড়েছিল নীলোফার কথা যে সারাক্ষণ বোরখা ব্যবহার করে এ কারণে যে তার পুড়ে যাওয়া মুখ সে দেখাতে পারে না।

অনিসুজ্ঞামান মেয়েটির তন্ময়তা লক্ষ করেন এবং প্রায়ই জানতে চান সে শেলি পড়েছে কি না। কিটস, ইয়েটস বা বায়রন পড়েছে কি না। মেয়েটি জানায় যে সামান্য পাঠ করার সৌভাগ্য তার হয়েছে এবং এতে অনিসুজ্ঞামান কিছুটা অন্তত উৎসাহ বোধ করেন এবং পড়াতে থাকেন—'ফ্রেজি জেন টকস উইথ দ্য বিশপ'। দেখো। কবিতাটা দেখো। উপলব্ধি দেখো,

I met the Bishop on the road  
And much said he and I.  
'Those breasts are flat and fallen now,  
Those veins must soon be dry;  
Live in a heavenly mansion.  
Not in some foul sty.'

'Fast and foul are near of kin,  
And fair needs foul.' I cried.  
'My friends are gone, but that's a truth  
Nor grave, nor bed denied,  
Learned in bodily lowliness  
And in the heart's pride.

বুকেছ? বুঝতে পারছ? জীবনকে কতটা ভালবাসলে এরকম বলা যায়?  
অনিসুজ্ঞামানের সামনে দিনের পর দিন সব শূন্য মুখ। শুধু একজনের চোখগুলি বাধ্য।  
তার ডিগ কাট কামিজ, সে-দিকে চোখ চলে যায়। অন্য সব মুখগুলি, অমিত্যত বন্ধনের চুল

পরা বা নীল, হলুদ, ফুল ফুল সালোয়ার কামিজ—তারা চেয়ে থাকে। নিঃসাড়। ভাষাহীন। কারা আশুন দিয়েছিল কলেজে আর কারা চিৎকার করে বলেছিল—বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা মানি না। তাদের আশুনের আভা এখনও দেওয়ালে লেগে আছে। তাদের গর্জন এখনও শোনা যায় কান পাতলে কারণ বাতাস তা এখনও বিস্মৃত হয়নি। আনিসুজ্জামান অতীত এবং বর্তমানের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থান করেন এবং বলার নেশায় বলে যান—

‘A woman can be proud and stiff  
When on love intent;  
But Love has pitched his mansion in  
The place of excrement;  
For nothing can be sole or whole  
That has not been rent.’

তোমরা জানো, ভালবাসা শরীর দিয়ে প্রকাশিত হয়। শরীরে তার চরম আশ্বাদন। আমরা তা উচ্চারণ করতে ভয় পাই কারণ আমরা নিজেরা নিজেদের প্রবঞ্চনা করি।

তাঁর চোখ বার বারই লাল সালোয়ার পরা মেয়েকে দেখে। তিনি বলেন—শরীর, ভালবাসার চূড়ান্ত উদযাপনের ক্ষেত্র; Love has pitched his mansion in the place of excrement—বিদ্যাপতিতে আছে, কিংবা হতে পারে যে-পদ এখন তোমাদের বলব তা গোবিন্দদাস ঝা-র, এখন আর তা আলাদা করে বলা যাবে না। কোনও কোনও পদে দু’টি নাম একাকার। কিন্তু এই ভাষালক্ষণ দেখো, এই ললিত বর্ণনা দেখো। এটা বিদ্যাপতিরই সম্পদ। এ নিয়ে আর সন্দেহই থাকে না। রাধাবিরহে কাতর কৃষ্ণ, সুবল তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছেন। কৃষ্ণ বলছেন—

বেলজ সঞা যব বসন উতারল  
লাজে লজগুলি গোরী।  
করে কুচ ঝাঁপইতে বিহুসি বয়নি ধনী  
অঙ্গ কয়ল কত মোরি ॥

মাধর নির্লজ্জের মতো রাধার বসন খুলেছেন, রাধা লজ্জায় নীরব। তিনি হাত বাড়িয়েছেন কুচ দু’টির দিকে, রাধা শরীর মুড়ে বাধা দিচ্ছেন।

নীবিবদ্ধ খসইতে করে কর ধরু ধনী  
পুণু বেকতে কুচ জোর।  
দুহু সমধানে বিকল ভেল শশিমুখী  
তব হম কোরে অগোর ॥  
এত কহি বিষাদ ভাবি রহু মাধব  
রাহিক প্রেমে ভেল ভোর।

দেখো, এখানে শরীরী মিলনের সব কথা বলা আছে কিন্তু এখানেই কবির জয়। মানবিক প্রেমেরও জয় এখানেই। এখানেই নারী ও পুরুষের সম্পর্কের স্বর্গীয় উদ্ভাস। শরীর পূর্ণ হলেও এই অতৃপ্তি থাকে। পরম মিলনের পরও মানুষ বিষাদে আক্রান্ত হয়। এরই নাম প্রেম। দৈহিক হলেও যা দেহাতীত। যা বিশুদ্ধ। যা সুন্দর।

আন্তে আন্তে রটনা হতে থাকছিল কলেজে। আনিসুজ্জামান স্যর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে অশ্লীল কবিতা পড়েন। কেউ কেউ তা আমল দেয়নি কিন্তু কেউ কেউ দিয়েছিল। কোনও কোনও ছাত্র, যারা আনিসুজ্জামান সম্পর্কে খুবই সশ্রদ্ধ এবং অনুরাগী তারা মনস্থ করেছিল এ কথা জানানো হবে স্যরকে যাতে তিনি সতর্ক হতে পারেন। যারা আনিসুজ্জামান সম্পর্কে বিরূপ

ছিল, এমনকী এর মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপকও বর্তমান যারা তাঁর সম্পর্কে কট্টরিত করতে বাজি ছিলেন, অতএব এই কানামুখো, যা মেয়েদের ঘিরে শুরু হল আর তার কেন্দ্রবিন্দুতে ডিপকাট লাল সালোয়ার কামিজ মেয়ে থাকল, যা আনিসুজ্জামানের এতদিনের অধ্যাপনা জীবনে আসেনি, এসে গেল এবার এবং সেইসব ছাত্র যারা আনিসুজ্জামানকে ভালোমানুষ ত্যারা তাঁকে এ সব বলতে লাগল, আর সেইসব অধ্যাপক যারা আনিসুজ্জামান সম্পর্কে কট্টরিত করতে চান তাঁরা সহ-অধ্যাপক দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে এ সব বলতে লাগলেন।

শুধু কিছু কবিতার পক্ষেই এমন আলোড়ন তোলা সম্ভব যা এমন কিছু শ্রান্ত ধারণাও যদি সেই কবিতার পাঠক যথার্থ শিক্ষিত না হয়ে থাকেন এমনই মতামত গ্রহণ করলেন দীপঙ্কর এবং আনিসুজ্জামানের সঙ্গে কথা বলতে প্রবৃত্ত হলেন। আনিসুজ্জামান বললেন—‘অশালীন কবিতা? সে আবার কী? আমি তো বৈষ্ণব পদাবলীর ক্লাশ নিয়েছি কদিন। দীপঙ্কর জানান, একটি মেয়ে, সে বুঝি-না আনিসুজ্জামানের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকবে এবং আনিসুজ্জামানও খুব সততার সঙ্গে একথা স্বীকার করেন যে একটি বিশেষ মুখ তাঁকে টানে কারণ সে-মুখে কিছু ভাষা থাকে আর কোন অধ্যাপকই বা অস্বীকার করবেন যে তাঁদের অধ্যাপনার কালে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে একটুখানি ভাষা তাঁরা কতখানি প্রত্যাশা করেন এবং তা পেলে শুধু অনন্যিতা নন, কৃতজ্ঞও বোধ করেন তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি, অতএব এর মধ্যে কোনও অশালীনতা ছিল না যখন তিনি সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলেন এবং এতটুকু যৌনতাবোধও জন্ম নিতে পারেনি ওই ডিপকাট কামিজ, বতই-না তিনি প্রেমের শরীরী অনুবঙ্গ সম্পর্কে নেটি নিয়ে থাকুন। শরীরী ইচ্ছা সংযত রাখার বিপুল ক্ষমতা আনিসুজ্জামানের যা তিনি প্রয়োগ করে আসছেন সেই কাল থেকেই প্রায় যখন তাঁকে যুবক বলা যেত না এবং এই সংযম নিয়েই তিনি পড়ান কবিতা, যা রচনা করেছিলেন কবিকুলশিরোমণিরা দেশে দেশে, যুগে যুগে অথচ যাদের চিন্তাধারায় কোনও পার্থক্য ছিল না। আনিসুজ্জামান বলেন—‘ফ্রেজি জেন টকস্ উইথ দ্য বিশপ’ বলেছিলাম বটে বিন্যাসিত বলতে গিয়ে।

দীপঙ্কর উৎসাহিত হন। তাঁকে তথ্যই হতে দেখা যায় এবং তিনি বলতে থাকেন—ফ্রেজি জেন? তুমি ফ্রেজি জেন বলেছিলে?

That lover of a night  
Came when he would,  
Went in the dawning light  
Whether I would or no;  
Men Come, men go;  
All things remain in God.

মনে আছে, মনে আছে তোমার? কী অসাধারণ লাইন! বলো! মেন কাম, মেন গো, অল থিংস রিমেইন ইন গড! আর এরপরে আছে একটা অমোঘ লাইন। যা মানুষের প্রতি বা এই নগরায়নের প্রতি খিজিরও বটে আবার সাবধানবাণীও বটে। এর পরের লাইনটা। মনে আছে?

আনিসুজ্জামান বলেন—ব্যানারস চোক দ্য স্কাই/মেন-আউট-আর্মস টেড...

দীপঙ্কর বলেন—ইয়েস! দোজ আর দ্য ওয়ার্ডস! ব্যানারস চোক দ্য স্কাই... জানো, কলকাতার দিকে তাকালেই আমার এ কথা মনে পড়ে আজকাল। ব্যানারস আন্ড ব্যানারস। হোভিৎস আন্ড হোভিৎস। সত্যিই আকাশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখো! আর আজকাল হয়েছে, ওই আন্টেনা, একটার পর একটা ছাদ ফুঁড়ে উঠছে, ম্যাজিসিয়ানের শূন্য ভাসমান কঙ্কালের মতো...

আনিসুজ্জামান চারপাশে অসংখ্য কঙ্কাল দেখতে পান। নির্বোধ, হাড়সর্বস্ব কঙ্কাল। তবু, দীপঙ্করের সঙ্গে কথা বলার আনন্দ সাহসনার মতো মনে লেগে থাকে। সেটুকু স্বন্দল করে আবার



পড়তে যান ক্লাশে এবং তাঁর মনে হতে থাকে, সারা ক্লাশ, বুথি-বা তাঁর চোখের ওপর নজরদারি করছে, বুথি-বা মুখ টিপে হাসছে এই ভেবে যে আনিসুজ্জামান সব কিছু সুযোগ নিচ্ছেন নিজস্ব ইচ্ছা প্রকাশের জন্য। তাঁর বিপন্ন লাগে। তবু তিনি এক কবিতা থেকে অন্য কবিতায় যান। কে জানে, কখন কার মধ্যে এতটুকু আলো জেগে উঠবে তার সে বুঝতে পারবে এইসব আশ্চর্য রচনার সার্থকতা, আর সে তখন সাহায্যে পড়বে 'হেইজি জেন' খন গড' এবং 'ব্যানারস চোক দা স্কাই'। পড়ে আকাশের জন্য কষ্ট বোধ করবে।

আনিসুজ্জামান নিজের মতো করে পড়ল এবং নিজের কাজটি নিজের মতো করে করাই ভাল, এও তিনি বিশ্বাস করেন। তাঁর সমস্তসীমা পেরুলে তিনি চলে যান অধ্যাপকদের কাছে এবং সেখানে, কয়েকজন, তাঁকে—আর কতদিন ব্যাচেলর থাকবে, এ বার বিয়ে করো—গোছের উপদেশ দিতে শুরু করেন।

কলেজ থেকে ফেরার পথে আর মল্লিনাথের বাড়ি গেলেন না আনিসুজ্জামান। বেশ বিচে পেয়েছিল। সরাসরি বাড়ি চলে এলেন তিনি। নীলোফা গরম গরম সুজির পোলাও বানিয়ে দিল। আনিসুজ্জামান খেতে খেতে বললেন—ভাল রান্না করেছিস তো নীলু। কে শেখাল?

—মাসিমা।

একটিও বাড়তি কথা বলে না নীলোফা। কিছু চায়ও না। মাঝে মাঝে বিপন্ন স্ট্রিটের বাড়িতে যাওয়া ছাড়া তার আর যাবার জায়গাও নেই। ইদানিং সেখানেও আর যেতে চায় না সে। প্রত্যেকটি উৎসবে-অনুষ্ঠানে ও বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ পান তাঁরা। মাঝে মাঝে নীলোফাকে নেবার জন্য গাড়িও পঠানো হয়। কিন্তু আনিসুজ্জামানের বাড়িতে আসার কোনও আগ্রহ ও বাড়ির লোকের নেই। তিনি কোনও উৎসব অনুষ্ঠানও করেন না যে তাঁদের আমন্ত্রণ করা যাবে। ইতিমধ্যে দুই চাচি গত হয়েছেন। মনিরুল তরুণী স্ত্রী নিয়ে সুবেই জীবন-যাপন করছেন দেখা যায়। কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে, এই বয়সেও তিনটি বাচ্চা আনয়ন করেছেন তিনি। মায়ের মৃত্যুতে শোক পেয়েছিল নীলোফা, কিন্তু সামলে নিয়েছে। বড় চাচিকেই মা বলে জেনেছিলেন আনিসুজ্জামান। তাঁর মৃত্যুতে বুঝি কষ্ট পেয়েছিলেন তিনিও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোক প্রশমিত হয়েছে। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আনিসুজ্জামানও মনে মনে নীলোফার সে-দিনের সিদ্ধান্তের প্রশংসা না করে পারেননি। এটা ঠিক যে নীলোফা নিজে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু আনিসুজ্জামান নীলোফার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ববোধের ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করে ভাল আছেন এ নিয়েও কোনও সংশয় নেই।

নীলোফা এখানে কেমন আছে? আনিসুজ্জামান কখনও তা জানতে চাননি। কিন্তু এটুকু বলা যেতে পারে যে এখানে তার স্বাধীনতা আছে। এখানে পাড়ার লোক, গল্প শুনতে খুবই উৎসুক কিন্তু নিম্পুহও। কখনও কোনও জমায়ত হলে কুট-কচাল, নিন্দে-মন্দ, আলোচনা-সমালোচনা চলে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। যে বার বাড়িগত জীবনপ্রবাহে স্বচ্ছন্দই থাকতে পারে। আনিসুজ্জামান ও নীলোফার জীবনযাত্রায় এ পাড়ার পরিবেশ সহায়কই হয়েছে। নীলোফা সেতার শেখে, গান করে, বাজারে যায়। নীলোফা সেলাই করে। বাংলা বই পড়ে। নীলিমার সঙ্গে কথা বলে আর মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে কেনাকাটাও করতে যায়। নীলিমার কাছে সে বুঝি কিছু মেই ও প্রার্থ্যও পায়। নীলিমা নানারকম রান্না নীলোফাকে শেখান এবং বই পড়ে তা নিয়ে কথা বলতে প্রবৃত্ত থাকেন। নীলোফা নিজের ইচ্ছেমতো রান্নাঘর গোছায়, ঘর সাজায় এবং কোনও কাজের লোক না রেখে সারা দিনমানের কাজ একাই সম্পন্ন করে। আনিসুজ্জামানের কোনও ছাত্র যখন এসেছে তখন রাত্রিবাস করুক বা না করুক নীলোফা তাদের যথাযথ আপ্যায়ন ও যত্ন করেছে। নীলোফা না থাকলে কী হত সে-সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই আনিসুজ্জামানের। হয়তো-বা ছাত্রদের এতখানি আপ্যায়ন করা সম্ভব হত না। হয়তো-বা ঘরের এই পরিচ্ছন্নতা, সুদৃশ্য পর্দা বা ফুলের

টব, বাথরুমের পাছ বা বাকনকে রান্নাঘর থাকত না। আনিসুজ্জামান একা থাকে ও ঘরোয়া কাজ করা সম্পর্কে যে-কোনও ভারতীয় পুরুষের মতোই যোগ্যতা রাখেই অসমর্থ। নীলোফা যে-নিশ্চিন্তি ও সহায়তা তাঁকে দেয় তা গবেষণাধর্মী বই লেখার পরিকল্পনায় সাহায্য করে। কিন্তু সে সম্পর্কে আনিসুজ্জামান ওয়াকিবহাল নন। নীলোফা যখন দু'একদিনের জন্য বিপুল ষ্টিটে যায় তখন আনিসুজ্জামান একটু বিপন্ন বোধ করেন এই ভেবে যে হয়তো তাঁকে চা বানিয়ে খেতে হবে, যদিও তা কোনওদিন ঘটেনি কারণ নীলোফা না থাকলে নীলিমা খুব খুশির সঙ্গে আনিসুজ্জামানের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। নীলোফার কোনও নিজস্ব প্রার্থনা বা জাহিদা আছে কিনা এ নিয়ে আনিসুজ্জামান কখনও ভাবেননি।

সুজির পোলাও খেয়ে আনিসুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধের কাজে গেলেন। ঘুরে-ফিরে কলেজের কথা তাঁর মনে পড়তে লাগল। প্রবন্ধে মনোনিবেশ করতে না-পারে তিনি মঞ্জিনাথের বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

মাঝে মাঝে নিশুতি রাতে বেরিয়ে পড়েন আনিসুজ্জামান। হয়তো ঘুম আসে না তাঁর। কিংবা নিশুতি রাত, যা চেনা পৃথিবীটাকে অচেনা করে দেয়, কিংবা দিনের বেলায় বা প্রথম রাত্রে বা উচ্চারণ করতে পারে না মানুষ এবং যে-আবেগ অন্তঃস্থ রাখে সেগুলি প্রকাশ করতে থাকে, আর তার কানকড়ি আনিসুজ্জামান সংগ্রহ করতে সক্ষম হন এ সময়েই। ফলে তিনি মধ্যরাত্রে ঘুরে বেড়ান কোনও কোনও দিন এবং দেখতে পান ওই পাঞ্জাবি পরিবারের জানালার উঁকি মারে দুই যুবক বা যৌবনসমৃদ্ধ দম্পতির ঘরে উঁকি মারে এবং এই ইচ্ছে প্রকাশ করে যে তারা অন্তত একদিন কোনও পাঞ্জাবি মেয়ের সঙ্গে শুতে চায়। আনিসুজ্জামানের মনে হয়, ইচ্ছেটা অতি সামান্য বটে, তবে অতি নীচ। তিনি পথে চলতে চলতে দুঃখবোধ করলেন যখন ওই যুবকদ্বয় চমৎকার পোশাক পরে, শিক্ষিত মুখ নিয়ে হেঁটে গেল।

মঞ্জিনাথ তখন কোনও ঘরের আলো জ্বালেননি। সমস্ত নীরব এবং অপ্রীতিকর সন্ধ্যা, যা তিনি এতকাল কাটিয়ে এসেছেন, অদৃশ্য রূপচাঁদের সন্তোষবিধানের নিমিত্ত এতকাল যে আধা-সংসারী জীবন-যাপন তাঁর ছিল, আজ তার সমাপ্তি ঘটেছে। দেওয়ালে অমল-কমলের ছবি, দেওয়ালে মাধবী ও মঞ্জিনাথের ছবি। কিন্তু সবই পুরনো, হলদেটে। যখন মঞ্জিনাথ রূপচাঁদকে সর্বস্ব অর্পণ করেননি তখনকার আবছা সংসারচিত্র। আজ মঞ্জিনাথ থেকে থেকে এইসব দেখছেন। এই ছেলেকে দাহ করে এসেছেন, যে এক আশ্চর্য চিঠি তার ভাইকে লিখেছে। যে তার পিতাকে সমস্ত ঘটনাসূত্রের জন্য দায়ী করে, ঘৃণা করে চলে গেছে। সে কি সত্যি জেনেছিল, মারা যাবে? মঞ্জিনাথ চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞান থেকে ঝুঁটি হতে থাকেন। যন্ত্রণালিভের মতো ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় এসে দাঁড়ান ওষুধভর্তি আলমারির সামনে। আলমারির কাছে তাঁর প্রতিবিম্ব। হালকা প্রতিবিম্বকে ভেদ করে যাচ্ছে ওষুধের বিচিত্র নাম। তিনি পড়ছেন— ...জেসিক। ...সায়ানিন। ...প্রক্স। ...সিডিন। স্মরণ করার চেষ্টা করছেন বিভিন্ন কম্পোজিশন। বাইক্লোমেথাসোন ডাইক্লোপায়ারেন্ট। ডাইক্লোফেনাক ডাইয়েথাইলামাইন। মেটোনিডাজোল। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিচ্ছে মঞ্জিনাথের কপালে। পূর্ণ ঘূর্ণায়মান পাখার নীচে দাঁড়িয়েও তাঁর পিঠ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। তাঁকে একলা রেখে দুই ছেলে চলে গেল। একজন কথাটিও বলল না। একজন মুখ ঘুরিয়ে রইল। বলল না, বাবা, তুমিও চলো। বাবা, একলা, এত বড় বাড়িতে তুমি কেমন করে থাকবে।

আর মাধবী? মঞ্জিনাথের আজ এত বছর পর মনে হচ্ছে, মাধবী, পাগলিনী হয়ে, অর্থহীন হয়েও, সারা ঘর জুড়ে ছিল। সেও কি ছেড়ে গেল না মঞ্জিনাথকে? রেখে গেল না, একা? এবং ওই ঔষধসমূহ। প্রেসক্রিপশন লিখতে বসলে যারা ধরা দেয় না মঞ্জিনাথকে, হতে পারে তা মানসিক চাপে, হতে পারে পুরস্কারে, হতে পারে ধারাবাহিক ও প্রলম্বিত, অতিভারনুজ্ঞা ওই কালীপূজার ধারসে, কিন্তু তারা এতদিন মঞ্জিনাথে অবস্থিত ছিল আপন শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই

এবং আজ নেই! মল্লিনাথ শঙ্কিত হয়ে আছেন। ওষুধের রাসায়নিক মনে আছে তাঁর, হায়, নাম মনে নেই। অপরিপূর্ণ স্বামীর মতো, অপরিপূর্ণ পিতার মতো, অপরিপূর্ণ সংসারীর মতো, অপরিপূর্ণ ডাক্তার হয়ে যাবার ভয়ে তিনি শ্রান্তি বোধ করেন এবং ওই শ্রান্তি তাঁকে আরও একলা করে দিতে দিতে উপলব্ধি করিয়ে নেয়, এই ভার দুর্বহ, এই একাকিত্ব অসহনীয়। ঘড়ির একটানা টিক টিক শব্দ তাঁর মাথা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয় নিষ্ঠুর হত্যাকারীর অভিপ্রায়ে এবং তিনি দু'হাতে মাথা আঁকড়ে কাঁপেন। এবং বিন বিন করে নেমে আসতে থাকা ঘামের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পান দরজার বেল বাজছে। তিনি ছোটেন। কেউ এসেছে। হ্যাঁ। কেউ এসেছে নিশ্চয়ই। কোনও মানুষ। কোনও দানব। কোনও আত্মা বা প্রেতাত্মা। রূপচাঁদ—যিনি স্বপ্নে দেখা দেন ; অমলেন্দু—যে আগে থেকে মৃত্যুর দিন নির্ধারণ করে রাখেন। মল্লিনাথ দরজা খুললেন। আনিসুজ্জামান দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাস করছেন—ডাক্তারদা, আপনি অসুস্থ?

মল্লিনাথ হারিয়ে গিয়েছেন। এ কে? রূপচাঁদ নন। মাধবী নন। অমলেন্দু—কমলেন্দু নয়। ঘামে ভেজা মুখে, শূন্য দৃষ্টি মেলে আনিসুজ্জামানের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। আনিসুজ্জামান আবার জিজ্ঞাসা করছেন—ডাক্তারদা, কী হয়েছে? আপনি কেমন আছেন?

মল্লিনাথ ক্রমশ দৃষ্ট আত্মাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে থাকেন। পরিব্রাজণ পেয়ে ফিরে আসেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টি অভিব্যক্তি ফিরে পায়। বেদনার মতো এক হাসি ফুটে ওঠে তাঁর ঠোঁটে। তাঁকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং ক্লান্ত লাগছে এখন। তিনি বলছেন—এসো। অধ্যাপক। ওরা সবাই আজ চলে গেল।

আনিসুজ্জামান ঘরে পা রাখেন। জুতো খুলে খোলা পায়ে মেঝে স্পর্শ করেন তিনি। তাঁর চোখে প্রশ্ন ও বিস্ময়। তিনি জিজ্ঞাসা রাখেন—কারা চলে গেল, ডাক্তারদা?

—মাধবী। কমল। কমল ওর মাকে নিয়ে চলে গেল।

—চলে গেল? কেন?

—মায়ের চিকিৎসা করাতে চায়। আমি যে-দায়িত্ব পালন করিনি তাই করতে চায় সে। অধ্যাপক, তুমি কি জানো, মানুষ আগে থেকে তার মৃত্যুর সময় ঘোষণা করতে পারে? ধরো তা আত্মহত্যা নয়, অসুস্থতা, তবু?

আনিসুজ্জামান মল্লিনাথের অবস্থা অনুমান করেন। তাঁর কপাল কুঁচকে যায়। সাদা-কালো শ্বেতিচিহ্নিত কপালে কয়েকটি বাঁকাচোরা দাগ পড়ে। তিনি চিন্তিত মুখে বলেন—মৃত্যুর সময় বুঝতে পারা? এরকম শুনেছি কয়েকবার। কিন্তু এর কি কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে?

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরীশ ঘোষের রোগ গ্রহণ করেছিলেন, এর কি কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? সবাই বিজ্ঞান খোঁজে। প্রমাণ খোঁজে। অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেয়। আমি কেন পারি না? কেন জেগে শান্তি পাচ্ছি না আমি? কেন ঘুমিয়ে শান্তি পাই না? সব ছাড়লাম, সব দিলাম, নিয়ম-নিষ্ঠা মেনে পূজা করে যাচ্ছি। তবু সে আমার পিছু ছাড়ে না কেন?

—কে? কার কথা বলছেন, ডাক্তারদা?

—রূপচাঁদ। রূপচাঁদ...

মল্লিনাথ অসংলগ্নভাবে রূপচাঁদের বৃত্তান্ত বলেন। স্বপ্নের কাহিনী শোনান। একে একে বলেন গঙ্গায় কাঠামো ভেসে আসার ইতিবৃত্ত। আনিসুজ্জামান স্তব্ধ হয়ে শোনেন। এতদিন কিছুই জানতেন না, কিছুই বলেননি মল্লিনাথ। এত ভার নিয়ে দিনযাপন করেছিলেন বোঝাও যায়নি কখনও। আনিসুজ্জামানের অস্থির লাগে। চেনা মুখের মধ্যেও, হঠাৎ, অজানিত, অপরিজ্ঞাত জীবন দেখতে পেয়ে তিনি দিশেহারা বোধ করেন। মল্লিনাথ বলে যান—তোমার বউদি কালীবেশে আমার কাছে এসেছিলেন।

—সেকি?

—হ্যাঁ, কালীবেশ ধরে আমার কাছে পূজা চাইছিলেন তিনি। এ কি কালীরই কোনও নির্দেশ?

এ কি মায়েরই ইচ্ছা? নাকি স্বামী হিসেবে আজীবন যে পূজা আমার তাকে দেবার কথা ছিল, তা দিইনি বলে, যাবার আগে আমার কাছে পেতে চেয়েছিল! তার কাছে কি পুত্রশোকের চেয়েও বড় ছিল সেই শোক যা তার যৌবনকে লালিত করেছে? কিন্তু আমি তো সব ভুলে গিয়েছি। সব হারিয়ে ফেলেছি। মায়ের পূজা ছাড়া আমার যে আর কিছুই করার উপায় নেই।

খুবই ব্যক্তিগত কথা বলছেন মল্লিনাথ। অনিসুজ্ঞামান কথা মেনে না। মল্লিনাথকে তাঁর অপ্রকৃতিস্থ লাগে। হয়তো জামে খাকা শোক, কষ্ট, যন্ত্রণা তাকে এ মতো মানসিক অবস্থায় নিয়ে গেছে যা অফুরন্ত কথা বললে প্রশমিত হতে পারে। মানুষ কথা বলতে চায়। প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু পারে না। আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র কই। কিন্তু অনেক সময় স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান থাকে না। তখন শুধু কথা বলতে ইচ্ছা করে স্বপ্নোক্তির মতো। কেননা আর কারওকে শোনানোর জন্য নয়। নিজের জন্য। নিজের ভেতরকার বিরোধের জন্য। এ সব যে শোনে সে উপলক্ষ্য মাত্র। তাকে অলিখিত, অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতি দিতে হয় ভুলে যাবার। আর তেমনই প্রতিশ্রুতি সমেত অনিসুজ্ঞামান শুনে যান মল্লিনাথের কথা—আমি ওষুধের নাম ভুলে যাচ্ছি, অধ্যাপক। আমি ডাক্তারি পড়তে গিয়ে গোল্ড মেডেল পেয়েছিলাম। আমি ওষুধের নাম ভুলে যাচ্ছি। এ সবই কি তাঁরই নির্দেশে? মা কি চান আমি সব ভুলে তাঁরই ভজনা করি? এ জন্যই কি তিনি সবাইকে, সবকিছুকে আমার থেকে দূরে নিয়ে গেলেন? আমি তো দুই-ই চেয়েছিলাম। জানো, অমল যখন ছোট ছিল, খেজুর খেতে ভালবাসত। পূজোর দিন বলত—বাবা, খেজুরগুলো আমার তো? এর জন্য প্রসাদে অনেকটা খেজুর দিতাম আমি। সেই অমল আমাকে ঘৃণা করে চলে গেল। আমার জন্য ও মৃত্যুর কাছে গেল। তা হলে কি আমি আমার পুত্র-হত্যারক হলাম? তোমার বউদির জন্য, অমল-কমলের মায়ের জন্যও কি আমিই দায়ী রইলাম?

অনিসুজ্ঞামান বিপন্ন বোধ করেন। কী বলবেন, কী বলতে হয় ভেবে পান না। বলেন—আপনার বিক্রাম প্রয়োজন। আপনি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। ঘুমিয়ে নিন।

—ঘুম? আসে না। এলেও স্বপ্নে তিনি আসবেন, আমার ভয় করে। ঘুমোতে ভয় করে।

—একটা ওষুধ-টবুখ খান বরং। ঘুম গাঢ় না হলে আমরা নানা রকম স্বপ্ন দেখি। আপনাকে আমি আর কী বলব?

—ওষুধ? হ্যাঁ... ওষুধ... কিন্তু কী খাই বলো তো? আমাকে কি তুমি কিছু দিতে পারো, অধ্যাপক? কোনও ওষুধ? আমার মাথার ভেতরটাঃ যন্ত্রণা হয়। কবে থেকে যে হচ্ছে তাও মনে করতে পারি না। কিন্তু খামে না। ওষুধ খেয়েও কিছু হয় না।

—অন্য কোনও ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন একবার?

—নাঃ। অন্য ডাক্তার আমাকে কী করে সারাবে। আমার এ যন্ত্রণা সারবার নয়। তুমি বরং আলমারিটা খোলো। আমাকে একটা ওষুধ দাও। যদি ঘুমোতে পারি।

অনিসুজ্ঞামান ইতস্তত করেন। ওষুধ দেবার তিনি কেউই নন। বলেন—আমি বরং যাই একবার। শিবতোষকে ডেকে আনি।

—নাঃ। থাক। আমার ওষুধ দরকার নেই।

অনিসুজ্ঞামানের কষ্ট হয়। তিনি প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অন্য কোনও প্রসঙ্গেরই অবতারণা সম্ভব হয় না। কৌতূহল, অকারণ অসত্য কৌতূহল তাঁকে গোপনে প্ররোচিত করে। ক্ষয়ে যাওয়া মানুষটিকে ঝুঁটিয়ে তোলেন তিনি। তাঁর কষ্ট হচ্ছে, তবু, অপরাধী লাগছে, তবু। প্রশ্ন করেন—ওরা আপনাকে দায়ী করছে কেন?

মল্লিনাথ বলেন—পূজা করেছি তো। শুদ্ধভাবে পারিবারিক প্রথা মেনে পূজা করেছি। যাবতীয় সাংসারিক অকল্যাণের কারণ হিসেবে ওই পূজাকেই দেখেছে ওরা। আমি তো চাইনি। দায়িত্ব নিতে চাইনি। কিন্তু মা যদি যেতে আসেন... অধ্যাপক... একটা ওষুধ আমাকে দিতে যাও। মাথাটা আমার বন্ধ যন্ত্রণা করছে।

আনিসুজ্জামান ওয়ুথের আলমারির কাছে যান। আলমারিতে চানি দেওয়া নেই। তাঁর মাথু দুর্বল হয়। কখনও কি ভেবেছেন, একজন ভাগ্যবানকে ওয়ুথ সেদেশে? যশ ওয়েই সেখেন? ওয়ুথের ঝিগ ঘাটেন তিনি। হালকা পরিমাণ কিছু ওয়ুথ পেয়েও যান হাতের আলমারি ভর্তি পরিচিত-অপরিচিত ওয়ুথ। মল্লিনাথ এগুলো বিলিয়ে দেন তাদের মজা ওয়ুথ কিনতে পারে না।

আনিসুজ্জামান জিজ্ঞেস করেন—ক'টি দেব?

—দু'খানা দাও।

ভাগ থেকে গ্রাসে জল ঢালেন আনিসুজ্জামান। দু'খানা ওয়ুথ আর এক গ্রাস জল বাড়িয়ে দেন মল্লিনাথের দিকে। মল্লিনাথ ওয়ুথ দু'টি দেন কিছু জল অহম করেন না। হঠাৎ হাসেন। সশব্দ, দীর্ঘায়িত। আনিসুজ্জামানের কাছে তা ভৌতিক বা অস্বাভাবিক মনে হয়। তাঁর এই প্রত্যয় হতে থাকে যে মল্লিনাথ তাঁর মানসিক চাপে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কিছু হঠাৎই, কোড়ো উদ্ভাস্ত বৃত্তি যেমন সবকিছু ভিজিয়ে দাণিয়ে থেমে যায়, তেমনি চূপ করে যান তিনি।

আনিসুজ্জামান, আহত, অপমানিত অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হতে থাকেন। জলের গ্রাস নামিয়ে রাখেন টেবিলে। তাঁর মনে ছিল না। তাঁর মনে থাকে না। ধর্মীয় পরিচয় তিনি কাঁধে করে বেড়ান না পেশাদার শব্দবাহকের মতো। কিন্তু তাঁকে মনে পড়িয়ে দেয় সমস্ত মানুষ। যারা মুসলমান তারা বলেন তুমি হিন্দুবেঁকা, সাবধান হও, আমাদের থেকে দূরে থাকো। যারা হিন্দু তারা বলেন তুমি হিন্দু নও, তফাৎ যাও। জল ছুঁয়ো না। আনিসুজ্জামান বলেন—আমি দুঃখিত, ভাঙারদা। আমার বোঝা উচিত ছিল।

মল্লিনাথ আনিসুজ্জামানের কথায় কান দেন না। আপনমনে বলে চলেন—আমি হিন্দু। ব্রাহ্মণ। শাসন-কালিকা পূজা করি। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারও ছোঁয়া জল আমার চলবে না। অধ্যাপক দেখো। আমি কীরকম নীচ, ঘৃণ্য। হতে পারি আমি পূত্রহন্ত। হতে পারি স্ত্রীকে পাগল করে দেবার মতো ক্ষমতাবান। তুমি আমার খবর নিতে এসেছিলে। আমার শুক্রা করাতে চেয়েছিলে। তবু, তোমাকে আমি অপমান করছি। কিছু বিশ্বাস করো। আমার কোনও উপায় নেই।

আনিসুজ্জামান বেরিয়ে আসছেন। মল্লিনাথ কি ওয়ুথটা খেলেন? না, আর ভাবেন না তিনি। কী যায় আসে এ সব? তাঁর ক্রোধ জাগে না। সহস্র বৎসরের সংস্কার। প্রতিনিয়ত মানুষকে অবনমিত করে। এই বিংশ শতকের শেষেও জন্মদাগের মতো লেগে আছে কোনও কোনও মানুষের চেতনায়। আনিসুজ্জামান বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। হারুর দোকানের সামনে ছেলেরা আড্ডা মারছে। নানা বয়স, নানা পাঠি, নানা সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষার মানুষ। পরস্পর তর্কাতর্কি করছে। বিষয় জ্যোতি বসুর সাম্প্রতিক বক্তৃতা। বিষয় ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণাজনিত অভিসন্ধি। আনিসুজ্জামান জানেন না এরা পরস্পর বন্ধু কি না। শত্রু হওয়াও সম্ভব। অথবা কোনও কিছুই নয়। বন্ধু বা শত্রু। হঠাৎ কোনও ঘটনা ঘটবে আর তার নিরিখে যে যার মতো নিজস্ব অবস্থান ও পরিচয় ঘটিতে ঘটিতে পাশের জনের বন্ধু বা শত্রু হওয়া নির্ণয় করবে। যেমন মল্লিনাথ, এতদিনের পরিচয়ের পর ইদানীং তাঁর সত্যদর্শন হচ্ছে যে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারও হাতের জল তাঁর চলবে না। কিছুদিন হল কালীতারার রাগাও ত্যাগ করেছেন তিনি। স্বপাক বাচ্ছেন। ভাতার মল্লিনাথ, যিনি সারা জীবনে নানা শরীর স্পর্শ করেছেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ না মেনেই, যিনি এতকাল সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনও করেছেন কোনও কিছু প্রাধান্য না নিয়েই, তিনি আনিসুজ্জামানকে প্রত্যাখান করছেন, আর আনিসুজ্জামানের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কষ্টকর কারণ এ পাড়ায় প্রথম এসে মল্লিনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও এবং মল্লিনাথই তাঁকে নিয়ে যান রাজশোপালের দোকানের আড্ডায় এবং তিনি ক্রমে পাড়ার একজন হয়ে পড়েন। এখন, এ সমস্ত ঘটনানুক্রমে আনিসুজ্জামানের দৃষ্টি বিকশিত হয় এবং তাঁর



গলা বেয়ে নেমে আসে তেতো স্বাদ আর তা নভি পর্যন্ত বিকৃত হয়। এই অপমান। কিন্তু এ অপমান এমনই মানুষের দেওয়া যার কথা আনিসুজ্জামান কারওকে বলতে পারবেন না। সিরফর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকেন তিনি। সারা অগস্তের অতি তাঁর অস্থিরতা জন্ম নেয়। একটা আবারও এক আশ্চর্য উপলব্ধি যা তাঁকে, বরাবর, মনবচরিত্র বৃত্তিতে প্ররোচিত করেছে। কিংবা অনুপ্রাণিত। প্ররোচনা বা অনুপ্রেরণা যাই হোক, আনিসুজ্জামান যন্ত্রণা টের পান। সেই যন্ত্রণা যা মানুষই মানুষকে দিয়ে থাকে।

মল্লিনাথের পরিবার মল্লিনাথকে পরিত্যাগ করেছেন কারণ তিনি লুণ্ঠাপায়ন করেছিলেন। আনিসুজ্জামান তাঁর পরিবার দ্বারা অর্ধপরিত্যক্ত কারণ তিনি যুথায়খডাবে ধর্মান্বেশ মনেননি। প্রত্যেকেই মানুষ। এ দেশের। এ যুগের। তাঁর মনে পড়ে সারি-সারি মুখ। জামার লৌশিকা মনোজ। সৌমিত্র। দেবার্চন। নীলমিত্র। তাদের স্বপ্ন হারিয়ে গেছে। তারা কি রেনেছিল এই দেশকে? মাটিকে? শুধু ধান-গম নয়, এ মাটিতে জন্মেছে শোষণ ও হত্যা। শুধু ধর্ম-ভক্তি নয়, এ মাটিতে আছে তাঁর কুসংস্কার, কঠিন ধর্মসংকট এবং ঘৃণা। অদিগন্তবিকৃত ঘৃণা। এ সব কি জানেনি তারা? বোঝেনি? রক্তে রক্তে ঢুকে যাওয়া এই ঘৃণার বিষ থেকে কী করে রক্ষা পাবে এ দেশ! কারা রক্ষা করবে? তাঁর মনে পড়ে লাল ডিপকাটি আঁটো কমিজ, মনে পড়ে ক্রাশকমের সমস্ত শূন্য মুখ—কোথাও এতটুকু আলো জ্বলে না। আনিসুজ্জামান দরজার বেল বাজান। নীলিমার ঘর থেকে মধুকঠের রবীন্দ্রমঙ্গীত ভেসে আসে—...যে সুধারস পানে গ্রিভুন মাতে তাহা মোরে দাও, হৃদয় ভরে দাও... আনিসুজ্জামানের বলতে ইচ্ছে করে—হৃদয় ভরে দাও—কিন্তু কাকে বলবেন? হৃদয়ভরণ কারওকেই তিনি খোঁজেননি কোনওদিন। বিনা খোঁজে কাটিয়ে গিয়েছেন অর্ধ জীবনকাল।

নীলোফা দরজা খুলে দেয়। হাতের আঙুলে মেরজাপ। সেতার বাজাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সে। আনিসুজ্জামানের মুখ তার নজরে আসে এবং সে জিজ্ঞাসা রাখে—কিছু হয়েছে? ভাইজান?

আনিসুজ্জামান মাথা নাড়েন। কিছু হয়নি। তিনি পাঞ্জাবি খোলেন। তাঁর শেতরোগাক্রান্ত ছোপ ছোপ শরীর দৃশ্যমান হয়। তিনি বলেন—একটু বাজিয়ে শোনাবি? নীলু?

—হ্যাঁ ভাইজান।

নীলোফা নিজের ঘর থেকে সেতার আনতে যায়। আনিসুজ্জামান ঘরের চড়া আলো নিবিড়ে মৃদু আলোটি জ্বেলে দেন। নীলোফা তার সামান্য আয়ত্রে আসা বাগ বাজাতে শুরু করে। মাকে মাঝে আনিসুজ্জামান গুনতে চান বটে, বিশেষ করে যে দিনগুলোয় তিনি অস্থির থাকেন, নীলোফা শোনায়, কিন্তু শোনাতে লজ্জাও বোধ করে কারণ যেটুকু সে শিখেছে, সেটুকু, কখনও কারওকে শোনাবার মতো নয়। তবু, আনিসুজ্জামানের কথা সে ফেলাতে পারে না বলে হাত লাগায়।

প্রয়োজনের বাইরে নীলোফা ও আনিসুজ্জামানের মধ্যে কোনও কথা হয় না। কিন্তু প্রয়োজন হলে কথা না হবারও কোনও কারণ থাকে না। হয়তো-বা, সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে, নীলোফা পুড়ে না গেলে, আনিসুজ্জামান রোগাক্রান্ত না হলে, তাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিল। যদিও এ পরিবারে, খুলজাত ভাই-বোনে বিবাহরীতি নেই কিন্তু তা হওয়ার মধ্যে কোনও নিষেধও নেই। বহু আগে এ পরিবার হিন্দু ছিল এবং পরে ধর্মান্তরিত হয় ফলে কিছু কিছু পারিবারিক রীতি বজায় থেকেই যায়। তাদের বংশে এ এক অনুষ্ঠারিত নিয়ম এবং তা থাকা সত্ত্বেও ভাই-বোনের মধ্যে দুষ্টর শীতল দেওয়াল থাকে যা অতিক্রম করা কঠিন। যেমন নীলোফা আনিসুজ্জামানের ঘরে বসে সেতার বাজাচ্ছে এখন এবং মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে আছে কারণ আনিসুজ্জামানের উপস্থিতিতে সে সাধারণত এ ঘরে আসে না এবং তিনিও যান না নীলোফার ঘরে। তাঁদের মধ্যে কোনও ছিটকিনি দেওয়া দরজা নেই, আবার দরজা ডিজেনোও



নেই। এই ঘর নীলোফাই পরিষ্কার করে। গোছায়। এ ঘরের সব সুল, সুগন্ধ, পুষ্টিশক্তি তারই হাতে বিদূরিত হয়। বিছনার চাদর ও বালিশচাকনা সে-ই কাছে-এবং বই শুঁচিয়ে রাখে। কিছু আনিসুজ্জামানের উপস্থিতিতে এ ঘর তার কাছে অচেনা থাকে। সন্ধ্যায় ঘুম থেকে উঠে আনিসুজ্জামান লবিতে আসেন এবং বাবার টেবিলে বসে লেখাপড়ার কাজটি সম্পন্ন করতে থাকেন। নীলোফার সঙ্গে তাঁর বাক্তীয় কথা এখানেই হয়। এখন সে বলে আছে এ ঘরের মেঝেয় এবং এ ঘরের মদু আলোর মতো মৃদুভাবে রাগ বিস্তার করেছে। সামান্য যে ক'টি রাগ সে কিছু কিছু আয়ত্ত করেছে, তারই থেকে বেছে নিয়ে বিস্তার করেছে। মাঝখানে থৈবত রেখে দু'পাশের কোমল ও শুষ্ক নিধান নিয়ে সুর খেলাতে ফেলতে থৈবত উপরে নেমে আসছে মধ্যমে, গাছারে। আর মধ্যম-গাছার গায়ে গায়ে আন্দোলিত হচ্ছে। মন্ত্র থেকে মধ্য সপ্তকে এসেছে তার বিস্তার। সে মিয়ামজার বাজাচ্ছে। এখন ববী নয়, মধ্য রাগি নয়, তবু বাজাচ্ছে। আনিসুজ্জামানের মনে হচ্ছে চারপাশ নিষ্ক হল। তাপিত জলয় সিদ্ধ হল। তিনি জানালার পর্দা তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ছির শুয়ে রইলেন। কিছু চিন্তায় অস্থিরতা গেল না। কলেজের কথা মনে পড়ছে। মঞ্জিনাথের আচরণ মনে পড়ছে। বড় চাচি, ছোট চাচি, মনিরুলের কথা। তাঁরা, নীলোফাকে আনিসুজ্জামানের সঙ্গে নিয়ে নিয়েছেন। নিজের সুবিধার জন্য জীবনযত্নকে পার করেছেন। আপদ আপনি বিদেয় হতে চাইল যখন তখন আর সুযোগ হাতছাড়া করেননি। এক আপদকে অন্য আপদের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। একটি বিকৃত মুখকে পাঠিয়েছেন অন্য এক বিকৃত মুখ বর্ণনের জন্য। তাঁদের খেয়াল রাখতে হচ্ছে করেনি যে আনিসুজ্জামান যুবক একজন আর স্বৈরাচারিণী হলেও সে পুরুষ। আর নীলোফা যৌবনকন্যা পোড়া ও বীভৎস হলেও সে নারী। যে কোনও মুহূর্তে এই দু'টি পরিচয় অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে যেতে পারে কারণ তাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্ভব। তাঁদের পরিবারে যদিও খুন্সিত ভাইবোনে বিবাহের রীতি নেই, তবু। নাকি এও এক কুটাল। যে কুটাল বিতে মানুষের ভুল হয় না। তাঁদের দু'জনকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যদি কোনওভাবে আনিসুজ্জামানের দ্বারা নীলোফার গতি হয়...।

আনিসুজ্জামান এক হাতে নিজের গলা টিপে ধরেন। নিজের ওপর যেমা হয় তাঁর। নিজের মথেকার জটিল ভাবনার রাফস মুখ বেখে ক্লান্ত বোধ করেন তিনি। নীলোফার মগ নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাসের বিপরীতে এই ভাবনার জন্য তিনি নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন না। তাঁর চোখ বুলতে ভয় করে, বুঝি, চোখ বুললেই নীলোফা সব পড়ে ফেলবে আর ঘৃণায় মুখ কিরিয়ে নেবে। নীলোফার জন্য মায়া জাগে তার। ভাবতে থাকেন তিনি, আহা মেয়েটা, আহা। সমস্ত সৌন্দর্যবিহীনতাকে সারাদিন আড়াল করে বেড়ায় সে। আর তাঁর লাল কামিজের মেয়েকে মনে পড়ে। সমস্ত সৌন্দর্যকে যে উপরে দেয়। আর এই ওপরানোর মধ্যে নিহিত থাকে এমন তীব্রতা যা সৌন্দর্য পোড়ায়। আনিসুজ্জামানের পক্ষে তা কঠিন এবং দুঃসহ হয়ে থাকে যা তাঁর কাছে প্রায় সৌন্দর্যহীনতারই সমার্থক।

নীলোফা একমনে বিস্তার করে। শুধুই বিস্তার করে। বুঝি-বা বিকৃত সুরে সে আকাশকে ছুঁয়ে ফেলতে চায়। ব্যানারে, হোর্ডিং-এ, বিজ্ঞাপনে লাক্ষিত হয়ে যাওয়া আকাশে সুর পৌঁছে দিয়ে মেঘ ভেঙে আনতে চায়। আর মেঘেরা সব, ব্যানারের ফাঁক-ফোকর গলে, নীলোফার সুর ধরে একসময় কখন যেন ঢুকে পড়বে মাথুরের গড়ে আর বৃষ্টি ঝরিয়ে দেবে, এই তাপিত ব্লাডিবাড়ির দেওয়ালগুলো ভিত্তে বাবে তখন আর ঠাণ্ডা হবে। আনিসুজ্জামান ঘুমোবেন। সব ভুলে ঘুমোবেন। ঘুমিয়ে পড়বেন। ঘুম... ঘুম...

সমস্ত কুটিল মুখের থেকে দূরে সরে যান আনিসুজ্জামান। ঘুমে ডুবে যান। গুরুপক্ষের রাতে আকাশে চুপিসাড়ে মেঘ ঘনায়। নীলোফা, বিস্তারের মধ্যেই থামিয়ে দেয় বাজনা এবং সেতার তুলে রাখে। আনিসুজ্জামানের জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় সে একবার। পেছনদিককার ঝাঁকড়া খুপসি আমগাছটি দেখে। মৃদু বিদ্যুৎ কাঁপে আকাশে। বুঝি বৃষ্টি হবে। বুঝি দিগন্তের

মেঘ ছেয়ে বাবে সন্মুখ আকাশ। অনিসুজ্ঞামানের যাওয়া হয়নি। তবু, নীলোফা, তাঁর ঘুম না ভাঙানোর সিদ্ধান্তই নেয় এবং নিজের খাবারের থালা নিয়ে ব্যালকনিতে তার গাছদের কাছে দাঁড়ায়। সে ভাবতে থাকে, ডাইনিং টেবিলের চেয়ারটি টেনে নেবে এবং বসাবে এখানে। সে-মতোই সে করে এবং দেখতে পায় আকাশে বেড়ে চলেছে বিদ্যুতের পরিলম্ব। তাঁর আনন্দ হয়। ওই মেঘের সঙ্গে নিজের সংযোগ স্থাপন করে মন ভরে তুলতে থাকে। বৃষ্টি-বা সে মিঞামজার বাজিয়েছিল বলেই গ্রীষ্মের ছাঁটে এসে গিয়েছে বর্ষা। সে ভাবতে থাকে, সত্যিই কি তেমন করে চাইলে আত্মা সব দেন বা কাম্য?

অন্যান্য দিন অনিসুজ্ঞামানের সঙ্গেই নীলোফা আহার করে থাকে। প্রথম-প্রথম, এখানে আসার পর, বিপন স্ট্রিটের বাড়ির রীতি অনুযায়ী আসে। অনিসুজ্ঞামানকে, পূর্ববমানুষের অগ্রাধিকার ও বিশেষত্বে খেতে দিত সে, পরে নিজে খেত। অনিসুজ্ঞামান নিজেই তা রন্ধ করেছেন এবং এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে এক সঙ্গে খাবার মধ্যে যে পারিবারিক পরিমণ্ডল রচিত হয়, অন্য কিছুতেই তা হয় না। আজ একা একা খেতে নীলোফার ফাঁকা লাগছে। সে প্রত্যাশা করছে, যদি অনিসুজ্ঞামানের ঘুম আপনা থেকেই ভেঙে যায় তাহলে তাঁকে খাবার সাজিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তেমনটি ঘটে না। সেও অতৃপ্তির খাবার নিঃশেষ না করে রেখে দেয় এবং তার গাছদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে বলতে থাকে, তৈরি হও, তোমরা তৈরি হও, আজ বৃষ্টি আসবে। গাছেরা মাথা নাড়ে। ব্যালকনির জিল গলে কিছু বৃষ্টির ভাপ জুটে বাবে তাদের নিশ্চয়ই। ফাঁটা না পাক ছাঁট পাবে। তাই নিয়ে খুশি থাকবে রাত্রিভর।

নীলোফা ব্যালকনির দরজাটি বন্ধ করে এবং নিজের ঘরে চলে যায়। পর্দা তুলে দেয় সে এবং শুয়ে শুয়ে দেখে দ্রুত ধাবমান মেঘ। ফাকে মোটেই অন্ধকারে ঠাহর করা যায় না, শুধু জেগে থাকে, কলসে থাকে তার বিদ্যুতের চমক। আর সেই চমক দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

বৃষ্টির ছাঁটে ঘুম ভাঙল অনিসুজ্ঞামানের। ঘের লাগা চোখে উঠে বসলেন তিনি। এখন কি মাঝরাত? কিছুই ঠাহর হল না। কখন বৃষ্টি নামল আর মেঘই-বা করেছিল কখন। বৃষ্টির ছাঁটে বিভ্রান ভিজে যায়। অনিসুজ্ঞামান জানালা বন্ধ করতে করতে পাকস্থলীতে ঘিদের যন্ত্রণা টের পান। তাঁর কি আজ যাওয়া হয়নি? মনে পড়ল মল্লিনাথের মুখ। মনে পড়ল, সেতার বাজাছিল নীলোফা আর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। শীত-শীত করছে। পাঞ্জাবি টেনে গায়ে চাপালেন তিনি। তখনই মনে পড়ল, এই হঠাৎ বৃষ্টির কথা নীলোফা কি জানে? সে কি জানালা বন্ধ করেছে? যদি ভুলে যায়, যদি টের না পায়, তার সেতার ও অন্যান্য বস্তু ভিজে যাবে। অনিসুজ্ঞামান, নীলোফার ঘরের পর্দা সরিয়ে ঢোকেন। না। জানালা বন্ধ করেনি নীলোফা। ছাঁট ঢুকছে ঘরে। বৃষ্টিতে সে জাগেনি। অন্ধকারের নিজস্ব আলোয় দেখা যাচ্ছে তার শয়ান।

নারী-অবয়বের প্রান্তে অবচ্ছাদ মুখ। অনিসুজ্ঞামানের কল্পনায় তা মাদুরে মণ্ডিত হয়। কবে একদিন সেখা ফেলা কোন বাঁশের বেড়ায় ঘেরা ঘরের মধ্যকার দৃশ্যাবলী হিঁড়ে-ফেলা চিঠির মতো ভেসে বেড়ায়। ওই দৃশ্যই তাঁকে কামবোধে প্ররোচিত করেছিল এবং ওই দৃশ্য থেকেই তিনি পালিয়ে বেড়িয়েছেন এবং সংযত থেকেছেন প্রত্যাগী রুদ্ধচারীর মতো। আজ, অনিসুজ্ঞামান বিদ্যুৎ দ্বারা, মানসিক অস্থিরতা দ্বারা, শরীর কল্পনা-শ্রুতি দ্বারা প্ররোচিত হন আবার এবং তাঁর, এতদিন আগলানো সংযমের বাড়ে থাকা বসায় উপগ্রহ অনুভূতি। বিশ্বাসঘাতক রক্ত পুংস্থলীতে ধাবমান হয়, ধমনীতে চলাচল করে। অন্ধকারে রাত্রি, সমস্ত অন্ধকার পুরুষের মতো তাঁরও অভিসন্ধি সক্রিয় হয়। ভুলে যেতে থাকেন তিনি, অনিসুজ্ঞামান, সংযত, অবিকলিতচিত্ত, চিরকৌমাৰ্যের সংকল্প তাঁর। ভুলে যান, শুয়ে থাকা মেয়েটি কত বিশ্বাসে শয়নকক্ষে আগল ভোলে না। তিনি, এক চিরাচরিত আদমি পুরুষ, অভুক্ত অপমানিত মস্তিষ্কে ভেসে ওঠেন। তাঁর সামনে চরাচর জুড়ে থাকে ছাকিশ বছরের পরিপূর্ণ নারী। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘরে ভিজে ভিজে জাব। তবু কী আশ্চর্য উত্তাপ। পায়ে পায়ে এগোচ্ছেন অধ্যাপক। মহান,

দেহাতীত প্রেম সম্পর্কিত অভিভাষণ দেওয়া অধ্যাপক। কোন নিম্নে— অনিবার্য নিপু তাত্ত্বিক। কীসের জন্য— এই প্রেমহীন দৃষ্টি নিষ্কপ? নেই প্রশ্ন কই প্রশ্ন প্রশ্নবিহীন— দুই হাত এগিয়ে আসে আর তখন এক ঝলক তুমুল বিন্যাস ঢুকে পড়ে জানালা দিয়ে আর আছড়ে পড়ে নীলোফার মুখে— সে মুখে, এখন বোরখা ঢাকা নেই, খোলা আছে দণ্ড, কুণ্ডলী, বীভৎস অতিবাস্তি, বিন্যাসের মৌহর্তিক ঝলকে যা আরও আরও ভয়ঙ্কর, কদাকার।

আনিসুজ্জামান বাড়িয়ে দেওয়া হাত গুটিয়ে ছোপ চাপা নিলেন। তীব্র শব্দ উঠল তাঁর গলায়— আ আ আ! থোমটা নেই কেন, বোরখা নেই কেন নীলোফার? দণ্ড গলিত কদম্ব মুখ। নাকের অঙ্ককার ফুটো। সম্পূর্ণ বহু না হওয়া চোখে বিবমিষা সাদা। এক ঝলক অ্যাকোয় গলিত সমাধিস্থ শবের মতো কুহসিত।

আনিসুজ্জামান পালাতে থাকেন। দ্রুত, অতি দ্রুত, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চান। দরজায় ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনার শব্দ হয়। দুই হাতে পেট চেপে ঘরে অজ্ঞাত অজ্ঞান বসি করে উগরে সেন হাতখোয়ার বেসিন-গর্তে। এবং বেসিনের নালি অটকে যায়। কল থেকে বেরিয়ে আসা জলের সঙ্গে মিশতে না পেরে জলে ক্রমশ আবর্ত তৈরি করতে থাকে অপাচ্য বস্তু, অন্ন, পিণ্ড, ধুতু, কফ। যেন-বা তমসা নির্গত হয়। আনিসুজ্জামান আবার, বহুদিন আগেকার মতো বমনবাস্তি হয়ে ওঠেন।

সমস্ত সুরহীন ধাক্কার শব্দে, সমস্ত উগ্র নিষ্ঠুর অতিবাস্তির স্যোতনায় ঘুম ভেঙে ছুটে এল নীলোফা— ভাইজান। তার মনে পড়ছে ভাইজান আজ অস্থির ছিলেন। অসুস্থ হলেন কি? আকস্মিকতায় তার মুখে ঢাকা দেওয়া নেই। বিনি নিশ্চেষ্টে আছে কাঁধে। উৎসেগে সে বুঝি ভুলে গেছে তার কদম্ব মুখ। পুড়ে যাওয়া কর্কশ হাতে সে আনিসুজ্জামানের কাঁধে শুক্রা চাপড় মারছে। আনিসুজ্জামান দেখছেন না। তুলছেন না মুখ। অঙ্গগত ঘর ভরে যাচ্ছে। তাঁর মুখে ঠোটে জড়িয়ে আছে বমি-রস-নাল। তিনি বলছেন— চলে যা... ওক্... চলে যা তুই... আহ... তাকাতো পারছি না, দেখতে পারছি না। ওক্-ওক্-ওক্... ঘরে চলে যা তুই... নীলু—

নীলোফা চলে যাচ্ছে। মুখ নিচু করে। ধীরে ধীরে। বুঝি-বা নিভৃত ছায়ার মতো চলে যাচ্ছে। অস্তিত্বে বিপন্নতা দেখতে দেখতে সে অনুমান করে নিচ্ছে আনুপূর্বিক ঘটনানুক্রম। সে, রিপন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে আসার পর, এই প্রথম, এ ঘরের আগল তুলছে। বিছানায় চলে যাচ্ছে। কান্না যদি কোনও সঙ্গী হয় মানুষের, কোনও প্রতিষেধক, কোনও উপশম, তবে, এই মুহূর্তে নীলোফা তার নাগাল পাচ্ছে না। আর আনিসুজ্জামান তাঁর অবসন্ন শরীর বিছানায় মেলে দিয়ে ভাবছেন, এ কেমন মার? যে-মার অন্যকে রক্তাক্ত করে এবং নিজেকেও ছিড়ে-ঝুঁড়ে দেয়— এ কেমন মার। নিজের মধ্যকার অসংখ্য অচেনা মুখ তাঁকে ঘিরে ধড়হীন মুণ্ডের মতো নাচে। রক্তাক্ত বীভৎস লাগে সেই সব। আনিসুজ্জামান বিভ্রান্ত হয়ে যান। নিজেকে তাঁর সম্পূর্ণ অচেনা লাগে। অস্বীল লাগে। মানুষ মানুষকে অপমানে দাহ করে তিনি জানতেন। ভরসা ছিল, নিজে তা করেন না। আজ সে ভরসা গেল। এবং সেই অতুলনীয় ঘৃণা কাজ তিনি করলেন যা নীলোফাকে সর্বার্থে অস্তিত্বহীন করে দিল। আনিসুজ্জামান নীলোফার মুখের জন্য নিজের কাছে সহনশীলতা প্রার্থনা করেন। সেই প্রেম প্রার্থনা করেন যার স্বরূপ জানা তাঁর থাকে না কিন্তু যা রূপাতীত সত্যকে আশ্রয় করে। এবং নিজের প্রতি দিকারে, নিজেরও রূপহীন বিকৃতচর্ম শরীরকে চিহ্নিত করতে বিছানা থেকে নেমে দরজায় খিল তোলেন তিনি। পূর্ণ দৈর্ঘ্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একে একে খুলে ফেলেন সমস্ত পোশাক। মৃত কুকুরের জলে ডোবা শবের মতো সাদা-কালো ছোপ ছোপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে ঘৃণা পেতে ইচ্ছা করেন তিনি। কিন্তু ঘৃণা জাগে না। বরং পরম মায়ার আপন দেহে হাত খেলে যায় নিবিড় স্নেহ সম্পর্কের মতো। তখন, অন্য অন্তরালে, অন্যজনও ধীরে ধীরে চলে গিয়েছিল আয়নার কাছে। একে একে খুলে ফেলতে চেয়েছিল সব— সব— সব পোশাক। শাড়ি খুলে ফেলার পর,

ব্লাউজ খুলে ফেলার পর, নীবিবন্ধে হাত রেখে থমকে গেল সে। মাথা থেকে পেট অবধি নিরাবরণ, ফলসানো বা দক্ষ ও কৃষ্ণিত, দলা পাকানো স্বক দেখল কিছুক্ষণ। চোখ বন্ধ করল। এবং বন্ধ চোখের তলায় নিজেকে কল্পনা করল সে— সুস্থ। সুন্দর। হাত রাখল। নিজের পাল্লে, ঠোঁটে, শুনে ও গলায়। আয়নার আরও কাছাকাছি গিয়ে চোখ খুলল। নিজের দৃষ্টিবিষয়ে চুমু খেল। প্রত্যেকটি পোড়া স্থান গভীর নিরিখ করল হুঁয়ে হুঁয়ে। আর তার প্রত্যেকটি বিভাডন, প্রত্যাখান ও ঘৃণার উপকরণগুলি সম্পর্কে অপার মায়ায় ডুবতে লাগল। একবারও দেখল না ঘোনিদেশ, উরু, অবতল জানুসন্ধি— কারণ সেগুলি সাধারণত তার কোনও মায়া নেই। কারণ সেগুলি অটুট আছে।



মেথেন্য় গোল হয়ে বসেছে ডমরু, বামরু, ছেদি, গোপাল আর সুরেশ। মাঝখানে হরিচরণ। যাচ্ছে। তুলসী খাবার পরিবেশন করছে। আজ মুসুরির ডাল রেখেছে তুলসী। আর সেটি কেমন চমৎকার খেতে হয়েছে। সঙ্গে উচ্ছে বেগুন আলু আর কুমভোর তরকারি। সেটিও কেমন চমৎকার। তুলসী যা রাঁধে তা-ই সুস্বাদু। মেথি ফোঁড়ন দিয়ে, চাক চাক করে কাটা করলা ও রুইমাছের ঝোল তার মতো আর কেউ-ই রাঁধতে পারে না এই মহাশয়। পেরাজ ও সরষেবাটা দিয়ে সাটিমাছের ঝোলেও তুলসীর হাতের অপূর্ব গুণ ঢালা থাকে। আজকের মুসুর ডাল আর তরকারিটিও এই কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়নি। ছেলেরা তার সুস্বাদের ভূঁশিতে মন দিয়ে যাচ্ছে। হরিচরণও বড় আরাম পাচ্ছে খেয়ে। কালু সাহার ওখানে আজ বড় খাটুনি গেছে। দু'গাড়ি সিমেন্ট এসেছিল। সেগুলো খালি করতে হয়েছে। সিমেন্টের বস্তায় মাঝে মাঝে অন্য কীরকম একটি গন্ধ পাচ্ছিল হরিচরণ। যেন-বা সেইসব সিমেন্টের রংও কিছুটা হলদেটে। আর সেই গন্ধে তার নাক জ্বালা করছে। আতিতুল, মোহন আরও যারা বস্তা বইছিল, তাদেরও নাকি অমনই লেগেছে। হরিচরণ ভেবেছে। এ কিছু অন্যরকম সিমেন্ট হবে হয়তো। আরও ভাল, আরও মসৃণ। অনেক বেশি বড়লোকদের বাড়ি হবে তাই দিয়ে। কিন্তু অনেক বস্তা বয়ে তার পিঠে টনটন করছে। সে ভাবছে, তুলসীকে বলবে, পিঠটা যাতে একটু দলাই-মলাই করে দেয়। এ বিষয়ে তুলসী খুবই নিপুণ। ওর বাবা ছিল চমৎকার মালিশওয়ালা। উত্তরপাড়ার ঘাটে গিয়ে বসত আর লোকজনকে মালিশ করে নিয়ে পয়সা পেত। সকালে এই কাজ শেষ হলে সে ছাতু, লেবু, লাংকা আর নুন নিয়ে, পুদিনা পাতা আর ডাকা ডাতি জল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়। তার ঠেলাগাড়িখানি ঠেলে ঠেলে ঘুরত। ছোট তুলসী তার সঙ্গে থাকত। তার পিঠে রক্ষা বিনুনি দুলত। নাকে শিকনি গড়াত। হাতে রঙিন কাচের চুড়ি পরে, বিবর্ণ হলুদ জামা পরে সে বাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত আর লোকদের খেয়ে যাওয়া, ছাতুর লিটি খেয়ে যাওয়া বা শরবৎ, থালা আর গ্লাসগুলি ধুয়ে দিত। তার বাবা তাকে কখনো দিত আমের সময় কচা আম, পেয়ারার সময় পেয়ারা বা জাম। হরিচরণ তাদের অনেকদিন ধরে চেনে। জন্ম থেকেই চেনে। তার বাবাও মিউনিমিপ্যাগিটির সাফাইওয়ালা ছিল এবং একই পাড়ায়, তুলসীর বাবার সঙ্গে বসবাস করত। তুলসী যখন একটু বড় হল, যখন তার নাক দিয়ে শিকনি পড়বার আগেই সে ধুয়ে ফেলল আর তার ফ্রকের তলায় উকি দিল দু'খানি অশুচি দুনিয়া, তখন হরিচরণ অবাক মনে গিরেছিল। তুলসীর গা দিয়ে যেন গর্ভ ঝরে পড়তে শুরু করল তখন। সে যদি খুশি হয়েও ঘাড় ঝকিয়ে তাকাত, মনে হত, রাগ করছে তলায় তলায়। তার বাবা তখন তাকে বেশি করে কাচের চুড়ি

কিনে দিত। আর নানারকম ঝিকমিকি বিনি। সেই সঙ্গে হঠাৎই যেন তুলসীর মালিশদার বাণু কেমন বুড়োটে আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মেয়েকে নিজে বিকিরিত জন্য সেরেলে বেশ ভিড় জমত তার। ব্যবসায়ী হিসেবে এতে তার খুশি হওয়াই উচিত ছিল কিন্তু শিজা হিসেবে তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। পাঞ্জি পাঞ্জি বাড়ি ছোকরাগুলো এরা এক গ্রামের আতশাচ্ছাদিত তিন গ্রাম শরবৎ কিনত আর আড়ে আড়ে তুলসীকে দেখত। হরিচরণ অনেকদিনই নক্ষিমেস্বর-মন্দির গেটের কাছাকাছি এইসব লক্ষ করেছে। সেই সময়গুলো তার মনে হত সারা দুনিয়া ভুড়ে ছায়া নামছে। উদ্দাম রোদ্দরে, লোকে হাঁসফাঁস করতে করতে যখন ছাত্রের শরবৎ বাসে, তখনও খৈনির তামাকপাতা বিক্রি করতে করতে হরিচরণের মনে হত রোদ্দরের মধ্যে একটুকরো ছায়া ঢুকে পড়েছে আর চারপাশ ঝাঁ ঝাঁ করা সত্ত্বও এখনই যেন কুপ-কাতা হওয়া নরমে আসবে। শুধু তুলসী নিজে তখন একটুকরো মেঘ হয়ে থাকত। তার চুলে আর জট পড়ে না তখন। রেশমি চুলে রঙিন ফিতে বাঁধা। একমানে গ্রাস খুয়ে যেত সে। আর মাঝে মাঝে হরিচরণের বস্ত্রায় বসে পা ছড়িয়ে দিত। একদিন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরাল তুলসী। হরিচরণের মনে গাছে, শাড়িটোয় অজস্র আশ্চর্য ফুল ফুটেছিল। আর ফুল জড়িয়ে জড়িয়ে তুলসীও যেন এক অসামান্য ফুল। সে-দিন হরিচরণ অনেকবার খন্দেরের কাছে পয়সা নিতে ভুলে যাচ্ছিল। আর তুলসী যখন ওর বস্ত্রায় ধারে পা মেলে বসল তখন, ওই প্রথম হরিচরণ দেখতে পেল তুলসীর পায়ে মন্দিরের দেবীর পায়ের মতো জড়িয়ে আছে রূপোর মল। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল তার মূলোমাথা পা। তুলসীর বাবা তুলসীকে রূপোর নখ গড়িয়ে দিয়েছে। কানের দুল হার চুড়ি কিছুই বান রাখেনি। সে-সব প্রতিদিন তুলসীর অঙ্গে থাকে। কিন্তু তার যে একজোড়া মলও আছে তা হরিচরণ জানতই না।

এখন, ছেলেপুলের জন্ম দিয়ে তুলসী আর আগের সেই কাঁচা তুলসী নেই। মোটাসোটা গিমিবাগ্নি হয়েছে। হরিচরণও তুলসীকে আরও মোটা মোটা দু'খানা মল গড়িয়ে দিয়েছে যাকে মল না বলে বাঁড়ু বলা যায়। আগে ওর কোমল পায়ে ওই হালকা মল যেমন মানাত, এখন ওই পুরুট্টা পায়ের গোছে খাবু দেখলেও হরিচরণের মন ভাল হয়ে যায়। পাঁচ ছেলেকে স্ত্রী দান করে, এবং হরিচরণকেও নিশ্চয়ই, তুলসী এখন গুরুস্তনী হয়েছে। তার ভারী কোমরে হলুদের ওপর লাল গোল গোল ছাপা শাড়ি বা হাত ধরাধরি করে নাচতে থাকা মেয়েদের ছবিওঘালা পাড় হরিচরণকে এখন আশ্চর্য শান্তি, সন্ধান ও নির্ভরতা দেয়। সে যখন ভোরবেলা ময়লা পরিষ্কার করে তখন ঘেন-বা এর মধ্যে কোমল আলিনা নেই, দুর্গন্ধ নেই, গমমই সে ভালতে চায়। তরকারির পচনশীল খোসা, মাছের আঁশ, মেয়েদের উজ্জ্বল মাসিকের কাপড়ের মধ্যেও সে গাছ থেকে করে পড়া শুকনো ফুলেরই মতো বৈভব সন্ধান করে। এ সবার কোনওটাই সম্ভব হত না যদি তুলসী না থাকত। তুলসী ও পাঁচ ছেলে সমেত বরাহনগর মিউনিসিপ্যাল ভবনের কাছাকাছি হরিচরণ খুবই শান্তিতে জীবনযাপন করে যার গৃহস্থালিতে পরিশ্রম আছে কিন্তু অসন্তোষ নেই, মিথ্যাচার নেই, অভাববোধ নেই। তুলসী খুবই গুছিয়ে ধর্মকর্ম সমেত সংসার করতে সমর্থ। আর হরিচরণ তার প্রতিবিন্দু শ্রম সংসারের কল্যাণে নিয়ে তৃপ্ত থাকে। তাদের মধ্যে একটিমাত্র চাগুয়া মাঝে মাঝে বলসে ওঠে। সেও খুব অভিযোগক্রিষ্ট বা দুঃখজড়িত নয়।

তুলসী বলে—ইস্, একটা যদি মেয়ে হত।

হরিচরণ এ বিষয়ে তার নিজের প্রত্যাশাকে অলাদা করে নেড়েচেড়ে দেখেনি। তুলসীর ইচ্ছেকেই নিজের ইচ্ছে ভেবে প্রত্যেকবার তুলসীর কথায় সাহা দিয়েছে—হ্যাঁ। রামজি তোমার আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন।

তুলসী মুখ লাল করে, চোখে লজ্জাকর উদ্দাননা একে হরিচরণকে ঠেলে দিয়ে বলেছে—  
যাও!

এরকম অবস্থায় প্রতিবারই হরিচরণ উত্তর হয় এবং তুলসীর নরম পেটে মুখ ডুবিয়ে দেয়।



কখনও তার বিশাল শুনে চওড়া গোর্ফ ঘষে দিতে থাকে। সেওয়ালে তখন খুশি পরিভ্রমের সঙ্গে গৃহস্থ টিকটিকি সাজা দেয়।

হরিচরণের মন সাদা। কোনও কিছু সম্পর্কেই তার কোনও পাণ্যবোধ নেই। পরিশ্রম, উপার্জন, দাম্পত্য ও সন্তান পালনের যে সরল গাইছ সে যাপন করে তার মতো পাপের অবকাশও নেই। হরিচরণ যদি অবহিত হত যে পাপবিহীন কোনও ব্যক্তির জন্য অস্বস্তি, তা হলে হয়তো সে পাপ সন্ধান করত। পাপের প্রয়োজনা খুঁজত। সে খোঁজেনা। কারণ তার লোভ নেই। লোভ নেই তার কারণ সে নিজস্ব বাঁচবার পদ্ধতি ও দর্শন থেকে জানে সে নিজে ভাল আছে। তার পরিবার ভাল আছে। এটুকুই তার সুন্দর পবিত্র আত্মকেন্দ্রিকতা। শুধু মাঝেমাঝে সে খুব স্বার্থপরতার সঙ্গে তুলসী সম্পর্কে দু'একটি কথা না ভেবে শাঝে না। তুলসীকে যখন রূপোর ফুল চকচক করে আর পায়ের গোছে মেজা বাড়ু আলো ছিটকোয়, তখন তার মনে হয়, ওই ঘটনাটা যদি না হত, যদি তুলসীর বাবা ট্রাকের ধাক্কা হঠাৎ এই দুনিয়া ছেড়ে চলে না যেত তা হলে হরিচরণ কখনওই তুলসীকে লাভ করত না। তুলসীর বাবা বেঁচে থাকলে তুলসীকে নিশ্চয়ই কোনও পাম্পম্যান বা মিলের কর্মচারীর সঙ্গে বিয়ে দিত। খৈনির তামাক পাতা কেচেনেওয়াল, ভাডুদারের পো ভাডুদারের সঙ্গে কখনওই তুলসীর বিয়ে হত না। এ বিয়ে যে তা হলে তুলসীর পক্ষে কোনও দুর্ভাগ্যই তা হরিচরণের মাথায় আসেনি। কিন্তু সে যে পরম সৌভাগ্যবান এ নিয়ে তার কোনও সংশয় নেই।

কিন্তু তাদের জীবনে সেদিনের সে দুর্ঘটনা করুণভাবে মুদ্রিত আছে। কেমনভাবে হয়েছিল সে-দুর্ঘটনা, পরে কৈদে কৈদে শুনিয়েছিল তুলসী হরিচরণকে। বেলার দিকে মন্দিরের সামনে থেকে বেরিয়ে জুটমিলের দিকে যাচ্ছিল তারা। গোজকার মতোই। বালি ব্রিজে ওঠার মুখে ভ্যানের একটা চাকা হঠাৎ খুলে যায়। তুলসীর বাবা মহাভারতের কর্ণের মতোই, পথের ধার ঘেঁষে জিনিসপত্র সমেত ভ্যানটাকে আগলে চাকা সারাবার চেষ্টা করছিল। তুলসী বড় এককণ্ঠ পাথর বা ইটের সন্ধানে, যেমন বিপদগ্রস্তরা খুঁজে ফেরে কোনও গুম্বা বা অবলম্বন, তেমনি খুঁজে ফিরছিল। তখনই দু'টি ব্যস্ত ট্রাক দু'দিক থেকে এসে পড়ে এবং পরস্পরকে জায়গা দিতে বুঝি-বা অনেকটাই ধর ঘেঁষে চাকা চালিয়ে দেয় এবং তুলসীর বাবা সেই ধাক্কা ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত ও প্রাণহীন অবস্থায়। বালি ব্রিজের ওইখানটার দু'পাশে খাড়া ঢাল আর মনুবা বিরলতা। শুধু তুলসী তাঁক চিংকার করছিল তখন—বাপুরে—এ—এ, ও বাপু—উ—উ—আর সেই দেহ ঘিরে অবাক হয়ে দেখেছিল, মৃত ও চূর্ণ শরীর থেকে কীরকম দ্রুত বেগে রক্ত প্রবাহিত হয় আর সেই রক্তে কীরকম শরীর ওগলানো গন্ধ। সে জানত মানুষ মরে গেলে তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায় সমস্ত রক্তপাত। যাকতীয় তরল ও উষ্ণ রক্ত ডোলা পাকিয়ে যায়। সেই মুহূর্তে একই গোত্রের দু'টি সত্য উপলব্ধি করেছিল তুলসী আর বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। রক্তপাত সংক্রান্ত সত্য ছাড়া অন্যটি হল, এই দুনিয়ায় সে একা ও অরক্ষিত। সেইদিন তাকে আর তার বাপুকে ঘিরে যে জটলা হয়েছিল তার মধ্যে থেকে কয়েকজন তুলসীকে বাছ ধরে তুলতে চেয়েছিল বা তার পিঠে হাত রেখে নির্ভরতা দেবার চেষ্টা করেছিল। তুলসী তার নারীসুলভ কোনও অনুভবে সেইসব প্রতিহত করেছিল বটে কিন্তু পরে সে হরিচরণকে বলে যে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে যে অত দ্রুত শব্দ নেমে আসতে পারে, বা জঙ্গলে ঘাপটি মেরে থাকা শেয়াল নির্গত হয় তা তার ধারণায় ছিল না। তার এত ভয় করেছিল যে শেষ পর্যন্ত বরষা শুনে হরিচরণ যদি ওখানে না পৌঁছত তবে সেও শেয়াল শব্বনের হাতে বাপুকে ছেড়ে পালিয়ে আসত। কারণ একটা জায়গায় সে নিশ্চিত ছিল, এরা তার বাবার মাংস খেতে আসেনি। বস্তুর, বাপুর ওই করুণ মৃত্যুর শোক থেকে ঋতিহীন বেরিয়ে আসতে হয়েছিল তুলসীকে সুরক্ষার কারণেই। দুখে নিঃশব্দে কান্নার অবকাশও তাকে দেয়নি হাত হারামজাদারা।

এখন ভাবলে হরিচরণ তাকজব বনে যায়। ওইটুকু বয়সেই তুলসী কত বুঝদার হয়ে



উঠেছিল। হয়তো বাপের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে লোকচরিত্র সম্পর্কে কোনও গভীর জ্ঞান তার জন্মেছে। সেই সময় সে থেকে থেকে বাপুউ-উ-উ বলে কেঁদেছে আর হরিচরণের বাপ বলেছে, হরির মা, যাও মেয়েটাকে শাস্ত করো। হায় রাম, ওর বাপুর সঙ্গে কালকে রাত্রো তাস খেলতে খেলতে কত গল্প করেছে। মেয়ের বিয়ে নিয়ে কত স্বপ্ন ছিল মানুষটার। বলত—পারমিষ্ট চাকরি করা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। আমার মতো এমন ঘুরে বেড়ানো লোকের সঙ্গে নয়।

হরিচরণের মা-ই আগলে রেখেছিল তুলসীকে। তুলসীর নিজের মায়েরই মতো, কারণ তারাও, পাশাপাশি বসবাসের কারণে, খুবই সখ্য বোধ করত পরস্পরের প্রতি এবং একে অন্যের ছেলেমেয়েকে আপনার করে ভাবত। তুলসীর মা শেষ অবধি সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে বহু রক্তপাতে মারা যায়। আর তুলসী তার বাপের খালি বুক ভরতে ভরতে, অন্ধকার মন আলো করতে করতে বড় হয়ে উঠল। সেই সময় হরিচরণকে কেউ বলে দেয়নি কিন্তু সে আপনা-আপনি কেমন করে বুঝে গিয়েছিল তুলসীর কাছাকাছি তার বেশি যাওয়াটা ঠিক হবে না। তুলসী তার মায়ের জিন্মায় আছে এই এক নিশ্চিত বোধে সে নিজের কাজ করতে বেরুত। পরে তুলসী তাকে বলেছিল, সেই সময় সে নাকি সারাদিন প্রতীক্ষা করত হরিচরণ কখন ফিরবে আর তার ইচ্ছে করত হরিচরণের তামাকপাতায় লাল হয়ে যাওয়া আঙুলগুলি ধুয়ে মুছে দেয়।

এখনও তুলসী তাকে সমান যত্নই করে বটে। পাখা দিয়ে ব্যতাস করে দেয়। গরমে কাজ থেকে তেতে-পুড়ে ফিরলে ঠাণ্ডা শরবৎ দেয়। এখন তো হরিচরণেরও বাপু নেই, মা নেই। জগতের ধর্মে সব স্বর্গে চলে গেছে। তাদের সমস্ত স্নেহ মমতা যেন একাই টেনে নিয়েছে তুলসী। এই স্নেহ সে হরিচরণে বিলোয়, সন্তানে বিলোয়, এবং আরও বিলোবার জন্য আরও একটি সন্তানের প্রতীক্ষা করে। বস্তুত, হরিচরণের ক্ষেত্রে তুলসী পত্নী বটে আবার মাতাও। তুলসী এক বিস্ময় বটে, আবার স্নিগ্ধ আশ্রয়। যার তরে হরিচরণ এই নটের ভবে জন্ম জন্ম ধরে ফিরে আসতে পারে।

এখন তারা সকলে মিলে একটি পারিবারিক আহার পর্ব সমাপন করছে। ঝমরু থালা চাটছে। হাতের চেটোয় থালা থেকে তুলে নিচ্ছে থালায় লেগে থাকা সুস্বাদু ডাল আর তরকারির রেশ। ছেদীর পাতে ভাতের চেয়ে ডালই বেশি। সে দু'হাতে থালা ধরে সুরুৎ সুরুৎ টানছে। তার নাকে এক ফোঁটা ডাল লেগে গেল। ডমরু, ঝমরু, সুরেশ আর গোপাল তাই দেখে হাসছে। এ ওর গায়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। হরিচরণ আর তুলসীও হাসছে কিন্তু তারা পরস্পরের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে না। তারা হাসছে। স্নিগ্ধ স্নেহচর্চিত হাসি। গোপালের পিড়ির তলায় হঠাৎ একটা আরশোলা চলে এল। পিড়ির নীচেকার অন্ধকারে গা ঢেকে শুধু শুঁড়দু'টি বার করে পরিস্থিতি বুঝে নিচ্ছে সেটি। গোপাল দেখেছে আরশোলা তার পিড়ির তলায় ঢুকল। তার খাওয়া থেমে আছে। সে হাত নামাতে পারছে না। তার ভয় করছে। বুঝি-বা আরশোলাটি হাত কামড়ে দেবে। তার ঘেন্নাও করছে, যদি উঠে আসে থালায়, যদি তার প্রিয় অগ্নে জিভ দেয়। সে অসহায় কেঁদে উঠছে, মাদ্রি, মাদ্রি। পৃথিবীর সমস্ত ভীত ও শঙ্কিত মানুষের স্বর তার কণ্ঠে। ঠোঁটে অসহায় আর্তি। মাদ্রি, মাদ্রি। তুলসী তখন দেবী ভগবতী হয়ে গেল। পরিত্রাতা হয়ে গেল। স্বয়ং মা বিপত্তারিণী। পিড়ি খাবড়াচ্ছে যাঃ। যাঃ। আরশোলা পিড়ির কম্পনে অস্থির। বেরিয়ে আসছে তলা থেকে। দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছে। ডমরু, ঝমরু, ছেদী আর সুরেশ প্রত্যেকেই নিজের নিজের পিড়ি খাবড়াচ্ছে এখন, যেমন হয়, যেমন অন্যের বিপদ দেখলে যে-যার বাস সামলায়, মুখ দিয়ে হুসহাস শব্দ করছে। আরশোলাটি কোথায় পালিয়ে গেল, কোথায় সঁধিয়ে গেল। না, আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। সে বুঝি গিয়ে খবর দিয়ে দিয়েছে তার মহান্নায়। অন্য কোনও আরশোলাকে আর দেখা যাচ্ছে না। গোপালের জলভরা চোখ, তবু খুশি ও স্বস্তির হাসি ঠোঁটে। সে ফের খাবারে মনোযোগী হল এখন। এবার তুলসী চাপাটি বিতরণ

করছে। ভাত আর চাপাটি মিশিয়ে খাওয়া, তাতে চাল সাশ্রয় হয়। এ বার খোজল থেকে আচার বার করা হল। হরিচরণ, ডমরু, ঝমরু দু'টি করে আমের টুকরো পাচ্ছে। সুদেশ, ছেলি আর গোপাল একটি করে পেল। তাই নিয়ে কেউ খেদ করছে না। অভিজ্যোপ করছে না। বড়বা জানে তারা বড় বলে, আর একটু বেশি খাবে বলে বেশ পেল। ছেলিয়া কম খাবে, তাই কম পাওয়া। ওরা বড় হবে যখন, আর কয়েক বছর গেলেই, আর একটু বেশি খেতে শিখবে, তখন তুলসী ওদেরও দু'টি করে আমের টুকরো দেবে। সেটুকু বৈষ্য ওরা হরতে জানে। যখন ডমরু ঝমরু ছোট ছিল, তখন দু' টুকরো আম হরিচরণই পেত একমাত্র, ওরা ভাত জন্য। কখনও জোড়ী হয়নি। ওরা জেনেছে, বুকে গেছে, বড়টুকু ওদের কাছে আসে, বড়টুকু ওরা পায় তার মধ্যেই ওদের প্রাণ্য ফুরোয়। সেটুকুতেই ওরা তুষ্ট থাকে। ওদের উদ্দেশ্যে এই প্রাণ্যে চমৎকার শান্তিময় ছায়া পড়ে। সেখানে পাটি বিছিয়ে তুলসী কাণড়চোপড় আলদা দিয়ে ছেলেদের নিয়ে বসে আর ঈশ্বরের পাঠানো কৃপণ বাতাসে হাতপাখার আন্দোলন তুলতে তুলতে একটি ছোট মেয়ের জন্য কাতর হয়। যে থাকলে গোলাপি রঙের ফিতে দিয়ে দু'টি বিনুদী বেঁধে দিতে সে। মেটা করে কাজল পরিয়ে দিত, ফাঁকে ফাঁকে মেয়ের বিয়ের জন্য গমনা গড়াত। মেয়ের ভিক্ষায় কি না কে জানে, হতে পারে সারা সংসারেরই মঙ্গল। কামনায় কাল থেকে তুলসী খ্রীষ্টসন্তোষীমাতার পূজা শুরু করেছে। খোলোটি শুক্রবার এই পূজা তাকে করতে হবে। একটানা প্রতি শুক্রবার করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। এর মধ্যে কোনও শুক্রবার তার মাসিক হয়ে যেতে পারে। মাসিক অবস্থায় দেবতার পূজা নেন না। দেবতার নেন না সে এক রকম। দেবীরাও যে কেন নেন না, সে এক বিষয়। তুলসী এ সব ভেবে দেখেছে। গণেশকন্যা সন্তোষী অতি সরলমতী দেবী। আছে তুট আবার আছে রেপে আগুন। তার মধ্যে কেন কে জানে টুকরাদের সঙ্গে তাঁর ভয়ানক বিবাদ। টক সংক্রান্ত নানা বিধিনিষেধ তুলসী পই পই করে ছেলেদের বুঝিয়ে রেখেছে। আজ সকলকে আচার দেওয়া হলে আর নিজেরও নেওয়া হলে আচারের বরাদ্দ তুলসী পাকঘরের কুলসিতে তুলে রাখবে। কাল এ বয়সে নামবে না। তুলসী যখন ছেলেদের নিয়ম কানুন বুঝিয়েছে তখন ছেলেরা চমৎকার বুঝদার সন্তানের মতোই মাথা নেড়েছে। পরে নিজেরদের মধ্যে এ বিষয়ে তারা আলোচনাও করেছে। মাত্র তে একটি দিন। একদিনের জন্য টকের লোভ ত্যাগ করা আর এমন কী। পরিবর্তে বাড়িতে পূজো হলে সারাদিন কেমন আনন্দের গন্ধ! তাই, হরিচরণের শান্ত পরিবারের সকলেই আজ সন্তোষে আছে। কাল সন্তোষী মার পূজা।

সকলকে সব দিয়ে নিজে খেতে বসল তুলসী। ছেলেদের খাওয়া হয়ে গেলে ডমরু, ঝমরু আর ভাইদের খালা নিয়ে উঠে পড়ল। উঠানের একধারে টিনের পাত্রে জল রাখা। জলপাত্রের কাছে ইট বাড়িয়ে বাসন ধোয়ার জায়গা করেছে হরিচরণ। এখানে ঘরে ঘরে কল নেই। কিছু দূর দূর মিউনিসিপ্যালিটির জলের পাইপ আছে। কল লাগালে কে যেন খুশে নিয়ে যায়। জলের সময় এলে ওই পাইপ থেকে এক ধারায় জল পড়তে থাকে আর আশেপাশের মানুষ নিজের প্রয়োজন মতো জল তুলে নেয়। কুলিয়ে যায় সবাইই। তবে জল টানা আর ধরে রাখা এক কষ্ট। কে আগে জল নেবে তাই নিয়ে মহল্লায় মারামারি, ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে।

ডমরু, ঝমরু তাদের আর ভাইদের বাসন ধুতে থাকল। হরিচরণ আর তুলসী সংসারের টুকটাকি কথা সেরে নিল। সকালে হরিচরণ কাজে বেরিয়ে যাবে। তুলসীর ইচ্ছা পূজার সময়, ব্রতকথার সময় হরিচরণ থাকুক। হরিচরণেরও এমনই ইচ্ছা। কিন্তু কাজ সেরে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে আসতে বেলা দেড়টা-দুটো বাজে। অতক্ষণ পূজার দেরি হলে তুলসীকে না খেতে থাকতে হবে। হরিচরণ তার জন্য দুঃখ বোধ করছে। যেন তুলসী, ওইটুকু উপোস দিলে, ফয়ে যেতে পারে, দুর্বল হতে পারে। হরিচরণ, যাই খাওয়াতে সমর্থ থাকুক, বাবার সে ভরপেট পরিমাণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ঈশ্বরের কাছে তার প্রার্থনা, যেন শেট ভরে খেতে দিতে পারে সন্তানদের এবং স্ত্রীকে। হরিচরণ কষ্ট পাবার কথা তুলসীর কাছে প্রকাশ করেছে এখন।

তুলসী হাসছে। বোঝাচ্ছে হরিচরণকে— এমনি এমনি না খেয়ে থাকলে কষ্ট হবে। পূজার উপোস করলে কষ্ট নেই। তুমি ভেবে না।

তখন মুচকি হেসে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে হৃদি আর গর্ভেই ভাসাটাস করা বাতির জিহ্ন ভোরের জন্য প্রার্থনা করছে। চার পুত্র পাশে। শুধু গোপাল তুলসীর গোড়ের কাছে বৈয়িছে আছে। তাকে বাঁচিয়ে তুলসীর গায়ে একটি পা তুলে দিয়েছে হরিচরণ। তুলসী আঁচল সরিয়ে দিয়েছে। নিভৃত থেকে উঠে আসা গন্ধ নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়ছে তমক, বামক, ছেদি, সুব্রহ্মণ আর গোপাল। ঘুমিয়ে পড়ছে হরিচরণ। আর তুলসী, সকলকে ঘুম দিতে দিতে নিজেও ঘুমিয়ে পড়ল কখন। জানতেও পারল না। তাদের অজান্তসারে ঘুমের দেবতা এসে মিলিত হলেন রাত্রির সঙ্গে। তাঁর কোমর জড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন। ঘুম দেবার শক্তি অমোঘ। কিন্তু তা কি রাত্রির চেয়ে বেশি? সে-কথা কেউ জানে না। কোনও দিন কেউ তা হোল করতেও পারবে না। প্রমাণ করতেও না। যখন পরস্পর পরস্পরে সম্পৃক্ত গাথা, যখন একে আন্যের জন্য স্বতন্ত্রার সঙ্গে কামনা করে এবং মিলিত হলে পারস্পরিক ফলাফল এমন মিশে যায় যে ঘুম ও রাত্রির নিজস্ব অঙ্গকার নিরবচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন ঘুম নিজের সত্তা নিয়ে, রাত্রি নিজের অবস্থান নিয়ে আর সতর্ক নন। তাঁদের আশ্চর্য মিলনে, যা মহামিলনও বলা যায়, অসামান্য শক্তি পুঞ্জীভূত হয়। পুরুষের জল চাঁদ ও নক্ষত্রসমেত আকাশকে নিজের বুক টেনে নেয়। নদীর সঙ্গে পাথরের ঘষা লেগে যায় নেয় মসৃণতা। সমস্ত পশু-পাখি নিজের নিজের ধর্ম পালন করে। মাটির তলায় অঙ্কুরোদ্গমের প্রস্তুতি হতে থাকে। মানুষেরা তখন ন্যায়-অন্যায়-নিরপেক্ষ, হিংসা-দ্বেষ্ট ব্যতিরেকী; কোথাও কোনও হীনবৃত্তি নেই। এমনই চলতে চলতে রাস্তার ধারে আলো জ্বলে উঠল আর শুরু হল চৌর্যবৃত্তি। যদিও এমনই কথিত আছে যে ঘনায়মান অঁধারই চৌর্য প্ররোচিত করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার চৌর্যবৃত্তিকে কখনও সহায়তা করেনি। বরং তাদের সহায়তা করেছে নিজাভিত্ত রাত্রি এবং তা আলোকোচ্ছল হলেও। যে-কোনও সার্বিক বৃত্তির জন্য আলোর প্রয়োজন এই বোধ হল যখন তখন জেগে উঠল অনুসরণ। পাহারাদারেরা তা শুরু করল। চৌর্য নিবৃত্ত করার জন্য ধাবমান থাকতে থাকতে তারা বিম্বৃত হয়ে গেল ধাবনের প্রকৃত ধর্মকে। অস্ত্র শাণিয়ে তারা ছুটে গেল তাদের দিকেও যারা রাত্রি জেগে ভোরবেলার জন্য কোনও কল্যাণী নিমাণ শেষ করতে চায়। এবং আলোই পাহারাদারের পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে। এই মহাবিশ্বে তবু শান্তি আছে কোথাও। তা বজায় রাখা নিশ্চয়ই সম্ভব হয়েছে। আলো ও অন্ধকার, ঘুম ও রাত্রি সম্পর্কে ভাবিত হয় না এমন সব প্রাণীদের মধ্যে থেকে মহাবিশ্বের অংশ হয়ে জেগে উঠছে হরিচরণ। তখন ঘুমদেবতা জড়িয়ে আছেন রাত্রিদেবীকে। তখনও আকাশ শুধু অসামান্য নীল হয়েছে মাত্র আর তারই মধ্যে তারা জ্বলছে। পৃথিবীর সমস্ত মোহণ যোগী হয়ে যোগিয়া ধরল বৃষ্টি। হরিচরণ ঘুমন্ত স্ত্রী-পুত্রকে রেখে, দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আবার আঁন্ধে নিল শব্দ না হয় এমন সন্তর্পণে। নরম উঠোনের প্রান্তে প্রাকৃতিক নিঃসরণ ঘটাল। ধূয়ে নিল মুখ চোখ আলিসা। এ বার সে বেরিয়ে আসছে। হাতে ঠেলাছে জঞ্জাল বান। হাঁটছে। আজ পূজা। আজ অন্ধকার থাকতেই সে বেরিয়েছে। তাড়াহাড়ি ঘিরে আসতে হবে। তার কাজ তো কম নয়। দায়িত্ব কম নয়। গোটা মাথুরের গড় তাকে পরিষ্কার রাখতে হয়। সমস্ত সমুদ্র বসবাসকে সে পরিচ্ছন্ন রাখে। ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় তাকে এই মহান কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। সে তার ধর্ম বিম্বৃত হতে পারে না। যানের চাকা ঠেলে ঠেলে পায়ে পায়ে এগোয়।

রাস্তা পায়োপায় করতে করতে ভেবে নিচ্ছে সে এখন। মাথুরের গড়ে ঢোকান বেশ কয়েকটি পলিমুখ। আজ সে সাতকন্যা দিয়ে চুকবে। সাতকন্যা। অতুত নাম বাড়িটার। মাথুরের গড়ে সাতকন্যাই সবচেয়ে নতুন বাড়ি। নতুন হলেও তা প্রায় তিন বছর হল। ওখানে আগে জমি ফাঁকা ছিল। ওই মানুষটি, খাঁর ওই সাতকন্যা বাড়ি, একদিন তা কিনে নিলেন এবং মাটিতে ভিত করে, শূন্য আঁকড়ে তৈরি করলেন একটি চমৎকার তেতলা বাড়ি। হরিচরণ গুণে দেখেছে, বাড়িটা,

ম্যাজিকের মতো তৃতীয় মাসে দিবা খাড়া হয়ে গেল। আর চতুর্থ মাসে রাত্রে আসবাবে সেজে বলমলে হয়ে গেল। বাড়ির মালিক স্ত্রী ও সাতকন্যাকে নিয়ে গৃহবিশেষ করলেন। বাড়ির নামও দিয়ে দিলেন, সাতকন্যা। তাঁদের ঘরে পা সেবার সময়ও হরিচরণ ছিল। রাজাই পরিচালক করছিল সে। বুঝি-বা, তাঁরা আসবেন, এই প্রচার হয়ে গাভগায়, আলোকেই খোঁজাখোঁজ করছিল। হরিচরণও একটু কৌতুহলে, একটু ইচ্ছায় দেরি করে সাফাই চালিয়ে যাচ্ছিল। যদি তাঁদের দেখা মেলে। যদি জানা যায় তাঁরা কোথায় ছিলেন এককাল। এক জীবনযাত্রা ছেড়ে আর এক জীবনযাত্রায় কেনই-বা তাঁরা এসেন। যেমন গাছের শেকড় চাড়িয়ে যায়, হরিচরণের মনে হয়, মানুষেরও এক জায়গায় থাকতে থাকতে ওইরকম শেকড় টুকে যায়। সেখানকার মাটি, জল, হাওয়া, আকাশ ও বৃষ্টির সঙ্গে। আশেপাশের লোকের সঙ্গে। সকলে থেকে সন্নি-পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত তখন চেনা ও মায়াময় লাগে। জানা হয়ে যায়, ওই, বজ্রলাল চানার খাকা নিয়ে বেরুল। এখন নবীন চাচা সাজিতে ঠাকুর বসিয়ে লোকানে লোকানে মন্ত্র পড়তে যাবে। দুর্গা চাচি এখনি রামার আয়োজন করবে। তার সুখানু রামার ফোড়নের গন্ধ সারা বস্তিকে মাতিয়ে তুলবে। মোতিনানির ঘরের পাশে যে-কাকগুলো ঘোরে, যে-শালিকগুলো হীরাভাবির ভাতের হাড়ি ঠুকরে দেয়, যে-চড়াই আর পায়রাগুলো গৃহস্থ মানুষের মতোই কিচিরমিচির বকম বকম করে— মানুষের শেকড় সেইখানেও চারিয়ে যায় আর অত অত সম্ভ্রান্তনাময় মুহূর্ত জড়িয়ে গিয়ে এক মহাকাণ্ড বাঁধিয়ে বসে। অতসব জড়িয়ে, কেটে, উপড়ে নতুন জায়গায় বসবাস— তা কি চাট্টিখানি কথা? হরিচরণ যখন দক্ষিণেশ্বরের বস্তি ছেড়ে এই মিউনিসিপ্যালিটির পাশে চলে এল তখন ওইসব শেকড় ছেঁড়ার কষ্ট সে টের পেয়েছে। আর এটাও সে মনে মনে স্বীকার না করে পারে না যে এখানে এসে ততখানি শেকড় চারিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তুলসী আর ছেলেপুলে নিয়ে এক ঠাসবুনেট গভীরচারী বৃক্ষ তৈরি আছে বটে কিন্তু তা নেহাৎ পারিবারিক। ওই ঘরের বাইরে কোনও মোরগের ডাক, কোনও পালন করা শুয়োরের পদচারণের হিসেব হরিচরণের জানা নেই। সে বোধে, তার নিজস্ব বৃক্ষটি শেকড়-বাকড় সমেত উপড়ে প্রয়োজনমতো আবার অন্য জায়গায় বসতি করে যদি তবে আর কোনও কষ্টই হবে না যেমন দক্ষিণেশ্বর থেকে আসতে তার হয়েছিল। এখনও চোখ বন্ধ করলে তার মনে হয়, ওইখানে, ওই বস্তিতে এক হরিচরণ, তুলসী আর তাদের বাপু-মা জীবনযাপন করছে। যে-জীবন সে চিনত ওখানে তা একেবারে পরিপূর্ণভাবে অক্ষত রেখেছে নিজেকে। ওইখানে, হরিচরণের ওই জীবনযাত্রাকে কেউই আর সরাতে পারবে না কক্ষনো। সে দু'বার গৌফ মুচড়ায়। আকাশ লাল হয়ে আসছে। একটু পরেই গরমের ছাঁট লাগবে। ভোরের আলোর সাতকন্যার হলুদ হলুদ রঙ জেগে উঠছে। হরিচরণ দেখেছে, এ বাড়ির সামনে কখনও মল্লা জমে থাকে না। আবর্জনা থাকে না। বাড়ির বাদিক ঘেঁষে একটি লতানে বেগফুলের গাছ। এই এলাকায় এমন গাছ আর একটিও দেখেনি হরিচরণ। সারা ব্রীজে থোকা থোকা সাদা ফুল ফোটে গাছটার আর গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। এই গাছের নীচে প্যাকেট প্যাকেট করে সব আবর্জনা রেখে দেন এ বাড়ির মা। সেই প্রথম আসার পর একদিন ভেঙে বলে দিয়েছিলেন হরিচরণকে। এরকম থাকবে। এরকমভাবে রেখে দেব। নিয়ে নিয়ো। হরিচরণ দেখেছিল তাঁকে। কী সুন্দর। দেবীপ্রতিমার মতো মুখ। আর তাঁর মেয়েরাও কী সুন্দর। বড়টাকে ভবহ হেমামলিনীর মতো লাগে। মেজটা যেন তনুজা। এ বাড়িতে আসার পরই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সেজটার সাজপোজ অনেকটা রীণা রায়ের মতো। ওই রকমই উচু গাল। চোখে কাজল। সুন্দর। কিন্তু হরিচরণের ভাল লাগে না। কেন, সে নিজেও জানে না। ওরা মেয়ে। সম্পূর্ণ মেয়ে। কিন্তু যেন মেয়ে নয়। ও বাড়ির বড় মেয়ে মেজ মেয়ের সঙ্গে বাকিদের মিল নেই। বাকিরা টাইট প্যান্ট পরে। ছোট ছোট শাট পরে। একেবারে ছেলের মতো ইঁটাচলা। কিন্তু ঠোট রাঙায়। কাজলও পরে চোখে। যদি অন্য পথ দিয়ে এ পাড়ায় চোকে হরিচরণ তবে এ পথে বেরোয়। তখন, ওইসব মেয়েরা নানা জায়গায় যেতে থাকে। তাদের

শরীরে সূর্যের আলো ঠিকরোয়। সমস্ত পৃথিবীকে তুচ্ছ করে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যায় তারা। হরিচরণ তখনই তাদের দেখে নেয়। দেখে নেয় আশেপাশের সব বয়সের সব পুরুষ। এখানে এরকম পোশাক এই সাতকন্য়ার মেয়েরা ছাড়া আর কোথাও পাবে না। জাদুঘর দেখতে দেখতে পানওয়ালা পান বানানো ধামিয়ে দেয়। হালবাহী ট্রাকগুলো গতি ধামিয়ে কাপতে কাপতে পেরিয়ে যায় তাদের। সমস্ত বুকে একবার নড়েচড়ে বসে। আর হরিচরণের মন খারাপ হয়ে যায়। কেন যে হয় সে তা বুঝতেও পারে না। ওই মন খারাপ দিয়েই সে তেলে নিয়ে যায় ভ্যানটিকে। অনেকক্ষণ।

আজও বেলফুলগাছের তলায় আবর্জনার প্যাকেট রাখা আছে। হরিচরণ নিজের ভ্যানে তুলে নিল প্যাকেটটা। তার প্রথম আবর্জনা সংগ্রহ। একটা বানি বেলফুল বসে পুরল জ্বর গায়ে। যেন তলা থেকে আবর্জনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটুখানি অসীর্বাদ ফেলে নিল গাছ। হরিচরণ ওপরে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্য ধমকে গেল সে। বেঁধে দেওয়া নড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে যেখানে শেষ হয়েছে বেলফুলের ঝাড়, সেইখানে, ছাদের অলসেয় হাত রেখে, আর সেই হাতে মুখ রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সাতকন্য়ার সেজ মেয়ে। সেজ মেয়েই তো। হরিচরণ চাইর করল। মেয়েটি তাকে নজর করছে না। মুখ নামিয়ে নিল সে। ভান ঠেলে এসোতে থাকল। এখন আর পথ বা পথের আবর্জনা তার চোখে পড়ছে না। তার বুক জুড়ে দুঃখ উঠে আসছে। চোখের সামনে সেজ মেয়ের মুখ ছাড়া অন্য কিছু নেই। হরিচরণ বুঝতে পারছে না, কী ছিল মেয়েটির মুখে, যা তাকে এমনই দুঃখজর্জর করে ফেলেছে। তাকে যেমন কাজলে, যেমন রঙে, যেমন বেপরোয়া ভঙ্গিতে দেখতে সে অভ্যস্ত তার কিছুই এই ভোরবেলায় নেই। যেন-বা তার দিদিদের মতোই হয়ে উঠেছে সে কিংবা তার চেয়েও বেশি কিছু। যেন আকাশের কাছে নিবিড় করে প্রার্থনা করছে। হঠাৎই তার সমস্ত বেপরোয়া ডাব মিলিয়ে গিয়ে সে হয়ে উঠেছে করুণ ও ক্রিষ্ট। এ কি তাকে মানায়? হয় তো মানায়। আবার মানায়ও না। এই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা, কীরকম দুঃখী করে দেয় সমস্ত ভোরবেলা। বুকের ওপর থেকে, গলা আর মুখ আর বিনুনি কোলানো মাথাটি ওপরের দিকে তুলে রাখা— এর বেশি কিছুই দেখতে পায়নি হরিচরণ। কিন্তু এখন, যেন অল্প অল্প করে তার মনে পড়ছে, অনেকদিন, অনেকদিন এই মেয়েটিকে সে রাস্তায় দেখতে পায়নি। এ বিষয়টি তাকে ভাবায়ওনি তেমন। দিনের পর দিন রাস্তা কাঁপিয়ে তাদের আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে, ওই দর্শন প্রতিদিনের জন্যই এমন সত্য হয়ে ছিল যে মনে হত আজও হয়েছে। এমনই হয়েছে। চোখে না দেখলেও।

এক জায়গায় ভাঙা খুঁড়ি পড়ে আছে। চলতে চলতে কুড়িয়ে নিল হরিচরণ। ভ্যানের গায়ে বেঁধে রাখা ব্যাডু এবার খুলে নিচ্ছে সে। পথ খঁটি দিচ্ছে। টেনে টেনে জড়ো করছে এক দিনের আবর্জনা। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, সে যদি না ঝাঁট দিত এমন, দিনের পর দিন এইসব আবর্জনা জমে পাহাড়ের মতো হয়ে যেত, আর ঢেকে যেত এইসব পথ মাটি গাছপালা, এইসব অট্টালিকাপ্রতিম বাড়িঘর। তখন আর মানুষ দেখা যেত না। এই 'সাতকন্য়ার' মেয়েও এরকম উদাস ও বিষয় চোখে আকাশের দিকে চেয়ে ভোরবেলাকে দুঃখী করে দিত না। হরিচরণের বাপুও এরকমই সাফাইওয়ালা ছিল। কলতে গেলে, হরিচরণের মনে হয়, আবহমানকাল ধরে তারা বংশ পরম্পরায় এমনই সাফাই করে চলেছে আর পৃথিবীকে পরিচ্ছন্ন রাখছে।

পাড়ার অর্ধেক পরিষ্কার হতে না হতে রোদ উঠে গেল বেশ। হরিচরণের গেলি খামে ভিজে গেছে। এখানে ওখানে ধুলো-ময়লা লাগছে। সাফাইয়ের কাজ করতে এলেও হরিচরণ প্রতিদিন তুলসীর কেচে দেওয়া ধুতি আর গেলি পরে আসে। যে-কোনও কাজই খুব পরিচ্ছন্নভাবে ও সততার সঙ্গে শুরু করা উচিত বলে তুলসী মনে করে। হরিচরণও এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে না। বধুত তুলসীর সঙ্গে তার এ পর্যন্ত কোনও বিষয়েই মতের অমিল হয়নি।

কাজ করতে করতে 'সাতকন্য়ার' মেয়েটি কখন মন থেকে হারিয়ে গেল টের পেল না



হরিচরণ। সে এখন পরেশবাবুর বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। দীর্ঘকাল ফেলে বাতু আর বেলচা নিয়ে তৈরি হচ্ছে সে। প্রতিদিনের মতো মাহের আঁশ, তবকারির কাটা আঁশ ও উচ্ছ্রিট খাবারের স্থাপ পড়ে আছে গেটের কাছে। হরিচরণ ভাবতে ভাবতে এগিয়েছে— থাকবে কি থাকবে না। পরেশবাবুর স্ত্রীর রক্তমাখা কাপড় পড়ে থাকে এখন। প্রতিমাস। পরিষ্কার করতে করতে হরিচরণ জেনে গেছে, এই সেই সময়। সে তাই নিজের মতো নিজেকে প্রস্তুত করেছে। কিন্তু তেমন কিছু পড়ে নেই। হরিচরণ খানিক স্বস্তি বোধ করেছে। ধীরে ধীরে বাতু আর বেলচা দিয়ে আবর্জনা তুলছে। বাদিকে জানালা দিয়ে মূর ভেসে আসছে। হরিচরণ জানে, পরেশবাবুর বড় ছেলে এখন গান গাইছে। গভীর মিঠে স্বর রোদ্দুরে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু শব্দগুলি উড়িয়ে যাচ্ছে। ঘুরে পড়ছে। কিছুতেই আকার নিচ্ছে না। হরিচরণ গান থেকে বাকি পালার টুটা করছে। পাচ্ছে না। সে জানে না এ কীরকম গান। কিন্তু বেশ গান। এ বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘরে ঘরে মানুষের ঘুম ভাঙছে। পথে কুতুর-বেড়াল ঘোরাঘুরি করছে। জলের ভারীবা বীক কাঁধে রিজের তলার কলে জল অনেক ছুটছে। মাথুরের গড়ে ডিপ টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে যে-জল ওঠে ও ঘরে ঘরে চলে যায় তা পানযোগ্য নয়। এমনকী স্নানযোগ্যও নয়। ওই জল চুলে পড়লে চুল চিট চিট করে। এখানে জলের ভারীরা খুব চাহিদা। ড্রামে জল ভরে ঠেলায় করে তারা বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেয়। বেশ কাজ। হরিচরণের বেশ ভাল লাগে। সকালে বিকেলে দু'বার বাড়ি বাড়ি জল দিয়ে যাও। সারা দিনভর অন্য কাজ করো। আয়ও হল। জল দেবার পুণ্যও হল। সে যদি মিউনিসিপ্যালিটির সাফাইওয়ালার না হয়ে অন্য কিছু হত, তবে কালু সাহার ইট-সিমেন্টের গুদামে কাজ করে বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা না করে এই জল কখন করত। সে জানে, সাফাইওয়ালার আনা জল কেউ খারে না। কেউ তা দিয়ে স্নান করবে না। তার জন্য তার কোনও গ্লানি নেই। প্রতিবাদও নেই। সাফাইওয়ালার হাতে জল আর কে কবে খেয়েছে। এই সবই তার অমোঘ সত্য মনে হয়। সে দেখেছে, শহরে ধর্মধর্ম নেই, জাতি-বর্ণ নেই, হিন্দু-মুসলমান এক টেবিলে খাবার খায়, ব্রাহ্মণে কায়স্থে দিগ্বি বিয়ে-সাদি ঘর-সংসার হচ্ছে। কিন্তু প্রফেশন সম্পর্কে উন্নাসিকতা যেমন ছিল তেমনি আছে। হরিচরণ জানে, বামুনের ছেলে এখন জুতো সারাতে পারে। দেশকাল এমনই হল সে তাও সম্ভব। স্বাভাবিকও। আর সেই ব্রাহ্মণতনয় তখন মুচি হয়ে গেল। জুতো সারায় বলেই। সে ক্রমে তুচ্ছ হতে থাকবে। বদি পৌরোহিত্য তার অন্যতম কাজ হয় তা হলেও কেউই তাকে পূজায় নেবে না। সে ক্রমে ব্রাত্য হতে থাকবে। হরিচরণ জানে, বুঝতে পারে, মানুষে মানুষে ভেদ বর্ধে আছে, ধর্মে আছে, জাতিতে আছে— সেইসঙ্গে পেশায় আছে। অন্যগুলো উপকানো যায়। জাতবৃত্তি বা পেশা উপকানো যায় না।

পথ পরিষ্কার করতে করতে সেতারের বাজনা শুনতে পেল হরিচরণ। গ্রীষ্মের এই সকাল, হঠাৎ শারদীয় হয়ে উঠল যেন। কে বাজায় এমন বাজনা? হরিচরণ ওপরের দিকে তাকাল। সে জানে এটা চাকরি করা মাসিমার বাড়ি। এ বাড়ির সামনেও কখনও জঞ্জাল পায় না সে। মাসিমার কলা আছে, নীচে দাঁড়িয়ে হরিচরণ ভ্যানের গায়ে কয়েকটি ধাতব শব্দ তুলবে, তখন ওপর থেকে জঞ্জালের প্যাকেট তিনি ফেলে দেবেন নীচে। সে শব্দ করতে করতে ওপরের দিকে তাকাল। ক দিন হল এ ধারের জানালাগুলো সকাল সকাল খোলে না। মাসিমার ছেলে এসেছে। সে বোধ হয় অনেককণ ঘুমোয়। জানালা বন্ধ থাকলেও মাসিমা টুকই শুনতে পেয়েছেন শব্দটা। প্যাকেট নিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়াচ্ছেন। ফেলব? রোজকার মতো জিজ্ঞেস করছেন তিনি, হরিচরণ মাথা সোলাচ্ছে। হ্যাঁ। ফেলুন। তাদের কথোপকথনেই বুঝি, কিংবা সেই ধাতব শব্দে বাজনার শব্দটি যেমে গেল। জানালার পর্দা তুলে উকি দিল বোরখা ঢাকা একটি মুখ। হরিচরণ দেখল, মুসলমান মাস্টারের বোন ওপর থেকে উকি মারছে। মাসিমার জন্য শব্দ করলে সেও হরিচরণের আগমনবর্তা টের পায় এবং জঞ্জালের প্যাকেট নিয়ে নীচে নেমে আসে। আজ বুঝি তার নামার



ইচ্ছে নেই। প্যাকেট নিয়ে সেও এসে দাঁড়াল বারান্দায়। কথা বলছে না। ইশারা করছে— ছুড়ব ? হরিচরণ ভ্যান ঠেলে এসে দাঁড়াল ওই ব্যালকনির নীচে। নীলোদ্ভা দু'টি প্যাকেট ছুড়ে দিল ওপর থেকে। একটি ভ্যানে পড়ল। একটি পড়ল না। মাথায় হাত দিয়ে ঠোঁটেরে উঠল সে— 'হে আল্লা।' হরিচরণ হাসল। অভয়দানের হাসি বেলচা নিয়ে কুড়িয়ে নিল প্যাকেট। নীলোদ্ভা কি হাসল একটু ? কৃতজ্ঞতার হাসি কি একটুখানি দিয়ে গেল ? হরিচরণ জানে না। মুসলমান মাস্টারের বোনের মুখ কেনওদিনই দেখেনি সে। হয়তো কেউই দেখেনি। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ভ্যানটিকে এ দিক-ও দিক করতে থাকছে সে এখন। নীলিমা ওপর থেকে ডাকলেন— হরিচরণ।

—'হ্যাঁ, মাসিমা।'

উত্তর দিল হরিচরণ।

—অনেকটা কটি আর ছানার ডালনা আছে। বাবার সময় নিয়ে যাবে ?

হরিচরণ হাসল। এই মাসিমা প্রায়ই তাকে কিছু না কিছু সেন। নানারকম খবর। খুবই সুখানু হয় সেইসব। আজও ছানার ডালনা আর কটির কথা শুনে হরিচরণের ভিভে জল ভরে এল। নীলিমা তাকে অনামনক দেখে বললেন— রাগে বানিয়েছিলাম। তোমার দাদার শরীরটা খারাপ হল... এত ভুগছে আমার ছেলেটা... কিছুই খেল না। আমি যা পেরেছি সামান্য খেয়ে বাকিটা তুলে রেখেছি। ভাবলাম তুমি নিয়ে যাবে। তোমার ছেলেমেয়েরা বাবে আনন্দ করে।

হরিচরণ ফের হাসল। ভ্যানের গায়ে ঝাঁটা বেলচা ঠেকিয়ে রেখে উবু হয়ে রাস্তার ধারে বসে পড়ে বলল— মাসিমা, ছানার তরকারি তো আজ নিতে পারব না।

হরিচরণের মুখে রোদুর পড়ছে। ঘামে ভেজা মুখ সে রোদ থেকে আড়াল করছে ঘামে ভেজা হাত দিয়ে। নীলিমা বললেন— কেন ? কারও শরীর খারাপ হল বাড়িতে ?

—না। তুলসী আজ সন্তোষীমা'র পূজা রেখেছে বাড়িতে। টক কিছু ঘরে তোলা যাবে না। ছানাতে লেবু আছে তো। ছুঁতেও পারব না আজকে।

নীলিমা হাসছেন। বলছেন— হ্যাঁ। সন্তোষী মা'র পূজা বেশ হচ্ছে বটে ঘরে ঘরে। কিন্তু টক ছোঁবে না বলছ কেন, এই জঞ্জালের মধ্যে কত লেবুর খোসা আর ফলের খোসা লুকিয়ে আছে তা তো তুমি বুঝতেই পারছ না। সেগুলো তো ছুঁয়ে ফেলছ।

—কী জানি মাসিমা। তুলসী বলেছে, ছুঁতে নেই। আমি তো দেখে-শুনে কিছু করিনি। ভগবান আমাকে পাপ দেবেন হয়তো। আমি সামান্য মানুষ, কি আর বুদ্ধি।

নীলিমা ভেতরে চলে গেলেন। হরিচরণ উঠে ভ্যান ঠেলে ঠেলে পাশের গলিতে গেল। মিথিলেশবাবুর বাড়ির সামনে গুচ্ছের নোংরা। ভাত-তরকারি। ছেঁড়া কাপড়। প্রাস্টিক। বোতল। খবরের কাগজের দল। তরকারির খোসা। মাছের আঁশ। অনেকক্ষণ লাগবে এ জায়গাটা পরিষ্কার করতে। হরিচরণ কপালের ঘাম মুছল। একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে। বেলচা নামিয়ে ময়লা তুলছে সে। মিথিলেশবাবুর বাড়ি থেকে বাজনা ভেসে আসছে। ঠিক এমন বাজনাই সে একটু আগে মুসলমান মাস্টারের বাড়ির সামনে থেকে শুনে এসেছে। বড় মধুর এই শব্দ। ওখান থেকেও, এখানে। মিথিলেশবাবুর বাড়ির সামনে যেন আরও মধুর হয়ে বাজছে। হরিচরণ মিথিলেশবাবুর বাড়ির সামনে এ বাজনা প্রায়ই শোনে। কিন্তু আজ যেন তার কানে সব কিছুই আরও স্পষ্ট শোনাচ্ছে। আলাদা করে বাজনা শোনার ইচ্ছে এর আগে কখনও হয়নি। এখানকার ময়লাগুলি একটু দীরে দীরেই সাফাই করল সে। একটু বেশিক্ষণ ধরে বাজনা শুনল। ভ্যান ঠেলে এগিয়ে চলল আবার। বিকাশবাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসতেই চা খাবার ইচ্ছেটা বিস্ত্রণ হয়ে উঠল হরিচরণের। বিকাশবাবুর বউ, ছোটদের ইচ্ছার বড় দিদিমণি মাঝে মাঝে সকালবেলায় চা খেতে দেন হরিচরণকে। বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে গিয়ে কুয়োতলায় বসে চা খায় হরিচরণ। দিদিমণি তাকে ভাঁড়ে চা দেন। এ সব ভাঁড় চায়ের জন্য নয়। হয়তো দই

এসেছে বা মিষ্টি এসেছে। আর দিদিমণি মনে করে হরিচরণের জন্য সেরে-সব সেপে দিয়েছেন। হরিচরণ খেলে বা ঝুলে পাত্রগুলি আর ব্যবহার করার যোগ্য থাকবে না। সে তাই এই ভাড়ের চায়েই তৃপ্তি সীমিত রাখে এবং খাওয়া হলে নিজের ভ্রাতার ভাড়টা ফেলে দেয়। সেইসব চা পানের দিন দিদিমণির বাড়িতে নিশ্চিতভাবে ইদুর বা বেড়াল মরে থাকে। জিব্বা বাহাদের দিকের পাথরখানার গর্তে পাঁচিল টপকে বল বা ঢিল এসে গর্তের মুখ ঝাটকে দেয়। তা খাওয়া হলেই দিদিমণি হরিচরণকে সেইসব মরা ইদুর-বেড়াল পরিষ্কার করে দিতে বলেন। কিংবা পাথরখানার গর্ত থেকে আবর্জনা তুলে সেটি যথায় রাখা দিতে বলেন। হরিচরণ তা করে দেয়। পরিষ্কারকরণই তার ধর্ম। তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় চা খাবার কুতজ্ঞতা। মাঝে মাঝে দিদিমণিও নানা রকম খাবারের প্যাকেট ধরিয়ে দেন হরিচরণকে। তার মধ্যে হোটেলের খাবারের প্যাকেটও থাকে। আর বেশির ভাগ দিনই সেইসব প্যাকেটের খাবার পড়ে যায়। হরিচরণ কতদিন বাড়ি নিয়ে যাবার আগেই সেসব ভ্যানের জঞ্জালে ফেলে দিয়েছে। কখনও-না সে বুঝতে পারেনি। বাড়ি নিয়ে যাবার পর তুলসী ছি ছি করে ফেলে দিয়েছে। রাগ করে বলেছে—

—এ সব ভাল খাবার। হোটেলের খাবার।

জবাব দিয়েছে হরিচরণ।

—আমাদের হোটেলের খাবার দরকার নেই।

—ভালবেসে দেয় আমাদের। না বলি কেমন করে, বলো?

—ভালবেসে? তুমি কি সত্যি ভাবো ওরা তোমাকে এ সব ভালবেসে দেয়?

—না হলে আর দেবে কেন বলো? দানের মধ্যে স্বীকারের করুণা থাকে তুলসী। কেউ কিছু দিতে চাইলে না বলতে নেই।

এ সব বলে তুলসীর কাছে নিজেকে, নিজের দুঃখকে একটু একটু আড়াল করে হরিচরণ। এইসব পড়ে যাওয়া, ফেলে দেওয়া খাবার দিলে সেও কষ্ট পায়। গরিব মানুষ সে। দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া জুটে যায়। বউকে সামান্য গচনা গড়িয়ে দেওয়া, পরিবার নিয়ে খেলা দেখতে বেরুনে কিংবা দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবাটিতে গিয়ে হনুমানকে বাদাম খাইয়ে আসার মজাও সে করতে পারে। মাঝে মাঝে 'সেনালী' সিনেমায় নতুন নতুন হিলি ছবিও দেখাতে নিরে যায় তুলসীকে। তাদের কোনও অভাববোধ নেই। তবু স্বীকার করতেই হবে তারা গরিব। বিকাশবাবু যেমনি গাড়ি ইকিরে আপিস যান আর হেডদিদিমণি যেমনি সিঁধের শাড়ি পরে লাল ছাত্তা নিয়ে ইস্কুলে যান তেমন তো কিছুই নেই তাদের। তাই, বিকাশবাবু আর হেডদিদিমণির যতখানিতে পচা লাগে, যতখানিতে কোনওকিছু আর খাবার যোগ্য বলে মনে হয় না, তার চেয়ে অনেক বেশি পচা খাবার হরিচরণদের খেয়ে হজম করে ফেলাই উচিত। কারণ গরিব লোহা খেয়েও হজম করে। আরও বেশি গরিব রাক্তার জঞ্জাল থেকেও খাবার কুড়িয়ে যায়। অতএব, হরিচরণ মনে করে, সকল দেওয়ার মধ্যেই মহাব লুকিয়ে আছে। যদিও তুলসী তা শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়নি। অস্তর মাও না। ইদানীং বাড়িতে খাবার নিয়ে ফিরলে তুলসী জানতে চায়, খাবার কোন বাড়ির। বিকাশবাবুর বাড়ির স্তন্যলে সে ওই খাবার ঝুঁড়ে ফেলে দেয়। পরখ করেও দেখে না সে খাবার গ্রহণযোগ্য ছিল কি না। বাচ্চারাও এ নিয়ে বাঘনা করে না। অন্যদের দেওয়া খাবার তারা আগ্রহ ও তৃপ্তির সঙ্গেই খায়। অন্যরকম স্বাদ ও গন্ধ। কিন্তু সে খাবার না-খেলেও তাদের মন স্বাধীন নেই। বাড়ির সাধারণ রামাও তারা সমান তৃপ্তিতে গ্রহণ করে।

অস্তর মা একেবারে খাবার নিতে চায় না হেড দিদিমণির কাছ থেকে। বলে— আমি নিজের চক্ষে দ্যাখসি। পোলায় খাইয়া গেল। লাউ করসিলেন। পোলায় খায় নাই। আইঠা পাতের বিকা দিদিমণি বাড়িতে লাউ তুলিয়া রাখতেন। আমারে কয়— অস্তর মা। লাউ রাখসি। খাও। আমি কই— আইজ শরীলডা ভাল নাই। কিসু খামু না। কয়— লাউ খাও। লাউ তো ঠাণ্ডা—

সহিরা যাইব গিয়া। আমি আর কিসু কই না। লাউ লইয়া থো ফ্যানছিলা কইরা নিসি নালায় ফেইল্যা। ছুডোলোকের বেটি ছুডোলোক। গজর খাটাইয়া বাই। ভিক্ষা তো করি নাই। পাতের আইঠা বাইতে দিব ক্যান?

অন্ধর মা'র ভাবনা মিলিয়ে যেতে না যেতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হরিচরণের। গোঁফের তলায় হেসে সে জিজ্ঞেস করল— কি? আজ যে বড় ভ্রাতৃত্বাভি?

অন্ধর মাকে চিন্তাকুল দেখাল। সে বলল— হ। অন্ধর বাপের লইয়া বড় ভাবে ভয়ে আসি। হরিচরণ বলল— কী হয়েছে অন্ধর বাপের?

—সারা দিনে কয় মাথা ঘুরায়। হজম হয় না। প্যাতলা কইরা কীটকল্যাে মূল আর ভাত নিসি। তাও কয় প্যাটে বাদনা। উঠনের নাম নাই। কুনো কামও করতে পারেনা। আমি একা কুনদিনে ককম! টাকা পয়সা নাই। পাঁচখান কাম নিসি। সকাল সকাল না আইলে সাক্ষম কি কইরা?

অন্ধর মায়ের জন্য হরিচরণের চোখ নরম হয়ে আসছে। কী সুন্দর গভন-পেটিন অন্ধর মায়ের। কী সুন্দর কথা। চারটি মেয়ে ও একটি অন্ধ পুত্রের জন্ত দিয়েও, এই বাড়ি বাড়ি এত খাটাখটুনি করে আর সংসার সামলেও সকালের রোদ্দুরে অন্ধর মাকে খুব সজীব লাগছে। তুলসী বলে, একে বলে মনের আলো। যার মন যত সাত্তা থাকে, তার মুখ তত সজীব থাকে— সে তুমি যতই পরিশ্রম করো। কত কিছু যে জানে সে। বোকে। হরিচরণ যখন তার সমস্ত দিনের দেখার গল্প, শোনার গল্প সম্ভায়া তুলসীর কাছে বলতে থাকে আর জানতে চায়— কেন এরকম হয়, বলে তো কেন হয়। তখন তুলসী খুব নিশ্চিতভাবে উত্তর দেয়। যেমন অন্ধর মা'র বিষয়ে সে বলেছিল বা 'সাতকন্যা'র গৃহিণীর বিষয়ে। বলেছিল— মনে যদি অন্ধকার না থাকে, হাহাকার না থাকে, কষ্ট পেলে, কেন কষ্ট পাচ্ছি, এরকম না ভেবে যদি মনে করা যায়, সুখ-দুঃখ সবাইর জীবনে আছে, তা পেরিয়ে যাওয়াই কাজ। যদি অন্যের আনন্দ দেখে ঈর্ষায় পুড়ে না যায় কেউ, তবে পরিশ্রম, কষ্ট, অভাব— কিছুই তার মনকে মারতে পারে না। মনের সেই আলো তাকে উজ্জ্বল করে রাখে। ভাল রাখে।

অন্ধর মা যাই-যাই করছিল। হরিচরণ বলল— ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?

—হ। ডাক্তার। মমিনাথ ডাক্তার তো আর কণীই দ্যাখেন না। কালীতারা নিদি আমারে তার ঘরেও লইয়া গেছে। ডাক্তারে কয়, মা'র নিষেধ করছে। আর আমি কণী দেখুম না কালী। কত কইলাম কত সাধলাম। না, দ্যাখেন না। গলায় কুম্ভাক্ষ পইরা, ছোটো কাইটা রাতদিন ঠাকুর ঘরে মন্ত্র পড়তেয়াসেন। কয়, শিবতোষ ডাক্তার আসে, তার কাসে যাও।

হরিচরণ বলে— বড় ডাক্তারবাবুকে দোষ দিয়ে না গো অন্ধর মা। মানুষটার কি দুঃখের শেষ আছে? অত ভাল ছেলেটা কীরকম হয়ে গেল। মরেই গেল শেষে। বউটা পাগল হয়ে গেল। সবাই মানুষটাকে ছেড়ে, একলা ফেলে কত দূরে চলে গেল। তার কি আর কাজে মন লাগে রে। তুমি বরং শিব ডাক্তারের কাছেই অন্ধর বাপকে নিয়ে যাও।

—যাই নাই? গেসিলাম। শোনে, শিব ডাক্তারের কাছে গিয়া, ওষুধে ইঞ্জেকশানে আমার পক্ষাশ টাকা কর্ত্ত হইয়া গেল। কিন্তু কিসু হয় নাই। ভগবান জানে কী আসে কপালে। ভাল-মন্দ হইলে কপাল তো একখান পড়ব না। পড়ব দুইখান।

—দুইখান কেন?

—বাংলাদ্যাশে আর একখান সংসার রাইখা আসছে না?

—আরও সংসার মানে?

—অন্ধর বাপের আর একখান বিয়া অসে না? তারে বাংলাদ্যাশে রাইখা আইসে। দুইখান গোলাও আসে ছেইখানে। এইখান থিকা কাজ কাম করে, দুই-চাইর পরসা জমাইয়া গিয়া হ্যাঘরে দিয়া আসে।

হরিচরণের মুখে কথা জোপায় না। আপশমনে ভানের হাতল ধরে টানটানি করে সে।

বিকাশবাবুর বাড়ির নিমগাছ থেকে পাতা খসে পড়ে পথ ভরিয়েছে। সেগুলোই তুলসী বলে খাটি হাতে নিতে থাকে এখন। অন্ধর মা বলে চলে— সন্তোষীমায়ের কপসে মানত্র করসি। অইজ থিকা আসন নামামু।

হরিচরণ অন্ধর মার দিকে তাকায়। অন্ধর মার মুখে দুঃখের ছায়া। কী আশ্চর্য মেয়েমানুষ।

সে বলে— পূজা করে ক্ষতি নেই। কিন্তু ভগবান তো বলেনি অসুখ করলে নাগরায়ি না খাওয়ালেও সেরে উঠবে। ঈশ্বর অসুখ দিয়েছেন জে তার দাড়াইও দিয়েছেন।

অন্ধর মা বলে— হ। কামারহাটিতে এক গুণিনের সন্ধান পাইসি। মিঞাবাবার থান। এ্যাক্তরে বইলা-বইলা সারাইয়া দিব। আর শুধু কি রোগ সারেন। কিস হারাইলে চুর ধইরা দিব। মাথা বারাপ হইলে সারাইয়া দিব। বর ছইড়া গ্যালো ধইরা আসব। হেইখানে লইয়া যামু অন্ধর বাপেরে।

হরিচরণ হাঁ করে শোনে। সত্যিই এমন কেউ আছে? এমন মুশকিল আসান? আর তা কামারহাটিতেই? তার একবার যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে যাবে কী নিয়ে? তার তো পরিবারে কারও অসুখ করেনি। মাথা বারাপ হয়নি। তুলসী এবং তার মশো ভালবাসার এতটুকু অভাব ঘটেনি। তা হলে? কোনও দুঃখ কিনা কষ্ট বিনা কেমন করে সে গুণিনের কাছে যায়! তখনই তার মনে পড়ে তুলসীর ইচ্ছের কথা। তাই তো! এ কথা কেন এতক্ষণ মনে পড়েনি? পাঁচটাই ছেলে বলে, মেয়ে নেই বলে, তুলসীর কি দুঃখ নেই? অভাববোধ নেই? হরিচরণ কি জানে না, আজ থেকে তুলসী যে সন্তোষী মার ব্রত পালন করবে তা ওই মেয়ে প্রার্থনা করেই? তবে কি সে তুলসীকে নিয়ে একবার যেতে পারে না, গুণিনের কাছে? পরক্ষণেই তার মনে হয়, মিঞাবাবার থান, তার মানে গুণি মুসলমান নিশ্চয়ই। হরিচরণ জানে, তুলসী কোনওভাবেই কোনও মুসলমানের দেওয়া গুণুখ খাবে না। সে জিজ্ঞেস করে— লোকটা কি মুসলমান?

—না। হিন্দু। সম্মাসী।

—তুমি যে বললে মিঞাবাবার থান।

—হ। ওইখানে আগে এক মুসলমান গুণি আসিল। হ্যার মরলে গিয়া তার দাহ পাওয়া যায় নাই। হেইখানে বইসা তেনি নামাজ পড়তেন, হেইখানে এক রাত্রর মইখো দুইখান গাছ সাঁই সাঁই কইরা বাইড়া উঠল। একখান কদম গাছ। আর একখান নিম। মাইনবে কয়, মিঞাবাবার আত্মা হইল নিম গাছ আর দাহ হইল কদম।

হরিচরণের চোখ গোল গোল হয়ে যায়। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় সেই মুসলমান পুণ্যদ্ব্যাকে যার শরীর মৃত্যুর সঙ্গে কদমগাছ হয়ে উঠছে আর ফুলে ফুলে ভরে উঠছে আশ্চর্য পুলকে। যার আত্মা অশীর্বাদের মতো, ঔষধের মতো দাঁড়িয়ে আছে নিমগাছ হয়ে তার তলায় একদিন এসে দাঁড়াচ্ছেন একজন হিন্দু সম্মাসী। মুসলমান ফকিরের কাজ কাঁধে তুলে নিচ্ছেন। সুজ্জবা বিলিয়ে দিচ্ছেন দিগ্বিদিক। অন্ধর মায়ের মতো কত মানুষ তাকে উপকৃত হচ্ছে। হিন্দু-মুসলমান সব তো বাইরের কথা। আচরণের কথা। পুণ্যে পূজায় মানুষের কল্যাণে কী-বা হিন্দু কী-বা মুসলমান! হরিচরণের হৃদয় প্রসন্ন হয়ে যায়। সে স্থির করে কন্যার কামনায় তুলসীকে নিয়ে সে কামারহাটি চলে যাবে একদিন। দরকার হলে অন্ধর মাকেও সঙ্গে নেবে। সে কৃতজ্ঞ চোখে অন্ধর মার দিকে তাকায়। বলে— তুলসীও আজ থেকে সন্তোষী মার পূজা বদাবে অন্ধর মা। তুমি ভেবো না। ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সে ঝাড়ু দিয়ে নিমপাতা জড়ো করতে থাকে। অন্ধর মা বিকাশবাবুর বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতে লক্ষ্মী ছুটে আসেন— দাঁড়াও। দাঁড়াও। ঢুকো না।

অন্ধর মা থমকে দাঁড়ায়। লক্ষ্মী বলেন— অতক্ষণ লোকটার সঙ্গে কথা বলছিলে, ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দাগনি তো? ছুঁলে বাপু চান-টান করে আমার বাসন-কোসন ঘর-দুহারে হাত দেবে।

অন্ধর মা থোকর মতো হাসে। বলে— ছুমু কান! এইড়া আপনে কী কন? পাখে বাড়াইয়া

দুইখান কথা কইসি। তারে আমি ছুইতে যামু ক্যান?

লক্ষ্মী বললেন— দুটো কথা তো বলোনি বাপু। সন্তোষী মা'র পূজা করব বলে আজ আমি ভোরে ভোরেই উঠেছি। সবই দেখলাম। কাজ করতে এসেছি। করে-চলে যাও। ওই ঠা-ঘাটা লোকের সঙ্গে অত গুজগুজ কি।

অন্ধর মা'র কোনও কথা শোনা যায় না এবার। অন্ধত হরিচরণের কানে অন্ধর মা'র কোনও উত্তরই পৌঁছয়নি। কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতিটি কথাই সে শুনতে পাচ্ছিল। অন্য শুনতে শুনতে সমস্ত করে পড়া নিমপাতা, কাগজের ঠোঙা, চুলের দলা, হেঁড়া ব্রিডিজ বা আঁড়িয়া গুহের করে বেগাচায় তুলে তার ভ্যান ভরে ফেলছিল। একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। চায়ের নেশা কখন হারিয়ে গেছে! গোর্ফের ভগায় ঘামের বিন্দু জমেছে। সকালের পরিষ্কর শোশাক এখন মড়লা-গ্রাম। মুখ নাহিরে সেই শোশাকেই মুখের ঘাম মুখে নিচ্ছে হরিচরণ। ভাবিছে— আজ সন্তোষী মা'র কাছে তুলসী হয়তো মেয়ে চাইবে। এতদিন সে ভাবত, তুলসী যা চাইবে, সেই তার চাওয়া। এখন, এই মুহূর্তে তার মনে পড়ছে, আজ তার চাওয়া অনারকম। সে মেয়ে চাইবে না। বরং প্রার্থনা করবে, তার পুত্রেরা, কেউ যেন, কাফুদার হয়ে না ওঠে।



গণেশকন্যা সন্তোষী। পিতারই মতো তিনিও সিদ্ধিলাক্সী। করুণাময়ী। যোগাসনে বসে দুঃখজর্জর মানুষের প্রার্থনা পূরণের চেষ্টা করছেন অহরহ। চার হাতে আর কত সামলানো যায়। তবু একহাতে তরবারি ধরে অমঙ্গল ধ্বংস করছেন তিনি। অন্য হাতে ত্রিশূল নিয়ে অন্তর্ভকে বধ করছেন। তৃতীয় হাতে অকাতরে বিলোচ্ছেন অন্ন-পানীয়। চতুর্থ হাতে বরাভয়। হে কাতর মানুষ, হে কষ্টজর্জর মানুষ, হে বেদনাভারে ক্লান্ত ক্লিষ্ট মানুষ— তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি আছি। আমাকে দেখো। চোখ মেলো। আমার দিকে তাকাও। আমিই ভবানী। আমিই অন্নপূর্ণা। আমিই পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি, আমিই লক্ষ্মী-সরস্বতী দুর্গা, কালী, আমিই নারায়ণী, ব্রাহ্মদেবী, শিবদেবী। আমাকে ভক্তিভরে ভালবাসো। নিষ্ঠাভরে আমাকে পূজা কর। আমি তোমাদের কল্যাণ সরবরাহ করব।

আজ এই মহাপুণ্যের দিন। ঘরে ঘরে মেয়েরা সন্তোষী মা'র পূজা আয়োজন করেছে। মঙ্গলচর্চা পূজার মতো, ইহু পূজার মতো, সন্তোষী মা'র পূজাতেও কোনও খটা নেই। জ্ঞান করে শুদ্ধ কাপড় পরে মেয়েরা ধূপ-দীপ ছেলে দিয়েছেন। ঘাটের ওপরে দেবীর চন্দন ও সিন্দুরচর্চিত ফটোগ্রাফ। যে যে নারী পূজার আয়োজন করেছে তারা বসেছে ঘাটের কাছাকাছি। অন্যরা একপাশে চোখে-মুখে ভক্তি ও বিশ্বাস মেখে বসে আছে। তুলসীর ঘরে হরিচরণ ও তার পাঁচ ছেলে হাতে ছোলা-গুড় নিয়ে বসে আছে। বিকাশের বাড়িতে লক্ষ্মী একা। ছেলে জ্ঞান সেরে এসে একবার বসবে। কিন্তু নকশাল পুত্রের পিতা বিকাশ কোন মুখে সন্তোষী মা'র কাছে প্রণত হবেন? মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকলেও প্রকাশ করার সাধ্য নেই। যদিও ওই প্রসাদ তিনি গ্রহণ করবেন এবং সারাদিন একটুও টক যাতে না খেয়ে ফেলেন তার জন্য সতর্ক থাকবেন।

প্রচুর ফল প্রসাদ দিয়েছেন লক্ষ্মী। এত ফল তুলসী বা অন্ধর মা'র আয়োজনে নেই। তবু তুলসী একটি পাক্য পেঁপে ডুমো ডুমো করে কেটে দিয়েছে। নারকোল কুরিয়ে থালায় ভর্তি করে দিয়েছে। কিন্তু অন্ধর মা'র আয়োজনে শুধু গুড় আর ছোলা। ফুল, গুড়, ছোলা আর ধূপকাঠি কিনতেই তাকে সাতবার ভাবতে হয়েছে কোন ঋচ তাকে কমাতে হবে। সামান্য এই পূজার



আয়োজনটুকু ঘিরে হাতে ছোলা-গুড় নিয়ে বসে আছে অন্ধ আর তার চাকরুমা। মা সন্তোষী মা'র পূজা করছে খবর পেয়ে মেজ মেয়ে মালতী মোহপাড়া থেকে চলে এসেছে। এসে অন্ধর মা'র কাছে খান খান করছে— একটাও ভাদ শাড়ি নেই আমার। তোমাকে বাবুনের বাড়ি থেকে নববর্ষে কিছু দেয়নি মা?

অন্ধর মা'র একটা নিজস্ব নাম আছে, সুমিত্রা, অন্ধ জন্মবার পর সে-নাম সবাই ভুলে গেছে। এমনকী তার নিজেরও আজকাল মনে পড়ে না। শুধু যখন সে বাবুনের দেওয়া নতুন শাড়ি, কামো পরে তখনই তার মনে হয় তার নাম সুমিত্রা। নিজেকে ভাল লাগে তখন। এই বাপের চাঁচের ঘরে, এই ফুটো হয়ে যাওয়া টিন, রুগ্ন স্বামী ও অভাবের সংসারে থেকেও তখন খুব যত্নে গোল করে একটি সিনুরের টিপ পরে সে। কিন্তু এমনটি খুব বেশি ছটুতে পায় না। সামান্যপাশে নতুন শাড়ি পাবার সম্ভাবনা থাকলেই কোনও না কোনও মেয়ে এসে হাজির হয় এবং অন্ধর মা'র নতুন শাড়িটি না নিয়ে ছাড়ে না। কখনও তার শাশুড়ি অগতি করে—তগো নুড়ের শ্যাম নাই? অ্যা? মায় মুখে রক্ত তুইল্যা চাটে। খাইয়া না-খাইয়া তগো বিয়া দিসে। অহনও তগো মায় কী পাইল হাতান লাগে?

মেয়েরা দাঁত খিচিয়ে চ্যাচায়— চূপ কর বুড়ি। আধুনিক শহরে ভাবা ও সাজগোজে তারা বেশ চৌখস। বুড়ির এই অনুযোগকে তারা উড়িয়ে দিতে চায় কিছু পারেনও না সব সময়। না পারার ঝাল মিটিয়ে নেওয়ার জন্য মায়ের নতুন শাড়ি পরে সিনেমা দেখে আসে। বাজার যোরে। দু'-চারদিন এমনই চলতে থাকে। নতুন শাড়ির জৌলুস কমে গেলে তারা যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

স্বামীর জন্য এবং পূজার জন্য অন্ধর মা আজ উদাসী হয়ে আছে। মেয়ের প্রথের জবাব দেয়নি তেমন। একখানা ছাপা শাড়ি সে সত্যিই পেয়েছে পালবাবুর গিমির কাছ থেকে। কিন্তু মেয়েকে তা জানাচ্ছে না। জানালে নিয়ে নেবে। ভাবলে এর মধ্যেও একটু মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে অন্ধর মা'র। তারপরই নিরাসক্ত হয়ে ভাবছে— 'নিক গিয়া। আমরাই তো মাইয়া।' এ সব ভেবে সে ব্রতকথা শুরু করছে। তার পুরোহিত ডাকার ক্ষমতা নেই। পড়তেও সে জানে না। শুনে শুনে ব্রতকথা মুখস্থ করেছে। যেমন করেছে তুলসী। কিন্তু হেড দিদিমণি লক্ষ্মী পুরোহিত ডেকেছেন। তিনি পূজা, জল, আসন, ফুল সব শুদ্ধ করছেন। তুলসী আর অন্ধর মা এই শুদ্ধতার জানে না। তারা ব্রতকথা বলছে। অন্যরা শুনছে।

... মা হলে কি হয়, দেখো, ছোট ছেলেটা আর সব ছেলের মতো রোজগারে নয় বলে পাতকুড়নো খাবার দিচ্ছে। আহা! বউটারও কত কষ্ট! রোজগার করবে বলে ধামী বিদেশে চলে গেল। আর শাশুড়ি ও অন্য জায়েরা মিলে তাকে দিয়ে সব কাজ করাতে লাগল। সে বনে যায়। কাঠ আনে। রাঁধে। বাসন মাজে। ঘর গুছায়। অন্য সকলের সেবা করে। তার শরীর শুকিয়ে গেল। হাড় কালি হল। চোখ গর্তে বসে গেল। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী সাবিত্রী এক কঙ্কালবর্মণী হয়ে গেল। সন্তোষী মা এই সব প্রত্যক্ষ করলেন। দুঃখীর ত্রাতা, অসহায়ের উদ্ধার, সাবিত্রীকে এমন পথে চালিত করে দিলেন যে সে একটি মন্দিরের সন্ধান পেলে। সেখানে সন্তোষী মা অধিষ্ঠান করছিলেন। সাবিত্রী জিজ্ঞেস করল— তোমরা এ কার আরাধনা করছ?

—সন্তোষী মাতার। এটা সন্তোষী মাতার মন্দির। প্রতি শুক্রবারে সন্তোষী মাতার পূজা দিতে হয়।

—এই দেবীর পূজা করলে কী হয়?

—অপুত্রের পুত্র হয়। অজ্ঞানের জ্ঞান হয়। নিধনের ধন হয়। আর যার যা মনস্কামনা— সব পূর্ণ হয়।

—দেবীকে কী দিয়ে পূজা করতে হয়?

—শুধু ভালবাসা আর ভক্তি দিয়ে।



—আমি কি এই ব্রত পালন করতে পারি না?

—কেন নয়? তুমি কি উপবাসে আছ?

—হ্যাঁ।

—বেশ। তুমি তাহলে হাতে ছোলা গুড় নিয়ে বসে ভক্তিব্রত দেবীকে অর্পণ করো। তাঁর কথা মন দিয়ে শোনো। প্রতি শুক্রবার এমনি করে পূজা করতে থাকো। মা তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। যে-দিন তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে সে-দিন সাধারণতঃ দেবীকে নিরামিষ ভোজন দেবে। ব্রাহ্মণ ও বালকভোজন করে ব্রত উদ্‌যাপন করবে। সমবাসদের তেল-সিদ্ধি, গম-সুপুরি আর ব্যতাসা দিয়ে নমস্কার করবে। কিন্তু মনে রেখো, টক খাবে না। কারওকে খাওয়াবে না।

হ্যাঁ। সাবিত্রী ভক্তিব্রতের সমস্ত ব্রতপালন করেছিল। তার স্বামীর ধনভান্ডি ঘটেছিল। তাদের মিলনও সম্পন্ন হয়েছিল দেবীর আশীর্বাদে। এই আশীর্বাদ ছিনিয়ে নেবার জন্য চক্রবন্ত কম হলে না। জায়েরা তাদের ছেলের শিকিয়ে নিল— খাবার সময় টক চাইবি? না দিলে ডিংকার করবি। পরসো চাইবি? ওই পরসো দিয়ে পরে টক কিনে খাবি। দুর্বাস!

জায়েরদের বড়বড় সাবিত্রী আবার দুর্বিপাকে পড়ল। কিন্তু ভক্তির চেয়ে বিশ্বাসের চেয়ে বড় কিছু নেই। সাবিত্রীর অটল ভক্তি ও বিশ্বাস সব বড়বড় অতিক্রম করে গেল। সে স্বামী পুত্র নিয়ে ধনে-জনে শাস্তিতে সুখে ঘর করতে লাগল।

ব্রতকথা শেষ হল। হির বিশ্বাস ও সহায়তার বাণীতে সকলে আশ্রুত হয়ে রইল। মনে মনে সকলেই সংকল্প করল, হ্যাঁ, সন্তোষী মাতা দেবতার মতো দেবতা বটেন। তিনি নির্ধনকে ধন দেন। অপুত্রকে পুত্র দেন। দুঃখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, অতএব তাঁর পূজা করতে হবে। সে পূজায় নিষ্ঠা থাকতে হবে। হরিচরণের ছেলেরা প্রসাদের পাকা পোঁপে খেতে খেতে পরস্পর বলাবলি করল, আজ, সারাদিন, কিছুতেই টক খাবে না তারা। সমস্ত প্রলোভন এড়িয়ে যাবে। গোপাল আর সুরেশকে নিয়েই ভয়। তারা এখনও যথেষ্ট ছোট আছে। কিছুতেই বোকে না। কোনওভাবে টক জাতীয় কিছু খেয়ে ফেলতে পারে তারা। ডমরু, কামরু আর জর্জী তখন সংকল্প করে, সারাদিন দু'ভাইকে তারা চোখে চোখে রাখবে। আজ আর পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে যাবে না। তখন হরিচরণ মুখ ভর্তি পাকা পোঁপের রস নিয়ে ঘন চোখে তুলসীর দিকে তাকায়। তুলসী মিষ্টি হেসে চোখ সরিয়ে নেয়। ডমরুকে বলে— 'যা, এই ছোলা আর গুড় গরুকে খাইয়ে আনবি, যা।'

বিকাশ জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে চামচ দিয়ে প্রসাদের ফলমিষ্টি মুখে দিচ্ছেন তখন আর লক্ষ্মীর সাবধানবাণী শুনছেন। দ্যাখো, ফেন টক খেয়ে ফেলো না।

বিকাশ বিরক্ত হচ্ছেন— আচ্ছা, অকসি কোথায় আমি টক খাব বলো তো?

লক্ষ্মী অঁঝিয়ে ওঠেন— কেন? টিফিনে কোনওদিন ধোসা ইডলি খাও না মনে হচ্ছে।

বিকাশ চুপ করে গেলেন। দেবশিস এসে পেছন থেকে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। লক্ষ্মীর গালে গাল রেখে বলল— কী চাইলে মা?

—চাইলাম, তোমার বাবার ফেন একটু মতিগতি দেন।

অবাক হয়ে তাকালেন বিকাশ— কীসের মতিগতি?

—বালিগঞ্জে একটা বাড়ি করতে পারতে তুমি। পারতে না? সল্ট লেকে একদু কত জমি আছে। কিনতে পারো না? কলকাতায় লোকের বাড়িতে টেলিভিশন এসে পুরনো হয়ে গেল। আমাদের জন্য একটা কেনার নাম করো তুমি?

—টেলিভিশন? সে তো কেনাই যায়। এর জন্য সন্তোষী মায়ের পূজা করতে হবে কেন?

—কেন নয়? বড় খোকার বিয়ে দেব না আমি? তোমাকে আর কিনতে হবে না। বড় খোকার বিয়েতে টেলিভিশন যৌতুক নেব আমি।

—যৌতুক নেবে? ছেলের বিয়েতে যৌতুক নেবে তুমি?

—কেন নেব না, ছেলে কি আমার ফেলনা?

দেবশিস তখনও মাকে জড়িয়ে আছে। লক্ষ্মী তার মাথাটা টেনে টুমা খেলেন। যৌতুক নেওয়া সম্পর্কে দেবশিস কোনও মত প্রকাশ করল না। বিকাশ উঠে পাড়ালেন। এখনও তাঁর গাড়ি আসেনি। দু'একবার এ দিক ও দিক দেখে আবার খবরের কাগজটা নিয়ে রসলেন। দেবশিস বেরিয়ে গেল। পুজোর বসেছিলেন বলে লক্ষ্মী এখন এককত্বে। হলুম মিস্র শাড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে পরে আছেন। সে অবস্থাতেই হঠাৎ বিকাশের গা ঘেঁষে বসে পড়লেন তিনি। বিকাশ, কেন অমা কেনও নারী তাঁর গা ঘেঁষে বসছেন এমনই অনুভবে একটা স্নেহ বসলেন। লক্ষ্মী দু'দিকে মাথা নেড়ে হতাশভাবে দু'টা হাত ছড়িয়ে দিয়ে বললেন— ছি ছি ছি! কী লজ্জার কথা!

—কী হল? বিকাশ জানতে চাইলেন।

—এর আজকাল হয়।

—কী হয়? কার?

—বড় খোকার।

—কী হয়?

—ওই সব পড়ে। বেশ কয়েকদিন বিছানা তুলতে গিয়ে দেখেছি। ছি ছি ছি!

—এতে ছি ছি করার কী হল? বড় হয়েছে। এরকম তো হতেই পারে।

—তা বলে এখনই? এত আগলে আগলে রাখি। এত অভ্যাস করার চেষ্টা করি।

বিকাশের কথা বলতে ইচ্ছে করল না। মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না যে বড় খোকার বয়সে তিনি দেবশিসের পিতা হতে যাচ্ছিলেন। অস্তুর্নিহিত পরিবর্তন ও অনিবার্য উদ্বেগ কি ঠেকিয়ে রাখা যায়, আগলে রাখা যায়? পৃথিবীর কোনও মায়ের পক্ষেই কি তা সম্ভব? লক্ষ্মী বলে চললেন— সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকি, এই বুদ্ধি কোনও মেয়ের পামায় পড়ল। বড় খোকা আমার সে-রকম না যদিও। আমি তো বলি, সবসময় বলি, কারও দিকে এগোবি না। তুই ভাল চাকরি করিস, এত সুন্দর চেহারা হোর, মেয়েরা এসে হোর পায়ে লুটোবে।

বিকাশ সোফায় ঘাড় এলিয়ে বসে আছেন। গাড়ি আসতে এত দেরি করছে কেন? ওপরে ফ্যান ঘুরছে। ক্যানের বিস্তার ময়লা। তিনি ভাবছেন, পাশে বসে থাকা এই নারী মাত্র পাঁচ বছর আগে পুত্রশোক পেয়েছেন। আশ্চর্য! তাঁর এক প্যাচের শাড়ির আঁচল স্নেহে গেছে। ভারী স্তন বেরিয়ে পড়ছে হাতের নড়ার সঙ্গে। বিকাশের চোখ চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোনও অনুভূতি হচ্ছে না। বিকাশ ভাবছেন, কতদিন তাঁদের শারীরিক মিলন হয়নি। ভাবছেন, তাঁর মধ্যকার পুরুষটা মরে গেছে সম্ভবতঃ। যাক। এখন আর পৌরুষ দিয়ে কী হবে! যখন ইচ্ছে করত, ভেতরটা আছড়াত, লক্ষ্মীর শরীরটা গিঁথে ফেলার জন্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভাস হত, তখন লক্ষ্মী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দরজা বন্ধ করে শুতেন। এখন বিকাশের উদ্ভাদনা শেষ। কিন্তু তা অন্যভাবে জেগে উঠছে। পুত্রের মধ্যে জেগে উঠছে। ঘুমের মধ্যে কথা বলছে শরীর। এ বার দেবশিসের বিয়ে দিতে হবে। বেশ হবে। দেবশিসের বিয়ের কথা ভাবতে বিকাশের ভাল লাগল।

তখন ফটিক বিলের বস্তিতে অন্ধর মা'র রতকথা বলা শেষ হলে অন্ধ হাতের শুড় চাটতে চাটতে বলল— মা!

—কী কইস?

—সন্তোষী মা'র দাঁতগুলান কি পোকায় বাইসে?

—কী মাথা বাওনের কথা কইস? অ্যা?

—কও না! মা! পোকায় ধরসে না? নাইলে সন্তোষী মায় টক খাইব না ক্যান কও! আমাগো তো টক পাইলৈ জিকা আলুস-উলুস করে।



একাডেমিতে আজ নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। ফুটবল। গোটা মাইটা গ্যাংগারি ট্যালারি সমেত, চিংকার-ঠেচামেটি সমেত মঞ্চে নেমে এসেছিল। সব সুন্দার, অভিনা, দর্শন—আমি কিছু ভুলে গেছি। না, ভুলিনি। আমি আসলে কিছু দেখিওনি, শুনিওনি। না না, শুনেছি। একটামাত্র গান। গান নাকি? হ্যাঁ। সুর কপ্রে গাইছিল যখন তখন গানই হবে। অমোখ লাইন একেবারে। লাইন। বাবা কে তোরা, বাবা কে তোরা, বাবা কে তোরা রেফারি? বেজন্মা তুই। বেজন্মা তুই। বেজন্মা তুই রেফারি! অসাধারণ! একেবারে গণসঙ্গীত যাকে বলে।

গণসঙ্গীত! এরকম কুৎসিত নোংরা কথার গান গণসঙ্গীত? কেন নয়? নোংরা আবার কী? জনগণের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। অনুভূতি দিয়ে তৈরি হয়েছে। যুগার সৃষ্টি। গণসঙ্গীত নয় কেন? জন হেনরি, পল রবসন আর হেই সামালো ধান হো না বললে গণসঙ্গীত হবে না? শুধু খাদা, স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি—এ সবই মৌলিক প্রশ্ন? বাবা কে তোরা—এটা কি মৌলিক গণপ্রশ্ন নয়?

হ্যাঁ, ফিরে এসে থেকে আমার মাথায় এই ঘুরছে। বাবা কে তোরা, বাবা কে তোরা, বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই!

বাবা কে আমার? আঁ! কে বাবা? পরেশ বোস। শালা! একটা বাচ্চাও বলবে না পরেশ বোসের সঙ্গে আমার এতটুকু মিল আছে। আমার তো মনে হয় আমাকে অনেকটা অরুণ সেনের মতো দেখতে। অরুণ সেন। আমার প্রকৃত পিতা। জন্মদাতা। হুসু! এই পৃথিবীতে কে কাকে জন্ম দেয়!

দাদাটা মাইরি লাকি। ওকে একেবারে খাটি পরেশ বোসের মতো দেখতে। কোথাও ভেজাল নেই। এমনকী আমি জানি, আর দশ বছর পর ওর মাথাটাও পরেশ বোসের মতো চকচকে হয়ে যাবে। প্রাজ্ঞতার সূর্য উঠবে মাথা জুড়ে রোদুর ঘোষণায়।

অরুণ সেনের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। দেখা হলেই আমি ভাবি, এই লোকটা আমার বাবা! বা-আ বা-আ! বাঃ বাঃ! ব্যা ব্যা! আমার এ সবই বলতে ইচ্ছে করে কারণ লোকটাকে কিছুতেই খাটি বাবা মনে করা যায় না। বরং বলা যেতে পারে ও আমার মায়ের নাগর।

লাগর মোরে খাইল রে  
বাঁশি কে বজাইল রে  
সবী মোরে বাইন্দ্ৰা রাখ  
আমার মন পলাইল রে

যখন ছোট ছিলাম। একটা ভিথিরি হেঁটে গলায় গানটা পেয়ে ভিক্ষে করত।

তো, অরুণ সেন আমার মায়ের নাগর। না। এটাও ঠিক হল না। নাগর শব্দটা এখন আর চলে না। এখন বলে কেণ্ট। রক্ষিতা। ইংরিজিতে বললে বেশ একটা করুণ মর্যাদা পায়। বিষয়টা। হিন্দি ফিলিমে বলে রাখেল। রা-খে-ই-ল। মানে যাকে রাখা হয়েছে। আমার মা অরুণ সেনের রাখেল। অরুণ সেন আমাদের ভর্তা। ওই জামনা পরেশ বোসের প্রভু।

এই পরেশ বোস লোকটাকে আমি বাবা বলে ডাকি। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় ওর পেছনে

একটা লাথি মেরে রেললাইনে ফেলে দিলে কেমন হয়? ওর মাথাটা রেলের চাকায় পিষে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। আর মাথা দিয়ে রক্তের বদলে বেরবে মদ। তাতে কী? আমার মা বিধব। হুই ন্যা। ব্যাসদেব পঞ্চ পাণ্ডবের একজনকেও কুরুক্ষেত্রে মারেননি কেন? কারণ এই হিসেব উনি কিছুতেই ঠাহর করতে পারেননি যে কে মরলে দ্রৌপদী কত বানি বিধবা হবে। তার চেয়ে বেচে থাক বাছারা।

পরেণ বোস লোকটাকে কিন্তু আমি ভালই বানি। হাতদার মোকামের সামনে তিনটি রোঙ্গা ওঠা নেড়িকুত্তা আছে আমি তাদেরও ভালবাসি। আরে পুঁথিবাঁতে ভো এই শব্দটাই সবচেয়ে সুন্দর আর অর্থহীন। বলে দিলেই হল। কঠিন কাজ হল ঘুণা করা। কারণ ঘুণা কখনও আপাতভাবে হয় না। কৃত্রিমও হয় না। ঘুণা সবসময় বিদেশি শাণের মতো বাঁটি। পরেশ বোসকে আমি ঘুণা করি। করুণাও করি। ঘুণা আমি কাকেই-বা করি না? কারণকে ভালবাসতে পারি না আমি। কারণকে বিশ্বাস করতে পারি না। তাই আমার বাঁচতেও ইচ্ছে করে না। এখন আমি মরব বলে পরিকল্পনা করি। রেললাইনে বাই আর মত্নমুখের মতো ভাবি কীভাবে মরব। আমিও শালা ঢামনা কম না। মরার জন্য আবার পরিকল্পনা লাগে নাকি? পরিকল্পনা লাগে বাঁচার জন্য। মরতে ইচ্ছে করলেই মরা যায়। বাঁচার পরিকল্পনা খুবই অনিশ্চিত। ঠিক থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। আমাদের টাইমপিসটার মতো। অ্যালার্মের ব্যাপারে চিরকাল অনিশ্চিত থেকে গেল। কেনওদিন বাজে, কেনওদিন বাজে না। আমরা তাই নিয়েই এত বছর চালিয়ে দিলাম। জীবন অনিশ্চিত। কিন্তু মৃত্যু অমোঘ। শুধু মরলেই হয়। কিন্তু তার আগে, তার আগে.....

কী? তার আগে কী?

তার আগে যথেষ্ট ঘুণা দরকার। আমার ঘোরাব বোলোকলা এখনও পূর্ণ হয়নি। এখনও মাঝে মাঝে আমার মধ্যে অটেল করুণাধারা নেমে আসে। আমি বলি বেচারা অরুণ সেন! বেচারা পরেশ বোস। শবরী বোসের চোখের জলও আমার মাঝে মাঝে মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। সবার জীবনের বঞ্চনা নিয়ে আমি গভীর গবেষণা করি তখন আর গাই—এক বেচারা—আ-আ—আহাঃ।

অরুণ সেন—সম্পদশালী মান্যবর, শুধী, কর্তব্যনিষ্ঠ, মামলাবাজ, ফিকিরবাজ কিন্তু পুরুষ। নিজে পুরুষ বলে বুঝি পৌরুষ আসলে কী ভয়কর। কী ছটফটায়। কী কেলেকারি করে! বিয়ে করার উপায় ছিল না লোকটার। বোন ভেসে যাবে। বোনের ছেলেরা ভেসে যাবে। কিন্তু কোথাও চলেতে ভো হবে। অরুণ সেনের ঢালতে হবে তাই পরেশ বোস শবরী বোসকে বিয়ে করে আনল। আচ্ছা, বাবা কি বিয়ের আগে মাকে শর্ত দিয়েছিল—শোনো, আমিও খাব, অরুণনাও খাবে, তুমি রাজি? না হলে মা'র কোনও প্রতিবাদ নেই কেন?

অদ্বুত পরেশ বোস লোকটা। নিজেকে সারাজীবন মামা দে-র চেয়ে বেশি প্রতিভাবান মনে করে কষ্ট পেয়ে গেল। কবে দু'-চারখানা ছায়াছবির প্রে-বাক করেছিল, তারপর থেকে ভাবতে লাগল, এমন প্রতিভা—লোকে বুঝলই না। পরেশ বোস অকশা গানও লেখে। সুন্দর দেয়। সে-সব গায়ও কেউ কেউ। লোকটা মনে করে সে-সব গানের সুর অসাধারণ। কথা অনবদ্য। কিন্তু আর কারণ তা মনে হয় না। লোকটা যদি ঠিক ঠিক নিজের প্রতিভার সীমা-পরিসীমা বুঝত তা হলে হয়তো আরও কিছু দূর যেতে পারত। অরুণ সেন না থাকলে পরেশ বোসকে ভিক্ষেই করতে হত এখন।

পরেশ বোসের সঙ্গে দীপনদার খুব মিল আছে। পাজার ঠিক মাঝখানটায় দীপনদার বাড়ি। দোতলায় দীপনদারা থাকে আর একতলায় দেবশিসের মা, লক্ষ্মীকাকিমা একটা স্থল করেছে।

ছেটিবেলায় দীপনদাকে হাঁ করে দেখতাম। কী সুন্দর দেবতে ছিল ওকে। বিরাট চাকরি করতেন দীপনদার বাবা। কী চাকরি জানি না তবে গাড়িতে যাওয়া-আসা করতেন আর দীপনদা

খুব ভাল ভাল জামা-কাপড় পরে নায়ক-নায়িকা ভাব করে পাড়ায় ঘুরে বেড়াত। আমি আর দাদা বলাবলি করতাম, বাবা বড়লোক হলে কী মজা না।

দেখো আমার কপাল। আমার বাবাও বড়লোক। কিন্তু ছেলে বলে আমাকে মানতেই চায় না। অতএব আমি নিজে বড়লোক, কিন্তু বড়লোক নই, প্রভু কিন্তু পোষা, দাতা কিন্তু ভিক্ষুক। মাঝে মাঝে হাসি পায়— হা হা হো হো হি হি...। আবার কান্নাও পায়— উঃ উঃ ফিচু ওঃ হো-হো। ধূস। আমার তো বড়লোক বাবা চাই না। আমার দরকার ছিল একটা মাটি বাবা।

দীপনদাকে সবাই বলত সিনেমা করো। নায়ক হিসেবে দারুণ মানাবে। এমনকী উত্তমকুমারের জায়গাটাও তুমি অধিকার করতে পারো। দীপননা বিশ্বাস করল। আর অরুণ সেনকে গিয়ে খরল। কাজলের ছোট পিসি, বুড়িপিসি কলতান আমরা, শ্রোম করত দীপনদার সঙ্গে। সবাই জানত পাড়ায়। দীপনদা সিনেমায় নামবে- নামবে করতেই বুড়িপিসিরও চাল-চলন বদলে গেল। বেশ একটা নায়িকা-নায়িকা ভাব। সুচিহ্না সেনের মতো তাকানো। সন্ধ্যা রায়ের মতো হাসি।

অরুণ সেন দীপনদার বাবাকে চেনেন। দীপনদাও সুন্দর, স্মাট। পয়সার অভাব নেই। ফ্যালনাও নয় আমাদের মতো। অতএব চাপ করে দিলেন একটা ছবিতে। উত্তমকুমার নায়ক। দীপনদার পার্শ্বচরিত্র। তাতেই মোটামুটি পাড়ার উত্তমকুমার হয়ে গেল দীপনদা। এরপর দীপনদার দ্বিতীয় ছবি, কার সঙ্গে মনে নেই, ছবিটা মুক্তি পেল না।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে মানুষের জীবনের এই একটা ভয়ঙ্কর মিল। দুটোই মুক্তির প্রতীক্ষা করে। কী থেকে মুক্তি তা নির্দিষ্ট নয়। শুধু মৃত্যুরই মতো তা অমোঘ হয়ে থেকে যায় মৃত্যু-পরবর্তী অস্তিত্বের জন্য। দীপনদার দুটি সুদৃশ্য অক্ষত ডানা তখনও অক্ষত। এবার তৃতীয় ছবি। তাতে দীপনদা নায়ক। দীপনদা উড়ল। ছবি রূপ করল। এত বড় খরনের রূপ যে ওর ফর্সা রঙ তামাটে হয়ে গেল। চোখের তলায় পাখির নখের অচড়। একটু কুজোও কি হয়ে গেল না দীপনদা?

প্রথম প্রথম ঠটি বজায় রেখেই অরুণ সেনের কাছে বাওয়া-আসা করত। নায়ক হওয়ার জন্য নাকি দীপনদা অনেক টাকা ঢেলেছিল। মানে ছেলের আপ্যানে বাবা ঢেলেছিলেন। ছবি রূপ করায় দ্বিতীয়বার আর তিনি টাকা দিতে রাজি হলেন না। দীপনদা খুব চোঁচামেচি করল। বাড়ি ছেড়ে যাবে, আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখাল। পিতৃহৃদয় গলল না। দীপনদা অরুণ সেনের পায়ে পড়ে আরেকটা সুযোগ চাইল।

অরুণ সেন অষ্টাঙ্গসারশূন্য পরেশ বোসকে পুষেছিলেন। হয়তো প্রথমে অতথানি কাঁপা না ভেবেই পুষেছিলেন। কারণ পরেশ বোস যখন চোখ বন্ধ করে, থেমে থেমে, ভাল ভাল কথা বলে তখনই ওকে একদম পৃথিবীর তিন নম্বর প্রতিভাবান মনে হয়। প্রত্যাশা ও নির্ভরতা জাগিয়ে তোলা আত্মপ্রত্যঙ্গী মুখ। পরে যখন সে-মুখ কাঁপা বেরুল তখনও অরুণ সেনের হাতে দু'খানা তাস। পরেশ বোসের বউ আর বিশ্বস্ত, অনুগত, পোষা কুকুরের মতো পরেশ বোস নিজে। এতদিনে গায়ক, বীতিকার, সুরকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরুণ সেনের মদ্যপানের সঙ্গী ও পার্শ্বচর। লোকটা এত নখদস্তহীন যে অরুণ সেনের সামান্য ক্ষতি করার ক্ষমতাও ওর নেই। লোকটা নিজেই একতথানি বিকিয়েছিল যে আত্মায় বেড়তে গিয়ে অরুণ সেনের ধাব্য বউকে ফেলে আমাদের দু'ভাইকে নিয়ে গিয়েছিল তাজমহল দেখতে। সারাদিন ঘুরল। তারপর বিকেলে বাড়ি ফিরে শুরু করল নটক। বাড়ি কি বলছি, হোটেল। আমাদের তো সবটাই হোটেল। এখন যেখানে থাকি, সেটাও হোটেল। দেখতে অবশ্য বাড়ি। আমার মায়ের নামে বাড়ি। অরুণ সেনেরই দেওয়া নিশ্চয়ই। না হলে পরেশ বোসের ক্ষমতা ছিল নাকি মাথুরের গড়ের মতো জায়গায় দোতলা বাড়ি হাঁকায়। এক কেজি চাল কেনার ক্ষমতা আছে লোকটার? আমার তো মনে হয়, আমি আর দাদা যখন থেকে টাইশন করতে শিখলাম তখনই প্রথম এ বাড়িতে সন্ততার পয়সা এল। নিজের পরিগ্রহের পয়সা।

দাদাটি বেশ আছে। চাকরি আর গান নিয়ে থাকে। প্রেমও করছে একটা। এই যে এত কিছু—  
 বাবার মদ খাওয়া, বদমায়েশি, মায়ের বঞ্চিত সখী সখী ভাব আর অকণ সেনের প্রকাশ্য  
 লাম্পটি—এ সব নিয়ে ও ভাবে না। হয়তো একারণেই যে আমার মতো ওর পিতৃপরিচয় নিয়ে  
 সংশয় নেই। যুস্। কী যা তা বকছি। পিতৃপরিচয় নিয়ে আমারই কি প্রশ্ন আছে নাকি? বিরাট  
 পিতার নগণ্য সন্তান আমি। আমিও শালা চামনা আছি। মায়ের মতো বঞ্চিত সখী সখী ভাবটা  
 আমার মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। দু'একদিনের মধ্যেই বোধহয় গহিতে শুক করব— কেন বঞ্চিত  
 তব চরণে। সবসময় নিজেকে দুঃখের মোড়কে রেখে সেওয়াই আমার চরিত্র হয়ে গেছে এখন।  
 অথচ খাও পিয়ো জিয়ো করতে পারলে দিবা ল্যাটা ঢুকে যেত। কিন্তু আমার দ্বারা কিছুই সম্ভব  
 হল না। একটা প্রেম পর্যন্ত করতে পারিনি এখনও। অথচ আমারই চোখের সামনে অরুণ তুলছে  
 আর ছাড়ে।

প্রেম নাকি জন্মান্তর ঘটাতে পারে। আমার আর বোঝা হল না। জান হতে না হতেই অরুণ  
 সেন, পরেশ বোস আর শবরী বোস আমার অস্থি মজ্জা চিন্তা চেতনা শরীর প্রেম সব শুধে  
 নিয়েছে।

না। ভুল বললাম। শরীর নিতে পারিনি। আমার মধ্যে স্বাধীনভাবে, ওই তিনব্যক্তি  
 নিরপেক্ষভাবে যে বোধ জন্মায় তা শরীরী বোধ। সে-জনাই আমি আজকাল ছন্দা বউদির কাছে  
 যাই। এক চামনার ছেলে আরেক চামনার বউয়ের কাছে যাই। এক খানকির ছেলে আরেক  
 খানকির কাছে যাই। নিতাদা কি বোঝে না, মৌচাক ক্লাবের ফেসব ছেলে ছন্দা বউদির কাছে  
 কাছে ঘুর ঘুর করে তাদের সঙ্গে বউদির কি সম্পর্ক? নিশ্চয়ই বোঝে এবং দেখি না দেখি না  
 করে থাকে। আসলে এখানেই হিসেব আছে। নিতাদা ব্যাঙ্কে চাকরি করে তো। একেবারে পাকা  
 হিসেবি। মৌচাক ক্লাবের প্রচুর কাজকর্ম আছে। অনেক টাকার ব্যাপার। নিতাদার তাই এ ক্লাবের  
 সেক্রেটারিশিপ বজায় রাখা খুবই নরকার। সুতরাং ছন্দা বউদিকে দিয়ে ছেলেগুলোকে হাতে  
 রাখে।

আমি অবশ্য মৌচাকের কেউ না। কিন্তু ছন্দা বউদিদের পাড়ায় আমি সোনালিকে পড়াতে  
 যাই। সোনালি খুব ভাল মেয়ে। বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে ফুলের পাপড়ি রেখে দেয় আর লুকিয়ে  
 লুকিয়ে কবিতা লেখে। একদিন বাংলা খাতার পেছনে একটা কবিতা লিখে রেখেছিল। আমি খুব  
 বকাবকি করেছিলাম— এ সব কী? লেখাপড়ার খাতায় এ সব লেখা কেন? —যেন রাগ করে  
 হাঁড়ে ফেলছি এমন ভাব করে পাতিটা হাঁড়ে ভাঁজ করে পকেটে পুরেছিলাম। আসলে কাবিতাটা  
 ভাল লেগেছিল আমার। আর মনে হয়েছিল ওটা আমার জন্যই। প্রথম দিকটা এরকম—

তুমি কি পুকুর দেখো? সমস্ত পুকুর?

নাকি জল—

তোমার ও দু'টি চোখ আশ্চর্য, অপার অভল

যখন সন্ধ্যা হয়, যখন চিংকার করে পাড়া

কেউ-বা বন্ধু খোঁজে, কেউ বই খোলে, কেউ ফেরে

অকিসের থেকে

আমি একা অপেক্ষায় থাকি। সেবি কে ফিরেছে

তখনও ফিরল না কারা কারা

যেদিন তোমার জন্য বারান্দায় লুকিয়ে দাঁড়াই

জল স্থির, তারাগুলি স্থির, এমনকী বাতাসও কাঁপে না

তুমি ভুল জানালার কাছে যাও। ভুল আঙনের কাছে



আমাকে দেখেও না দেখার ভান করো  
গলা ডিড়ে কণ্ঠটা চেঁচাই কত বলি— যেখানে ওখানে  
পুড়ে যাবে, জ্বাই হয়ে যাবে  
জ্বাইভস্ম বাতাসের আগে আগে ডিড়ে  
পুকুরের জলে মিশে যাবে।

এরপর আরও অনেক আছে। সে-সব লিখে ডায়েরির পাতা নষ্ট। কিন্তু শেরশিক লিখতেই  
হয়—

আমি ভেসে যাচ্ছি জলে  
ভুবে যাচ্ছি এপাড়ার শাওলপুকুরের নীচে  
কলসিতে দড়ি গেঁথে জন্ম জন্ম ধরে।  
ছিন্নভিন্ন হয়ে আছি রাস্তায় রাস্তায়  
একা একা বারান্দায় বসে আছি  
গোপন অপেক্ষা নিয়ে  
কে এল, কে গেল সব মুখস্থ আমার  
সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে বউদি হয়ে আছি  
ঘরে ঘরে মগ বইপোকা  
পড়ুয়া বিনুনি বেঁধে  
ঘরে ঘরে শাপ্ত বউ বরকে জিজ্ঞেস করে  
কী যাবে গো তুমি? কখন কী যাবে?  
ওই বউদি ওই বউ পড়ুয়া মেয়েটা—  
আমি সব হয়ে আছি।  
মাস্টারমশাই! আমাকে এড়িয়ে তুমি কোথায় পালাবে?

কবিতাটা আমি অনেকবার পড়েছিলাম। বহুদিন ওকে পড়াতে এসে আমি দূর থেকে দেখেছি  
বারান্দার আলো নিভিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সোনালি। ওদের বাড়ির আগেই ছন্দা বউদির  
বাড়ি পড়ে। ছন্দাবউদিও আমাকে ঠিক জানালা দিয়ে দেখতে পায়। ডাকে। আমিও জানালার  
কাছে দাঁড়াই। গ্রিলের এপারে আমি। ওপারে ছন্দা বউদি। ছন্দাবউদি ইচ্ছে করেই গ্রিলে শরীর  
চেষ্টে ধরে। আর আমি আঙুল রাখি। খুঁটে দিই। উত্তেজিত হই। তখন সোনালি ঘরে চলে যায়।  
আমি জানি ও বারান্দা থেকে আমাদের কথা বলটা বুঝতে পারে কিন্তু আর কিছু দেখতে পায়  
না। মাঝে মাঝে ও বিষম হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা। একদিন শেলি প্রসঙ্গে ওকে  
বিশ্ভারিতভাবে 'অ্যাডোনিস' পড়াচ্ছিলাম। ও শুনছিল। দেখলাম ওর পলক পড়ছে না।  
বললাম—বলো তো, কী বলছিলাম।

ও চমকে উঠল। মুখ নামিয়ে নিল। স্পষ্ট দেখলাম, লাল হয়ে যাচ্ছে। এটা কি প্রেম? আমার  
প্রতি সোনালির প্রেম? বেচারী! ওর জন্য মায়া হয় আমার। এই বয়সে মেয়েরা খুব  
মাস্টারমশাইয়ের প্রেমে পড়ে। কিন্তু ও তো জানে না, আমার প্রেম-ট্রেন নেই। পৃথিবীর সব  
মহিলাই আমার কাছে শবরী বোস বা ছন্দা মিত্র। সোনালিদের দেবার মতো কোনও জায়গাই  
আমার নেই। সোনালিও কি একদিন শবরী বোস বা ছন্দা মিত্র হয়ে যাবে? আজকের পবিত্র,  
মিষ্টি, লাল হয়ে যাওয়া সোনালি। হয়তো হবে। সবাই তো প্রথমে সোনালিই থাকে। তারপর  
রঙ চটকে যায়। আজ না হোক কাল। আজ সোনালি আমার জন্য কবিতা লিখছে, কাল  
কলেজের কোনও রোমান্টিক অধ্যাপককে নিয়ে লিখবে। মেয়েরা জাতটাই এরকম।

নাঃ। কথটা বলা ঠিক হল না। ছেলেরাই বা কী এমন গল্পাঙ্গল? ক'জন মহৎ পুরুষ আমি দেখেছি জীবনে? অরুণ সেন, পরেশ বোস, দীপনলা— যুঁহ, বিকৃত, লোভা, হতশাঙ্কজর। কিলবিল করছে সবসময়। সর্পজাত সন্তান সব। আমি বলছি, আমিই বা কম কী? অন্যের বউ ধরে টানি না? পাপ পাপ। পাপে ভরে গেছে সব। পৃথিবীটা আর পৃথিবী নেই। লুপ্ত হয়ে গেছে। ঝুঁচরে ভরে গেছে। রুইও নয়। কাংলাও নয়। সব শালা মিলভার কার্প।

কী লিখছিলাম, আর কোথায় এসে পড়লাম। কথা ইচ্ছিল দীপনলা আর পরেশ বোস নিয়ে শুরু করে দিলাম ধান ভানা।

হ্যাঁ, পরেশ বোসকে পোষা প্রয়োজন ছিল অরুণ সেনের। বিশ্বস্ত বুড়ো কুকুর যা নুলো ঘোড়াকেও তো লোকে আজীবন পোষে। সুতরাং পরেশ বোস পারশেষে গেল। কিন্তু দীপনলা পেল না। অরুণ সেন ওর জন্য আর কিছুই করতে চাইলেন না। দীপনলাটা কীরকম এলেবেলে হয়ে গেল। সবাইকেই বলতে লাগল—‘আর একটা সুযোগ যদি পাই, দেবিয়ে দেব।’ সেই দেখিয়ে দেবার সুযোগ আর এল না।

দীপনলার অভিনয় প্রতিভা ছিল না। চর্চা ছিল না। শিক্ষা, প্রশিক্ষা, অধ্যবসায় কিছুই ছিল না। শুধু লোকে দীপনলাকে তুলে দিয়েছিল। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দিয়েছিল। মনে মনে নাফক হতে হতে ও উত্তমকুমারকেই ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করল একদিন। কী আশ্চর্য ইলিউশন। আচ্ছা, ইলিউশনের বাংলা কী হবে? মায়াজালিকা? নাঃ! চলে না কথটা। স্বপ্নমায়া?

যাই হোক, আমি বেশ বুঝতে পারি, আমার চারপাশে সবাই কোনও না কোনও ইলিউশনে ভুগছে। শুধু আমি ভুগছি না। এ পাড়ার ঘুঁটেকুড়ি ফুলরেণু, তারও কিছু কিছু ইলিউশন আছে। আমি ইলিউশনে ভুগছি না কারণ আমি মৃত্যুর জন অপেক্ষা করছি। খোলা আকাশের নীচে চিং হয়ে শুয়ে থাকলেই আমি দেখতে পাই ছোট ছোট কালো কালো বিন্দু অনেক ওপরে ঘুরছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাকসট মারছে। ওরা মৃত্যু। অসংখ্য, অগুণতি মৃত্যু। এই পৃথিবীতে এই একটাই বস্তু যা চাইলেই পাওয়া যায় কিন্তু কেউই চায় না। ধারা চায়, পেতেও যায়। বাকিরা তাদের ভিত্তি বলে। বোকা বলে। বলে জীবন থেকে পালাল। আমি জানি, আমি নিশ্চিত জানি যে ওরা সবাই ওই ভীকতা চায়। ওই পলায়ন। জীবনে কোনও না কোনও দিন ওরা ওই বোকামিই প্রার্থনা করে। হয়তো আমার মতো প্রতিদিন করে না।

সব সতীর বাচ্চাই স্বীকার করবে যে চলে-ফিরে বেড়ালেও তারা আসলে মরে রয়েছে। না, না। গীতার বালী না। এ তো অভিজ্ঞতা। দীপনলার কথাই ধরা যাক। ও যে গ্রুপ নায়ক তা প্রমাণিত হওয়ার কিছুদিন পরই দীপনলার বাবা মরা গেলেন। ইতিমধ্যেই দীপনলার গুরুগুরু উপস্থিতি হারিয়ে গিয়েছিল। শেষ আশ্রয়ের মতো বুড়িপিসিকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল বোধহয়, বুড়িপিসি ঝেঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ঝাড় ঝাওয়া নায়ককে কে আর বুকে টানবে! মেয়েরা যা সেয়ানা। প্রেম করার সময় একেবারে এমন ভাব দেখাবে যেন তোমা কিনা প্রাণ উড়ি যায় হে! কিন্তু গ্রুপ লোককে কিছুতেই বিয়ে করবে না। এ সব কথা এখানে সবাই জানে। সব কথাই সবাই জানে। পরেশ বোসের কথাই কি জানে না? হাকগে, পরেশ বোসের কথা পরে। আগে দীপনলার কথা বলি। বাবা মারা যাবার পর আর বুড়িপিসির বিয়ে হয়ে যাবার পর দীপনলা একেবারে ন্যালাক্যাবলা হয়ে গেল। আস্তে আস্তে লোকের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিল। ঘরকুনো হয়ে গেল। জ্যেষ্ঠিমা যতদিন চলেতে ফিরতে পেরেছেন, ঘরে-বাইরে সামলেছেন। এখন আর দোতলা থেকে নামতে পারেন না। দীপনলা মাঝে মাঝে বাজার করতে বেরোয় আর ব্যাঙে যায়। বিশ্বস্ত সভ্যতার মতো লাগে ওকে এখন। কুঁজো। বিদ্রী। ময়লা। চুল-দাড়ি কাটে না ঠিকমতো। স্নান? বোধহয় করে না রোজ। কিন্তু ঝাওয়া-দাওয়ায় দীপনলার খুব পরিপাটি। নিজেই রাঁধে। লোকে এখন বলে পাগলা দীপু। কেন এরকম হল? ও নিজেকে বোঝেনি। চেনেনি। ও দীপন হতেই চায়নি। দীপনকে যে দীপনই হতে হয় তা শেখেওনি হয়তো। ও

উত্তমকুমার হতে চেয়েছিল বলে কিছুই হল না শেষ পর্যন্ত। ক'জন মানুষই যা স্বয়ং হয়ে উঠতে চায়? ক'জনই—বা জানে সে কী, সে কেন, সে কতখানি।

আমার অবশ্য দীপনদাকে পাগল মনে হয় না। ও যেন খানিকটা স্বেচ্ছানির্বাসিত মানুষ। কারণ দীপনদার সব চেতনা আছে। ঠিক ঠিক বাজার করে। রাখে, খায়—এ সব তেজ আছেই। কিন্তু নিয়মিত ব্যাস্তে যায়। হিসেব করে খরচ করে। ওশে ওশে মাসের ঠিক চার জরিপে লক্ষ্মীকাকিমার কাছে ভাড়া আনতে যায়।

পাগল নয়। দীপনদা আসলে একটা গুটিয়ে-যাওয়া মানুষ বা চুরিতে মাথায়। আমি বলি, মৃত। এই পৃথিবীকে যাদের কিছুই দেবার নেই, তারা মৃত ছাড়া কী? যেমন আমি। যেমন পরেশ বোস। পরেশ বোস—এতগুলো বছর ধরে এই লোকটা একটা কলের শব্দে মতো হাসছে, কাঁদছে। একইভাবে গান গাইবার চেষ্টা করেছে আর খুন বাজাচ্ছে আর মনোপান করে বসছে—এ দেশে প্রতিভার দাম কেউ বুঝল না। প্রতিভার কোনও মূল্য নেই। দীপনদার মতো এই লোকটাও নিজেকে মামা দে-র প্রতিচ্ছবি মনে করে এল। কিংবা সত্যিকারের বলতে গেলে মামা দে-কে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। হ্যাঁ, চেহারায পরেশ বোসকে কিছুটা মামা দে-র মতো দেখায়। আর এ বিষয়ে লোকটা বেশ সতর্ক। কিন্তু দেখায় যেন সতর্ক নয়। ঠিক মামা দে-র মতোই একটা টুপি পরে মাথায়। গানের ভঙ্গি নকল করে। এমনকী গাঁফটাও অবিকল মামা দে-র মতো না রেখে পারে না। কী আশ্চর্য! মনে মনে মামা দে-র প্রতিভা, কণ্ঠ, যশ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে করতে এই লোকটা মামা দে-র অহং পেয়ে গেছে এবং নিজে মরে গেছে। আমাদের চারপাশে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে একজন মৃত মানুষ।.....

আজ পরেশ বোস তাকাতাড়ি ফিরে এসেছেন। এবং মদ খাননি। মুখে স্বীকার করুন বা না করুন, পরেশ বোস নিজের মতো জানেন অনুপমের জন্যই তাঁর বুকের তলায় একটা স্নেহসঞ্চারী নদ লুকিয়ে আছে। বড় ছেলেকে স্পর্শ করলে তাঁর শান্তি লাগে। তিনি বোধেন, বড়পমের কণ্ঠ অতি সম্ভাবনাময়। তাঁর নিজের চেয়েও মধুর ও স্থিত। এতে তাঁর আনন্দ হয়। ঈর্ষাও হয়। কিন্তু এ ঈর্ষা বিষবর্জিত। এ ঈর্ষা আসলে একজন শিল্পীর অসহায় বার্থতা ও অন্য শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধানুভব। এক ধরনের তারিফ। ও পেরেছে। বাঃ ও পারল। সঙ্গে সঙ্গে মনে কষ্ট খেলে যায়—আমি পারিনি। আমি পারলাম না।

সমস্ত গায়ক ও সুরহস্তা পৃথিবীর সমস্ত সার্থক সুরের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন। সমস্ত চিত্রকার—বাবতীয় ছবির মধ্যে বিলিয়ে দেন নিজেকে। পৃথিবীর যে-কোনও কবি-লিখিত কবিতাই অন্য কবিদের নিজস্ব হয়ে যায়। সমস্ত অসামান্য স্থাপত্য দেখে সব স্থপতি মনে মনে সেটি নির্মাণ করেন। পৃথিবীর সব শিল্পীই—দেশকাল নিরপেক্ষভাবে যার যার আরাধ্য শিল্পের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় কোনও না কোনও দিন। এই তাঁর ধর্ম। যখন সে সৃষ্টি দেখে এবং উপলব্ধি করে তখন সেও স্রষ্টার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন আনন্দে ভরপুর। যখন সে সেই সৃষ্টির বাইরে এসে নিজের দিকে তাকায়, নিজেকে দেখে, তখন সে বিরাট-বিশাল নয়, সমস্ত শিল্পের সঙ্গে একাত্ম নয়, তখন সে এক। অসামান্য রচনার ইচ্ছা তখন তাকে তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই সে-ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। প্রেরণা কখনও ব্যাংসপূর্ণ হয় না। শিল্পীর অজস্র প্রতিবন্ধকতার ভিতর অসম্পূর্ণ অসমাপ্ত শিল্প দিনে দিনে গুমরে মরে এবং কোনওদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নিজের মধ্যে নিরন্তর সৃষ্টিকে জাগিয়ে রাখতে পারে যে, সে যুগন্ধর। সে যুগে যুগে সত্ত্বব হয়। যুগে যুগে আসে।

অনুপমের গান শুনলে পরেশের মনে হয়—এ তাঁরই গান। তাঁরই স্বর। এই সবই সে তাঁর থেকেই পেয়েছে। কিন্তু নিজের গভীরে তিনি জানেন, বড়পমকে তিনি কিছুই দেননি। যেভাবে পিতার থেকে পুত্রের চরিত্র প্রবাহিত হয় সেভাবেই অনুপম পরেশের থেকে সংগীত আহরণ

করেছে। পরেশের বীর্বিবাহিত হয়ে শবরীর শরীর মাধ্যমে অনুপমের মস্তিষ্কে। বালু, ওটুকুই। আর কোনও একদিন, অনুপমের ছোটবেলায়, তাকে কাছে বসিয়ে হারমোনিয়মে না গায় মা তিনিয়েছিলেন। ওই একদিনই।

সেবিশিষ্টর মতো দেখতে ছিল অনুপম ছোটবেলায়। সময় সময় পরেশ তাকে গানের চেয়েও বেশি ভালবেসে ফেলতেন।

গানের চেয়ে বেশি? তাঁর সন্দেহ হয়। সংশয় জাগে। নানাবিধ সংশয়। গানের চেয়ে বেশি করে কোনওদিন কিছু ভালবাসতে পারেন তিনি? না। হয়তো—আ গানকেই তিনি ভালবাসেননি কোনওদিন। ভালবাসলে তা সুন্দর হয়। সফল হয়। ভালবাসার নামে তিনি ঈর্ষা করেছেন মাত্র আর গ্রাস করতে চেয়েছেন। বরাবর ভাল গান, ভাল কণ্ঠ, ভাল স্বরায়ত প্রয়োগ ঈর্ষা করেছেন তিনি। যাকে ঈর্ষা করেছেন তাকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেননি। প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের বাসনায় ঈর্ষা ধরার বদলে, সাধনার বদলে নিজেকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছেন। কবে থেকে এরকম স্বপ্নগ্রাসী হয়ে উঠলেন, এখন আর মনেও পড়ে না। গুরুজির কাছে যতদিন ছিলেন ততদিন সাধনা ছাড়া আর স্বপ্ন ছিল না। একদিন অরুণ সেন এলেন। প্রায়ই আসতেন তখন গুরুজির কাছে, নতুন প্রতিভার খোঁজে। একদিন পরশকে বললেন—চমৎকার গলা তোমার। আমার ছবিতে গ্লে-ব্যাক করো। মাঝে মাঝে একেবারে মামা দে-র মতো লাগছে।

মামা দে-র মতো! সত্যি? মামা দে-র মতো! পরেশ কি জানতেন না? জানতেন। এর আগেও অনেকের কাছে শুনেছেন—একেবারে মামা দে-র মতো। মামা দে তখন ক্রমশ উদ্ভাসিত হচ্ছেন। তাই যত শুনেছেন তত বেশি করে পরেশ বোস না হয়ে মামা দে হওয়ার চেষ্টা করে গেছেন তিনি। মনে হয়েছিল, একটিমাত্র সুযোগ পেলেই মামা দে-কে ছাড়িয়ে যাবেন। তখন জনমানসে মেরুকরণ শুরু হয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, না মামা দে? তিনি স্বপ্ন দেখলেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, না পরেশ বোস?

অরুণ সেনের প্রস্তাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। গুরুর অনুমতি ছিল না। কিন্তু গুরুর কাছে যাওয়া বন্ধ করলেন। বয়সে মামা দে-র সঙ্গে খুব পার্থক্য ছিল না। সেটিও আরও বেশি করে ঈর্ষা জাগাল। গাইলেন জীবনের প্রথম গ্লে-ব্যাক। চারখানা গান। ছবিটি চলল না। গানগুলো নিয়েও কোনও হৈ চৈ হল না। শুধু পরেশ বোসের কানে ওই গানের কথা ও সুর, কণ্ঠ ও গায়কী এত মধুর লাগল যে সেই মধুরিমায তিনি বধির হয়ে গেলেন। জানলেন না, তাঁর কণ্ঠে এখনও পূর্ণ নৈপুণ্য আসেনি, সুরসমৃদ্ধ হয়নি, মায়া জাপেনি। বুঝলেন না যে প্রতিভা নিয়ে মামা দে জন্মেছিলেন সে প্রতিভা তাঁর নেই। তাঁর সব অপূর্ণতা যন্ত্রে ধরা পড়ল, সমঝদারের কানে ধরা পড়ল এবং সাধারণ শ্রোতার বুকে কোনও প্রত্যাশা জাগাল না। তিনি নিজেকে মহান করে মামা দে-কে দুখলেন, দুর্ভাগ্যকে দুখলেন এবং টিকে থাকার জন্য অরুণ সেনের পিঠে কামড়ে বুকে পড়লেন।

অনেক দিয়েছেন অরুণ সেন পরেশকে। তিনি ছিলেন তাই পরেশ ভাত পেয়েছেন। তিনি ছিলেন তাই পরেশ যেটুকু হোক স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর জন্যই পরেশ বোসকে সারা জীবনে এক বোতল মদও কিনতে হয়নি। বউ ছেলে নিয়ে পরেশ বোস একজন সফল সংসারী। মাথুরের গড়ে তাঁর দোতলা বাড়ি। তাঁর ছেলেরা শিক্ষিত এবং প্রায় প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী এখনও সুন্দরী। এ সমস্ত সাফল্যই ঘটিয়েছেন অরুণ সেন। পরেশ বোসের জীবনে তিনিই একমাত্র নরাজ ঈশ্বর। এ জন্য তাঁর কোনও ক্ষুণ্ণতাবোধ নেই। তিনি আজও বিশ্বাস করেন, তাঁর দূরন্ত প্রতিভা ছিল। আর প্রতিভাকে লালন-পালন করতে হয়। প্রতিভাহীন কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সফল মানুষেরা যুগে যুগেই প্রতিভাধরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে। শুধু ছোটপেমের দিকে তাকালে পরেশের জ্বালা ধরে যায়। সব প্রাপ্তি অর্থহীন লাগে। সেবোপম শাস্ত। গভীর। কথাবার্তা যা-কিছু সে অনুপমের সঙ্গেই বলে।

আর মাঝে মাঝে শব্দী ও পরেশের দিকে তীব্র চোখে তাকায়। সেই দুটি দেখলে পরেশের মাঝে মাঝে ওর টুটি হিড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

সন্ধে থেকে লোডশেডিং চলছে আজ। আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। শহরে বন্য এসে গেছে। অন্যান্যবারের মতোই খাল উপছে ভাসছে ভক্তিক বিল বস্তি। বাজারে আনানোর নাম চলা। এই বৃষ্টিতেও লোকে নির্বাচনের মিছিল করছে। কেউ পরিবর্তন চায়। অন্য হাঙ্গা মুঠো শক্ত করে প্রকাশ করছে রাগ, রোষ, আকাঙ্ক্ষা। কেউ পরিবর্তন চাইছে না। বড়বিড় মন্থন সুবিধার প্রতিশ্রুতি সমেত তারা বোকাতে চাইছে স্থিতিবস্থাই কাম্য। একই দেশ, একই নগর, একই ভূমি কিন্তু স্বার্থগুলি একাকার হতে পারছে না কিছুতেই। কোনওমতেই বলা যাচ্ছে না এতে আমাদের সবার ভাল। কীসে কতখানি ভাল বুঝতে না বুঝতেই দুটি মিছিল মুহোমুহি হবে। লড়াই বাণীবো। ভাল চাওয়ার আগে সব শেষ হয়ে যাবে। কেউ কেউ ভাল-মন্দ ঠিক-ভুল বোঝার আগেই মরে যাবে। যারা বেঁচে থাকবে, অহত বা সুস্থ, তারা বাড়ি ফিরে যাবে, ঘুমোবে, খাবে, বিয়ে করবে এবং পাশের বাড়ির বাচ্চার সঙ্গে মারামারি খুনোখুনি করার জন্য এ বাড়িতে একটা বাচ্চার জন্ম নেবে।

এ সবই অতি স্বাভাবিক গতি ও ছন্দ। কোথাও না-কোথাও তা বজায় থাকে। এ পাড়ার জন্য ও পাড়া স্তম্ভ হয় না। এ গাঁয়ের জন্য ওই গাঁ তাঁদে না। একটা দেশ ধ্বংস হলে অন্য দেশ রাত্রি জোগে উৎসব জমায়। এই ভোটের মরসুমেও এই পারস্পরিক লড়াই এবং অস্থিরতা, বহুপক্ষীয় অনিশ্চয়তাও বটে, যখন কারও কারও মনে পড়ছে সেইসব তরুণদের কথা যারা পরিবর্তন চেয়েছিল আর মরেছিল গুলি খেয়ে, ছুরিতে বিদ্ধ হয়ে। জেলের মছোকার নিজস্ব নিপীড়ন প্রক্রিয়ায় তারা কেউ মরেছিল, কেউ মরেনি, হারিয়ে গেছে, পসু হয়ে গেছে, পাগলও অনেক—এ সবেবর জন্য কে দায়ী, কে নয়, কারওকে ঘৃণা করা হবে কি না, কেউ অভিযুক্ত হবে কি না ঠিক হতে না হতে মার-মার কাটি-কাটি ভেটি এসে গেল। রাষ্ট্রযন্ত্র থেমে থাকল না। ভাবতে ভাবতে প্রত্যেকেই নিজেকে প্রত্যুত্ত করল ভোটাভুটির জন্য। হয়তো-বা কয়েকজন মা ছাড়া—যাদের ছেলে মরে গেছে, কয়েকজন ভাই ছাড়া—যাদের ভাই মরে গেছে, কয়েকজন পিতা ছাড়া—যাদের কন্যা নৃশংস ও নোংরাভাবে নির্যাতিত—তেননি কয়েকজন, যাঁরা সংকল্প করেছেন, ভোট দেবেন না, বাকিরা প্রত্যুত্ত। কে গেল কে এল কিছু যায় আসে না। তারা বেঁচে আছেন—এ পর্যন্তই। এর চেয়ে ভাল থাকার কথা সবাই ভুলে গেছে। এর থেকে মন্দ থাকা যায় কি না তারা জানে না। এমন সব নিবিচার ও নিবিরোধী মানুষ। এই নিয়ে পৃথিবী ঘুরছে। মানুষ নিজের অজান্তে জন্মায়, বিবাহ করে, মরে যায়। ভোট দেয়। অজান্তে ভবিষ্যৎ প্রবাহ নির্বাচন করে। কেউ মরল। কেউ বাঁচল। কারও গায়ে আঁচড়টিও লাগল না।

যেমন পরেশ বোস। যেমন তাঁর পরের ঘাড কামড়ে জীবন অতিবাহিত করা। কোনও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে তাঁর কিছু এসে যায় না। আজ তিনি তাড়াহাড়া ফিরে এসেছেন কারণ সকালে অনুপম বলেছিল, ছারুরি কথা আছে। বলেছে যখন, আছে নিশ্চয়ই। কারণ এ বাড়িতে নোটস দিয়ে ঘাটে এমন ঘটনা বিরল। বছরে এক-আধ দিন, এক-আধ বার, এ পরিবার এক আদর্শ পরিবার হয়ে উঠতে চায়। চারজন একসঙ্গে খেতে বসে। কোনও তর্ক-বিতর্ক স্বগড়া-খাটি করে না। সুস্থ ও প্রশান্ত মস্তিষ্কে কোনও একটি সমস্যা নিয়ে ভাবে, মতামত দেয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়। আজ সেরকমই একটি দিন। শব্দী আজ পাঞ্জাবি পরোটা করেছেন সবার জন্য। সঙ্গে কচা মাংস। পরোটা ও মাংসের সৃষ্টি সাগর পরিবারের সুখী পারিবারিক বাতাবরণ।

পরেশ সন্ধেবেলা জান করে সাদা পাঞ্জাবি চাপিয়ে ঘাড়ে-গলায় পাউডার মেখেছেন। শব্দী আজ সাদাসিধে। পরোটা ও মাংস রান্না করতে গিয়ে পরিপাটি চুল বাঁধেননি। চোখে কাজল পরেননি। অনুপম হারমোনিয়ম নিয়ে বসেছে। এ হারমোনিয়ম তার নিজের। পরেশের মনে পড়ছে। তাকে না বলে হারমোনিয়মে হাত দিয়েছিল বলে অনুপমকে তিনি বেণ্ট দিয়ে



মেরেছিলেন। সারা পায়ে মাগ পড়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন পর অনুপমকে একটি ছোট হারমোনিয়ম উপহার দিয়েছিলেন অরুণ সেন। পরেশের হারমোনিয়মে অনুপম আর কখনও হাত দেয়নি। ওই ছোট হারমোনিয়মেই গান গেয়েছে এককাল। চাকরি পেয়ে সম্প্রতি এই হারমোনিয়মটি কিনেছে। বেশ ভাল জিনিস। বেশ কয়েকবার এটি বাড়িয়ে গাইতে ইচ্ছে করেছে পরেশের। পারেননি। পিতা-পুত্র একই সঙ্গে গান গাইছেন এ দৃশ্য এ পরিবারে বিরল। কিন্তু গাওয়া হলে পরেশ নিজের হারমোনিয়মে বসেন, অনুপম তারিফে। অনুপমও কোনদিন তার হারমোনিয়ম পরেশকে বাজাতে বলেনি। সে রোজ কোরে সংগীত অভ্যাস করে। তখন তানপুরা নেয়। তানপুরায় সুর সাধতে এখনও তার স্বর কাপে করণ এক বছর আগেও এ বাড়িতে তানপুরা ছিল না। পরেশ শুনেছেন, প্রথম তিন মাস অনুপম ভোরে শুধু সা বলা অভ্যাস করেছিল। পরেশের মনে পড়েছে, গুরুজি বলতেন—সা বোল বেটা। পহিলে সা লাগা। যে ঠিকসে সা বোলতা হয় ও ঠিকসে সব বোলেগা।

সা বলা শেষ হল না। পরেশ রে গা মা পা গাইতে লাগলেন। আজকাল অনুপমের সুর শুনে নিজের সমস্ত দম্প খাটিয়ে একটি আশ্বকরুণা জন্ম নেয় পরেশের। সা বলা হল না। যথাযথ অভ্যাস করা হল না। কিছুই হল না তেমন।

অনুপম গাইছিল না। আপন মনে সুর বাজাচ্ছিল। সে কিছুটা অনামনস্ব। কিছুটা উদ্বিগ্ন। আজ সে সকাল থেকে বলে রেখেছে বলেই বাড়িতে একটি শাস্ত্র আবহ আছে। তার কপাল ভাল। থাকবেই যে তার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু আছে বলে তার ভাল লাগছে। যেন-বা তারা একটি অন্য বাড়িতে এসে পড়েছে। এ বাড়ির চরিত্রগুলো তাদেরই মতো দেখতে কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্যাস্টে গেছে আমূল। সে মনে মনে তার কথা সাজিয়ে নিচ্ছে। কেমন করে বলা যায়। দেবোপম জানে, কী বলা হবে। তার কোনও উদ্বেগ নেই। সে এখন একটি বই পড়ছে। বই না বলে একটি ছোট পুস্তিকা বলা যায়। ইসলামি তত্ত্বের সঙ্গে হিন্দুবাদ ও খ্রিস্টধর্মের মিল খোঁজা হয়েছে এতে। পুস্তিকাটি আনিসুজ্জামানের লেখা। দেবোপম মাঝে মাঝে আনিসুজ্জামানের কাছে যায়। বই পড়ে। নানা রকম আলোচনা করে। তার ভাল লাগে মানুষটিকে। কিন্তু অনুপম তাঁকে পছন্দ করে না। তার মনে হয় আনিসুজ্জামান বড় বেশি ভারসাম্য রেখে চলেন, বড় বেশি ভদ্র ও যথাযথ। কোনও কথা অকারণে বলেন না। বাড়তি বলেন না। কারও কাছে বিনা প্রয়োজনে যান না। তাঁর কোনও কিছু সম্পর্কেই কোনও অভিযোগ তোলা চলে না। সে একদিন দেবোপমকে জিজ্ঞেস করেছিল—ওখানে যে যাস, ভাল লাগে লোকটাকে? দেবোপম বলেছিল—অনেকক্ষণ কথা বলা যায়।

অনুপম অবাক হয়েছিল। তার এতদিন ধারণা ছিল তার ও অরুণের সঙ্গে ছাড়া দেবোপম কারও সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে না। অরুণও বেধে হয় এ দলে পড়ছে না আজকাল। কিন্তু আনিসুজ্জামান কখন ঢুকে গেলেন! অনুপমের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গলা জড়িয়ে শিবের গাজন গাইবার অন্তরঙ্গতা হারিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে। কে কখন মাঝখানে ঢুকে পড়ছে কেউ জানে না। ইতিমধ্যেই পুণ্য ঢুকেছে। আনিসুজ্জামান ঢুকেছেন। ছন্দা বউদিও ঢুকেছে। আরও কেউ ঢুকেছে কি না কে জানে। অনুপম নিজেরও এর জন্য কম দায়ী নয়। আর, হয়তো এরকমই হওয়ার কথা। এই-ই জীবনের নিয়ম। ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ঢুকে পড়ে বহু অজানিত সম্পর্ক, আর সেগুলি কাছিত ছিল কি না বোঝার আগেই স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। দু'টি চেনা মানুষকে ক্রমে অচেনা করে দিতে থাকে।

বাড়ির দায়িত্বশীল কর্তার মতো মুখ করে বিছানায় উঠে দুই ছেলের মাঝমাঝি বসলেন পরেশ। তাঁর সংসারে আসনাবপত্র কম। একতলায় একটি খাট ও ছড়ানো চেয়ার-টেবিল। একটি বাথরুম। সে-অর্ধে একতলায় একটিই ঘর বলতে হবে। মাঝে মাঝে বড় ধরনের অজো বা আসর সেখানে বসানো হয়। কোনও কোনও লোকের ক্ষেত্রে অরুণ সেন নিজের বাড়িতে



আজ্ঞা জমাতে চান না। তখন পরেশের একতলা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ-ও দিক সে পরেশের একতলায় অরুণ সেন কখনও পানের আসর বসাননি। এ বিষয়ে শব্দীর কোনও নিবেদন বা আপত্তি থাকলেও থাকতে পারে যদিও তিনি মাঝে মাঝে পান করতে আসত।

পরেশ লক্ষ করেছেন, বিশেষতঃ সুরকার তিমির সেনগুপ্তকে অরুণ সেন স্বপ্নেই নিতে চান না। পরেশের কানে এসেছে, অরুণ সেনের খিঁচবা বোন অন্নপূর্ণা প্রেমে পাগেছিলেন তিমির। বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। অন্নপূর্ণার কী মত ছিল জানা যায়নি। কিন্তু অরুণ সেন তা ঘটতে দেননি। পাঁচ বছর আগে তিমির সেনগুপ্তর ছেলে পুলিশের অফিসে নারা যায়। পুলিশ না শুভ্র না অন্য পার্টির লোক তা জানা যায়নি। বাড়ির দরজাঘর আর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ এনে ফেল রেখেছিল কেউ। ছেলেটি নকশাল করত। তিমিরের কী প্রথম ছেলেকে ওভাবে শায়িত দেখতে পান। প্রথমে বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর; তারপর কথা ফিরে পান কিন্তু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তিমির সুরকে আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রীর আর অন্য অবলম্বন ছিল না। ইতিমধ্যে তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন তিনি। এখনও নাকি সারাদিন পরিকল্পনা করেন—কীভাবে মরা যায়। মাঝে মাঝে খুব শান্ত ও স্বাভাবিকভাবে বলেন—বুকে, ভাবছিলাম ঘ্যান বা কড়িকাঠ থেকে হবে না। ভেঙে পড়তে পারে। পার্কের কুঞ্জচূড়া গাছটা কেমন হয়?

তিমির কোনওদিন বেশি দেরি করে ফিরলে বলেন—আর একটু দেরি করলে না কেন, প্রায় ঠিক করে ফেলছিলাম।

সুর ছিল না। কথা ছিল না। শুধু ছেলে ছিল। স্বামীকে সুরের কাছে যেতে দিয়ে জীবনধারণের জন্য আশ্রয় জড়িয়েছিলেন ছেলেকে। সেই ছেলে অনেক বড় জীবনের জন্য, আরও অমোঘ মায়ের জন্য সব ছেড়ে চলে গেল। আর তিমিরের স্ত্রী মৃত্যু আঁকড়ালেন।

আর তিমির সেনগুপ্ত হারমেনিয়াম বাজাতে বাজাতে, সুর তৈরি করতে করতে মাঝে মাঝে বলে ফেলেন—‘জল আসছে, চোখে জল আসছে। কোনও নতুন সুর বাজলেই ছেলের মুখ মনে পড়ে যায় আমার। তোমরা কিছু মনে কোরো না ভাই।’ কেউ কিছু মনে করে না। কেন করবে? ঘরে ঘরে এইরকম উদ্ভাদ, অর্ধ-উদ্ভাদ, শোকসন্তপ্ত বাবা-মা হাতোকেই দেখছে কমবেশি। ককবাকে তাজা সব ছেলেদের মৃত মুখ। রক্তাক্ত শরীর। মসৃণ ও উদ্ভাসিত মেয়েদের ধর্ষিত মুহূর্তে কষ্টহেঁড়া চিৎকার, পোড়া মাগ গায়ে—সকলেই সহ্য করে যাচ্ছে, কতকাল, কতদিন। হয়তো তিমির সেনগুপ্ত একা বহুজনেরই হয়ে কাদছেন। কাদেন দিনের পর দিন। আর সেই চিঠিটার কথা বলে যান।

—জানো, সে কী লিখেছিল জানো? লিখেছিল—ভেবো না আমার জন্য। আমি ঠিক আছি। কোথায় কোথায় ঘুরত। ঠিকমতো খেতো না, ঘুমত না—তবু বলত, ভেবো না, ভাল আছি। ঠিক আছি।

—‘চিঠি নিয়েছিল বুঝি?’ জিজ্ঞাসা করে কেউ।

—কোথা থেকে দিয়েছিল? বাড়িতে কী একেবারে থাকত না?

তিমির সেনগুপ্ত তখন বাথিংট দুই চোখ ভোলেন। বলেন—না। সে চলে গিয়েছিল। জানত তো, মরে যাবে। মেরে ফেলা হবে ওকে। আজ নয় কাল। ওর বন্ধুদের মতো। কিংবা সহ বোদ্ধাদের মতো। ও তো বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, যুদ্ধ করছে সবাই। তাই লিখেছিল—ভেবো না আমার জন্য। ভেবে কোনও লাভ নেই। বরং দুঃখ যদি একটু কমাতে চাও মাগো, তবে ওদের জন্যও ভাবো। যাদের কিছুই নেই। জীবন না। সম্মান না। ঘর না। বাড়ি না। শুধু কষ্ট। শুধু একজন মানুষের মতো বেঁচে থাকবার জন্য খালি গায়ে, খালি পায়ে থেকে ওরা শেষে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। না হলে অস্ত্র তুলতে আর কে চায় না? সবাই শান্তিই তো চায়। সুস্থ জীবন চায়। মা, ভাবো, আমার মতো আরও শত শত ছেলেদের কথা—যারা জানে—মানুষের জন্য, দম্ভ, পিষ্ট,

অবহেলিত ওই মানুষগুলির জন্য তাদেরও অস্ত্র শস্তাই হবে। যুদ্ধ করতাই হবে। এবং হয়তো মরতে হবে। মা—আমাকে একা ভেবো না। আমি ওদেরই একজন। ওই সব সাহসী যোদ্ধাদের একজন। দেখবে তোমার আর কষ্ট নেই। জানবে, আমাদের সবার তোমার বুকে টুকরে যেতে ইচ্ছে করে মা আমার। এরকম ভেবো, দেখবে, তুমিও একজন যোদ্ধা হয়ে যোদ্ধা বীর বোদ্ধা। আমার বীরাসনা মা—আমার হাতেই অস্ত্র দিয়ে বলছি—যা খোঁকা, যুদ্ধ কর। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যেন না থামে এ লড়াই।

মা, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়েছে এই অপূর্ব যুদ্ধের গান। দেখো, আর কষ্ট থাকবে না মানুষের। এই অন্ধকার অবসিত হবে। আসিবে নতুন যুগ। মানুষ নতুন করে ভাবতে শিখবে। নতুন জীবনযাপন করতে শিখবে। সবজ দেশের প্রতিটি শোহিত অবহেলিত যুগ্ম মানুষই আজ জেগে উঠেছে। এই এশিয়াকে দেখো, আফ্রিকাকে দেখো, ল্যাটিন আমেরিকার দিকে তাকাও, মা, দেখতে পাচ্ছ না? সবস্ত্র শাস্ত্র অচেতন মানুষের জাগরণ ঘটেছে না। এতদিন যারা মুখ বুজে শুধু পরিশ্রম করে গেছে, শুধু রক্ত, ঘাম আর শ্রম দিয়ে গেছে, প্রাণ দিয়েছে দিনের পর দিন—বিনিময়ে কিছু চায়নি, এমনকী জানতেও চায়নি তাদের মানুষ বলা হল কি না—তারা আজ হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছে। শক্ত মুঠি তুলে ধরেছে আকাশে। সবাই ত্রো যুদ্ধ করছে মাগো! এ দেশের সমস্ত নিরস্ত্র মানুষ আজ যুদ্ধে গেছে। দেখো খ্রীকাকুলাম, দেখো গোগিবল্লভপুর, দেখো বহরাগোড়া। একটু, সামান্য আগুন, মা—দেখো নকশালবাড়ির ওই স্কুলিঙ্গ সারা দেশে ধু ধু আগুন ছোলে দিল। ওই আগুনে আমরা সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুড়িয়ে দেব। সমস্ত কুটিল জোতদার আর অর্থলোলুপ ওই মালিককে, যারা এতদিন গরিবের রক্ত শোষণ করেছে আর নিজেরা ঐশ্বর্য্যে বসে এই দুনিয়াকে ভোগ করেছে, আমরা তাদের বেঁচে থাকতে দেব না। ঢাকা ঘুরে গেছে। পৃথিবী ঘুরছে। পরিবর্তনের দামাশ হাওয়া লেগেছে পালে। এই পরিবর্তনকে আমরা আরও দ্রুত ও অবশ্যজারী করে তুলবই। আমি খুবই গর্বিত মা, আমিও এ পৃথিবীর অন্যতম যোদ্ধাদের একজন। একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ব বলে, মা, প্রিয় মা আমার, চলে এসেছি তোমার কোল ছেড়ে। কিন্তু তুমি যেন কেঁদো না আমার জন্য। সোলা মা আমার। দক্ষী মা। আমি আজ বেঁচে আছি। হয়তো ফাল বেঁচে থাকব। পরশুও। হয়তো বেঁচেই থাকব মা, যতদিন না যুদ্ধের শেষটা দেখতে পাই।

ইতি—তোমার মানব

মানব, তিমির সেনগুপ্তর ছেলে, যে-দিন চিঠিটা লিখেছিল তার তিনদিন পর সে মারা যায়। তার মৃত্যুর পর চিঠিখানা হাতে পেরেছিলেন তিমির। যুদ্ধের শেষ দেখা পর্যন্ত বাঁচেনি মানব। হয়তো তা সম্ভবও ছিল না। কারণ কেউই বলতে পারে না যুদ্ধ আসে! থেমেছে কি না। আপাত শীতল পরিস্থিতির তলায় তলায় আগুন ঘনিয়ো উঠেছে কি না। কারণ সত্যিই কেউ শান্তিতে নেই। সুখে নেই। সকলেই কি আর দুখে-ভাতে আছে গো? সুখে-দুখে শিক্ষায় সংগীতে আছে? সকলেরই কি কষ্ট ছেঁড়ে স্বাধীন চিংকারে? ওই যে অন্ধর মা, পাঁচবাড়ি টিকে কাজ করে যায়—বস্তিতে উপচে ওঠা কাদাজলে থেকে থেকে হাতেপায়ে ঘা ধরে গেল, তবু কাজের বিরাম নেই, ও ভাল আছে? ওরা?

তিমির শোনান। মানবের চিঠি তিনি বার বার শোনান। আর সুর দেন। প্রেমের সংগীতে। বিরহ মিলনের গানে। বেশির ভাগ গানই তো ওই। কী মধুর ছোঁয়া। চোখে চোখে চাওয়া। কী মধুর হাসি। কত ভালবাসি। ভালবাসার হেঁদো কথায় সুর মেলাতো শস্তা শিল্পের শস্তা বিনোদন।

পরেশ দেখেন, তিমিরের ফর্সা মুখে চোখের তলার অংশে অন্ধকার। পুত্রশোক কালি লেপে দিয়ে গেছে। পরেশের মাঝে মাঝে মনে হয় পুত্রশোক না পাওয়া কত আনন্দের। ছেলে বেঁচে আছে, সুস্থ আছে, এটুকু দেখা কত আনন্দের। তার ইচ্ছে করে, বাকি জীবন যদি শুধু ছেলের টাটকা সন্তোজ মুখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যেত! মদে নয়, ঈর্ষায় নয়, হতাশায় নয়—

শুধু ছেলে নিয়ে বাঁচা। ইচ্ছে করে তাঁর—বড়পমের খাদ্যনুষ্টি ছুরে খাবারেন, ওর বুকের পুস্তখালি রোম ঢাকবার জন্য রঙিন পাঞ্জাবি কিনে আনবেন। তখনই ছোটপমের দিকে চোখ যায়। আর সব এলোমেলো হয়ে যায়। সমস্ত স্বপ্ন পতিত হয়। সমস্ত ইচ্ছের মুক্তা ঘটে। পরেশ তখন আবার মদ খান। আবার স্বর্বা করেন, আবার যন্ত্রণায় বিভ্র হতে হতে অরণ্য সেতোর সঙ্গে জীবনে আশে গ্রহণ করেন।

আজ পরেশ চমৎকার আছেন। অনুপমকে বলছেন—শোনা, সেই খানটা শোনা।

—কোনটা?

—সেই যে—দেয়া ডাকে গুরু গুরু কী কথা বলে।

—আজ হবে না বাবা।

—কেন। হবে না কেন। লাগা। সুর লাগা।

অবিকল গুরুজির ভঙ্গিতে বলছেন পরেশ। লাগা। সুর লাগা। সা লাগা। সা বোল বেটা। সা বোল। কিন্তু অনুপম পারছে না। সুর লাগছে না গল্লায়। শুধু দেবোপম জানে। দাদার পল্লভে আজ কথা অটিকে গেছে। সে হাসছে। তার বিরল হাসি সে হেসে নিচ্ছে মুখে বই চাপা দিয়ে। শবরী এসে দাঁড়িয়েছেন। হাত মুছছেন আঁচলে। বলছেন—বড়পম, বাবা বলছে, গা না।

ঘন ঘন মেঘ ডাকল বাইরে। তুমুল বিদ্যুৎ চমক মারল। কেউ বুঝি কোথাও বলল ধান মেপে দেবে আর তাই বেঁধে বৃষ্টি নামল। দেবোপম উঠে বসল। অনুপমের কাছ থেকে টেনে নিল হারমোনিয়াম। ধরল—

সঘন ঘন ছাইল পগন খনাইয়া,

স্তিমিত দশ দিশি

স্তম্বিত কানন

সব চরাচর আকুল—

কী হবে কে জানে।

প্রাণ দিয়েছে গানে আজ দেবোপম। যেন বৃষ্টি মেঘ বর্ষা ছিটকে ছিটকে উঠছে ঘরে। পরেশ তবলা পাড়ছেন। খাটি শিল্পীর মতো ভাল গানের কদর দিতে ঠেকা দিচ্ছেন। তাল পড়ছে। বর্ষায় একটু বসে আছে তবলা কিন্তু হাতুড়ি পেটার সময় নেই। শবরী পাউডার এগিয়ে দিচ্ছেন পরেশের হাতে। দেবোপম কি আজ ভাল আছে? কেন আছে? ভাবছে অনুপম। কবে ও ভাল থাকে? কীসে থাকে? যদি জানা যেত। ভারতে ভাবতে গলা মেলাচ্ছে সে...

শবরী দেওয়ালে টাঙানো রবিঠাকুরের ছবির দিকে তাকাচ্ছেন। কী আসামান্য সৃষ্টি মানুষটার। ভাবছেন তিনি। সুর জড়িয়েছে তাঁকেও। তিনি ধরছেন—

ঘোরা রজনী

দিকললনা ভয়া বিভলা।

চমকে চমকে সহসা দিক উজলি

চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী

পরেশের গাঢ় গভীর গলা জুড়ছে এবার। বাদল বাতাস ঝাপট মারছে ঘরে। মোমের আলো কাঁপছে। কাঁপুক। আজ ল্যাম্প জ্বালা আছে। কাঁপে কাঁপুক। নেতে নিভুক। পরেশ সম স্বর ধরছেন—

...সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ,

কত কত বাজ ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবতার মতো আলো দিয়েছেন, ঈশ্বরের মতো আনন্দ। প্রকৃতিকে গানে ধরেছেন আর গান প্রাণ ভরিয়ে সুন্দর করেছে পরেশ বোসের পরিবারকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য গোটা পরিবার পৃথিবীর সেরা সুখী ও আদর্শ পরিবার হয়ে বলমল করেছে। আজকের দিন যেন

অন্য বই থেকে হিঁড়ে আনা পাতা জুড়ে দেওয়া। কিংবা আজ প্রত্যেকে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বৃষ্টি ছাপিয়ে সমবেত সংগীত পৌছে যাচ্ছে পাতায় পাতায়। স্রোতের অবাধ হয়ে স্নানছে। গালাগালি নয়, চিৎকার নয়, মদে জড়ানো কণ্ঠ ও স্রোতারোপ নয়—পারেশবাবুর বাড়ি থেকে ভেসে আসছে গান। যৌথ সংগীত। পড়ার স্রোতে বসাবলি চলাচ্ছে—ওরা নিজেরা গাইছে। নিজেরা। ওরা গায়। ওরা সবাই গায়।

শবরী বসে পড়েছেন খাটের একধারে। বলছেন—ছোটপম। কী সুন্দর গান তুই! কত বললাম, দাদার সঙ্গে গিয়ে তুইও শেখ। কিছুতেই কথা শুনলি না।

দেবোপম বলছে—ভাগ্যিস শিখিনি। দাদা কি তা হলে শাড়া পেত।

সকলে হাসছে। একসঙ্গে হাসছে। আজ যেন খটি, বিজ্ঞান, দেওয়ান, প্রানমারি—সব হাসছে। শবরী বলছেন—গা ধুয়ে আসি। তারপর খেতে সেব।

পারেশ বলছেন—কী বই পড়ছিলিস রে ছোটপম।

অনুপমকে কেউ বলছে না, কী বলবি বল, কথা শুভ্র কর। এ বাড়িতে সবাই এমন। অিডেস করবে না যতক্ষণ যে-যার কথা নিজে থেকে না বলে। অনুপম বলেছে তার কথা আছে, সেই শুভ্র করবে। দেবোপম হারমোনিয়ম ছেড়ে আবার বই তুলেছে। অল্প আলোয় পড়তে কষ্ট হচ্ছে। তবু পড়ছে। অনুপম তবলা তুলে রাখছে। এ বার হারমোনিয়ম তুলবে। পারেশ আবার বলছেন—কী বই বে ছোটপম?

দেবোপম বলছে—অদ্ভুত বই। অদ্ভুত সব কথা লেখা।

—কী লেখা?

—লেখা—সব প্রাণীই জন্মেছে জল থেকে।

—আর?

—মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনও ভেদাভেদ নেই।

—ওরে কবাব। কোনওটার সঙ্গে কোনওটার মিল নেই।

পারেশ হাসছেন। অনুপম গভীর হয়ে যাচ্ছে।

দেবোপম বলছে—মিল বুঝতে গেলে তোমাদের বইটা পড়তে হবে। এক লাইন শুনেই গোটাটা বুঝতে চাও নাকি?

অনুপম দুপুরে বইটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। বলল—আনিসুজ্ঞামানদা কিছু প্রচুর পড়েছেন। বইটা দেখলেই বোকা যায়।

বইটি সম্পর্কে আলোচনায় মাতে দু'জন। আনিসুজ্ঞামানের নানা ভাবনা চিন্তা নিয়ে কথা বলে। আনিসুজ্ঞামানের গবেষণার বিষয়ে অনুপম জেনেছে দেবোপম। তার ভাল লেগেছে। এই ভাল লাগার কথা সে জানাচ্ছে অনুপমকে। আর ছেলের আলাচনা অচেনা লাগছে পরেশের। কত গভীর, কত বিস্তৃত আলোচনা করছে ওরা। পরেশ নিজে কি কোনওদিন ভাবে দেখেছেন এভাবে? এতখানি করে? অথচ তাঁরই চাখের সামনে এই ছেলে দু'টি কত বিচিত্র বিশ্ব নিয়ে ভাবতে শিখে গেল। তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি যুগ যুগ ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে বাসে আছেন। ওদের বড় হওয়ার পেছনে তাঁর কোনও ভূমিকা নেই। ওরা আপনা-আপনি বড় হয়েছে। আপনজালা গাছের মতো। তবু ওরা যেন অনেক বেশি সম্পূর্ণ। অনুপম আজ কী বলবে পরেশ স্পষ্ট করে জানেন না। কিছু অনুমান করতে পারেন—এই বয়সে, এই সময়ে, গোটা পরিবারের কাছে কী বলা যায়। তিনি বুঝতে পারছেন, সংসার বাঁক নিচ্ছে। তবে কি সত্যিই তাঁর একটা সংসার ছিল? আছে? এ সংসার তাঁর? তাঁর গলা শুকিয়ে যায়। এ প্রশ্নের উত্তর তিনি কোনওদিন পাবেন না। এ সংসারের জন্য তাঁর মায়া আছে। বিতৃষ্ণাও আছে। দেবোপমের দিকে তাঁর চোখ চলে যায়। বুকের মধ্যে ভয় গুড় গুড় করে। এই ছেলেটা চাকরি খোঁজে না। স্থিত হওয়ার চেষ্টা করে না। একলা একলা থাকে। বই পড়ে। টাইশন করে নিজের খরচ চালায়। এই

ছেলেটা স্পষ্ট বলে, সহজে রেগে যায়, সবসময় নিজেকে দূরতম বিন্দু করে রাখে। ও এরকম কেন? সঙ্গে সঙ্গে কাঁপন লাগে গায়ে। দেবোপমের কণ্ঠ পরিষ্কার কানে বাজে—কেন, তুমি জানো না? আমার কোথায় যন্ত্রণা, তুমি জানো না? মাই গুড ওল্ড বিলাভেড ফাদার—...

তখন শবরী খেতে ডাকেন। আজ মাটিতে খাওয়া হবে। পরেশের সেই অর্থে কোনও খাবার টেবিল নেই। একটি টেবিল ও দু'টি চেয়ার আছে বটে। তাতে সবাই মিলে বসে খাওয়া যায় না। পায়ে পায়ে খাবারের দিকে নেমে আসেন পরেশ ও তাঁর ছেলেরা। খাবারের পাত্র ঘিরে শূন্য চারখানি প্লেটের পাশে পাশে বসে পড়েন চারজন। একটি পাত্রে পরোটা অন্যটিতে মাংস। যার যতখানি লাগবে, তুলে নেবে। এভাবেই খাওয়া হয় এ বাড়িতে। তাতে কারওই কম-বেশি হয়নি। কেউই খিদে মেটেনি বলে অভিযোগ করেনি। চারজন নীরবে পরোটা ছিড়ে মাংসের ঝোল লাগিয়ে মুখে নেয়। দেবোপম বলে—তুই বলবি, না আমি শুরু করে দেব?

অনুপম চমকে ওঠে। বলে—কী?

—তুই যা বলতে চাস তা বলা শুরু না করলে আজ আর আলোচনাটা শেষ হবে না।

আলো এল। সমস্তরে আহ শব্দ ধ্বনিত হল একবার। দেবোপম উঠে বিছানা থেকে আনিসুজ্ঞামানের বইটা নিয়ে এল। পাতা খুলতে না খুলতেই আলো চলে গেল আবার। দেবোপম তবু পাতা ওলটাচ্ছে। পরেশ একটি ল্যাম্প ওর দিকে এগিয়ে দিলেন। ঘরে এখন দু'খানি ল্যাম্প জ্বলছে। শবরী একটি রান্নার কাজে ব্যবহার করছিলেন। সেটি আনা হয়েছে। দু'টি ল্যাম্প মিলে বেশ আলো হয়েছে ঘরে। পরেশ আজ নিজের হাতে চিমনি পরিষ্কার করেছেন।

গোল করে ফিতে কেটেছেন। একেক দিন সংসারের খুঁটিনাটি কাজে মন লেগে যায় তাঁর। মনে হয়, এই তো, এই সেই দিন। আজ থেকেই মন লাগিয়ে নিখুঁতভাবে সংসার করা যায়।

শবরী পরোটা চিবোচ্ছেন। চোখে কাজল পরেছেন স্নান করে এসে। চুল খোলা। ল্যাম্পের আলোয় চোখ দু'টি তীব্র লাগছে। বলছেন—বইটা কার? ওই যে কলেজে পড়ায়? মুসলমান?

দেবোপম বলল—মা, তুমি মাস্তুদাকে চেনো তো?

—হ্যাঁ, চিনব না কেন? ওই তো, কলেজে পড়ায়। বউয়ের সঙ্গে বোধহয় ডিভোর্স চলছে।

—বাঃ চমৎকার! আচ্ছা, মাস্তুদার ক্ষেত্রে তো তুমি বললে না—ওই যে হিন্দু... কলেজে পড়ায়?

শবরীর মুখে অল্প অল্প আলো আঁধারি। রেখাগুলি কঠিন হতে থাকছে। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে না পারলে তাঁর মুখ থেকে কঠোর ভাব বেরিয়ে আসে।

একটি হাড় থেকে মাংস ছিঁড়তে-ছিঁড়তে তিনি বললেন—এর মধ্যে এত জটিলতার কী আছে? এখানে আমরা সংখ্যায বেশি, তাই ও ভাবে বললাম। এটা যদি একটা মুসলিম কাস্টি হত আর এক পাড়া মুসলমানের মধ্যে আমরা একঘর হিন্দু হতাম তবে ওরাও আমাদের দেখিয়ে বলত—ওই যে হিন্দু ভদ্রলোক তো, গান করেন—!

কয়েক মুহূর্ত সকলেই চুপ করে গেল। নতুন করে বৃষ্টি নামল। এতক্ষণ যে বৃষ্টি ছিল না তা বোঝা গেল নতুন করে নামা বৃষ্টির শব্দে। সে যে ছিল না, সে যে এল, তারই ঘোষণা হল যেন। অনুপম দেবোপমের দিকে তাকাল। বলল—তবে আমি এ বার বলি?

—বলো।

দেবোপম বই বন্ধ করছে। ল্যাম্পের আলোতেও অনুপমের মুখ লালচে দেখাচ্ছে। সে পরোটাগুলো টুকরো টুকরো করছে। কথা শুরু করার চেষ্টা করছে, তাই অন্যমনস্ক। নানাভাবে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু এখন আর কোনও কাজে লাগছে না সে-সব। এ পরিবারে প্রত্যেকেই যে-কোনও বিষয়ে পরিষ্কার কথা বলতে পারে। হয়তো পরেশ ও শবরীর পারস্পরিক দোষারোপ ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির ইতিহাস এই খোলা পরিবেশ রচনা করেছে। তবু অনুপম আজ খানিকটা দ্বিধাবোধ করছে। অবশেষে শুরু করতে পারছে এভাবে—মা, তুমি তো আমাদের

গানের স্কুলের অনুষ্ঠানে পুণ্যকে দেখেছে।

শবরী খাওয়া থামিয়ে নীরবে চেয়ে আছেন ছেলের দিকে। তাঁর সমস্ত স্বাদু স্মৃতি। কী বলবে ও! কী বলবে! পরেশ চোখ বন্ধ করে হাড় চিবোচ্ছেন। সবকিছু তার ভাবনা অনুযায়ী এসেগেছে। একমাত্র দেবোপমই স্বাভাবিক। তার কোনও প্রতিজ্ঞা নেই।

অনুপম বলছে—মা, মানে, পুণ্যকে আমি..., পুণ্যকে আমার..., মানে পুণ্য বাড়ি থেকে খুব চাপ আসছে মা।

—কীসের চাপ।

পরেশ বলছেন—এত দেরি হয় কেন বুঝতে? এ সব সময় একটাই চাপ হয়। রিডের চাপ? নারে বড়পম?

পরেশকে খুশি দেখাচ্ছে। কিন্তু শবরী জ্ঞ কুটকোচ্ছেন। বলছেন—এখনই? ওর ব্যাস কত? দেখে তো পনেরো-ষোলোর বেশি মনে হয় না।

—যোলো মা। ওদের বাড়িতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার রেওয়াজ আছে।

শবরী ভাবছেন। অনুষ্ঠানের দিন পুণ্য ও অনুপমকে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। ছেলে কারওকে বিয়ে করবে, করতে চাইবে এ তো খুব স্বাভাবিক কিন্তু তাঁর ভাল লাগছে না কেন তিনি ভেবে পেলেন না। পরেশ বললেন—কী করেন পুণ্যর বাবা?

—সেনার ব্যবসা।

—ওরে কবাব। সে তো প্রচুর পরমাওয়াল।

অনুপম চুপ করে আছে। পরবর্তী প্রশ্নগুলো অনুমান করছে সে। পরেশ বললেন—অত বড়লোকের মেয়ে আমাদের এই সাধারণ ঘরে মানাতে পারবে নাকি?

অনুপম বলল—ও অন্যরকম।

পরেশ বললেন—কীরকম?

—ঘরোয়া।

শবরী বললেন—কিন্তু ও তো নাচ শেখে।

—তা হলেও। ঘরোয়াই। তা ছাড়া বিয়ের পর নাচ শেখা ছেড়ে দেবে বলেছে।

—কেন? ছাড়বে কেন? তুই বলেছিস?

অনুপম মাথা নাড়ে। না। সে বলেনি। এটা পুণ্যর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। কারণ নাচ সে খুব আগ্রহে ভালবেসে শেখে না। তাকে জোর করে শেখানো হয়। পড়াশুনারও সে ভাল নয়। পাশও করে না প্রতি বছর। এই যোলো বছর ব্যসেও সে অষ্টম শ্রেণী পেরুতে পারেনি। গানের গলাও নেই যে গান শিখবে। তার চেহার। দেখলে রূপসী বলতে ইচ্ছে যায় তা নিশ্চিত কিন্তু সে-চেহারায় মেদবাছলোর প্রবণতা। তাই রূপের সঙ্গে গুণ জুড়তে এবং মেদ করতে সে নাচের স্কুলে যায়।

পরেশ শবরীর দিকে পর্যবেক্ষণের চোখে তাকান। শবরীর মুখ কঠিন। পরেশের হাসি পেয়ে যায় হঠাৎ। শবরী খুশি হতে পারছেন না। কেন? শবরী কি শাস্তি হতে চান না? বড়ি হয়ে যাবেন? মনের মধ্যে আত্ননাদ ওঠে তাঁর। শরীর শরীর শরীর। শরীর ছাড়া কিছু বুঝলেন না শবরী। কোনওদিনই বুঝলেন না। প্রথম থেকে, যখন তাঁদের বিয়ে হয়েছে, যখন শবরী কুড়িও পেরোননি, তখন থেকে শরীরের টান ভাসিয়ে নিল শবরীকে। তাঁর শরীরের জন্ম, কিংবা কে জানে হয়তো পরেশের নিজের শরীরের জন্মও, পরজীবী হয়ে থাকতে হল তাঁকে। দু'মুঠো ভাত, শবরী ও সন্তানের জন্ম, যোগাতে কি সত্যি অক্ষম ছিলেন তিনি? ছিলেন না। তবু নানাবিধ শরীরী চাহিদার কাছে বিক্রিত হয়ে গেলেন। মানবজাতির সবচেয়ে বড় অভিশাপ বোধহয় এই যে শরীরের নানাবিধ খিদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার আর কোনও উপায় থাকে না। পরেশ শবরীর প্রতি বৈরিতা অনুভব করতে থাকেন। চকিতে সিদ্ধান্ত নেন বড়পমের বিয়েটা তাড়াতাড়ি ঘটিয়ে ফেলতে হবে। শবরীর আপত্তির বিরুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে পেরে উল্লসিত



লাগে তাঁর। বলেন—তা বেশ। তুমি যদি মনে করো এ বাড়িতে আর কোনও অসুবিধে হবে না তবে আর আপত্তির কী আছে? তুমি চাকরি করছ। বড় হয়েছ। আমাদের কোনও আপত্তি নেই। শবরী বড়কুটো আঁকড়াবার মতো বলেন—কিন্তু ছোট ছোট বড়পদের চেয়ে প্রায় বারো বছরের ছোট।

পরে বলেন—তাতে যে খুব আটকায় না এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। মনের মিল থাকলে আর বয়স কী?

শবরী বলেন—হট করে একটা বিয়ে লাগিয়ে দেবে। বাড়িতে একটা ভাল ফর্নিচার নেই। ভাল বিছানা নেই। ছোটপম এখনও কিছু করে না—

পরে শবরীর কথা কাড়েন—ফর্নিচার? সে বানিয়ে নিতে করিলাম। আর ছোটপম চাকরি করে না কিন্তু আমাদের কাছে হাত পাতে কি? ওর খরচ তো ও চালিয়েই নিচ্ছে। সেটাই তো যথেষ্ট। মতি বলতে কি শবরী, আমার ছেলেরা আমার গর্ব। আমি আর কী করেছি ওদের জন্য। ওরা তো নিজেরাই বড় হয়ে উঠেছে। আজ যে বড়পম ওর জীবনের সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের অনুমতি চেয়েছে এই তো অনেক।

শবরী তবু গভীর হয়ে আছেন। অনুপম ও দেবোপম পাবেশকে দেখছে। লোকটা মাঝে মাঝে চমৎকার দর্শন রচনা করে। অনুপম ভাবছে—আসলে মানুষটা মহান। আসলে ভাল। মনে মনে সুন্দর। একজন শিল্পী তো। শিল্পীর মধ্যে একটি সুন্দর মন না থেকে কি পারে? জীবনটাকে ভুলে ভরে রেখেছেন। তাই মাঝে মাঝে ব্যাধ লাগে।

দেবোপম ভাবছে—এ! একবারে বেড়াল তপস্বী। চমৎকার অভিনয় জানে লোকটা। কী অবলীলায় মহান হয়ে গেল! জাতে মাতল, তালে টিক। কীরকম টনটনে জ্ঞান। অবলীলায় বলে গেল আমি তো ওদের জন্য কিছু করিনি। কেন করিনি? আমরা বারণ করেছিলাম? দাদা হারমোনিয়ম ধরেছিল বলে দাদাকে বেঁট দিয়ে মেরেছিল। মনে নেই নাকি? শয়তানের বাচ্চা! আজ মহাশয় দেখাচ্ছে। বড়পম! ছোটপম!...

ডায়েরিতে তারিখ লেখে না দেবোপম। সালও লেখে না। কোনও কোনও রাগ্নিতে, গভীর ও স্তব্ধ সময়ের সঙ্গে নিজেরই মুখোমুখি কন্সবার মতো ডায়েরির কলটানা সাল তারিখ ত্রিধির হিসেব ভর্তি পাঠায় পর পর লিখে চলে যা মনে আসে। আজ সে শুরু করেছে এভাবে—

দাদা বিয়ে করছে শেষ পর্যন্ত। বলেছিলাম, এ বাড়িতে এই পরিবেশে পুপকে আনতে তোর লজ্জা করবে না? ও বলল—কেন? লজ্জা কীসের? পুপুর কাছে কীসের লজ্জা? ও সব জানে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—সব জানে? মানে সবই জানে? দাদা ছির হয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল—পুপুর বয়স মাত্র ষোলো। তা ছাড়াও ওর বয়সি মেয়েদের তুলনায় ও অনেক সরল। ওকে কেন ভালবেসে ফেললাম জামিস? ও নিষ্পাপ বলে।

আমি বললাম না যে ষোলো বছর কাসে সব মেয়েই নিষ্পাপ থাকে। সব মেয়েই এ বয়সে পবিত্র ও অনুগত হয়ে ভালবাসে। সব মেয়েই প্রেম দিয়ে পূজা দিয়ে এ বয়সে মরতে প্রস্তুত থাকে। আসল খেলা শুরু হয় তার পর।

বললাম না মানে বলতে পারলাম না। পুপুর যে-নিষ্পাপ সন্তাকে দাদা ভালবেসেছে তা বাসতে গেলে নিষ্পাপ হতে হয়। দাদাটা অন্যরকম। এ পর্যন্ত অনেক মেয়ে এসেছে ওর জীবনে। তারা কীভাবে এসেছে আমি জানি। মেয়েরা দাদাকে সহজেই পছন্দ করে ফেলে। ও কিছু কারওকে বেশি কাছে টানেনি। কারও সঙ্গে জড়ায়নি, কারওকে পরিকল্পিতভাবে দুঃখও দেয়নি। নিজের মধ্যে ও বেশ একটা শুচিতা বজায় রেখেছে। ও এখনও নিষ্পাপ, পবিত্রতা, পুণ্য, কল্যাণ, শুচিতা—এ সব বিশ্বাস করে। চরিত্র। ওর তো আমার মতো সংকট নেই। থাকলে ও-ও আমার মতো হয়ে যেত। ছন্দাবউদিত গমন করত আর নীরবে প্রত্যাখ্যান করত সেনানির

নিবেদন। মানে আমি যা করি আর কি। কিংবা কে জানে, ও হয়তো, আমার মতো সংকট নিয়েও এরকমই থাকত। সবার প্রতিক্রিয়া সমান হয় না। বিশেষ করে এর দুটিভিত্তি একেবারেই আলাদা। কিছু কতদিন এরকম থাকে, সেটাই গ্রন্থ। আমি ওকে বলেছিলাম—পুণ্য নিষ্পাপ হলেই তোর সমস্যার সমাধান হয় না। ও বলল—বেন? এবার আমার সঙ্গে ওর দীর্ঘ কথা বিনিময় হল। সেই অমলেন্দু মারা যাবার পর আমাদের অনেক কথা হয়েছিল, তারপর আবার এই হল। আগে আমি আর ও রাতের পর রাত জেগে কথা বলতাম। কত কথা! রাত্তর কে কী দেখলাম তাও বাদ যেত না। আস্তে আস্তে সবই বদলায়। আমারও বদলেছি। বাই হোক, আমি ওকে বলেছিলাম—বাবার এই মাতলামো, মা'র এই অকুণ্ঠ বিশ্বস্ততা, ন্যাকামি, মাই বল, আমাদের আশ্চর্য ইতিহাস, পাড়ায় আমাদের অবস্থান—এ সব ও যখন জামবে, বুঝ আঘাত পাবে না কি? ওর নিষ্পাপ মনে সে-সব দাগ কাটবে না? মা-বাবার একদিনের ঝগড়া শুনলেই তো ওর পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করবে। এ সব ওও বাড়িতে জানবে। ওর বাবা-মা তাকে দোষারোপ করবেন তখন।

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—শোন, পম, পুপুকে এ সব বলেছি আমি।

আমি—এ সব মানে?

দাদা—মা'র বিশ্বস্ততা। বাবার মাতলামো। তোর গাঙ্গী'র।

আমি—আমি কেমন তাতে পুপুর কী যায় আসে?

দাদা—তেমন কিছু না। কিন্তু তোর কথানুযায়ী পরিবারের সার্বিক চিত্রই তো ওকে দেবার কথা। ও শুনে বলেছে, আমি যেমন আছি, তেমন থাকলেই ওর চলে যাবে। অন্যদের ও বেশ মানিয়ে নিতে পারবে। বাবার মলপান আর মায়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া ও নিজের বাড়িতেও দেখেছে। ওর বাবা নাকি মদ খেয়ে ঝগড়া করেন আর ওর মাকে বাড়ি থেকে বার করে দেন। ওর মা পাশেই ওর মাসির বাড়িতে চলে যান। সেরকমই বন্দোবস্ত আছে। পরদিন ওর বাবা আবার সাধাসাধি করে মাকে নিয়ে আসেন।

আমি — বাঃ চমৎকার। কিন্তু আমাদের ইতিহাস? আমাদের পরিবার? অরুণ সেন? এ সব? এ সব ও শুনে না?

দাদা — ইতিহাসের কী আছে? ও সব আমাদের ছোটবেলাকার। যা দেখেছিস, ভুলে যা। আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি। মানুষই তো হয়েছি। অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছি। কিছু ভেসে যেে যাইনি সেটাই তো সবচেয়ে বড় জোরের কথা।

আমি — কিছুই হইনি আমরা। কিছুই না। চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের শুরুতেই গোলমাল। সেইসব ডাৰতে আমার ঘোঁ লাগে। মরে যেতে ইচ্ছে করে। শুণু যে বেঁচে আছি কেন এটাই বুঝতে পারছি না।

দাদা — ছোটপম, আমরা কোথা থেকে এলাম, কীভাবে এলাম, কেন জন্মলাম, আমাদের বাবা-মা যথাযথ দায়িত্ব আমাদের প্রতি পালন করলেন কি না, তাঁরা নিজেদের কাছে যথেষ্ট সং ছিলেন কি না, আমাদের মধ্যে কার জিন, কার রক্ত—এ সব ভেবে কী লাভ? ভেবে দেখ—কোনও পুরুষ কোনওদিন নির্ভুলভাবে বলতে পারবে না—হ্যাঁ, আমিই এই সন্তানের পিতা। একমাত্র কোনও নারীই তা বলতে পারে। আবার নাও পারে। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু নেই আবার এর চেয়ে সুন্দরও কিছু নেই। একটা মানুষ, সে মানুষ হয়ে জন্মেছে, তার স্বর আছে, মেধা আছে, বুদ্ধি আছে, অনুভূতি ও অভিব্যক্তি আছে। এই সুন্দর পৃথিবীকে সে ঝুঁতে পার, দেখতে পার, পৃথিবীর ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারে, সে গায়, কবিতা রচনা করে, আঁকে—নিজেকে সে বহুত দিতে পারে, প্রকাশ করতে পারে নিজের ইচ্ছায়। এই কি যথেষ্ট নয়? একটা মানবজন্ম মানে এক বিশাল প্রাপ্তি। আমি তা পেয়েছি। আমি আর কিছু চাই না। কীভাবে পেয়েছি জানতে চাই না। এই মানুষজন্মই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা। ঈশ্বরকে তুই মনে কর তোর পিতা।

তার কাছে থেকে এসেছি। তার কাছে চলে যাব। ঈশ্বর না হলে তুই একটা সময়কে কখনা কর। একটা সময় থেকে এসেছিস একটা সময়ের জন্য। আবার চলে যাবি। তোর সবাই আসল কথা। অন্য সব গৌণ।

আমি — এগুলো বানানো ভাষা। বানানো চিন্তা। বাস্তবকে অস্বীকার করে কল্পিত ডাববাজে ঘুরে বেড়ানো। এ হল নিজের কাছে নিজের ফাঁকি। এভাবে ভেবে ভেব করলে ভাল থাকা যায় না।

দাদা — বানানোই তো। সবটাই বানানো। তোর জগৎটা তো তোকেকেই নির্মাণ করতে হবে। জগৎ তোর নিয়মে চলবে না। সূর্য সূর্যের মতো ওঠে। তোকেকেই ঠিক করতে হয় তুই ক'টা আলাদা দিবি। তোকেকে সবাই খারাপ রাখার চেষ্টা করবে। মানুষ নিজেকে তার রাখার জন্য প্রায় সব মানুষেরই অন্যকে খারাপ রাখার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তুই আত্মসমর্পণ করবি কেন? তোকেকে ভাল থাকতে হবে। তোর নিজের জন্য। এর নাম প্রয়াস। এই ভাল থাকতে চাওয়া, ভাল হয়ে উঠতে চাওয়া—এইই নাম জীবন। এই প্রয়াসই বেঁচে থাকা এবং বেঁচে থাকার প্রেরণা। ওপর ওয়ালার ওপর ভরসা করে নেমে পড়ো। যা হবার হবে। বেঁচে থাকার জন্য আরও ভাল থাকার ইচ্ছেটা চাই। ও কেন এমন করল। সে কেন ওমনি হল না। এ সব করে কেঁদে লাভ নেই। তুমি নিজেকে প্রস্তুত করো, যা তুমি হতে চাও।

আমি — ও সব ওপর ওয়ালার-ফেয়ালার আমার বিশ্বাস নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলেও সে একটা একচোখো ভুলভাল লোক ছাড়া কিছু নয়। ঈশ্বর হল দুর্বলের অবলম্বন। ওই যে ফটিক বিলের লোকগুলো—যাদের ঘরবাড়ি জলে ভেসে আছে, খেতে পরতে পায় না—পচতে পচতে প্রাণধারণ করছে—ওরা কি ঈশ্বরকে রাতদিন ডাকছে না? কী লাভ হচ্ছে ওদের?

দাদা — এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। আমি শুধু আমার কথা বলতে পারি। আমি তত্ত্ব জানি না। আমি মহাজ্ঞানী নই। গান ভালবাসি, গাই। এই পৃথিবীকে ভালবাসি তাই আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো বাঁচি। পেটের জন্য চাকরি করি। সময় হলে খোল কর্তাল বাজাতে বাজাতে হরিবোল বলে চলে যাব। তার আগে এই জীবনকে দেখে নিই। মৃত্যু তো আসবেই। জীবন মানে কী, সেটুকু বোঝার জন্যও তো বেঁচে থাকা দরকার। শেষ দিন উপলব্ধি করব—এই তবে জীবনের স্বাদ আর এই মৃত্যুর।

আমি — তুই তা হলে দারুণভাবে ঈশ্বর-ঈশ্বর মানছিস। মাঝে মাঝে তো দক্ষিণেশ্বরেও যাস।

দাদা — হ্যাঁ। যাই। রামকৃষ্ণদেবের ঘরটায় গিয়ে চুপ করে বসি। চিন্তা করি। সব চঞ্চলতা চলে যায়। সেখিন একদিন গিয়ে।

আমি — ঈশ্বর যে আছে তার কোনও প্রমাণ যদি সত্যি কেউ দিতে পারত।

দাদা —

...who profess Him?  
Saying : I believe in Him!  
Who feeling, seeing,  
Deny His being.  
Saying : I believe Him not!

এর পরেরটা আমারও জানা। আমার অতি প্রিয় পিস। তবে ঈশ্বরের জন্য নয়। সাহিত্যের গুণে। তাই দাদার সুরে গলা লেগে গেল আমার। রবীন্দ্রনাথের গান যেমন কেউ গাইলে গলা লেগে যায়, তেমনি আমিও গোটে বলতে লাগলাম—

Arches there not the sky above us?  
Lies not beneath us firm the earth? ...

...Vast as it is, fill with what

force thy heart,

And when thou in the feeling wholly blessed art,

Call it then, what thou wilt,—

Call it bliss! Heart! Love! God!

আমি — I have no name to give it!

Feeling is all in all

দাদা — ভাব, এই লাইনগুলো ভাব ছোটপন। কী চমৎকার! ভাব! কল হিট গ্লিস। হাট। লাভ। গড! আই হ্যাভ নো নেম টু গিভ ইট। ফিলিং ইজ অল ইন অল। এরপরও তোর ইচ্ছা করে এইসব বিশী স্মৃতির মধ্যে নিজেকে ফেলে রাখতে? হেঁচে সে। ও সব ছেড়ে সে। গ্রান আর অনুভূতির চেয়ে বড় কিছু নেই। তোর দেখার জগৎটাকে আরও বাড়িয়ে দে না! নিজেকে মহাবিশ্বের একটা অংশ বলে ভাব। অন্য সব তুচ্ছ মনে হবে। তোর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নিজের জন্য একটা সুন্দর জগৎ তৈরি করে নেওয়া খুবই সম্ভব। পরেশ এবং শবরী বোসের অপসম্পর্ক উদ্দেশ্য বার্থতা। আমাদের নয়!

দাদা পারে। আমি পারি না। আমি কিছুতেই পারি না। আমি কারওকে বিশ্বাস করিনি। ভালবাসিনি। নির্ভর করিনি। ছন্দাবউদির শরীর ধরলে আমার যন্ত্রণা হয়। না ধরলেও হয়। আমি কোথাও শান্তি পাই না। সোনালিকে আমি অকারণে বকাবকি করি। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জ্বারে ধমকাই। ওর চোখে জল ভরে আসে। আমার ভাল লাগে না। তবু এরকম করি। মনে হয় এটাই ঠিক। এগুলোই আমার করার কথা। কীসের ভাল থাকা। কীসের প্রয়াস। আমি তো মরবই। মরে যাব। মৃত অবস্থাতেই আমার জন্ম। যার বাপের ঠিক নেই তার আবার প্রয়াস কী! মূল্যবোধ কী! আমি জানি আমার জীবনে কোনও প্রেম-ধেম আসবে না। বউদিবাজি করতে করতেই আমি ফুটস হয়ে যাব। মাকে মাঝে যখন রেললাইন ধরে হাটি, অথবা গুরে থাকি লাইনে মাথা দিয়ে, রেল আসার আগে কাঁপন লাগে, যেন-বা ধাতব প্রবাহের শব্দও বয়ে যায়। আমার মনে হয় মৃত্যুর শব্দ। মৃত্যু আসছে। ভারী, গর্জনশীল, ধাতব ও কঠিন মৃত্যু। আর তখনই কোথা থেকে ফুলরেণু উপস্থিত হয়। কুঁড়ো, নড়বড়ে, হামাগুতি দেওয়া থুঁটেকুড়ানি ফুলরেণু! গায়ে গোবরের গন্ধ। আমাকে তাড়া দেয়—ওঠো, ওঠো। ট্রেন আসছে। বুকতে পারছ না নাকি!

স্পষ্ট আদেশ করে সে। আমি উঠে পড়ি। তার বুকের দিকে তাকাই। ওই রোগা শরীরে কী বিশাল বুক! আমি যে কতখানি নোংরা, জন্মসূত্রে যে কতখানি লাম্পট আমি অসিকার করেছি, জা বুকতে পারি। একটা লটপটে কুঁড়ো থুঁটেকুড়ানির শরীরের দিকেও আমি তাকাতে ভুলি না।

সে-দিন দাদার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে দেবার্চনের কথা আমার মনে পড়ছে। খুব সুন্দর কথা বলত দেবার্চন। ওর মধ্যে গভীর দৃষ্টি ছিল। ও সঙ্গে থাকলে, কেন জানি না, আমার অশান্তিগুলো প্রশমিত হয়ে আসত। তবু ও যে-পথে গেল শেষ পর্যন্ত, আমি যেতে পারলাম না। একদিন বলেছিলাম—কারওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা ঠিক নয়। দেবার্চন সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—সে কী! বিশ্বাসের আবার কম বেশি কী! বিশ্বাস মানেই অন্ধ বিশ্বাস। পুরো বিশ্বাস। বিশ্বাস থাকলে সম্পূর্ণ থাকে। না হলে থাকে না।

পরে ভেবে দেখেছি, সত্যি তো, বিশ্বাসের আবার সন্দেহ কী, যুক্তি কী। বিশ্বাস মানেই তো অন্ধ। সন্দেহ রেখে যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে বিশ্বাসে পৌঁছানো যায় না। যুক্তি বিশ্লেষণের রাস্তায় খানাখন্দের শেষ নেই, জিজ্ঞাসা, প্রতিযুক্তি, বৈরোধিতোরও শেষ নেই।

দাদাও দেবার্চনের মতোই বিশ্বাস করে জীবনকে, ভাল থাকার প্রয়াসকে। দেবার্চনকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। ও ওর সমস্ত উপলব্ধিগুলি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত। ওর কথায় রামকৃষ্ণের

প্রভাব খুব স্পষ্ট ছিল। আবার পরে ও কীরকম মার্কসিস্ট হয়ে গেল। নকশাবাদ হয়ে গেল। মরেও গেল। আমি শালা একটা ফালতু। ওই কুল্লারের চেয়েও নগণ্য। একটা কীটের বাচ্চা কীট। কিছুই হতে পারলাম না। কিছুই ধরতে পারলাম না। না ভক্ত হলাম না বিপ্লবী। না কংগ্রেসি হলাম না নকশাল। ভক্ত হলে ইশরে ভিজতাম, প্রেমে পড়তাম, কবিতা লিখতাম, নারীতে স্বর্ণ দেখতাম। নকশাল হলে গুলি খেয়ে মরতাম বা জেলখানায়—পুলিশের হাতে খেতে খেতে পাগল বা পঙ্গু।

এখন গোটা একটা শরীর নিয়ে আমার মতো পঙ্গু আর কেউই নেই।



পলাশ বেন চেয়েছিল কিন্তু একটি ফুটফুটে ভাই হয়েছে তার। শেফালির মা অবাক মেনে গেছে। যে-দিন বাচ্চা উঠল রাধিকার আর শ্যামল, কমল, পরমেশ সব মিলে শেফালির মা'র সঙ্গে সঙ্গে তাকে মাতৃসদনে নিয়ে গিয়েছিল, সে-দিন বাড়জালের অস্ত ছিল না। যেন পানাপুকুরের পেছুরা পোয়াতি-শরীর খেতে না পেরে, শিকার হাতছাড়া হয়ে যায়-যায় দেখে আক্রোশে তুফান ডেকেছিল। আর মগ্ন চড়িয়ে দিয়েছিল রাধিকার পেটে। বাচ্চা পাগল পাগল হয়ে গিয়েছিল রাধিকা। শেফালির মা'র কেকলই মনে হচ্ছিল ওর যমজ হবে। এখন অবাক মেনে গেছে সে। একটাই বাচ্চা আর তার কীরকম আশ্চর্য স্বাস্থ্য। কেমন করে হল? এই মেয়েটা নিয়ম করে খেতে পায়নি। একটু শাস্তি পায়নি। শেফালির মা নিজেও তেমন আদরবত্ত্ব করতে পারল কই! তবু রাধিকা একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্ম দিয়েছে। শেফালির মা মনে মনে মা মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করছে। সে যতবার বিপদে পড়েছে ততবার মঙ্গলচণ্ডী তাকে উদ্ধার করেছেন। শুধু শেফালিকেই আর পাওয়া গেল না। ব্রত, হতো, তিল বাঁধা, মানত—সব বিফলে গেল। হবেও-বা মঙ্গলচণ্ডী তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। হবেও-বা তাকে ভাল রেখেছেন। তাই হবে। তাই হওয়াই সম্ভব। সে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলফুল সংগ্রহ করেছে। রাধিকা অদূরে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে। তার দুই বুক দুধে টল টল করছে। পলাশ মাঝে মাঝে ভাইয়ের মুখ দেখছে। মাঝে মাঝে মায়ের মুখ। সে তার নিজের কথা ভাবছে। কবে মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল এখন আর মনে পড়ছে না। এখন ভাইকে দেখে তারও আবার একটু একটু পান করতে সাধ যাচ্ছে। বোন হয়নি বলে তার আর দুঃখ নেই। বেশ চমৎকার একটা ভাই হয়েছে। কদিন পরেই ভাই বড় হয়ে যাবে। সে খেলবে। হাত ধরে ইস্কুলে নিয়ে যাবে ভাইকে। মাঝখানে কার্তিক এসেছিল। ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে এসে দেখে গিয়েছিল রাধিকাকে। কিছু টাকাপয়সা দিয়ে গিয়েছিল। শেফালির মা বুশি। কিন্তু রাধিকার ইচ্ছে করে না কার্তিক আসুক। যদি সে কোনওভাবে উপার্জন করতে পারত, যদি সে কোনওভাবে তার ও বাচ্চা দু'টোর পেট চালাতে পারত তা হলে কার্তিকের মুখও দেখত না।

শেফালির মা পূজার আয়োজন করছে আর ভক্তির কথা বলছে। রাধিকা কিছু শুনছে, কিছু শুনছে না। এখন সে ছোট ছেলের মুখ দেখছে। পলাশ কী সুন্দর, সে রাধিকার মতো হয়েছে। রাধিকা ভাবছে এই ছেলেটা কার মতো হল? কার মতো? কার্তিকের মতো? না না। কখনও নয়। পরমেশের মতো? বাঃ! তাই কখনও হয়? তা হলে কি শমসেরের মতো? যদি হয়! যদি হয়! তখন, ঠিক তখন, পলাশ বলল—মা, ভাইরে ঠিক জোৎস্নার লাখান ন্যাখতে।

—কার লাখান কইলি? কার লাখান?

—জ্যোৎস্নার লাবণ্য।

শেফালির মা হাসছে। রাধিকা হাসছে। শ্যামল কমল আর তাদের বাবা হাসছেন। কথা দেখো। জ্যোৎস্নার মতো মুখ! পলাশ লজ্জা পেয়ে গেছে। শ্যামল বলছে—এক ডো, বউদি, ওর নাম রাখো জোছন। ভাল না?

ভাল, ভাল। সবাই ভাল বলছে। কী চমৎকার নাম। জোছন। পলাশের ভাই জোছন। এ কি মেলে? পলাশের ভাই বিকাশ বা প্রকাশ হলে কি ভাল হত না? না না। এই ভাল। বেশ মিলেছে। পলাশের ভাই জোছন। জ্যোছনায় পলাশ ফুটে আছে। ডাবো। ভেতরে দেখো কী চমৎকার। শেফালির মা পাঁচালি পড়ছে। আজ সবাই দেরি করে কাজে যাবে। পূজো হবে। ফলগ্ৰাসাদ যাবে। তারপর যাবে। এমনকী পরমেশ পর্যন্ত। শেফালির মায়ের কুল ছুঁতে। জন্ম বেলার নিকে তাকে একবার হেডসিদিমণির বাড়ি যেতে হবে। সেখানে কারা কারা আসবে। শেফালির মা হেডসিদিমণিকে সাহায্য করতে যাবে। অন্ধর মাও আছে। কিন্তু তাকে দিয়ে সবটা হবে না। সে তেমন ভদ্রসভ্য নয়। বস্তির মহিলা। ওই কাপড় কাচা, বাসন মাজার বাইরে কী-ই বা সে পারবে। শেফালির মা তেমন নয়। গরিব কিন্তু বস্তির নয়। অভাবগ্রস্ত কিন্তু অসংস্কৃত নয়। তার পোশাকে, আচরণে আর্থিক স্বচ্ছতা প্রকাশ পায় কিন্তু হাঘরেপনা নয়। তাকে আদেশ করা যায় কিন্তু সেই আদেশে কিছু-বা সত্ৰম মেশাতেই হবে ঘেন। শেফালির মা দ্বারা হেডসিদিমণিরও রুচি অভিব্যক্ত হয়। এবং শেফালির মা নিজেও বস্তিবাসী শ্রেণীকে অসহ চক্ষে দেখে। সে নিজে দশঘরের মধ্যে থেকেও স্বাতন্ত্র্যের আত্মসম্মান বোধ করে। এমনকী, হেডসিদিমণি তাকে এমন দিনে ডেকে থাকেন যে-দিন অন্ধর মাকে ডাকা যায় না—এই উপলব্ধি তাকে উদ্দীপ্ত করে।

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা সেরে, রান্নাবান্না করে যাবে শেফালির মা। এখন সে পড়ছে। মা মঙ্গলচণ্ডীর মহিমাকীর্তন করছে। পয়্যরে পড়ে যাচ্ছে উপাখ্যান।

চণ্ডিকা দেবীর বরে লুপ্ত ধন জন।  
দেখিতে দেখিতে তরী ভাসে সেইক্ষণ ॥  
আনন্দে উৎফুল্ল হল সাধু ধনপতি।  
বহু দ্রব্য লয়ে দেশে যাইল খটতি ॥  
ঘাটে রাখি তরী যত দ্রুত পাঠাইল।  
সাধুর গৃহেতে বার্তা তখনই জ্ঞানল ॥  
বার্তা পেয়ে দ্রুতগতি খুলনা যুবতী।  
পুরাঙ্গনা সাথে লয়ে আসে শীঘ্রগতি ॥  
আনন্দে উৎসবে তবে জনজন লয়ে।  
নিজ গৃহে গিয়ে তথা পূজে চণ্ডী মায়ে ॥  
পরম আনন্দে যাপে সাধু ধনপতি।  
সুরপতি যথা করে স্বর্গেতে বসতি ॥

এবং খুলনার সুখ দেখে সমৃদ্ধি দেখে দেশে দেশে যুগে যুগে সমস্ত নারীই মঙ্গলচণ্ডীকে পূজা করতে থাকল। তারাও সুখে-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল। আর কোথাও কোনও দুঃখকষ্ট রইল না। আর এত কিছু শুনেও একটুও পূজায় মতি হল না রাধিকার। সে প্রণাম করল বটে, গ্ৰাসাদ খেল বটে, কিন্তু ছেলে কোলে নিয়ে পরমেশকে দেখল। দু'চোখ ভরে দেখল। আর শমসেরকে ভাবতে লাগল। এই পরমেশ তার কেউ-ই নয়। এক বাড়ির ভাড়াটে বই কেউ-ই নয়। তবু, খিলপাটনি থেকে এসে, শমসেরকে, বাবাকে, গ্রাম ও রূপসী নদীকে ছেড়ে এসে তার যখন ভীষণ কষ্ট হত আর কষ্টে দম আটকে আসত তখন এই দশ ঘর ভাড়াটের মধ্যে, কার্তিকের কঠিন পেছনের মধ্যে পরমেশ আস্তে আস্তে স্বপ্ন হয়ে গেল। শমসেরের মধ্যে মিলিয়ে গেল সে। অথবা শমসের পরমেশ হয়ে গেল। রাধিকা ইচ্ছে করলে তাদের মিলিয়ে দিতে পারে, ইচ্ছে



করলে জুড়ে দিতেও পারে। আবার আলাদাও করতে পারে। তার মরন যেমন ইচ্ছা। আজ পরমেশকে দেখে তার আশ মেটেনি। আজ তাকে শমসের পেয়েছে। কেমন আছে শমসের? কোথায় আছে? কেমন দেখতে হয়েছে তাকে? ঢাকা থেকে তিন-চারটে পাঁচ দিয়ে এসে সে কি তার বাবার মতো জমিজমা দেখাশুনা করেছে? সে কি বিয়ে করেছে এতদিনে? সে কি সুখী? বউকে নিয়ে সুখী? এই বউকে কি বলেছে সে—তরে বিয়া করুন। বিয়া করুন তরে?

ছেলে বুকে করে আনমনা হয়ে আছে রাধিকা। সে যখন কার্তিকের সঙ্গে এ পারা চলে এসেছিল তখন শমসের খিলপাটনিতে ছিল না। অনেকদিন ধরেই ছিল না। ঢাকার গিরে সে খুবই শহুরে হয়ে উঠেছিল। বুঝতে সে ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। তারপর আত্মনের মতো ছড়িয়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। রাধিকা এ সব জানে না। অকোলন জানে না। মুক্তিযুদ্ধ জানে না। তাদের খিলপাটনি গ্রামে এ সবের অর্ন্ত আসতে না-আসতে রূপসীর জালে ভেসে যেত। চার-পাঁচ মাস বর্ষার সঙ্গে, রোগ-বালাই, অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে কেই-বা বাড়তি ভাবনাচিন্তায় ঢুকবে? সে আলগা আলগা বস্ত্রুক বুকেছিল তাতে ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে শমসের কোনও সাংঘাতিক কাজ করেছে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার জন্য বুঝি-বা তার প্রাণও চলে যেতে পারে এবং সে বুঝে গিয়েছিল শমসের বিয়া করার কথা ভুলে গেছে। রাধিকাকে ভুলে গেছে। ভাড়া শিবমন্দিরে শমসের আর রাধিকা যে একাঙ্গী হয়ে গিয়েছিল একদিন আর পরস্পর প্রতীক্ষা করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল সেইসব আর মনে নেই। শমসের রাধিকাকে প্রতারণা করেছিল। ছি ছি। এ সব কী ভাবছে সে। দু'হাতে মুখ চাপা দেয় রাধিকা। ঢাকায় চলে গিয়েছিল বলে, অনেকদিন আসেনি বলে, কিংবা সে যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িয়ে গিয়েছিল সেহেতু সে যে আর ফিরে আসত না কখনও, রাধিকাকে বিয়ে করতে চাইত না, তা কে বলতে পারে? সে হয়তো নিশ্চিন্ত ছিল। জানত রাধিকা আছে। প্রতীক্ষা করছে তার জন্য। সারা জীবন। সে ভেবে থাকবে, সমস্ত যুদ্ধের পর সে ফিরে আসবে। রাধিকাকে বলবে—'কোল পেতে নাও। আমি ঘুমব। আমি ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত।' আর রাধিকা কোল পেতে দেবে তখন। সারা শরীরে সুগন্ধ মেখে রাখবে। চুলে সাজিমাটি ঘষে রাখবে। শমসেরের জন্য নিজেকে সাজিয়ে রাখবে রাধিকা। একটা লাল... না না একটা হলুদ রঙের ঢাকাই শাড়ি পরবে, সেটা শমসের ওর জন্য নিয়ে এসেছে—

শিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।  
মঙ্গল যতই করব নিজ দেহে ॥  
কনয়া কুস্ত করি কুচযুগ রাখি।  
দরপণ ধরব কাজর সেই আঁখি ॥  
বেদী বনাওব হাম অপন অঙ্গল।  
ধাতু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥

কিছুই ঘটেনি এ সব। কিছুই হয়নি। তার আগেই রাধিকা কার্তিকের সঙ্গে চলে এসেছে। শমসেরকে কিছুই না বলে, কারওকেই কিছু না বলে ওই গ্রাম, ওই নদী, বাবা সব ফেলে চলে এসেছে। পথের কথা কিছুই মনে নেই তার। কীভাবে এসেছিল এতখানি? কোন পথে? শুধু মনে আছে একটা জায়গা। তাদের গাঁয়ের মতোই জায়গাটা। শুধু তার নাম বর্ডার। বর্ডার কাকে বলে সে জানত না। পরে বুকেছিল ওটা সীমান্ত। এ পাশে পাকিস্তান, ও পাশে ভারত। দু'টি আলাদা দেশ। তারা পাকিস্তান থেকে ভারতে আসছিল। কার্তিক দু'টি লোককে টাকা দিয়েছিল। তারা নিরাপদে সীমান্ত পার করে দিয়েছিল কার্তিক ও রাধিকাকে। ওরা কার্তিকের চেনা লোক। আগে এ পার থেকে চাল নিয়ে ও পারের চালান করত কার্তিক। সেই চাল সব রেল-ওয়ার্থন থেকে বার করা। লুট করা চাল। কার্তিক সরাসরি ওয়ার্থন ভাঙত না। কিছু লুট করা চাল যেখানে বিক্রি হত তার একটা ঘাঁটি ছিল বনগাঁয়। সে সেখানে কাজ করত। চাল পৌঁছে দিত ও

পারে। এ কাজ করতে গিয়েই একজনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে যায়, যে সত্যকথ্যকে চিন্তিত আর জানত সত্যবন্ধুর একটি গলগ্রহ ভাইঝি আছে। সোমস্ত। বিবাহযোগ্য। কঠিন জুটে গিয়েছিল। কাকা জেনেছিল, বাবা জেনেছিল ব্যবসা করে। ভাল ব্যবসা। সেই লোকটি বলেছিল। কেউ ভাল করে খোঁজ নেয়নি। নেবার প্রয়োজনও ছিল না হয়তো। খোঁজ নিয়ে বিয়ে নিলেই তো অনেক টাকা লাগত। কে দিত সে টাকা। সত্যসাধন পদু হয়ে গড়েছিল তখন। হারিয়ে গিয়েছিল। একেবারে একা হয়ে গিয়েছিল রাধিকা। একেবারে লেখা হয়ে গিয়েছিল। দিনরাত কাকির মুখনাড়া খেতে আর ভাল লাগত না। যখন কঠিন এল আর বিবাহের কথা হয়ে গেল, সে একটুও আপত্তি করেনি। সে শুধু দু'টো দিন সময় চেয়েছিল। সেই দু'দিনে সে সারাদিন রূপসীর পাড়ে ওই কাঁকড়া জামরুল গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল। কিংবা চলে গিয়েছিল মন্দিরতলায়। তাকে দেখে শিবলিঙ্গের মাথায় চাপানো বেলপাতা খসে পড়ছিল। মন্দিরের ঠাণ্ডা মেঝে আর সৈদা গন্ধ—অলস নির্জনতা—রাধিকার মনে হয়েছিল বুঝি-বা এ সময় দেবতার দেখা পাওয়া যায়। সে বুঝি বিভ্রান্ত হয়েছিল কাকে দেবতা মনে করে ভালবাসবে। দেবতাকে সেরা ভালবাসা নিবেদন করতে হয়। সে, তার সুন্দরতম প্রেম, শমসের ছাড়া এমনকী দেবতাকেও দিতে প্রস্তুত ছিল না। সেইসব নির্জন সময়, যখন সে ভেবেছিল দেবতা অবিরূত হলেও হতে পারেন, তখন প্রকৃতপক্ষে শমসের প্রার্থনা করেছিল। সে আশ্রয় বিশ্বাস করে থাকে—সেদিন শমসের থাকলে আমতুই রাধিকা তার খিলপাটনি গ্রাম ও রূপসী নদীর অঙ্গাঙ্গী থাকতে পারত। তেমন আর সম্ভব ছিল না। তেমন ঘটেনি। তার চোখ জ্বালা করছিল। সে বলেছিল—হয়তো আর আসব না কোনওদিন। আর কখনও দেখা হবে না। সে জামরুল গাছের গায়ে কাঠি দিয়ে লিখেছিল—‘চলে যাচ্ছি।’ কে চলে যাচ্ছে? কাকেই-বা সংবাদ দিয়েছিল জানল না কেউ। শুধু জামরুল গাছের কাণ্ডে শিহরণ জাগল। ছাতারেরা কিচিমিচি করল আর রূপসী বয়ে গেল চুপচাপ। শমসেরদা কি জানবে না এ লেখা তার? কিংবা, কে জানে, শমসের ফিরে আসার আগেই হয়তো ছল গজিয়ে যাবে। লেখটুকু হারিয়ে যাবে। রাধিকা দেখেছিল এতটুকু জল জমে নেই, এতটুকু কান্দা নেই কোথাও। হেমস্তের গন্ধ ছড়িয়ে গিয়েছিল চারপাশে। একলা শিবলিঙ্গ পাথর হয়ে ছিল। দ্বিতীয় দিন সে সারাদিন বাবার কাছে ছিল। আর সে-দিনই বলেছিল সেই লুকনো কথাটা।

—বাবা।

সত্যসাধন কথা বলতে পারে না তখন, কিন্তু চোখ কথা বলে। মুখে জাস্তব শব্দ হয়। তার বাঁ দিক অসাড় হয়ে গেছে এই হুমাস হল। শরীর শুকিয়ে গেছে। মরে যাবে যে কোনওদিন। ওই অবস্থাতেও চলে আসার আগের দিন রাধিকা জানিয়ে দিয়েছিল সব। কেন জানিয়েছিল সে জানে না। শুধু মনে হয়েছিল, বলা দরকার। শমসের থাকলে হতো বলত। কিন্তু সে আর এল কই। এখন, কথা বলবার জন্য সাকুলো বাকি বাবা। তাকে ছাড়া আর কাকেই-বা বলবে! সে ডেকেছিল—বাবা।

সত্যসাধন চোখ মেলেছিল। সে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলেছিল, একখান কথা আসিল বাবা। শুধু কথা।

সত্যসাধনের নাকের দু'পাশ কাঁপছে। চোখের নীচেকার শিথিল ও কালশিটে পেশি কাঁপছে। এই তার প্রহ্ন। এটুকুই অভিব্যক্তি। রাধিকা বড় বেদনায় বলেছিল—বাবা, মায় ডুবে নাই গ। মায় ভাইসা গেসিল। যেই সালতিখান চুরি হইসে বইলা তোমরা ভাবসিলা, সেইখান মায় লইয়া গেসিল।

সত্যসাধনের নাকের দু'পাশের কাঁপন বাড়ছে। চোখের তলাকার কাঁপন বাড়ছে। প্রহ্ন, প্রহ্ন, আরও প্রহ্ন। অনেক প্রহ্ন। যেন-বা বলতে চায়, কীভাবে জানলি রাধিকা? রাধিকা বলেছিল—আমি মাঘরে দাখসিলাম বাবা।

সত্যসাধনের চোখগুলো প্রথমে বিস্ফারিত হয়েছিল। তারপর চোঁট বঁচকে গিয়েছিল। তার হৃদয়ের অর্ধাং যোলা ও নিরতিবাস্তব চোখে জল ভরে এসেছিল। যেন-বা অভিযোগ। যেন-বা হাহাকার। যেন-বা অক্ষমতার তীব্র যন্ত্রণা। যেন তার আবুল প্রাণ নিঃশব্দে উচ্চারিত হয়—কইস নাই কান? তখন কইলি না কান?

রাখিকা শুকনো তখন। যেন-বা মরুভূমির। যেন তার কান নেই। যেন তার চোঁট যাবার প্রাকলমে এতটুকু বেদনা নেই। জীবনের অনিবার্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যেন সে মহাপুরুষের মতো ত্যাগী ও মৈত্রীশীল। স্বগতোক্তির মতো বলেছিল সে—বুঝিনি যা বলা। কিছুই বুঝিনি। মন্দিরতলা থেকে অন্য এক রাখিকা হবে ভেবে এসেছিলাম তখন। আমার যেন ছিল কিছু সৃষ্টি বদ্ধ ছিল। আমার মাথা ছিল কিন্তু মস্তিষ্ক অসাড়। বাবা গো, আমি যে সে-দিন প্রাণ পেয়েছিলাম। বুঝিনি, আমার প্রাণপ্রদায়ী মানুষের সন্তান পেয়েছি এমন-দিনেই আমার জন্মদায়িনী বা হারিয়ে যাচ্ছে। একজনকে বুকের মধ্যে গভীর আশ্রয় পেয়েছিলাম বলে আরেকজন নিজের বুক উপড়ে চলে যাচ্ছে। যেন ওই দিনটুকু পর্যন্তই তার থাকার কথা ছিল। যেন আমারই জন্য তার থাকার কথা ছিল। বাবা, সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল তখন। আমি যেন দেখলাম, ওই বাদল পেরিয়ে কার সাগতি ভেসে যায়। কার সাগতি জল ভিত্তিতে মেঘে মেঘে মেঘে। তার আঁচলখানি ওড়ে। তার চুল বুঝি বাহিত হয় জলধারায়া। বাবা, আমি বুঝি নাই গ। জানি নাই গ। মায় ভাইসা যায়।

তার পর থেকে আজও জলের কাছে একলা দাঁড়ালেই তার মনে পড়ে সাগতি বেয়ে ভেসে যাচ্ছে কে। মা-ই কি ছিল? যেন সে-দিন স্পষ্ট করে দেখিনি বলে আজও প্রত্যয় হয় না। তখন, নদী দু'কূল ছাপালে যেন তাকে গুণ করত কেউ। অনেকক্ষণ ধরে উথাল-পাথাল জল দেখত সে আর শব্দ শুনত। এমনকী বিছনায় রাতে শুতেও—যতক্ষণ ঘুম না আসে। এই শব্দের সঙ্গে বকুলফুলের সম্পর্ক পাতাবার ইচ্ছাও তার হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জলের শব্দকে সে কিছুতেই মেয়েমানুষ ভাবতে পারেনি। জলের শব্দ মানেই যেন বেটাছেলে—যে উন্মত্ত টানে কিন্তু যাকে লজ্জা পেতে হয়। শান্ত পুরুষের মতো, উন্মত্ত পুরুষের মতো, জলশব্দেরও যে কত ধারা। সাগরক্ষণ এই নিয়েই সে থাকে। এই সবই ভাবে। এই আকাশ-পাতাল ভাবনা ছাড়া কিছুতেই মন লাগে না রাখিকার। সবসময় চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। শুধু পরমেশ এলে ভাল লাগে। অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে। আবার মাঝে মাঝে তাও করে না। ইদানীং সকালটা শরতের মতো লাগে। পুজো এসে গেলে। রাখিকা পাকাসের দিকে তাকায়। নদী কুরিয়ে গেলে তার মন খারাপ করে। বর্ষায় মানুষের কত কষ্ট। তবু তার মন খারাপ করে। বর্ষায় শমসেরকে সে যতখানি করে পায় তেমন আর কখনও পায় না। সে ভাল করে ঘরখানি দেখে। এ ঘরে থাকতে থাকতে, এ ঘরের পরিত্রিত দৃশ্যে পরমেশকে দেখতে দেখতে, এ ঘরেই যেন শমসের পরমেশ একাকার হয়ে গেছে। এই ঘরও তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। কার্তিক শেষ যে-দিন এসেছিল, বলে গেছে। অনেকদিন হল চালের কারবার ছেড়ে দিয়েছে কার্তিক। ও সব আর ভাল লাগে না। হৃদয়পুরে কাঠের কারবারে জুটেছে। কত কি আয় করে রাখিকা জানে না। সত্যিই কি ওখানে আর একটা সংসার করেছে কার্তিক? করেছে নিশ্চয়ই। নরাজে আসে না কেন? থাকে না কেন? আগে যার একটা দিন শরীর ছাড়া চলত না সে এখন ঘরমুখোও হয় না কেন? সে-বরং এক পক্ষে রাখিকার ভাল। না আসুক কার্তিক। সে এভাবেই কাটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু টাকা? সে কোথায় পাবে? তার মন আরও ভার হয়ে যায়। মুক্তি নেই। কোথাও মুক্তি নেই। কার্তিক বলে গেছে, ফটিক বিলের ধারে একখানা ঘর নিয়েছে রাখিকার জন্য। দক্ষিণেশ্বরে যেতে ফটিক বিলের ধার দেখেছে রাখিকা। দূরে রেললাইন চলে গেছে। দামখানে ফটিকবিল। তার ধারে অসংখ্য ছোট ছোট ঘর। বাঁশের বেড়া। মাটির বেড়া। ঢালির চাল। পাশাপাশি মেঁঘাঝেঁষি নিচু নিচু ঘর। বিলের ওপর উঁচু বাঁশে চট টাঙিয়ে পায়খানা। ফটিক বিলের বস্তি। বস্তি কেমন হয় রাখিকা জানে না। হয়তো এরকমই হবে। বা এর চেয়ে খারাপ। সে বস্তি ভালবাসতে পারবে কি? পছন্দ করতে

পারবে কি? সে জানে না। কীসে আনন্দ তার, কীসে দুঃখ সে জানে না। শমনের বিনা জীবনের এইসব বোধগুলি সম্পর্কে চিরবিদ্রোহ বৃদ্ধি পে। এখানে এই ৮শ খর ভাড়াটের মতো শেফালির মা ছাড়া, পরমেশ ছাড়া কারেকই বা ভালবাসতে পারল রাখিকা? কারওকে নয়। প্রায়ই বাগড়া লাগে এখানে। শাওডি-বউতে লাগে। নন্দে-ভাঞ্জে লাগে। স্বামী জীতে কোঁ সব ঘরেই লাগে। মা বাচ্চাদের কিলোয়। এ বাড়ির বউ ও বাড়ির বউয়ের সঙ্গে গলা বুলেকাপার করে আর এ ওর সুসম্পর্ককালে বলা গোপন কথা ফাঁস করে দেয়। রাখিকার বোধ হয় বস্ত্রিও এমনই সংস্করণ। শুধু সেখানে ভাষায় অকথা শব্দ জুটে যায় হরতো চিৎকারে। আরও উদ্ভ্রামন।

শেফালির মা যদি না থাকত, পরমেশ যদি না থাকত, তাহলে রাখিকা মনের মতো আগলে রাখা পদাবলীর সব কথা এতদিনে ভুলে যেত। ফটিকের বিলে গিয়ে কি ভুলে যাবে? কে জানে। রাখিকা এখনও চলে যাবার কথা শেফালির মাঝে জানায়নি। কষ্ট পাবে মানুষটা। রাখিকা জানে। কিন্তু বলতেই হবে তাকে। আজ না হোক, কাল। যা-কিছু ঘটে মানুষের, এড়িয়ে যাওয়া যায় না এমনই সব কর্মসমূহ, বেশির ভাগ সমঝিঁ তা জটিল পরিপতি টানে অথবা যন্ত্রণার পরিপতি, আর বহি জানা থাকে এইসব ভবিষ্য, তাহলেও, জানা থাকা মধ্যেও মানুষ তা ঠেকিয়ে রাখতে চায়, যেন নেরি করলেই তার তীব্রতা কিছু কম পড়বে। যেন কষ্ট লাঘব হবে কিছু। রাখিকাও এমনই সাধারণী প্রক্রিয়ায়, আড়াল রাখতে চায় শেফালির মা'র যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্ত। যেন-বা আত্মজাতুল্য মমতা তার শেফালির মায়ের জন্য, আর তাই হওয়া উচিত, এমনই সে বোধ করে। রাখিকার জন্য কী না করেছে শেফালির মা! নিজের খাবার ভাগ করে খেয়েছে। ছেলেকে খাইয়েছে। মনে সাইস দিয়েছে। স্নেহ দিয়ে শাসন করেছে। রোজ এসে রাখিকার ছেলেকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যায়, আদর করে—জোছন জোছন জোছন। রাখিকার কল্যাণে মঙ্গলচতীর পূজা করেছে এখন। এমন কেউ হয়? কেউ করে? মা ছাড়া? শেফালির মাঝেও ছেড়ে যেতে হবে ভেবে চোখে জল এসে গেল রাখিকার। সে যেন দ্বিতীয়বার বাপের বাড়ি ফেলে যাচ্ছে। তবু এ একরকম, সে ইচ্ছে করলে বা শেফালির মা যদি ইচ্ছে করে, যাওয়া-আসা করতে পারবে। এত দূর নয় যে বাবার মৃত্যুসংবাদ পেতেই হারিয়ে যাবে তিন মাস। এমন নয় যে কালো পোলে কাদবার জন্য ছুটে আসতে আসতেই পথে পথে কালো ফুরিয়ে যাবে। তবু, সারাদিনের এই দেখা, এই সঙ্গ, এই নির্ভরতা, শিশু নিয়ে, বালক নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে, মেঘমেঘন এই মন নিয়ে একটা মানুষ, একটা শূন্য মানুষ, তার এই আঁকড়ে ধরা আর একটা শূন্য কিন্তু অসামান্য মানুষকে, এ সব তো থাকবে না। সে যখন জটাজুলে ঘুরে বেড়াবে, কেউ তো বলবে না—“কাইট্যা ফালামু। সব চুল কাইট্যা ভাসাইয়া দিমু গঙ্গায়। কান একটু আঁচড়ান্ যায না? বান্দন যায় না? মাইয়া মাইনয়ের এ কেমন ধারা ক দেখি। অলক্ষী হইয়া ঘুরস্—।” রাখিকা তার চুল আর এলিয়ে দেবে না। বলবে না—“আহা। লক্ষ্মী স্বান চুল ধইরা ঘরে আইবা।” তখন, শেফালির মা চুলগুলো মুঠোয় ধরে স্নেহে রাগে কষ্টে ডিকনি ঢালাতে ঢালাতে আর বলবে না—“হ। থো ফালাইয়া। আর কথা কইস না। কামে আড়া, বুজনে দাড়া।” রাখিকা আর বলবে না—“আর আকখান কও, মাসি, আর আকখান কও।” শেফালির মা, যেন বলতে চায় না এমনই ডান করবে আর বলতে চাইবে, তার ঠোঁটে হাসি থাকবে যেন বলতে চায়, ক্র কুঁচকে থাকবে যেন বলতে চায় না, তখন তাকে অপকৃপা লাগবে, এমন ঘটবে না, সে বলবে না—“হ, কি কম, তরে লইয়াই কওন যায় তুই যামন রান্দস্। দ্যাশে-গীয়ে হইলে কী কইত ক’?”

—কী কইত?

—অরান্দুনির হাতে পইড়া পুটিমাছে কান্দে

না জানি রান্দনি আমার কেমন ধারা রান্দে।

—হা হা হা। হি হি হি।

রাখিকা হাসছে। গড়িয়ে পড়ছে। পেট চেপে ধরছে। চোখে জল এসে গেল। তবু শোনা চাই।

তবু বলবে—আর আকখান। অ মাসি, আর আকখান—।

এমন কিছুই আর হবে না গো, হবে না। শেফালির মা রাধিকার কিনি বালিতে বাঁধতে, মাথায় কিনির বেড়া দিতে দিতে বলবে না আর—বামনি আর বামুনে মহাভগবতী। বুজনি মি।

—হ। হেইডা আবার বুজুন না।

—ঘরে কাক চিল বসে না। পেঁজাপান ঝগড়া দেখা পড়ায়। পাঁজাপড়শনে জানে আব্দুল দায়। তো ঝগড়াঝাটি কইরা বুড়ির পাটে টান লাগলে, বুড়ি কলমি কুলে হয়েসে। একলনে অইয়া কইল, অ বুড়ি, তোমার বুড়া মরসে। বুড়ি কয়—

—কী কয়? বুড়ি কী কয়?

—বুড়ি কয়—

বুড়ায় মরসে ভাল হইসে।

দুইখান কাঁথা আমার হইসে ॥

আর হবে না, এ সব আর হবে না। রাধিকা জ্ঞাথার। কেমন করে হাব? তখন তো শুধু দেখা করতে আসা। শুধু দু'চারটি দুগ্ধের কথা বলে—হ্যাঁ শুধুই দুগ্ধের কথা—কারণ রাধিকার আর সুখ কোথায়—সেইসবই বলে চলে যেতে হবে। সে কান্দছে। খুব কান্দছে। অ মাসি, মাসি গো, তোমাকে ছাইড়া থাকুম ক্যামনে? ছোট্ট শিশুটি কঁদে উঠল। কাঁথা ভিজে গেল বুঝি। এ কাঁথাও বানিয়ে দিয়েছে শেফালির মা। রাধিকা কাঁথা পালটে দিল। তখন দিচ্ছে শিশুকে। ছোট্ট শিশু পান করছে—চক চক। শব্দ হচ্ছে চক চক। মাঝে মাঝে তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে খান নেবার জন্য ছোট্ট নাকটি সরিয়ে নিচ্ছে। কেমন করে সরাস্থে? সে কি জানে, বোঝে, সরাতে হয়? এমন করে সরাতে হয়? কেমন করে জানে? রাধিকা শিশুর গালে আঙুল রাখে। দুগ্ধের উৎস মুখের মধ্যে যত্ন করে পুরে দেয়। এবং তার চোখ থেকে জল পড়ে। শিশুর গালে পড়ে। গাল থেকে তা ঠোঁটের দিকে গড়িয়ে যায়। দুগ্ধপানরত ঠোঁটের দিকে গড়াতে গড়াতে দুগ্ধের সঙ্গে মেশে। শিশু দুগ্ধের সঙ্গে মায়ের অশ্রু পান করে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কত যুগ, কত মহাবর্ষ শিশুরা পান করে আসছে এমনই দুধ মায়ের, এমনই চোখের জলে মেশা। রাধিকা জানে না। জানেনি কোনওদিন। আজ মাসির জন্য কাঁষ্ট তার মায়ের জন্যও কষ্ট হচ্ছে। আজ সমস্ত কষ্ট ছাপিয়ে উঠছে। মা কি পাগল ছিল? ওমনি পাগল ছিল যখন সে জন্মায়? মা-ও কি কান্দত এরকমই, আর তার চোখ থেকে জল পড়ে দুগ্ধের সঙ্গে মিশে যেত যখন পান করত রাধিকা! তার গলা থেকে কান্না ছিটকে আসে। শব্দ হয়। নামহীন, গোত্রহীন, উচ্চারণের অনেক তলায় অপার্থিব শব্দ হয়। চলে যাওয়া। ছেড়ে যাওয়া। কতবার ঘটবে তার? কতবার? সালতি নিয়ে মা ভেসে যায়। চলে যায়। ভাইস্যা যায় গো যার হাড়মাংসের জিয়ন্ত পিতিমা। আর সমস্ত বর্ষা ও বাদলের ঘন ঝঞ্ঝা বুকে করে, ঠোঁটে করে, ঘেন খড়-কুটো, ঘেন পানির বাসা বোনার তীর ইচ্ছার মতো সত্য, বুকে করে, অপেক্ষার আবেদন রেখে চলে যাচ্ছে শমসের। চলে যাওয়া। ভেসে যাওয়া। ছেড়ে যাওয়া। কতবার? কতবার? এবং মানুষ সাক্ষ্য পেতে চায়। বলে, যাচ্ছি বটে, চোখের আড়ালে থাকব, কিন্তু আমি রইলাম, আমরা রইলাম, রইলাম। রইলাম—বল্য হয় কিন্তু থাকা হয় না। একসঙ্গে থাকা, গায়ে গা লাগিয়ে, পাশাপাশি, যেন চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া যায়, যেন হাসিতে ভেঙে পড়া যায় পরস্পরের কাঁখে, যেন অসুখ করলে শীর্ণ ঠোঁট ভিজিয়ে দেবার সুযোগ পাই ঠাকুর—এ সব আর রইল কই!

শিশুটি ঘুমিয়ে পড়ছে তখন। বিকেল হচ্ছে। ছায়া নামছে পুকুরে। শিঙ মাছ, মাগুর মাছ মুখ তুলে দেখে নিচ্ছে আকাশ। সজনে পাতা খসে পড়ছে জলে, জল ঠাপছে। মৃদু। অতি মৃদু। এমনকী জলও তা টের পাচ্ছে না। যতসব অপআচারো কোথায় কী সম্ভান করছে। হয়তো নতুন কোনও পোয়াতি। নতুন কোনও ভরস্তু শরীর। সম্ভানের সম্ভাবনাময় রসালো পাকা আভ্যন্তরের মতো উপড়ে ওঠা তাদের শরীর। শিশুর জন্ম দেওয়া হয়ে গেল তবু রাধিকা এখন নিজের



অগোচরেই উপচে উঠছে। উপাচ্ছে উঠছে। ভাসবে বুঝি। ভেসেই যাবে এ বাবা। পিঠে ছড়ানো চুল। জন ফিরিয়ে নিচ্ছে জামার নীচে। তখন ঘরে ঢুকছে পরমেশ—বউদি—

—কে?

চমকে উঠছে রাধিকা। দুর্বোধ্য চোখ দেখছে সামনে। কাকে দেখছে? তার আঁখি। সে-নির্নের মতো ফে। কোন দিন? কোন দিনের মতো? শমসেরকে জড়িয়ে ধরবে? যেন করবে? একলা বিকেল কিংবা ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায়—শিবমন্দিরে, শিবলিঙ্গের কাছে—

—আজ জল রাধিনি। একটুও খাবার জল নেই। বউদি। একটু জল দোবন?

রাধিকা উঠতে পারছে না। কথা বলছে না। কী সে বলতে চাই আর বলতে গিয়ে গলার থেকে কান্না ছিটকে আসে। পরমেশ এগিয়ে আসছে। শমসের এগিয়ে আসছে। অনেক অনেক আশ্বাস নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে যুবক পুরুষ এগিয়ে আসছে।

—কাদছেন কেন? কী হয়েছে? বউদি?

সে হাত রাখছে। কাঁধে। হাত রাখছে। পিঠে। পিঠময় চুল। চুলে হাত ডুবে যায়। ডুবে যাচ্ছে। সে টানছে। কাছে টানছে। নারী কাঁদলে পুরুষ ডুবে যায়। নারী যতখানি কাঁদে, তার কতক বুঝি পুরুষের তরে। তবু, পুরুষ তার কোমল হৃদয়ে জানে, নারীর কান্না পুরুষের সহনীয় হয় না। তারা দ্রব হয়। ঠোট দিয়ে প্রিয় নারীর চোখের জল মুছিয়ে দেবার ব্রত তাদের। তবে কষ্ট দাও কেন? আঁ? কেন কষ্ট দাও? কান্না নিয়ে ব্যাপিয়ে পড়ে নারী। ঝরনা হল, খাল, বিল, পুকুর হল। নদীও হল বুঝি। পরমেশ সে পুরুষ এক, কোনওদিন নারীকে এমন নারীর মতো ছোঁয়নি। সে জল ভুলে যাচ্ছে। তৃষ্ণা ভুলে যাচ্ছে। তার মধ্যে এখন অন্য তৃষ্ণা। সে ন্যায় ভুলছে। স্থান ভুলছে। পাত্র ভুলে গেল। আমি কে, তুমি কে জানতে পারল না। কোথায় ডুবি, কেন, আমি কোন নদীতে ডুবি? কোথায় সে? ওগো সে কি নদীতে ডুবল, না পুকুরে, না কুয়োয়? সে কি সমুদ্রের পেল? ওগো কে মানুষকে এমন ভোবায়! এমন ভোবায় যে আমি ডুবে যায়, তুমি ডুবে যায়—ডুব ডুব ডুব ডুব...

রাধিকা তার মুখ ডুবিয়ে আছে। গলায় মুখ ডুবিয়ে আছে। এই তো সেই কষ্ট—যাতে চুইয়ে পড়ে জানের ধারাজল। এই তো সেই বুক, যাতে যেন ঘাসের মতো গ্রেম, যাতে অক্ষকার, মুখ লুকনো, কষ্ট লুকনো, চোখ মুছনো অশ্রুকার। পরমেশের সরু কোমর, মেদহীন, ঝড়ু কোমর জড়িয়ে আছে সে। মুখ ঘষছে বুকো। কোন বুক এ। কে এ। তুমি কে গো? কেমন করে এলে? তোমাকেই তো ফেলে এসেছি আমি? শিবের কাছে ফেলে এসেছি। জামকল গাছের গায়ে, রূপসী নদীর পাড়ে। এখানে তুমি কেমন করে এলে? তুমিই কি, তুমিই কি, তুমিই কি সমস্ত কান্তিকত হয়ে ঘুরে বেড়াও জগৎ চরাচরে?

পরমেশের পেট অথবা পেটের নীচে রাধিকার বুক সাপটে যায়। দুধ নামছে। এখনও দুধ নামছে কত। পরমেশ ভিজ়ে যাচ্ছে। সে কী করবে এখন? তার হাত ক্রমশ খুঁজছে। গুঁজে যাচ্ছে। সে জানে না কী খুঁজতে হয়। কেমন করে খোঁজে। নারী পেয়ে এমন দিশেহারা। নিচু হচ্ছে সে। শুইয়ে দিচ্ছে। তার গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু ঠোট নেমে যাচ্ছে ঠোটে আর ভিজ়ে যাচ্ছে। হাত নেমে যাচ্ছে বুকো আর ভিজ়ে যাচ্ছে। তখন মেঘ নামছে। ঢেকে দিচ্ছে আকাশ। আর দ্রুত রাত্রি নামছে। না জেনে না বুঝে পরমেশ উপুড় হতে গেল, যেমন মেঘ উপুড় হয়, উপুড় হওয়ার জন্য যেমন মাটি খোঁজে, আর পরমেশও তেমনি, উপুড় হতে গেল আর জাগিয়ে দিল বাচ্চা। রাধিকার সদা ঘুম পাড়ানো শিশু। শিশু কাদল। জোরে। আরও জোরে। হাত ছুঁড়ল। পা-ও ছুঁড়ছে। পরমেশ উঠে দাঁড়াচ্ছে। ফিরে পাচ্ছে হাত। ফিরে পাচ্ছে পা। শুধু, নারীকে যখন ছোঁয়নি, তখনকার স্পর্শটুকু নেই, তার কী যেন হাবিয়ে গেছে, কী যেন সে পেয়েছে—সে চলে যাচ্ছে, স্বপ্নে, অথবা ঘুমে, অথবা মগ্নে, সে চলে যাচ্ছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, ভুলে গিয়েছে, জল চাইতে এসেছিল। আর আশ্চর্য আশ্চর্যে ঝলসে যাচ্ছে রাধিকা। এত আশ্চর্য থাকে? শরীরে এত আশ্চর্য



ধাকে? সে হো কোনওদিন এমনি করে টের পারনি। সে পাল দিলে পুড়ে পড়ছে। জড়িতে নিচ্ছে শিশুকে। সম্ভানে শীতল হতে চাইছে। তার মনে পড়ছে, মনে না পড়ে উপায় নেই কোনও—

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| পিঙ্গলবরণ          | বসনবাঁনি      |
| মুখনি আমার মুখে।   |               |
| শিখান হইতে         | মাথাটি বাহুতে |
| রাখিয়া শুভল কাছে। |               |
| মুখে মুখ দিয়া     | সমন হইয়া     |
| বঁধুয়া করল কোলো।  |               |
| চরণ উপরে           | চরণ পসারি     |
| পরাণ পাইলু বোলে।   |               |

শেফালির মা ডাকছে। এখনও উঠিসনি? রাধিকা? রাধু? বেলা গেল। সন্ধে হল। কত কাজ করে এলাম আমি। দিমিঘির বাড়িতে কত লোক। এবার বুঝি ছেলের বিয়ে দেবেন বড়দিদিমণি। বেশ হবে। এক ছেলে হো গেল। আর এক ছেলে জড়িয়ে কত স্বপ্ন, কত সুখ। আমার ছেলেও তো কত বড়টি হল। বিয়ের যোগ্য হল। কিন্তু কেমন করে বিবাহ দিই? কোন মুখে বলি? রাধিকা? ঘর নেই। বাড়ি নেই। একই ঘরে খাওন, শোওন, বসন। আমারও ওই ওমনিই ছেলের বউয়ের মুখ দেখতে বড় সাধ যায় রে রাধিকা।

রাধিকা উঠল। আলো জ্বলছে। পলাশ কই, পলাশ? তার কথা মনে হয়নি এতক্ষণ! সে কি প্রেমী হয়ে মাতৃত ভুলল? সে কি এক প্রিয়তমে ডুবে ভুলতে থাকল অন্য প্রিয়জন? পলাশের কথা মনে হল না? ভাবল না, কেনই-বা এখনও সে ঘরে এল না?

শেফালির মার চোখ কুঁচকে আছে—মুখখান এমুন লাগে ক্যান?

—কী লাগে?

—এমুন ফুইল্যা ঢোল হইল ক্যান? কয়টার থিক্যা ঘুমাইতেয়ামসু?

—হ। ঘুমাইসি অখন। পলাশের লাখলা নাকি হেইজা কও।

—হ। পোলারে মনে পড়সে এতক্ষণে। হারুর লোকানে পাঠাইসেন দিমিঘি, মাদা আর বি কিনুম, সেই তর পোলায় খাড়াইয়া আসে। মাঠে যাইব। আমি কই, অ্যাতখনি আইসসু, মায় জানে? হ্যায় কয়, হ, আমি খালা করতে যাই। কয় বলে, মায় তো ঘুমায়, তাই, ডাকি নাই। আমারে জিগায়, কী ন্যাও দিলা? কই, মাঝি আমার লগে? কয়—কই যামু? মুখ দেইখা কষ্ট হইল। পোলাপান। ভাল-মন্দ কিসুই তো খায় না। দিমিঘির ঘরে কত কী হইতাসে। যাইব আমার লগে। খাইয়া আইব।

—খাইসে?

—হ। খাইসে। প্যাটি ভইরা খাইসে।

—অখন কই?

—শ্যামলের লগে কতা কয়। তুই শুইয়া আছস দেইখা আর ডাকে নাই।

রাধিকার বুক টনটন করে। নিজের জন্য এমন কাঙালপনা কখনও কি করতে পারত শেফালির মা? পারত না। নিজের জন্য মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারে না সে। কিছু বলতে পারে না। ক্লান্ত থাকে, তবু দাঁতে দাঁত চেপে কাজ করে আসে। ঘরে ভাল তরকারি ফুটিয়ে ফুটে যায়। দিমিঘি বাসি সিঁচি দেয়। কাটা ফল দেয়। খেয়ে নেয় নির্বিবাদে। হজম করতে পারে না। তবু বলে না, খাব না। পারব না। না বলতে শেখেনি সে। রাধিকা গাঢ় গলায় বলে—বও না, মাসি। বইসা যাও।

—হ। বমু অনে। বইলে চলব? কার আসে না?

—কাম কইরো। অকন বও। কত কাম তো কইয়া আইলা।

শেফালির মা বসে। রাধিকার একটু সহানুভূতিতে তার ক্লান্তি আরও দৃষ্টিগ্ণ হয়ে যায়। ছোট ছেলের পাশে বসে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে বানিক। আদর করে ডাকে জোছন, জোছন। জোছন চাঁদের মুখে ঘুমোয়। শেফালির মা ডাকে। জাত ঘাবে কি আসব কখনও এমন শিখ নাতির মুখ কি দেখতে পাবে সে?

মুখেচোখে জল দিয়ে এসে শেফালির মা'র কোলের কাছে বসে পড়ল রাধিকা। আজ তার ঘরের বাইরে যেতে লজ্জা করছিল। যদি কারও মুখোমুখি হয়ে যায়—কী হল আজ—এ কী হল। সে কি আজ দুপুরেও জানত, এমন হবে? হতে যাচ্ছে? হিঁ চিঁ। সে পরমেশকে মুখ দেখানে কী করে? সে কি কার্তিককে ঠেকাল? সে কি শমসেরকে ঠেকাল? না। কার্তিকের জন্য তার কোনও অনুভব নেই। বরং কার্তিককে লুকিয়ে, এই প্রথম, কিছু করতে পেরে, নিতে পেরে বেশ লাগছে। যেন মনে হচ্ছে তার নিজের কিছু আছে, একেবারে নিজের কিছু। যেন সে কোথাও একটুখানি স্বাধীন, একটুখানি মানুষ, যার সম্মান সে কিনা জানে না অন্য আর কেউ। কিন্তু সে কি পরমেশকে চেয়েছে? সে জানে না। সে কি শমসেরকে চেয়েছে? সে জানে না। ওই সময়, ওই অন্ধকারে, ওই কান্নায় সে কাকে পেয়েছে, কাকে? সে জানে না, বলতে পারে না, বুঝতে পারে না কিছু। শুধু এটুকু জানে, শরীরের ওই সুখ, ওইরকম আনন্দ, ওই বিস্তারিত আশ্রয় হয় যে, থাকে যে, সে জানত না। তার আগে কখনও হয়নি। এমন হয়নি।

—উঠ। বইয়া পড়লি ক্যান?

—উইঠ্যা কী করুম?

—ভাত বসা। প্যাটে দিবি কী?

—হ। মুড়ি খাইয়া থাকুম। পল্যাশের আর রইতে খাওন লাগব না। আইজ আর রান্দুম না কিসু।

—আমিও কিসু খামু না আইজ। লুচি খাইয়া প্যাটভা আইজাই করতেয়াসে।

রাধিকা ডাকে—মাসি।

—কী কইস?

—তোমার লগে কথা আসে।

—ক। কইয়া ফালা।

—মাসি। হায়া আমারে লইয়া বাইব কইসে।

শেফালির মা নড়ে বসে। কে নিয়ে যাবে? কোথায়?

রাধিকা বলে যাচ্ছে। সে নিয়ে যাবে মাসি, সে।

—কে নিয়ে যাবে? কার্তিক? কোথায়? কই আগে তো বলিসনি তুই? এতদিন বলিসনি তো?

—বলিনি। বলতে পারিনি মাসি। আজ আর পারছি না। আজ দুপুর থেকে কী সব ঘটে যাচ্ছে। কী সব হয়ে যাচ্ছে। আর পারছি না গো। আর পারি না।

—কী হয়েছে রে? কী হল?

—মাসি গো, আমি মাকে পাইনি জানো। আমার মা, পাগল মা না একদিন, ভরা বর্ষায়, সালতি নিয়ে ভেসে গিয়েছিল জলে, আমি মাকে দেখেও চিনতে পারিনি মাসি। বুঝতে পারিনি মা যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে। আমিও যে ভাসছিলাম তখন।

—তারপর? তারপর কী?

—মা মরে গেল। নাকি ভেসে গেল। কোথাও আর পাওয়া গেল না মাকে। এমনকী মাছে ঠোকরানো, চোখ উপড়ানো শরীরটাও না। ওই বর্ষাতেও হারুকাকা, মতিকাকা, বাবা জাল ফেলেছিল জলে। নেই, কোথাও নেই। তারপর বাবাও যেন কেমন হয়ে গেল। আর কোথাও

গেল না। তবলা বাজাতে গেল না। যাত্রাপালার গেল না। আর একদিনও পদাবলী পড়তে চাইল না। শুধু ঘাটলায় বসে থাকত সারাক্ষণ আর বুকে দিক চেয়ে থাকত। মা যখন ছিল বাবা ছুঁতেও দেখেনি মাকে। পাগল ছিল তো। কিন্তু মাকে বাবা ভালবাসত বরং। আমি টের পেতাম। মাসি। মা ছাড়া বাবার মধ্যে কেউই আর ছিল না। আমিও না। তাই বাবা পদাবলী পড়ত। চব্বীদাস বিদ্যাপতি পড়ত। আমি কুতাম, বাবা শোনাত, আসলে বাবা আমাকে শোনাত না। বাবা পড়ত আর বাবার মনের মধ্যে বসে, বুকের মধ্যে বসে হুতুত মা, জানে শুনে পাগল হয়ে যেত, বাবাকে পাগল করে দিত, বাবা-মায়ের মিলন হত জানো, পদাবলীতে মিলন হত।

—চূপ কর তুই চূপ কর। মা-বাবার কথা বলবে দেই। এ ভাবে বলে না।

—কেন বলে না মাসি? তুমি জানো না, আমার বাবা আমার পাগলী মাকে নতুন শাড়িতে দেখে কত খুশি হত। কীরকম ভালবাসে মাতো তাকিয়ে থাকত মায়ের দিকে। আমি বুঝতাম। সব বুঝতাম। মা চলে গেলে বাবা কেমন হয়ে গেল। আমি বললুম, বাবা পদাবলী পড়ো, স্তবক। বাবা পড়ল না। আমি হাতে বই ধরিয়ে দিলাম। হলুদ হলুদ বই। বাবা সরিয়ে রাখল। একদিন ঘাটলাতেই বসে থাকতে থাকতে অজ্ঞান হয়ে গেল। কখন হয়েছিল কে জানে। জ্ঞান যখন ফিরল, বিছনায় শুয়ে, সেখান, ঠেঁচি নাড়ল, আর কথা বলতে পারল না।

শেফালির মা কাঁদছে। নিঃশব্দে কাঁদছে। রাধিকাকে টেনে নিয়েছে কাছে। রাধিকা চলে গিয়েছে কোথায়। সেই বিলপাটনি গ্রাম, যেখানে মা ভেসে গেল, বাবা মরে গেল, হারিয়ে গেল শমসেরা। রাধিকা কেনে কেনে অন্ধ হয়ে গেলেও আর ফিরে পাবে কি কারওকে? একজনকেও? সে বলে চলল—বিয়ে দিল কাকা। আমার সব গেল। কাকির কাছেও সুখ ছিল না। শান্তি ছিল না। তবু ওরা নিজের ছিল। ওই গ্রাম, ওই নদী, ওই পাড়া-পড়শি। ওই তাজিয়া নিয়ে মহরমের মিছিল, ওই শিবমন্দির পুজো, আরও কত সব ছিল তো, বিয়ে হয়ে আর কিছুই রইল না। আমি একেবারে শূন্য হয়ে গেলাম। না। ভগবান শূন্য হতে কেন না কিছু। কিছু রাখেন। একটু রাখেন। তেমনি রইলো। তুমি রইলো। আমার ছেলে রইল। তুমি আমাকে য়েহে ভিজিয়ে দিলে। কত ভালবাসলে মাসি। এতখানি কেউ কখনও বাসেনি। আমি তোমার মধ্যে মাকে পেলাম। মা তো যন্ত্র হয়ে ছিল, পাগল হয়ে ছিল, ভালবাসতে জানত না। অথবা জানত, আমরা বুঝিনি বলে, দেখিনি বলে, দুঃখে অমন পাগল হয়ে ছিল। মাসি, তোমার কোলে আমি মায়ের কোল পেয়েছিলাম। ভগবান সেইটুকুও কেড়ে নিলেন। ও মাসি, মাসি গো, আমি তোমায় ছেড়ে কেমন করে থাকব?

শেফালির মা পাথর হয়ে যাচ্ছে। পাথর চাপা বুক তার। বইতে-বইতে অভ্যাস হয়ে গেছে। সে প্রশ্ন করছে—কোথায় নিয়ে যাবে কিছু বলছে? কইসে কিসু?

—হ। কইসে। বলেছে। ঘর নিয়েছে ফটিক বিলের বস্তিতে।

ফটিক বিল? শেফালির মা'র দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। হায় মা মঙ্গলচণ্ডী। এত ডাকলাম তোমাকে। এত করে পূজো দিলাম। আমার কি কোনও অপরাধ হল? মেয়েটাকে শেষে বস্তিতে নিয়ে ফেললে?

যত কষ্টই পাক, যত দারিদ্র, অনাহার সইতে হোক শেফালির মাকে, বস্তিজীবন তাকে পোহাতে হয়নি কখনও। যখন তারা দেশ-বাঁ ছেড়ে চলে আসে তখন গ্রাম সম্পর্কে চেনা ছিল বলে খুব সাহায্য করেছিলেন মল্লিনাথ ডাক্তার। তখন তাঁর বয়স অল্প। সাহায্য করার বিশেষ কিছু ক্ষমতা ছিল না। তবু, ওই মাথুরের গড়ে যাঁরা বসবাস করতেন সে সময়, সবাই মোটামুটি সবুজ ও সম্মুখ পরিবার, তাঁদের অনেকের মধ্যেই পাকিস্তান থেকে উদ্ভাস্ত হয়ে আসা মানুষদের প্রতি সহানুভূতি ছিল, কারণ, সেইসব পরিবারের অনেকেই, তখন থেকে দশ বা পনেরো বা হতে পারে তারও বেশি সময় আগে পূর্ব বাংলা ছেড়ে এ পাঠে এসে বসতি করেছিলেন। ধীরে ধীরে ওছিয়ে সামলিয়ে এসেছিলেন বলে এ দেশেও পাকাপাকিভাবে বসতে তাঁদের অনুবিষে

হয়নি। তাঁরা দীর্ঘকাল দুই বাংলাতেই সম্পত্তি ও বাওয়া-আসা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু শেফালির মায়েদের মতো মানুষরা, যাদের সম্পত্তি বেশি ছিল না, ভিত্তিমাটি আর সামান্য জমিজমা, তারা সেটুকু শেষ দিন পর্যন্ত ছাড়তে চায়নি। আমাদের কিংবা হুইন না। কাশ ছাইড়া কুনখানে যামু—এমনই তারা ভেবেছিল জীবন নিয়ে টানটানি হওয়ার দিনটি পর্যন্ত। আরপর শুধু প্রাণ হাতে করে, পরম্পরের কাঁধে ভর দিয়ে, একটি-দুটি পুতুলি আর সামান্য গমলা-গাটি সম্বল করে সব ফেলে তাদের চলে আসতে হয়। সেই ঘর—কত স্বপ্ন, কত স্মৃতি মাথা, জীবনের পরম আশ্বাসের মতো সেই রোদুর-পড়া উঠান, কাক-শালিক-কতুই-বুলবুল-সোয়েল জড়ানো মোহময় দুপুর, সেই কুলুঙ্গি—যেখানে লক্ষী বসেছিলেন, সেই আচানের রমান, ফুলছাপ দেওয়া সেই বিয়ের তোড়কাখানা আর সবরি কলার কাঁকড়া ওই গাছ—সব ফেলে, মাটি ফেলে, জীবন ফেলে, শুধু প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটে আসা—সে কতকাল আগে। তবু সব মনে পড়ে যায়। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মনে থাকবে সব। ওই আলোছায়া, ওই গছ, ওই পুকুর এ সব কোনওদিন জোলা যাবে না। আর শেফালির মা, যার শেফালিটাই হারিয়ে গেছে, তবু সে বেঁচে আছে, তুমুলভাবে বেঁচে আছে শুধু শেফালির মা হয়েই, সে এখন বুঝি-না আরও এক শেফালিকে হারাতে চলেছে, এমনই বেদনায়, বিড় বিড় করছে, চৌটে জিতে উচ্চারণ করছে, বোঝাতে চাইছে, রাধিকা নামের একটি দুঃখী, বিপর্যস্ত, সহায়সম্বলহীন মেয়েকে বোঝাতে চাইছে, এ কিছু নয়, এই ছেড়ে যাওয়া, এ কিছু নয়, এর চেয়ে অনেক বড় ছাড় সারা জীবন ছাড়তে হয় মানুষকে। সে বলে যাচ্ছে, শুনে চলেছে রাধিকা, সইতা, এক আন্দারে, ঘর ফালাইয়া, দুয়ার খুঁইয়া, সব ফালাইয়া, চক্ষের জলে বন্ধ ভাসাইয়া, আমাগো পলাইতে হইল। পালিয়ে গেলাম। আমরা পালিয়ে গেলাম। আর এ পালানোয় ফেরার কোনও পথ রইল না। এ এক চিরপলায়ন। পিছনে চাইবার অবকাশ নেই, সামনেও তাকানো যায় না। অন্ধকার। শুধু অন্ধকার। হাঁটছি, হাঁটছি, হাঁটছি। দলে দলে লোক হাঁটছে। একেকটি পরিবার জড়াজড়ি করে হাঁটছে, যেন ছেড়ে না যায় কেউ, যেন হাত ফসকে না যায়, যেন মিশে না যায় ভিড়ে আর পথ হারিয়ে ফেলে। এত ভালবাসা। এত টান। পথ চলেছে লোক। পড়তে পড়তে, উঠতে উঠতে চলেছে। বাবা মেয়ের হাত ধরে আছে। মা ছেলেকে বুকে চেপে আছে। ভাই ভাইকে সাপেট জড়িয়ে আছে। শেফালি আমার কোলে। আমি আর হাঁটতে পারছি না। বসে পড়ছি। ক্লান্ত। অবসন্ন। সে বলছে, চলো, যেতে হবে। সবাই সবাইকে বলছে, চলো, যেতে হবে, থেমো না, দাঁড়িয়ে না, যেতে হবে। কোথায় যাব? কোথায়? কেন যাব? কী পাপ করেছি? কী অনায়া করেছি? আর পারব না, আর যাব না, এই বললাম, বসে পড়লাম। কী ক্লান্তি, কী ভয়। কীসের ভয়? সবই তো ছেড়ে এসেছি, ভয় কীসের। তবু ভয়। প্রাণটা তো আছে। দেহটা তো আছে। যদি হারায়। যদি না থাকে। যদি মরি। মৃত্যুভয়। মৃত্যুভয়ে কালো হয়ে আছে মানুষগুলি। যত মৃত্যু তত প্রাণ আঁকড়ে ধরা। বাবার হাত থেকে মেয়ে ফসকে গেল। স্বামীর হাত ছাড়িয়ে স্ত্রী পড়ে গেল। জল চাই জল। ভাইকে ছেড়ে ভাই ছুটল জলের সন্ধানে। নদী শুকিয়ে ডোবা। ডোবা শুকিয়ে পুকুর। পুকুর শুকিয়ে কাদাজল। সেই জলই পান করতে ছুটল। আঃ বড় ক্লান্তি, বড় তেঁট, জল খাবে, উপুড় হয়ে পড়ল আর জলে জিভ ঠেকাবার আগেই তার প্রাণ উড়ে গেল। সে আর বেঁচে রইল না। তার পথ মাঝপথেই শেষ হয়ে গেল। কেউ ফিরে তাকাল না। তার ভাই, সব পলায়নপর ভাই, তার পিতামাতা, তার বোন, সবাই ওই কাদাজল খেল, ঢেকুর তুলল, এবং পথ চলতে লাগল। শোক করল না। শোক ভুলে গেছে। কিংবা এই চলতে থাকা, এই তো এক শোকপালন, এর চেয়ে বড় শোক আর হয় না। তোমাকে পথে রেখে গেলাম। তুমি শুয়ে থাকো। শেয়াল কুকুরে তোমার দেহ ছিঁড়ে থাক। চিল শকুনে তোমাকে ভোজন করুক। আমি দেখব না। ও আমার ভাই, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, সেদা বোনটি আমার, তোমাকে ফেলে চলে যাচ্ছি শুধু বেঁচে থাকব বলে আর বেঁচে থাকলে কাদব বলে আর চিরকাল শোকগ্রস্ত থাকব বলে। এখন আর শোক করলাম না। আমিও

আর শোক করলাম না। আমার শেফালি হারিয়ে গেল। শোক করলাম না। ভীষণ ভয়, ভীষণ ভাড়া। দারুণ ইচ্ছা বেঁচে থাকবার। দুনিয়ার ইচ্ছায় আমরা ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে ছুটতে যখন বুঝলাম, হ্যাঁ, বেঁচে আছি তো। হ্যাঁ, এই তো দম নিচ্ছি। এই তো আমার হাত পা মুখ চোখ। এই যে আমি। সত্যি সত্যি আমি। আর এই আমার আকাশ। এই আমার মাটি। আর। ওই পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল। আর। বেঁচে থাক কী সুন্দর। বেঁচে থাকা—তখন আমার মনে পড়ল—বেঁচে আছি, কিন্তু শেফালি কই? সব হারিয়েও সব আছে, কিন্তু আমার শেফালি কই। এই আকাশ এই মাটি এই জল হাওয়া রোদুর—সব আছে। সব আমার শেফালি আর কোথাও নেই। হে ভগবান! এই কি তোমার বিচার? এই কি তোমার ন্যায়? নির্দেশ? কৃপা কল্যাণ? গোটা একটা জীবন নিয়ে দাও আর বিনিময়ে কেড়ে নাও একটি দু'টি স্নেহমিষ্টতা?

রাধিকা কাঁদছে কিন্তু শব্দ করছে না। শেফালির মা কাঁদছে কিন্তু শব্দ করছে না। মানুষ তা হলে শেষ পর্যন্ত শুধু বেঁচে থাকে। শুধু বেঁচে থাকতে চায়, আর কাঁদে। কাঁদতে চায় না কিন্তু কাঁদতেই হয়। তাদের কান্না মিলেমিশে যেতে যেতে জন্ম হয় নতুন সব কামান। এবং শুধু, একজন আর একজনকে হুঁয়ে থাকে। হুঁতে চায়। মানুষের জন্যই কাদে মানুষ আর কান্নায় ডুবতে ডুবতে শেষ পর্যন্ত আর একজন মানুষকেই চায়। তাই, তাই, তাই একসঙ্গে থাকতে চাওয়া, একসঙ্গে বসবাস করতে চাওয়া, মতভেদ, ইচ্ছেভেদ, অভিমান-অভিযোগ সব-সময়ে একসঙ্গে জড়িয়ে থাকার ইচ্ছে। গভীর ইচ্ছে। আর তা সম্ভব না হলে, বিচ্ছিন্ন হতে থাকলে, অসম্ভব-অসম্ভব কষ্ট—যেন কোনও বিরক্ত দানব দু'হাতে নিষ্ঠুর হিড়ে নিচ্ছে ধড় থেকে মুণ্ড থেকে নখ চুল হৃৎপিণ্ড।



দুর্গামত্সের সামনে মূর্তির দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনিসুজ্ঞামান। দুর্গার এই বিশালতা, সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি ও পূজকন্যা সমেত অধিতানের আড়ালে একটা পারিবারিকতা আছে, অনিসুজ্ঞামানের মনে হয়, এটিই প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বাঙালির আরাধনার বিষয়। এই পারিবারিকতা। সুখী-সুবন্ধন পরিবারের চেয়ে সুন্দর আর কী হতে পারে এই মানব সভ্যতায়।

মূর্তির কাছে যেতে ইচ্ছে করে অনিসুজ্ঞামানের। কিন্তু উপায় নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে। অনেক আগে, কত আগে তা নিজেও জানেন না তিনি, তাঁদের পূর্বপুরুষ, হিন্দু ছিলেন। তখন তাঁদের দুর্গাপূজার অধিকার ছিল। এখন নেই। ঈশ্বর নন, কোনওদিনই নন, আসলে মানুষই মানুষের অধিকার রচনা করে এবং খণ্ডায়। অবশ্য এও বিচার্য যে হিন্দু থাকাকালীন তাঁরা কী ছিলেন! হাঁড়ি, ডোম—অস্পৃশ্য অন্ত্যজ। নাকি সম্বংশে প্রণমা। এ বিষয়ে পরিবারে কথাই চলে না তেমন, কথা উঠলেও এড়িয়ে যাওয়া হয়, যেন কোনওকালে হিন্দু থাকার লজ্জা তাঁদের আজও স্পর্শ করে ফেলবে। তবু, কান্যাঘুরায় যতটুকু জেনেছেন তাতে জেনেছেন যে অন্য অনেকের মতো অত্যাচারিত হয়ে নয়, মুসলমানের মোরয়ে ভালবেসে গৃহ ও ধর্মত্যাগ করেছিলেন তাঁদের কোনও একজন পিতামহ। সামাজিক মর্যাদায় তিনি ছিলেন উচ্চ বংশীয় কায়স্থ। এইটুকু জানার মধ্যেই সুখের বিষয় এই যে, সেই ধর্মান্তরীকরণের মধ্যে কোনও ঘৃণা ছিল না। প্রেম ছিল।

দুর্গা-সম্পর্কিত যে-গবেষকামূলক ছুটি লিখছেন অনিসুজ্ঞামান, তার কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। এর আগে তিনি একটাই বই লিখেছেন, যাকে পূর্ণাঙ্গ বই না বলে পুস্তিকাও বলা যায়:



তার বিষয় ছিল সাধারণ জনজীবন ও সর্বধর্ম সমন্বয়। কিংবা প্রকৃতপক্ষে এই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠা করা যে, কোনও ধর্মের সঙ্গেই কোনও ধর্মের বিরোধ নেই। সব ধর্মই প্রকৃতপক্ষে মানুষের কল্যাণের কথা বলে। কিন্তু তাঁর ওই ছোট পুস্তিকার সমান্য প্রবন্ধে এ সব কিছুই যুক্তি ও বিশ্লেষণ সমেত প্রকাশ করা সহজ ও সম্ভব ছিল না। এবং, ওইটুকু লিখতে গিয়েই আনিসুজ্জামান অনুভব করেছিলেন তুলনামূলক ধর্মীয় বিষয়ে লিখতে গেলে গভীর অধ্যয়ন এবং পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন যা খুব অল্প সময়ে করা সম্ভব নয়। অতএব, তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে প্রবন্ধ বা পুস্তিকাটি দিয়ে তাঁর রচনা শুরু হয়েছিল, সেই প্রবন্ধই তাঁকে অনায়াসেই লিখে যেতে তাঁর ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যটি প্রতিষ্ঠার জন্য। বিবাহ নয়, সংসার পালন নয়, সম্মান উৎপাদনের প্রয়াস নয়—আনিসুজ্জামান লিখে যেতে চান মাত্র কয়েকটি গ্রন্থ।

ওই পুস্তিকাটি যখন লেখেন আনিসুজ্জামান তখন দুই বাংলার রাজনৈতিক আশ্বন ফুলছে। আনিসুজ্জামানের প্রিয় ছাত্ররা, ছাত্রের বন্ধুরা তখন মরছে, পালিতে বেড়াচ্ছে আর দাঁতে দাঁত চেপে লাড়াইয়ের সংকল্প নিচ্ছে। দুই বাংলায় দু'রকম মুক্তির প্রার্থনা।

নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের স্থির কোনও সিদ্ধান্ত ছিল না। ওদের অনেক মত ও পদ্ধতি সমর্থনও করতে পারেননি সবসময়। আবার ওদের দূরেও রাখতে পারেননি। ওদের ইচ্ছাটিকে তিনি শ্রদ্ধা করেছিলেন। তাই সাহায্যও করেছিলেন সাধ্যমতো। ছাত্রদের মধ্যে যারা মার্কসবাদী ছিল না তারা আনিসুজ্জামানকে সন্দেহ করেছিল। কিন্তু তিনি সেইসব সন্দেহাকুলদের সঙ্গেও সহজ ছিলেন। সমান বন্ধুত্বপূর্ণ ও স্নেহশীল। সেটুকুর জন্যই হোক বা অন্য কোনও কারণ—যাকে ভাগ্যের জোর বলা যায়—আনিসুজ্জামানকে কেউ বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়নি বা পুলিশকে ফোন করেনি এই বলে যে, তিনি নকশালদের আগ্রহ দিচ্ছেন। অন্যান্য অধ্যাপকরা চতুরভাবে আবহাওয়া বুঝে চলতেন। এবং এড়িয়ে চলতেন ছাত্রদের। কোনটা আন্দোলন কোনটা নয়, কোনটা যথার্থ কোনটা ধ্বংস এই বিচারবোধ গুলিয়ে গিয়েছিল তাঁদের। আনিসুজ্জামান স্বীকার করেন, সে-দলে তিনিও পড়েন, কোনও ব্যতিক্রম তিনিও নন। তাঁর শুধু বাড়তি ছিল একটাই বস্তু, তা ওই ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা, যারা স্বপ্ন ও আশ্বন সমেত শুল্লিঙ্গ ছিল এক এক জন। অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না বলেই, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি বলেই, ওই বারুদ ও মারণের গন্ধের মধ্যেও মানুষের চিরন্তন বোধ ও সমস্যা সম্পর্কে ভাবা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

দেবী দুর্গা যে তাঁর কোনও গ্রন্থের বিষয় হয়ে উঠবেন তা তখনও ভাবেননি আনিসুজ্জামান। কিন্তু ধর্মবিষয়ক পড়াশুনো করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, হিন্দুধর্মের শাখা-উপশাখা এত বিস্তৃত ও জটিল যে গভীর অধ্যয়ন না করলে এ ধর্ম সম্পর্কে কোনও যথার্থ জ্ঞান অধিগত করা সম্ভব নয়। নিজে মুসলমান হওয়ায় এবং মনিকলের ম্যাপক ধর্মাচরণানুগত্যের কারণে ইসলামের তত্ত্বগুলি তিনি অবহিত ছিলেন। ফলে ইসলামি তত্ত্ব সরিয়ে রেখে হিন্দুধর্ম, দেবদেবী বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতা নিয়েই তাঁর পাঠ শুরু হয় এবং ক্রমশ ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে থেকে দেবী দুর্গা খুবই আকর্ষণীয় বিষয় প্রতিভাত হন তাঁর চোখে। তিনি উপলব্ধি করেন, বাঙালি হিন্দুর অস্তিত্বের মধ্যে দুর্গার প্রভাব অপরিসীম। শুধু ধর্মে নন, তিনি গার্হস্থ্যে আছেন—আবার মহাকাব্যেও। সংস্কৃতিতে আছেন—আবার সমাজেও। এমনকী তিনি স্বয়ং হয়ে উঠেছেন এক বিশাল অর্থনীতি। সুতরাং তিনি দুর্গা সম্পর্কে পাঠ জারি করলেন এবং লিখে চললেন একের পর এক প্রাবন্ধিক অধ্যায়। তৃণাকুর আনিসুজ্জামানের সঙ্গে আলোচনা করে এবং প্রবন্ধগুলি পাঠ করে খুবই উৎসাহী হয়েছেন এবং নিজেরই ইচ্ছায় সু. ভা. প্র. প্রকাশনীর সঙ্গে আনিসুজ্জামানের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন যারা এ ধরনের গবেষণামূলক গ্রন্থ ছেপে থাকে।

তৃণাকুর এ বাড়িতে ফের বসবাস করতে শুরু করার লাভবান হয়েছেন আনিসুজ্জামান। কারণ দু'জনেই একই পেশার মানুষ তাই নন—পরম্পরিক আগ্রহ, দর্শন ও মানসিকতার মধ্যে



কোনও সমস্ট নেই। সে-ভাবে বলতে গেলে তৃণাঙ্গুরই আনিসুজ্ঞামানের একমাত্র সমন্বয়ী বন্ধু। অন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে কেউ তাঁর অধ্যাপকের বয়সী প্রাণ, আর কেউ ছাত্রের বয়সী—বা ছাত্ররাই।

কিছুদিন আগে তৃণাঙ্গুর একটি ভাল পরামর্শ দিয়েছেন আনিসুজ্ঞামানকে। ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী এরকম কয়েকজনকে তৃণাঙ্গুর জেনেন যারা বাংলাদেশে বসবাসকারী ছাত্র বা অধ্যাপক। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এগোলে কেমন হয়। কথাটি ভেবে সেবেছেন আনিসুজ্ঞামান। এ বুঝই ভাল প্রস্তাব। সামাজিক নৃত্তিকোণ সম্পর্কে আলোচনার আদান-প্রদান বুঝই কার্যকরী হবে নিশ্চয়ই। ধর্ম ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করে, বর্তমান নিয়ন্ত্রণ করে, গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে মানব প্রগতি—যার প্রভাব কোনও বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে কম সুদূরপ্রসারী নয়।

সারা জীবনের প্রচেষ্টায় যে-গ্রন্থটি আনিসুজ্ঞামান লিখবেন বলে স্থির করেছেন তার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে এবং এ কাজের জন্য চিন্তা বিনিময়ে তার এতটুকু কুটা নেই। তৃণাঙ্গুরকে নিজের মত জানিয়ে দিয়েছেন আনিসুজ্ঞামান। তিনি যোগাযোগ করতে চান। তৃণাঙ্গুর পূজা মিটে গেলে যোগাযোগের কাজ শুরু করবেন। স্নায়ুদৌর্বল্য হওয়ায় আজকাল ভাল লিখতে পারেন না তৃণাঙ্গুর। আনিসুজ্ঞামান জানেন না, সত্যিই শর্মি তৃণাঙ্গুরকে স্রো-পয়জনিং করে শেষ করে দিতে চেয়েছিল কিনা। ভাবতে কষ্ট হয়, আবার ভাবা যায় না এমনও নয়। যদিও আনিসুজ্ঞামান যত দূর জানেন, স্নায়ুজনিত সমস্যা তৃণাঙ্গুরের বাবার ছিল এবং তৃণাঙ্গুর নিজে সে-সমস্যা নিয়েই জর্মেছিলেন। অবশ্য এটা নির্দিষ্ট নয় যে তৃণাঙ্গুরের পিতা স্নায়বিক অসুখেই ভুগতেন, তাঁর রোগ মানসিকও হতে পারে। কারণ যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সবই স্নায়ুতেই বর্তায়। তবে তৃণাঙ্গুরের মতো গভীর ও বইপ্রেমী, কবিতাপ্রিয়, আপন জগৎ ও পড়াশুনোয় ডুবে থাকা মানুষ—নির্বিরোধী ও নির্ভরশীল মানুষকেও যে কারণে ধীর-বিস্ত্রিয়া করার প্রয়োজন হতে পারে তা ভাবতেও আনিসুজ্ঞামানের কষ্ট হয়। অজ্ঞাতশত্রু হওয়ার থেকে অতিরিক্ত অসম্ভব আর কিছু হয় না পৃথিবীতে। যে-কোনও মানুষই তার নিজের অগোচরে অন্যের শত্রু হয়ে উঠতে পারে। আনিসুজ্ঞামান দেখেছেন অপরের বিদ্য হয়ে উঠতে সব সময় সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

মাথুরের গড়ের দুর্গাপূজায় এবার উজ্জ্বল্য কম। তার কারণ, আনিসুজ্ঞামানের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক পরাজয়। যদিও কয়েকটি জায়গায় কংগ্রেসের আসন রক্ষিত আছে, কিন্তু এ হল শক্তিবাহিনীর শক্তি। বুড়ো সিংহের মতো। সিংহ—কিন্তু দাঁত-নখ ক্ষয়ে যাওয়া। এমনকী এই এলাকাতেও কংগ্রেসের প্রভাব অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও এবং পূজার কর্মকর্তারা কংগ্রেসি হওয়া সত্ত্বেও শোক পালনের মতো নিরানন্দ এ পূজা। এতদিন এ পূজায় মাকর্সবাদীদের কোনও আড্ডা পর্বন্ত ছিল না। কিন্তু এখন হয়েছে। আনিসুজ্ঞামান ও নীলিমার বাড়ির একতলার গ্যারেজঘরে পাঁচি অফিস খুলেছে সি পি এম। কিন্তু মাকর্সবাদীরা পূজায় আগ্রহী নয় সুতরাং পাঁচি অফিস হওয়াতে মা দুগ্ধার মুখ উজ্জ্বল হয়নি। সে-দিক থেকে দেখতে গেলে, আনিসুজ্ঞামানের মনে হয়, সারা কলকাতাতেই পূজার বর্ণ কম থাকার কথা। তা হলে কি মা দুর্গাকে খানিকটা রাজনৈতিকও বলা যায় না? যায় নিশ্চয়ই। রামচন্দ্রের অকালবোধন, অর্থাৎ শারদীয়া পূজার সূচনার পিছনেই কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল না? তবে আনিসুজ্ঞামান এ তথ্য পেয়েছেন যে অকালবোধন সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। কৃতিবাসী রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় রামচন্দ্র অকালবোধন করে দেবীর পূজার প্রচলন করেছিলেন। সারা বাংলায় তাই মানা হয়। যে-সব পট, কঠনোদাই বা পোড়ামাটির শিলে দুর্গার অকালবোধন উৎসর্গ আছে তাতে রামায়ণের কথনই মানা হয়েছে। কিন্তু পুরাণে আছে—ব্রহ্মা স্বয়ং দেবী দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন। পুরাণে যাই থাক, আনিসুজ্ঞামান মনে করেন, যে-সত্য মহাকাব্যে লিখিত তার কোনও তুলনা হয় না, কারণ মহাকাব্য মানুষের

জীবনের প্রতিচ্ছবি। দর্শনের ব্যঞ্জনা। অনুভবে রঞ্জিত সেই সত্য—যা মন থাকে সহস্র বছর পরেও।

পূজার ঘন্টা বাজছে। অনিসুজ্ঞামান দেখছেন—কত আয়োজন। সারা কলকাতা শহরের কোন্ কোন্ পূজা দেখতে যাকেন তার একটি তালিকা অনিসুজ্ঞামান প্রকৃত করেছেন কাল রাহে। এর মধ্যে কয়েকটি পারিবারিক পূজাও আছে। গত পাই বছর ধরে এ-সব তিনি করে আসছেন। মুসলমান বলে তাঁর অসুবিধে অনেক। ব্যারোয়ারি মণ্ডপের বাইরে দাঁড়িয়ে হুপড়ায় দেখা ছাড়া কিছু করার নেই। মুসলমান বলে পূজাগুলো বেচে পারবেন না—এমন কোনও সংস্কার ব্যারোয়ারিতে বজায় নেই। তেমনই নিয়মের প্রতি আনুগত্যও আরো নেই। ঘট যথার্থ শুদ্ধ হল কিনা তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পাই মণ্ডপসম্বন্ধে গণকটিকা, কেল্লা ব্যারোয়ারিতে মা আর ধর্মে নেই, আছেন শিল্পে, সংস্কৃতিতে, অর্থনীতিতে এবং সৌন্দর্যচর্চায়। গভীর নিরিখ করতে হলে পারিবারিক পূজায় যাওয়া চাই। পারিবারিক পূজাগুলির এক একটি ইতিহাস থাকে। এবং এই পূজাগুলি খুব নিয়ম-নিষ্ঠা মেনে সম্পন্ন হয়। নানা পরিচয়ের সূত্র ধরে এককম কয়েকটি পূজা দেখতে গিয়েছিলেন অনিসুজ্ঞামান, কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয়নি। কোনও পরিবারই তাঁকে পূজাগুলো বসে আচার-বিধি দেখার আমন্ত্রণ জানায়নি। যথার্থ ভক্ততার সঙ্গে সব জায়গাতেই তাঁকে প্রেতি সাজিয়ে প্রসাদ বেতে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও প্রত্যেকেই খুব আগ্রহের সঙ্গে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে তাঁর প্রয়োজন সবটা মেটেনি।

গৃহের পূজামণ্ডপে যে কেউই তাঁকে বসতে বলেননি এ নিয়ে তাঁর কোথাও কোনও অভিযোগ নেই। নিজের বাড়িতে তিনি হিন্দুদের সম্পর্কে উদাসিনতা দেখেছেন। তিনি মনেছেন—যেহেতু ধর্মচর্চার বিধি-নিষেধ মানুষের আদিমতম সংস্কারে মিশে আছে সেহেতু এ আচরণই প্রত্যাশিত। তাঁকে পূজাগুলো না ডাকার পিছনে কোনও অপমানের উদ্দেশ্য নেই, আছে হয়তো-বা পাপের ভয় যা ছোঁয়াজানিত দেবতার রোষ থেকে উৎপন্ন হতে পারে। এবং এই সমস্ত প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণও অনিসুজ্ঞামানের গবেষণার বিষয়।

তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনে গত বছর পূজায় নীলিমা অনিসুজ্ঞামানকে দণ্ডপুঙ্করে তাঁর বাপের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। নীলিমার বাপের বাড়িতে দুর্গাপূজা প্রচলিত আছে আর তা খুবই প্রাচীন। নীলিমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁর শিক্ষিত ও প্রগতিশীল ভাইবোনেরা অনিসুজ্ঞামানকে মণ্ডপে প্রবেশ করতে ও কাছ থেকে পূজা দেখতে দেবেন। অনিসুজ্ঞামানের মহৎ উদ্দেশ্য তাঁদের প্রাণিত করবে এ কথাও তাঁর মনে হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। নীলোৎপাকে রিপন ষ্ট্রিটের বাড়িতে রেখে অনিসুজ্ঞামান যখন নীলিমার সঙ্গে দণ্ডপুঙ্করে পৌঁছিলেন তখন তাঁর নিজেকে খুবই অনাহৃত লাগল। তাঁকে দেখে প্রায় সকলের মুখেই এই ভাব প্রকাশ পেল যে, বড়দির যেমন চিত্রকলে অনাছাড়া, অনিসুজ্ঞামান নিজেই স্তন্যলেন একজন বলছেন—বড়দির যদি কোনওদিন একটু জ্ঞানগমি হত। নিজে তো জাতধর্ম কিছু মানেই না। বিধবা হয়েছে, এখনও মাজ-মাংস খোয়ে যাচ্ছে—লজ্জা নেই। আমাদেরও নষ্ট করে ছাড়বে।

অন্যজন বললেন—সে তুই নিজে যা করিস কর, আমরা দেখতেও যাব না। তা বলে পূজোবাড়িতে যাকে-তাকে তেনে আনবি।—ওকে যখন ত্র্যাটিটা দিল তখনই আমি আপত্তি করেছিলাম। অত শস্তায় একটা মুসলমানকে বেচে দিল! তোর জামাইবাবু কেনার কথা ভেবেছিল জানিস। পাশ্চাই দিল না। বলে মুসলমান তো কী! জানিস কলেজে পড়ায়।

ইচ্ছে করেই কি অনিসুজ্ঞামানকে শুনিতে এ সব কথা হয়েছিল। তিনি বুঝতে পারেননি। বরং কথাগুলো শুনে ফেলে, যেন-বা চৌর্যকর্মের অপরাধবোধ জাগছিল তাঁর। সংকোচে গুটিয়ে যাচ্ছিলেন অন্তরে কিন্তু ভেবেছিলেন—হ্যাঁ, মনে রাখা উচিত, আমি মুসলমান, মনে রাখা উচিত। তুমি হিন্দু, মনে রাখা উচিত। আমার কেন তা মনে থাকে না? আরও অনেক মানুষেরই কেন মনে থাকে না? কোনটা ভাল? মনে রাখা, নাকি না রাখা...

নীলিমার ভাইরা খুবই অপায়ন করেছিলেন আনিসুজ্জামানকে। তাঁদের প্রায় প্রতিজ্ঞার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল। সে-দিন তখনও তৃণাকুর এসে পৌঁছাননি। সপ্তমীর অরুণাকে সকাল। ঢাকবাসি বাজছিল। দুর্গার গলায় বিশাল বেলপাত্রের মতো। নীলিমা বড়ভাইয়ের কাছে আনিসুজ্জামানের আসার উদ্দেশ্য প্রকাশ করলেন। বড়ভাই বললেন—তা বেশ। দেখবে। মার কাছে সব সন্তানই সমান।

মেজভাই বললেন—হ্যাঁ। বড়দা যখন বলেছেন যখন আর অন্যার্মা কী।

ছোটভাই বললেন—হ্যাঁ। দাদাদের যখন আপত্তি নেই তখন আমি আর কে। তবে কিনা বাড়ির মেয়েরা আপত্তি করছেন। আসলে মেয়েদের সংস্কার তো। তবে আমি বলেছি। কত বড় কাজ করছেন উনি। মুসলমান হয়ে হিন্দু সেবাবী নিয়ে লেগা।

কিন্তু আনিসুজ্জামান যখন প্রবেশ করলেন পূজাশূলে তখন নীলিমার বহীমান মামা, মূল মণ্ডপে একজন মুসলমান প্রবেশ করেছেন জেনে রাগে বা পাগল হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

ওই শেষ। আনিসুজ্জামান আর কোনও পারিবারিক পূজামণ্ডপে ঢোকার চেষ্টা করবেন না। যা দেখবেন, দূর থেকেই। বাকিটা শুনে আর পড়ে মিটিয়ে নেবেন। হয়তো তাঁর কাজে কোনও অপূর্ণতা থেকে যাবে। কোনও হিন্দু বিদগ্ধ পণ্ডিত তা ধরিয়ে দেবেন। আনিসুজ্জামান সংস্কার করে নোবন তখন।

সে-দিন কি খুব অপমানিত লেগেছিল তাঁর? তিনি জানেন না। ব্যাপারটি এত হঠাৎ ঘটেছিল যে তিনি অন্য কিছু উপলব্ধি করার আগেই অপরোধবোধে আশ্রয় হয়ে গিয়েছিলেন। মামা সুস্থ হলে, দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর নীলিমা আনিসুজ্জামানের সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। যদিও তাঁর থেকে যাবারই কথা ছিল, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত পাটেছিলেন। আনিসুজ্জামান আপত্তি করেছিলেন। নীলিমা শোনেননি। পাথে কেউ এ প্রসঙ্গে কথা বলেননি। এমনকী পরেও কথা ওঠেনি এ নিয়ে। এ বছর আনিসুজ্জামান জেনেছেন নীলিমা দস্তপুকুর যাবেন না। অনেকদিন হল এই মহিলাকে কাছ থেকে দেখছেন আনিসুজ্জামান। তাঁর সবসময় মনে হয়েছে নীলিমা অতুলনীয়। নীলিমা আলাদা। তিনি ঠিক সে-যুগের নন যে-যুগে জন্মেছিলেন। তিনি ভাবীকালের। আর, এ কথা নানাভাবে প্রমাণিত, মানুষের সমাজকে এক বর্তমান থেকে সন্তুর্নবর্তী অন্য বর্তমানে পৌঁছে দেয় মাত্র গুটিকয় মানুষই। অন্যরা তা অনুসরণ করে অতি ধীর প্রক্রিয়ায়। ফলে তখনও সমান সারি তৈরি হয় না। সমান অবস্থিতি পাওয়া যায় না। সাধারণ একটি প্রগতিককে যখন ছোঁয়, তখন অসাধারণ নির্ণয় করে ফেলে আরও এক প্রগতির মাত্রা।

কালও ছিল এমনই এক সপ্তমীর সকাল। আনিসুজ্জামানকে ডেকে লুচি, আলুর দম, আর নাতু দিয়েছিলেন নীলিমা। তৃণাকুর আর আনিসুজ্জামানকে একসঙ্গেই। নীলোফা নীলিমাকে লুচি বেলে সাহায্য করছিল। আনিসুজ্জামান বলেছিলেন—দস্তপুকুর কবে যাচ্ছেন, মাসিমা?

—যাব না এবার।

নীলিমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

আনিসুজ্জামান বললেন—কেন মাসিমা? গতবার সেই যে আমার সঙ্গে চলে এলেন, আর গেলেন না। এবার পূজাতেও গেলেন না। আমার জন্যই কি এ সব হল?

নীলোফা লুচি বেলা ধামিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। তার মুখ যেহেতু ঢাকা সেহেতু বোঝার উপায় নেই সে কী বলতে চায় বা ভাবে। কিন্তু আনিসুজ্জামান অনুমান করেছিলেন নীলোফা কষ্ট পাচ্ছে। আনিসুজ্জামান সে-দিনের সমস্ত অপমানের কথা নীলোফাকে বলেছিলেন। মাঝে মাঝে বলে ফেলেন সবই। মজিনাখের ওই অস্বৃত আচরণের কথা ছাড়া প্রায় সবই নীলোফার জানা। সুতরাং আনিসুজ্জামানের স্বরের নিহিত প্রকাশ নীলোফার শ্রবণে অনিবার্যভাবে ধরা পড়ে। তাঁর কথায় উৎকর্ষ ও বেদনা ছিল যা নীলোফাকে স্পর্শ করছে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি কারণে পরিবার থেকে নির্বাসিত দু'টি মানুষের এই দিন্যযাপন ভাগ করে নেবার মধ্যে পারস্পরিক অলিখিত নির্ভরশীলতা আছে কিন্তু কোনও দাবিদ্বারা নেই। নির্বাসনের কথা হয়তো বা তাঁরা মনে রাখেননি কারণ এইই তাঁদের কামাণ্ড ছিল। তবু যা তাঁদের চাইতে হয়েছে তার পিছনের ইতিহাস বেদনাতুর, যা তাঁদের দু'জনকে একাকিত্বে নিশ্চয়ই বিষয় করে। কোনওরকম বোকাপড়া ছাড়াই নীলোফা নিজের যন্ত্রণা সম্পর্কে নীরব। আর আনিসুজ্জামান নিজের অভ্যন্তরে বাইরেরবদর যন্ত্রণা ও অগম্যতার কথা, অসম্ভবতা বা অস্বাভাবিকতা, এমনকী নিজের লেখার পরিত্যক্ততার কথাও নীলোফাকে বলতে অস্বস্তি হয়েছিল, যার মধ্যে নীলোফা কখনও মন্তব্য রাখে, কখনও নীরবে নেয়, কিন্তু আনিসুজ্জামানের সমস্ত ব্যথায় একান্তে ব্যথিত থাকার অবধারণ রচনা করে বসে।

অতএব সে স্থির ও সতর্ক হয় নীলিমার জবাব শোনার জন্য। নীলিমা বলেন—তোমার জন্য নয় আমি, ওদের জন্যই। সেখো, যারা ঘৃণা করতে শেখে, অবহেলা করতে শেখে, সংস্কারের পত্নি বেঁধে দুটিকে স্বেচ্ছানির্বাসন দেয়, মানুষ হিসেবে তাদের সমস্যা অনেক বেশি। ওহামার মেসোমশাই মারা যাবার পরও আমি মাছ-মাংস খাই বলে ওরা আমায় অপমান করে। আমার সমস্ত চালচলন, বক্তব্য, জীবনযাপনের পদ্ধতি ওদের কাছে নিন্দ্যার বিষয়। এমনকী মাস্তুর বিয়ে ভেঙে যাবার জন্যও নাকি আমিই দায়ী। আমার মাস্তুরকে মানুষ করাটা যথার্থই হয়নি। সেখো, আমার জীবন যাই হোক তার জন্য আমি কারও মুখাপেক্ষী হইনি। নানা সমস্যার মধ্যে আমি জীবনকে চিনেছি। কষ্ট করেছি কিন্তু নিজের মতামতকে অবহেলা করিনি। ওদের বিশ্বাস নিয়ে ওরা আছে, আমার বিশ্বাসে আমি। এ নিয়ে আমার কোনও ক্ষোভ বা নালিশ ছিল না। কিন্তু আমাকে যা বলে বলুক, তুমি আমার ছেলের সমান, তোমাকে আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম ও বাড়িতে, ওরা তোমাকেও অপমান করল, আমাকেও করল। সবচেয়ে বড় কথা আমার চোখে এই প্রথম খুব ছোট হয়ে গেল ওরা। যারা মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখে না তাদের আমিই বা মানুষ বলি কী করে!

আনিসুজ্জামান বলেছিলেন—মাসিমা, আমি ও সব মনে রাখিনি। এরকমই তো হয়। সেভাবে দেখতে গেলে ঠগ বাহুতে গাঁ উজাড় হবে। আপনি কতজনকে জীবন থেকে বাদ দেবেন? সমস্যাটা কোনও ব্যক্তিমানুষের না। কোনও পরিবারেরও না। সমস্যাটা ঐতিহাসিক। কোনও-না-কোনও কারণে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করেছে চিরকাল। জাতিতে, বর্ণে বা ধর্মের বিরোধিতায়। আর কিছু না হলে এক মানুষ অন্যজনকে ঘৃণা করেছে পেশার পার্থক্যের জন্যও। এই তো হয়। হচ্ছে। আপনি কাকে বাদ দেবেন। ক'জনকে বাদ দেবেন, মাসিমা?

নীলিমা বলেছিলেন—এই তো বাদ দেবার সময়, বেলো? বাছলো আর ভাল লাগে না। জটিলতা, কৃত্রিমতা কিছুই আর ভাল লাগে না। জীবনের বোঝা টানতে টানতে এমনিতেই মশ্বর হয়ে আছি। এ বার ছাড়ার পালা। এ বার যে-ক'দিন যতটুকু বাঁচব, সে নিজের মতো।

আনিসুজ্জামান আর কথা বলেননি।

সন্ধ্যাবেলা নীলোফা কাছে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ছিল। তিনি তখন গবেষণার কাগজপত্র দেখছিলেন। বলেছিলেন—কিছু বলবি?

—হ্যাঁ।

—বল।

—আমাকে কাল বিদিরপুরে পীরবাবার মাজারে নিয়ে যাকেন?

চমকে উঠেছিলেন আনিসুজ্জামান। মাঝারে? কেন? কিন্তু মুখে কিছু বলেননি। নীলোফার কোনও দাবি নেই। প্রত্যাশা নেই। এ বাড়িতে সে তার গাছেদের মতোই নিরক্ষার। সে শুধু বেঁচে থাকতে থাকতে খেয়াল রাখে, আনিসুজ্জামানের কোনও অসুবিধা যাতে না হয়। আনিসুজ্জামান তার জন্য যতটুকু করেন সেটুকুই তার প্রাপ্তির জগৎ। যেমন কিছু পড়িয়ে

দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া বা সেতার শেখার আয়োজন। যেমন নীলোৎপল নিজের বেঘামে কিছু করতে চাইলে বাধা না দেওয়া। এই জাতি সে মনের মতো করেই সাড়াই নানা প্রকম পর্দায় আর চানবের। মনের মতো গাছ করে। ছবি টাঙ্কায়, বইয়ের তৃপ্ত গোহায় ফেন এ তার নিজের সত্যিকার সংসার। এ সবে কোনও বাধা নেই আরও অনিসুজ্জামান উপাসন ও নির্বিকার। নীলোৎপলকে নীলোৎপল মতো ছেড়ে দিয়েই তাঁর নিশ্চিহ্ন। এই স্বপ্ন, যা বলা যেতে পারে, রিপন ট্রিটের বাড়ি থেকে চলে আসার প্রজ্ঞার পর এই প্রথম নীলোৎপল মুখ ফুটে কিছু চাইছে তা মনে পড়ল অনিসুজ্জামানের। ভাগ্যিস পড়ল। না পড়লে হয়তো তাঁর নিজের-কাজের তাগিদে এ আবেদন খারিজও করে দিতে পারতেন। এবং নীলোৎপল তাতে প্রতিবাদও করত না। অনিসুজ্জামান নীলোৎপল দিকে তাকিয়েছিলেন। তার বোকা-ঢাকা মুখ মাটি দিকে নামানো। তিনি বলেছিলেন—নিয়ে যাব। কাল বিকেল। কেমন?

আজ সেই নিয়ে যাবার দিন। বড় ভিড় রাজ্যায়। অটমীর কলকাতা। অনিসুজ্জামান জানেন পথ অচল হয়ে থাকবে। হাটা যাবে না। গাড়ি নড়বে না। তবু মানুষ চলবে। একটু একটু করে এগোবে। চলা থেমে থাকবে না। না চলে উপায় নেই। অনিসুজ্জামানের মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যে চারপাশে এত হানাহানি, দ্বন্দ্ব, ঘৃণা, বিদ্বেষ—এ সব যেন করতে হয়, তাই মানুষ করে, না করে কোমলও উপায় নেই বলে করা। প্রত্যেকের মতো। রোতাম্বলনের মতো। এইসব মানুষেরা প্রত্যেকে এখন থেকে বেগেতে চায়, মুক্ত হতে চায়, কিন্তু পারে না। না পেরে নিরুপায়ভাবে আবার এ সবে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজেকে সং ও সুন্দর দেখতে চায়।

মগুপ থেকে বেরিয়ে অনিসুজ্জামান হাঁটছেন— পাশ দিয়ে একটা রিকশা চলে গেল। রিকশায় দুই মহিলা বসে আছেন। একজন আর একজনকে বলছেন—‘হাসপাতালটাই আমাদের একমাত্র বেড়াবার জায়গা।’ ইস! কী কঠিন। কী কষ্ট! অনিসুজ্জামান ভাবেন, এই তো মানুষ। এরা বেড়াতে যেতে চায়। মুক্ত বাতাস, খোলা আকাশ, কুলকুল নদী আর সবুজ নরম মাঠে গড়িয়ে দৌড়ে খেলতে চায়। মানুষ প্রকৃতিকে কাছে চায়। না চেয়ে কী করবে। প্রকৃতিই উৎস। প্রকৃতিই মা। মাকে না পেলে সন্তান যেমন পাগল-পাগল হয়, অস্বাভাবিক হয়, তেমনিই, প্রকৃতিকে না পেলে মানুষের মধ্যেও অস্বাভাবিকতা আসে। সে উদ্ভ্রান্ত হয়। ক্ষিপ্ত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মাৎসর্যে ধাসে করে পরস্পরকে।

ভাল থাকতে চায়, ভাল হতে চায় মানুষ—এ বিশ্বাস অনিসুজ্জামানের মধ্যে খুবই গভীর। শুধু দুঃখ হয় যে মানুষ বুঝতেই পারে না আসলে সে কী চায়। কিন্তু এভাবেই, অজ্ঞান ভাল হতে চায় মানুষ। যেন ছোট্ট বালক বা বালিকা, খুব দুঃখি করছে, শুনেছে না কোনও উপদেশ, শাসন আদেশ মানছে না, তাকে ভাল বলা হোক—তুই কী ভাল রে—বলা হোক—তুমি কী লক্ষ্মী, সোনা, তোমার মতো ভাল আর দুটি নেই—সে ভাল হতে থাকবে। শুনতে শুনতে সে নিজেকে বলবে ভাল। যেন এক বৃষ্টিওয়াল এসে মস্ত দিয়ে যাবেন—বলো, আমি সুন্দর। বলো, আমি ভালবাসি।

দুটি ছেলে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। একজন চাল্যাচ্ছে, একজন সামনের রডে বসা। যে চাল্যাচ্ছে, বলল—মাধবী দাঁড়াতে বলেছে তোকে।

সামনের ছেলেটি কী বলল শোনার আগেই তারা চলে গেল। কে মাধবী? সে ছেলেটিকে দাঁড়াতে বলল কেন? কোথায় দাঁড়াতে বলল? কখন? একটি বিচ্ছিন্ন বাক্য অনিসুজ্জামানের মধ্যে জীবনের নিগূঢ় দর্শন সঞ্চার করে। ভাল হতে চাওয়ায় মতো, ভাল থাকতে চাওয়ায় মতো, এও এক চাওয়া। থেকো আমার জন্য। দাঁড়িয়ে। অপেক্ষা কোরো। কেউ কারওকে দাঁড়াতে বলে। কেউ দাঁড়ায়। কেউ দাঁড়ায় না। আসবে বলে কথা দেয় কেউ। আসে। আবার আসেও না। অথবা আসে, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে আসা অর্পহীন হয়ে যায়। কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতে



থাকতে, অপেক্ষা করতে করতে কাটিয়ে দেয় সাগর জীবন। এক সময়, কার জন্য অপেক্ষা, কার জন্য দাঁড়ানো, সেটুকু ভাববারও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তখন শুধু অপেক্ষাই জীবন। অপেক্ষাই ধর্ম। মৃত্যুরই মতো অনিবার্য ও অর্ধহীন।

আনিসুজ্জামান নিজে কখনও কারও জন্য দাঁড়িয়ে থাকেননি। কোনও মাদকী তাঁকে কোথাও কখনও অপেক্ষা করতে বলেনি। তিনিও প্রত্যাশা করেননি তাঁর জীবনে কোনও মাদকীর ফুটে ওঠা। তাঁর মধ্যে, এমনকী, যৌন তৃষ্ণাও অতি নিভৃত এবং বিবল। এক লুকনো ভীতি বা বিতৃষ্ণায় ওই বোধ থেকে তিনি পালিয়ে বেড়াতে চান।

বেড়াবার জায়গা হিসেবে, মুক্তির জায়গা হিসেবে, আনিসুজ্জামানকে কখনও হৃদয়পাতালে যেতে হয়নি। সে-দিক থেকে ভাবতে গেলে আনিসুজ্জামানের জীবন খুবই ঘটনাবিহীন এবং নিস্তরঙ্গ। বলা যেতে পারে, জীবনকে তিনি পরোক্ষভাবে যত্নবানি চিনেছেন, প্রত্যক্ষভাবে তেমন নয়। মাঝে মাঝে গভীর রাতে একা বেরিয়ে পড়েন বাইরে। আপনভোলা পাগলের মতো হেঁটে যান রাস্তায়, গলিতে, কিংবা ফটিক বিল বজিতে। অল্পগত জীবন নানাভাবে তাঁর কাছে ধরা দেয় তখন। কবে থেকে এ অভ্যাস হল? মনে আছে, কাশীপুরের ওই বীভৎস পার্শ্বিক হত্যাকাণ্ডের পর, মনে হত রক্তের গন্ধ পাচ্ছেন, মনে হত কারা চিৎকার করছে, বাঁচাও—মেরো না—মা গো, পায়ের শব্দ পেতেন, কারা পলাচ্ছে। অজস্র পায়ের শব্দ। ছুটছে। বেগধায় ছুটছে? কেন পথে? ওইসব মৃতদের মধ্যে আনিসুজ্জামানের কলেজের ছাত্র ছিল। স্কুল পড়িয়া ছিল। নিরীহ, জীবন কী তার কোনও সম্বন্ধ ধারণাহীন তরুণও ছিল। পৃথিবীর সমস্ত তরুণের প্রতি আনিসুজ্জামানের ছাত্রবৎ রোহ লহমান। ওইসব মৃত্যু তাঁকে তাড়িয়ে ফিরত। দম বন্ধ হয়ে আসত। ঘরে মন টিকত না। ওইসব পায়ের শব্দের সঙ্গে পা মেলাবার ইচ্ছায় পথে নেমে আসতেন তিনি। তখন গভীর রাতে বেরনোয় খুঁকি ছিল। রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক কোনও মানুষেরই নিকৃতি ছিল না। পুলিশ ও গুণ্ডা, বিপ্লবী বা সাধারণ পার্টিকর্মী—প্রত্যেকেই খুন করতে পারত, খুন হতেও পারত। আনিসুজ্জামান তবু বেরোতেন। বেরিয়ে পড়তেন। সেই অভ্যাস হল। এখনও তা বজায় আছে। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েন। দু'—এক পাক এ দিক-ও দিক ঘুরে দেখেন। আর দেখেন গভীরতর নিহিত জীবন।

একদিন রাতে নিয়োগীপাড়া দিয়ে চলেছেন। ঘুমন্ত পাড়া। একটি কান্না বাজছে। একটি পুরুষকণ্ঠ সাড়া দিচ্ছে।

—কাঁদছ কেন? বাসন্তী? কেঁদো না। ও জেলে আছে। তবু তো আছে। আসবে কোনওদিন।

—ও কি সত্যি মেরেছে, বলো? ও তো একটা স্ত্রীমোপাকাও মারত না। ও কি ওর মাস্টারমশাইকে মারতে পারে? ওই নিরীহ লোকটাকে?

—মারতে পারে। আবার নাও পারে। যদি মারে, অবাক হবো না। ওরা বিপ্লব করছে। ওরা স্বপ্নে আছে। খুন শব্দটা ওরা জানে না। ওরা শ্রেণীশত্রু খতম করে। আমাদের স্বাধীনতার আশে সশস্ত্র বিপ্লবীরা যেমন করতেন, তেমনই। সে-সব কি খুন বলবে তুমি?

—হ্যাঁ গো, আমি কিছু জানি না, বুঝি না। কিন্তু এভাবে কি শত্রু নিক্ষেপ করা যায়? অন্যকে মেরে, নিজেরা মরে? একজনকে মারলে দশজন কি ফের জন্মাবে না? যে-প্রাণ একবিন্দু দিতে পারব না কারওকে, সে-প্রাণ নেব কেন? অন্য পথে বিপ্লব হয় না? হ্যাঁ গো, না মেরে, না মরে বিপ্লব হয় না? আনিসুজ্জামান চলে এসেছিলেন। পুরুষ কণ্ঠটি কী উত্তর দিয়েছিল, আর শোনেনি। তাঁর মন ভার হয়ে গিয়েছিল। যে-বিপ্লবে মা ছেলেকে সমর্থন করতে পারছে না তা কীভাবে সফল হওয়া সম্ভব? সে-বিপ্লব কখনও বার্থ নয়। কিংবা, হতে পারে তিনি পিছিয়ে আছেন। ওদের গতি ধরতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না সত্যিই এই খুনাখুনির প্রয়োজনীয়তা কতখানি। কষ্ট পাওয়া ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার ছিল না। যতই তা উপলব্ধি করছিলেন, ততই একটা পাগলামি কিংবা নেশা তাঁকে টেনে ঘরের বাইরে আনছিল।



শুধু হত্যা, শুধু ধ্বংস। সমস্ত অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিলিই বোধহয় প্রাণল হারে উঠেছিল সেই সময়। আর ব্যাবহার যবর হুঁছিল এই বরানদার। সত্যর সাতসর শেষের দিকে হঠাৎ একদিন বারাসত আমজাদ্রা অঞ্চলে অনেকগুলো মৃতদেহ পাওয়া গেল। কারও হাত-পা বাঁধা। কারও চোখ বাঁধা। প্রত্যেকের গায়ে চার-পাঁচটি করে গুলির মাথা। দেহগুলো শব্দেই হল। বেগমরিয়া-বরানগর-দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলের সব ছেলে। স্কুল-কলেজের ছাত্র। নকশাল করত। তাদের মধ্যে একজন ছিল বেগমরিয়া থানার এক অফিসারের ছেলে। দিহিতে রাজ্যপাল সম্মেলন চলছিল তখন। সম্মেলন ডিঘোখন করে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিলেন। আইন শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে এসে বললেন—যেভাবেই হোক ভারতবর্ষ থেকে হিংসার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। বুনের রাজনীতি ছাড়া সমস্যার সমাধান হয় না। বরং তা বেড়েই চলে।

ওই সম্মেলনেই নকশাল আন্দোলনকে সর্বভারতীয় সমস্যা হিসেবে তুলে ধরা হল। পশ্চিমবঙ্গের একজন বিদগ্ধ নেতা বললেন—নকশালরা, পুলিশেরই সৃষ্টি। এবং শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসাজসেই নকশালদের তৈরি করা হয়েছে।... ..

বিবৃতি চলতে লাগল। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণও চলতে লাগল। স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তির ওপর আঘাত এল। কিন্তু ক্রমশ, ওই আঘাত ব্যক্তি আক্রমণের কাছাকাছি চলে এল। চারু মজুমদার বললেন—মনীষীদের মূর্তি ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে খুব সমাজের তাঁদের প্রতি তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। মনীষনার্থ, বিন্যাসগর এঁরা তো ইম্পিরিয়ালিজম-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসেই উৎসাহী ছিলেন না। মূর্তি ভাঙার মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আসবাব কিংবা ল্যাবরেটরি ধ্বংসের মধ্যেও ছাত্রদের কোনও অন্যায় নেই। বরং আমি খুব আনন্দিত হতাম, যদি ছেলেরা গোটা বিশ্ববিদ্যালয়টা একটা ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দিত।

বিভিন্ন বিবৃতিতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। তার সঙ্গে যুক্ত হল মনীষীদের অপমান করার কারণে নকশালদের প্রতি সহানুভূতিহীনতা। শুণামির সঙ্গে বৈষনিক জিয়া-কর্মের আর তথ্যত পেল না তারা। আন্দোলন ক্রমশ সার্বিক আবেদন থেকে সরতে সরতে কুক্ষিগত হয়ে গেল। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে লাগল পাঁচ কমীদের মধ্যেই। ভাঙন ধরল। কারণ বিপ্লবীদের নেতারা প্রশ্ন পছন্দ করলেন না। যে-কায়দায় জরুরি অবস্থার নামে জনকণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা হয়েছিল, সেই একই কায়দায় পার্টির প্রতি অনুগত্যের নামে বিপ্লবের নেতারা প্রশ্নের উত্তর থাকতে চাইলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠল। উঠলই। কারণ মানুষের চেতনায় প্রশ্ন সূর্যোদয়ের মতো অমোঘ, অনিবার্য সত্য। প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না, থামানো যায় না, হত্যা-করা যায় না। আর তাই-ই মানুষ প্রশ্নকেই এড়িয়ে চলতে চায়। তাই, প্রশ্নের উত্তর হতেই তখন শুরু হল পারস্পরিক খুন ও মস্ত্রাস। একবারও ভেবে দেখা হল না, বিশ্ববিদ্যালয় গুঁড়িয়ে দিলেও গড়ে উঠবে আবার কোনও বাড়ি বা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে থাকবে কারণ বিশ্ববিদ্যালয় বাতিরেকে নতুন ও বিকল্প কোনও চেতনা দেওয়া হয়নি।

ভাবলে এখনও দমবদ্ধ হয়ে আসে। পূজার সকালে মানুষের এই নির্বিকার মুখ, মা দুর্গার আরতি, মেয়েদের নতুন শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ানো দেখলে মনে করতে ইচ্ছে করে না যে দু'বছর আগেও গলিতে গলিতে যখন-তখন ব্যাঙ্গদের গন্ধ উঠেছে।

হটিতে হটিতে উদ্ভাস্ত কলোনিতে পৌঁছলেন আনিসুজ্জামান। সত্যর বাড়িতে এসেছেন তিনি। সত্যর একটা গাড়ি আছে। ভাড়া দেয়। পুরনে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনে ব্যবসা করছে সত্য। আনিসুজ্জামান এসেছেন গাড়িটি ভাড়া নিতে।

সত্য বাড়ির বারান্দায় বাসে নারকোল ভুলছিল। এ কাজে একটি সাঁড়াশি ব্যবহার করছিল সে। সাঁড়াশি দিয়ে নারকোল ছোলা যায় তা প্রথম দেখলেন আনিসুজ্জামান। সত্য তাকে দেখে এগিয়ে এল। বলল—স্যার, আপনি?

সত্য আনিসুজ্জামানের প্রাণ্ডন ছাত্র। ওর বোন এখন এ কলেজে পড়ছে। আনিসুজ্জামান

হাসলেন। বললেন— তোমার গাড়িটা কি আর পাওয়া যাবে সত্য?

সত্যও হাসছে। বলল— হ্যাঁ, স্যার। পাওয়া যাবে না। আপনি বললেই পাওয়া যাবে। কোথায় যাবেন স্যার?

—খিরপুর যাব। তারপর ওখান থেকে আরও কয়েকটা আয়গায়। একটু-আড়াআড়িই বেরশতে চাই। রাত যত বাড়বে তত জাম্ব বাড়বে রাস্তায়।

—ক'টায় বেরবেন স্যার? আমি নিজে গাড়ি নিয়ে আপনার বাসায় চলে যাব।

—আড়াইটেয় এসে।

সত্যর বোন এসে দাঁড়াল বাইরে। সবুজ রঙের তাকের শাকি পরেছে। টিপ দিয়েছে কপালে। চুল খোলা। কিছুই দেখতে নয় মেয়েটিকে। কোনওভাবেই চোখে হাজার মতো নয়। কিন্তু আজ ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। লাবণ্য ঢলঢল করছে। পূজোর দিনে, উৎসবের দিনে খুবই সুন্দরী হতে ওঠে মেয়েরা। আপনা-আপনিই। যেন উৎসবের হান্সেলের ছটা লাগে চোবমুখে।

সত্যর বোন আনিসুজ্জামানের বিভাগের নয়। মেয়েটির নাম ভুলে গেছেন তিনি। তাতে কী। ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অভ্যস্ত। স্যার নাম ভুলে যাবেন আর তারা লাজুক মুখে বলবে— ‘আমি অমুক স্যার। চিনতে পারছেন না? ওই ইয়াদু স্যার। সেই সেবার—.....’ সে কোনও ঘটনার কথা বলবে। আর অধ্যাপকের তা মনে পড়ে যাবে।

সত্যর বোন এগিয়ে আসছে। প্রণাম করছে আনিসুজ্জামানকে। আনিসুজ্জামান পিছিয়ে যাচ্ছেন— কী করছ? আচ্ছা— আচ্ছা— থাক...

সে হাসছে। বলছে— আমার নাম শিউলি স্যার। ভিতরে আসুন না। মা ডাকছেন। পূজোর দিন এলেন।

আনিসুজ্জামানের ভয় করছে। পূজোর দিনে ঘুয়ে ফেলার ভয়। অপমানের ভয়। কিন্তু তিনি না বলতে পারছেন না। সত্য আর শিউলি দু'জনেই বলছে, আসুন না স্যার।

আনিসুজ্জামান ঘরে ঢুকছেন। ঘরে চালবাটার আলপনা। ভিজ্জেস করছেন— পূজো হয়েছে বুঝি?

—না, না। আজ অষ্টমী বলে শিউলি আলপন দিয়েছে। বসুন স্যার।

ছোট ছোট দু'টি ঘর সত্যদের। ঘরজোড়া বিছনা, বসার অন্য কোনও জায়গা নেই। একফালি মেঝে আলপনার ভবে আছে। ঘরের চার দেওয়াল পাকা হলেও দু'ঘরের মাঝখানের দেওয়ালটি বাঁশের। একপাশে একটি আলনা, তাতে পরিপাটি করে শাড়ি গুছানো। পাশের ঘরটি এত অন্ধকার যে সেখানে আর একটি বিছনার আভাস ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দেওয়ালে একটি কাঠের তাক ঝোলানো, তাতে বই। সব কিছুই গোছানো। যথাস্থানিক। এত ছোট ঘর। এত সামান্য আসবাব, তবু ভাল লেগে যায়।

আনিসুজ্জামান বিছনায় বসতে সংকোচ করছিলেন। শিউলি হাত দিয়ে ঝেড়ে দিল সামনের দিকটা। দেখিয়ে দিল, বসুন স্যার। আনিসুজ্জামান বসলেন। শ্রেষ্ঠ ভরে নাড়, সশেষ আর খেজুর নিয়ে এল শিউলি। আনিসুজ্জামান খেতে আপত্তি করছিলেন। তখন পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সত্যর মা। মোটাসোটি। শিষ্ণ। মায়ামায়া। অনেকটা যেন আমিনার মতো লাগে। বললেন— খান। খাইয়া লন। সন্ধ্যালে সন্ধ্যালে পূজা দিসিলাম। প্রসাদে না কইতে নাই।

সত্যর মায়ের কথায় বাঙাল ভাষার টান। সত্য বা শিউলির কথা শুনে বোঝা যায় না ওরা বাঙাল। অবশ্য উদ্ভাস্ত কলোনির বেশির ভাগ লোকই বাঙাল। পূর্ববাংলা থেকে উদ্ভিন্ন উৎপাটিত মানুষ। কোনওক্রমে বাঁচতে চেয়েছিলেন এপারে এসে। জীবনের ত্রাণিক বড় ত্রাণিদ। কত সম্পন্ন গৃহস্থ যে নিঃস্ব হয়ে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করেছেন তার হিসেব নেই। সারা কলকাতায় এরকম অসংখ্য উদ্ভাস্ত কলোনি।

হঠাৎ আনিসুজ্জামানের মনে হল, ওই যে হলুদ পাড় সাদা শাড়ি পরা মহিলা, মায়ের মতো

মায়াস্বয়ং মুখ, যিনি সত্য ও শিউলি নামের দু'টি চমৎকার ছেলেরমতো মা, অষ্টমী পূজার সকালে শুদ্ধভাবে গৃহদেবতার পূজার প্রসাদ তুলে নিয়েছেন অতিথির হাতে, তিনি কি জানেন, অনিসুজ্ঞামান একজন মুসলমান? তাঁর মাথায় টুপি নেই। তিনি গৌরবর্ণ কাটেন না। নিখুঁত দাড়ি, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি কিংবা সাধারণ শার্ট-প্যান্ট কখনও বলেন দেখ না। তিনি কোন ধর্মের মানুষ। যদি সত্যর মা না জেনে আপ্যায়ন করে থাকেন, যদি জানার পর তাঁর মনে হয়, অষ্টমী পূজার সকালটায় একজন মুসলমান ঘরে ঢুকে ছুঁয়ে-ছেঁদে সব অপবিত্র করে দিল— তা হলে? অনিসুজ্ঞামানের বুকের মধ্যে সিরসির করে। আর হাতে দু'খানি ফুলবেলপাতার সমেত এগিয়ে আসেন সত্যর মা। বলেন— দাঁড়ান। মাথায় একটু নিরমালি ঠাকাইয়া দেই।

তাঁর হাত উঠল। সত্য আর শিউলি কোনও কথা বলেন না। অনিসুজ্ঞামান প্রায় আর্পনাদের মতো বলে ফেললেন— দাঁড়ান মা, আপনি বোধহয় জাফেন না আমি মুসলমান।

একটু চুপ করে থাকলেন সত্যর মা। ভাবপূর বললেন— আপনার আপত্তি থাকলে দিই না। নান, খাইয়া লন।

সত্য কথা বলে ওঠে এবার। কারণ সে অনিসুজ্ঞামান সারকে চেনে। মাকেও। সে বলে— সারের কেনও আপত্তি নেই মা। তোমার আপত্তি হতে পারে ভেবে উনি বললেন।

অনিসুজ্ঞামান বিজ্ঞানায় পা খুলিয়ে বসে আছেন। প্রসাদের প্লেট পাশে রাখা। তাঁর মাথা নিচু। বারবার এরকম হয়। বারবার। তুমি হিন্দু, না মুসলমান! ছোঁব, না ছোঁব না। যদি না ছোঁয়— তবে কষ্ট, অপমান। ছুঁল না আমাকে। কেন, কেন?..... যদি ছোঁয়— তবেও কষ্ট। না, অপমান নেই। শুধুই কষ্ট। বেশ ককশা করছে। কারণ যে স্পর্শ করছে সে এ মনে করে করবে না যে আমার জাতি-গোত্র নেই, ধর্ম-বর্ণ নেই, দেশ-বিদেশ নেই, আমি একটা মানুষ, একজন মানুষ আর একজন মানুষের কল্যাণ কামনা করছে। না, এরকম নয়। বরং সব মনে রেখে জেনে রেখে ঔদার্য প্রমাণ। আবার মনিরুলের মতো ধর্মাচারপরায়ণ—তিনি কোনও হিন্দুর পরিবারে মাংসাদি গ্রহণ করবেন না কোনও দিন কারণ হিন্দুরা প্রাণীগুলিকে জবাই করে না। হালাল করে না। এই বকমই চলছে। চলে যাচ্ছে। এ ওর কাছে অস্পৃশ্য। ও এর কাছে অনায়া। ঈশ্বরকে ভজনা করছে দু'দলই কিন্তু সাকারে নিরাকারে বৈরিতা বেঁধে যাচ্ছে। পশু-পক্ষীও বধ করছে দু'দল কিন্তু বধ করার পদ্ধতি নিয়ে কলহ বীথিয়ে পশুবধের ছুরিগুলি পরস্পর বসিয়ে দিচ্ছে বুক। অপমান দিতে দিতে নিতে নিতে যুগ গেল, যুগান্তরে পৌঁছে গেল বিরোধ—তবু ফুরল না।

সত্যর মা অনিসুজ্ঞামানের মাথায় ফুল ছোঁয়াচ্ছেন। নির্মালা ছোঁয়াচ্ছেন। বলছেন— দ্যাশে আমার এক ভাই আসিলেন। মোসলমান। ভাই ডাকসিলাম তাইনরে। তাইতে কী? আপনে আমার পোলা-মাইয়ারে শিক্ষা দেন। আপনার আর জাইত-ধর্ম কী। শিক্ষকের জাইত নাই। জীবনে কি কম দ্যাখলাম? কতবার দাঙ্গা হইল, হিন্দু মোসলমানেরে কাটল, মোসলমান হিন্দুরে। কত রক্ত দ্যাখলাম। রক্ত দেইখা তো বুজি নাই কুনডা মোসলমানেরে কুনডা হিন্দুরে।

অনিসুজ্ঞামান মুখ তুলছেন। এ করে কথা? অল্প শিক্ষিত বা অতিশয়হীন অশিক্ষিত সত্যর মায়ের? নাকি ইনি এক প্রাজ্ঞ দার্শনিক। সত্যর মায়ের পায়ে হাত রাখতে ইচ্ছে করে তাঁর। কিন্তু লজ্জায় দ্বির ও নিষ্ক্রিয় থাকেন। পায়ে হাত রেখে বা মাথা রেখে প্রণামে তাঁর মোহ ছিল না। নিজেকে এটি পালন করেছেন কখনও বা গ্রহণও করে থাকেন ছাত্রছাত্রীর কাছে। কিন্তু আজ এ যেন কোন অস্তরের ইচ্ছা। আজ তাঁর মনে হচ্ছে, কোনও কোনও মুহূর্ত আসে যখন নিজেকে নীচে দেখতে, ছোট দেখতে ভাল লাগে। বড় মনের কাছে, বড় স্নেহের কাছে, বড় বিশ্বাস ও কল্যাণের কাছে ছোট হয়ে, শিশু হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। যেন মায়ের কাছে বলা— আমাকে নাও। আমাকে তুলে নাও। আমাকে বড় করো। তোমার মতো করো। তোমার মতো বড়।

আনিসুজ্জামান আনন্দে নারকোল নাড়ু মুখে পুরলেন। শিউলির দিকে তাকিয়ে বললেন—  
তোমার নিশ্চয়ই শরতে জন্ম?

—হ্যাঁ।

মাথা নাড়ল শিউলি। সত্য বলল— আজই ওর জন্মদিন স্যার। ডু-কারতে দেখেছেন কেউ  
নিজের জন্মদিনে নিজে আলপনা দেয়। শিউলি দিয়েছে।

শিউলি ছেলেমানুষের মতো ঝপাঝ। রাগ করে। প্রতিবাদের চেষ্টাও বলে— মোটেই না।  
ভাল হবে না নানা। উল্টো-পাল্টা বলবি না। আমি অইনী বলে আলপনা দিয়েছি। মোটেই  
আমার জন্মদিন বলে নয়।

আনিসুজ্জামান শিউলি ও সত্যর সরল শুভ্রতায় বিম্ব হইলেন। বললেন— আহরণ পায়ের  
কোথায় মা? জন্মদিনের পায়ের?

সত্যর মা বললেন— এখনও করি নাই বাবা মাস্টার। সেইতারে কইতেয়াছি দুখ আইন্যা দিব।  
অ সেইতা। এমুন ব্যালা করলি। আর দুখ পাবি না। মাইয়াটারে আইজ পায়ের দিমু না?

সত্য বলে— পাব মা। মরণ ব্রিজের ওপাশে বাটাল থেকে এনে দেবে।

আনিসুজ্জামান বেতে থাকেন আর চারপাশের গৃহস্থীতে চোখ বোলান। এ ঘরে কী আছে,  
যা অন্য সব ঘরেই থাকে না? তাঁর মনে হল, এ ঘরে জীবন আছে। বেঁচে থাকার প্রতি সন্ত্রম  
আছে। বেশির ভাগ ঘরে শুধুই থাকা। শুধুই দিনযাপন। যতটুকু আছে তারই মধ্যে ভাল না  
থেকে যা নেই তারই জন্য খারাপ থাকা। তিনি সত্যর মায়ের দিকে তাকালেন। মাথাব চুল প্রায়  
সব পাকা। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। চুলের তলায় গিট দেওয়া। কানে দু'খানি সোনার  
কানপাশা লতি কেটে বুলে আছে। হাতে শাঁখা, পলা, নোয়া। কী সাধারণ। কী অনাড়ম্বর। কী  
রিক্ত অথচ কী সুন্দর। এখনও বিশ্বাস হয় না এই মানুষটির দর্শন কী আশ্চর্য গভীর ও মূল্যবান।  
সারা জীবন গবেষণা করে যে-তত্ত্ব আনিসুজ্জামান পুস্তকে বা গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তা  
প্রতিষ্ঠিত ও নিহিত আছে সাধারণ মানুষের মনোজগতেই। সব সময় তার ক্ষুরণ হয় না। প্রকাশ  
হয় না। আর এটাও ঠিক যে সব মানুষের মধ্যে সেই অবিকল নিজস্ব দর্শন গড়ে ওঠার অবকাশ  
পায়নি।

পূজোর জন্য নীলোফাকে একটি তাঁতের শাড়ি উপহার দিয়েছেন নীলিমা। আনিসুজ্জামান  
জানেন, নীলোফার সঙ্গে নীলিমার এইসব সুন্দর আদান-প্রদান হয়। কেউ কোথাও একটি মনের  
মতো গাছ পেলে সংগ্রহ করে আনেন এবং দু'জনের বাগানেই তা লাগানো হয়ে যায়। যাবার  
দেওয়া-নেওয়া নৈমিত্তিক ঘটনা। দু'জনে বাজারে যান একসঙ্গে এবং যে-যার সংসারের বস্তু  
কিনে আনেন। নীলিমা নীলোফার পছন্দের ওপর ভরসা করেন। নীলোফা নীলিমার নির্দেশনার  
ওপর। এই দুই মহিলার সখা দেখে অবাক লাগে আনিসুজ্জামানের। বয়সে সমান নয়। ধর্মবোধ  
আলাদা। একজন শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, মুক্ত— বাইরের পৃথিবীকে দেখতে পাওয়া মানুষ। অন্যজন  
শিক্ষা পাবার অবকাশ পায়নি। স্কুলের সীমা পেরিয়ে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার অবকাশ  
পায়নি। রিপন ট্রিটের বাড়ি আর মাথুরের গড়ের এই পরিবেশ ছাড়া বৃহত্তর জগৎ সম্পর্কে যার  
কোনও ধারণা নেই। সেও ঈদের দিনে, হালকা চাঁপাফুল রঙের ওপর সবুজ কঙ্কাপাড় তাঁতের  
শাড়ি নীলিমাকে উপহার দেয়। কতদিন আনিসুজ্জামান বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে এসে  
দেখেছেন নীলিমার বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ার পেতে বসে রয়েছেন দু'জন। একজন বোরখায়  
ঢাকা। আড়াল থেকে আকাশ দেখছে বা কশিদা করছে চূপচাপ— অন্যজন কাঁচাপাকা চুল  
ছড়িয়ে দিয়েছেন পিঠময়। হাতে 'গীতবিতান'। পড়ছেন—

ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,

ওগো দিনশেষের পতি,

ভাঙা বাসার লহো নমস্কার ॥

আনিসুজ্জামান নড়তে পারছেন না। চা চাই। খিদে পোয়েছে। কিন্তু এই বৈকালিক ধ্যান

ভাঙিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বরং তিনি নিজের ঢুকে পড়ছেন খানার জগতে। এ বী আশ্চর্য কথা। এ কোন শক্তি! এ কী অপূর্ণ প্রেম আর নির্ভরতা! নিঃশব্দ মিথহৃদয়ের কী অসম্ভব উচ্চারণ! বিনায়কে ব্যক্তিহীন। কী সুন্দর! তুমি সব নেত্রতরে! হে বিরহ— সব ভেঙে দিলে তুমি। নষ্ট করে দিলে। সব সাজানো স্বপ্নের ধন তোমার হাতে তখনই হল। তাতে কী! তুমি তো এলে। তোমাকে তো আসতে হল। আমার কবির বেশে। আমার দিন-ফেনার বেশে। তবুও আমার ভাঙা আমি, রইল তোমার জন্য।

অনিসুজ্ঞামান ভেবেছেন বহুবার। নীলোফা কি যোঝে? এ সব যোঝে! নীলোফা পড়ে। পড়তে ভালবাসে। অনেক সময় অনেক কিছুর মনে কুতূহল পাবে না। ছেলেরা মতো প্রশ্ন করে তখন। এসে তাকে— ভাইজান—

নীলিমা 'রাজকন্যার' নিয়েছেন নীলোফাকে। অকস্মিকভাবে। পড়ছে নীলোফা। ধরতে পারছে না। যখন যেটা পড়ছিল, পড়ছিল। অনিসুজ্ঞামান বুদ্ধিতে নিয়েছিলেন— এ বই অন্য গল্প বইয়ের মতো নয়। এটি পড়তে হয় ধারাবাহিকতা মেনে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

নীলোফা পড়ছে। পড়তে পড়তে 'বাগ্নাদিত্য'তে ঠেকল। বলল— এ কেমন করে হয় ভাইজান? যেখানে শরীর ছিল সেখানে রইল গোলাপ আর পদ্ম। কেমন করে হল?

অনিসুজ্ঞামান তখন সেই দুর্গাবিষয়ক প্রবন্ধ লিখছেন। গভীরভাবে নিরীক্ষা করছেন পোড়ামটির ভাস্কর্যের ছবি। তাঁর মাথায় বাগ্নাদিত্য ঢুকছে না। তিনি দেখছেন, দুর্গার পায়ের তলায় সিংহকে অনেকটা ঘোড়ার মতো লাগছে। যে-নির্বৃত্ত নির্মাণ তাতে মনে হচ্ছে— এই ঘোড়ার মতো সিংহ অর্থাৎ সিংহে বানিক অস্তিত্ব প্রদানই শিল্প। এই অশ্বারোহী সিংহ শিল্পীর নিজের সৃষ্টি। এ শিব গড়তে শিখা নয়। এ অর্থবহ। তিনি ভাবছেন— কেন এমন হয়, কেন এমন আসে। সিংহের সম্পূর্ণ পশুবিজ্ঞানের সঙ্গে অশ্বের তীর বেগ ও বৌদ্ধিকতার ভঙ্গি কেন জুড়ে যেতে চায়? মানুষ কি চিরকালই সমস্ত প্রার্থনীয় এক আধারে সমবেত দেখতে চায়? কেন এমন হয়? কেন?

নীলোফাও প্রশ্ন করছে তখন— 'ভাইজান। কেন এমন হয়? কেন? একটি পাতায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সে—

'একশত বৎসর বয়সে বাগ্নার মৃত্যু হল। পূর্বদিকে হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু মহিষী, হিন্দু প্রজারা; পশ্চিমে ইরানীস্থানে তাঁর মুসলমানী বেগম আর পাঠানের দল, হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের কবর দিতে বাস্তব হল। শেষে যখন একপিঠে সূর্যের স্তব আর একপিঠে আল্লার দোয়া-লেখা প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাগ্নার উপর থেকে বুলে নেওয়া হল, তখন কিছুই দেখা গেল না— কেবল রাশি-রাশি পদ্মফুল আর গোলাপফুল। চিতোরের মহারানী সেই পদ্মফুল বাগ্নামাতার মন্দিরে মানস সরোবরের জলে রেখে দিলেন! ইরানী বেগম একটি গোলাপ ফুল শবেহর জলবাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপ জলের ফোয়ারার ধারে পুতে দিলেন, আর সেইদিন হিন্দুস্থান ও ইরানীস্থানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ পর্বতের শিখরে হীরে-জহরতে মোড়া এক রাজার শরীর চিতার উপরে তুলে দিয়ে এক সন্ন্যাসিনী বললেন— "সখী, তোরা সেই গান গা।" ...'

অনিসুজ্ঞামান বুদ্ধিতে দিচ্ছেন— যিনি বড়, যিনি রাজা, যিনি সার্থক ও মহান তিনি সব ধর্মকে ধারণ করেন, সব মানুষকে গ্রহণ করেন। তাঁর কাছে চিতোরের মহারানী আর ইরানী বেগম, দুই-ই সমান, দুই-ই বড়। দু'জনকেই ভালবাসেন তিনি। মনের মধ্যে বালকবেলার সেই শোলাকি রাজকুমারীকে রেখেও ভালবাসেন অনস্বের। ব্যক্তিগত জীবনে বলে, প্রজা বাৎসল্যে বলে, কে হিন্দু কে মুসলমান— এ তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তাঁর নিজের



মনে এ নিয়ে কোনও বিরোধ ছিল না। কিন্তু তাঁকে নিয়ে বিরোধ মিটল না। এক হৃদয়ে জাতিগোপন্যেও মানুষের জন্ম জন্ম বয়ে চলা ধর্মসংস্কার ও স্বজাতিভিমান স্বাধীনতাকে চিরকালের মতো স্বস্তিত করে দিল। তাদের বিরোধ বন্ধ করার জন্য বুদ্ধিমত্তা, গ্রেমপূর্ণা, শোলাকি রাজকুমারী, নীরবে বেখে গেলেন গোলাপ আর পদ্মফুল। বলতে চাইছেন— থাকো। বস্ত্র থাকতে চাও, থাকো। নিজেদের মধ্যে হানাহানি কোরো না। একই কিশোরীর নীচে, দেখো, পাশাপাশি শুয়ে আছে গোলাপ আর পদ্ম। একই দেহের নির্বাস।... আর রাজকুমারী সেইটি নিয়ে গেলেন। এক শত বৎসর বয়স্ক গলিত লোল দেহ। কিন্তু তা স্বাধীন দেহ। রাজকুমারী যে দেহ সারা জীবন খুঁজছেন এবং পেলেন যখন তা চিত্তাকর্ষক তোলার সময় হল—।

নীলোফা কান্দছে। গালের ওপর দু'লিয়ে দেওয়া বোরখার ঢাকনা ভিঙে যাচ্ছে। অনিসুজ্জামান মূদু হোসে বলছেন— "স্বাধীনতা" প্রথমবার পড়ে কান্দেনি এরকম মোত কমই আছে।

এ সবই সম্ভব। এ সবই ঘটে। নীলোফা ও নীলিমার মধ্যে এই আশ্চর্য সম্পর্ক ঘটে যায়। পাশাপাশি দু'টি গৃহ দুই বোন বা বান্ধবীর মতো কঠলগা হয়ে একই সাজে সাজ পরে। অনিসুজ্জামানের মনে হয়, নারী বলেই এমন অসম্পর্ক সম্ভব। পুরুষ পারবে না। এত বৈপরীত্য, এত প্রান্তিক অবস্থান সত্ত্বেও এমন সম্পর্ক গড়তে পারবে না।

ঠিক আড়াইটির সময় অনিসুজ্জামানের জ্যাটের নীচে হর্ন বাজাল সত্য। অনিসুজ্জামান পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিলেন। নীলোফা নীলিমার দেওয়া ডুরে শাড়িটি পরেছে। ওপরে বোরখা চাপিয়ে নীলিমাতে দেখাতে গেছে। অনিসুজ্জামানের বুকের মধ্যে আবৃত ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। কী দেখাবে ও? মুখ নয়, বাহু নয়, সম্পূর্ণ অবয়ব নয়। যেটুকু বোরখার তলা দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, সেটুকুই। নিজেকে দেখাবার ইচ্ছা এত প্রবল হয় মানুষের? এত তীব্র হয়?

নীলোফার আসার অপেক্ষা করছেন অনিসুজ্জামান। ল্যাম্প পোস্টের রঙে দু'টি শালিখ এসে বসল। যে যার নিজের বুক খোঁচাচ্ছে ঠোট দিয়ে। ডানা দু'টি অপটে পরিপাটি করে নিচ্ছে। গলা ছেড়ে ডেকে নিল দু'—একবার। কথা কয়ে নিল দু'জনে। দু'টি অপকল্প পক্ষীবিভঙ্গ। অপকল্প দাম্পত্যবিভঙ্গও কি নয়? সাহিত্য থেকে কল্পনা ও চিন্তা অর্জন করে, বাস্তবে অসার্থক দাম্পত্য প্রত্যক্ষ করে সার্থক দাম্পত্য সম্পর্কে যে ধারণা অনিসুজ্জামানের মনে তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে মিলে যায় একমাত্র পাখিদাম্পত্য। চারপাশের মানুষের মধ্যে কোথাও তা নেই। অনিসুজ্জামান জানেন না, সে-ই সার্থক দাম্পত্য কিনা যা তিনি একদিন, মাত্র একদিন, চোদ্দো বছর বয়সে, দেখে ফেলেছিলেন। জেনেছিলেন সেই অমোঘ সত্যকে আর পালিয়ে গিয়েছিলেন সেই সত্যের কাছ থেকে তীব্র আকর্ষণে ও তীব্র বৈরাগ্যে; কঠিন টানে এবং কঠিন অপমানেও— কারণ তাঁর ক্ষেত্ররোগ তাঁর সুস্থতা ও স্বপ্ন হরণ করেছে। দাম্পত্য ও নারী সংসর্গের ইচ্ছা হরণ করেছে। আপন শরীরে আপনি অভিমানী হয়ে উঠেছেন তিনি। আর পালাচ্ছেন সেই চোদ্দো বছর বয়সের পালিয়ে যাওয়া।

বড় চাচির এক আত্মীয়ের বিয়েতে বেথুয়াভহরি গিয়েছিলেন অনিসুজ্জামান। শহরও নয় সে, বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আর গ্রামের শ্রান্তে এক ঘন বন।

তখন ওই বয়স। সব কিছুর প্রতি লজ্জা, আবার দারুণ টান ও অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের বয়স। গোপনে অসামান্য ঔৎসুক্য আর মুখে ও আচার-আচরণে, যেন কোনও ঔৎসুক্য নেই, এমন ভাব বজায় রাখা।

অনিসুজ্জামান প্রথম দু'দিন চাচির পিছন পিছন ছিলেন। কম কথা বলতেন আর শাস্ত্র ধরনের ছিলেন বলে সব সমবয়সীদের সঙ্গে তাঁর ভাব হত না চট করে। কিন্তু একজনের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। সে এক আশ্চর্য স্বপ্নিল ছেলে। পুঁথি আশ্চর্য-আশ্চর্য কথা বলত অনিসুজ্জামানকে। তার নাম ছিল কামাল। কামাল বলত, সে বাতাসে বারুকের গন্ধ পায়। আর সেইসব গন্ধ নাকি



পলাশির মাঠ থেকে উঠে আসে। একদিন কামাল তার বাবার সঙ্গে সিরাজের কবর দেখতে গিয়েছিল। ওখানে, সিরাজ ও তার পরিবারবর্গের কবরগুলি দেখে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে বাবার কাছ থেকে চোখের জল লুকোবার জন্য সিরাজের কবরের কাছে উণ্ডু হয়ে বসে পড়েছিল। আর তখন, ঠিক তখনই, সে শুনেছে প্যা, ধক্ ধক্ করছে। ভেতরে ধক্ ধক্ করছে।

অনিসুজ্জামান কামালের হাত চেপে ধরেছিলেন। কামাল বলেছিল— বিশ্বাস কর। বিশ্বাস কর। আমি স্পষ্ট শুনেছি। ধক্ ধক্ ধক্ স্পষ্ট শুনেছি। কবরের নীচে সিরাজের বুকের শব্দ। কারওকে বলিনি। কারওকে না। তোকে বললাম। তোর বিশ্বাস হয় না? তুই বিশ্বাস করবি না?

এতখানি বিশ্বাস নিয়ে যে কথা বলে তার কথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। কামালের চোখে-মুখে কষ্ট ফুটে উঠেছিল। যেন অদ্যাবধি সে শুনতে পাচ্ছে বাবরের গন্ধ বা সিরাজের বুকের ধক্ ধক্। আর কামালকে দেখতে দেখতে ভয় করছিল অনিসুজ্জামানের। পলাশির মাঠ, সিরাজের কবর, কিছুই দেখা হয়নি, কিন্তু কামালের চোখের মধ্যেই ছিল গোটা বুড়তা। আর, এই কামালই তাঁকে দেখিয়েছিল জীবনের আশ্চর্য জানালা।

একদিন, তখন বিকেল গভিরেছে। কামাল ডাকছে— মেঠা। মেঠা।

অনিসুজ্জামান বেরিয়ে এসেছেন। কামাল চোটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইশারা করছে। চোখে ডাকছে। চলে আয়। আয়। তার মুখ লালচে। ঘাম-ঘাম। অনিসুজ্জামানের শরীর শির শির করছে। কেন ডাকছে ও! কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে চুপি চুপি? যেন-বা কোনও নিষেধ পেরিয়ে অন্য এক নিষেধের কাছে যাওয়া। অনিসুজ্জামান যাচ্ছেন। কামাল তাঁর হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পায়ে, বনের কাছাকাছি। দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে একটি ছোট্ট কুঁড়ের পাশে। বাঁশের চাঁচের বেড়া আর খড়ো চালের কুঁড়ে। বেড়ার ফাঁকরে চোখ রাখলেন দু'জনে।

ঘরের মতো অন্ধকার। তারই মতো আরও তীব্র নুটি অন্ধকার বগু। সক্রিয় কিন্তু গতিশীল নয়। একটি কণ্ঠস্বর অতল থেকে উঠে আসছে— আমারে করো। জোরে করো। জোরে—

তার উচ্চারণ যথার্থ হচ্ছে না। খসে যাচ্ছে। অনিসুজ্জামান কামালের হাত চেপে ধরেছেন। অন্য একটি কণ্ঠ জোরের সঙ্গে, জেদের সঙ্গে বলছে— জোরে রে মাগী! জোরে! কত জোরে! কত! এই নে। এই নে। এই নে।

প্রত্যেক 'এই নে'র পর উচ্চারিত হচ্ছে বা ছিটকে উঠছে এক একটি 'আ' ধ্বনি, যা শুধু শব্দের মধ্যে বন্ধ রেখেছে প্রার্থিত সুখ ও যন্ত্রণার প্রহার। এত নিবেদিত যেন তা ধামলে পৃথিবীর মূর্গন যেমে যাবে আর ধ্বংস হবে সব সৃষ্টি, সব ভারসাম্যজাল।

—বউ। অ বউ।

—কও না কও। কও। আঃ কইতাছ না ক্যান?

গর্জন নয়। নাদ নয়। শুধু কয়েকটি সমাহিত শব্দ ওঠে দু'খানি মিলিত আঁধার বগু থেকে। যেন-বা, শরীরে শরীর রেখে মন খুঁজে ফেরে সেই প্রার্থিত মহাবাক্ত যা দেহ ডিঙিয়ে আত্মার মন্ত্র রচনা করে।

—তুই আমারে ভাবো?

—ভাবি গো। ভাবি গো। ভাবি। সারাদিন কাম করি। যুঁইটা দেই। উঠান বাড়ি। কাঠ কুড়াই—আর ভাবি।

—কী ভাবো? কও। কও না বউ কী ভাবো?

—আমি কানু না। কানু না।

—আমি যদি মরি? বউ? তখন কারে বলবা?

—না না না—

—আমারে যদি সাপে কাটে? তখন কারে দিবা সব?

—না না না—

—যদি বাজ পড়ে মাথায়, বউ? যখন মাঠে কাজ করি? তখন কারে ডাইনা চুল শানিয়ে।

—না। হয় না। এমন হয় না। আমার কেউ নাই গো। কিছু নাই তুমি ছাড়া।

একটি আঁধার বগু কাঁদে। অন্য বগু তাকে জড়ায়। পেবে। মিষ্ট সম্ভাষণ করে। দু'টি বালক শুনতে পায়— কান্দে না। অ বউ। কান্দে না। তবে ফেইলা আমার মইরা! সখ কই? আমার সব সখ তর গতরে। অখন ক'। ক' না। অ বউ! কও—

সমস্ত উত্থান-পতন খেমে আছে। এক বলক বৃষ্টির পর আরও বড় বৃষ্টির জন্য খেমে থাকে মুহূর্তের মতো। মেঘ ভারী হতে হতে, ভারী হতে হতে ফেটে যাবে হঠাৎ আর অববর চরক শব্দে বৃষ্টি হতে থাকবে। আবিজ্ঞান। অবিরত। যতক্ষণ না শান্ত হয় তুমি। যতক্ষণ না ভেঙ্গে। যতক্ষণ না গলে পিছলে কাদা হয়ে যায়।

আহা! কী কষ্ট পুরুষটার! কাতর গলায় বলছে— কও, কও!

আহা! কী কষ্ট মেয়েটার। কাতর গলার বলছে— কমু না। আমি কমু না। আমার শরম লাগে।

—কও। কও না। আমারে ভাবো তুমি? কী ভাবো?

—ভাবি, ভাবি, ভাবি। তুমি আসবা। আইসা নিবা আমারে। করবা। নিবা না? কও? নিবা না? ন্যাও, ন্যাও, ন্যাও—

আগুন লেগে গেছে দুনিয়ায়। অশ্রান্ত, অনিবার্য আগুন। বৃষ্টি নামার আগেকার এক নিষ্ঠুর দহনে জ্বলে যাচ্ছে বুক। জ্বলে যাচ্ছে চেতনা। যেন-বা অসহ গ্রীষ্মে আকণ্ঠ অপেক্ষা সেই আরাধ্য অনিবার্য পরিপূর্ণ বর্ষার। অসহ্য কষ্ট হচ্ছে। অনিসুজ্ঞামান কামালের হাত ছেড়ে পালাচ্ছেন। ছুটছেন। কামালও দৌড়ছে পিছনে— এই। পালাচ্ছি কোথায়? যাস না। বনের কাছে যাস না।

অনিসুজ্ঞামান থমকে দাঁড়াচ্ছেন। দেখছেন কামালকে। অথবা দেখছেনও না। কারণ, বোবা চোখে তাকিয়ে আছেন তিনি। প্যাণ্টে চাপ পড়ছে। অসহনীয় চাপ আর কষ্ট! তাঁর ভয় করছে। খুব ভয় করছে। এ সব কী! কেন এমন হল। কামাল বুঝতে পারছে। নাইস দিচ্ছে অনিসুজ্ঞামানকে— ভয় পাস না। দেখ। এই দেখ। আমারও—

সে নিজের প্যান্ট খুলে ফেলছে। অন্ধকারে। বনের সীমানায়, দু'টি বালক, অসহায় আগুনে পুড়তে থাকছে আর তাদের মধ্যে দাপাদপি করছে উদ্ভাদনা। একজন পুড়েছে আগুনে। সে জানে। সে প্রাজ্ঞ। সে তার আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে অন্যজনে, যেমন করে স্বপ্নের পর স্বপ্ন ছড়িয়ে যায়। অন্যজনের প্রথম। তার কী যে লাগছে! মা গো! সে কি পাপ করছে! খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বাজে!

কামাল বলছে— বোল্। সবটা।

সে খুলছে।

কামাল বলছে— ধব্। এইভাবে। এ রকম ধব্।

সে ধরছে। যথার্থ। যেমন ধরছে কামাল। যেমন বলছে। অনিসুজ্ঞামান এখন এক যন্ত্রবৎ। লজ্জামুখ খুলে যাচ্ছে আপন সজ্জা। আগুনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য উদ্গিরণ! এ কী। এ সব কী! প্রথমে কাঁপন এবং এক বলক হাওয়ার মতো নির্যাস। তারপর ভিজে গেল হাত। আবার পালালেন অনিসুজ্ঞামান। কামালের ডাক উপেক্ষা করে, হাত ভিজে যাবার হাত থেকে পালাতে থাকলেন। ওই সব সজ্জার থেকে, ওই কুঁড়েঘরের দৃশ্য আর শব্দ থেকে, ওই নির্গমন থেকে কেবলই পালাচ্ছেন তিনি। পালাতে পালাতে আজ এতগুলি বছর। প্রথম ক'দিন নিজেই খারাপ লেগেছিল। পানী লেগেছিল। রাতে ভাল ঘুম হত না। খেতেও ইচ্ছে করত না। অনেকদিন এরকম হয়েছিল। আজ আর পাপবোধ নেই। শরীরে কিছু আসে, তা ফেলে দিতে হয়। রেচনক্রিয়ার মতো। কিন্তু এতে পাপবোধ না থাকলেও ক্রান্তি আছে। অপরিণীত ক্রান্তি

আর তৃপ্তিবিহীনতা।

তৃপ্তিবিহীনতা? এর খবর কি তিনি জেনেছেন একদিন? জানতেনই না। জানতেন না। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে অন্যান্য রেসনক্রিয়ার মতোই যখন স্বহস্তে নিজেকে হুস্ত করতেন তখন টের পাননি তাঁর নিজের মধ্যে এই ক্ষুধা কত বিশাল। কী ভয়াবহ! এ কি কোনও দানবীয় ক্ষুধা, না প্রকৃতপক্ষে এ-ই মানবিক? অনিসুজ্জামান রাতিরা না। শুধু যেদিন এই ক্ষুধা নির্মম হয়েছিল, সে-দিনের সেই রাত্রির জন্য, সেই ছোয়া ওঠা ও নির্দাপনের জন্য, নিজের প্রতি ক্ষমা নেই। কিছুমাত্র ক্ষমা নেই তাঁর।

নীলোফা ডাকছে— ভাইজান আমার হয়ে গেছে।

সে নামছে সিঁড়ি বেয়ে। পিছনে অনিসুজ্জামান-নীলিমা এসে দাঁড়িয়েছেন সিঁড়ির মুখে। বলছেন— আমার জন্যও একটা ঢিল বাঁধিস তবে।

—বাঁধব। কিন্তু তোমাকেই গিয়ে খুলে আসতে হবে মাসি।

—যাব একদিন।

অনিসুজ্জামান বলছেন— হ্যাঁ রে, ঢিলে কি সব নাম লেখা থাকবে?

নীলিমা আর নীলোফা হাসছেন। সম্মিলিত শব্দে সিঁড়ির আবহতার ধাক্কায় প্রতিধ্বনি উঠছে। তৃণাঙ্কুরও এসে দাঁড়াগেল নীলিমার পাশে। নীলিমা হেসে বলছেন— ছেলোটর কথা শোন। ঢিলে লিখা নাম লেখা থাকে।

আর এক দফা হাসির শব্দ উঠছে।

অনিসুজ্জামান সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে অবাক গলায় বলছেন— ও। থাকে না? তাহলে খোলার সময় কেমন করে বোঝা যাবে কোনটা কার ঢিল?

নীলোফা বলছে— যে-কোনও একটা খুলে এলেই হবে ভাইজান।

নীলিমা বলছেন— একেই বলে পুঁথি-পড়া বিদ্যা। লৌকিকতা, আচার, ধর্ম নিয়ে বই পড়ে পাতার পর পাতা লিখে ফেলল, ঢিল বাঁধার নিয়ম শিখল না।

তৃণাঙ্কুর সরব হলেন এবার। বললেন—

আমাদের ছাত্রদের ভাষায় বলি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মাসুদা...

—ছাত্রদের ভাষায় আমার বক্তব্য হল ঢিল বাঁধার বিষয়ে আমারও কোনও ফাণ্ডা নেই।

তুমুল হাসি বাজল। কারণ এ হাসির সৃষ্টি সমন্বয়ে।

হাসির দমকে ভাসতে ভাসতে সিঁড়ি টপকান্ধে নুঁজেন। অনিসুজ্জামান নীলিমার কথা ভাবছেন। সত্যিই আশ্চর্য সংস্কারমুক্ত এই মহিলা। আজ অষ্টমী, পূজার দিনে তিনি পীরবাবার ঘানে ঢিল বেঁচে আসার সংকল্প করছেন। এ নিয়ে কোনও ঘিণা নেই। সংকোচ নেই। সকলকেলায় দেখা সত্বে মাকে মনে পড়ল অনিসুজ্জামানের। এই উপলব্ধি আবার জাগ্রত হল যে, সাধারণ মানুষ সর্বক্ষণ নিজের মধ্যে ধর্মভেদ জারি রাখে না। রাখে মাত্র কয়েকজন। আর তারাই অন্যদের মধ্যে এই ভেদ চারিয়ে দেয়। স্বার্থে বা অন্ধ সংস্কারে।

গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দিয়েছিল সত্য। কিন্তু অনিসুজ্জামান নীলোফাকে পিছনে বসিয়ে সামনে সত্বে পাশে চলে এলেন। খুব ভাল লাগল সত্বে। গাড়ির ব্যবসা করছে বলে, ড্রাইভার না রেখে নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে বলে অনেকেই তাকে অপাত্তনের জ্ঞান করে থাকে। অনেক বন্ধু বা পরিচিত জানই তাকে এড়িয়ে গেছে যখন সে যাত্রী নিয়ে পুরোপুরি কার-ড্রাইভার। এ জন্য সে কষ্ট পেয়েছে কিন্তু ভেঙে পড়েনি। শুধুমাত্র ভরভাবে আত্মনির্ভর থাকার জন্য এ পর্যন্ত অনেক কষ্ট করে এসেছে তারা। এখন, তার মধ্যে এই চেতনার উন্মেষ ঘটেছে যে কোনও কাজেই কোনও অপমান নেই যদি তা সং হয়ে থাকে। যদি তা কোনও

মানুষকে নিজের দুটি পায়ের ওপর দাঁড়াবার অধিকার দেয়।

আনিসুজ্জামান গাড়ি বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন সত্যর সঙ্গে। ব্যবসা করে লাভ থাকে কি না। ট্রেড লাইসেন্স আছে কি না। নীলোফর জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। তার হাতে ছোট একটি ব্যাগ। বাগবাজার পেরিয়ে গাড়ি ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। সারা রাস্তা খোঁজা। গর্ত। জল জমে আছে। গর্তের পাশেই তার মটি ভূপ করে রাখা। খুঁড়ে তৈরি করা খারকি খাল ছাড়াও রাস্তায় অসংখ্য খোঁদ। ছাল-চামড়া উঠে যাওয়া অমনুগত। রাস্তা না বলে একে-রাস্তার ইতিহাস বলা ভাল। গাড়ি ঝাঁকুনি খাচ্ছিল। চিত্তরঞ্জন অ্যান্ডিনিউ ছেড়ে বামিকে বাঁক নিল সত্য। ট্রাম লাইন আছে বলে বিধান সরণিতে অন্তত খোঁজাখুঁজি নেই। কিন্তু এখানে হকার আছে। পুজোর দ্বিতীয় দিনেও পুজোর বাজার চলছে পুরোদমেই। কেনাকাটা এখনও শেষ হয়নি। হকার বাজার জেতা দর্শক আর পুজো প্যাণ্ডেল। রাস্তা অনেকখানি নিয়ে পুজো প্যাণ্ডেল করা হয়েছে। এক একটি প্যাণ্ডেলের অন্তত আধ কিলোমিটার এখার-ওখার দূরত্বে আলোকসজ্জার কারিকুরি। তার জন্যও বেশ ভাড়াগা লাগে বইকি। আলোকসজ্জার সঙ্গে সঙ্গে মাইকের বাজনা। এত জোর সেশন যে গাড়িগুলি পরস্পরের হর্ন শুনতে পাচ্ছে না। এক প্যাণ্ডেলে বাজছে— পুরানো সেই দিনের কথা— হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠ— তার বেশ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে— হাম কালে হায় তো কেয়া হয় দিলবালে হায়— মেহমুদ রাস্তা জুড়ে নেচে বেড়াচ্ছেন। ছেলেদের বড় বড় চুল আর লম্বা জুলফি। চাপা ফুলছাপ শার্ট। প্যান্টের মাথা হঠাৎ পায়ের কাছে চওড়া হয়ে পতপত করছে। তারা সব শরীর দোলাচ্ছে, কোমর দোলাচ্ছে। হাঁ, বড় সুখে আছে তারা। তাই নাচছে। না গো। বড় দুঃখে আছে। কিছু তো নেই জীবনে, তাই নাচছে। সুখে নাচুক বা দুঃখে নাচুক— সে-নাচ সকলের সহনীয় নয়। শুধু মেয়েরা খুব রঙিন আর ঝলমলে সোজা এ নাচ উপভোগ করছে। বুকি-না এরাই সেই স্বপ্নের নায়ক, যারা পথে পথে নৃত্যপর দৃশ্যমান হয়। সব সাজগুজু মেয়েরা নেমে এসেছে রাস্তায়। আর রক্ত জটাজীর্ণ চুলের এক আব্দুল বালিকার নাক দিয়ে শিকনি গড়াচ্ছে, সারা গায়ে মাটি, ন্যাংটো ভাইয়ের হাত ধরে রাস্তা পারাপার করছে। হাঁ করে দেখছে নাচ, সাজ, আলোকবিস্তার। আজ যেতে পারনি, তবু কী আনন্দ কী আনন্দ, শহর উৎসবে মেতে আছে।

নীলোফর দেখছে— তার মতো— নতুন শাড়ির ওপর বোরখা পরা একজনও নেই।

ধর্মতলার কাছাকাছি আসতেই এক যুবক প্রায় কাঁপিয়ে পড়ল সত্যর গাড়ির ওপর— দাদা, দয়া করে সাহায্য করুন।

—কী হয়েছে? কেউ অসুস্থ? দুর্ঘটনা? হাসপাতালে যেতে হবে?

—না দাদা। এ বিয়ে করবে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে যাবে। একটাও টাক্সি পাচ্ছি না।

সত্য আনিসুজ্জামানের দিকে তাকাচ্ছে। ছেলটিকে বিশ্বাস করবে কী করবে না। মিথ্যা বলছে না তো? কোনও মতলব নেই তো?

আরও কয়েকজন ঘিরে ধরল গাড়িটাকে। আনিসুজ্জামান বললেন— কিন্তু আপনাদের এতজনকে নেওয়া তো সম্ভব নয়।

একজন বলল— এতজন না। সারা। আপনি মাত্র তিনজনকে নিল। বর-কনে আর অন্য একজনকে। আমরা যে-ভাবে হোক আসছি।

—কোথায় যেতে চান সেটাই তো বলেননি। আপনাদের কটে যদি না যাই?

ছেলেগুলো চুপ। পিছনের সার সার গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। একজন বলল— বেহালা যাব সারা।

এ বার সত্য কথা বলল— শুনুন। আমরা খিলিরপুর যাব। আপনারা সব ওখানে নেমে যাবেন।

রাজি হয়ে গেল দলটি। একটি লাজুক-লাজুক মেয়েকে নিয়ে নীলোফর পাশে উঠে বসল এক যুবক। মেয়েটি এরই মধ্যে সিঁদুর দিয়েছে কপালে। অন্য একজন সামনে এসে

আনিসুজ্জামানের পাশে বসল। বেশ চাপাচাপি হল। গুহিয়ে বসতে না-বসতেই সে বলল—  
আমি স্যার আপনার কলেজেরই ছাত্র। চিনতে পারছেন না তো স্যার?

সে আনিসুজ্জামানের পায়ের খোঁজে ঝুঁকল। আনিসুজ্জামান তার হাত ধরে ফেললেন। সে বলল—  
দিনবেন আর কী করে স্যার। সবটা তো পড়িনি, বুঝলাম ঢুকে গেলাম।

আনিসুজ্জামান মুখ খোলেন—  
বেশ? শক্তবে না কেন?

—ওই যে স্যার, বোমা বানাতে গিয়ে এই আঙুলটা উড়ে গেল। বাবা বলল, ওসব নকশাবাজি অনেক হয়েছে। অত বড় দোকান স্যার বড়বাজারে। আমি ছাড়া কে দেখে। একমাত্র সন্তান তো স্যার। বুধ কামেলা। পড়াশুনা তো-আগেই গেল। এবার পাটি-পলিটিকা ছেড়ে ঢুকে গেলাম দোকানে। এই যে বিয়ে করছে স্যার—ও বিজয়! মাই বিজয়, নেখে স্যারকে প্রণাম করবি। আমি তো আপনাকে দেখেই বুঝলাম স্যার—কাঁপিয়ে পড়—পাড়িতে এ এস এম—কোনও ভয় নেই। ঠিক তাই হল।

—তুমি তো জানতে না আমি কোথায় যাব।

—না জানলেই কি স্যার? আপনাকে তো জানি। আমি পরিচয় দিলে আপনি কি আর না করতে পারতেন? যেখানে বলতাম সেখানেই নামিয়ে দিতেন।

—আজ কিছু আমি তোমাদের বিদ্যাপুরেই নামিয়ে দেব—মানে ইয়ে—তোমার নাম মনে নেই।

—স্বপন স্যার। স্বপন কবাক।

—হ্যাঁ স্বপন। আজ বেহালা পৌছানোর কোনও উপায় নেই আমাদের, কেমন?

—সে কোনও ব্যাপার নাকি, স্যার? এতটাই কি কেউ করে? কী কামেলায় যে পড়েছি স্যার। বিজয়ের স্বপুর্নটা এক নম্বরের ডামনা, বুঝলেন। কিছুতেই রাজি হয় না। বলে বানিয়াকে মেয়ে দেব না। বানিয়ারা মানুষ নাকি। নে, এবার ঠালা বোঝ... মালতী। সারি মাইরি। কিছু মনে কোরো না।

একটি কীণ শব্দ উঠল—  
না না, এতে মনে করার কী আছে? আনিসুজ্জামানের ইচ্ছে করল চাচ্চনা বাপের মেয়ের গদগদ মুখখানা একবার দেখেন। কিছু নিদারুণই তা অসম্ভব। তিনি একবার সত্য পড়ির আড়ান্না দেখার চেষ্টা করলেন। হল না। তখন সত্য হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—  
সকলদের ব্যাচ? সুজিত, হীরক ওদের সঙ্গে থাকতেন?

হেসেটি চমকে উঠল। বলল—  
হ্যাঁ। ঠিক। কী করে জানলেন?

সত্য বলল—  
ওই আঙুল উড়ে যাওয়ার গল্প করলেন, তাতে বুঝলাম। আপনার তো আঙুল। হীরকের দু'টা পাখা উড়ে গিয়েছিল না?

—হ্যাঁ। আপনি জানেন? চেনেন হীরককে।

—চিনি। ও কী করে এখন জানেন?

—না। জানি না। যোগাযোগ নেই তো। কী করে?

—কাশীপুর শাশনঘাটে বসে খাঁজা বাঘ। কোনও কাজ তো করতে পারে না। দুই কজিতে কক্ষেটা ধরে। শুনেছি বোমা বনানোর ট্রেনিং নিচ্ছে আজকাল।

—আঁ! কোথায়? কাদের?

—নকশালদের নয়। নকশালরা তো নিরামিষ হয়ে গেছে এখন। এই ভোটে তো সি পি এমের হয়ে ষাটলও অনেক।

বিদ্যাপুরে নেমে গেল ওরা। নামার সময় আবার আনিসুজ্জামানকে প্রণামের ভঙ্গি করেছিল আর আনিসুজ্জামান 'থাক—থাক' করতে অব্যাহতিও পেয়েছিল।

বিকেল গড়িয়ে গেছে। আলোকসজ্জা উজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমশ। মাজারে ভিত নেই। নীলোৎস

ভিতরে চলে গেল। আনিসুজ্জামান বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। পূজোর স্বজ্ঞারে দামান বাতাস। তিনি একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলেন। বলমলে কপড়ে ঢাকা পবিত্র আজগার কাছে স্থির হয়ে বসে আছে নীলোফা। বাইরে থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার নামছে। আলোর কাকতালি, সাজসজ্জা, রোশনাই স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। আনিসুজ্জামান আবার মাজারের দিকে তাকালেন। নীলোফা তেমনই বসে আছে। স্থির। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আলোকসজ্জা দেখা-হাতা কিছু করার নেই। তাঁর মনে হচ্ছে— এই উৎসবের আলোও কত বাণীয়া সময়ের মতো নিষ্ঠুর। কারও গুণ কষ্ট যন্ত্রণার পরোয়া করে না। ঠিক জ্বলে। কোথাও না-কোথাও। অথবা, অন্যভাবে দেখলে, এই রোশনাই আসলে জীবনের মতো। কিছুতেই নেবানো যায় না। যাই খুঁজ, জীবনপ্রবাহ থামে না।

খুব বেশিক্ষণ সময় নিল না নীলোফা। আনিসুজ্জামানের ঘেরা-সাজেই হওয়ার কারণেই চলে এল সে। আনিসুজ্জামানের মনে হল নীলোফাকে তিনি কোথাও কোনওদিন নিয়ে যাননি। বেড়াতে, সিনেমা বা নাটক দেখতে, কেনাকাটা করতে— কোনও জায়গাতেই নয়। তাঁরও ইচ্ছে করেনি। নীলোফাও বলেনি কখনও। তার কিছু প্রয়োজনীয়তা সে নীলিমার সঙ্গে গিয়ে মিটিয়ে নেয়। টাকার অভাব নেই। মনিকল নীলোফাকে অর্থে বঞ্চিত করেননি। প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আসার সুব্যবস্থা তিনি করেছেন। আনিসুজ্জামান তাঁর ব্যাল্টেই অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছেন নীলোফাকে। কিন্তু কোনওদিন জানতে চাননি সে কত পায়, কী খরচ করে। তাঁর নিজের উপার্জনেরও পুরোটাই তিনি দিয়ে দেন নীলোফাকে। দরকারমতো চেয়ে নেন। নীলোফা সব সামলায়। সংসারের খুঁটিনাটি, আনিসুজ্জামানের দরকারি জিনিসপত্র এবং নিজেরও সব। আজ প্রথম আনিসুজ্জামান নীলোফার জন্য সময়টি দীর্ঘায়িত করতে চাইলেন। যা যা তিনি করেননি, যা যা তিনি করতে পারেন, তার সামান্য একটু করার ইচ্ছে পূজোর রোশনাইয়ের মতো জ্বলে উঠল। তিনি বললেন— ফ্যাপি মার্কেট যাবি?

মাথা নাড়ল নীলোফা। যাবে। আনিসুজ্জামান বললেন— সত্যর বোন শিউলির আজ জন্মদিন। ওর জন্য কিছু কিনে দিবি নীলু?

—দেব। বলল নীলোফা।

সত্য মাজার থেকে একটু দূরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আনিসুজ্জামান তাকেও ফ্যাপি মার্কেট যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। সে রাজি হল না। পূজোর সময়। গাড়ি ফেলে যেতে পারল না। বলল— আপনারা ঘুরে আসুন। আমি এখানে আছি।

আনিসুজ্জামান নীলোফাকে নিয়ে ফ্যাপি মার্কেটের দিকে এগোলেন। শিউলির কথা আবার মনে পড়ল। কী দেওয়া যায় মেয়েটাকে? ঘড়ি? ওং কি ঘড়ি আছে? হঠাৎ তাঁর মনে হল, আচ্ছা, শিউলিকে কী দেবেন ভেবে মাথা খারাপ করছেন— নীলোফাকে কিছু দেবার কথা মনে হচ্ছে না কেন? নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হন আনিসুজ্জামান। সংকল্প করেন, কিছু দেবেন নীলোফাকেও। কিন্তু কী দেবেন? কী পেলে ও খুশি হবে? মনে মনে অসহায় বোধ করেন তিনি। কষ্টও হয়। এই মেয়েটা— এই দক্ষ, বিদ্যা, বাস্তব, বোরখা-ঢাকা মেয়েটা আজগারকাল আনিসুজ্জামানের সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করছে, অথচ তিনি জানেন না সে কী পেলে খুশি হয়। কী চায়। নীলোফাকে হঠাৎ আনিসুজ্জামানের অচেনা গ্রহান্তরীয় মতো লাগে। যে স্বীকার করলে আছে। না করলে নেই। তা নিয়ে মাথা ঘামবারও দরকার নেই। কিন্তু সে যে আছে, সে যে রইল, তা যেন অতি আশ্চর্য এবং বাড়তি। বাড়তি তার অস্তিত্বটাই যা শুধু আছে এই স্বীকৃতির মধ্যেই পূর্ণ। এটাই তার সবচেয়ে বড় পাওয়া। এর চেয়ে বেশি তাকে চাইতে নেই। চাইলে মানুষ তার দিকে অবাক হয়ে তাকাবে— এই পোড়া মেয়েটা চাইছে— দেখা চাইছে। তাহলে চাইতে পারে ও? চাইতে জানে?

ট্রাম রাস্তা পেরোতে পেরোতে আনিসুজ্জামান খুব হালকা চলে, যা তাঁর মধ্যে প্রায় বিরল, জিজ্ঞাসা করলেন— সব ছেড়ে এই মাজারে এলি কেন রে?



নীলোফা বলল— এখানে ঢিল বাঁধলে সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

আনিসুজ্জামান নির্ভরে চাপলো আর তজ্জনিত নিচুরতায় বলে ফেললেন— তোরও ইচ্ছে? কী চাইলি তুই? আ?

মাথা নিচু করে এগোচ্ছে নীলোফা। এগোচ্ছে। উত্তর করেছে না। আনিসুজ্জামান আবার বলছেন— কি রে? তোর কী চাই?

নীলোফা দাঁড়িয়ে পড়ল। বোরখা-আবৃত মুখ তুলল। বলল— হাসছেন না? আরও তো হাসি পাবে শুনলে, কী চাইলাম।

ককশ হাওয়া এসে এক নিমেষে উড়িয়ে দিল আনিসুজ্জামানের চপল ধুলোবাঁচি। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর হাত তীর হল। তাঁর ডায়. করতে লাগলো। শিঠি মিসরিস করা ডায়। অনেকটা যেন কামালের সঙ্গে বেথুয়াডহরির বনের আশে চলেতে থাকার ডায়। তাঁর পালাতে ইচ্ছে করল। নীলোফার উত্তর শোনার আগে এই ট্রাম রাস্তা ধরে উল্লাসের ছায় সে-ছুটি সে-ছুটি। কেন? কেন এরকম ইচ্ছে হল? সে-দিন যে তিনি পালিয়েছিলেন, ওই বেথুয়াডহরির গ্রামে, সে কী ওই দূশোর থেকে? কুঁড়ের থেকে? কামালের থেকে? না তো। না তো। তবে? তাঁর নিজের থেকেই কি নয়? নিজেকে চিনতে গিয়ে নিজেকে অস্বীকার করতেই কি নয়? নিজের কোনও অনভিজ্ঞত, অপ্রত্যাশিত ধর্মকেই কি বেথুয়াডহরির বনের উপাশে ফেলে পালাতে চাননি তিনি?

পালাতে চান। কিন্তু উপায় নেই। সত্যিই ট্রাম রাস্তা ধরে ছুট লাগানো বায় না। তিনি প্রতীক্ষা করছেন। দোষ দিচ্ছেন নিজেকে। কেন জানতে চাইলাম! কেন এই কৌতূহল! যেন-বা এক অমোঘ প্রশ্ন করে বসে আছেন, শুনবেন অমোঘ উত্তর।

ট্রাম লাইনের ওপর নীলোফার মুখোমুখি বা মুখোমুখি নন এমনই দাঁড়ানো তাঁর। মুখোমুখি নন কারণ এ একতরফা তাকানো। নীলোফার মুখ ঢাকা। নিচু। সে বলছে— আমি চাইলাম... আমি চাইলাম... এমন একজন মানুষকে, যে আমাকে দেখে ঘোমায় পালিয়ে যেতে চাইবে না। বেসিন ভরে বমি করবে না।...

লোডশেডিং হল। চারপাশ ডুবে গেল অন্ধকারে। গাড়িগুলি তীব্র হর্ন দিতে থাকল। লাউড স্পিকার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্ত হর্নের শব্দ অন্ধকারের সঙ্গে যড়যন্ত্র করে ছিন্নভিন্ন করে দিতে থাকল আনিসুজ্জামানের শ্রুতিকে।



অনেকদিন পর ব্রজগোপালের ওষুধের দোকানের আজ্ঞায় এলেন আনিসুজ্জামান। দুর্গাপূজা শেষ হয়েছে। দেবী ভাসানে গেছেন। বহু মেয়ে-পুরুষ, বালক-বালিকা, প্রেমিক-প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে সঙ্গে সঙ্গে গেছে। কিশোর-যুবকরা নাচতে নাচতে গেল। গঙ্গায় ভাসান জমবে। অনেকেই আত্ম মন্যপান করেছে। কিংবা সিঁড়ির সরবত। ভাসানকালে একটু গাঁজা টানটানি হবে। জল ছোঁড়াছুঁড়ি। এ ওকে চুবনো।

মাথুরের গড়ের মা দুধা গেলেন একটি বিশাল ট্রাকে, সে ট্রাক সুধীর পালের। কাজল, হয়তো তাঁর কাবার ট্রাক বলেই, দু'পাশে সজ্জন আর অমিত্রভেদে নিয়ে ভেঙে চেপে বসেছে। শরীর দুলিয়ে নাচছে। পূজোয় জৌলুস কম থাক, অনিল সামন্তর ডান হাত বাসুদেব পোদার নিজে এসেছেন ভাসান রঙনা করিয়ে দিতে। এ সব দেখে সুধীর পালের ট্রাকে চেপে মা দুধার চোখ

ছল ছল করছে। সুধীর পাল যে-বার প্রথম টাক কিনেছেন সে-বার থেকেই মাথুরের গড়ের মা দুগ্ধা তাঁর টাকে চেপেই প্রতিবার ভাসান যাচ্ছেন। কত টাক এল সুধীর পালকে, কত খেল, কত টাক উল্টে পড়ল হাইওয়ের পাশে আর চোরাই কাঠ পাচারের দায়ে ধরা পড়ল—তার হিসেব স্বয়ং মা দুগ্ধাও জানেন না। যত কাজ, যত ব্যস্ততাই থাকুক, দশমীর দিন একটি টাক মা দুগ্ধা জন্য ঠিকই মজুত রাখেন সুধীর পাল। মা ভাসানে যাচ্ছেন। কম কথা নয়। এ সুযোগে বাসুদেব পোদ্দারের সঙ্গেও একটু কথা বলা যায়। দরকারে-অনরকারে অনিল সামন্ত বরাদির পাশে আছেন। তবে এখন পাড়ার যা ভাবগতিক, পরবর্তী ভোটাদুটির আগে শ্যামাকান্তের সঙ্গে তার জমিয়ে ফেলতে হবে। কিছুদিন আগেও এলাকায় সি পি এমের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু এখন পাড়ায় পাড়ায় পাটি অফিস হচ্ছে। এ পাড়ায় নীলিমার বাড়ির ওলায় গ্যারেজে পাটি অফিস করেছেন শ্যামাকান্ত। সেখানে বেশ আড্ডাও জমেছে। একদিন যা হাল-চাল ছিল তাতে শ্যামাকান্ত কমিউনিস্ট বলে তাঁকে করুণাই করত লোকজন। আর শুধু কমিউনিস্ট হওয়াই নয়, শ্যামাকান্ত এই সম্পন্ন মাথুরের গড়ে অসম্পন্ন গৃহস্থ। সেই হিসেবে উদ্বাস্তু কলোনিতে তাঁকে মানাত ভাল। যদিও, এখন শ্যামাকান্ত পার্টির কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের উন্নতি করে নিচ্ছেন ধীর প্রক্রিয়ায়, তবু, পুরোদস্তুর নেতা হবার পরও একটি দারিদ্রের ইতিহাসের জন্য তিনি এ পাড়ার নির্মম অন্তরে অবহেলিতই থেকে যাবেন।

পাড়া শাসন করে মা চলে গেলেন। যে-ক জন আছেন, ভাসানে যাননি, বিজয়ার সাক্ষাৎপর্বে আড্ডায় জমা হচ্ছেন এইবেলা। আনিসুজ্ঞামান আসতেই বিকাশ ও সমরেন্দ্র একসঙ্গে বললেন—এসো, অধ্যাপক, এসো। তাঁরা কোলাকুলি করলেন। আনিসুজ্ঞামানের সঙ্গেও করলেন একে একে ব্রজগোপাল, বিকাশ, রতেন, সমরেন্দ্র। ভাসান দিয়ে ফেরার আগে এই পর্ব শুরু হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আড্ডায় নিয়ম নাস্তি। বাস্তব মানুষ সব। এ বেলা সুযোগ পেয়ে করণীয় সেরে ফেলতে চান।

আনিসুজ্ঞামান আসার একটু পরেই প্রণবেশ এলেন। আবার একদফা প্রণাম ও কোলাকুলি হল। ব্রজগোপাল এটুকুর জন্যই দোকান খোলা রেখেছেন আজ। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আড্ডার সব সদস্যই আছেন। শুধু মল্লিনাথ নেই। সবচেয়ে বর্ষীয়ান, সবচেয়ে প্রিয় সদস্য এই আড্ডার। আনিসুজ্ঞামানের মনে হল, কতদিন মল্লিনাথের কাছে যাওয়া হয়নি। মল্লিনাথের মধ্যে ভেগে ওঠা ছোঁয়াছুঁয়ি-জনিত সংস্কারকে মনে মনে জমা করতে সক্ষম হয়েছেন আনিসুজ্ঞামান। কিন্তু ভিতরকার উদ্বেগ যায়নি। আবার যদি ঘটে কিছু। আবার। আবার।

তবু কষ্ট হয়। মানুষটির জন্য কষ্ট হয়। সেই মেলামেশা করা মানুষ, একলা হয়ে গেলেন। সেই খ্যাতিমান ডাক্তার, চিকিৎসা ভুলে গেলেন। আর চেষ্টারে যান না। প্রাকটিস করেন না। রোগীরা জেনে গেছে ডাক্তারবাবু আর চিকিৎসা করতে সক্ষম নন। সারা দিন একা একা গৃহে কটান। পূজা করেন। ওষুধের আলমারির কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন মাঝে মাঝে। মানুষ কখনও কখনও তার পেশা ধারা নির্ণীত হয়। পেশার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে যায় সত্তা। বিশেষত, যে-পেশার মধ্যে ঢুকে পড়ে নির্মাণ, সৃষ্টি, সাফল্য, বার্বতা—যে-পেশার মূল্যমান কোনওদিন অর্থ দ্বারা তুল্য হয় না, তার থেকে নিজের সত্তা বিয়োগ করলে ফলাফল শূন্যে ঠেকে। এমনই পেশা, যা কারও গুণ ও প্রতিভা, জীবনযাপন ও বস্তু চলাচল—তা যদি ছেড়ে যায় সেই মানুষকে তবে তার নিজস্বতার আর কোনও অর্থ থাকে না। তার, এমনকী, ক্ষয়ও শুরু থাকে।

মল্লিনাথের আলমারির ওষুধ আর বাড়েনি। কমেওনি। তিনি স্বাভাবিক ভাষা ভুলে গেছেন। স্বাভাবিক কথাও। যে-কোনও কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলেই রূপচাঁদ এসে পড়েন সে-প্রসঙ্গে। রূপচাঁদ, যার কথা এতদিন গোপন রেখেছিলেন মল্লিনাথ, সেই সর্পখোদিত কাঠামো, যার ভেসে আসার কাহিনীও তিনি করতকৈ বলেননি, তা এখন মল্লিনাথের ঘনিষ্ঠজনবিদিত। যে-ই যখন গেছেন, তাঁকে দেখতে, তাঁর খোঁজ নিতে, তিনি শুনিয়েছেন সব

কথা। কিন্তু আনিসুজ্জামান যা জানেন, যত দূর জানেন, তা কি জানেন আর কেউ। সম্ভবত নয়, কারণ আড্ডায় এ নিয়ে আলোচনা হয়নি। এখানে সকলেই এমন নন যে-সোপান কথা এই আড্ডাতেও লুকিয়ে রাখবেন, বিশেষত তা অন্য কারও সম্বন্ধীয়, এমনই সূচ্যেতা হয়ে থাকেন। আনিসুজ্জামান ভাবেন, আজ এমন দিনে, সকলে মিথে মজিনাথের গাতি গোলে কেমন হয়। সে-কথা বলার আগেই বিকাশ বলেন—একটা ভাল খবর তোমাদের নিই।

—কী খবর? কী খবর?

—ছেলের বিয়ে ঠিক হল।

—বাঃ! খুব ভাল। খুব ভাল। কবে? কোথায়? কোন মাসে?

সমস্বরে প্রশ্ন উঠল। বিকাশ বলেন—মেয়েটি ত্রিপুরার। আশুভক্ষার নাকি। তবে কলকাতায় থেকে এম-এ পড়েছে। আমাদের অধ্যাপকের বিয়ায়।

—বাংলা? বাঃ।

—আমিও মেয়েটিকে গল্প করেছি, অধ্যাপকের কথা। বুঝলে অধ্যাপক, সে তোমার নাম জানে। বোধহয় কোনও এক পত্রিকায় কোনও ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলে তুমি।

আনিসুজ্জামান সংকোচ বোধ করেন। বলেন—হ্যাঁ ঠিকই। আধুনিক কবিতার বিবর্তন নিয়ে লিখেছিলাম বটে। সেটা উনি পড়েছেন।

বিকাশের ছেলের বিয়ে নিয়ে আরও কথা চলতে লাগল। ভিসম্বরে বিয়ে। বিকাশ খুশি। ব্রজগোপাল বললেন—অনুপমেরও বিয়ে ঠিক হয়েছে সুনলাম। ওই সময়েই।

—তাই নাকি? অনুপম। মানে পরেশবাবুর ছেলে।

সমরেন্দ্র চোখ মটকালেন—পরেশ ছেলের বিয়ে নিচ্ছে।

বিকাশ বললেন—তা কেন দেবে না? নিজে যাই হোক, ছেলে দুটো ভাল।

রশেন হাসছেন। বলছেন—হবে না কেন? টু সনস্ অফ এ গ্রেট ফাদার।

সকলে হাসছেন। সে-হাসি আনন্দের নয়, বরং উল্লাসপ্রতিম, যে-উল্লাস মানুষ বোধ করত আদিম অবস্থায় ফলসাতে থাকা শুয়ের দেখে এই প্রত্যয়ে যে, কিছুক্ষণ পর তাজা সুগন্ধ পশুমাংসে ভোজন করবে। কিন্তু, আনিসুজ্জামান, বুঝি-বা এমন মানুষ, যাঁর মানুষতা এ কাল পেরিয়ে চলে গেছে কোনও এক অনির্বচনীয় সুন্দরের ভবিষ্যে যেখানে মানুষ পরস্পরের জন্য কাতর ও প্রেমী। তাই আনিসুজ্জামানের মনে পড়ছে দেবোপমের মুখ। ছেলেটি প্রায়ই আসে। বইপত্র নিয়ে যায়। গভীর, আত্মস্থ, কিন্তু বিষয়। কত কবিতা পড়ে। কত মনে রাখে। কিন্তু এখন কারও সে-কথা মনে আসছে না। সমরেন্দ্র হাসতে হাসতে বলছেন—একটু ভাল হল, রশেন, টু সনস্ অফ এ লেডি হ্যাভিং টু হাজব্যান্ডস্।

আনিসুজ্জামান অন্য কথা শুনতে চাইছেন। অন্য কথা বলতে চাইছেন। কী বলা যায়। বলা দরকার, খুব দরকার, কেউ আনিসুজ্জামানের ভেতরে বলে যাচ্ছে, এমন স্থানে যেয়ো না যেখানে থাকা তোমার নিজের কাছে অবমানকর। এমন কথা শুনো না যার ধনি তোমার অন্তর্গত শাস্তি ভেঙে দেয়। তুমি জানো, শাস্তি, বড় দুর্বল। অতি ক্ষণস্থায়ী। এবং বোলো না এমন কথা যা তোমাকে চিহ্নিত করে দেবে এক বিন্দুও অমানবিকতায়।

প্রণবেশ বললেন—কী করে জানলেন, অনুপমের বিয়ে?

ব্রজগোপাল হাসছেন। তাঁর চাক পড়া মাথার আলো চক চক করছে। বলছেন—আমাদের হিরণ। ওর কাছে সব ঘোড়ার মুখের খবর পাবে। সে-দিন এল। একেবারে মদ-উদ খেয়েছে। বলতে লাগল, পরেশ বোস ছেলের বিয়ে নিচ্ছে, বুঝলে। শালা, যা বাগিয়েছে না, একেবারে বানিয়ার মেয়ে ধরেছে। লোকটার কপাল বটে। সারা জীবন নিজের বউ ভাঙিয়ে খেয়েছে এবার ছেলের বউ ভাঙিয়ে খাবে। হ্যা হ্যা হ্যা।

—হ্যা হ্যা হ্যা। হ্যা হ্যা হ্যা।

হিরণের হাসি ব্রজগোপালে, ব্রজগোপালের হাসি আভার অন্যান্য কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। অনিসুজ্ঞামানের মাথায় এই রোগেও মধ্যাহ্নের খীয়া রোসদর বা খাঁ করছে। তিনি রক্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সমরেন্দ্র তাঁকে ঠেলছেন। চলল অধ্যাপক, তনমে। তাঁর কান বন্ধ। মুখ বন্ধ। কু-বাক্য শুনিয়ো না। কু-কথা বলিয়ো না। রোগও কি বন্ধ থাকার কথা নয়? হ্যাঁ। সে-ও তো হওয়ার কথা! কারণ কু-দৃশ্য না দেখিবার কথাও বলা আছে হিতোপদেশে। কিছু কান আর মুখ বন্ধ রেখে কু-বাক্য থেকে দূরে থাকা যদি সম্ভব, আর চেষ্টা খোলা রাখলে যদি কোনও মনোরম দৃশ্য দেখা সম্ভব তবে অনিসুজ্ঞামান তাই দেখছেন। প্রায় নিয়ে হেঁচকি যাচ্ছে হিরিচরণ। চমৎকার সাদা ধুতি আর শাট পরেছে। কোলে একটি শিশু। হাতে আর একটি। পাশে হিরিচরণের বউ। কমলা রঙের সামনে ফেরতা শাডি পরেছে। হাতের লাল কাঁচের চুড়ি। নাকে নাকছবি চিক চিক করছে। পায়ের গোছে মল বাজছে। কোমর থেকে আঁচল ঘুরিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনেছে সে। তারও কোলে শিশু। তারও হাতে শিশু। সবচেয়ে বড়টি, মা-বাবার হাত ধরে থাকা দু' ভাইয়ের মাঝখানে থেকে ধরে আছে তাদের অন্য দু'টি হাত। তাদের সকলের গায়ে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা চুড়িদার। সকলে পায়ে জুতো দিয়েছে আর তাদের কী চমৎকার স্বাস্থ্য। একটি সুখী ও স্বাস্থ্যবান পরিবার হাতে হাত রেখে চলেছে। আশ্চর্যত কিছু উদাসী নয়। সকলের চোখে-মুখে খুশি কলকাজে। এক জন বলছে জিলাবি-জিলাবি। অন্য জন বলল—বেলুন-বেলুন। দশমীর দিনে তারা বুঝি শোভাযাত্রা দেখতে বেরিয়েছে। এখানে দশেরা হয় না। হয়তো তাদের দেশ-গায়ে হয়ে থাকবে। এখানে তারা নিজের ইচ্ছায়, বাজলির মতো দশমীর শোভাযাত্রা দেখছে। আর এই বিজয়ার রাতে দুই ভাই অনুপম-দেবোপম কোথায়? কী করেছে? তারা বুঝি গান গাইছে। বুঝি কবিতা পড়ছে। বুঝি আলিঙ্গন করছে পরস্পরকে। আর তারা আলোচিত হচ্ছে। রাস্তায়-রাস্তায় ঘরে-ঘরে।

অনিসুজ্ঞামান বললেন—চলুন সবাই মিলে ভাস্করদার বাড়ি যাওয়া যাক।

অনেকে সায় দিলেন। হ্যাঁ। যাওয়া যাক। যাওয়া উচিত। আমরাও ভাবছিলাম। রাজকার চাপে মানুষটার খবর নেওয়া হয়নি কতদিন। চোখের সামনে তিনি কীরকম বদলে গেলেন। ক দিনেই কীরকম বেভুল হয়ে গেলেন। আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! হবে না-বা কেন! অত বড় শোক! সারা জীবন পাগল স্ত্রী নিয়ে কাটানো। চলো, চলো, যাওয়া যাক।

প্রণবেশ যেতে রাজি হলেন না। ব্রজগোপালকে দোকানের কাঁপ কেলতে হবে। তিনিও থেকে গেলেন। সমরেন্দ্র, রঞ্জন, বিকাশ আর অনিসুজ্ঞামান রওনা দিলেন। অনিসুজ্ঞামান, তিনিই এই যাবার প্রস্তাব দিয়েছেন অথচ তাঁরই যেতে ইচ্ছে করছে না এখন। বুঝি-বা তিনি কোনও অপমানে লিপ্ত হতে যাচ্ছেন। বুঝি-বা কোনও অগ্রিম দৃশ্য দেখে ফেলতে যাচ্ছেন যা-নিয়ে পরে আভা সরগরম হয়ে উঠতে পারে। এইসব আভা, যাতে মাঝে মাঝে চমৎকার আলোচনা হয় রাজনীতি বা সাহিত্য বিষয়ে, ধর্ম বা সংস্কৃতি বিষয়ে তখন এই মানুষগুলিকে ভাল লাগে। ভাবতে ভাল লাগে, এই, এ কিছু কারণ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে এসে পড়লে আর সংস্কৃতি থাকে না। সাহিত্য ভেসে যায়। শিক্ষা ও রুচিবোধ দাঁতকপাটি দিয়ে ভিরমি খায়। সব চলে যায়। সব ভেসে যায়। শিক্ষিত, ভদ্র, মার্জিত মানুষগুলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে জাস্তব মুখ। জাস্তব নখ-দাঁত। যাকে যা মানায়। ওই মুখ, ওই নখ, ওই দাঁত ও গর্জন মানুষকে মানায় না মোটে। অনিসুজ্ঞামানের মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি জানেন, কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই। কলেজে সুন্দরী ছাত্রীকে নিয়ে রসালো মন্তব্য করলেন অধ্যাপকরা। কোনও কোনও ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হল আর তারা হাত ধরাধরি করে চলে গেল বিলের ধারে আর হাসি হয়ে গেল ঘনিষ্ঠতম ভঙ্গিতে—এ নিয়ে অধ্যাপক-কক্ষে আলোচনা চলল। অনিসুজ্ঞামানের দিকে প্রশ্ন ছোঁড়া হল—যেহেতু তিনি অবিরাহিত—যেহেতু ছাত্রছাত্রী কয়েকজন তাঁর সম্পর্কে জটিল কিছু মন্তব্য হেনেছে—কি? রাতে খুম হয় এ সব দেখে গেলে?

জানেন, সব জানেন আনিসুজ্ঞামান। তবু মন খারাপ হয়। এখনও হচ্ছে। এই ক'মাসে মল্লিনাথের বাড়ির শ্রী একেবারে চলে গেছে। বাগানের যত নুহি। দেওরানো-শ্যাওলা ধবেছে। কুলটা জীর্ণ। মাঝে মাঝে মল্লিনাথ নিজের খরচে কুলচাটতি দাখাতেন। সেই কতকাল আগে উদ্যোগ করে বসানো হয়েছিল এই কুল। এখন সব ময়লা। সব অক্ষয়। নুহি-বা বাড়িও যোঝে তার অবস্থিতির অর্থহীনতা। এবং দুঃখ পায় আর কাঁদে। ক্রমশঃ সারাজীবন হতে থাকে ক্রেশপ্রাপ্ত মানুষের মতো।

বিকাশ বহুক্ষণ চুপ করে আছেন। আনিসুজ্ঞামান বললেন—বী হয়েছে, বিকাশলা।

বিকাশ বললেন—মল্লিনাথকে এভাবে কোনওদিন দেখতে হবে ভাবতেও পারিনি।

আনিসুজ্ঞামানের নিজের অজান্তেই জ্ঞ-কুণ্ঠিত হল। ঐশ্বর্যমিত্রিত বহুবর্ণ মুখে খেলা কবল অদ্ভুত অলোছায়া। তিনি নিজের ঠোঁটের মধ্যে শব্দ ধরে বেগে উচ্চারণ করলেন—কে আসে কাকে কখন কীরকম অবস্থায় দেখতে হবে? মানুষ নিজে যেমন জানে না সে কখন কী করে বসে, তেমনই জীবন যে তাকে কোথায় টেনে নেয় আর আছড়ে খেতলে গুঁড়িয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় কোথায় তাই-বা কে বলতে পারে।

বেল দেওয়া হয়েছিল। দরজা খোলার শব্দ হল। সকলেই নীরব। উদ্বিগ্ন। শেষ কে কবে মল্লিনাথকে দেখেছেন তাই মনে করার চেষ্টা করছেন প্রত্যেকে। পাজা দুটি ফাঁক হল। দরজায় দীর্ঘদেহী মল্লিনাথ। কিন্তু মল্লিনাথ নয় বলে ভ্রম হয়। চুল বড় হয়ে কাঁধ ঝুয়েছে। কাঁচা-পাকা দাড়ি অযত্নে কুলছে গাল ছাড়িয়ে, চিবুক ছাড়িয়ে গলার কাছ বরাবর। পেশি শিথিল হয়েছে। মুখ জুড়ে অজস্র জরাচিহ্ন। সকলে নীরব হয়ে দেখছেন। আর এই নীরব মুহূর্ত ভাঙা দরকার। সমারোহ বললেন—আমরা সব এলাম মল্লিনা। আপনি আজ ব্রজদার দোকানে গেলেন না। আজ বিজয়া দশমী।

শুধু একটি মাত্র শব্দ বেরুলো মল্লিনাথের মুখ দিয়ে—ওঃ। সরে দাঁড়ালেন দরজা থেকে। ঘরে কোনও আবর্জনা নেই, যেমন থাকার সজ্জাবনা আছে বাইরের। দেখলে মনে হয়। কালীতার। সোজা আসে। ঘরদোর গুছিয়ে যায়। আগে রান্নাও করত। এখন মল্লিনাথ স্বপাক খাচ্ছেন।

বিকাশ এগিয়ে গেলেন মল্লিনাথের দিকে। বললেন—মল্লিনা, আসুন। কোলাকুলি সারি।

না। না। না। মল্লিনাথ পিছিয়ে যাচ্ছেন। জ্ঞ কোঁচকানো।

বলছেন—ছুঁয়ো না। ছুঁয়ে দিয়ো না আমাকে। আমার পূজা আছে। আমাকে সংযত থাকতে হবে। সন্ত থাকতে হবে। ছুঁতে পারব না। কারওকে ছুঁতে পারব না আমি।

সকলে মাথা হেঁট করছেন। কষ্ট পাচ্ছেন। মল্লিনা—এ সব কী বলছেন তিনি!

ততো মামের শরণং দেহবন্ধ-বিমুক্তয়ে।

যাহি সংযতচেতাস্থং মামেধাসি ন সংশয়ঃ ॥

—দেহবন্ধ বিমুক্তির নিমিত্ত সংযতচিত্ত হয়ে আমাকে শরণ করো। তুমি আমাকে লাভ করবে।

কেউ কোনও কথা বলছেন না। বোঝা এবং না-বোঝার মধ্যবর্তী অবস্থানে নীরবতাই স্রেয়। মল্লিনাথ কি তবে সত্যিই আর প্রকৃতিস্থ নেই? নাকি তাঁর কোনও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়েছে। আর আনিসুজ্ঞামানের মাথায় বিম বিম তর্জমা বাজছে। তাঁকে দেখতে হবে। বুঝতে হবে। মল্লিনাথ প্রকৃতিস্থ নেই। তা ছাড়া মহাভাগবতের যেটুকু শ্লোক মল্লিনাথ পাতছেন তা সম্পূর্ণ ছিল না। শ্রীপার্বতী-হিমালয়-সংবাদে মূল জায়গায় মল্লিনাথ বলেননি। হয়তো বলতেও চাননি। আনিসুজ্ঞামান অনুভব করেন, মল্লিনাথ এখন সেই পর্যায়ে আছেন যেখান থেকে মানুষ শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে এবং ধর্মকে ক্লেচ্ছাচারের কাজে লাগায়। তাঁর মধ্যে এই বোধ জন্মায় যে এখনই সেই প্রধান অংশটি বলা দরকার। মল্লিনাথের দিকে তাকিয়ে, ধীরে ধীরে, সেই শ্লোক তিনি কলতে লাগলেন। অন্যরা নিষ্ক্রিয় কুশীলবের মতো স্তব্ধ থাকলেন আনিসুজ্ঞামানের স্বর—



যেহপাগাদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধাযুক্তিভাঃ।

তেহপি মামেব রাজেন্দ্র যজন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

অহং সর্বমহী যন্ত্রাং সর্বযজ্ঞফলপ্রদা।

কিন্তু তাত্বেব যে ভক্ত-স্তোত্র মুক্তিঃ সুদূরভা ॥

মল্লিনাথ আনিসুজ্ঞামানের পায়ের কাছে বসলেন। নুরুত্ব রইল, যেন ছোঁয়া না লাগে। বললেন—এর মানে কী?

আনিসুজ্ঞামান বললেন—ভাতেরদা, উঠে বসুন। ওখানে বসবেন না।

মল্লিনাথ বললেন—বলো। মানে বলো। এটা তো তিনি আমাকে বলেননি।

আনিসুজ্ঞামান বলেন—শ্রদ্ধার সঙ্গে যারা অন্য দেবতাকে ভক্তনা করে, তারাও আমাকেই ভক্তনা করে কারণ আমিই সর্বমহী, আমিই সর্বযজ্ঞ-ফলপ্রদা। এ জগতে আমার থেকে স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নেই। সকল দেবতা আমারই বিভূতি। সে, যে-যজ্ঞই করুক, সে-যজ্ঞের আরাধ্য হিসেবে আমিই তার ফল বিধান করি। কিন্তু যারা নিজের দেবতাকেই একমাত্র বলে জানে, অন্য দেবতাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করে উদাসীন হয়, বিরক্ত হয় বা অভক্ত থাকে, তাদের মুক্তি দুর্লভ।

মল্লিনাথ আরও একটু এগিয়ে এসে বলেন—তুমি জানো? সব জানো? অধ্যাপক?

তাঁর ব্যক্তিত্ব উধাও হয়। জেদি, অবুঝ কিন্তু কৌতূহলী ও সুমন বালকের মতো লাগে তাঁর ভঙ্গি।

আনিসুজ্ঞামান বলেন—এটা জানি কারণ এ সব নিয়েই আমাকে পড়াশুনো করতে হচ্ছে। কিন্তু আমি এ সব কিছুই মানি না। দেব-দেবী পূজা-পার্বণ নমাজ-কলমা প্রার্থনা—গির্জায়ের পাপকবুল—এ সবের কোনও অর্থ নেই আমার কাছে। আমি এ সব নিয়ে গবেষণা করছি মাত্র। ভাতেরদা, যে-ক্লোক আপনি বললেন, আমি তার আয়েরটুকুই বললাম। আপনি জানান না?

মল্লিনাথ অসহায়ভাবে মাথা নাড়েন। বলেন—না। জানি না। আমি তো পড়িনি কখনও। তিনি বলতেন। আমি শুনতাম। আমার মনে ছিল। আবার মনে যে ছিল তাও জানতাম না। এখন তিনি ঘুমের মধ্যে এলেন আর আমাকে সব বলতে লাগলেন। শাসন করলেন আমাকে। ভয় দেখালেন। ঠিকমতো পূজা না করলে সব কেড়ে নেব। বুঝলে, বুঝলে তোমরা, আমাকে পূজা চলিয়ে যেতে হবে। একনিষ্ঠভাবে। শুদ্ধভাবে। আমি কী বোকা, আঁ কী বোকা। বুদ্ধিনি: কিন্তু বুদ্ধিনি তিনি কী চান! কী বোকা, আঁ, কী বোকা আমি—

মল্লিনাথ নিজের দু' গালে চড় মারতে থাকেন। তাঁর মাথা ঝাঁকিয়ে যায়। তাঁকে পাগল-সদৃশ লাগে। অনর্গল বলে যান—বোকা বোকা বোকা। হঠাৎ কঁদেন। মাটিতে উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কঁদেন শোকাবুল বৈধব্যের মতো। তাঁর খেয়াল থাকে না যে ওই মেয়ে পা রেখেছিলেন আনিসুজ্ঞামান আর তাঁর পায়ের গুলো এখানে জমা ছিল।

অনেকক্ষণ পর মল্লিনাথের কান্না থামে। রণেনের চোখে জল এসে গেছে। হাতের উপ্টো পিঠ দিয়ে তিনি জল মোছেন। রাস্তা দিয়ে বিসর্জনের বাজনা চলে যায়। কারা বুদ্ধি ভাসান দিয়ে ফিরল। ছোট কোনও পূজা। বড় পূজার দল হলে অনেক বেশি কলরব হত। অনেক চিংকার!

মল্লিনাথ আন্তে আন্তে উঠে বসেন। বলেন—তোমরা যাও ভাই। আমাকে পূজায় বসতে হবে। আমার ছেলে চিঠি লিখেছে, তারা সব ভাগ আছে। তার মা ভাল আছেন। ওখানে গিয়ে তাঁর আর পাগলামি নেই। কমলেশ্বর মাকে আর এখানে ফিরতে দেবে না। না ফেরাক। আমি তো কারওকে ছাড়তে পারব না। পূজা আমাকে করতেই হবে। উপায় নেই। কোনও উপায় নেই।

একে একে উঠে পড়েন সকলেই। সকলের মন ভাঁর হয়ে যায়। মাধুরের গড়ে মল্লিনাথ ভাতের বিশাল পুরুষ হয়ে ছিলেন। ভাল চিকিৎসক বলেই শুশু নন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, ঔদার্য, বিপদে পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস, তাঁর বহুত্ব, তাঁকে নির্ভরযোগ্য বুকের মতো করে তুলেছিল।



এই বৃক্ষ এখন অতীত হতে থাকছেন। তাঁর পাতা খসে পড়ছে। ডাল-পালা ভেঙে পড়ছে। ভারী কাণ্ড মাটি থেকে কবে উপড়ে নেবে ঝড়ো সময়। এ সবই ভাবতে ভাবতে পথ চলেন সকলে। ভাবতে ইচ্ছে করে, এই মহাবৃক্ষের পতনের পর, কে আছেন মাথুরের গড়ের সম্ভাব্য মহীক্ষহ? যেমন ঈশ্বরের পর গুরু, যেমন রাজার পর রাজতনয়, যেমন নেতার পর দলপতির পর সমস্ত সম্ভাব্য নেতৃত্ব, তেমনই কোনও লোকালয়ে থাকেন এমন মানুষ, যেমন মল্লিনাথ, তাঁর পতন হলে, অনুপস্থিতি ঘটলে, আরও এক সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছে হয়। তাঁরা এমনই কোনও ভবিষ্যৎ মুখ ভাবতে চেষ্টা করেন। এবং ভাবতে ভাবতে ভুলে যান। চলতে চলতে এক কথা থেকে অন্য কথা পাড়েন। মল্লিনাথ তাঁর নিজেরই নিজস্ব মস্তিষ্ক এবং দুঃস্বপ্নের সায়বাবস্থার মতো স্মরণ হারিয়ে ক্রমশ আর স্মর্তব্য থাকেন না।



এমনি করেই আশ্চর্য রাত্রি আসছে রাধিকার। সমস্ত দিন কথা হয় না। চোখে চোখেও না। দেখা হলেই মুখ নিচু করে পালিয়ে যায় সে। কেন? একজন মানুষ অন্য এক মানুষকে চায়। এর চেয়ে নিষ্পাপ ও সরল আর কী হতে পারে যদি সেই চাওয়ায় কোনও দায়বদ্ধতা না থাকে? শর্ত না থাকে? যেমন একটি নক্ষত্রের গায়ে খসে পড়ে অন্য এক তারা আর প্রজ্জ্বলন হয়—যেমন একটি ফুল অন্য ফুলের গায়ে মুখ রাখে আর পুকে কাঁপে—তেমনই নারী ও পুরুষ। যদি দায়হীন হয় তারা পরস্পর, যদি শর্তহীন হয়। যদি শুধু কাছে আসাটুকুই সব চাওয়া জুড়ে থাকে! তা হলে ভয় কেন আর? দ্বিধা কেন?

কত দিন চলে গেল। সেই এক হঠাৎ আসা আশ্চর্য সন্ধ্যা, আগুন জ্বলল রাধিকার। আগুন এমন স্বাদের হয়, এমন অপূর্ব অনুভব দিতে পারে—জানল রাধিকা। আর একবার চায় সে; একটিবার চায়। সে তাকিয়ে থাকে। চেয়ে থাকে। বেহায়া মেয়ে। সে তার বালককে ভাত বেড়ে দেয় আর দিতে দিতে বালক ভুলে পুরুষকে কামনা করে। সে শিশুকে স্তন দিতে থাকে আর আশ্চর্য অনন্য অনুভবে ডুবতে ডুবতে মরে যায়। বারবার মরে। বারবার বাঁচে। শিশুটি যখন অস্তহীন পানই করতে থাকে, যখন নরম ঠোঁট—কোমল ও দৃঢ় মুখগহ্বর দিয়ে শুয়ে নিতে থাকে রাধিকাকে, রাধিকা তখন চোখ বন্ধ করে আরও গভীর শোষণ, আরও কঠিন চাপ প্রার্থনা করে। এতদিন সে পায়নি এমন স্বর্গীয় আনন্দ। যদি না পেত কোনওদিন, সে একরকম ছিল। এখন সে যেন এক অন্য রাধিকা। যেন পাগলিনী সে। যেন বাঁশি শোনে কার আর অসামান্য পুরুষ পায়। এখন আশ্চর্যের সন্ধান সে পেয়ে গিয়েছে, আরও একটু পাবার জন্য, সম্পূর্ণ হবার জন্য সমস্ত অস্তিত্ব তেঁষ্টায় কাতর হয়ে আছে।

কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।

কতদিনে ঘুচব গুরুআ দুখভার ॥

কতদিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।

কতদিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি ॥

কতদিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।

কবছঁ পয়োধরে দেওব হাত ॥

কিন্তু সে তো চোখ তোলে না। কথা বলে না আর। কেউ জানে না কী হয়েছে সেদিন। কেউ টের পায়নি। রাধিকা নিজের বুকের তলায় মন্দির করে রেখে দিয়েছে সব। সমস্ত দিন তার

কানে সাইকেলের ঘণ্টি বাজে। আর সমস্ত রাত আশ্চর্য স্পর্শেরা শরীরময় ঘুরে বেড়ায়। আশ্রয়-  
 আশ্রয় লাগে। রাধিকা পাগলির মতো টান মেখে আঁচল নামিয়ে দেয়। দু'খানি হাত সামনে মেলে  
 ধরে। দু'খানি হাত পাতার মতো হয়। আস্তে আস্তে নামিয়ে আনে নরম গভীর উদ্ভাসে। চাপ  
 দেয়। শরীর জুড়ে আবেশ, কত আবেশ, সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। হাত দু'টিতে পুরুষ জেগে  
 ওঠে। সমস্ত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা নামে, নেমে যায়। ক্রমশ নান্দ, ক্রমশ উরু, ক্রমশ  
 বোনি প্রত্যঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। রাধিকা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। নিজের শরীরে গুরুত্বাক্রান্তি নিয়ে  
 খেলে। ঘুমকে জাগিয়ে দেয়, জাগরণীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। হঠাৎ চানপাশে কন বোঝা আসে।  
 যেন, বর্ষার পূর্ণপারা প্রসবিতা গাঢ় মেঘ। মেঘ ছিঁড়ে চাঁদ আসছে নাকি। চাঁদের হাসেই মুখ হের  
 ভর্তি মুখ, কোমল কোমল দাড়ি ভর্তি মুখ—রাধিকাকে নিয়ে অস্তির অস্তির খেল, একটুও  
 বিশ্রাম দেয় না, একটুও দম ফেলবার অবকাশ নেই, রাধিকা কতবার, কতবার মরতে মরতে  
 বাঁচে, বাঁচতে বাঁচতে পরিপূর্ণ হয় এবং আবার মরে যায়। কে তার স্তন মুঠোর টানছে। কে তার  
 পেটের ওপর উঠিয়ে দিচ্ছে পা। রাধিকা, জানে না কিছু, জানতে চায় না। সে তার স্তনের মধ্যে,  
 নান্দির মধ্যে, যোনির গভীরে নিজেকে আরোপ করতে চায় এবং কাঁদে। কাঁদে কারণ রাতের  
 শেষে নিজেকে তার ছিন্নভিন্ন লাগে, পূর্বাপর ব্যর্থ মনে হয়। বখন সে চেতনাতলে আসে আর  
 বুজে পায় না কারণকে, তখন গভীর অভিমানভরে ভাবে। চলে গেল সে, বলে গেল না কেন?  
 একটুখানি জড়িয়ে নিতাম যাবার আগে। একটুখানি মুখ ঘষতাম। কোথায় কোথায় কোথায়?  
 বুকে। ওর বুকে। যেখানে মুখ রাখলে দমবন্ধ হয়ে যায়। সব আলো নিভে যায়। প্রত্যাশিত  
 অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে পৃথিবী আর শান্তি নামে, ক্রমশ শান্তি নামে। আর কোলাহল থাকে  
 না। তখন চেতনা এসে গলা জাপ্টে ধরে। রাধিকা বিপর্যস্ত হয়। কে ছোঁয় কাকে? কার জন্য  
 জাগিস? সমস্ত দিন যে-মুখ সে প্রত্যাশা করে রাতে তাকে দেখতে পায় না কেন? যে-মুখ ফেলে  
 এসেছে কত বছর আগে কত দূরে শিবমন্দিরে আশ্চর্য বর্ষণে, তার সঙ্গে দেখা হবে না আর, তবু  
 তাকেই কেন জড়িয়ে থাকে রাতে? দিশেহারা লাগে তার। কী করে সে, কোথায় যায়, কোথায়  
 পায়, একটা সম্পূর্ণ লোক। এরকম খণ্ড খণ্ড গ্রহণ আর ভাল লাগে না। আর পারছে না সে। এ  
 মুখ থাকে, ও মুখ দেখে, সে মুখ চায়। কার্তিকের বউ, কার্তিকের দুটি সন্তানের স্নেহসিক্ত  
 জননী, কে একজন ছুঁয়ে ফেলল তাকে, কে একজন স্বপ্নে দেখা দিল। পায় না? সম্পূর্ণ পায় না?  
 এই জীবনেই একটি পোটা পুরুষ?

এখন তখন করি দিবস গোঁয়ায়লুঁ

দিবস দিবস করি মাস।।

মাস মাস করি বরস গোঁয়ায়লুঁ

ছোড়লুঁ জীবনক আসা ॥

এমনই এক বিস্ত্রস্ত সন্ধ্যায় কার্তিক এল একদিন। বলল, কাল চলে যাব। পরশু আসব। সব  
 শুধিয়ে বেঁধে-ছেঁদে তৈরি থাকবে। নিয়ে যাব।

কালই শেষ? কালই? রাধিকা ভাবে। সেই কাল তবে এল। ছিঁড়ে ফেলবার কাল। উপড়ে  
 নেবার কাল। ক্রমশ দূরে দূরে ছুঁড়ে ফেলবার কাল, এল, তবে এল। সে বিবশ হয়ে থাকে।  
 কার্তিক শুয়েছে আজ পাশে। সে সন্তুষ্ট। আজ আর স্বপ্ন আসবে না। আজ আর নিজের সঙ্গে  
 নিজের খেলা বন্ধ থাকবে। আজ সব মেঘ দুয়ার দেবে ঘরে আর চাঁদ গিয়ে শুয়ে থাকবে কার  
 চাতালে, ফুটপাথে, জলের তলায়। রাধিকা তখন মীরবে সেই অনিবার্য কালের জন্য জাগে।  
 শিশুটি কাঁদে। তার গায়ের ওপর বালক পলাশ হাত ছড়িয়ে ছুঁয়ে রেখেছে মাকে। তার জায়গায়  
 বাবা শুয়েছে। সে চলে গেছে দূরে। আর ছুঁতে চাইছে। শিশুটি কাঁদছে। পলাশের ভারে  
 জ্যোৎস্না কাঁদছে। কার্তিক ধমকাচ্ছে, "মাই দিল্ল না কেন?"

রাধিকা উঠে বসছে। ছেলে কোলে নিয়ে গোল দিচ্ছে। কাশা খামছে না। সে এখন ব্লাউজের

ছক বুলছে। ছক ছিড়ে পড়ে গিয়েছে কবে। বরং ব্লাউজের ব্রোঁস সেফটিপিনে আঁটা। সে সেফটিপিন সাবধানে বিধিয়ে রাখাছে। যেন ক্ষত না দেখে সন্তানকে। বাম ঠুনকুজে দিচ্ছে শিশুর ঠোঁটে। শিশু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পান করছে। চোখ বন্ধ করে পান করছে। তখন কার্টিক সর্পিলা হয়ে উঠছে। লকলকে জিত বাড়িয়ে দিচ্ছে দক্ষিণের হ্রদে। একটি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে বড়ীরে। রাধিকার যেন্দা করছে। উঃ মাগো, কী এল পাগো, কী লাগছে। কোনো নাকি ভোলক, নাকি পুঁয়োপোকা, টিকটিকি। সে খেতে ফেলতে চাইছে, সহজ ন্যা। সহজ ন্যা ফেলা। দাবির সঙ্গে শরীর টানছে কার্টিক। অনেক দিন পর অন্য রকম স্বাদ। তার চাই। সে নেয়ে রাধিকা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে কার্টিককে। কার্টিক ভাবতে পারছে না, বুঝতে পারছে না এ প্রত্যাখ্যান। প্রতিবোধ তৈরি হয়েছে রাধিকার মধ্যে? না বলার ক্ষমতা এসেছে? করে এল। কেমন করে সম্ভব হল। রাধিকা শাস্তভাবে ঘুমন্ত ছেলেকে শুইয়ে দিচ্ছে কাঁধায়। কার্টিক ভাবছে, ও এইজনাই, এইজনাই সরিয়ে দিল হাত। সে অপেক্ষা করছে। ছেলে শোয়ানো হলেই আবার টানবে। আবার ঘটিবে। রাধিকা বলছে—বরদার। আঙুলেরে ধরবা না আমারে।

কার্টিক লাফিয়ে উঠছে। কী বললি? কী? শালী? হারামজাদি। খুব তেজ বেড়েছে কেমন? আমার খাবি, আমার পরবি, আমাকেই কল্য বেচবি?

রাধিকা লড়াই করছে। আপ্রাণ লড়াই করছে। আঁচড়ে দিচ্ছে, কামড়ে দিচ্ছে কার্টিককে। কার্টিক চড় মারছে। শাড়ি টানছে রাধিকার। রাধিকা আর পারছে না। পালাতে চাইছে। পালাচ্ছে। কোথায় পালাবে? ছোট্ট এই ঘর। এই ছোট্ট পৃথিবী। এই ছোট্ট সমাজ। স্বামীর থাবার তলায় চেপে রেখেছে তাকে। কোথায় পালাবে? সে আছড়ে পড়ল দেওয়ালে আর ঠোঁট কেটে গেল। আর আলোর আলো হয়ে উঠল ঘর। হাত লেগে গেছে সুইচে। আর আলো জ্বলল গেছে। কার্টিক বিমূঢ় হয়ে গেছে। হঠাৎ আলো সইতে পারছে না। দু' হাতে চোখ আড়াল দিচ্ছে। তার উর্দ্বাসে হলদে গেঞ্জি। নিঃশ্বাস থেকে লুঙ্গি বসে গেছে। রাধিকা ডাকছে, পালল হয়ে ডাকছে—উঁ, পলাশ, উঁ, বাবা, সোনা, উঁ।

পলাশ উঠে বসেছে। চোখে ধূম। তবু—তবু—বাবা এসেছে আজ। সে উঠে বসেছে—কী হইছে মা? কী?

—উঁ বাবা। তর বাবায় আমারে মারে। আমারে কিলায়। রাধিকা বিছানার কাছে বসে পলাশের কোলে মাথা গুঁজে দিচ্ছে। পালাচ্ছে সে। এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষ পালাচ্ছে। বালক পলাশ পুরুষ হয়ে যাচ্ছে। দেখছে বাবাকে। কার্টিক লুঙ্গি পরছে। কীরকম নির্বোধ লাগছে তাকে। কীরকম অশক্ত লাগছে। যেন ধাক্কা দিলে পড়ে যাবে। পলাশ ভাবছে—এই লোকটাকে ভয় পায় মা? এই লোকটাকে? তার ভয় করছে না। কিন্তু সে স্তব্ধ হয়ে আছে। তার ভেতর থেকে কী যেন চলে যাচ্ছে আর কী যেন জায়গা নিয়ে নিল। হ্যাঁ, হতে পারে, কার্টিকের প্রতি ভয় চলে যাচ্ছে, নির্ভরতা চলে যাচ্ছে, ভালবাসা যতটুকু ছিল তাও—কিন্তু তার বদলে কী এল? এ সবের জায়গা নেয় কী? রাগ? ঘৃণা? প্রতিহিংসা? আলো নিবিয় শুয়ে পড়ছে কার্টিক। শোবার আগে দেখে নিচ্ছে রাধিকাকে। মাথা জ্বলছে তার। রাগে। অপমানে। প্রত্যাখ্যানে। ছেলে জেগে গেছে। এই জাগরণ তাকে আরও ফ্রোদী, নিষ্ঠুর ও দাবিদার হওয়া থেকে অক্ষম করেছে। পলাশ ঘুমন্ত গলায় বলছে—মাটিতে শুইবা মা? মাটিতে? পাটিখান পাইত্যা দেই?

রাধিকা উঠে বসেছে। কী হচ্ছিল এতক্ষণ? বাজে-কবুতরে লড়াই? বাঘে-হরিণে লড়াই? সে আঁচল সামলাচ্ছে। সারা শরীর কাঁপছে তার। কতক্ষণ যুদ্ধ করেছে সে? বলছে—হ। পাটিখান পাট পলাশ। শুই।

পলাশ পাটি পাতেছে। হাত দিয়ে মুড়ে মুড়ে সোজা করছে গুটিয়ে যাওয়া প্রান্ত। রাধিকা খোঁপা আঁটিছে। জানলা দিয়ে রাত্রির নিজস্ব আলো ঢুকে পড়ছে ঘরে। রাধিকার মনে পড়ছে, এই সেই আলো, যা বাবা সেখতে পেত, দেখতে চাইত রাধিকাকে, সে বোঝেনি তখন, আজ বুঝতে

পারছে, কত কিছুই যে বোঝা হয় না আগে আর শেষ পর্যন্ত যখন উপলব্ধি হয় কত কিছুই হারিয়ে যায়।

পলাশ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে—আমি তোমার লগে শুই মা?

ছেলের মাথা হাত রাখছে রাধিকা। বলছে—শৌণ্ড।

বাড়তি বালিশ নেই। নিজের বালিশ দিয়ে, পলাশের বালিশ দিয়ে জোড়নের পাশে বালিশ দিয়ে রাধিকা। পড়ে না যায়। ভাবছে। বলছে—যাবি আমার লগে?

—কই যাইবা?

—কলে যামু।

কলঘরের দিকে যাচ্ছে রাধিকা। একবারও পরামেশ্বর কথা মনে পড়ছে না তার, আজ শুধু খিলপাটনি গাঁয়ে ফেলে আসা মুখ উকি দিচ্ছে। বাড়বার উকি দিচ্ছে। সে মুখে-চোখে জলের কাপটা দিচ্ছে। চোখ ফেটে জল আসছে। সে আঁচলে চোখ মুছে। মুখ মুছে। পলাশ প্যাণ্টের বোতাম বুনে হিসি করছে আর বলছে—কান্দো ক্যান মা?

রাধিকা চমকে উঠল। ও কী করে জানল? কেমন করে জানল? সন্তানকে জন্ম দেয় মা। সন্তানও কি জন্ম দেয় মাকে? রাধিকা হাসার চেষ্টা করছে। ছেলেকে জড়িয়ে ফিরে যাচ্ছে ঘরে। আজ আর ঘুম হবে না। পলাশ মাঝের বাহুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ছে। একটি পা তুলে দিয়েছে পেটে। রাধিকা বাইরে চেয়ে আছে। জন্মালা দিয়ে একটুখানি আকাশ। একটি দুর্গি তারা। সে ভাবছে, সত্যি তা হলে প্রতিরোধ করতে পারল সে? সত্যি পারল? কতদিন ইচ্ছে করেছে তার, পারেনি। ছেলেকে জড়িয়ে বরল সে। ছেলের পিঠে মুখ গুঁজে দিল। ভীষণ কান্না পেল এবার। মনে মনে বলতে লাগল সে—আমাকে বাঁচাবি না পলাশ? বাবা? বাঁচাবি না আমাকে? তার মনে রইল না, পলাশ এখনও এক বালকই বটে।

সকালে খুব গভীর থাকল কার্তিক। চারটে রুটি আর বেজনাডাড়া খেয়ে হৃদয়পুর কেরার ভাড়া করল। যাবার আগে আবার বলল—সব গুছিয়ে রাখবে, কাল বেলাবেলি এসে নিয়ে যাব। একবার শেফালির মা'র কাছে গেল সে। রাধিকাকে নিয়ে যাবে সে সংবাদ দিল।

বলবে না বলবে না করেও বলে ফেলল শেফালির মা—আরে নাকি ফটিক বিলের বস্তিতে লইয়া যাইবা?

কার্তিক মাথা চুলকোচ্ছে। পরাক্রম খসে যাচ্ছে মুখ থেকে। এদিকে ওদিকে চোখ ঠারছে। বলল—আয় কমে গেছে মাসি। আর চালাতে পারি না।

—চালাইতে পারো না? দুইখান পোলা লইয়া মাইয়াডা এইখানে আঁকড়া-আঁকড়ি করে। হেইখানে তুমি আলাদা বাসা লইসো। আর একখান সংসার করসো শুনি। হেইতা কি একখান ধর্মের কাম হইল? মাইয়াডারে ভাসাইয়া দিলা?

—কে বলে? কে বলেছে এ সব? রাধিকা?

—হ্যায় কইব কান? শুনাছি। হ্যায় জানাব ক্যাননে? এক পাও বাইরে রাখে?

—মিথো কথা। সব মিথো কথা। হৃদয়পুরে এক বড়ুর বাড়িতে আছি। একটু মাথা গুঁজে থাকা।

—হেইখানে লইয়া যাও মাইয়াডারে। বস্তিতে রাখতেয়াসো কান?

দু'বার কাশে কার্তিক। শেফালির মা তার কাশির মতো ঝড়বস্ত্র বুঁজে পায়, যেন-বা সে ওই কাশির সময়টুকুতে কোনও পরিকল্পনা ফেঁদে নিচ্ছে। কার্তিক বলে—সে মেয়েমানুষের থাকার মতো নয়। আর বড় ঘর নিলে যা লাগবে তা আমি দিতে পারব না। চারটে মানুষের বহি মেটানো আপনি আর কী বুঝবেন মাসিমা? আপনার তো চার ইঞ্জিন চলে। লোকে বলল, বামফ্রন্ট এলেই বাজার নামতে শুরু করবে। কোথায় কী!

শেফালির মা আর কথা বাড়ায় না। দূরত্বের কত হল! বিয়ে না করলেও কার্তিক যে আর একটা মেয়েছেলে নিয়ে থাকে তা সবাই জানে। রোগে ও খেদায় গা শুলিয়ে ওঠে শেফালির মা'র। কোনও কোনও পুরুষ মানুষের কিছুতেই খিঁচি মেটে না। এমন জগত মহিলা কালহিয়া আধবুড়িরে লইয়া থাকতেয়াসে। কয় না—পুরুষের ভালবাসা মুসলমানের মুরগি পোষা...ভাবতে ভাবতে এক বলক সন্নিহান হয়ে পড়ে শেফালির মা। এ ব্যাটা সব পুরুষে যায় কি? যায় না। যেমন পোষা মুরগি জবাই করতে দুঃখ পায় অনেক মুসলমান। আসলে হইল কপাল। ভাইগা। যার যেমন ভাইগা। মহিয়ামহিনযের কও আর মুরগির। রাধিকার কপালে কী আছে কে জানে। পোড়া কপালে মেয়ে। একটু সুখের মুখ দেখা না কোকিলিন। শেফালির মা উনুনে হাঁড়ি চাপাতে চাপাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সেই শ্বাসে অতি উসকে যায়। হাঁড়িতে ডাক ফুটছে টগবগ-বগবগ, হাঁড়ির মুখে ঢাকনাটা নাচছে। সংঘর্ষে শব্দ তুলছে টাং টাং টাং। শেফালির মা চুকে যাচ্ছে হাঁড়ির মধ্যে। ফুটছে, ফুটছে, ফুটছে। অক্ষম রোগে নিরুপায়ভাবে আঁচে আঁচে সেদ্ধ হচ্ছে সে। আর দেখতে পাচ্ছে এইরকম হাঁড়িতে পাশাপাশি উনুনে সেদ্ধ হচ্ছে রাধিকা নিজে। এবারে শেফালির মা'র চোখে জল এসে যাচ্ছে। মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রতি গাড় অভিমানে বুক ভেঙে যাচ্ছে। এত ডাকলাম তোমাকে, এত পূজা করলাম, এ কী হল! আমি পাপ বুঝি না। প্রায়শ্চিত্ত বুঝি না। এইটুকু মেয়ের আর পাপ কী? প্রায়শ্চিত্ত কী? আমি বুঝি কপাল। বিধির লিখন স্বতঃনো যায় না। যায়ই না বসি, তবে আর তোমাকে ডাকব কেন মা, পূজা করব কেন? যা হবে তা এমনি হবে। যা যাবার তা ওমনি যাবে। আমি কী পাপ করেছিলাম যে আমার শেফালি চলে গেল।

রাধিকা সকাল থেকে একবারও আসেনি। শেফালির মা তার স্বভাব জানে। খুব কষ্ট পেলে, খুব রাগ হলে, রাধিকা নিজেকে বদ্ধ করে ফেলে। পালিয়ে যেতে চায়। শ্যাফালি, শ্যাফালি—অ্যাক্টরে শ্যাফালির লাফান। সেই যে অভিমান করে সে চলে গিয়েছিল জামকলতলায় আর সাক্ষসদ্বায় কেমন হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রবল অসুখ করল তার। কত কী হতে পারত সে-দিন। শেফালিকে সাপে কাটিতে পারত। সে পুকুরে পড়ে ডুবে যেতে পারত, সুশীলার পেট্রি খাড়াটা মটকে দিতে পারত। কোনও কোনও সময় মনে হয় দিলেই বোধহয় ভাল হত। অন্তত জানা যেত কী গতি হল মেয়েটার। শেফালির মার এক-এক বারে ইচ্ছে করে কলকাতা শহরের ওই আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোর ওপর দাঁড়ায় আর চিংকার করে ডাকে—“শ্যাফালি লো-ও-ও-ও,” যদি স্নানতে পার সে কোনওদিন আর সাড়া দেয়—“মা-আ-আ-আ। আইতাছি—ই-ই-ই।” যেমন মিত ছোটবেলায়, যেমন ডাকত শেফালির মা তখন তাকে।

হাতে মাছের খলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন অমরেশ। সকালে দাড়ি কাটেননি। সাদা বাসি দাড়িতে মুখ ভরে আছে। রোগা শরীর। সারা জীবন লড়াই করতে করতে নাজ। এই প্রাক-শীতের পর্বও তাঁর গায়ে ঘাম ফুটছে। শেফালির মা খলে নিয়ে গামছা এগিয়ে দিচ্ছে স্বামীর দিকে। জল দিচ্ছে। অমরেশ জল পান করতে করতে শ্রীর দিকে দেখছেন। শেফালির মা'র চোখ ফোলা। গালে জলের দাগ। ফরসা শরীরের ঠিকলো নাকটি আজও কষ্ট পেলে লাল হয়ে যায়। অমরেশের বুকের মধ্যে মায়া জমে উঠল। অপূর্ব ভালবাসায় ব্যথিয়ে উঠল ভেতরটা। কী সুন্দর এই রমণী! কত বড়, কত নির্ভরযোগ্য তার মন। অমরেশ সারা জীবন কষ্ট ছাড়া কিছুই দিতে পারেননি স্ত্রীকে। বহু চেষ্টা করার পরও ইশ্বর সে ক্ষমতা দেননি। উল্টে শেফালির মাকেই চাকরি নিতে হয়েছে। ওই সামান্য আয়ই কাজে লেগেছে সংসারের। দেশে থাকতে অমরেশ কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, ঘরের লক্ষ্মী বাইরে কাজ করতে যাবে? সেখানেও অভাব ছিল। সুখ-দুঃখ ছিল। কিন্তু ইচ্ছের জোরও ছিল। তিনি জানেন, শেফালির মা এক দুঃখী মহিলা। কিন্তু তার কোনও অভিযোগ-অনুযোগ নেই। সে ভাবী আশ্চর্য করে ভাবে। আশ্চর্য করে রাখে। তার বোকা সকলকে শক্তি দেয়। সংসারের ঢাকা ঘখন একেবারে বসে যাবার উপক্রম তখন এক

রাতে স্ত্রীর বুকে মাথা দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন অমরেশ। গেটি সংসার নিয়ে আত্মহত্যা কথা ভেবেছিলেন তিনি। তখন, অমরেশের ঘুবক চুলে শ্যাক বরছে; তাতে আত্মল চালাতে চালাতে শেফালির মা বলেছিল—শুধু দুখের নিকে তাকিয়ে না। সারাক্ষণ বহি নিজের দুঃখ তুলে দেখো, তবে চারপাশের একটুখানি সুখও আর বরা দেবে না জীবনে। কিন্তু সেই একটুখানি সুখ কী বুঝতে পারেননি অমরেশ। শেফালির মা বলেছিল—এই বেঁচে থাকা। এই এক সঙ্গে থাকা। সুস্থ থাকা। যদি শেফালির মতো আমরা সবাই বিধির হয়ে যেতাম। যদি আর আমাদের দেখা না হত! যদি এই দুই সুস্থ সন্তান না পেতাম আমরা। যদি তুমি অন্ধম হয়ে যেতে আর আমি পাগল হয়ে যেতাম! এ সব হয়নি। এই সুস্থতা এই কর্মক্ষমতা এই একসঙ্গে থাকা, এ-ও কি সুখ নয়? চারপাশে দেখোনি, কত লোক একলা হয়ে গেল, কত লোক-হারিয়ে গেল, মরে গেল।

স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন অমরেশ। তাঁর মনে হয়েছিল স্ত্রীই শক্তি, স্ত্রীই সহায়িকা, স্ত্রীই দৃষ্টি। আর ভেঙে পড়েননি তিনি। খুব লড়াই করেছেন। শূন্য হাতে লড়েছেন। শব্ব করে জামাকাপড় বানানো শিখেছিলেন, সেই শব্বই তাঁর পুঁজি ছিল। সেটুকু দিয়ে শুধু কষ্ট করে বেঁচে থাকতে পেরেছেন তিনি, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেঁচেছেন। এর বেশি কিছু দিতে পারেননি শেফালির মাকে। কিন্তু ভালবেসেছেন। গভীরভাবে ভালবেসেছেন। যত বয়স বেড়েছে, যত পরিণতি এসেছে ভাকনায়, যত লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়েছেন, তত ভালবেসেছেন।

চারপাশে একবার দেখে নিলেন অমরেশ। তারপর তর্জনী দিয়ে শেফালির মা'র নাকটি ঠেলে দিয়ে বললেন—কান্দো কান?

শেফালির মা চুপ। নাক টানল দু'বার। অকারসে খোঁপা বুলে আবার খোঁপা করল। অমরেশ বলল—খইলাখান খইলা দ্যাখসো?

—না। শেফালির মা'র গলা ভারী।

—কী আনছি কও?

—কামনে কমু?

—চিতল মাছের গাদা আনছি। কোল আনুম মনে লইসিল, এমুন দাম। হাত দ্যাওনের উফার নাই।

—হ। গাদার দাম যান কিসু কম। আর গাদা খইয়া চিতলের কোল খাওনের আনন্দ পাইবা? হেই যে কয় না—

স্বপ্ন দেখি লুচি খাই

জাইগ্যা দেখি কাথা চিবাই

তোমার হইল গিয়া হেই দশা।

অমরেশ হাসছেন। বলছেন—কান? কাথা কান? তুমি মুইঠা রানবা। কতদিন হয় তোমার হাতের মুইঠা খাই না কও দেখি।

শেফালির মা'র মুখখানা কোমল হয়ে আসে। কী সামান্য সাধ! মুইঠা খাবেন। কী সাধারণ বেঁচে থাকা। কত ছোট ছোট ইচ্ছে আর স্বপ্ন। স্বামীর ভাঙাচোরা মুখের দিকে তাকিয়ে তবু শেফালির মা'র মনে হয়—এ জীবন সুন্দর। এই বেঁচে থাকা সুন্দর। পরস্পরকে জড়িয়ে এই শ্বাস নেওয়া, এই অঙ্গপ্রহরণ, এর কি কোনও তুলনা হয়?

অমরেশ বলেন—অগো আইজ খাইতে কও শাফালির মা।

শেফালির মা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বামীর দিকে থাকায়। সেও আজ চেয়েছিল রাখিকাকে, পলাশকে খেতে বলবে। একসঙ্গে পাত পোড়ে খাবে দুজনে! অমরেশ সেই ইচ্ছাটি বুকে নিয়েছেন। নিজের সাধের মধ্যে সেবা মাছ কিনেছেন বাজার থেকে। শেফালির মা'র চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে যায়। ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতায় কনায় কনায় মন ভরে ওঠে। সে একটু ঘন হয়ে আসে।



অমরেশ কাঠের চেয়ারে শরীর এগিয়ে লেমা লে বলে—দিমু! আমায়ও সাধ লইসিলা।  
শুনছ?

—কও।

—তুমি ক্যামানে জানলা?

—কী?

—অগো খাইতে কমু ভাবসিলাম।

—জানুম না? হুইলৈ জানি। তোমারে না জাইন্যা মানু কই। প্যা পামু?

তার মুখে ছায়া নেমে আসে। বহু কথা উপছে আসে। বলা হয় না। অনেক দুঃখের কথা।  
বুকের মধ্যে মাথা খুঁড়ে মরে সেইসব। বলতে ইচ্ছে করে—তোমার সব ইচ্ছার কথাই তো টের  
পেরেছি আমি। টের পাই। কতটুকুই—না পুরোতে পারিলাম।

শেফালির মা খালা নিয়ে চামচ নিয়ে স্বামীর পায়ের কাছে বসে। ছোট ছোট দু'খানি খুপরি  
ঘর। একটিতে ছেলেরা থাকে। অন্যটিতে বাবা-মায় ঘুম। এ ঘরেই একখানি টেকিতে অনেক  
পড়েন দু'জনে। আগে এই ঘরটিই ছিল। একটাই ঘর। দিনের পর দিন অমরেশ মোঝতে  
শুয়েছেন। টেকিতে দুই ছেলে নিয়ে শেফালির মা। রাতে এক এক দিন নেমে এসেছেন। পা  
টিপে টিপে এসে স্বামীর বুকে মাথা রেখেছেন। কত ভয়ে ভয়ে, কত সন্তর্পণে। ছেলেরা যাতে  
টের না পায়। জায়গার অত অভাব ছিল, তবু টেকির তলায় কিছু রাখতে দিতেন না অমরেশ।  
দ্রীক বুকে নিয়ে এটিই ছিল তার একমাত্র আড়াল। একমাত্র স্বপ্ন। কত কিছু মনে পড়ে। কত  
আশ্চর্য দিন। কত অজুত, বিচিত্র সময়।

শেফালির মা চামচ দিয়ে মাছের সারবস্তু খুঁড়ে নিচ্ছে এখন। অমরেশ দেখছেন। কী অজুত  
কাহনা। চামচের ভগায় মাছের মাস উঠে আসছে। কচিগুলি খোঁচা খোঁচা হয়ে গেল। অমরেশ  
শুধালেন—পাজি আসে নি?

—হ। আসে। কান?

—চাম চচ্চড়ি রানবা না?

—হ। রান্দুম।

—খাল খাল কথা কথা কইরো।

—হ। করম। শুনছ। একখান কথা কমু?

—কও।

—রাইতে শুটকি খাইবা? লইট্যা শুটকি?

—আসে?

—না। আইন্যা দিবা। আইয়াজার রাইজোও খাইতে কমু। শাক্তি আর জাত। আর কিমু না।  
হায় বড় ভালবাসে।

মাথা নাড়েন অমরেশ। বলেন—হ' দিমু আনে। আর কী লাগবে কইয়ো। রসুন, পাজি...  
তরকারি করবা, না ভর্তা।

—দুইয়ে করম। ভর্তায় তো এতগুলো প্যাটের কুলাইব না। তরকারিও করম আর অল্প কইরা  
ভর্তা।

ফুল খুলে যাবে কদিন পর। তখন আর এ সব হবে না। শেফালির মা নিখাদ গৃহিণীর মতো  
মুঠো রান্নার সময় পাবে না আর। এই শাস্ত্র গৃহস্থালি, এই শ্রাণ ছুঁইয়ে রান্নাবান্না এই সময়টায়  
করে নেয় শেফালির মা। শেষে কত কাজ ছিল। টেকিতে পাট দেওয়া, বড়ি দেওয়া, ডাল ঝাটা,  
সর্ষে কোটা। এখানে সে-সব নেই। এখানকার গেরস্থালি যেন শুধু রান্নায় সীমাবদ্ধ। শুধু কাপড়  
কেচে শুকোতে দেওয়া আর ভাজ করায় সীমাবদ্ধ। ফুল খোলা থাকলে সেটুকুতেও টান পড়ে।

মাছের মাস ছাড়িয়ে, কথা বলতে বলতেই, তাতে নুন-হলুন মাখছিল শেফালির মা।

চটকাচ্ছিল বেশ করে। হাতে তেল মেখে আঁঠাল তলতলে মাস দলো পাকাত্তে এখন। মুঠো করছে। অমরেশ বলছেন—আইজ আর লোকানে যানু না। বুজলা।

শেফালির মা সতর্ক হয়। স্বামীর মুখের রেখা পড়ার চেষ্টা করে। মানুষটা কাজে ফাঁকি দেয় না একদম। প্রশ্ন করে—ক্যান? শরীলভা খারাপ লাগে?

—না। শরীলে কিনু না। আইজ মনডা বড় উতলা আসে।

—ক্যান? মাইয়াডার লিগা মন কান্দে?

—হ। আসিল লগে লগে। পোলাডায় আইয়া গর কইত। দাদ-দাদু ডাকত। বুকড়া যান খালি খালি লাগে।

দু'জনেই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। রান্নিকার জন্য এভাবে আগে ঘেঁষে প্রকাশ করেননি অমরেশ। হয়তো এই যাবার কালে তিনি নতুন করে নতুন মেহাবেশ টের পাচ্ছেন। হয়তো তাঁরও রান্নিকা দেখতে দেখতে বারবার মনে পড়েছে তাঁর শেফালির মুখ। কিন্তু ভুলেও সে কথা তিনি উচ্চারণ করেননি। পিতৃহৃদয়ের সব তোলপাড় পাজরের আড়ালেই খামিয়ে রেখেছেন। তাঁদের জীবনে দুঃখ অধিক কিন্তু বিশ্বাস, ভালবাসা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অপরিদীপ্ত সুখ। অমরেশ দেখেছেন—সুখ-দুঃখময় এই জীবনে এক এক জন আসে। মায়ায় বাঁধে। তারপর হারিয়ে যায়। শেফালির মাও তখন ভাবতে থাকছিল ক্রমাগত। রান্নিকা এল। মায়ায় বাঁধল। এবার হয়তো হারিয়ে যাবে। শেফালির মা জানে, সে বস্তিতে যাবে না। যেতে পারবে না। রান্নিকার সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রবাহের মাঝে বস্তি একটি বৃহৎ দেওয়াল হয়ে যাবে। একযোগে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দু'জনে। অমরেশ বললেন—আইজ বাজার থিকা মল্লিদাদার বাড়ি গেসিলাম। বিজয়ার প্রণাম করা হয় নাই।

—কেমন দ্যাখলা?

—ভাল আর কই? দুঃখের কথা কইলেন। হায়রে তো দুঃখের কথা কইতে শুনি নাই। এখন শুইন্যা বড় মন খারাপ লাগতেয়াসে। কয়, পোলায় লিখসে, মায় যদিঁন তোমার লগে আসিল তুমি মায়ে পাপল বানাইয়া রাখসিলা। অহন মায় সুখ আসে। মায়ে আর পাঠানু না আমি।

—এমুন হয়? কী কও? হয় এমুন? পাপল-ছাপল হইলেও বউ কাসে আসিল। বিশাল বাসাডায় অখন আকলা মানুষতা কেমন কইরা থাকব?

—হায় কোলাকুলি করসে না।

—ক্যান?

—কইল ঝুঁমু না। সব অশুদ্ধ। কাদায় ময়লায় আকাকার। সব অশুচি। সব কয়লা। বাজাতে কুজাতে দুনিয়া ভইরা গ্যাসে। ঝুঁমু না। কাউরে ঝুঁমু না। হায় এমুন আসিল না। আমার ডর লাগতেয়াসে।

—কীসের ডর?

—ডাক্তারি করে না। খালি পুজা লইয়া আসে। কয় হায় আইসিল। শুচিয়ে পুজা না করলে হজ্বরে মাইরা ফলাইব।

—কয় কথা কয়? হেই রূপচান্দ দাদুর প্যাচাল?

—হ।

—তাইনরে দ্যাখসো তুমি?

—দ্যাখসি। ছুডো আসিলাম তো। তাও ভুলি নাই। তাইনরে ভুলন যায় না।

শেফালির মা রান্নার জেগাড় করে। অমরেশ রূপচান্দ দাদুর গল্প শোনায়। অদ্ভুত দেখতে ছিল লোকটাকে। গাট্টাগোটা, খুব ফরসা। ছোট ছোট করে চুল ছটিতেন। শীতে গ্রীষ্মে কোরা ধুতি ছাড়া কিছু পরতেন না। নানারকম যোগাভ্যাস করতেন আর কালীপূজা। লোকে নাকি তাঁকে কয়েটি নিয়েও পুজায় বসতে দেখেছে। প্রতি অমাবসায় শাক্তকথা শোনাতেন রূপচান্দ।

মল্লিনাথদের আঙিনায় লোকে ভিড় করে শুনত। সারা গ্রাম বিশ্বাস করত রূপচাঁদের পাওয়া স্বপ্নাদিষ্ট আসন মন্ত্রপূত। রূপচাঁদের কালী ভাগ্যত। রূপচাঁদ বলতেন—শুদ্ধভাবে পূজা না করলে ধ্বংস হবে। সব ধ্বংস হবে। মুসলমান সহ্য করতে পারতেন না তিনি। খ্রিস্টান সহ্য করতে পারতেন না। অসম্ভব পর-ধর্মঘেবী ছিলেন। মানুষের মধ্যে তা চারিয়ে দিতেন। বলতেন—‘সমস্ত মুসলমান, সমস্ত খ্রিস্টান, সব পাণী। ওদের জন্য গুম্বস্তী ধ্বংস হচ্ছে।’ গায়েয় লোকে শুনত। ভুলেও যেত। ধর্ম-বিভেদ তখন খুব দৃঢ় হার্মি। তাদের মধ্যে। কিন্তু বীজ গজিয়েছিল। অত বছর পর দাঙ্গার সময় তার প্রকাশ ঘটে। এসব বিবের ক্রিয়া অতি দীর্ঘ এবং অনিবার্য। বংশে বংশে, যুগে যুগে তা চারিয়ে যায়। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থাকে, তা ওই ভয়। অশুদ্ধতার ভয়। কালীর কোণে পড়ার ভয়।

অশুদ্ধ নিষ্ঠুরতাও ছিল মানুষটার মধ্যে। অমরেশের মনে আছে, ঠাকুরঘর থেকে বাতাসা চুরি করেছিলেন মল্লিনাথ। তখন তার অষ্ট বছর। অমরেশের ছয়। রূপচাঁদমাদু জমতে পেরে গিয়েছিলেন। দুপুর বারোটার রোদুরে দু’হায়ে দু’খানা ইট চাপিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন মল্লিনাথকে আর দু’পয়সার বাতাসা কিনে ক্রমাগত মুখে পুরে দিচ্ছিলেন তার। মল্লিনাথ খেতে পারছিলেন না। জল চাইলেই আর একটা বাতাসা পুরে দিচ্ছিলেন। গলায় বাতাসা আটকে ভয়ে অপমানে কষ্টে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন মল্লিনাথ। রূপচাঁদের ভয়ে কেউ তাঁকে বাঁচাতে আসেনি। শুধু ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে নলিনীবালা ছুটে এসেছিলেন। নাতির মাথা কোলে করে গলায় আঁতুল দিয়ে বমি ও শ্লেষ্মা মাখানো বাতাসা টেনে বার করেছিলেন। সেই বাতাসার সঙ্গে রক্ত মাখানো ছিল। এরপর অনেকদিন ভালভাবে কথা বলতে পারেননি মল্লিনাথ। গলা বসে গিয়েছিল।

শেফালির মা কথা বলতে পারছে না। পায়ে পায়ে পলাশ এসে দাঁড়িয়েছে, দরজার কাছে। শেফালির মা বলছে—বা। মায় কী করে? তার গলা কাঁপছে। সে প্রশ্ন করছে—হায় হায় এমুন নিষ্ঠুর। হুন হইয়া যাইত পোলাডায়। আইছা, তোমার কি মনে হয় হায় আসে? সইতা আসে?

অমরেশ চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর ব্যাখ্যা করতে চান। কে জানে, কী হয়। এই দুনিয়ায় যা-কিছু ঘটে সবেব ব্যাখ্যা নেই। মল্লিনাথের বাবার অপঘাতে মৃত্যু হল তো! সেই কোন সুদূর বাংলাদেশের গ্রাম থেকে ওই সিংহাসন ভেসে এসে ঠেকল তো দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে। আর সে-দিনই মল্লিনাথ তো উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। এ সবেব ব্যাখ্যা কে দেবে? কে বলবে তিনি আসেন কি না। ঈশ্বরকে যদি ভয় পেতেই হয় তবে তাঁকে পূজা করা সম্ভব নয়। ভালবেসে যে-ভক্তি আসে, যে-পূজা আসে তাই শুভাঙ্গ। যে আনন্দ দেবে তাকে ভয় করলে চলবে কেন। রূপচাঁদ ঈশ্বর ছিলেন না। যতই পূজা করুন, অত যুগা ও নিষ্ঠুরতা সমেত তাঁর পক্ষে পূজাধ্যা হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি দুরাধ্যা ছিলেন। দুরাধ্যা অমর। অজর। যুগে যুগে তার জন্ম হয়। সে বারবার মরে আর বারবার জন্মায় মানুষের চিন্তায়, জীবন-যাপনে, বিশ্বাসে আর দুঃখে।

অবশেষে, আজ এ ঘরে রাধিকার শেখ রাত্রি। এর দেওয়ালে দেওয়ালে তার সমস্ত ভাবনা লেখা আছে। তার ইচ্ছে ও স্বপ্নের কথা, তার কষ্ট ও অবহেলার কথা। এ ঘরেই আঁকা আছে সেই অসামান্য সময় যখন একবারের জন্য রাধিকা ছেপে উঠেছিল। এই পরিবেশ, জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া এক টুকরো আকাশ, মাছ হয়ে ঘুরে বেড়ানো দুই আত্মভর্তি পুকুর ও সজনে গাছ, যার পাতা ভেজে খেয়ে অনেক দুপুর কেটে গিয়েছে রাধিকার—এ সব আর কাল থেকে থাকবে না। শেফালির মা থাকবে না। আর থাকবে না শমসেরকে চাইতে চাইতে পরমেশকে আঁকড়ে ধরা। আজ সে একবারও কাঁদেনি। কটাই বা জিনিস। বাঁধা-ছাদা করা হয়ে গেছে। শুধু একটা কাছ বাকি। পরমেশকে দেখতে পায়নি সারা দিন। শুধু সাইকেলের শব্দ পেয়েছে। সে তো জানে রাধিকা চলে যাবে কাল। তবু কেন একবার এল না। কতদিন চোখে চোখ পড়েনি।

কতদিন কথা হয়নি। পরমেশ তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ভাবছে এ যাওয়া ছাড়া সম্পূর্ণ যাওয়া নয়। রাধিকা আবার আসবে। দেখা হবে। পরমেশের কাছে এ যাওয়ার যেমন কোনও অংশাই নেই। কিন্তু রাধিকা বুঝতে পারছে, এ যাওয়া তার কতখানি। এই দূরত্ব কত অনতিক্রম্য। সে ক্রমশ অন্ধকারের আভাস পাচ্ছে। আরও গভীর, আরও ঘন অন্ধকার। ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। নিঃশব্দ নেমে এল বিছানা থেকে। আলো ছালাল। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে বসন্ত দু'টি তার। সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে পরমেশের ঘরের দিকে। মৃদু টোকা মারছে দরজায়। একবার, দু'বার। পরমেশ কি বুঝতে পেরে গেছে? সে কি জানত রাধিকা চলেও আসতে পারে এই ঘোর রাত্তিরে? সে কি প্রতীক্ষা করছিল? নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল সে। দেখল এক পলক। মৃদু স্বরে বলল—বউদি!... রাধিকা ভেবেছিল, আর একবার, মাত্র একবার পরমেশের বুকে মুখ রাখবে সে। ধবল শরীরে, মুখা ঘাসের মতো সোমের আড়ালে দু'খানি রক্তাভ চুনীতে মুখ রাখবে আর আশ্রয় হতে চাইবে।

জৈসন রজনী উজোরল চন্দ।

এইসন বেস ভূসন কর বন্ধ ॥

এ ধনি ভাবিনি কি কহব তোয়।

নিচয় সো নাগর তুরা বস হোয় ॥

তুহ রস নাগরি নাগর রসবস্ত।

তুরিতে চলহ ধনি কুঞ্জক অন্ত ॥

কিন্তু সে এখন শীতল হয়ে আছে। পরমেশ দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে রাধিকার পায়ে। কাছে। ফিস ফিস করে বলছে—ক্ষমা করুন বউদি। যাবার আগে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে যান। আমি সে-দিন পাপ করেছিলাম।

### একত্রিশ

ঘ্রাণ পেয়েছে অন্ধ। বস্তিতে নতুন সংসার আসার ঘ্রাণ। সংসার হয় বটে ফটিক বিল বস্তিতে। জিনিসপত্র নেই। পরসাকড়ি নেই। হেঁড়া কাঁথা আর ফুটো চাল—তবু গলায় রক্ত তুলে ষাটুনি আর জীবন-যাপন। সংসার করা। সংসার। কথায় বলে—ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।

তা যাই হোক না কেন। বাঁচার টান তীব্র। যেমন করে হোক বাঁচতে হবে। এই অমূল্য জীবন টিকিয়ে রাখা চাই। এই টিকিয়ে রাখা এক এক জনের এক-এক রকম। বাঁচার গন্ধও তাই এক এক জনের এক এক রকম। প্রত্যেক পরিবারের গায়ে সে-গন্ধ আলাদা করে লেগে থাকে। আর অন্ধ সেইসব আলাদা গন্ধের সন্ধান পায়। এ বস্তিতে বত রকম গন্ধ আছে, সে চেনে। এখানে পঁয়ত্রিশটা বাসা আর সবার নিজের নিজের গন্ধ। সে যখন হেঁটে যায়, বড় পাথরটায় ঠোক্তর খায়, বুঝতে পারে যে মুন্নাদার বাড়ির কাছে এল। বাড়ি তো নয়। ঘর। এখানে সব ঘর। মুন্নাদার ঘরের গন্ধও তার চেনা।

মুন্নাদা সকালবেলায় মাথুরের গড়ের মোড়ে মাটিতে বস্তু পেতে বসে খুচরো ফুল আর বেলপাতা বিক্রি করে আর দুপুর থেকে সিনেমার টিকিট ব্লাক করতে যায় জয়শ্রী সিনেমায়। যত ফিল্ম আসে, সব মুন্নাদার মুখস্থ। এক একটা ফিল্ম ও চার-পাঁচবার দেখে। রাজেশ খান্নার ছবি হলে আট-দশবার। সেইসব ফিল্মের গল্প অন্ধকে করে মুন্নাদা। অন্ধ তো কোনওদিন সিনেমা

দেখতে পাবে না, তাই। মুন্নাদার কাছে শুনে শুনে অন্ধ সব হিরোর নাম জেনে গেছে। ভিলেনদের নামও। মুন্নাদা ওকে হিরোইনদের বর্ণনাও শুনিয়েছে কিন্তু অন্ধর বেশি আকর্ষণ হিরো আর ভিলেনে।

মুন্নাদা এ পর্যন্ত যত গল্প করেছে অন্ধকে সব তার মুখস্থ। সব কিছুই খুব ভাল মনে রাখতে পারে অন্ধ। গল্প, পায়ের শব্দ, বাতাসে উষ্ণতার তারতম্য—সব। সে বলে দিতে পারে, সোমবার বাতাসে জলের পরিমাণ বেশি ছিল কিন্তু মঙ্গলবারের হাওয়া শুকনো। তার মাথাটা খুবই পরিষ্কার। এ কথা অবশ্য জানা ছিল না। কিন্তু মাস্টারকাকা এ কথা তাকে বলেছে। মাস্টারকাকা যা বলে তার এক বর্ণও অন্ধ অবিশ্বাস করে না। মাস্টারকাকা তাকে ভাবতে শেখায়, বুঝতে শেখায়। কথা পর্যন্ত বলতে শেখায়। আজকাল অন্ধ ওর মা-বাবার মতো করে কথা বলে না। শুদ্ধ করে বলে। মুন্নাদার বাড়ি ছাড়িয়ে মাস্টারকাকার বাড়ি। এই বস্তিতে একমাত্র মাস্টারকাকার বাড়ির সামনেই ফুলগাছ আছে। অন্ধ সহজেই এ ঘর চিনতে পারে। সারা বছর ধরে মরসুম বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার গন্ধ বদলায়। আর অন্ধ তার মধ্যে দিয়ে বছরটাকে ছোঁয়। এক পূজো গেল—আবার আসবে। এক বসন্ত গেল—আসবে আবার। সে তো ক্যালেন্ডার দেখতে পায় না। ডায়রিও না। মাস্টারকাকার এই গাছগুলোই তার সালতামামি। মুন্নাদা যেমন অন্ধকে ফিল্মের গল্প বলে তেমনই মাস্টারকাকাও অন্ধকে গল্প বলে। কিন্তু সে-সব গল্পের চরিত্র আলাদা। মাস্টার বলে সারা পৃথিবীর গল্প। দেশ-বিদেশের উপকথা আর ইতিহাসের গল্প।

মাস্টার যে ঠিক ঠিক মাস্টারমশাই একজন—তা বলা যাবে না। বস্তির লোক তার নাম দিয়েছিল মাস্টার। অন্ধ জানে, মাস্টারকাকার আসল নাম সত্যব্রত দাস। আর এখানে আসার আগে মাস্টারকাকা বীরভূমে থাকত। অন্ধ বলে—তা, বীরভূমে কি তোমার ঘরবাড়ি ছিল না?

—ছিল।

—তা হলে চলে এলে কেন?

—খুঁজতে রে অন্ধ।

—কাকে? কী?

—কী জানি! এখন আর তা মনে পড়ে না। হয়তো ভাই খুঁজতে এসেছিলাম বা বন্ধু খুঁজতে। নাকি আমি পড়তে এসেছিলাম রে অন্ধ, বা কাজ করতে। এখন আর তা মনে পড়ে না।

—আমার মনে হয় তুমি এখানে থাকবে আর আমাকে গল্প বলবে বলেই এখানে এসেছিলে।

—তা বেশ বলেছিস। আমাকে তুই-ই বুঝতে পারিস রে অন্ধ। তোর জন্যই আমি গ্রাম ছেড়ে এসেছিলাম। এক অন্ধ বালকের জন্য। আমি বুঝেছিলাম, শহর ছেড়ে লেখানো পড়ানোর জন্য শুধু গ্রামেই নয়, যেতে হবে শহরের বস্তিগুলোতেও। কারণ এখানে বাস করে অন্ধ। অনেক অন্ধ। তাই এসে থাকতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। অনেক কথা বলার ছিল আমার। বলা হল না। তোকেই সব বলব রে অন্ধ।

—তোমার গল্পগুলো আর কেউ শোনেনি বুঝি?

—নাঃ। শুনল আর কোথায়! কিংবা আমিই হয়তো বলতে পারিনি শোনাবার মতো করে। আমারই ব্যর্থতা সব।

—আমাকে বলো, কী তুমি অন্যদের বলতে চেয়েছিলে?

—ধর, তোর বাড়িটা হঠাৎ আজ অন্য কেউ নিয়ে নিল আর তোকে শুতে হল রাস্তায়—

—হুঁ!

—তোর ভাতের থালা কেড়ে নিল আর বলল, আজ থেকে তুমি শুকনো মুড়ি খাবে আর ভাত খাব আমরা—

—কেন?

—এটাই তো কথা। কেন। ধর তোকে নিয়ে কাজ করিয়ে নিল সারা দিন আর মিশ মোটে এক টাকা—

—তখন?

—সেই টাকায় তুই খেতে পেলি না, তোর ঘরের চাল ফুটো, সারাতো পারলি না, তোর মায় অসুখ, তুই ভাতার ডাকতে পারলি না—

—আমার বাবার অসুখ।

—তুই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিস, তোর ছেঁড়া পোশাক, পেটে খিদে, মাথার চুলে দুলিয়ার জট পাকিয়ে গেছে, তুই খার নিয়ে গেলি, অন্ন, তুই লেবাপড়া ভানিস না, ধার পেলিও যদি, ত্র্যোকে দিয়ে লিখিয়ে নিল লেড় গুণ, আর তুই বিকিয়ে গেলি—

—আমার মা মাঝে মাঝে অলিচাচার কাছে ধার নেয়।

—তোর কিছুই নেই। ঘর দিলি। মাটিতে শুয়ে থাকিস, কাঁথা চিবিয়ে খাস—

—মাঝে মাঝে খুব ঝিদে পেলো আমার দুনিয়াটাকে টিবিয়ে খেতে হাঙ্গ করে।

—তোর মা, না হোক বাবা, যতগায় ধুকছে। তুই জানিস, খিদেয় এবং পরিশ্রমে ওদের অসুখ করেছে। এবার তুই হিসেব কষাচ্ছিস। যদি এক টাকার বিনিময়ে ওরা তোকে পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক দিত তোর ঘর সারত, মা সারত, বাবা সারত, তুই একটু একটু বিদ্যাত্যাস করতে পারতিস। একটা পরিকার জামা পারে হেঁটে যেতিস রাস্তা দিয়ে আর ভাবতে পারতিস এই পৃথিবী কত সুন্দর—

—সুন্দর নয় বুঝি? আমি তো কত ভাল ভাল গন্ধ পাই।

—এইটাই মুশকিল। তুই যে খারাপ আচ্ছিস, তোর যে এরকম সব-হারানো, সব-খোয়ানো জীবন হওয়ার কথা নয় এটা তুই বুঝতেই পারছিস না—

—কেন? বুঝি তো। মা কত বড় বড় বাড়িতে কাজ করতে যায়। তাদের বাড়ি সব ধুয়ে-পুছে আসে। ওখানে পাঁজা পাঁজা বাসন মাঝে মাঝে আর এঁটো-কটা দেখে বুঝতে পারে আজ কী কী রান্না হল। সে সব খাবার আমরা জন্মেও খাইনি। তাতে কী? মা যখন কুঁচোমাছের চকড়ি করে আর পটিলের খোসা বেটে ভাত খেতে দেয়, আমার দারুণ লাগে। মা মাঝে মাঝে কাঁচকলার খোসাও বাটে। একটু কস কস গন্ধ বটে কিন্তু খেতে দারুণ।

—কিছু তোর বাবা? তুই তো বললি, তার অসুখ সারছে না—

—হ্যাঁ। মা সন্তোষী মায় পূজা করছে। এবার ইতুও করবে বলছে। সন্তোষী মায় পূজা করলে, বুঝলে, যা চাওয়া যায়, পাওয়া যায়।

—আর ইতু করলে—

—সেও।

—মঙ্গলচণ্ডী করলে? পুরীর ধামে গেলে? হারকেশ্বরে হতো বিলে? কামারহাটিতে সেই কদমগাছ আর নিমগাছওয়ালা পীরবাবার কাছে মিল বাঁধলে? মা কালী মা দুয়া বলে ঢাক-ঢোল পেটালে? কী হয়—

—ওই যা চাওয়া যায় পাওয়া যায়।

—তবে পাচ্ছে না কেন লোকে? ভিবিরি বাড়ছে কেন? লোকে কাজ না পেয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে আর গলায় দড়ি দিচ্ছে কেন? তোরা আথপেটা খেয়ে মরছিস কেন? ভাতগর দেখাবার পরস্য নেই কেন? তোর চোখটা অপারেশন করে সারানো যায়। সেটা করা যাচ্ছে না কেন—

—সে-সব গভজাঘের পাপ। মা বলে, ঠাকুমা বলে, পাণী হলে এরকম গরিব হয়ে জন্ম হয়। এক জন্ম ঘরে গরিবের ঋণ শুধতে হয় ভগবানকে।

—এই ঋণ আমিও শুধছি রে। জন্মের ঋণ। তোর বাবা যেভাবে দুঃখে কাঁদে, ওমনি কান্না আর বেগথাও শুনিস—



—হ্যা, ছোট্টর মা কঁাদে। জনার পিসি কঁাদে। কন্দুসের বউ কঁাদে। নয়নার দিদি কঁাদে।

—ওই এক টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা হলে এই বাচ্চাগুলো থাকত না—

—কিন্তু এক টাকাই দেবার কথা থাকলে পাঁচ টাকা দিবে কেন?

—শোন বন্ধু, আসলে দেবার কথা পাঁচ টাকাই। ওরা এক টাকার দের। খেপেছে ভাতের মারে। মনে মারে। মারতে মারতে তুলিয়ে দেয় তার বাঁচার কথা ছিল—এরা কীভাবে বাঁচার কথা ছিল।

এখন অন্ধ জানে, সব মানুষের বড় বাড়িতে থাকার কথা ছিল। সব মানুষের গাড়ি চাশার কথা ছিল। সবাই পেট ভরে সুন্দর খাবার খাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হ্যাঁ হয়না। স্বপ্ন মাস্টারই তা খায় না। তবু বলে—যাদের যাদের কান্না শুনতে পারি তারা যদি এক জোড়ি হয়ে পাঁচ টাকা আদায় করতে শেখে তবে ঠিক হয়।

—তাহলে সে কথাটা তুমি কেন সবাইকে বলে দিচ্ছ না?

—বলিনি কি আর? বলেছিলাম। কিন্তু কারও শোনার সমত্ব হয়নি। সারা দিন পরিশ্রমের পর কেউ আর কেমন আছে, কেমন হলে ভাল থাকা যায়, ভাবতে চায় না। তখন তারা চুপ খেতে চায়। বেশাবাড়ি ছোট্টে। গুলতানি করে। ঘুমোয়। সারা দিন মার খায়। যতটুকু সময় মারের হাত থেকে বেরিয়ে আসে ততটুকু ওই মার ভুলে থাকার চেষ্টাতেই কাটিয়ে দেয়। কেন মার খেল, মার খাবারই কথা তার ছিল কিনা ভাবে না। ভাবে এইটাই ওদের প্রাণ।

—তুমি কী ভাব?

—আমি আর কী ভাবব? আমি গেল্লিকলে কাজ করতে করতে দম ফুরিয়ে ফেলেছি। আমার ফুসফুসে রোগ হয়েছে, বুঝলি? এ রোগ এ বসতিতে প্রায় সবাই আছে। তোমও হবে। বুঝলি? একটা কথা আমি বুঝে গেছি, আমি গাঞ্জি নই। নেতাজিও না। আমি ইন্দিরা গাঞ্জি নই। জ্যোতি বসুও না। আমি চারু মজুমদার, কানু স্যানাল কিছু না। আমি আসলে যা বলব বলে ভাবি, বলতে পারি না। যা করব বলে স্বপ্ন দেখি, করতে পারি না। আমি তাই শুধু দেখি। ইতিহাস দেখি।

—সেটা কী?

—ঘটনা দেখি। চুপচাপ। আর ভাবি, বিশ্লেষণ করি, এটা হল না বলে ওটা হল। এটা আর একটু অন্যভাবে দেখলে পরিণতি এরকম হত না। বলতে পারিস আমি নিজেই ইতিহাস। কিছুই বদলাবার সাধ্য নেই আমার। শুধু যা ঘটছে তা দেখে হাওয়া ছাড়া। ধারণ করা ছাড়া।

মাস্টারের সব কথা অন্ধ বুঝতে পারে তা নয়। কিন্তু কথাগুলো শুধে নেয়। মুন্সাদা যাই বলুক, অন্ধ শোনে, বোঝে। মাস্টারের কথাও অন্ধ শোনে, কিছু বোঝে, বেশিটাই বোঝে না, এবং সবটা মনে রাখে। অন্ধকে মাস্টার শিখিয়েছেন কাকে বলে ইতিহাস। অন্ধ জানে, এই আজ যা ঘটছে কাল তা ইতিহাস হয়ে গেল। তাই বলে এই জবাফুলটা আজ ফুটছে, আর কাল ধরে গেল, সেটা কিন্তু ইতিহাস হল না। সেটা অতীত। আজ ছিল। কাল নেই। কাল ছিল। আজ নেই। কিন্তু ইতিহাস আজ নেই। কাল থাকবে। থেকে যাবে। অতীত হচ্ছেও মানুষের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। যদি জবায় জবায় ব্যাপক হানাহানি হয় আর সমস্ত জবার বুক চিরে করবর রক্ত করে তবে ইতিহাস হয়ে যাবে। ইতিহাস মানে নির্মাণ হওয়া চাই, ইতিহাস মানে সংঘর্ষ হওয়া চাই। ইতিহাস ধ্বংসে লালিত হয়। প্রতিপালনে লালিত হয়। ইতিহাস হল কীর্তি। কণ্ড। ইতিহাস হয়ে উঠতে পারার ঘটনাগুলো সময়ের অভিমুখ পাল্টে দেয় এবং লালিত হতে থাকে মানুষের চেতনায়।

সূতরাং, অন্ধ বুঝতে পারে না, গোটা একটা মানুষ, যে বেঁচে আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে-কথা কইছে, সে কী করে ইতিহাস হবে। মাস্টার বলে—এ বেঁচে থাকাকে কি বাঁচা বলে রে অন্ধ? যে-বাঁচা অন্যকে বাঁচতে উদ্বীণিত করে না, তা আবার বাঁচা কী? যে-কথা বলি, তাও কি আর কথা? এ গোল্কারও কাছে পৌঁছয় না। কেউ শোনে না। এই বস্তির একজনকেও কি আমি কথা বলে, বুঝিয়ে, বাঁচতে শেখাতে পারলাম? আমি তাই শুধু ধরে রাখি। ইতিহাস ধরে রাখি। প্রতিদিন

যা-কিছু খটে, আমি টুকে রাখি ভায়রিতে। এটাই তো ইতিহাস হল।

ভায়রি কী, এখন অন্ধ জানে। আর আজকাল অন্ধ মনে হয়, মাস্টার যা জানে, তার সবটাই অন্ধ জানে। ফেন তাদের জানায় কোনও পার্থক্য নেই। যেন এ পাত্রের জল ও পাত্রের ঢেঁসে দিলেই হল। তাতে জলেরও আপত্তি নেই, পাত্রেরও না। তাই অন্ধ ব্যতীত জানে না, জেনে নিচ্ছে ক্রমশ। অন্ধ শুধু রঙ কেমন জানে না। রোদুর কেমন, আকাশ কেমন, চাঁদ, তারা, জ্যোৎস্না আর অভিব্যক্তি জানে না যদি তা নিঃশব্দ হয়। রক্ত, রোদুর, মালাশ, চাঁদ, তারা, জ্যোৎস্নায় তো শব্দ নেই। কিন্তু গন্ধ আছে। আর সে গন্ধটা একা টের পায় অন্ধই। সে বোকে, রাস্তা পুড়ছে, মাটি পুড়ছে, ঘরের চালে বোদ ঠিকরোচ্ছে। সে গন্ধ পাতা। এক একদিন, সন্ধ্যায় যখন চুপ করে বিল ঘেঁষে দাঁড়ায় তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারে চাঁদ এসে মাথার ওপর দাঁড়িয়েছে, জ্যোৎস্না নেমে আসছে, মাঝে মাঝে একটু গুলিয়ে যায়, ক্যান্সারকেও সে মনে করে জ্যোৎস্না, সে টের পায় জলে তারা পড়ছে, জল নড়লে, সব নক্ষত্র নড়ে গেলে। বাতাস ছুঁয়ে গেলে সে টের পায় এখন চন্দ্রপক্ষ নয়। সে সব গন্ধ দিয়ে বোকে এমন নয়। স্পর্শেও বোকে। কিন্তু ইতিহাস সে স্পর্শে বুঝতে পারেনি। মাস্টারের ঘরে এলে সে ভায়রির গন্ধ শৌঁকে আর বিশ্বাস করে এটাই ইতিহাসের গন্ধ।

মাস্টারের আর অন্ধের একটি প্রিয় খেলা আছে। রাত্রে মাস্টার লর্ডন জ্বলে কাগজ-বই খুলে বসে। আর অন্ধ তার কথা শোনে। নানা কথা, নানা কাহিনী, নানা বর্ণনা। এক সময় অন্ধ বলে, 'দ্বাজ কী শোনাবে?'

মাস্টার বলে— খোলা।

অন্ধ ভায়রি হাতে নিয়ে এক-দুই-তিন বলে যে কোনও একটী পাতা খোলে। মাস্টার সে পাতা থেকে পড়ে শোনায়। এক-এক পাতা কতবার পড়া হল, অন্ধর মুখস্থ হয়ে গেল, তবু পড়া হয়। কাল রাত্রে অন্ধ খুলেছিল—

অজুত সুযোগ নিয়েছে কংগ্রেস সরকার। সেন্টারে, স্টেটে একেবারে নিরক্ষর ক্ষমতা পেয়ে গেছে। এটাকে কি সংবিধান সংশোধন বলে? এটা সংশোধন নয়। এটা বানানো। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে চমৎকারভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে আইনের জুডিশিয়াল রিভিউ-এর সম্ভাবনা। ফান্ডামেন্টাল রাইটস্ নিয়ে ছেলেখেলা খেলছে। একটা শোবিত, নিপীড়িত, গরিব দেশ, যেখানে অধিকাংশ মানুষ জীবনের প্রাথমিক অধিকার পায় না, সেখানেও আমাদের মাননীয় জনপ্রতিনিধিরা মৌলিক অধিকার ধর্ব করে দিতে উদ্যত হন। ট্রাইবুনালের ক্ষেত্রে সমস্ত জুডিশিয়ারি কন্ট্রোল ছেঁটে ফেলেছে। এমনকী নতুন আইনের ক্ষেত্রেও জুডিশিয়ারি কন্ট্রোল প্রায় নেই বললেই চলে। এভাবে চলে না। এভাবে চলতে পারে না। একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়েও সমস্ত মানুষের গলা টিপে দেওয়া যায় না। জরুরি অবস্থা নিয়ে যে-ছেলেখেলা গত বছর থেকে চলছে, তা যদি এ দেশের চেতনাসম্পন্ন মানুষকে প্রতিবাদ না জোগায় তাহলে, হে ভারতবর্ষ, তোমার আবার পরাধীন হয়ে যাওয়াই উচিত।

বুঝি উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল মাস্টার পড়তে পড়তে। অন্ধ কিছুই বুঝতে পারছিল না। তবে, সে বেহেতু ইতিহাসের গন্ধ চেনে সেহেতু অনুমান করছিল, এমন কোনও ইতিহাস এখন পাঠ করা হচ্ছে, যা আপত্তিকর, যার পরিবর্তন দরকার। অন্ধ বোঝে না মাস্টার এত কঠিন করে লেখে কেন! যে-ভাষায় সে অন্ধকে বোঝায়, সে-ভাষায় তো লিখতেও পারে। সে কেবল বলতে গেছে— তারপর?

তখনই খুব চোঁচামেচি উঠেছিল পাশে। মাস্টার ভায়রি বন্ধ করে বলেছিল— কী হল, দেখে আসি চল।... মাস্টারের হাত ধরে অন্ধ গিয়েছিল গোলমালের জায়গায়। আরও সব লোক ছুটে

এসেছিল। টেপির বাবা মদ খেয়ে পেটাম্বিল টেপির মাকে। টেপির মা টেপিরে কাঁদছিল। প্রায়ই হয় এমন আর প্রায়ই তার কান্না শোনে বাবা। অন্ধ জানে, সফল হলেই টেপির বাবা পাথরের বাগ নিয়ে বেচতে যাবে। ছোট বাগ নিয়ে আটটির পাথর কেটে টেপির বাবা। সেগুলো নাকি খুবই সুন্দর। টেপি বলেছে। লাল, নীল, হলুদ রঙ। আরো পড়লে অবাক করে। টেপির বাবা বাগে তুলে দিয়ে যত্নে পাথরগুলো সাজিয়ে রাখে। যদিও মাস্টার বলেছে, এগুলো পাথর নয়, সব কাচ, টেপির বাবা লোক ঠকিয়ে কাচের দামের জিনিস কিনে পাথরের নামে বেচে। সেই থেকে অন্ধ জানে, পাথর কখনও কখনও কাচের চেয়ে দামি এবং রাস্তার লোকেরা খুব বোকম আর টেপির বাবা একটা বাগে লোক। বস্তিতে আরও জানেকের মদ খেয়ে বউকে ধরে পেড়িয়ে। কিন্তু তারা কেউ লোক ঠকায় না। তারা পরিশ্রম করে। রিকশা চালান। কুতো সারাম। রাস্তার পাথর ভাঙে। কাঠের দোকানে, হোটলে কাজকর্ম করে।

টেপির মা বা অন্যরা রোজ রোজ কেন মার খায় মাস্টারের কাছে জানতে চেয়েছিল অন্ধ। জিজ্ঞেস করেছিল— কেন ওরা কিছু বলে না? পাল্টা মার দেয় না কেন?

মাস্টার বলেছিল— ওরা শেখেনি।

—কেন? শেখেনি কেন? আমাকে সো-দিন পেঁচো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল তার পরদিন পেঁচোকে পেয়ে আমি বিমর্ষে রক্ত বের করে দিইনি? আমাকে কে শিখিয়েছিল?

মাস্টার চুপ করে ছিল। তারপর বলেছিল— পেঁচো তোর কেউ না। কিন্তু ওরা সব বর।

—বর তো কী?

—বর মানে মালিক। ওরা সব বউদের মালিক।

—মালিক তো কিনলে হয়।

—বিয়েটাও একরকম কেনা হল। তার তাই ওরা যা-খুশি করে। বউগুলো সয়। মারলে ভাবে— মারবেই তো, ও আমার বর। ভালবাসলে ভাবে, বাসবেই তো, ও আমার বর। দুটোই ওরা ভাবে প্রাণ্য। দুটোতেই ওদের অধিকার। আমি এখানে যখন প্রথম এসেছিলাম তখন খামবার চেষ্টা করতাম। ওই টেপির মা আমাকে একদিন কী বলেছিল জানিস?

—কী?

—বলেছিল— আমার সোয়ামি আমারে মারুক কাটুক আপনের কী? আপনে আমার ভাতার হইকেন?

—হি হি হি...

অন্ধ হেসেছিল। ভাতার মানে সে জরন। বোকে। বাঁশের চাঁচের চৌখুস্তি ঘরের মধ্যে, উঃ আঃ, মাইটা মুখে নিয়া দে, তোমারে করুহ... আরও করুহ... এইসব হয় আর সে দিবি বুঝতে পারে এ সব মাগ-ভাতারে হয়। টেপি কতবার অন্ধকে বলেছে— আঃ, মাগ-ভাতার খেলবি? টেপি শুয়ে পড়েছে। আর অন্ধর হাত এনে নিজের মাইতে, মুতুনিতে টুইয়ে টুইয়ে বলেছে, ধর, ধর টেপি। কী যে টেপে অন্ধ, কী যে করে, মুতুনি ধরে হাতে কী বিদ্রী গন্ধ! অন্ধর ঘোড়া লাগে, আবার ভালও লাগে। বেশ খেলা।

অন্ধ কিন্তু টেপির মা মার খেতে খেতে উল্টে মার দিয়েছে টেপির বাবাকে। একেবারে বাঁ কাঁধে অশ্রুধারি বিশাল কোপ। অন্য দিন টেপির মা কাঁদে, আজ বাবা কাঁদছে। কীরকম অদ্ভুত শোনাচ্ছে তার কান্না। ফেন ফাটা বাঁশ হঠাৎ কথা বলতে লেগেছে। অন্ধর হাসি পাচ্ছে। মনে মনে বলছে—‘বেশ হয়েছে’। সব মেয়েরা টেপির মাকে ঘিরে ধরেছে। ছি ছি, ভাতারের গায়ে হাত তোলে কেউ। টেপির মারও খুব অনুশোচনা হয়েছে। সে কৈনে কৈনে বলছে— আর কত সহিতে পারি কও। রোজ আইব, পয়সা লইয়া মদ গিল্যা আমারে মারব। আইজ ব্যাতন পাইসি। সব নিসে। উড়াইসে। আইয়া আমারে কয় হারামজাদি, আরও টাকা আসে। সে আমারে। যত কই, নাই। সব উড়াইসো, সারা মাস প্যাটে কিল দিয়া খুয়া, কয়, দিতই হইব, দিতই হইব। হ্যায়

জুয়া ধরসে, সব উড়াইতাসে, কয়, গভর ভাইগা দিবি, খানকি, হট্টলে কই পুইশ না? আমি শুই? কোন পুদির পুত কইব আমি শুই? দিসি দুইখান...

মাস্টার আলো ফেলে দেখছিল কত কতখানি গভীর। তারপর নালি, পাড় আর তাপুকে বলেছিল— নিয়ে যা শিবতোষ ডাক্তারের কাছে। সেমাই দেবে।

মল্লিনাথ ডাক্তার আর রোগী দেখেন না। লোকে শিবতোষ ডাক্তারের কাছে যায়। যেতেই হয়। কিন্তু তাদের যেতে ইচ্ছে করে না। শিবতোষ গরিব-বড়লোক মারেন না। সবার কাছে তাঁর পরসা চাই। পুরো পরসা। মল্লিনাথ গরিব-বড়লোক সবার ডাক্তার ছিলেন। শিবতোষ শুধু বড়লোকের ডাক্তার।

ফেরার সময় মাস্টার বলেছিল— রোজই তো মারামারি হয়, আজ কেন এক গোল বাধল বল তো?

অন্ধ বলেছিল— দা দিয়ে কেটেছে বলে?

—না। তুই তো দেখিসনি। কাটেনি খুব বেশি।

—কিন্তু আমি রক্তের গন্ধ পাচ্ছিলাম।

—রক্ত পড়ছিল। তবে ও নিজেরাও পটি বেঁধে সারিয়ে নেওয়া যায়। আসলে রোজ মেয়েছেলের কামা শোনে তো লোকে, আজ বেটাছেলের কামা শুনেছে। আর তাও সবটা নয়। আসলে মানুষ যাকে সহনশীল দেখতে অভ্যস্ত সে যদি কোনও দিন ভুল করেও প্রতিবাদ করে বসে, যদি একদিনও নিজের অবস্থান ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন চিন্তা করে, তাহলে যারা রোজ চোঁচায় তাদের চেয়ে সেই নীরবতা-ভাঙা চিন্তার কানে আসে দ্বিগুণ তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন হয়ে। অন্যদের তা স্রুতিকটু লাগে। বিসব্ধ লাগে। তাই অসহ্যও লাগে।

অন্ধ জানে মাস্টার খুব বোঝে। এই বস্তুতে মাস্টারের মতো করে আর কেউ বোঝে না। বুঝবেই বা কী করে, মাস্টারের মতো পড়তেই তো পারে না কেউ। অন্ধর খুব মাস্টার হতে ইচ্ছে করে। ইতিহাসও হতে ইচ্ছে করে, ঠিক মাস্টারের মতো। কিন্তু অন্ধ, খুব অসহায়ের মতো, এটুকু বোঝে, শুনে আর গন্ধ শুঁকে আর বুঁয়ে মাস্টার হওয়া যায় না। ইতিহাস হওয়া যায় না। ইতিহাস হতে গেলে চোখ থাকতেই হয়। দেখতেই হয়। ইতিহাস হতে গেলে দৃষ্টি চাই। গোলমাল থেকে ফিরে এসে ডায়রির বাকিটুকু পড়েছিল মাস্টার—

ঘাড়ের ওপর পাকিস্তান শত্রুতা করছে বলে ১৯৭১ সালে জরুরি অবস্থা জারি করা হল। চমৎকার। এ নিয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না যে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকবে। কিন্তু গত বছর যে-কারণে জরুরি অবস্থা আবার ঘোষণা করা হল তার কি সত্যিই প্রয়োজন ছিল? কিন্তু লোক পুলিশ ও সশস্ত্রবাহিনীকে তাদের কর্তব্যাপালন ও স্বাভাবিক কাজকর্ম না করতে প্ররোচিত করেছে। পুলিশের স্বাভাবিক কর্ম কী? সশস্ত্রবাহিনীর কর্তব্য কী? ময়দানে তাজা তরুণ ছেলেদের ছুটিয়ে পিছন থেকে গুলি করে মারা?

অন্ধ আর সহ্য করতে পারছে না। সে যেন দেখতে পাচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে একটা ছেলে। কত বয়স? কে? ছুটে যাচ্ছে। শব্দ হল। গুলির শব্দ হল, বুম বুম বুম রাট টাট টাট। লুটিয়ে পড়ছে ছেলেটা। একটু আগেও ভেবেছিল বেঁচে যাচ্ছে কিন্তু আসলে এখন মরছে। মরে যাচ্ছে। অন্ধ জানে। এ সব গল্প জানে। মাস্টার তাকে পড়ে শোনায়। অজস্র খুনের গল্প। অজস্র মারামের ইতিহাস। অন্ধর মা যে যে বাড়িতে কাজ করে তার একটা বাড়ির ছেলেও মরে গিয়েছিল এভাবে।

মাস্টার পড়ে চলেছিল—

পুলিশকে কর্তব্য না করতে প্ররোচিত করা! হয়। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন। আমাদের গেন্ড্রিকলের ছোট কোরানিবাবু বলছিলেন— হ্যাঁ, ঠিকই করেছে বাটো ইন্দিরা। কার মেয়ে দেখতে হবে তো!

ট্রেনগুলো এখন কেমন রাইট টাইমে চলেছে? কোনও ট্রেন দু'মিনিট এক মিনিট লেট পাবে না। ড্রাইভাররা সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকবে, এখন সেরি হয়ে যায় আর তাদের চাকরিটি শেষ হয়। এই আমাদের দেশ। এই আমাদের নাগরিক। এরা প্ররোচিত করছে পুলিশকে কর্তব্য না করার জন্য।

এক পাতা পড়া হয়ে গেছে। এক পাতার বেশি পড়ে না মাস্টার। বলে, 'তোমার অগাধ দুকণে না।' যে-পাতাটা কাল পড়েছিল, সেটাই কি মগজে ঢুকেছিল অঙ্ক? ইন্দিরা গভীরে সে জানে। এই বস্তির কে-ই বা জানে না! ইন্দিরা আছেন বলেই এ দেশে মানুষ বেঁচে-বড়ে আছে এমন ধারণা ছিল সকলের। কিন্তু মাস্টার বলেছে, এখন আর ইন্দিরার জমানা নেই। সাধারণ মানুষ ঠিকই বুঝেছে, গণতন্ত্র ক্ষমতার অপব্যবহার ক্ষমা করে না। এত কিছু কোরলি অঙ্ক। সে শুধু এটুকু বুঝেছে, ইন্দিরা থাকতেও তারা যেমন আধপেটা খেয়েছে, ভাতা ঘরে খেয়েছে এখন ইন্দিরা না থাকলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি।

মাস্টারের বাড়ি ছাড়িয়ে আজ বানিকটা এগিয়ে গেল অঙ্ক। ওপাশে একটা গুলামোহর গাছ আছে। সেটা পোরোলেই বেলিদিদের বাড়ি। ওদিক থেকে একটা নতুন গন্ধ আসছে। নতুন লোকের গন্ধ। নতুন জিনিসের গন্ধ। ওই বাড়িটার আগে কমলমণি থাকত। সে নাকি বাবু ধরে কোথায় চলে গেছে। এখানে অনেক মেয়েই বাবু ধরে চলে যায়। বাবুদের কোথায় ধরা যায় অঙ্ক জানে না। তবে কেউ বাবু ধরলে মা-মাসিরা খুব গল্প করে তাকে নিয়ে। বাবু ধরা খারাপ না ভাল অঙ্ক জানে না। একদিন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করেছিল। মাস্টার বলেছিল— ভাল না খারাপ আমিও জানি না। তবে বাবু না ধরে আরও অন্যান্য কাজ করার সুযোগ তাদের নিশ্চয়ই ছিল না। বেঁচে থাকার তাগিদটা অনেকটা পেটের নিদের মতো, বুঝলি রে অঙ্ক। কিছু মানে না। স্থল-কাল মানে না। বাসি-পাচা মানে না। বুড়ুকু মানুষ থাকার পেনেই খেয়ে নিতে চায় হালুম-হলুম। জীবনের জন্যও মানুষের এমনই কাঙালিপনা। অঙ্ক, কী কলব রে অঙ্ক, কাঙাল তুই হতে পারিস, একমাত্র ভালবাসার জন্য। অন্য সব কাঙালিপনা মানুষকে আর মানুষ রাখে না। শরীর করে দেয়। শরীর নামের যন্ত্র। সেহ নামের প্রাণী। সেই থেকে অঙ্ক ঠিক করেছে সে কাঙাল হবে না। সেহ-প্রাণী, শরীর-যন্ত্র হবে না। তা হলে সে কী হবে। সে জানে না। গন্ধ শুঁকে অতীত, গন্ধ শুঁকে ভবিষ্যৎ—এই অঙ্কর কীর্তি। এই অঙ্কর বর্তমান। তবুও সে জানে না সে কী হবে। কী হওয়া যায় এই চক্ষু দু'টি বিনা। তাই, দ্রাণশক্তির জোরে দিনযাপন করতে করতে সে বেলিদির বাড়ির দিকে হাটে।

কমলমণির ওই ঘরটাও বেলিদিদের। এখানে অনেক ঘরই বেলিদিদের। আজ সেখান থেকে নতুন গন্ধ আসছে। অঙ্ক সেদিকে চলেছে। কার গন্ধ? কীসের গন্ধ? জানা চাই। বেলিদি ডাকছে— ও অঙ্ক! যাস কই?

অঙ্ক দাঁড়াচ্ছে। কোমল চিকন মুখ। রোগা লম্বাটে চেহারা। মুখের মধ্যে সাদা গোলকের ওপর ঘোলাটে দু'টি মণি। অঙ্কর চোখ। সেই চোখ বেলিদির দিকে নিবন্ধ করেছে সে। নতুন শাড়ির গন্ধ লগল নাকে। অঙ্ক বলল— নতুন শাড়ি পরেছ, বেলিদি।

—হ্যাঁ। পরছি। বাবা আনছে। ভাল না?

—ভাল। তোমাদের ফাঁকা ঘরটায় কে এল বেলিদি?

বেলি অঙ্কর কাছাকাছি এসেছে। এক হাতে অঙ্কর কান চেপে ধরে মুখটা নিম্নের বুক বরাবর টেনে নিয়ে বলছে— কে আসছে জানিস? জানিস?

অঙ্কর ঘ্রানের পৃথিবী টলে যাচ্ছে। বেলিদির বুকের গন্ধ কী ঝাঁকাল। সে সহ্য করতে পারছে না। বলছে— ছাড়ো। বেলিদি। লাগে।

বেলিদি ছাড়ছে না। অঙ্ককে শত্রু করে ধরে আছে তো আছেই। আর তার কানের কাছে মুখ এনে বলছে— বস্তিতে উদ্ধরলোক আসল রে অঙ্ক। উদ্ধরলোক আসল।





এটুকু করতে পেরেছে মাস্টার। এই সামান্য পরিচ্ছন্নতাবোধ এনে দিতে পেরেছে এখানে। কিন্তু সহজ সভ্য মানুষ-জীবন বাপনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। যদিও বস্ত্রের মানুষেরা মানুষই যে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ মানবতার পরিচয় তাদের হৃদয়বিকাশে জৈবিক বোধের চেয়ে একটু ওপরে।

বাচ্চারা আগে যেখানে-সেখানে বসে বাহ্যি করত, সেটা বন্ধ হয়েছে। অন্ধর নিজেরই মনে আছে সে কতদিন ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে বাহ্যি বসত। তার দেখাদেখি বেলি বা টেপি বা কেউ চলে আসত আর বসে পড়ত পাশে। উক্তি মারত—‘দেখি তর কতখানি হইল।’

বেশির ভাগই বস্ত্রা নিয়ে ঘেরা, চারখানা বাঁশের ওপর টিনের টুকরো গুঁজে, কাঠের পাটাতন গুঁজে, কোনওমতে কাজ চালাতো। তবু, বাস্তার ধারে, এর-ওর ঘরের খাঁজে বাহ্যি করতে নেই, এটুকু বোধ জাগ্রত হওয়ায় বস্ত্রটিকে আর ততখানি বস্ত্রি লাগে না, বদলে তা কয়েকশো গরিব লোকের বসতি হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু ফটিক বিলের তলা থেকে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী গন্ধ ভেসে আসে। এত লোকের এত ময়লা, এত গরল জমে জমে জল পড়ে যায়। কোনওদিন হয়তো-বা ঘন হতে হতে, ভারী হতে হতে, বাতাস বইবে যখন, জলে আর একটুও ঢেউ খেলবে না। ফটিক বিলের সব জল থকথকে কাদা হয়ে যাবে। এখনও এই জলেই কাপড়জামা কাচে সবাই। শুধু খাবার জল মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার কল থেকে ভরে আনে। বস্ত্রিতে দু’টো-তিনটে কলের জন্য, টিউকল হলেও আপত্তি ছিল না, এ মর্মে আবেদন জানাতে লোকজনকে একমত করিয়েছিল মাস্টার। আর মাথুরের গড় নাগরিক কমিটির কাছে আবেদন পেশ করেছিল যাতে তারা মিউনিসিপ্যালিটিকে চাপ দেন। এসব কাজে মাস্টার কখনও নিজে সামনে আসেনি। মাস্টার সম্পর্কে দু’চার কথা মাথুরের গড়ের মানুষ শুনেছে বটে, যে, বস্ত্রিতে আছে একজন মানুষ— যার প্যাটে বিদ্যা আসে— কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো কিছু ঘটেনি। অল্প ছাড়া তেমন ভাল করে কেউ জানেই না যে মাস্টারের আশ্চর্য সমস্ত ডায়রি আছে। আর মাস্টার নিজে একজন মাস্টার নয়, সে ক্রমশ ইতিহাস হয়ে উঠছে, ধারণা করছে সমস্ত ঘটনার ক্রম। এবং মাস্টারও, কোনও কিছু বোঝাবার কালে, বস্ত্রিবাসীর কাছে কোনও নেতৃত্বসুলভ স্বর এগিয়ে আনে না, সম্ভবত সে-কমতাও তার নেই, সে শুধু কখনও কখনও চণ্ডীর বাংলার ঠেকে বসে। খায়ও দু’-এক গেলাস। আর খায় বলেই নিতাই, হেমন্ত, মাধব, স্বপন, আজিজুল, মুন্না, কামেশ কোনও সমস্যা উত্থাপন করলে সাড়া দেয় এবং তার সমাধানে সম্মতি জ্ঞাপন করে। মাস্টার যদি গলা কাপিয়ে চোঁচাত— ‘বন্ধুগণ, আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, আমাদের এই বস্ত্রিত জীবন, যাতে একটা পানীয় জলের কল পর্যন্ত নেই, নোংরা জলে জামাকাপড় কেচে আমাদের শরীর খোশ-পাঁচরায় ভরে যাচ্ছে, আর এই সরকার, যারা ভোটের আগে অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং পালন করেনি, এই অকর্মণ্য মিথ্যাচারী সরকার, যারা আমাদের এই দারিদ্র ও বস্ত্রিত জীবনবাপনের জন্য দায়ী... ..’ তাহলে কেউ তার কথা শুনত না। সে বরং দু’গেলাস যেনো খায় আর উবু হয়ে চার-পাঁচজনের মধ্যে বসে। সে যে লিখতে-পড়তে পারে এবং ইতিহাস হয়ে যায় সে-সম্পর্কে কোনও অভিমান মনে রাখে না এবং বলতে শুরু করে— ‘তা হলে, আমাদের যদি বস্ত্রিতেই



দুই-তিনটা কল হয় তো ভাল।'

অনিবার্য উত্তর আসে— বস্তিতে? কল? হবে না। আমাদের কিছুই হবে না।

মাস্টারকে বলতে হয়— চেষ্টা করতে হবে।

—কেউ চেষ্টা করবে না।

—খুঁ, মল্লিনাথ ডাক্তারকে বলো তেমন। স্বপ্ন, তোমার মা ডাক্তারের বাড়ি রান্না করে তো।

—হ।

—সে বলুক ডাক্তারকে। পরলে দু'চারজন যাক। ন্যায়িক কমিটিতে বলে।

এটুকুই করে মাস্টার। রোজই করে। এটুকুই করতে করতে একদিন কারও মুখে শোনা যায়— আজ বলছিলাম। ডাক্তার বলে, আমি তো আর ওর মতো নাই। বিবাক্ষ রে বলে।

—গেছিল বিবাক্ষের কামে?

—গ্যালাম। বলে কল বসানো মিউনিসিপ্যালিটির কাজ। পাটি ধরো।

—কোন পাটি?

মাস্টার ঘন্থে পড়ে যায়। এখন মাথুরের গড়ে পাটি ধরা শক্ত। এই এলাকায় কংগ্রেস সক্রিয়। কিছু রাজ্য জুরে বাম জেটি এসে যাওয়ায় বামেরাও এখানে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ইঠাং তার মনে হয়, শুধু শুধুই ভাবছে। বস্তির জনসংখ্যা কম নয়। মিউনিসিপ্যালিটির ভোটে সংখ্যাটা বেশ গুরুত্ব পাবে। কংগ্রেস ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চাইবে আর সি পি এম ক্ষমতা পেতে চাইবে। যে দলকেই বলা যাক, কাজটা করার চেষ্টা হবে।

মাস্টার ঠেলে, বস্তির লোক একটু এগোয়। মাস্টার আবার ঠেলে। বস্তির লোক ঠেলা নেয় কারণ মাস্টার পড়ে, লেখে। মাস্টারের হাত এখানে থাকার কথা না। কেন থাকে তবু? জিজ্ঞাসা করলে বলে— 'থাকি, থাকতে হবে তো কোথাও।'

দু'একজন নিজে থেকে আরও একটু ভাল জায়গায় আরও একটু ভাল বাসা খুঁজে দিতে চেয়েছে মাস্টারকে। মাথুরের গড়ে না হোক, অন্তত উদ্বাস্তু কলোনিতে। মাস্টার বলেছে— কোনও নরকার নেই। আমার জন্য ভাল বাসা খুঁজো না। তোমাদের জন্য খোঁজো। তবে তোমরা বুঝবে যে এই বস্তিতে তোমাদেরও থাকার কথা নয়?'

এখন মাস্টার সবার একজন হয়ে গেছে। তিন-চার বছর আগেও যখন খুব খুন-খারাবি হচ্ছিল, পটিপট গুলি-গোলা চমকছিল, লাশ পড়ছিল তখন অনেকেই ভেবেছিল মাস্টারও ওই নকশাল দলের কেউ। কিন্তু মাস্টার কোনওদিন ও সবে যায়নি। মাস্টার যেন খানিকটা হাওয়ার মতো। সবচেয়েই আছে। আবার কোনও কিছুতে নেই।

ইতিহাসের মতোও। অগছেও, আবার নেইও।

মাস্টার শুনেছে ফর্মিমিঞ্জির বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে। অন্ধ বলছিল— তারা সব ভদ্রমনোক।

—'নোক না, লোক।' শুধরে দিয়েছিল মাস্টার। অন্ধ গড় গড় করে বলে যাচ্ছিল, 'চারজন বুঝলে? বাবা-মা দুজনে ছেলো। ছোট্টা দুখের শিশু। বড়টা বেশ। বুঝলে? ইস্কুলে যায়।'

এ পর্যন্ত বলে চুপ করে ছিল কিছুক্ষণ। মাস্টার তখন শাট গলচ্ছিল। চুল আঁচড়াচ্ছিল। রাস্তার কলে ঘন করে এসেছে কিছুক্ষণ আগে।

জানের প্রসঙ্গে এসে মাস্টার বস্তিজীবনের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মেলাতে পারেনি। এখানে সবাই, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, জান করে নেয় ফটিকবিলের জালে। মাস্টার পারে না। কিছুতেই পারে না। সে কলের পাড়ে যায়। অপেক্ষা করে। অনেক সময় জান করার আগেই জল চলে যায়। মাস্টার তখন হাঁটতে থাকে। মরণব্রিজের তলা দিয়ে ঘুরপথে কামারহাটির দিকে যায়। বি টি

রোড দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার হেটে গেলে একটা টিউকল পড়ে। সেইখানে স্বন-সেরে আসে। অন্ধও মাঝে মাঝে তার সঙ্গে যায়। মাস্টারের সঙ্গে থেকে অন্ধর কথা বদলে গেছে। ভাবনা আলাদা হয়ে গেছে। মাস্টার জানে অন্ধর খুব ভুলে পড়ার ইচ্ছা।

অন্ধ চুপ করে আছে দেখে মাস্টার বলেছিল— 'ভাল তো। ও কলো যা-যা পড়ে সেইগুলো তুই শুনে শুনে শিখে নিবি।'

তবু কথা বলছিল না অন্ধ। মাস্টার তাড়া দিয়েছিল— 'কি রে? যা বলবি বলে ফেল। আমাকে যেতে হবে। মালিকের বড় অর্ডার এসেছে। প্রচুর কাজ। তাড়াতাহি যেতে হবে।'

অন্ধ বলেছিল— 'ওর নাম পলাশ। ওর বাবাটা খারাপ মাস্টারবাবা, খুব খারাপ।'

—কী করে বুঝলি?

—আমি ওর বাবার গায়ে শয়তানির গন্ধ পেয়েছি।

মাস্টার জানে, অন্ধ সব রকম গল্প পায়। সেইসব গল্প কখনও মিথ্যে বলে না। হতে পারে লোকটা খারাপ। অন্ধকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মাস্টার। ঘরে তালা দিল। এ ঘর, বর্শ কেটে যে-কেউই সব চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। তবু লোকে তালা দেয়। সামলে রাখতে চায় সামান্য জিনিসপত্র।

অন্ধ মাস্টারের সঙ্গে এগোতে এগোতে বলল— 'রাত্রে পলাশকে তোমার কাছে নিয়ে আসব কেমন? গল্প শোনাবে, কেমন?'

মাস্টার এক মুহূর্ত দাঁড়াল। তারপর বলল— 'হ্যাঁ, গল্প বলব। কিন্তু ডায়রির খোঁটা আর কারও সামনে খেলব না অন্ধ। ওটাতে শুধু তুই আর আমি।'

আমনে উজ্জ্বল দেখাল অন্ধর মুখ। সে তো জানে মাস্টার লেখা-পড়া কত ভালবাসে। তার একটু ভয় ভয় করছিল সত্যল থেকে। এখানে অন্য সব ছেলেরা অন্ধের মতোই। ইচ্ছুলে যায় না। ঘুরে বেড়ায়। ইচ্ছুলে ভর্তি করে দিলেও যায় না। কিন্তু পলাশ আলাদা। সে নিয়মিত ইচ্ছুলে যায়। পড়ে। অন্ধ দু'-একটা কথা বলে বুকে গেছে পলাশের গন্ধ আলাদা। ও ভদ্রলোক। অনেকটা মাস্টারের মতোই কি নয়? পলাশকে পেলে মাস্টার কি অন্ধকে ভুলে যাবে? না, আর সে ভয় নেই। পলাশ তো মাত্র এসেছে। নতুন। আর অন্ধ তো মাস্টারের সেই কবোকার বন্ধু। কতদিন আগেকার।

অন্ধর মুখের রং নজরে পড়ল মাস্টারের। সে হাসল। গরিব, অসংস্কৃত, অশিক্ষিত, অন্ধ— তবু কত গভীর অনুভূতি ছেলোটার। অন্ধের মাথাটা নেড়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল সে। অন্ধ পায়ে পায়ে চলল পলাশের বাড়ির দিকে। কিন্তু বাড়ির কাছে এসে আর চুকতে সাহস পেল না। ভদ্র লোক। যদি তাড়িয়ে দেয়? পলাশই দেখতে পেল অন্ধকে। বেরিয়ে এসে বলল— 'তোমাগো এইখানে স্নান করে কুনখানে গো?'

বিড়ির গন্ধ পেল অন্ধ। শয়তানির গন্ধও পেল। পলাশের বাবা নিশ্চয়ই এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। শিশুর কান্না শোনা যাচ্ছে। পলাশের ভাই। শুধু পলাশের মায়ের কোনও সাড়াশব্দ নেই। অন্ধ বলল— 'ওই তো, ওই বিলেই স্নান করে সবাই।'

—বিলে?

পলাশ চুপ করে যায়। কালো জল। মাঝে মাঝে ড্যাপসা গন্ধ উঠছে। সার সার খাটা পায়খানা জলের ওপর। পলাশের গা দিনদিন করছে। এই জলে তাকে স্নান করতে হবে? সে দেখার চেষ্টা করছে, স্নানের ঘাট বস্তি থেকে অল্প দূরে। ও দিকে কোনও পায়খানা নেই বটে। বেশ ক'জন স্নানও করছে। কাপড়ও কাচছে। কিন্তু একই তো জল। পলাশ কথা বলছেন না দেখে ফের নিজেই কথা বলে অন্ধ— 'আমি বিলে করি না।'

সে ভাবছে বিলে স্নান করে বলে কি পলাশ ওকে পছন্দ করবে না?

অন্ধ মনে মনে পলাশকে পছন্দ করে বসে আছে কারণ সে ঝুলে যায়।

পলাশ বলছে—কুনখানে করো?

অন্ধ মাস্টার হয়ে যাচ্ছে। পলাশের ভাষা শুধরে দেবার অঙ্গন ইচ্ছে কাপছে তার। বলছে—  
বলো, কোথায় করো?

পলাশ হাসছে। বলছে—কোথায় করো?

—ওই জলে, হাত দিয়ে দেখাচ্ছে অন্ধ। বাস্তব-বীকে দেখাচ্ছে।

পলাশ বলছে—আমারে নিয়া যাইবা?

—নিয়ে যাবে?

—নিয়ে যাবে? আমাকে?

কে কাকে স্নান করিয়ে দেবে তা নির্ধারিত থাকছে না। কে কাকে ডাক দেবে, বলবে, চলো  
নেয়ে আসি আর নাওয়া হলে কে যে বলবে—নাও, দুটি খেয়ে নাও, বেলা হল... এ সব  
কোথাও নির্দিষ্ট নেই। মানুষে মানুষে এইসব ঘটে। চেনা-জানা না হলেও চলে। অন্ধে-বন্ধিরে  
অটিকায় না। শুধু ঘটে। স্নান করো। ভাত খাও। জিরিয়ে নাও দুপুরটায়।

চক্ষুস্থান পলাশকে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধ। রাস্তার কলো। তারা কথা বলছে। অন্ধ  
পলাশকে মাস্টারের কথা শোনাচ্ছে। মাস্টার কত অশ্রু মানুষ তা বোঝাচ্ছে। কিন্তু বলে দিচ্ছে  
না যে মাস্টার একজন ইতিহাস আর সেও ইতিহাস হতে চায়। সে মাস্টারের পরিচ্ছন্নতার কথা  
বলছে, গাছের ভাঙারের কথা বলছে। আর জানাচ্ছে, মিউনিসিপালিটি টিউকল করে দিলে  
আর ভাবনা নেই। তখন আর ফটিকের বিলে কারওকে জামাকাপড় কাচতে হবে না। স্নান  
করতে হবে না। মাস্টারকেও হেঁটে হেঁটে কামারহাটি যেতে হবে না।

কলে তখনও সন্ধ্যা হয়ে জল পড়ছিল। মাখামাখি করে স্নান করে নিল দু'জনে। পলাশ ইকুলে  
যাবে। অন্ধ আরও ঘুরে বেড়াবে খানিক। তারপর ঘরে ঢুকে পড়বে। ঠাকমা আজ কী রান্না  
করেছে কে জানে। মা দুপুরে আসতে পারবে না। মা যেখানে কাজ করে সেখানে বিয়ে  
লেগেছে। সারা দিন মাকে থাকতে হবে। বাতাসে বিয়ের গন্ধ পাচ্ছিল অন্ধ। হঠাৎ জমা রক্তের  
বন গন্ধ ছুটে এল। সে ঘরের দিকে পা চালাল। এ গন্ধ সে চেনে। এ হল বাবার বমির গন্ধ।  
মাঝে মাঝে কাশতে কাশতে রক্তবমি করে বাবা। অন্ধ জানে ডাক্তার বলে দিয়েছে এটা টিবি  
না। বাবার পেটে ঘা হয়েছে। আর সারবে না। খুব কষ্ট পাচ্ছে বাবা। মরে যাবে যে-কোনওদিন।  
অন্ধর মা সন্তোষী মার পূজা করছে। ভগবানই একমাত্র অন্ধর বাবাকে সারিয়ে তুলতে পারে।  
আর কেউ নয়।

সন্ধ্যাবেলা অন্ধর মা, কালীতারা, বেলি, বেলির মা অঞ্জলি, টেপির মা, ময়না সব দল বেঁধে  
এল রাসিকাকে দেখতে। আজকেই উপযুক্ত সময় কারণ কাল থেকে একেবারে বিবাহের দিন  
পড়ে যাচ্ছে। যাদের মূল বাড়িতে বিবাহ তাদের তো কদিন ধরেই ব্যস্ততা চলছে। কাল থেকে  
আর কথা কওয়ার সময় থাকবে না। যাদের মূল বাড়িতে বিবাহ নেই তারাও চার-পাঁচদিনের  
জনা বিয়েবাড়িতে ঠিকে কাজ নেবে। বেশ কয়েকটা বিয়ে লেগে গেল মাথুরের গড়ে। এর  
ছেলে, ওর ভাই, তার দেবর। আর শুধু মাথুরের গড় কেন, সারা কলকাতাতেই বিয়ে-বিয়ে ভাব  
জেগেছে। ফটিকবিল বস্তিতে এবারে কেউ বিয়ে করছে না অবশ্য তবে বরের গাড়ি চলেছে তো  
চলেছেই রাস্তা দিয়ে। ধূল দিয়ে সাজানো গাড়িতে টোপার পরা বর। আজ একা যাচ্ছে। কাল  
কউ নিয়ে ফিরছে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় উকি দিচ্ছে মানুষ—দেখি তো, কনে-বউকে  
কেমন দেখতে। কাজ করার কথা নয়, শুধু অন্ধর বাবা চাইছে, মালিকের কাছ থেকে রিকশা  
নিয়ে যদি একটু চালিয়ে নেওয়া যেত, দু'পয়সা হত। এই বিয়ের মরসুমে, যাদের গাড়ি সাজাবার  
পয়সা নেই তারা রিকশা সাজিয়ে বিয়ে করতে যায়। অন্ধর মা তাকে যেতে দেখনি। বলেছে—  
'আগে সারো।' আর সারা। দীর্ঘশ্বাস পড়েছে অন্ধর বাবার। এই তো কদিন আগেও দিবা

রিকশা চালিয়েছে। হঠাৎ শরীরটা বসে গেল। একা অন্ধর মা'র ওপর ছায়াটি পেরে। বেচারি কি পারে? বাড়ির পর বাড়ি বাড়িচ্ছে। ভোরবেলা ছুটে যায়। সারা দিন পাটবাড়ির বাসন মেছে, কাপড় কেচে, ঘর মুছে সন্ধ্যাবেলা হা-হুসাস হয়ে ফেরে। অন্ধর বাবা জানে, ও ও অসুখে পড়লে কোনওদিন, তখন সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। অদ্ভুত একচোখোমি স্বপ্নের। তিন-তিনটে মেয়ের পর ছেলে দিলেন তো দিলেন অন্ধ করে। অন্ধ ছেলে, সে আর বাপ-মায়ের কী কাজে লাগবে। অন্ধর মা বলে— 'হউক অন্ধ। পোলা তো।' মায়ের প্রাণ একেই বলে। সারা দিন টাট-টাই করে ঘোরে ছেলেটা। আর মাস্টারের কাছে পড়ে থাকে। মাস্টারের তো চালচুলো নেই। অন্ধর বাবার গভীর বিশ্বাস, মাস্টার শেষ পর্যন্ত অন্ধর জন্য একটা কিছু করে দেবে। অন্ধর বাবা শুয়ে থাকে সারা দিন। প্যাটে বড় ছালা-যন্তমা। যন্ত্রণা সয়। আর-আরো ভাবার সুস্থ ছোটবেলা থেকে বয়ে আসছে সে। রিকশা স্ট্যান্ডে যখন কোনও যাত্রী নেই, অনাবা গুলতানি করছে, আর অন্ধর বাবা ভাবছে। এই পুজো গেল, তখনও অন্ধর বাবা ভেবেছিল। তার ধারণা ছিল কমিনিস্ট পার্টি এলে পুজো-টুজো উঠে যাবে কলকাতা থেকে। সে তো হল না। কোনও পরিবর্তনই চোখে পড়ল না। শুধু ভোটের দিন কতই না মারামারি হল আর তারা গিয়ে দেখল সব ভোট শেষ। সে ঠিক করেছিল ভোটটা এবার কমিনিস্ট পার্টিকে দেবে। অন্ধর মাকেও তেমন শিখিয়েছিল। কিন্তু দিতে পারল না। এই ভোটের তিন মাস আগে আর একটা ভোট হল। সে-দিনও একই হল। কী দাপাদাপি। কী দৌড়াদৌড়ি! এ ওকে তাড়া করে, সে তার টুটি কামড়ায়। ভোট দেবার আগেই ভোট খতম। যদিও কমিনিস্ট রাজ এসেই গেল তবু কোথাও কোনও পরিবর্তন নেই দেশে। অন্ধর বাবা হতাশ। অন্ধর বাবা তো অন্ধ নয়। সে দেখেছে অনেক। একজনকে তাড়া করছে পাঁচজন, গলি থেকে উঠে আসছে চিংকার, লাশ পড়ে আছে গঙ্গার ধারে, বড় নরমায়, পুলিশের গাড়ি ঘুরছে, খুঁজছে, চক্রাকারে, ধীরে, যেন বাজ নামছে বিরাট আকাশ থেকে মুরগিছানা ছোঁ মারবে বলে। সে ঘরে ঘরে মায়েরের কান্না শুনেছে। বাবাকে ভাইকে জড়াজড়ি করে গুমরাতে দেখেছে। দেখেছে আর ভেবেছে। গুণামি মোটেও ভাল নয়। তা সে যেই করুক। তার গুলিয়ে গেছে। কে গুণা দমন করছে আর কে গুণা হিসেবে মাথা তুলছে। ফলত, সে একটা পরিবর্তন চেয়েছিল। আর কিছু নয়। পরিবর্তন একটাই, তেমন করে, সকালে বিড়েকুলের মতো আর টুপটাপ লাশ পড়ছে না। পড়লেও চোরাগোষ্ঠা। জানছে না অন্ধর বাবা। এখন, এই বিবাহের মরসুমে তার মনে হচ্ছে, যত বাঁশি বাজার কথা ছিল, যতগুলি বরের গাড়ি যাওয়ার কথা ছিল তা আর হল কোথায়? এ বছর বিবাহযোগ্য হয়ে উঠত যে-সব তরুণরা, তারা তো বেশির ভাগই মরে গেল।

তবু, ঝরে পড়ে যা থাকে, কম কি? কাল থেকে বস্ত্রি বৌটিয়ে সব বিয়ের কাজে নামবে। তার আগে রাধিকার সঙ্গে কথা বলতে আসা। কার্তিক মেয়ের দল দেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সবার আগে বেলির মা অঞ্জলি, পিছনে আর সব উঁকি দিচ্ছে। অন্ধর মা ফিসফিস করে বলছে— শুনছি ভদ্রলোক।

অঞ্জলি বলছে— বো। এইখানে আসছে। আমরা যা, অরাও তাই। তারা ফিসফিস করছে। রাধিকা বিছানার ওপর ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। পলাশও মার গা ঘেঁষে বসে আছে। এইখানে লাইট জ্বলে না। আগের দিনই তারা জেনে গেছে। লঠন জ্বলছে ঘরে। ঘরময় শুধু বিছানা। আলনটা কোনও মতে ঢেকানো গেছে। ইট দিয়ে উঁচু করা হয়েছে চৌকিখানা। তার তলায় মেঝে ঢুকে গেছে। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঝিল থেকে উঠে আসছে তীব্র হাওয়া। ঠাণ্ডা। কটু গন্ধে ভারী। রাধিকা ভাবছে, এটাকে তো দেওয়াল বলে না। তাদের ঝিলপাটনি গায়ে মাটির দেওয়াল ছিল। তবু সে দেওয়ালই ছিল। এখানে শুধু বেড়া। ছোট ছোট অন্ধর ফুটো। আবর নেই। আড়াল নেই। রাধিকা ভাবছে, তার আর চার দেওয়াল রইল না। চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ কী দেয় মানুষকে, শুধুই নিরাপত্তা, নাকি আরও কিছু? একটা স্বপ্নের খোর, একটা একাকী

পৃথিবী এবং অন্যদের পৃথিবী থেকে নিজেকে আগলে আঁকড়ান রাখা। কারণ, কখন বেরিয়ে আসবে নিহিত আবেগমঞ্জরী আর অন্যদের দ্বারা উপহাসিত হবে—সে বড় লজ্জার, সে বড় কষ্টের। নিজের আবেগকে-অভিমানকে অন্যের হাতে নিপীড়িত হতে দেয়া বড় মজ্জনার।

শুন লো রাজার ঝি।

লোকে না বলিবে কী?

লোকে বলে। শুধু বলে। নানা কথা। বোঝে না—কেন বুঝে ওর। জানতে চায় না—কেন ইচ্ছা ওর। লোক, সব সময়ই, প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানুষের বিরুদ্ধে এক-একটি প্রতিজ্ঞা। এবং রাধিকা, আডাল হারানো মেয়ে। তার চোখ চলে যাচ্ছে বাইরের দিকে। সে দেখতে পাচ্ছে দুয়ারে অন্ধকার জুড়ে আরও অন্ধকার ভাসা ভাসা দূর। অজলি করছে—আমরা সব আসলাম, তোমার সঙ্গে দুইটা কথা কইতে।

রাধিকা নড়েচড়ে বসছে—আসেন। বসেন।

সে বলছে না—“আহেন। বয়েন।” বলছে, আসেন, বসেন। তারও ভাষা মিশ্রিত হচ্ছে। সে জানে না। সে দেখছে। ক্ষমা ক্ষমা চেহারা, আধময়লা শাড়ি, উলুঝুলু চুল—একদল মেয়েমানুষ। বিছানা ছাড়া বসতে দেবার জায়গা নেই অথচ তারা বসবে এ ঘেন রাধিকা মানতে পারছে না। সে তাড়াতাড়ি, যাতে বিছানার শুচি রক্ষা হয়, পলাশকে বলতে চাইছে—পলাশ পাটি পাত... পলাশ তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ থেকে পাটি আনছে। তাকে বিছানার নীচে নামতে হচ্ছে না। বিছানার প্রান্তে গিয়ে হাত বাড়ালেই সব পেয়ে যাচ্ছে। সে পাটি পেতে টান টান করছে। সমান করছে। ভাবছে, এটাই তাহলে এখন তাদের মেঝে। এই বিছানাটা। কারণ, এতকাল মাটিতে পাটি পাতা হত। মেয়ের দল পাটিতে জাঁকিয়ে বসছে। রাধিকা কী বলবে বুঝে পারছে না। তার অল্প অল্প অভিমান হচ্ছে। সে ভেবেছিল, বিকেলে শেফালির মা ছুটে আসবে, আসেনি। যদিও শেফালির মা বলেছিল, ‘দিদিমণির বাড়ি বিয়া, না মিটাইলে তর কাসে যাইতে শাক্‌ম না।’ তবু রাধিকার মনে হয়েছিল, এরকম বললেও, শেফালির মা ঠিকই আসবে। রাধিকাকে দেখার জন্য, জোছনকে ছোঁওয়ার জন্য তার মন কেমন করবে। এখন শেফালির মার বদলে এরা এসেছে। সে কী করে। কী বলে। তাকে কিছু বলতে হল না। প্রশ্ন নামছে একের পর এক। সে উত্তর করছে। কোথায় গা, কোথায় ঘর। কী জাত। একজন বলছে—‘বর তো বুড়া। এমন সোন্দর মাইয়ার লগে এমন বুড়া বরের বিয়া দিল কান বাপ-মায়?’

রাধিকার গলা ভার হয়ে আসছে। চোখে জল আসছে। সে চুপ করে আছে। কাল রাতে বস্তিতে খুব চিংকার ছুজ্জাতি হয়েছে। সে ভেবেছিল এ এক মায়ামমতাহীন নির্দয় নোংরা জায়গা। এখন এদের সঙ্গে কথা বলে তার খারাপ লাগছে না। শুধু একটু গা ঘিন ঘিন ভাব। একটু নোংরা। অপরিচ্ছন্ন।

অন্ধর মা এবার মোক্ষম প্রশ্ন করছে—শ্যেফালির মায়েরে চেন নি? তুমি তাগো লগেই আসিলা না? অ্যাক বাড়িতৈ না থাকতা?

রাধিকা চমকে তাকান্ছে। এই বউটা শেফালির মাকে চেনে। তার মন আনন্দে ভরে যাচ্ছে। যেন দূরদেশ থেকে বাপের বাড়ির সংবাদ এনেছে এক পরিচিত ফেরিওয়াল। সে ভেবেছিল, শেফালির মা এখন বহু দূরদেশের হয়ে গিয়েছে। যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু এই বউটা শেফালির মাকে চেনে। তার মনে হচ্ছে, এই বস্তি ততটা অজানা নয়। ততটা বিদেশ নয়। সে বলছে—আপনে চিনেন?

—হ। চিনুম না? হ্যাং ইশকুলের কামডা করে। আমি ইশকুলের দিদিমণির ঘরের কামডা করি। চিনুম না কান?

ভাব হচ্ছে ক্রমশ। ওলো সই-ওলো সই হচ্ছে। রাধিকা আড় ভাঙছে। আর বাইরে অন্ধর গলা পাওয়া যাচ্ছে—পলাশ! পলাশ!



পলাশ চুপ করে শুনছিল সব কথা। বুড়ার লগে বিয়া দিলে। তার বাবা বুড়া। মা বুড়া না। এক যৌবনবতীর সঙ্গে প্রায় বৃদ্ধের অপমিশ্রণের সাংঘাতিক প্রতিফল। সে জানে না। তবু ভাবছে। এবং ভাবনা অনা দিকে চলে যাচ্ছে। অন্ধর দিকে। সে এবার অন্ধর গলা পাচ্ছে। অন্ধ বলেছিল ওর মাস্টারের কাছে নিয়ে যাবে। সে মা'র মুখের দিকে দেখছে— যাদু? মা?

—অখন? এই রাইতে কই যাবা?

—অন্ধ ডাকতেয়াসে।

—এমুন অন্ধকার। ঠাণ্ডা। অখন কই যাবা পলাশ?

অন্ধর মা বলছে— হ। আমার অন্ধর লগে মাস্টারের কাসে যাইব। বাড়িক। ছাইকা দ্যাও। মাস্টারের কাসে গ্যালে তোমার পোলার ক্ষতি হইব না।

রাধিকা কথা বলছে না। পলাশ বিছানা থেকে লাফিয়ে নামছে— যাই-ই-ই।

রাধিকা চুপ করে আছে। এটা-সেটা কথা চলছে মাঝে মাঝে। আর অন্ধ পল্ল্যশব্দ নিয়ে যাচ্ছে মাস্টারের কাছে। পলাশ বলছে— বেশিক্ষণ না। ফিরা পড়তে হইব। নাইলে মায় রোগ করব।

—ঠিক আছে।

অন্ধ পলাশের হাত ধরে মাস্টারের ঘরে ঢুকছে। পলাশ দেখছে অন্ধর মাস্টারকে। মাস্টার দেখছে পলাশকে। গোলগাল নরম বালক। বড় বড় চোখ। ফরসা রঙ। মাস্টার সে রোগা, কালো মুখ ভর্তি দাড়ি। লম্বা লম্বা কাঁধ ছোঁয়া চুল, চোখ দু'টি গর্তে। বলছে— এসো। আজ তোমাদের একটা চমৎকার গল্প শোনাব।

তারা দু'জন বিছানায় সার বেঁধে বসে পড়ছে। পলাশের গা ছম ছম করছে। শীতও করছে। এখানে শীত অনেক বেশি। সে চুপ করে বসে আছে। মাস্টার বলছে— রানি জোহ্নাকুমারীর ছিল সাত ছেলে আর সাত মেয়ে। তারা সব রূপে-গুণে অসামান্য। কলা যেতে পারে, তারা ফুলের মতো। আবার বিদ্যুতের মতোও। তারা যখন গান গাইবে তখন পাখির মধুরতম স্বরও হার মেনে যাবে। আবার তারা যখন শিকার করার জন্য তির ছুঁড়বে, সেই তির, হরিণের গ্রন্থিও এঁকোড় ওঁকোড় করে চলে যাবে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রানির মনে গর্বের সীমা ছিল না। সে-দেশের রাজা সাত বছরের জন্য সাতটি দেশে বৈদেশিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে গিয়েছিলেন। রানির ওপর দেশ শাসনের ভার ছিল। রানি সে-ভার গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পালন করেননি। রাজা চলে যাবার পর থেকে দেশে দস্যু-তন্ত্রর বেড়ে গেল। অরাজকতা দেখা দিল। গরিব চাষিরা কোনও রাজসহায়তা পেল না। মন্ত্রী-আমলা সব লুটে-পুটে খেতে লাগল। সাধারণ মানুষ দাঁতে দাঁত চেপে সাত বছর পর রাজা ফিরে আসবেন এই প্রতীক্ষা করতে লাগল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জনজীবনের ঢাকা ঘুরতে লাগল। আর রানি প্রতিদিন গোলাপজলে স্নান করে, সবচেয়ে দামী গাভিতে চেপে ছেলে-মেয়ে নিয়ে হেসে-খেলে হাওয়া খেয়ে সুন্দর পোশাক পরে শিকার করে দিন কটাতে লাগলেন আর রাজ্যে ঘোষণা করলেন— আমি রানি জোহ্নাকুমারী। আমাকে দেখেই সমস্ত প্রজাকে হাঁটু মুড়ে বসে অভিবাদন জানাতে হবে। লোকেরা তাই করতে লাগল। কিন্তু এই অযোগ্য মহিলাকে বিয়ে করার জন্য রাজার কষ্টের কথা ভেবে খুব দুঃখ পেল তারা। আর তাদের নিজের দুঃখ ঘোচাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল যাতে রাজা তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। সে-দেশে সবাই চন্দ্রিমাদেবীর পূজা করত। প্রতি বছরের মতো এবারও চন্দ্রিমাদেবীর পূজার উৎসব এল। মন্দির সেজে উঠল। মেয়ে-পুরুষ সব যে খার ভাল পোশাক পরে চন্দ্রিমাদেবী আর তাঁর দুই ছেলে-মেয়ে নিশিকান্ত ও নিশিনন্দিনীর জন্য ফলমূল উপহার ধূপকাঠি নিয়ে মন্দিরে যেতে লাগল। দেবী চন্দ্রিমা শান্ত কল্যাণী প্রসন্ন সুন্দর। পাহাড়ের ওপর থেকে, পাথর ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে তিনি নিজের পূজা দেখতে লাগলেন। তাঁর মন আনন্দে পূর্ণ হল। ঠিক তখনই— বিশাল সুসজ্জিত



দামি গাড়ি চেপে রানি জোছনাকুমারী সাত পুত্র, সাত কন্যা নিয়ে মন্দিরে এলেন। সব ভক্ত দেবীর মস্ত্র উচ্চারণ করতে যাবে, বলতে যাবে— যশো দেহি, ধনং দেহি, রূপং দেহি... ..তখনই রানি বললেন— ‘খামোশ।’ তাঁর চড়া আওয়াজ, চড়া শব্দ শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি বললেন, আজ থেকে দেবী চন্দ্রিমার পূজা বন্ধ। আজ থেকে তোমরা আমার পূজা করবে। আমার মূর্তি গড়ে রাখবে বেদীতে আর আমাকে আরাধনা করবে।

প্রজারা হাঁটু মুড়ে বসে মাথা নিচু করে কাঁপতে লাগল— মালিক, দীনদুনিয়ার মালিক, তা কি হয়?

—হয়। আলবাৎ হয়।

রানির মণিমানিক বসানো চাবুক বলসে উঠল। তিনি চিৎকার করলেন— না হলে আমি অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও দেশদ্রোহের উন্মেষ দেখে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করব।

জরুরি অবস্থা! জরুরি অবস্থা! কী সাংঘাতিক। এর আগে এ দেশে দু’বার জরুরি অবস্থা চালু হয়েছিল। সবার মনে আছে সেই ভয়ঙ্কর সময়ের কথা। কতরকম কারণে মানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন আর তাদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল তার শেষ নেই। তখন অবিশ্বাসের হাওয়া বয়ে গিয়েছিল চারপাশে। গুপ্তচরে ছেয়ে গিয়েছিল। স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করত না। বোন ভাইকে বিশ্বাস করত না। শিশু কাঁদতে ভয় পেত। সুতরাং জনগণ মনে মনে চন্দ্রিমাদেবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর মূর্তি সরিয়ে রানি জোছনাকুমারীর মূর্তি বসানো সাব্যস্ত করল। মনে মনে আশা রাখল রাজা ফিরলে এর একটা বিহিত হবে।

দেবী চন্দ্রিমা প্রজাদের মনোবেদনা বুঝলেন। তাঁর কষ্ট হল। নিজের জন্য। প্রজাদের জন্যও। তাঁর উৎসব সম্পূর্ণ হল না। তাঁর পদ্মের মতো চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি নিশিকান্ত ও নিশিনন্দিনীকে কেঁদে কেঁদে সব কথা কইলেন। তারা রেগে টং হয়ে গেল। সূর্যাস্তের লাল আভাষ ভয়ঙ্কর হল চোখ-মুখ। রানির দিকে দৈববাণী ছুঁড়ে দিল তারা। বলল— মুর্থ। তুমি কেন মনে করছ তুমি ঈশ্বরের চেয়ে বড়?

রানি সমান তেজে জবাব দিলেন— কারণ আমি শক্তিমান। আমার সাত পুত্র ও সাত কন্যা আছে যারা যে-কোনও দেবপুত্র বা দেবকন্যার চেয়ে রূপবান ও শক্তিশালী। আমার বিশাল রাজ্য। বিরাট সেনাবাহিনী। আমার তুলনায় দেবী চন্দ্রিমা তো ভিখারিণী। এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে কোথায় থাকেন কেউ জানে না। কেউ তাকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখেনি। কিন্তু তাঁর পূজা করে। এর চেয়ে বড় মুখামি আর কী হতে পারে?

আবার দৈববাণী হল। বিদ্যুতের রেখায় কথাগুলি আঁকা হল আকাশে— তুমি মুর্থ শুধু নও, উদ্ধত, শয়তান, গর্বে অন্ধ। সাধারণ মানবী, তুমি নিজেকে দেবী মনে করছ, তবে দেখো, তুমি কত সামান্য!

নিশিকান্ত এক ভয়ঙ্কর তির ছুঁড়লেন। জোছনাকুমারীর সাতটি ছেলে মরে গেল। জোছনাকুমারী হায় হায় করতে লাগলেন। তবু তাঁর অহঙ্কার গেল না। বলতে লাগলেন— এখনও আমার সাতটি মেয়ে আছে। এখনও আমি তোমার চেয়ে বড়, চন্দ্রিমা!

এবার নিশিনন্দিনী একটি একটি করে তির ছুঁড়তে লাগলেন আর রানির বড়, মেজ, সেজ... সব মেয়ে একে একে মরতে লাগল। পঞ্চম কন্যার বেলায় সবচেয়ে ছোটটি ছুটে আসতে লাগল। ভয়ে, মৃত্যুভয়ে, মায়ের বুকে লুকোবে বলে। তখন ষষ্ঠ কন্যাও মারা পড়ল। রানি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, দেবী, ক্ষমা করো। আমি ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। এই ছোট সন্তানটিকে কেড়ে নিও না। আমাকে একটি নিয়ে বাঁচতে দাও। কিন্তু এইসব কথা নিশিনন্দিনীর কানে যাবার আগেই তাঁর তির ছোড়া হয়ে গিয়েছিল। রানির কথা কানে যাবার পর তাঁর দয়া হল বটে, কিন্তু তির ফিরিয়ে নেবার আর উপায় রইল না। সেটি এসে রানির ছোট মেয়েটিকে বিদ্ধ করল। রক্তাক্ত অবস্থায় সে লুটিয়ে পড়ল মায়ের বুকে।

রানি এক মুহূর্তে ভিখারিণী হয়ে গেলেন। তাঁর রূপ, শক্তি, সম্পদ আর গর্বের কোনও মানে রইল না। চোদ্দোটি সন্তান ছিল তাঁর। এই গর্বে নিজেকে তিনি ঈশ্বরের চেয়ে বড় বলে ঘোষণা করেছিলেন। আজ তাঁর একটিও সন্তান নেই। তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যিতে বসে পড়লেন। কেউ তাকে সেখান থেকে ওঠাতে পারল না। কেউ একটি কথা কওঁতে পারল না। শোকে, দুঃখে বেদনায় তিনি ক্রমশ শব্দ হতে থাকলেন। তাঁর চোখমুখের রক্ত ট্রাণ্ড হয়ে গেল। তিনি পাথরে পরিণত হলেন। দিনের পর দিন ওভাবেই রইলেন রানি। অন্যড় পাথর হ'ল। এক দিন বিয়ম খড় এল। সব কিছু চূর্ণমার হয়ে গেল। আর হাওয়ার সেই দাপট পাথরের রানিকে উড়িয়ে নিয়ে ঝুলিয়ে দিল একটা পাহাড়ের চূড়ায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত পাহাড়ের চূড়ায় পাঁথা থাকে একটি রমণীর অবয়ব। দুঃখিত। ব্যথিত। সন্তান হারা, একাকী। এরা অমহীম শক্তির অকরণ দস্তের ফল।

অন্ধ বলল— ভগবান তা হলে মানুষের মতোই মানুষকে মারে?

মাষ্টার বলল— হ্যাঁ। ঈশ্বরও হিংস্র। প্রতিহিংসাপরায়ণ। পৃথালোড়ী। ক্ষমাশীলতা জানে না। ঈশ্বর মানুষের ছায়া মাত্র। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের কোথাও তফাত নেই।

অন্ধ বুঝতে পারল না, তা হলে ঈশ্বরের পূজা করে লাভ আছে না নেই।

গলাশ ভাঙা ভাঙা গলার বলল— কিন্তু ঠাকুরকে মন নিয়ে পূজা করলে তো ঠাকুর খুশি হয়ে যা চাওয়া যায় দিয়ে দেয়। না?

মাষ্টার চুপ করে রইল। সে নিজেও বুঝতে পারছে না যে সে ঈশ্বরকে স্বীকার করল না অস্বীকার করল। হয়তো স্বীকারই করল। পৃথিবীতে দেশে দেশে সবসময়ই কোনও না কোনও ঈশ্বর-ঈশ্বরী বিবাজ করেন। তাঁকে কে অস্বীকার করবে।



অনেকদিন পর দেবার্চনের বিছানা ব্যবহৃত হচ্ছে। বিকাশ নিজেই বেছে নিয়েছেন এই শয্যা। একটি সম্পূর্ণ ঘর দেবাশিসকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে-ঘরে লক্ষ্মী আর বিকাশ শুতেন, এতকাল সেখানে ছেলেকে নিয়ে শুয়েছেন লক্ষ্মী। আজ তিনি একা। বহু দিন আগে স্ত্রীর সঙ্গে শোবার অভ্যাস চলে গেছে। নিজের মতো করে রাত্রিটাকে পাবার জন্য বিকাশ ছোট ছেলের ঘরটিকেই বেছে নিয়েছেন। বাড়িতে যখন থাকেন, এ ঘরেই তাঁর বেশি সময় কাটে। তার টেবিল। তার বই। তার ডায়ারি। বিকাশই এগুলো ঝাঙেন পোছেন। লক্ষ্মী হাত দেন না। বলেন— ‘যে নেই, তার জিনিস ঘেঁটে কী হবে।’ বিকাশের মনে হয়— তবু তো পাওয়া যায়। ও একদিন ছুঁয়েছিল এইসব। একদিন লিখেছিল। নানান ভাবনা ছড়িয়ে দিয়েছিল পাতায় পাতায়। এ সবের মধ্যে তো ও আছে।

দু'জনের ভাবনা দু'রকম, তাই ঘরও দু'রকম। তবে আজ বিকাশের ভাল লাগছে। ছেলের ছবির দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। মনে হল দেবার্চন হাসছে। যেন সংসারের এই পরিবর্তন, দেবাশিসের বহু নিয়ে আসা, এই আয়োজন-উৎসব—এ সব দেবার্চনের মধ্যে সহজ আনন্দ সঞ্চার করেছে।

মেয়েটি বেশ। তিনি। আসলে শিল্পিনী। সারাক্ষণ হেসে বেড়ায়। কে যে তার নাম দিয়েছিল শিল্পিনী। একেবারে ঠিকঠাক নাম। কেউ তাকে গাইতে বললে সে একটুও লজ্জা না পেয়ে

পাইতে বসে যায়। দু'বার-চারবার হারমোনিয়ামের রিড এ হ্রাস থেকে ও প্রায় তিপে ধরে ফেলে— “প্রিয় যাই যাই বলো না।” কিংবা ‘পারদেশী মেঘ যাওঁতে যিরে’ হারমোনিয়াম সে সঙ্গে এনেছে। যেমন এনেছে সুন্দর সুন্দর আসবাব, টেলিভিশন, স্টিরিওফোনিক রেকর্ডপ্লেয়ার। এ বাড়িতে সে বলমল করে এসেছে। হেসে হেসে এসেছে। বিকাশের মনে হচ্ছে, একজন চলে গিয়েছিল, একজন এসে। যেন দীর্ঘদিনের জমে থাকা অন্ধকার ঘেরা বাড়ি ছাড়া। কারও অভাব তো পূরণ করা যায় না। কিন্তু নতুন মানুষ দিয়ে আলার নতুন করে ঘর পূর্ণ করা যায়। বিকাশের কাছে এখন জিনি সেই পূর্ণতা। বেশ সেবতে মেয়ে। পাতলা পাতলা গাউন। সজ নাক। গড় বড় সমুদ্র রঙের চোখ। বউভাত অনুষ্ঠানের মিল বিকাশের ‘অফিসের সহকর্মীরা’ এসেছিলেন। কথায় কথায় দেখা গেল বিজন দেব জিনির বাবাকে চিনেছেন। জিনির দু’একটি প্রশ্ন করতে লাগলেন তিনি। জিনি তাঁর সঙ্গে গল্প করতে লাগল। বাবা লেট। বাবা মারা গেছেন দু’বছর। জিনি কেন এই অল্প পরিচিত মানুষটির মধ্যেও চুপে পড়ে বাবাকে সেবতে চায়। বিকাশের হৃদয় মমতায় ছলছল করে উঠেছিল। তিনি পুর হারিয়েছেন পাঁচ বছর পেরোয়নি। এই মেয়েটি তার পিতাকে হারিয়েছে দু’বছর পেরোয়নি। বিকাশ নিজের সঙ্গে মেয়েটির শোক একাকার করে দেখলেন। তখন লক্ষী এসে হাত টেনেছিলেন বিকাশের— শোনো।

—কী?

—এ সব কী কাণ্ড?

—কী হল?

—চারপাশে এত লোকজন, নতুন বউ এত কথা বলে নাকি?

—ভাতে কী হল? আজকাল এ সব কেউ মানে না লক্ষী। কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে—

—বাজে বোঝো না। আমি কলেজে পড়িনি?

বিকাশ কোনও সোষ পাননি জিনির মধ্যে। চার ভাইয়ের একটা বোন। খুব আদরে মানুষ হয়েছে মেয়েটা। সরল। অনভিজ্ঞ। সদ্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পার করা মেয়েরা যেমন হয়। তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে কিন্তু বাস্তবিক শিশু থাকে খুব। মনে করে, এই তো দেখা হয়ে গেল জীবন, কিন্তু, ক্রমে বুঝতে পারে, জীবন আরও বহু রূপে ধরা দেয়। সেই রূপে মিশে থাকে চুন-কালি, অশ্রু, গর্জন এবং কিছু স্নিগ্ধ সূর্যোদয়।

বিকাশ ঘরের পর্দা টেনে দিলেন। অনেকদিন পর আবার রবীন্দ্রনাথ পড়তে শুরু করেছেন তিনি। ছোটগল্প ধরেছেন। আশ্চর্য জীবনের আশ্চর্যতর স্পন্দন ধরা আছে গল্পগুলিতে। সমস্ত রস আছে। কী অপূর্ব পরিমিত। কী অসামান্য বিস্তার। কখনও মনে হয় না এ অংশটুকু বাড়তি। বিকাশ পড়ছেন—

...উপার্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্নেন্ট-আপিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণশক্তি মুলেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোনও কাজই হয় না, কিছু হুঁ দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভালো। আমি স্থির জ্ঞানিতাম, সংসারের কোনও কাজেই যে হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভালো বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভালো বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আশ্রয় পাইয়া এমন বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিন্তাধিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।...

অন্য দিকের ঘরে আগো নিবিয়ে দিয়েছিল দেবশিশু। পর পর তিন রাত্রি সে বার্থ হয়েছে। প্রথম রাতে সে হাত দিয়ে হতাশ হয়েছিল। এত ছোট! অত অন্ধ! তার হাত মুখ সমস্ত শরীর পূর ভরাট রাত্রির জন্য কতখানি প্রত্যাশী ছিল সে-সম্পর্কে তার নিজের কোনও ধারণাই ছিল না। দরজা বন্ধ করা মাত্রই সে তীব্র হয়ে ওঠে আর সমস্ত হৃৎ-এক টানে ছিড়ে জিনিকে নির্দীর্ণ করতে চায়। এই তিনদিন ধরে জিনি একেবারে শক্ত হয়ে আছে। একেবারে কাঠ। দেবশিশু প্রথমে ভেবেছে লজ্জা। ভেবেছে ভয়। পূর্বাপর বার্থ হয়ে উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় খুটে গেছে স্বাধিক্রমে। সেই হাতের প্রশ্রয়। তার রাগ হচ্ছে। কিন্তু সে শান্ত আছে। মাত্র তিনদিন। আরও আছে হবে। অফিসের শব্দরদা বলেছিল— ভাড়াহুড়া করিস না বেন।

জানালার পর্দা একটু তুলে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল জিনি। দেবশিশুর সঙ্গে ভাল করে কথা হয়নি তার। দেবশিশু কোনও কথা জানতে চায়নি। অথচ জিনি ভেবেছিল, অনেক কথা বলবে বনের সঙ্গে, কথা শুনবে। ছোটবেলার কথা। বড় হবে ওঠার গল্প। তার বাবার কথা বলবে। তার প্রিয় কবিতাগুলি শোনাবে দেবশিশুকে। দেবশিশু তার কোলে মাথা রাখবে। কবিতা শুনতে শুনতে খুব ভালবাসবে তাকে। কবিতার মতো করে ভালবাসবে। এখনও হয়নি এমন। দেবশিশু সারা দিন দূরে দূরে থাকে। এই কদিন বেশিটাই এ ঘরেই কেটে গিয়েছে জিনির। আত্মীয় যারা এসেছিলেন চলে গেলেন আজ। এর মধ্যে দেবশিশু যতবার এসেছে এ ঘরে ততবার ডাক পড়েছে তার। লক্ষ্মী ডেকে নিয়েছেন ছেলেকে— ‘বাবু—’ ‘মাই মা’ বলে সেও চলে গেছে তৎক্ষণাৎ। জিনি শুনেছে, আর মাত্র চারদিন। তারপর আগরতলা যাত্রা। ভাবলেই ভাল লাগছে তার। সব দেখাবে সে দেবশিশুকে। ছোটবেলার স্কুল। খেলার মাঠ। পুরস্কার পাওয়া বইগুলি। বাবার ছবি। সব দেখাবে। আর অনেক গল্প করবে। তার বিয়ের পরের পরদিনই সবাই ফিরে গেছেন আগরতলায়। গিট খুলতে জিনি আর দেবশিশু সেখানে যাবে।

শব্দ করে দরজা বন্ধ করল দেবশিশু। জিনি চমকে উঠল। দেবশিশুর হাত আলোর সুইচে। হিমেল স্রোত জিনির মেরুদণ্ড বেয়ে নামতে থাকল ক্রমশ। সে জানে এখন দেবশিশু তাকে হিচড়ে শুইয়ে দেবে। পটাপট খুলে ফেলবে হুক। আর জিনি শক্ত হয়ে যাবে। তিনদিন ধরে এই চলেছে, এই হচ্ছে ক্রমশ। জিনি বুঝতে পারছে না, এইভাবে কেন আসছে ও। একটুও কথা না বলে! চোখে না তাকিয়ে! ভাল না বেসে! বিয়ে হওয়া মাত্রই কি দুই নারী ও পুরুষ সম্পর্কের শরীরের সম্পূর্ণ দখল পেয়ে যায়? সে আন্তে বলল— আলো নিবিয়ো না।

—কেন? ঘুরে দাঁড়াল দেবশিশু। তার জু কুঁচকে গেছে। নাক কাঁপছে। হালকা সবুজ চাদরে ঢাকা সুন্দর শরীর। সে আদেশের ভঙ্গিতে বলছে— জানালা বন্ধ করো। ঠাণ্ডায় সব খুলে রেখেছ কেন? জিনি জানালা বন্ধ করেছে। তার মনে হচ্ছে, যেন সে নিরাপদ নয়। বিচ্ছিন্ন। সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং তাকে যেন চিৎকার করতে হবে, যাকে বলে আত্মনাদ, এমনই পরিস্থিতি। আর জানালা খোলা থাকলে সে, আত্মস্বরসমূহ পৌঁছে দেবে। কোথায় পৌঁছে দেবে? কার কাছে? আপনজনদের কাছে। প্রিয়জনদের কাছে। মা, দাদা, বউদি, পিসি... ভাবছে জিনি, ঠোঁট কামড়াচ্ছে। মা, দাদা, বউদি, পিসি তার প্রিয়জন। দেবশিশু নয়? সে ভাবত, বিয়ে হওয়া মানেই বর এক প্রিয়জন। এই প্রিয়ত্ব, তিন রাত্রি পেরিয়েও সে স্পর্শ করতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে ভরাট চার দেওয়ালের মধ্যে আবার সে একা। সে খাটি থেকে নেমে আসছে। দেবশিশু শব্দ করে হাত ধরছে তার।

—কোথায় যাচ্ছ?

হঠাৎ প্রশ্ন করছে জিনি। আচম্বিতে প্রশ্ন করছে— তুমি কবিতা শেড়ো না?

—কবিতা? কী বললে? কবিতা?

—হ্যাঁ। শেড়ো না?

দেবাশিস হাসে। এবং হাসির মধ্যে বাস পুরে দেয়। কিংবা তাচ্ছিল্য। কিংবা বিরক্তি। জিনি,  
বোঝে অথবা বোঝে না। কিন্তু উত্তরের প্রতীক্ষা করে। দেবাশিস বলে—

—না। তুমি পড়ো? হ্যাঁ, তুমি তো পড়বেই। সাহিত্যের ছাত্রী। গান পাও? কবিতা পড়ো।  
নাচতেও নাকি?

দেবাশিসের একটি হাতে জিনির হাত শক্ত করে ধরা। অন্য হাত দু'খিলা। শরীরে ময় দূর ছিল।  
জিনি হয়তো ভাঙত আঁক। হয়তো গলত। কড় সুন্দর দেখাচ্ছিল যে দেবাশিসকে। কিন্তু সে শক্ত  
হয়ে গেল ফের। নাচতেও নাকি— শুনে শক্ত হয়ে গেল। নাচত না সে। যদি-বা নাচতেও তাতে  
কী? সে বলল— ছাড়ো।

—কেন? ছাড়ব কেন?

—কবিতা শুনবে?

—কবিতা? আচ্ছা বেশ।

হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। বলতে থাকল— ভাইয়ের এ সব ছিল। কবিতা, রবীন্দ্রনাথ,  
শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শেষ পর্যন্ত কার্ল মার্কস আর চার্ল মজুমদার। বাপরে।

—বাপরে কেন?...থমতে গেছে জিনি। দেওয়ালের র্যাকে কয়েকটি কবিতার বই  
সাজিয়েছিল, তার সর্বস্বত্বের সঙ্গী। সে দিকে যেতে পারছে না।

—ওর জন্যে কী হারাসমেন্ট গেছে জানো! আমাকে কতদিন পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে।  
বাবার কী অপমান। কী দরকার ছিল এ সবের।

—ও, অপমান কেন?

—সে তুমি বুঝবে না। তাড়াতাড়ি এসো।

জিনি র্যাকে হাত বাড়িয়েছে। জীবনানন্দ টানাচ্ছে। এখন আর কবিতা শোনাতে ইচ্ছে করছে না।  
সে বেশ বুঝতে পারছে দেবাশিস কবিতা শুনবে না। যদি এ ঘর থেকে একটু বেরোতে পারত।  
যদি একটু একা একা দু'পাতা পড়ে আসতে পারত। বাথরুমে চলে যাবে? বই নিয়ে? দেবাশিস  
প্রশ্ন করবে। সে আনমনে পাতা ওলটাল।

...রাত জের, —বাড়িবে আরো কি

এই রাত! —বেড়ে যায়, —তবু চোখাচোখি

হয় নাই দেখা।

আমাদের দুজনার! দুইজন, —একা! —

বার-বার চোখ তবু কেন ওর ভাঁয়ে আসে জলে।

কেন বা এমন ক'রে বলে,

কাল সাঁকরাতে

আবার তোমার সাথে

দেখা হবে? —আসিবে তো? তুমি আসিবে তো! —

ডুবে যাচ্ছে। কবিতায়। কোনও মুখ মনে নেই। কাছে নেই। কে বলবে একদিন? আসিবে  
তো?

—হল? কবিতা খোঁজা? তাড়াতাড়ি করো।

জিনি তাকাচ্ছে। এগোচ্ছে বিছানার দিকে। শোনাবে। শোনানো তো উপলক্ষ। আসলে  
নিজেই পড়বে। দেবাশিস চানর ছুড়ে ফেলছে। কলস চাপাচ্ছে গায়ে। হাসছে। জিনির হাতে  
জীবনানন্দ। সে শুনছে— আজ শিবতোফল দারুণ জিনিস দিয়েছে একটা।

—কী?

—মনে আছে শিবতোষদাকে ?

—ঠিক মনে পড়ছে না।

—ওই যে, বলেছিল, তোর বউয়ের বুকের তসুখ করলে আমার কাছে নিয়ে আসিস।

—ওঃ।

—ও কি। শিবতোষদা ডাক্তার। বুকেলে ? যা জিনিস দিয়েছে না।

জিনি দেখছে। দেবশিনের চোখমুখে উচ্ছলতা চকচক করছে। কিন্তু এর নাম 'আনন্দ নয়'।

দেবশিন দু' আঙুলে তুলে ধরেছে ছোট চককে রত্নিন প্যাকেট।

—খুব দামি। বিদেশি। দারুণ।

জিনির চোখের সামনে হামাগুড়ি মেয়ে। ঠোট ফাকা। নয়। বিপুল কলমাত্রা থেকে কোলাহল। কুমড়োর মতো দুগে আছে। জিনি দেখছে। জীবনানন্দ হাতে দেখছে। দেবশিন দেখছে। হাতে কন্ডোমের প্যাকেট। স্বামী-স্ত্রী তারা। নারী-পুরুষ তারা। মিলিত হবে। বর্ষে বর্ষে মিলিত হবে, যুগে যুগে মিলিত হবে। সারল্যে সৃষ্টি করবে অপরূপ সজ্জান। সারল্যে সেই সরব করে চলে যাবে দেহাতীত সেই পর্বে যার নাম প্রেম। এমনই জনত জিনি। আজ সব তার মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। সব ভুল। শরীরের জন্য তো রইলই আরও একটি শরীর। তবে কেন এত তিক্ত ছবির উল্লাস। কেন এই নির্লজ্জ প্রকাশ যা প্রেমকে ছুড়ে দেয় নর্মমায় এবং অস্বীকার করে ? দু'হাতে মুখ ঢাকছে জিনি। বিকৃত গলায় বলছে— ছিঃ। সরাও ওটা সরাও।

দেবশিন শুইয়ে ফেলেছে জিনিকে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলছে— লজ্জা করছে ? উঃ লজ্জা করছে ? ওইরকম করব আমি। তোমাকেও ওইরকম করব।

জীবনানন্দ ছটিকে গেছে হাত থেকে। মুখ খুবড়ে পড়ে রয়েছে মেথোয়। জিনি শক্ত হয়ে আছে। আর তার পরিভ্রাণ নেই। দেবশিন চড়ে বসেছে ওপরে। জিনি ছটকট করছে। বোবা নিরুত্তর গাড়ীর মতো ছটকট করছে। কী যন্ত্রণা। মাথো। চোখ উপছে জল পড়ছে তার। আলো নেবানো নেই। তার ঠোঁট কামড়ে আছে অন্য লোক। সে চোখ খুলল একবার। দেওয়ালে চোখ পড়ল। একটা ছোট্ট সোনালি মথকে কামড়ে ধরেছে টিকটিকি। মাথা নেড়ে-নেড়ে ছিড়ে খাচ্ছে।

পাতা ওল্টাচ্ছেন বিকাশ। পড়ছেন, বহুপাঠিত 'লাবারেটর'—

...মন-বে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আঙ্গুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পোলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাসে না। আজন্ম তপস্কিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী-কুন্তীর সেজে বসতে হয় সীতাসাবিত্রী।...

পদটি নড়ে উঠল। বিকাশ তাকালেন। ঘরে ঢুকছেন লক্ষ্মী। দুই চোখ সন্মোহিত। এগিয়ে আসছেন। বিকাশের শরীর খোঁয়ে বসে পড়লেন বিছানায়। বললেন— এখনও পড়ছ ?

বিকাশ অবাক হয়ে দেখছেন। লক্ষ্মীর এ কী পোশাক। এই শীতেও গারে কোনও চাদর নেই। গোলপি রঙের পাতলা রাতপোশাক, যা লক্ষ্মী আগে কখনও পরেননি। চিরকাল শাড়িতেই দেখতে অভ্যস্ত স্ত্রীকে এরকম পোশাকে দেখে হাঁ হয়ে গেলেন বিকাশ। এসময় এ ঘরে লক্ষ্মীর আসা, এই পোশাক সব দেখে বিকাশের বোধবুদ্ধি গুলিয়ে গেল। কখনো নিজেবে ভাল করে চোকেচুকে তিনি প্রশ্ন করলেন— এ সব কী ?

লক্ষ্মীর ভাবভঙ্গি, স্বয়ং প্রায় সেইরকম যখন বিকাশ সদ্য বিবাহ করেছেন। তেমনি গলা-গলা, তেমনি গা-ঘেঁষা। তিনি বলছেন— দেখি না, কী পড়ছ।

হাত থেকে কেড়ে নিলেন বইখানা। সেই আগেরই মতো। পড়তে লাগলেন, সেই আগেরই মতো। কিন্তু পড়তে পারলেন না। চক্ষমা নেই গোখে। 'দুশুই, কিছুই দেখি না'— বলে বইখানা সরিয়ে রাখলেন পাশে। একটু খুঁকে পড়ে, কনুইয়ে শরীরের ভর রেখে, হাতে চিবুক রেখে



প্রথোলেন—আমায় কেমন দেখাচ্ছে গো?

বিকাশ চোখ থেকে চশমা খুলে পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন—চান্দর-চাঁদর গায়ে নাওনি, ঠাণ্ডা লাগবে যে।

লক্ষ্মী নাকে শব্দ করলেন—উ উ উ উ।

শব্দটা ঘুরে ঘুরে ঢেউ খেলে গেল। বিকাশকে টেনে নিজের দিকে ফেরাতে ফেরাতে বললেন—আমার শীত লাগছে না...উচ্চারণ সামান্য সিক হল। আঘা আঘা হল। টেনে টেনে তিনি কইগেন—দ্যা-কো-না-আ।

বিকাশ পিটিপিটি করে চাইলেন। লক্ষ্মী হঠাৎ নববিবাহিত বধূটির মতো আচরণ করলেন। তাঁর মগজ শূন্য হয়ে গেল। গল্পগুচ্ছের গল্প উবাও। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বিছানার কোনার পড়ে কান্দছে। আর বিকাশ নির্বোধের মতো কহলের তলায় আঁকুপাকু করছেন। তাঁর সামনে একজন অচেনা মহিলা। যিনি বলছেন—আজ আমি এখানে শোব।

লাফিয়ে উঠে বসেছেন বিকাশ। কন্ডল-টবল ফেলে দিয়েছেন। বলছেন—এখানে? মানে এ ঘরে? মানে এই বিছানায়?

—কেন?

বিকাশ বলতে যাচ্ছিলেন—ছি ছি, ছোট খোকার সামনে একসঙ্গে...বলা হল না। কথাটা গিলে ফেললেন। লক্ষ্মীর নিজের যখন মনে পড়েনি, এ ঘরে ছোটখোকা সর্বক্ষণ জেগে আছে, তখন আর বলে কী হবে। তিনি ছেলের ছবির দিকে তাকালেন। বড় বড় নির্মল দুটি চোখ ছোটখোকার। দেখলেই মনে হয়, এই স্থান করে, জামায় বোতাম লাগাতে লাগাতে ঘরে ঢুকবে, বলবে—বাবা, এ সংখ্যায় 'গড়ের মাঠে' দারুণ একটা ছবি দিয়েছে পতৌদিরা...কিংবা বলবে—তুমি কি 'ম্যাকবেথ' পড়েছ বাবা?

বিকাশ বললেন—পড়েছিলাম। বহু আগে। তুই পড়ছিস?

—হ্যাঁ। কিন্তু মনে নেই তোমার? অনেক জায়গায় বুঝতে পারছি না। বিকাশ মনে করছেন। কতদিন আগেকার পড়া। ছোট ছেলের মুখ দেখছেন। বড়খোকা কখনও এমন প্রশ্ন করে না। বিকাশের খুব কাছাকাছি আসে না সে। তার সব কথা, সব দাবি মায়ের সঙ্গে। খাবারের স্বাদ মনোমতো না হলে চিৎকার করে। কোনও কিছু মনোমতো না হলেই সে চিৎকার করে। তার প্রকাশ খুব জোরাল। কিন্তু ছোটখোকা অন্য রকম। সে শান্ত। সে নীরব। ভাবুকও বলা যায়। সে যাই পড়ে, যাই দেখে, তাই নিয়ে ভাবে। বিকাশের মনে পড়ে যাচ্ছে একটি-দুটি লাইন—

Whence is that knocking?

How is't with me, when every noise appals me?

What hands are here? Ha : they pluck out mine eyes :

Will all great Neptune's ocean wash this blood

Clean from my hand? No : this my hand will rather

Making the green one red.

ছোটখোকা শুনেছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার। বিকাশ বললেন—বুঝিয়ে দেব তোকে। বলিস কোথায় অটাকাচ্ছে।

আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হবে না। কোথায় চলে গেছে ছোটখোকা। নিজের মতো করে বুঝে, নিজের মতো করে ভাল-মন্দ স্থির করে পৃথিবীর বাইরে চলে গেছে। বিকাশের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ছোটখোকা যদি বড়খোকার মতো হত, তা হলে হয়তো বেঁচে থাকত। এ কথা বহুব্যবহাৰ তাঁর মনে হয়েছে। কিন্তু শাস্তি পাননি ভেবে। ছোটখোকা তার নিজের মতো ছিল। সেই থাকটাই তাকে মনায়। এর থেকে একটুও অন্য রকম হলে সে তাঁর ছোটখোকা হত না যেন। ঠিক ঠিক তেমন করে স্বপ্নের আঙনে ঝাঁপিয়ে পড়ত না। বিকাশের ইচ্ছে করে পৃথিবীসুদ্ধ লোক

ছোটখোঁকা নরেন রাখুক। কিন্তু তার মা-ই তাকে ভুলে গেছে কত দূরত। গোলাপি-মাসি পরে আধো আধো কথা বলছে।

বিকাশ ডাবার চেষ্টা করেন— ভুলতে কি আর পারে। মা তো! সব কিছু নিয়ে মতে আছে। ভোলার চেষ্টা করছে। দুঃখ ভোলার চেষ্টা করাটাই তো জীর্ণ।

বিকাশ জানতে চান— এ ঘরে শুতে চাইছ কেন?

লক্ষ্মী বিকাশের কাছে মাথা রাখেন। বলেন— একা একা ভাল লাগে না।

লক্ষ্মীর মাথা ঠেলে দেন বিকাশ। কবল দলা করে হাতে নিয়ে ঘরে ফিরে বিছানা থেকে নামেন। বলেন— এ খাট তো ছোট। কসুবিধে হবে। চলো এতামার ঘরে।

ঘরের আলো নিবিয়ে এগোতে থাকেন দু'জনে। ছেলের লুপ্ত পরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন লক্ষ্মী। বিকাশ পেছন ফিরে অবাধ হয়ে বলেন— কী হল?

—না। কিছু না।

লক্ষ্মী মাথা নিচু করে এগোতে থাকেন। ঘরে এসে স্বামীকে বলেন— কেমন দেখাচ্ছে আমাকে, বললে না?

ঘাড় হেলিয়ে দীর্ঘ মোটা বিনুনি দুই বুকের মাঝখানে এনে ফেলেন তিনি। একসময় এ দৃশ্য বিকাশকে পাগল করে তুলত। কিন্তু আজ বিকাশের চোখে এতটুকু আগুন জ্বলল না। স্ত্রীকে দেখতে দেখতে নিকটেজ গলায় তিনি বললেন— বেশ যুবতী-যুবতী লাগছে।

—আমি এখনও যথেষ্ট যুবতী আছি। সবাই বলে।

বিকাশ কবলে শরীর ঢাকেন। তাঁর যথেষ্ট শীত করছে। লক্ষ্মীর কেন করছে না কে জানে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে ক্রিম ঘষছেন এখন। গায়ে সরাসরি আলো পড়েছে। বিকাশ দেখছেন পাতলা মাসির নীচে লক্ষ্মীর আবছা শরীর। এ শরীর বিকাশের ছিল। এখন নেই। কবে থেকে নেই? এখন মনেও পড়ে না। পর পর দুটো বাচ্চা সিজার করে হওয়ার পর লক্ষ্মীর কীরকম ধারণা হয়েছিল আরও বাচ্চা এসে তিনি বাঁচবেন না। ডাক্তার যদিও খুব স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে বলেছিলেন তবু আজও লক্ষ্মী কাপড় কাচেন না, ঘর মোছেন না, জলের বালতি তোলেন না। তাঁর পেট, যেখানে তিনি দু'টি শিশুকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলেন, এখনও এমনভাবে আগলে বেড়ান যেন তাতে আঙুল লাগলেই ফুটো হয়ে বরষার করে জল গড়াতে শুরু করবে মাটির কুঁজোর মতো। বিকাশের প্রথম প্রথম কষ্ট হত। অনেক বুঝিয়েছিলেন লক্ষ্মীকে। কথা দিয়েছিলেন, কতকম ছাড়া চাইবেন না। কিন্তু লক্ষ্মী রাজি হননি। গত বছর থেকে তাঁর ঝড়ুচক্র শুরু হয়ে গেছে। বিকাশেরও কোনও কিছুতেই কিন্তু এসে যায় না। ছোটখোঁকার মৃত্যু তাঁকে আরও শীতল, আরও নিকটেজ করে দিয়ে গেছে। এতদিন পর, আজ, লক্ষ্মীকে স্বাভাবিক লাগছে না। ক্রিম ঘষা শেষ করে তিনি আলো নিবিয়ে দিচ্ছেন। বিকাশের গা ঘেঁষে শুয়ে পড়েছেন বিছানায়। বিকাশ সরে যাচ্ছেন। অনেকদিন স্ত্রীর সঙ্গে শোওয়া অভ্যাস নেই। অস্বস্তি লাগছে। লক্ষ্মী বিকাশের কবলের নীচে ঢুকে পড়েছেন। হাত দিয়ে পা দিয়ে পেরিচিয়ে ধরছেন বিকাশকে। বিকাশের একটি হাত তুলে এনে স্থাপন করছেন স্তনে। বিকাশ পালাতে চাইছেন। সরে যেতে চাইছেন। পারছেন না। বলছেন— কী চাও লক্ষ্মী? কী করছ? ক্লান্ত বিপন্ন তাঁর স্বর।

লক্ষ্মী বলছেন— হয় না? আমাদের? আবার হয় না?

বিকাশের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। বলছেন— এতদিন পর, আমার আর হবে না লক্ষ্মী। ছাড়ো। তা ছাড়া ছেলের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। আর কি এ সব মানায়? আর হয় না।

—কেন হবে না? লক্ষ্মী ফুঁসে উঠছেন।—হবে না কেন? ছেলের বিয়ে দিয়েছি বলে আমাদের কোনও সাধ-আত্মপা ইচ্ছে-অনিচ্ছ থাকতে নেই?...তিনি হাতের প্রক্রিয়ায় ভাঙতে চাইছেন বছর বছর ধরে একটানা জড়িয়ে থাকা শীতযুগ। বালি খুঁড়ছেন। অগাধ বালি খুঁড়ছেন।

যথার্থ পাথরটিকে এতকাল পর খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত। কিন্তু লক্ষ্মী উদার হয়েছেন। নেমে আসছেন ক্রমে। বিকাশের শরীরের ভুলে যাওয়া ঘরে পৌঁছে মর্মে ধরা তাল খোলার আশ্রয় চেষ্টা করছেন তিনি। বিকাশ নড়তে পারছেন না। নিজস্ব অসাড়তার মধ্যস্থে অসন্তব আত্মবিশ্বাস নিয়ে শুয়ে আছেন। বাধাও দিতে পারছেন। নিজের গোচরে যায় না এমন সেই মানস অন্ধকার হাতড়াচ্ছেন তিনি। লক্ষ্মীর ইচ্ছার কাছে কি তিনি আত্মসমর্পণ করছেন না? ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ তখনই ঘটে যখন নিজের ইচ্ছাকে অস্বীকার করেও অন্যলে স্বীকারই করা হয়। বিকাশ লক্ষ্মীর ঠোঁট ও দাঁতের চাপ অনুভব করলেন। বহুক্ষণের পূরনে প্রতিফলনালী অত্যন্ত হাত তুলে লক্ষ্মীর চুল খামচে ধরলেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধু কাঁপনি অনুভব করলেন। লক্ষ্মী নিজেকে ঘষে ঘষে তুলে আনতে লাগলেন ওপরে। বিকাশ দু'খানি জড়িয়ে নেওয়া পারের মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টাও ব্যর্থ হতে লাগলেন বারবার। শুকনো হটখটে ঢালভূমিতে তাঁর সমস্ত প্রয়াস ব্যাহত হতে লাগল। লক্ষ্মী, তীব্রভাবে হিল হিল করে বলতে লাগলেন— বাত। বাত। জ্রেসিংটেবলে ক্রিমের টিউব আছে।

বিকাস কবল ছুঁড়ে ফেলে নেমে দাঁড়ালেন খাটি থেকে। নামতে গিয়ে মশারিতে শরীর জড়িয়ে গেল। যত ছাড়াতে চান, জড়িয়ে যায় তত। আঁকড়ে ধরে। উর্জ্বাঙ্গে একখানি গেঞ্জি, নিম্নাঙ্গ খোলা। নকশাল আন্দোলনে মৃত এক পুত্রের কেরানি থেকে আমলা হয়ে ওঠা পিতা বিছানা থেকে নেমে হেঁটে যাচ্ছেন জ্রেসিংটেবিলের দিকে। দীর্ঘকাল পর এক অনাবৃত পদক্ষেপ— একটি ক্রিমের টিউব সংগ্রহের জন্য। একটিও শিশিবোতল না উল্টে তিনি সহজেই সংগ্রহ করেছেন সেই বস্তু। ফিরে আসছেন। উঠে পড়েছেন বিছানায়। ভয়ে ভয়ে আছেন, তাঁর এই এতদিন পরের উত্থান হারিয়ে না যায়। আঙুলে ক্রিম নিয়ে চালনা করতে করতে তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে, বছর দুয়েক হল লক্ষ্মীর নীচের পাটির সব দাঁত তুলে বঁধানো হয়েছে। শোয়ার সময় লক্ষ্মী সেটি খুলে রাখত। কিন্তু আজ পরে আছে। বিকাশ মনে করতে পারলেন না লক্ষ্মীর আসল দাঁতের চাপও ঠিক এই রকমই ছিল কিনা।



ঘুম থেকে উঠে পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে জিনির। সে কি কোনও নতুন জীবন কাল লাভ করল? কাল কি সে প্রথম বধু হল? প্রথম নারী হল সম্পূর্ণতার অর্থে? পা ফেলতে থাকা এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে বেদনা বোধ করতে থাকা তাকে এইসব প্রশ্নের সমাগমে রাখছিল। রেওয়াজ মতো প্রথম দশদিন সকালে স্বস্তরকে প্রণাম করবে সে। শান্তিভিকে প্রণাম করবে। কিন্তু সে রক্তাক্ত হয়েছে। নিচু হতে পারছে না। তলপেটে তীব্র ব্যথা। কারওকে বলতে পারছে না। এরকমই কি হয়? এটাই কি স্বাভাবিক? সে জানে না। সে চায়ের কাপ নিয়ে স্বামীকে পৌঁছে দিচ্ছে। দেবাশিস খাটে বসে দু'চুমুক দিয়ে হাতে কাপ নিয়ে পায়ে পায়ে চলে আসছে খাবার টেবিলের দিকে। এবং একবার ধমকে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্মীর ঘরের কাছে। তার ঘুমমাথা চোখ-মুখ কুঁচকে গেছে। টি-পট থেকে চা ঢালছেন লক্ষ্মী। দেবাশিস অশ্রু করছে—বাবা কি কাল তোমার ঘরে ঘুমিয়েছিল?

লক্ষ্মী কান দিচ্ছেন— হ্যাঁ, জানে, আমার একলা শুতে ভয়-ভয় করে লাগে। ছোর তো এখন বড় এসে গেছে।

জিনির মাথা নিচু হয়ে আছে। সে মুখ তুলতে পারছে না। চায়ের কাপ মুখের কাছে আনতে

পারছে না। ভাবছে, এ সব বলা যায়? হয়তো যায়। হয়তো এটাই মহানৈতিক জীবনযাত্রার পদ্ধতি। তার তবু কান গরম হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে বাজছে—‘তোমার জেজু এসে গেছে!’ দু’খানি সরল চোখ তুলে সে প্রশ্ন করছে—‘তুমি মার কাছে ঘুমোতে বুঝি এতদিন?’

লক্ষ্মী জবাব দিচ্ছেন—‘আমাকে ছাড়া ঘুমই হত না বড়খোকার।’

বড়খোকা পেছন দিক থেকে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে। গ্যালে শালি রাখছে। লক্ষ্মী মুখ ঘুরিয়ে চুমু খাচ্ছেন ছেলেকে। বলছেন—‘যাও। বাথরুমে যাও।’

জিনি দেখছে। তাকে শেখানো হয়েছিল, ছেলে বড় হলে মাস আশ তাকে জড়িয়ে ধরতে নেই। মেয়ে বড় হলে বাবার কোলে বসতে নেই। ভাই বড় হলে বোনের সঙ্গে শুতে নেই। তার মনে পড়ে না সে শেষ কবে বাবার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। তার কোনও দাদার যখন মাথা ব্যথা করে তখন মা তাকে কোলের কাছে শুইয়ে কপালে পুরানো ঘি মালিশ করে দেন। বড়দা মাঝে মাঝে জিনিকে দিয়ে চুল ঘাঁটিয়ে নিতেন বটে। জিনি বড়দার চুলগুলো মুঠোয় ধরে খুব করে টেনে দিত। কিন্তু ওই পর্যন্ত। বাবা বতরদিন বেঁচে ছিলেন মায়ের সঙ্গে একঘরে এক বিছানাতেই শুতেন। বড়দাদা, বড়বউদি, মেজদাদা, মেজবউদি, সকলেই জিনিসের বাড়িতে এমনই করে থাকেন। এ নিয়ে যে কোনও কথা তৈরি হতে পারে, এর যে কোনও ব্যতিক্রম হতে পারে, তার কোনও ধারণাই জিনির ছিল না।

—‘চা শেষ হল? লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করছেন জিনিকে।’

—‘হ্যাঁ, এই শেষ হল মা। জিনি উত্তর দিচ্ছে। মনে মনে একটু নিশেহারা। সে জানে না ঠিক কীভাবে স্বস্তরবাড়ির দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাদের বাড়িতে তার মায়ের সঙ্গে বউদিদের ঘুম নেই। কারণ মা, তাঁর ছেলেমেয়েদের মতোই, বউমাদের ঠ্রুটিগুলিকে বুকে দিয়ে আড়াল করে বেড়ান। জিনিকে, বিবাহের জন্য, আগরতলা থেকে কলকাতায় পাঠানো হচ্ছিল যখন, সারা পরিবার নানা জিনিসপত্র গোছাগছ করছিল, কারণ এ পক্ষে বলা হয়েছিল ত্রিপুরা গিয়ে বিবাহ করে আসা সম্ভব নয়। জিনির মা সারাক্ষণ জিনিকে শিখিয়েছিলেন, তাকে বলা হয়েছিল, যেন, স্বস্তরগৃহে থাকায় সময় কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়া জীবনযাপন মনে না রাখা হয়। যেন-বা, স্বস্তরবাড়ি নিজেরই বাড়ি, এমনই ভাবে সে প্রথমদিন থেকে। স্বস্তর বা শাস্ত্রির কথা, যদি তা শাসন হয় যেন, আলাদা করে না দেখে মা-বাবার থেকে। প্রথম প্রথম সহ্য করতে হয়। সে যেন সহ্য। সেইলই সে একমাত্র রয়ে যেতে পারে সর্বাঙ্গীণ। এবং সে যেন তার বাবাহারে আচারে এমনই সৌজন্যনিষ্ঠ থাকে যাতে তার বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার বিষয় না জন্মায়।

জিনি তার এই কলকাতায় কলেজে পড়া জীবন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন সম্পাদন করত দূরসম্পর্কীয়া এক পিসির বাড়িতে থেকে, যিনি খুবই কড়া ধাঁচের ছিলেন, বিশেষ করে জিনির ক্ষেত্রে। এ কারণেই যে জিনি খুব সরল সাদাসিধে মেয়েটা, এই বিপুল কলকাতা শহরে এসেছে, সে কোনও ভুল করে ফেলতে পারে। আর তিনি নিজে একাই মেয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন, এ সম্পর্কে তাঁর সাবধানতা ও সতর্কতার শেষ ছিল না। জিনির দ্বারা কোনও ভুল করা সম্ভব ছিল কিনা এ কথা পিসি ভেবে দেখেছেন বহুবার এবং এই প্রত্যয় পেয়েছেন যে নয়, সম্ভব নয়, তবু ভুলেও ভুল করার কোনও অবকাশ তিনি রাখতে চাননি। জিনি শিখেছে, মানতে হয়, বাবা যা বলেন, মা যা বলেন, দাদারা যা বলেন। জিনি কুলে মাস্টারমশাইদের মেনেছে। কলেজে অধ্যাপকদের মেনেছে। পিসিকেও মেনেছে। পিসি তাঁর একলা অধ্যাপিকা জীবনে জিনিকে নিয়ে নিশ্চিন্তই ছিলেন আবার নিশ্চিন্ত ছিলেন বলেই তাঁর ভাবনারও শেষ ছিল না। কেননা নিশ্চিন্ত জীবন বজায় রাখা খুবই অনিশ্চিত। ভাবনা ছিল, জিনির এই ভাল থাকা, শিষ্ট থাকা যদি বজায় না থাকে। কিন্তু জিনিকে ধারণা হতে হয়নি। অশিষ্ট হতে হয়নি। অমান্য করতে হয়নি কারওকে। তার মনে নেবার শিক্ষা থেকে কোনও আঘাত নেমে আসেনি তার জীবনে, ফলে এই শিক্ষা সে সহজভাবে নিয়েছে। কিন্তু এখানে এসে তার এতদিনের শিক্ষা থেকে জন্ম নেওয়া

ভাবনা কুটিবোধ যখনই এতটুকু অমিল পাচ্ছে তখনই সংঘেষণ ভয়ে তার জেতরটা কেঁপে উঠছে। 'চা শেষ হল?' শান্তির এই প্রশ্নে, প্রায়ের চোরে বক কিছু যেন আছে। কেন কোনও অনুযোগ। যেন সকালে এই চা-পানে এতখানি সময় নেওয়া ঠিক নয়। সে সন্তুষ্ট হয়ে উঠছে। 'হ্যাঁ। এই শেষ হল বলে।'

লক্ষ্মী বলছেন—কাল যা ঠাণ্ডা পড়েছিল।

জিনি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বলল— হুঁ।

লক্ষ্মী বললেন— আমি তো তোমার স্বপ্নের কবলের তলায় ঢুকে গুটিসুটি হয়ে পড়েছিলাম।

জিনি কোনওমতে ঢৌক গিলে বলল— ওঃ।

সে মনে মনেও ভাবতে সাহস করল না, তার শান্তি গুটিসুটি মেয়ে স্বপ্নের কবলের তলায় ঢুকেছেন। বরং সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। লক্ষ্মী বললেন—তুমি এক কাজ করো। স্নান করে পূজার ঘরটা পরিষ্কার করো তো যাও।

জিনি মাথা নিচু করছে। কী বলবে বুঝতে পারছে না। কোনও ভাবে বলার চেষ্টা করছে— আমার... আমার....

—শরীর খারাপ হয়ে গেছে?

লক্ষ্মী বাক্য যুগিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর স্বর চড়ছে। নববিবাহিতা বধুটিকে ধমকাচ্ছেন তিনি— আগে বলোনি কেন? আঁ? আমার চায়ের পট ছুঁয়ে দিলে? আজ বৃহস্পতিবার, লক্ষ্মীর পূজা করব আমি। কাল সন্তোষী মার ঘট বসাব। পরশু যাব শনিমন্দিরের পূজা দিতে। রবিবারে, হ্যাঁ, রবিবারে ইতুর ঘট বসবে। তুমি সব ছুঁয়ে দিলে? ছি ছি ছি।

জিনির মাথা বকের ওপর নেমে এসেছে। নখ বুঁটছে সে। চোখে জল আসছে তার। সে কেমন করে জানবে ঘুম থেকে উঠেই তাকে স্বপ্ন হওয়ার কথা জানাতে হবে। কেমন করেই বা জানাবে সে? এ কি বলা যায়? তার এ সব অভ্যাস নেই। ওই হিচকির তার পিঠে একশো চাবুক হয়ে পড়েছে এখন। তার কান্না পাচ্ছে। এত জোরে কেন বলছেন শান্তি? ইস! কী লজ্জা! পাশের ঘর থেকে স্বপ্নের স্তন্যে পেরেছেন নিশ্চয়ই। এ সবের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। তার দু'চোখ থেকে গাল বেয়ে জল পড়ছে। লক্ষ্মী দেখতে পাচ্ছেন। বলছেন—কান্নার কী হল? তোমাকে এমন কিছু বলিনি যাতে কান্দতে হবে। তখনই জানতাম বাপু। তিন ছেলের পর এক মেয়ে আনুরে হবে। তখনই বলেছিলাম।

জিনি চলে যাচ্ছে ঘরে। মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতির মুখোমুখি কেমন করে হতে হয় তাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। সে তাই কান্দছে। নীরুপায় হয়ে কান্দছে। স্তন্যে পাচ্ছে, লক্ষ্মী বলছেন—কী মেয়েরে বাবা, দু'টো কথা বললাম কি না বললাম, কান্দতে শুরু করল।

জিনি জিনির ঘরের দিকে আসছেন। পেছন পেছন দেবশিস। জিনি জানালাগুলো খুলে দিচ্ছে, পর্দা টেনেটুনে ঠিক করছে। আর চোখ মুছেছে। পাশের বাড়ি থেকে সেতারের শব্দ আসছে। সে নিজেও অনামনস্ রাখার চেষ্টা করছে। ভাবছে, তার স্মিটরিতে একটা রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড চাপিয়ে দেবে কি না। এই সকালে, এই মন খারাপের মধ্যে একটু রবীন্দ্রসংগীত স্তন্যে তার খুবই ইচ্ছা করছে। তা হয়তো তার গ্লানি ধুয়ে দিতে পারে। সে হয়তো শান্তভাবে জেনে নিতে পারে আর কোন কোন কাজ তার করা উচিত নয়। কতখানি ছোঁয়া তাকে বাঁচিয়ে চলতে হবে! তখন লক্ষ্মী প্রবেশ করছেন ঘরে। দেখছেন। বলছেন— এই ক'দিন জামাকাপড় আলাদা করে শুকোতে দেবে। পাঁচদিন হয়ে গেলে যা যা ব্যবহার করেছে তার সব শাবান-কাচা করবে। বালিশের ওজাড়, বিছানার চাদর, মশারি— সব। আর পাঁচদিন তো থাকছেই না। তাহলে তিনদিন পরেলেই সব করে দেবে। নিজে কাচতে যেনো না। লোকের বলবে, নতুন কতক খাটিয়ে নিশ্চি। অঙ্কর মাকে বোলো, কেচে দেবে। সেইদিন আর আমাদের



কিছু সেব না।

জিনি শুনছে। কোনও উত্তর করছে না। কাঁই-বা বলবে। সে ঘাড় কাত করছে। লক্ষী গজ গজ করতে করতে বেরুচ্ছেন—বড় নেমাকি বাপু!...বিকাশ দেখছেন, চেনাছেন, কোনও কথা বলছেন না। খুব অলস লাগছে তাঁর। ছেলের বিয়ের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন। আজ বেলা সেবার কথা ছিল। কিন্তু সে-ভাকনা ছেড়ে দিয়েছেন। এতদিন পর আল শরীর জেগে উঠেছিল। বিকাশকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। বিকাশ ভাবছেন, কথায় বলে, অমরকাসে কপালে চক্ষম চটচট করে। তাঁর সেই অবস্থা।

লক্ষীরও আজ স্কুলে যাবার কথা। এই ক’দিন তিনি যাননি। মালভানির ওপর স্কুল তালাবার ভার আছে। কিন্তু বিকাশ অফিসে যাবেন না শুনে লক্ষীরও আর যেতে মন লাগছে না। ভাবছেন, বহুদিন পরে শীতের দুপুরটা স্বামীর সঙ্গে শুয়ে কাটানেন।

দেবাশিস জিনিকে বলছে—কী এমন বলছে মা তোমাকে যে তুমি কেনে-কেটে ভাসিয়ে দিলে?

জিনি কথা বলছে না। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এই তবে নিয়ম। এই তবে শস্তরবাড়ি! স্বত্বচক্রকে এখানে তবে এমনই অশুচি ধরা হয়। তাদের বাড়িতে দুই বউদি আর সে তিনজনে পালা করে হত। সারা মাসে কেউ না কেউ রক্ততে আছে। কিন্তু সেখানে এত অশুচি ছিল না। সে ভাবছে, সে হেঁটে-চলে বেড়াবে এই গৃহে। তাতে চেয়ার-টেবিল আলমারি অশুচি হবে না? যে-মেঝেতে ঠাকুরের আসন সেই মেঝেতে সেও দাঁড়িয়ে, তাতে আসন অশুদ্ধ হবে না? অন্যান্য ঘরের পর্দাগুলো যে তার গায়ে লাগবে, আর দেবাশিস যে তাকে ছুঁয়ে সেই শরীরে মা’র গলা জড়িয়ে ধরবে তাতে অশৌচ ঘটবে না? ওই যে অন্ধর মা, ওরও তো হর, মহিলা যখন, ও কি এসে বলে—মা আমি কিছু হইনি!

রাগ হতে থাকে জিনির। অপমানিত লাগতে থাকে। নিজেকে শাস্ত করার জন্য চোখ বন্ধ করে সে। আর বন্ধ চোখের তলায় মায়ের মুখ দেখতে পায়। এই প্রথম, মায়ের বাক্য অমান্য করছে জিনি। এই প্রথম তার শিক্ষাপ্রাপ্ত সন্তোর সঙ্গে উপলব্ধিগত সত্য মিলাছে না। সে মনে মনে বলছে—আমি ঠেকে মা বলে ভাবতে পারব না। কিছুতেই পারব না। আমায় তুমি ভাবতে বোলো না মা। আবার তার কান্না পাচ্ছে। দেবাশিস পাশে খবরের কাগজের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে। সে দেখছে। ছ’মাসে বামফ্রন্ট সরকার কিছুই করে উঠতে পারেনি এই রাজ্যের ভালর জন্য—এ কথা বিস্তরভাবে লিখেছে কাগজটি। জিনির খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু এখন পড়তে ইচ্ছে করছে না। তখন, অন্ধর মা জিনিকে ডাকছে—বউদি, আসেন, মায় সানে গ্যাসেন। আমি ময়লা মাখসি। বেইলা দেই। আপনে লুচিগুলা ভাজেন।

কাজ পেয়ে বেঁচে যাচ্ছে জিনি। বলছে—যাও। যাচ্ছি। সে বিছানা থেকে নামছে। দেবাশিস আঁচল টেনে ধরছে। আঙুল দিয়ে গাল দেখিয়ে ইশারা করছে। জিনি পারছে না। তার ইচ্ছে করছে না। সে জোর করে আঁচল ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে রান্নাঘরের দিকে।

দেবাশিস জিনির চলে যাওয়া দেখছে। নিজেকে অবাস্তর লাগছে তার। অক্ষম লাগছে। জিনি, তার বউ, তাকে ফেন ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই। কিংবা, ধরা দিচ্ছে না মেয়েটা। দেবাশিস অফিসে শস্তরদাদের কাছে নতুন দাম্পত্য বিষয়ে যেমন শুনেছে তার সঙ্গে মিলাছে না কিছুই। তার দিশেহারা লাগছে, বা অসহায়। এবং এইসব রাগ, ক্ষোভ ও ক্ষীণ সন্দেহ জন্ম দিচ্ছে। ও কি ভালবাসত আর কারওকে? ভালবাসে? যে-মনে খারাপ ভাবনা আসে সে-মন আপন কষ্ট পায়। দেবাশিসও কষ্ট পেতে থাকছে।

সাত্বে নটার সময় স্কুল থেকে ছুটিতে ছুটিতে এল শেফালির মা। লক্ষী স্নান করে পূজো-পার্বণ সেরে সবে দুটো লুচি মুখে পুরেছেন তখন। বিকাশ গল্পগুচ্ছ নিয়ে চলে গিয়েছেন তাঁর নিজের ঘরে, যেটা আসলে দেবাশিসের ঘর। দেবাশিস টিভিতে খেলা ধরার চেষ্টা করছে। টিভিটা



বিয়েতে যৌতুক পেয়েছে সে। শেফালির মা হাঁফাতে হাঁফাতে বলছে—আর টাকা নয়া না। পোলাপান লইয়া গার্মিয়ান সব যাইতাসে গিয়া। আপনে একবার চলেন।

শেফালির মাকে শাস্ত করার চেষ্টা করছেন লক্ষ্মী। বৃত্তান্ত বোঝার চেষ্টা করছেন। তখন স্কুল থেকে ছায়াদি এলেন ঘরে। দশটায় স্কুল শুরু হয়। টিচাররা আধ্যাত্ম-পনেরো মিনিট আগে এসে পড়েন। শেফালির মাকে থামিয়ে দিয়ে ঘটনাটি বলার চেষ্টা করছেন ছায়াদি। দু'দিন ধরেই গন্ধটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। থেকে থেকে উঠছিল, আবার হারিয়ে যাচ্ছিল। কাছাকাছি কুকুর বেড়াল মরে পড়ে থাকলে যেমন হয়। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনও কুকুর-বেড়াল কেনা একটা মরা ইঁদুরও পাওয়া যায়নি। প্রচুর ফিনাইল ছড়ানো হয়েছে চারপাশে। তবু গন্ধ উঠছিল। আজ গন্ধে আর টেকা যাচ্ছে না। মালতীদি, স্বপ্নাদি এসেই একবার করে বমি করেছেন। গার্মিয়ানরা বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এমন অস্বস্তিকর গন্ধ যে সত্যিই আর কিছুতেই স্কুলে থাকা যাচ্ছে না। আশেপাশের বাড়িগুলিতেও একই অবস্থা। তারা সকলেই স্কুলের দিকে আঙুল তুলছে। কী হল! কী হল! ছায়াদির উত্তেজিত স্বর শুনে বিকাশ আর দেবশিস এসেছেন ঘর ছেড়ে। লক্ষ্মী কোনওমতে তিনখানা লুচি শেষ করেছেন। উঠছেন। তাঁকে যেতেই হবে এবার। তিনি বলছেন—আগে জানাওনি কেন? ছায়াদি মাথা নাড়ছেন। বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম দূর থেকে গন্ধ আসছে। চলে যাবে।

লক্ষ্মী কাপড় বদলাচ্ছেন। বিকাশ ও দেবশিস সঙ্গে যাবে কিনা প্রশ্ন করছেন। লক্ষ্মী বলছেন—দরকার নেই। প্রয়োজন হলে ডেকে পাঠাব।

সকলে মিলে চলে যাচ্ছেন স্কুলের দিকে। স্কুল পর্যন্ত যেতে হল না, তার আগেই গন্ধ পেলেন লক্ষ্মী, সদা পূজো করে খেয়েছেন। ধূপ-ধূনোর গন্ধের পর, লুচি তরকারির গন্ধের পর এই গন্ধে তাঁরও গা ঘুলিয়ে উঠছে। তীব্র পচা গন্ধ। স্কুলে না ঢুকে আশেপাশে ঘুরে দেখছেন তিনি। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে নানা মুখ উঁকি দিচ্ছে, যেন এই গন্ধ তৈরি হওয়ার জন্য এই স্কুলই দায়ী। স্কুলটা যখন হয় তখন অনেকের যেমন সমর্থন ছিল, অনেকের আপত্তিও ছিল। আপত্তি যাদের ছিল তারা এখনও মুখিয়ে আছে।

কোথাও কিছু খুঁজে পেলেন না লক্ষ্মী নিজেও। তিনি স্কুলে ঢুকলেন। কয়েকজন অভিভাবক তখনও বাচ্চা নিয়ে বসে আছেন। এত খারাপ গন্ধ সত্যি সহ্য করা যায় না। তিনি নিজের চেয়ারে বসে কপালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। কী হতে পারে! কোথা থেকে এ গন্ধ আসতে পারে! হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো দীপনের কথা মনে পড়ল তাঁর। ইস! এতক্ষণ এ কথা মনে হয়নি! দিদিমণিদের ডেকে খুব উত্তেজিতভাবে লক্ষ্মী বললেন—চলো তো, একবার ওপরে চলো তো!

খুব শাস্ত মুখে দরজা খুলে দিল দীপন। সে মাছ কুটছিল। হাতে মাছের আঁশ লেগে আছে। তার পেছন থেকে ভলকে ভলকে আছড়ে পড়ছে পচা বিকৃত জটিল গন্ধ। দিদিমণিরা নাকে আঁচল-চাপা দিচ্ছেন। দু'চারজন অভিভাবকও এসে দাঁড়িয়েছেন পিছনে। লক্ষ্মী ভাবছেন, দীপন ঠিক আছে। তাহলে গন্ধ কীসের! মাসিমা কোথায়? তিনি জিজ্ঞেস করছেন—মাসিমা কোথায়?

দীপন বলছে—মা ঘুমোচ্ছে। শরীরটা ভাল নেই তো!

—ঘরে এ গন্ধ কীসের?

—গন্ধ! কী গন্ধ!

আশ্চর্য! লোকটা গন্ধ পাচ্ছে না? এই তীব্র গন্ধ পাচ্ছে না? লক্ষ্মীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক হল। কিছু একটা ঘটেছে। খারাপ কিছু। তিনি বললেন—মাসিমা কোথায়? দেখতে যাব।

দীপন দরজা ছেড়ে সরে যাচ্ছে। সহজ স্বাভাবিক মুখ—যান। ও ঘরে।

মাসিমার ঘর চেনা আছে লক্ষ্মীর। কতদিনই তো এসেছেন ওপরে। তিনি সটান চলে যাচ্ছেন সে-ঘরে। সঙ্গে অন্য দিদিমণিরা। অভিভাবকরা এগোতে সাহস করছেন না এখনও। সকলের নাকে রুমাল চাপা। রুমাল না হলেও হাত চাপা। মাসিমার ঘরের দরজা ভেজানো। গন্ধের উৎস

যে ও ঘরেই, এ সম্পর্কে কারও আর কোনও সংলগ্ন নেই। লক্ষ্মী দরজা ঠেপছেন। জানালাগুলো বন্ধ। পর্দা ফেলা। ঘরে আলো নেই। আধো আলো অন্ধকারে বিছানার দিকে তাকিয়ে চিংকার করে উঠছেন লক্ষ্মী—ও মা গো! ও মা!... নিজের অজান্তেই সুইচবোতের দিকে হাত চলে গেছে তাঁর। দরজার পাশেই সুইচবোতের সব সুইচ খুলে দিচ্ছেন তিনি। ডিড়িক ডিড়িক শব্দ করে দু'বারের চেষ্টায় ছপে উঠছে ডিড়িক। লক্ষ্মী দরজা ঠেপছেন। অন্যরা দেখছেন—বিছানায় ভিৎ হয়ে আছে মাসিমার দেহ। গায়ে কখন ছাপা দেওয়া। সাবান শরীর পাঁচ ফুলে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি ফুলে উঠেছে স্তন দু'টি। ফোলা উঠে গায়ে পেটকেও ছাপিয়ে গেছে। অমন টকটকে রঙের মাসিমা ছাইবর্ণ হয়ে গেছেন। চোখ দু'টি খেঁয়ে নিয়েছে গিপডেরা। দু'খানি গর্তের মধ্যে জেগে আছে কালচে মাংস। উৎকট গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী। তারই মধ্যে চোখে পড়ছে মাসিমার মাথার কাছে টেবিলে সারসার খাবার ভর্তি প্লেট। কোনওটায় রুটি, কোনওটায় ভাত, সঙ্গে তরকারি, মাছ। গ্লাস ভর্তি জল। হুদুরে আরশোলায় সব হাড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। একটি প্লেটে তাজা দু'টি টোস্ট, সকালবেলায় দীপন খেতে দিয়েছিল মাকে। রাজাই দিয়েছে এই ক'দিন। যদি মার খিদে পায়।



জুল ছুটি ছিল এই ক'দিন। মাসিমার ব্যাপারটা মেটাতে নানা ঝামেলা গেছে। তা ছাড়া ওই বিষাক্ত গন্ধ কিছুতেই যেন যেতে চাইছিল না। মাসিমার মৃত্যু থানা-পুলিস পর্যন্ত গড়াল। স্বাভাবিক মৃত্যু কিন্তু ঘটনাচক্রে কী অস্বাভাবিক হয়ে গেল।

আজ স্থল খুলবে। আজই বিকেলে তিনিকে নিয়ে ঘিরে আসবে দেবশিস। চা খেতে যেতে সে-কথাই তুললেন বিকাশ। মেয়েটা ত্রাণ ক'দিন হল এসেছে অথচ এরই মধ্যে সে না থাকতে কেমন ফাঁকা লাগছে বাড়িটা। তিনি বলছেন—ওদের তো আজ ফেরার কথা।

লক্ষ্মী চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। বলছেন—দেখো, আবার কী হয়।

—কী হবে?

—কী করে বলব। যা সব হচ্ছে। যাই বলো, মেয়েটার কিছু পয় নেই।

বিকাশ চমকে উঠছেন। ঞ্চ কুঁচকে বলছেন—তার মানে?

—মেয়েটার পয় নেই। বাড়িতে পা দিতে না-দিতে কী কণ্ডাই হল! মাগো, রাত্রে ঘুমোতে পারছি না।

—এখানে ওর দোষ কোথায়? কোথায় পাজার কোন বাড়িতে কে মরে পড়ে থাকবে তার দায় ওকে নিতে হবে কেন? তোমার কি বুদ্ধি-সুদ্বি গুলিয়ে গেল?

লক্ষ্মী চোখ পাকচ্ছেন। সে-চোখে কী যেন একটা ঘনিয়ে আসছে। বিবুদ্ধে ঝড়। গভীরভাবে নিরবিদ্যে উন্মাদ রাগের মতোই লাগে বটে। কিছু শুধুমাত্র রাগও নয়। ঈর্ষা নাকি? ঘৃণা? ঠাংহা করা সম্ভব হয় না সবসময়। স্নেহী চোখে বিকাশকে বিদ্ধ করছেন তিনি। বলছেন—বাবা! খুব বরদ দেখছি। ক'দিন হল ও এসেছে?

—যে ক'দিনই হোক, এসেছে তো আমাদের হয়েই। ও তো এ বাড়িরই একজন এখন।

—তুমি জানো, কটা চোখের মেয়েরা কখনও শুভ হয় না?

—কী যা-তা বকছ! ইউরোপ-আমেরিকায় ক'জন মেয়ের চোখ কালো বলো তো? ওদের জানা কি পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে?

—সে ওদের একরকম, আমাদের একরকম। কটা ছোখের মধ্যে কোনও নিক থেকেই ভাল নয়।

—তা সন্দেহ করার সময় তো তুমি ওকে দেখতে দিয়েছিলে। তখন তোমার এ সব মনে হয়নি? বিকাশ আধকাপ জা এক চুমুকে শেষ করলেন। উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। বললেন—ও আমাদের মেয়ের মতো। ওর নামে জোর করে নিজের সংসারে কু-সংস্কার টেনে এনে না।

লাফিয়ে উঠলেন লক্ষ্মী। তাঁর শরীরের খাঙ্কায় টেবিল কেঁপে উঠল। কণ্ঠে-গোটে তনয় শব্দ হল। তিনি বললেন—কী বললে তুমি? কী বললে? আমি কু-সংস্কার টেনে আনছি? আমি কু-সংস্কারগ্রস্ত? আমার মতো আধুনিক শাস্তি ও আর কোথাও পারে? নাহি। দেহান্তি। আরে ওর মতো ওরকম বাংলায় এম এ কলকাতা শহরে পাখে-ঘাটে গজাগড়ি ঘাঘ।

বিকাস উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁর কণ্ঠাটা বিপ্রাহ করে। তিনি বলেন—এ সব প্রসঙ্গ কেন আসছে? লক্ষ্মী, আমি দেখেছি, ওর স্থাপ্যারে তোমার আচরণ অসংলগ্ন হয়ে যায়। একটি মেয়ে ঘরে এল কি এল না সে শুভ না অশুভ, পর কি অপার, সে এলে ভাল ঘটনা ঘটছে না খারাপ ঘটনা এ সব বিচার শুরু করলে। কোনও মানে হয়? তুমি বন্ধন বউ হয়ে এসেছিলে তখন যদি এ রকম বিচার হত? তুমি ভাল না মন্দ—তুমি শুভ না অশুভ—তোমার কেমন লাগত? তুমি একটা স্কুলে পড়াও লক্ষ্মী...

—কী? কী বললে তুমি। কী বললে।

লক্ষ্মী স্থলে উঠলেন। দরজা দিয়ে জানালা দিয়ে উত্তরে বাতাসের মতো কলহ ঢুকে পড়ল। এতদিন লক্ষ্মী নামা বিষয়ে বিকাশকে দায়ী করেছেন আর বিকাশ নীরবে, নির্বিবাদে সেইসব সহ্য করে এসেছেন। লক্ষ্মীর দু'খানি সিঁজার করা বাচ্চার আগমনের জন্য দায়ী হয়েছেন বিকাশ। মাথুরের গড় ছেড়ে বালিগঞ্জ বা সল্ট লোকে বাড়ি করা হল না তারও দায়ভাগী বিকাশ। দেবার্চনের ওই পরিণতিও বিকাশের জন্যই। বিকাশের জন্যই লক্ষ্মী শারীরিকভাবে ক্ষুধার্ত রইলেন দীর্ঘকাল, চরম আত্মদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখলেন। এ সব স্তনতে স্তনতেই বিকাশ জানলেন—তাঁর এই কেরানিজীবন থেকে বেরবার প্রচেষ্টাও আসলে তাঁরই অক্ষমতার দায় কারণ লক্ষ্মী না থাকলে সৌক্যও তিনি করতেন না। বিকাশ শাস্তি বজায় রাখতেই লক্ষ্মীকে মেনে এসেছেন চিরকাল। কিন্তু শাস্তি পেয়েছেন কি? সে-খবর আর নেওয়া হয়নি। সংঘর্ষ এড়াবার জন্য অত্যন্ত নমিতভাবে তিনি তাঁর ইচ্ছাগুলি পেশ করে এসেছেন বরাবর। কিন্তু তাতেও সে সব গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেনি। লক্ষ্মীকে যত মেনেছেন বিকাশ লক্ষ্মী তত বেশি অভিযোগ করেছেন। লক্ষ্মীকে যত সুখী করার চেষ্টা করেছেন লক্ষ্মী তত বেশি অসুখী হয়ে উঠেছেন কারণ অপরের এতটুকু উন্নতি—বিশেষত তা যদি হয় বিকাশের পদমর্যাদার চেয়ে বেশি কিছু—তবে অভিযোগে উদ্ভাল হয়েছেন তিনি। যেন এই পৃথিবীতে বিকাশেরই হওয়া উচিত ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাবান, সবচেয়ে সম্মানীয়, সবচেয়ে ধনী ও ব্যক্তিত্ববান। কিন্তু তিনি কিছুই হতে পারেননি, অকর্মণ্য বিকাশ হয়েই তিনি ছিলেন আর অভিযোগ স্তনতে স্তনতে বিকাশের মনে হয়েছিল—হবেও-না। তিনিই এ সব কিছুর জন্য দায়ী। যদি দায়ী না হন, তাহলেও, স্ত্রীর অভিযোগ তাঁকে স্তনতে হবে। স্তনতেই হবে। এরই নাম দাম্পত্য। এই কলহ। এই অভিযোগ। স্ত্রীর খয়ের সঙ্গে সমানতালে দৌড়তে না পারার অক্ষমতায় এই দায়ী হয়ে থাকা। কিন্তু এর সবটাই তাঁর নিজের বিষয়। নিজের দায়। কিন্তু লক্ষ্মী যখন আরও অনেককে দায়ী করতে চাইছেন, অকারণে, বিশ্বের কোনওখানে ঘটে যাওয়া কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য সহজ সরল বধুটির ওপর দায় চাপাচ্ছেন তখন বিকাশের প্রতিবাদ আসছে। শাস্ত, নিকটের প্রতিবাদ। কিন্তু লক্ষ্মী স্থলছেন। প্রলাপের মতো তীক্ষ্ণ ও অবিশ্রাম বেরিয়ে আসছে তাঁর মুখ থেকে—ও। এত দরদ। আমি এ সংসারে পর হয়ে গেছি। দু'টা কথা বলেছি কি বলিনি এত বড় অপবাদ নিয়ে নিলে আমাকে। বুড়ি হয়ে যাচ্ছি তো, বয়স হচ্ছে তো আমার। আমাকে ভাল লাগবে কেন এখন?

মানুষ তখন যে নীচে নেমে যেতে থাকবে আর পৌঁছে যাবে কর্মমাক্ত পিচ্ছিলে তা কেউ বলতে পারে না। কোনও মানুষ নিজেরও জানে না কখন স্থলন হয় আর চূকে পড়বে অশ্রদ্ধার উপকরণ— সমস্ত ভালবাসা ও বিশ্বাস কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি তখন। যা ভাল তা ভালবাসা কঠিন নয়। কিন্তু ভালর ধারণার সঙ্গে যখন অমিল ঘটে কিংবা চরম বিরোধ তৈরি হয় তখনই নিজস্ব ভালবাসার পরমায়ু যুরোতে চায়। সে এক কঠিন সময়।

বিকাশ লক্ষীকে ভালবাসেন কি না সে হিসেব দীর্ঘদিন করা হয়নি। কিন্তু পূর্ববধু এসে লক্ষীরে এই আত্মপতন বিকাশের অভিপ্রেত ছিল না।

লক্ষী কাদছেন। বিকাশ চলে যাচ্ছেন বাইরে। তাঁর গাছগুলিকে অনেকদিন দেখাতেনো করা হয়নি। আজ পাড়াটা একবার চকর মারবেন। মনটা ভেঙে যাচ্ছে গেছে। তিনি সাধারণত লক্ষীর কথা বললে কলহ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। আজ আর এড়ানো গেল না। অস্তর মা বাসন মাজছিল। সেও সব শুনেছে। বিকাশের মনে অশান্তি হতে লাগল। কিন্তু তিনি এর পত্তন ভাবলেন, ওটুকু না বললে আরও অশান্তি হত তাঁর। ছোটখোকা যদি থাকত আজ, যদি তার সামনে এ সব কথা হত, সে কি সহ্য করতে পারত? সেও প্রতিবাদ করত। নিশ্চয়ই করত। বিকাশ এসেগেলেন। মিথিলেশবাবুর সেতারের শব্দ হাড়িয়ে গিয়েছে রাস্তায়। পথ-ঘাট শিশিরে ভেজা। বিকাশ চাদের জড়িয়ে দু'পাশ দেখতে দেখতে চলেছেন। মল্লিনাথের বাড়ির কাছে এসে আরও মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর। বাড়িটায় যেন প্রতিদিন অন্ধকার জমছে। চুন-বাগি খসিয়ে ফেলে শুধু দুঃখ আর বিষমতার দেওয়াল। মাত্র ক'দিনেই পরিবারটা শেষ হয়ে গেল। একজন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। মাত্র ক'দিনেই কীরকম বেতল হয়ে গেলেন! এই ভাঙন নিশ্চয়ই অনেকদিন আগে শুরু হয়েছিল। তলায় তলায়। গভীর প্রক্রিয়ায়। যারা ভাঙছেন, তাঁরাই টের পাননি। হঠাৎ এমনভাবে সব ধসে পড়ল যে সর্বনাশ আর ঠেকানো গেল না।

মল্লিনাথের বাড়ি হাড়িয়ে আরও একটু এগোতে দু'টি মানুষ চোখে পড়ল বিকাশের। ধীরে ধীরে তাঁরা এসেগেলেন। একজন আনিসুজ্ঞামান। একজন তৃণাঙ্গুর। আনিসুজ্ঞামান তৃণাঙ্গুরকে হাটতে সাহায্য করছেন। তৃণাঙ্গুর টলে টলে পা ফেলছেন। ছোট ছোট পদক্ষেপ। অনেকটা যেন শিশুকে হাটতে শেখানো অভ্যাস করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন কলেজ যাননি তৃণাঙ্গুর। ইদমীং সত্য এসে গাড়ি করে তাঁকে কলেজে পৌঁছে নিচ্ছে আবার নিয়েও আসছে। আনিসুজ্ঞামান এই বাবস্থা করে দিয়েছেন। সত্যার ব্যবসা হচ্ছে। তার যেন এসে পড়া দেখিয়ে নিচ্ছে তৃণাঙ্গুরের কাছে। বিকাশ দেখছেন।

নীলিমার ফ্ল্যাট থেকে সেতারের শব্দ আসছে। নীলোফা নিজের ঘরে বসে সেতার বাজাচ্ছে। নীলিমা নিজের বালকনিত্যে গাছের পরিচর্যা করছেন। নীলোফার বাগান থেকে সেই লতাটি বালকনিত্যের গরাদ ছেড়ে লাফিয়ে পড়াছে শূন্যে যেটি একদিন সে সংগ্রহ করে এনেছিল কোনও বাড়ি থেকে আর কনসাই করার ইচ্ছে জানিয়েছিল বিকাশের কাছে। বিকাশ ধমকে দিয়েছিলেন। দেখতে দেখতে কেমন দিন পেরিয়ে যায়। এই যে তৃণাঙ্গুর, এরও জীবন কীরকম অদ্ভুতভাবে গড়ে উঠল আবার উঠলও না। তৃণাঙ্গুরের বাবা সমরেশ ছিলেন অদ্ভুত মানুষ। অসম্ভব জ্ঞানী, অথচ জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো ভুল একটা লোক। বিকাশ দেখেছেন, অনেক কষ্ট করেছেন নীলিমা। সেই সময় চাকরি-বাকরি করেছেন। আজ থেকে কতদিন আগে। তখন ঘরের বড়য়ের চাকরি করতে যাওয়া এ পাড়ার ভাবতেই পারত না কেউ। নীলিমা ঘর সামলেছেন, ছেলে মানুষ করেছেন, ওই রকম অকর্মণ্য স্বামীকে সামলেছেন কিন্তু এ পাড়ার কেউ কখনও নীলিমাকে গলা চড়িয়ে ঝগড়া করতে শোনেননি। তাঁর কাছে কোথাও ফাঁকি ছিল না। কিংবা, ছিল হয়তো, ওই মানুষ করার মধ্যে কোনও ভুল ছিল হয়তো, যার জন্য তৃণাঙ্গুরের বিবাহ ভেঙে গেল, শোনা গেল তার স্ত্রী তাকে দ্রো পয়জন করেছে, যা বিশ্বাস করতে অসুবিধে হয়, কিন্তু এটা ঠিক যে তৃণাঙ্গুর এখন চলতে-ফিরতে পারছেন না ঠিকঠাক। কেনই-বা তৃণাঙ্গুরের স্ত্রী তাঁকে ভালবাসতে পারল না, এর কিছুটা দায়

নিশ্চয়ই নীলিমার ওপর বর্তায়। যেভাবে দেবার্চনের নকশাল হয়ে যাওয়া ও মৃত্যুর দায় বর্তায় বিকাশের ওপর। আর বিকাশের শিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী স্ত্রী বিশ্বসংসারের নানা ঘটনার জন্য দায়ী করতে থাকেন অন্যদের যাদের সঙ্গে ওই ঘটনার সরাসরি বা পরোক্ষ যোগাযোগও নেই। তবু বিকাশ গাছের দায়িত্ব নেন। নিজের কর্মক্ষেত্রে খুব সাফল্যের সঙ্গে পা ফেলেন এবং এক পদোন্নতি থেকে লাফিয়ে যেতে থাকেন অন্য পদোন্নতির দিকে। প্রথমে ছিলেন নীচের সারির কেরানি। লক্ষ্মীর বুকে তখন অনেক প্রেম ছিল। সেই প্রেম দিয়ে বিকাশকে প্রেরণা দিয়েছিলেন লোয়ার থেকে আপার ডিভিশনে পৌঁছানোর জন্য। বিকাশ পৌঁছলেন। লক্ষ্মীর তখন প্রেম শুকিয়ে আসছে। দাবি বাড়ছে। দাবি মেটাতে বিকাশ লাফ দিলেন। অফিসার হলেন। লক্ষ্মীর এক বোনের জামাই গেজেটেড অফিসার। প্রত্যয়িত নকল কাগজে সই করার বিশাল ক্ষমতা ছিল তাঁর। লক্ষ্মী কেঁদে পড়লেন—তুমি কবে হবে? ক—বে হ—বে গো-ও-ও। হলেন বিকাশ। সরকারি চাকরিতে স্বাভাবিক পদোন্নতি হয়। অস্বাভাবিকও হয়। বিকাশের অস্বাভাবিক পদোন্নতি হতে লাগল। বিকাশ নকলে সই করার ক্ষমতাবাহী হলেন। পাড়ার ছেলেরা—মেয়েরা, বুড়ারা—বুড়িরা নানা নকলে সই দেবার জন্য বিকাশের কাছে আসতে লাগল। পরীক্ষার নম্বরের কাগজ, ব্যাল্কের কাগজ, লাইব্রেরির সদস্যপত্রের আবেদনপত্র—হাজারও ধরন। তারা ডিং ডিং করে বেল বাজালে, লক্ষ্মী ব্যাজার মুখে দরজা খোলেন, বলেন—ওর এখন সময় নেই, রেখে যান। বলেন—সব সময় কি পারা যায়? যারা আসে, শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, মাটির দিকে চোখ। লক্ষ্মী দয়া করেন। আঃ—লক্ষ্মী অনুভব করেন—দয়া দেখাতে কী আরাম! লক্ষ্মী দয়াবতী হয়ে যান এবং ক্ষমতা উপভোগ করেন। ‘আমার স্বামী’ বলার সময় তাঁকে অনেকটা লক্সা পায়রার পাশে উদ্ভত গ্রীবা তোলা দেশি পায়রানির মতো লাগে। এবং গর্বের সঙ্গে, দয়ার সঙ্গে দাবি উত্থিত হয়। এমন কোনও শাড়ি কেউ পরতে পারবে না যা লক্ষ্মীর নেই। এমন কোনও নকশা থাকবে না পৃথিবীতে, যা দিয়ে লক্ষ্মীর গয়না তৈরি হবে না। বিকাশ ক্লান্ত হয়ে যান এবং টেবিলে মাথা রাখেন। মৎস্যজীবী বড় বড় মৎস্য ব্যবসায়ীরা টোপ ফেলেন বিকাশের সামনে। টোপের দিকে তাকিয়ে থাকেন বিকাশ আর চোঁক গেলেন। এক এক সময় ইচ্ছে করে খেয়ে ফেলেন। খেলেই ফ্লাট। খেলেই গাড়ি। খেলেই হাতের মুঠোয় সল্টলেক আর বালিগঞ্জ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেন না। শেষ পর্যন্ত জীবিত দেবার্চন কাছে এসে দাঁড়ায়। কোমল প্রশ্ন করে, বাবা, ওইখানটা জানো, ওই জায়গাটা? কথামুতের নরেন সামনে এসে দাঁড়ায়। হাত ভর্তি প্রার্থনা নিয়ে দেবীর কাছে এসে দাঁড়াচ্ছেন দরিদ্র বিপন্ন অথচ শক্তিমান মানুষ। কিন্তু চাইতে ভুলে যাচ্ছেন। বিকাশের ক্লান্তি আসে এক এক সময়। কত অজস্র অর্থহীন চাওয়া দিয়ে বেঁধে রেখেছেন এই জীবনকে। কত অপমান অভিযোগ, কত দুঃখ-মৃত্যু তবু চাওয়া ফুরোয় না। চাওয়ার জন্যই, চেয়ে চেয়ে কাঙাল হওয়ার জন্যই যেন বেঁচে থাকে মানুষ আর সারা জীবনে কী কী পেল না তার হিসেব করতে করতে মরে যায়। যা পেল তাকে সরিয়ে রাখে। অবহেলা করে। না পাওয়া বস্তুর প্রতিই মানুষের সীমাহীন চিরকালীন লোভ আর প্রাপ্ত জিনিষে অপরিমিত অবহেলা। যদি এমন হত, সব না-পাওয়া পূর্ণ হত, তাহলেও সমস্যার সমাধান হত না। হয়তো তখন সব পাওয়াই একটা মস্ত না-পাওয়া হয়ে দেখা দিত।

বিকাশ চলেছেন। গাছ দেখছেন। শীতে গাছের বৃদ্ধি কম। পথের দু’পাশে যে গাছগুলি লাগিয়েছেন তারা সব বৃক্ষ হয়ে উঠবে একদিন। বিকাশ জানেন না এই বৃক্ষ হয়ে ওঠা তিনি দেখে যেতে পারবেন কি না। প্রত্যেকটি গাছ লাগানো হলেই তা মনে মনে ছোট্টছোট্টকে উৎসর্গ করেন তিনি। গাছ ভালবাসত দেবার্চন। তার ধারণা ছিল গাছের থেকে দূরে চলে গিয়েছে বলেই মানুষ এত স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। এখন বিকাশ গাছ ভালবাসেন। গভীর করে ভালবাসেন। ছেলের ভালবাসায় প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে তিনি, এক সাধারণ সংসারী মানুষ, ক্রমশ বৃক্ষপ্রেমী হয়ে উঠছেন, ক্রমশ গাছ পরিবারের একজন হয়ে উঠছেন। ঘুরে ঘুরে দেখছেন কারও বেড়া খসে গেল কি না, কারওকে গোরুতে মুড়িয়ে খেল কি না, কেউ বুম্বি একটু শীর্ণ হয়ে উঠল। নীলিমার বাড়ির



উদ্ভেদাদিকে দস্তরায়েদের বাড়ির সামনে একটি জায়গার চারা লাগিয়েছেন বিকাশ। এ গাছ খুব দ্রুত বাড়ে। গেল বর্ষায় লাগিয়েছিলেন, এরই মধ্যে প্রায় চার ফুট হয়ে গিয়েছে। এখনও এর বেড়া প্রয়োজন হয়। আরও ফুট তিনেক না হলে বেড়া তোলা যাবে না। এই বর্ষা আসার আগেই বা বর্ষার মধ্যেই হয়তো তিন ফুট আরও পেয়ে যাবে গাছটা। হয়তো সামান্য কুলও দেবে। বেড়ানি বা, নরম পাপড়ি। বৃষ্টিতে ভিজে থাকবে ফুলগুলি। বিকাশ হাত ছোঁয়ালেন গাছটায়। বেড়া থেকে দু'—একটা বাঁশ খসে গেছে। অন্য বাঁশগুলো টেনে টেনে ফাঁক ভরে দিলেন। আর হঠাৎ মনে হল, গাছটা, তার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে আর চোখ পিটা পিটা করছে। তিনি মনে মনে বলতে থাকলেন—‘ফুল দেবে তুমি? এই বর্ষায়? দেবে?’

‘আমাকে তুমি কী দিয়েছ?’—চমকে উঠলেন বিকাশ। হাত ছিটকে বেড়ার লাগল আর বাঁশের খোঁচ ফুটে গেল আঙুলে। বিকাশ তাকালেন। ‘আমাকে তুমি কী দিয়েছ? সারা জীবন শুধু ছালিয়েছ। সংসারের জোয়াল গলায় কুলিয়ে গলায় রক্ত তুলে খেটে মরিছি আমি, আর তুমি?’ দস্তরায়েদের স্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন। এই সাতসকালে। যখন মানুষের ঘুম কাটনি ঠিকমতো, শরীরের আড় ভাঙেনি তখনই কী সব সাংঘাতিক প্রশ্ন ঘরে ঘরে রচিত হচ্ছে। ‘আমাকে তুমি কী দিয়েছ? লক্ষ্মী বলেন বিকাশকে। দস্তরায়েদের গিন্নি বলেন দস্তরায়েকে। সারা জীবন ছালিয়েছ—বলেন লক্ষ্মী। দস্তরায়েদের গিন্নিও বলেন। বিকাশের মনে হয় সারা পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যমসী গিন্নির ভাষা এক, উচ্চারণ এক, উপলব্ধি এক—‘আমাকে কী দিয়েছ? আমাকে ছালিয়েছ সারা জীবন...।’ যদি প্রশ্ন করা হয়—‘তুমি ছালেছ কেন? ছুলা ছাড়া অন্য উপায় কি ছিল না তোমার?’

নীলিমার গলা ভেসে এল ওপর থেকে—‘এবার কিছু পাম লাগাও।’ বিকাশ ওপর দিকে তাকালেন। দেখছেন। নিজের প্রশ্নের জবাব যেন পেয়ে যাচ্ছেন নিজেই। সে-জবাব ওই নীলিমার উপস্থিতি। ছুলা ছাড়াও অন্য উপায় আছে, তা হল নিজের মতো করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। সেটুকু করেছিলেন বলেই নীলিমা আজও, এত কিছু পরও, পঙ্গু হতে থাকা ছেলেকে হটিতে পাঠানোর পরও গাছের ফল নিচ্ছেন বালকনিতে। এখন বিকাশকে পরামর্শ নিচ্ছেন—‘পাম লাগাও।’ বিকাশের মন ভাল হয়ে যাচ্ছে। সকালবেলায় লক্ষ্মীর অসংলগ্ন আচরণের রেশ আর লাগছে না মনে। নীলিমার সঙ্গে দু’দণ্ড কথা বলার লোভ হচ্ছে তাঁর। বলছেন—‘চা খাওয়াবেন নাকি বউদি?’

—হ্যাঁ, কেন খাওয়াব না? তুমি অনি আর মাস্তুলকেও ডাকো বরং। আমি জল চাপাই।

বিকাশ এগিয়ে বান আনিসুজ্জামান ও তৃণাকুরের দিকে। দু’জনে ধীরে ধীরে হটিছেন। মগ্ন হয়ে আছেন কথা বলায়। তৃণাকুর একবার পাথরে হেঁচট খেলেন। আনিসুজ্জামান ধরে ফেললেন তাঁকে। কিছু কথা চলতে লাগল। বিকাশ শুনলেন আনিসুজ্জামান তাঁর দুর্গা বিষয়ে গবেষণার কথা নিয়ে মগ্ন আছেন। বলছেন—...হ্যাঁ। পোড়ামটির কাজে আমি যে-সব দুর্গা পেয়েছি তাতে বৈচিত্র্য আছে। আবার পটচিত্রেও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দুর্গামূর্তি। আমার মনে হয়েছে, যে-কোনও ব্যক্তি, যার শৈল্পিক বোধ প্রবল, তিনি দুর্গার প্রতিষ্ঠিত রূপ ভেঙে নতুন মাত্রা দিতে চেয়েছেন বারবার। হয়তো কবিগানে তাঁর বর্ণনা করেছেন। হয়তো তুলিতে তাঁকে একেছেন। তাঁর শিল্পের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে কোনও জনপদ এবং ক্রমে যুগে যুগে ওই অঞ্চলে দুর্গার ওই রূপই প্রচলিত থেকেছে। এর তো কোনও লিখিত ইতিহাস নেই। এগুলোকে আনুমানিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে মাত্র। ধরা যাক স্বপ্নাদেশের কথা। স্বপ্নে আদেশ পেয়ে যারা মূর্তির গড়ন বদলেছেন তাঁরাও কি আসলে তাঁদের শৈল্পিক মানসকল্পনাকেই রূপ দেননি?

বিকাশ ডাকতে যাবেন—‘তুফনি তারও একবার ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবার মতো হলেন তৃণাকুর। আনিসুজ্জামান কথা খামিয়ে তৃণাকুরকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই ধরার মধ্যে এমনই মায়া এক জনের এবং অন্য জনের এমনই নির্ভরতা, বিকাশের মনে হল—কে বলবে ওরা ভাই নয়!





বড় ধাতব। ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে বলল পাখিটা। আসলে বেলা পড়ে আসছিল আর উড়তে উড়তে তার ডানা দু'খানি ক্লান্ত হয়ে এসেছিল। সে এসে বসে পড়েছিল চলমান মালগাড়ির ছাদে। ফটিক বিলের পাশ দিয়ে এগোচ্ছিল গাড়িটা আর যাচ্ছিল এত ধীর গতিতে যে-পাখিটা ঠাহরই করতে পারেনি ওটা চলমান। বৃকল যখন, একটুখানি ডানা খুলে টাল সামলাল। তারপর ঠুকরে দেখল। হতে পারে সে ঠোঁটে লেগে থাকা খাবারের কণা মুছতে চেয়েছিল কিংবা যাতে বসে আছে সেই চলমান বস্তুটি কী পরখ করতে চেয়েছিল। চলমান অনেক কিছু ওপর বসার অভিজ্ঞতা তার আছে। গরু মোষ ছাগল শূয়ার সবার ওপরই সে সুযোগ পেলে বসে পড়ে এবং ঠুকরে ওদের গায়ের এঁটুলি তুলে দেয়। গোরুগুলি আরামে গলা নামিয়ে দেয়। মোষ—কী অসম্ভব ভাল লাগছে—ভাবতে ভাবতে আকাশের দিকে তাকায়। শূয়ার কান নাড়ে। শুধু ছাগলের কোনও অভিব্যক্তি নেই। পাখি ঠোকরালে একটু ব্যথা লাগে আর সে উদাস হয়ে যায়। অদ্ভুত নির্বোধ চোখে চায় যেন এই পৃথিবীর কোনও আঘাতের কার্যকারণ জানতে তার আগ্রহ নেই, কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ তার নেই। পাখি তাকে ঠুকরে দিয়ে বলে—‘বুদ্ধ’, আর চিক শব্দ করে উড়ে যায়। এখন সে এই রেলগাড়িটাকে ঠোকরাচ্ছে আর বলছে বড় ধাতব আগাগোড়া। তার ঠোঁটে বেশ লেগেছে। ফটিকবিল পেরিয়ে যাবার আগেই উড়ান দিল পাখি, আর বসল বিলের ধারে ঝাঁকড়া ছাতিম গাছটায়, যেখানে তার বাসা। ওই গাছটার নীচেই দাঁড়িয়ে আছে অন্ধ, সে টের পাচ্ছে সন্ধে নামছে, পাখিরা ফিরে আসছে বাসায়। বিলের জলে যত মাছ শেষবারের মতো হুস করে ভেসে উঠেই ডুব মারল। যেন আকাশটা দেখে নিচ্ছে। ট্রেন যাবার শব্দ পাচ্ছে অন্ধ। ঘটঘটাং ড্যাং চৌও... কিচ চিক কিচ চিক খস্—বড় ধাতব। আগাগোড়া আশ্চর্য ধাতব। একটা বড় শ্বাস ফেলল সে, এখন আর কাজ নেই। এখন বাড়ির দিকে ফেরা। সারা দিনে কাজেই বা তার কী? শুধু ঘুরে বেড়ানো, এর ওর বাড়ি কান পাতা, শব্দ শুনে গন্ধ শুঁকে বোঝার চেষ্টা করা কে কেমন আছে। কে কী করছে। চোখ নেই বলে সে কিছুই করতে পারে না। শুধু দৃষ্টির অন্য পার থেকে সমস্ত পৃথিবীকে শুয়ে নিতে চায়। কিন্তু মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগে, বিশেষ করে যখন এরকম সন্ধে আসে। ফটিক বিল থেকে সমস্ত শীত গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাড় কাঁপিয়ে দেয় আর সে দ্রুত পা চালায়, তাড়াতাড়ি গায়ে চাদর জড়াবে বলে, তখন তার এই অন্ধ বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে যায়। সন্ধ্যার পরে যে অনিবার্য অন্ধকার নেমে আসে, তার কেবলই মনে হয় তার নিজের বেঁচে থাকার মধ্যেও ওই রকম অন্ধকার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। যদিও মাস্টার বলে—এ দেশের মানুষ অন্ধের চেয়েও অনেক বেশি অন্ধ। রাত্রির অন্ধকারের চেয়েও গাঢ়তর অন্ধকার তাদের জীবনে ছেয়ে আছে। কিন্তু যখন মাইক বাজে—রূপ তেরা মান্তানা—গান ভরে যায় আকাশে, দলে দলে ম্যাটাডোর ভর্তি করে কত লোক যায় পিকনিক করতে, তখন অন্ধর মাস্টারের কথা বিশ্বাস হয় না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে মাস্টারের সব কথা বিশ্বাস করত, এখনও করতে চায় কিন্তু কোথায় একটা ফাটল ধরেছে তার নিজেরই মধ্যে, যা উপকানোর সাধ্য নেই তার। কিছুদিন আগেকার সব ভাল লাগা পাল্টে যাচ্ছে। সব বিশ্বাসে নতুন করে মোচড় লাগছে। অনেক নতুন প্রশ্ন ও বোধ জেগে উঠছে নিজের মধ্যে। তার শৈশবের বন্ধু হীরু সে-দিন থেকে কাজে লেগে গেল। তার বাবার সঙ্গে জুতো সারাইয়ের কাজে বসবে সে। চামড়া কাটবে, সেলাই দেবে, পেরেকও ঠুকে দেবে কোনও

কোনও জুতোয়। মাখনের বাবা মাখনকে একটা বাচ্চু তৈরির কারখানায় দিয়ে নিয়েছে। বড় বাচ্চু নয়। মাখন বলছিল ওগুলো হচ্ছে টুনি বাচ্চু। উৎসব-টুৎসব হলে যে আলোর সাজ-সাজানো হয় তার কাছে লাগে। অন্ধর চারপাশে সবাই কাছে গেলে বাচ্চু, একমাত্র তাইই কিছু লাগে নেই। তার এতদিনের চেনা দুনিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ছে অচেনা বোধ। এতদিন টেপির সঙ্গে সে মাগ-ভাতার খেলত, ইহানীং টেপি ডাকলে সে আর যায় না। তার ভয় করে। টেপির বুকটা কীরকম গুটি পাকিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, অন্ধর হাতটা নিয়ে সে চেষ্টা ধরে ওই অময়গণা। আগে অন্ধ ভাবত এটা খেলা। সে খেলত। যেমন মেয়েরা খেলে। রান্নাবাটা খেলে। নারকোলের মালায় পাতার কুঁড়ি নিয়ে মাকে নকল করে বলে, তামা মীমচকড়ি আর ভাত—তেমনই মাগ-ভাতারে কী হয়, আড়ালে অন্ধকারে তারা কী করে, কাদ্যগ্রাস্ত জৈনেও সে শুধুই খেলত। নকল করার খেলা। আগুন বিহীন উনুনে নকল রান্নার মতো শরীর বিহীন শরীরে খেলা। কিন্তু এখন আর অন্ধ সেটা পারছে না। টেপি বাচ্চু হাত টেলে নিলে সারা শরীর অংশ হয়ে আসছে। শরীরে এক নতুন বকম বোধ, যা ভয় ধরিয়ে দেয়, যা অসুখের মতো লাগে, কিন্তু এ অসুখের কথা কারওকে বলা যাবে না। যে মাস্টারকে অকপটে সব বলতে পারে সে তাকেও বলা যাবে না। তার মন ধারাপ হয়ে যায়। কেন এমন হবে? কেন এমন কিছু ঘটবে যা সে চায়নি? অন্ধর এখন সারা দিন মাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে। মনে হয় ওইখানেই আনন্দ আছে, ওইখানেই নির্ভরতা আছে। যেন মাস্টারের সঙ্গে থাকলে অন্ধর আর অনভিপ্রেত অনুভূতি হবে না।

এখন পলাশ রোজই অন্ধর সঙ্গে মাস্টারের কাছে চলে আসে। জুলের বইখাতা নিয়ে সে খুশি খুশি মুখে মাস্টারের বাড়ি যায়। মাস্টার তাকে অঙ্ক করিয়ে দেয়। পড়িয়ে দেয় বাংলা, ইংরাজি, ভূগোল আর অঙ্ককে বলে—শোন, অঙ্ক ও যা পড়ে শোন। অঙ্ক শোনে। পলাশ সে-দিন পড়ছিল—আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হট্টু জল থাকে। এটুকু পড়ার আগে সে একবার চেষ্টা করে বলে নিয়েছিল—ছোট নদী—কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পলাশের পড়ার এই শব্দ অন্ধর কানে অন্য রকম ঠেকে। কিছুটা নতুন। কিছুটা ছন্দোময়। এমন করে দুলে দুলে কেউ তো এখানে কিছু পড়ে না, তাই একা অন্ধ নয়—পঠনের এই আশ্চর্য শব্দ ও ছন্দ বস্তির অনায়াসে কান পেতে শোনে, যেন কিছুক্ষণের জন্য তাদের মনে হয় এই বক্তৃতা আর বস্তি নেই। বাবুদের পাড়া হয়ে গেছে। তাদের মনের গভীরে একটি ক্ষীণ প্রত্যাশা দুঃখের বাজনা হয়ে বাজে—আমার ছেলোটো যদি পড়ত। পড়ে না। এখানে কেউই পড়ে না। একেবারে ছ'মাস বয়স থেকে প্রত্যেকটি বাচ্চা শুধু বুটে খেতে শেখে। হামাগুড়ি দিয়ে কুড়িয়ে নেয়—এতটুকু খাদ্যবস্তু অথবা খেলনার ভাঁড়া টুকরো। শুধু অঙ্ক, অঙ্ক বলেই এইরকম বুটে নিতে কুড়িয়ে তুলতে শিখল না কোনও দিন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুনে অঙ্ক ভেবেছিল—ঠাকুর! আর তিনিও কবিতা লেখেন। মাস্টার তাকে অনেক কবিতা শুনিয়েছে। ওই সব কবিতা যারা লিখেছেন তাঁদের নাম সুকান্ত, তাঁদের নাম সুভাষ। কিন্তু কোনও ঠাকুর কবিতা লিখেছেন বলে অঙ্ক জানত না। শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এমনকী সন্তোষী মা কোনও কবিতা লেখেননি। একা গণেশ কোন কালে একটা মহাভারত লিখেছিলেন। সেও তাঁর নিজের মগজ থেকে বেরোয়নি। বাসদেব রচেননি। গণেশ লিখেছিলেন। সেক্ষেত্রে গণেশকে বলা যেতে পারে অনুলিপিকার।

আর মহাভারত তো কবিতা নয়। মাস্টার বলে—মহাভারত মহাকাব্য। মহাকাব্য কী সে অঙ্ক বোঝে না। তবে, মহাভারতের গল্প শুনে তার ভারী ভাল লাগে। সে ঠিক করে ফেলেছে বীর যদি হতেই হয় তবে অর্জুনের মতো নয়, হাতে হবে অভিমন্যুর মতো। স্বয়ং ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করতে আর কে না পারে। ও কি একটা বীরের কাজ হল। মাস্টারের মুখে অঙ্ক যখন নকশাল ছেলেদের কথা শোনে, কল্পনা করে মাঠে মরদানে অস্তিতে গলিতে প্রাণের ভয়ে ছুটে

পাল্যাদ্ধ একটা ছেলে। হাতে হয়তো কলস আছে, হরতো নেই, পায়েই খেলক একটা বোমা বার করে ছুঁড়েও দিতে পারে কখনও, হয়তো কিছুই নেই। এমনকী চাঁচি অবধি ঘুরে ফেলেছে যাতে জোরে ছোটা যায়, আর তাকে তাড়া করছে ছ'জন-সাতজন সশস্ত্র পুলিশ। পুলিশ কিংবা গুপ্তা, কে যে—সব সময় বুঝতে পারে না অন্ধ। শুধু দেখতে পায়—একজনকে তাড়া করছে সাতজন, তার অভিমন্ডর কথা মনে পড়ে। এবং আশ্চর্য লাগে আসা। সেই কারণে, কখন ঘুরে হিসেব নেই, সপ্তরথী দ্বারা অভিমন্ডর হত্যা সংঘটিত হয়েছিল। আজও তেমনি চলছে। এ কথা মাস্টারকে বলেছিল অন্ধ। মাস্টার বলেছিল, এই যে সর্বকায়ানতা, এই হল মহাপ্রাণের মূল শক্তি।

রবীন্দ্রনাথ কি ঠাকুর? কখন এই পূজা হয় বলে তো? জিজ্ঞেস করেছিল অন্ধ। মাস্টার বলেছিল—ঠাকুর? ঠাকুর মানে। তারপর হো হো করে হেসে উঠেছিল, যেমন হাসতে তাকে খুবই কম শুনেছে অন্ধ। সে বুঝতে পারেনি এতে হাসির কী হল, এমনকী পলাশও বোঝেনি। মাস্টার বলেছিল—তাই তো অন্ধ, তোকে কি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি রে। কিছু কিছু কবিতা তুই শুনেছিস কিছু। তোর মনে আছে তোকে বলেছিলাম—কতিনারা জুতোর তলায় বীভৎস কাদার পিণ্ড... আর সেটা শুনে তুই খুমাতে পারলি না। এক ভোরে ছুটে এলি আমার কাছে—সে ছিল রবিঠাকুরের লেখা। রবীন্দ্রনাথ আসলে মানুষ, ঠাকুর নয়। এই যেমন তুই দাস। তোর একটা ভাল নাম দেওয়া উচিত রে অন্ধ। অন্ধ দাস এটা কি কোনও নাম হল।

অন্ধ বলেছিল—দুস্। ভাল নাম দিয়ে আমি কী করব? আমি যা আমার নামও তাই। তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা কী বলছিলে বলে।

মাস্টার বলেছিল—একদিনে বলা যাবে না, বুকলি। তবে কি জানিস, তুই যদি পূজাও করিস রবীন্দ্রনাথকে, এই যেমন তোর মা সন্তোষী মা'র পূজা করে, তবে সন্তোষী মা যা সেন তার চেয়ে অনেক বেশি সেনে রবীন্দ্রনাথ। এটা তো আর কেউ বোঝেনি। শুধু বুঝেছিল ফুলবাগানের এক মিষ্টির দোকানওয়াল, সে কীরকম জানিস।

—কীরকম?

—ফুলবাগানে গেছি একদিন। খুব ঝিদে পেয়েছে। একটা মিষ্টির দোকানে দেখি গরম গরম কচুরি ভাজছে, ভাবলাম খাই, ঢুকে গেলাম। বিশাল মেটা কালো একটা লোক, বিরাট কড়া ভর্তি গরম গরম তেলে গরম গরম কচুরি ভাজছে। লোকটার নাশ পেট, গণেশঠাকুরের পেটে মতো খুলখুল করছে। আমি বেঞ্জে বসলাম। অত মাছি ডনডন করছিল, শুধু দোকানটাকে পছন্দ হয়ে গেল আমার। কেন জানিস?—আমি দেখতে পেলাম, দোকানের চার দেওয়াল জুড়ে অনেক ঠাকুর-সেবতার ছবি—কালি, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সন্তোষী, গণেশ, রামসীতা, রাধা-কৃষ্ণ, শিব, শ্রীচৈতন্য, হনুমানজি আর তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কত বড় ঠাকুর সেই দিন আমি ঠিক ঠিক বুঝেছিলাম। লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ছবি এখানে রাখার মানে কী? লোকটা কচুরিগুলো তুলে কাঁধরি হাতা নামিয়ে রেখে বলল—আজি মোর মনে হয় অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—যেন সে মিটিয়ে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা...এক নিশ্বাসে বলে কড়াকড় আবার কিছু কচুরি দিয়ে বলেছিল—কিছু বুঝলেন? সে-দিন আমার মনে হয়েছিল ভালবাসা যেমন মানুষের অন্তর্গঠনের ইচ্ছে তেমনি পূজাও। অপরিসীম স্নানার পর, ভালবাসার পর পূজা জেগে ওঠে। এই পূজায় কোনও মিথ্যে থাকে না। সংস্কার থাকে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক বই লিখেছেন বুকলি অন্ধ! গানের বই, কবিতার, গল্পের...সে-সব একজন পাঠ করতে থাকলে বছর ঘুরে যাবে। কেউ কেউ তাঁকে ঠাকুর মানে। আমি ভেবেছিলাম ওই লোকটা না জেনে ছবিটা টাঙিয়েছে। কিন্তু সে যখন ওই কথাগুলি বলল...!

অন্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। শুনছিল। সব কথা সে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু মাস্টারের স্বরে রবীন্দ্রনাথ মূর্ত হয়েছিলেন। সেই দোকানির পূজা মাস্টারের স্বরের মাধ্যমে

ঘণ্টা-মুপ-প্রদীপ সমেত আরতি হয়ে অন্ধর শ্রবণে পৌছেছিল। সে, রবীন্দ্রের সম্পর্কে কিছুই না জেনেও তাঁকে অনুভব করেছিল। তারপর বসেছিল—লোগাঘ পাওয়া যাবে ঠাকুরকে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে?

মাস্টার বলেছিল—হাওড়ার স্টেশনে গিয়ে তুই যদি চেপে বসিস একটা ট্রেনে, আর ক্রমশ পেরিয়ে যাস—বেগমপুর, বর্ধমান, বাপটের ঢাল আর পৌছে যাস বোলপুর ইস্টেশনে আর যদি পায়ে পায়ে চলে যাস শান্তিনিকেতন বলে জায়গাটার তবে তুই পেয়ে যাবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

এখন অন্ধর সে-সব কথা মনে পড়ছে। এই সন্ধ্যায়, যখন সে ক্রমশ বিদায় হয়ে উঠবে। আর ক্রমশ অর্ধহীন লাগছে তার বেঁচে থাকা, আর তখন সে ভাবছে—মাস্টার বলেছিল—শান্তিনিকেতন এক আশ্চর্য জায়গা, সেখানকার সব মাটির রং লাল। রবীন্দ্রনাথ সে-মাটিকে বলে রাস্তিয়েছেন। সেখানকার সব বাড়ির গায়ে সুন্দর ছবি অঁকা। সে-সব রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন। সেখানে যত ছাতিম আর আমগাছ আছে তা সব রবীন্দ্রনাথের লাগানো। ওখানে যত ভিথিরি গান গেয়ে ভিক্ষা করে—রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না। ভিক্ষা করার অপমান ঘূয়ে যায় সেইসব গানে। আর তারা সব আশ্চর্যভাবে বেঁচে থাকে। তুই যদি ওখানে কিছু কিনতে যাস, অন্ধ, তবে শুনবি ওখানকার দোকানদারেরা কবিতায় বেচাকেনা করছে। সেইসব কবিতা রবীন্দ্রনাথের। সেখানকার বৃষ্টি ভাল। কুখু মাটি ভাল। কুখু মাটিতে যারা কষ্ট করে ফসল ফলায় তারাও ভাল, ওখানে যদি তোর কোনও কষ্ট হয়, আর তুই একটা রবীন্দ্রসংগীত গাস, তবে তোর সব কষ্ট চলে যাবে। অন্ধর ইচ্ছে করছে সেই আশ্চর্য শান্তিনিকেতন দেশে ট্রেনে চেপে পৌঁছে যাবে।

ভাবতে ভাবতে ঘরে এল অন্ধ। ঠাকুমা বলল—তর মায় অখনও আইল না। তর বাপের শরীলটা আইজ ভাল নাই। একবার ডাক্তারের কাসে লইয়া যাওন লাগব।

অন্ধর বাবার দীর্ঘ কষ্ট শোনা গেল—আর ডাক্তার লাগব না। আমারে যমে ডাকসে। যেই টাছা ডাক্তারর খ্যাটনে দিবা হেই দিয়া আমার ছেরাদ কইরো।

অন্ধর ঠাকুমা হাউ-মাউ কাদছে এখন। বলছে—তর কি পেরানে অ্যাতটুকও মায়া নাই? আমি বাইচ্যা থাকত যম তরে নিব কান! অত পাপ আমি করি নাই।

অন্ধ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সে জানে বাবা মরে যাবে। কোনও ডাক্তার আর বাবাকে বাঁচাতে পারবে না। বাবাকে বাঁচানোর জন্য মা সন্তোষী মার পূজো করত। অন্ধ একবার ভাবল, মাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূজো করার কথা বলবে। মাস্টার বলেছিল—সন্তোষী মা যা দেয় তার অনেক বেশি দেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপরই তার মনে হল—এ সব ভাবনা বেকার। আসলে যমে টানলে কোনও ঠাকুরই কিছু দিতে পারে না। যম হল, যাকে বলে, বড় ঠাকুরের বড় ঠাকুর। আর তা ছাড়াও, মাস্টারের কথায় একটা অন্য স্পন্দন ছিল। অন্ধর কাছে তা ধরা দিয়েও দিচ্ছে না। সে জানে মাস্টার পূজো করে সমস্যার সমাধান বিশ্বাস করে না। তা হলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পূজো করলে আরও অনেক বেশি যা পাওয়া যাবে তার সম্ভান জানে না অন্ধ। সে-জানে মাস্টার। এবং অন্ধ কোনওদিন তা জেনে নেবে।

তার বাবার এই শরীর খারাপ এবং ঠাকুমার এই বিলাপ যোহেতু প্রায় রোজকার ঘটনা সেহেতু হাতড়ে হাতড়ে চাদর নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল অন্ধ। আজ সে বড় খারাপ গন্ধ পাচ্ছে। শুধু ভ্যাপসা পচা গন্ধ। সে দেখেছে, এইসব পচা গন্ধের পরপরই কোনও খারাপ খবর আসে। মাস্টার অবশ্য বলেছে এর নাম সমাপতন। অর্থাৎ একটা ঘটনার সঙ্গে আর একটি ঘটনা যদি কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই বারবার ঘটতে থাকে তবে এই বিশ্বাস জন্মায় যে একটি আর একটির ওপর নির্ভরশীল এবং দুটির মধ্যে কোনও অদ্ভুত সংযোগ আছে। এটা একটা মিথ্যা ধারণা। সমাপতন একটা ঘটনামাত্র। তার বেশি কিছু নয়। যেমন অন্ধর ঠাকুমা কাক

ডাকলেই হায় হায় করে, বলে—সব যাইব, শনি লাগসে—শুন শুন অন্ধও বিশ্বাস করতে ও করেছিল, কাক ডাকলেই অনর্থ, কিছু মাস্টার বলেছিল—সব ঘোড়ে আরি থাকি কী? তোদের আচ্ছটা কি যে শনি সব কেড়ে নিজে কাক পাঠাবে। এই শব্দের হাজার হাজার কাক সারাক্ষণ কা-কা করছে, তাতে যাদের ভাল হওয়ার তাদেরটা অটক আছে না।

শনি ভাবতে ভাবতেই শনি-শনি শুনতে গেল অন্ধ। কপিলাদির মা চিৎকার করছে। অন্যমনস্ক হটিতে হটিতে কপিলাদির ঘরের কাছে এসে গিয়েছে অন্ধ। বেশ একটা চৌচামেটি হচ্ছে। অন্ধ দাঁড়াল। টেপির গলা পাওয়া গেল—শুন, অন্ধ শোন—

অন্ধর হাত ধরে ফেলেছে টেপি। অন্ধ শব্দ হতে গেছে। শব্দ গলায় বলছে—বী ব্যাপার? তার কণ্ঠ থেকে 'কী' বেরুচ্ছে এক স্বরে, 'ব্যাপার' বেরুচ্ছে অন্য স্বরে। অন্ধর স্বর ভাঙছে। হি-হি হাসতে হাসতে অন্ধর গায়ে পড়ল টেপি। অন্ধ তাকে ঘোড়ে ফেলার ভদ্রিতে বলল—কী বলছিস বল।

টেপি আবার হাসল—হি-হি-হি।

অন্ধর গা দু'লিয়ে উঠল। টেপিকে আজকাল সে সহ্য করতে পারছে না। অনেক কিছুই আজকাল আর সহ্য হয় না। সে রেগে বলল—শুধু হাসিই শোনাবি না বলবি।

কপিলাদির বাড়িতে হঠাৎগোল বাজছে। অনেক মানুষের গলা পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধ নিজের মার গলাও তার মধ্যে পেল। সকলেই কিছু কিছু বলার চেষ্টা করছে। মানোদা বলল—তকনই তোমাকে বললুম, নগেন মিত্তিরের বাড়িতে মেয়েকে কাজ করতে দিয়েনিকো। শুনলে আমার কতা? দু'টো টাকা'র জন্য মেয়েটাকে বেচে দিলে গ্যা!

রামু বলল—আমাদের একটা গেসটিজ নেই? বস্তির মেয়ে বলে যা-খুশি করবে! গরিব বলে কি মানুষ নয়? গতরে খটিতে বায়। গতর বেচতে তো যায় না। নগেন মিত্তিরের বাড়ি ঘেরাও করব। টাকা আদায় করে ছাড়ব।

টেপিকে ছেড়ে এগিয়ে এসেছিল অন্ধ। শুনছিল এ সব। টেপি আবার তার ঘাড়ের কাছে মুখ এনেছে গন্ধে টের গেল অন্ধ। আর স্পর্শে বুঝল, টেপির গুটিপাকানো বুক তার পিঠে ঠেকে আছে। সে বলছে—কপিলাদির পেট হয়ে গেছে বুকলি অন্ধ। চার মাস পার হয়ে গেছে। নগেন মিত্তির উকিলবাবুর বাড়িতে কাজ করতে গিয়েছিল। লোকটা এমন ঢামনা, কপিলাদিকে চুষে ছিবড়ে করে দিয়েছে।

মুখ নিচু করে বেরিয়ে এল অন্ধ। অসহ্য লাগছে। কী হবে এখন কপিলাদির কে জানে। অন্ধর আবছা আবছা মনে পড়ছে—পেঁচোর পিসির পেট হয়ে গিয়েছিল। কামারহাটির কোথায় যেন তাকে খালাস করতে নিয়ে গিয়েছিল পেঁচোর মা। পেট খালাস হবার বদলে পেঁচোর পিসি নিজেই একেবারে খালাস হয়ে গিয়েছিল। পেঁচোর পিসিও কি নগেন মিত্তিরের বাড়িতে কাজ করত? অন্ধ জানে না, কপিলাদিও কি পেট খালাস করতে যাবে, আর মরে যাবে? এও অন্ধ জানে না। হঠাৎ তার মনে হয় পেট খালাস মানে কী? অকারণে তার বেশি বেশি শীত করে। ভয়, অস্বাভাবিক ভয়ে পাগল পাগল লাগে, ওই কথটার মানে যাই হোক, অন্ধ গভীরভাবে অনুধাবন করে—মানোদা এত খারাপ যে মানুষের প্রাণ পর্যন্ত কেড়ে নেয়। পায়ে পায়ে সে চলতে থাকে পলাশের ঘরের দিকে। এতদিন হয়ে গেল পলাশের মায়ের স্বরটা যে কেমন, তা পরিষ্কারভাবে অন্ধর কাছে ধরা দিল না। খুব কম কথা বলে পলাশের মা। যা বলে তাও এত আন্তে বলে যে প্রায় ফিসফিস করে কথা বলার মতো শোনায। এই বস্তিতে সকলেই ছোরে কথা বলে। তারা আনন্দেও চৈচায়, দুঃখেও চৈচায়। চৈচিয়ে ঝগড়া করে, চৈচিয়েই সোহাগ করে। কিন্তু পলাশের মা আলাদা। অন্ধর তাই পলাশের মাকে একটু দূরের মনে হয়। কিন্তু এ এমন দূর বা সবসময়ই কাছে ডাকে। পলাশের মায়ের নীরবতা অন্ধকে এমন আকর্ষণ করে যে যখনই অন্ধ এ ঘরে আসে, তখনই তার মধ্যে প্রত্যাশা সঞ্চিত হয়। পলাশের মা তাকে ডেকে



একটু পাশে বসাক। দু'টো কথা বলুক। কিন্তু বাধিকা কখনই তা করেনি। অন্ধ জানে অনেক দিন হল পলাশের বাবা আসছে না। সেই যে লোকটা উদ্বাস্ত কলোনি থেকে পলাশদের এই বসতিতে দিয়ে গেল, তার পর থেকেই তার আর দেখা নেই। অন্ধ বাইরে থেকে পলাশকে ডাকল। হাতে বইখাতা নিয়ে বেরিয়ে এল পলাশ। অন্ধ বলল—আজ যাবি তো?

পলাশ বলল—এই তো বই নিয়েছি।

অন্ধ বলল—বইগুলো আমার হাতে দিবি একবার?

পলাশ হেঁট আর পেনসিল নিজের হাতে রেখে বইগুলো অন্ধর হাতে তুলে দিল। গভীর শ্বাস টেনে বইয়ের ছাণ নিল অন্ধ। আস্তে আস্তে তার সব মনোনিবেশ চলে যেতে থাকল। আজ সন্ধ্যায় তার বাঁচতেও ইচ্ছে করছিল না, এ কথা আর মনেও পড়ল না। তবু কাছাকাছি বসে নিয়ে যাবে কি না, কপিলাদি মরে যাবে কি না, নগেন মিথিয়ার কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত টাকা আদায় হবে কি না, এ সব কিছুই আর মনে এল না। বইয়ের গন্ধ নিতে নিতে সে বলল—তোরা বইয়ের গন্ধটা আলাদা।

পলাশ বলল—ভাল?

—হ্যাঁ ভাল। কিন্তু মাস্টারের ডায়রির গন্ধ আরও চমৎকার, ওর মধ্যে তো ইতিহাস লুকিয়ে আছে তাই। বলেই জিভ কাটল অন্ধ, যেন গভীর গোপন কথা বলে ফেলেছে পলাশকে। তার ও মাস্টারের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি, বাস্ক-প্যাটরা যেন হঠাৎ খুলে ফেলেছে সকলের সামনে, পলাশ কিছু বলার আগেই অন্ধ বলল—আকাশে তারা উঠেছে রে আজ?

পলাশ বলল—হ্যাঁ।

—চাঁদ?

—না, চাঁদ আজ নেই।

চাঁদ যে নেই তা কী অন্ধ জানে? সে চাঁদের আলোর গন্ধ পায়। জ্যোৎস্নাকে স্পর্শে অনুভব করে। কিন্তু এখন পলাশকে অমায়নস্ক করে দেবার জন্য সে চাঁদ ও তারার বিষয়ে অনর্গল কথা বলতে থাকল। জিজ্ঞেস করল—ক'টা তারা, গোন দেখি?

পলাশ গুনতে লাগল—একটা, দু'টো, তিনটে, চারটে—

হেসে হেসে বলতে লাগল অন্ধ। বলল—কী বোকা তুই, কী বোকা। তারা কেউ গোনে?

পলাশ বলল—বেশি তারা মোটেও ওঠেনি, তাই গুনছিলাম।

গোলাপের গন্ধ এল নাকে। অন্ধ জানে মাস্টারের বাড়ি এসে গেছে। এই গোলাপের ডাঁটি, মাস্টার গত বছর এনে পুতেছিল। এ বছর গাছটা ফুল দিয়েছে।

অন্ধ বলল—চল।

পলাশ বলল—দরজা তো বন্ধ।

কাপের যেখানে তালো থাকে, সেই জায়গাটা স্পর্শ করল অন্ধ, তালো দেওয়া নেই, অন্ধ ভাবল—মাস্টার নিশ্চয়ই কপিলাদির বৃত্তান্ত শুনে ওদের ঘরে গেছে। সে পলাশকে বলল—আমরা বসি, মাস্টারকাঁকা এসে পড়বে।

অন্য দিন পলাশ স্কুলের গন্ধ, ভাইয়ের গন্ধ অথবা উদ্বাস্ত কলোনির কথা বলে। আজ সে একেবারেই চুপচাপ।

অন্ধ বলল—কথা বলছিস না যে?

পলাশ বলল—জানিস, আজ আমাদের ঘরে একদান্যও চাল নেই।

অন্ধ জিজ্ঞেস করল—কেন?

—বাবা আসেনি তো, টাকাও দেখনি। মা'র যা ছিল ফুরিয়ে গেছে।

—তা হলে কী হবে?

পলাশ বলল—আগেও তো বাবা এরকম করত। তখন ঘরে কিছু না থাকলে, ওখানকার



দিদা আমাদের খেতে দিত। খুব ভাল ছিল দিদা। এখন তো দিদা নেই। হ্যাঁ রে অন্ধ তোর মা তো বাবুদের বাড়ি কাজ করে। মা শব্দছিল—ওমনি একটা কাজ কি মা'র জন্য ছুটিয়ে দেওয়া যায় না?

চুপ করে রইল অন্ধ। ভাবতে লাগল—পলাশেরা তো ভদ্রলোক। পলাশ ইকুনে পড়ে, ওর মা আস্তে আস্তে কথা বলে। তা হলে, ওরাও বাবুদের বাড়ি কাজ করবে কেন? মান্দার বলে—ভদ্রলোকের ছোটলোক হাতে এক সেকেন্ড সময় লাগে। পলাশেরা কি তা হলে ছোটলোক হয়ে গেছে। ভাবতেই আবার মন খারাপ হয়ে গেল অন্ধ। সে থমক—হাচ্ছ আমি মাকে বলে দেখব।

অলক্ষ্য পরই ঘরে ফিরল মাস্টার। কপিলার বিষয়ে কী কথা বার-বের করতে পারছে না। নগেন মিত্তির ঘুঘু লোক। একে উকিল, তার মেয়েছাটি সর্বনাশে তার জুড়ি মেলা ভার। তা ছাড়া একটা হিসেব মাস্টার কিছুতে মেলাতে পারছে না। কপিলা খুব ছোট নয়। কী করলে সর্বনাশ হয়, বস্তির মেয়েরা তা ন'বছর বয়স থেকে বুঝতে শেখে। কপিলা প্রায় কুড়ি গেল। নগেন মিত্তির যে এককম কিছু ঘটছে, কপিলা তা আগে বলল না কেন? হতে পারে, তাকে কোনও স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। মাস্টার ভাবছে, এইসব বিষয়ে দরবার করতে সে নিজে কখনই যাবে না। কিন্তু এও সে জানে যে নিজে গেলে যতখানি কথা হতে পারে, না-গেলে ততখানি হবে না। তার এই নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া হয়তো-বা বস্তির পক্ষে মঙ্গলজনক হচ্ছে না। কিন্তু মাস্টারের মধ্যে যতটুকু শক্তি আছে তা এই নিজেকে গুটিয়ে নেবারই শক্তি।

পড়াশুনো আজ আর তেমন জমল না। পলাশ চোদ্দার নামতা মুখস্থ করেছিল তা শোনালা মাস্টারকে। মাস্টার বলল—আজ আর পড়াব না রে। গল্পও বলব না। তুই বাড়ি চলে যা পলাশ কল আসিস।

অন্ধ বলল—আমি তবে দিয়ে আসি ওকে?

মাস্টার বলল—যা।

সে পকেট থেকে এক টাকা বের করে অন্ধর হাতে দিয়ে বলল—বেণুর দোকান থেকে দু'বাগিল বিড়ি আর একটা দেশলাই আনিস।

পলাশকে বাইরে রেখে। আবার ফিরে এল অন্ধ। পলাশকে বাইরে রেখে। মাস্টার চোখ বন্ধ করে বসেছিল চুপচাপ।

অন্ধ বলল—মাস্টারকাকা—।

—কী রে।

—পলাশদের বাড়িতে আজ একটুও চাল নেই। ওরা কী যাবে?

—ভোদের ঘরে যখন চাল থাকে না তখনা কী খাস?

—কিছু না।

—ওরাও কিছু খাবে না। কাল বা পরশু একটা সমাধান খোঁজার জন্য ওদের বেরিয়ে আসতে হবে।

—কিন্তু ওরা তো ভদ্রলোক।

—ভদ্রলোককেও পথে বেরোতে হয় রে অন্ধ।

—তুমি ওদের আজকের মতো কিছু দিয়ে দাও না মাস্টারকাকা।

মাস্টার দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো শাটের পকেট থেকে তিন টাকা বের করে। অন্ধকে দেয়। বলে—তুই বললি তাহি দিলাম। কিন্তু পলাশের মা নেবে না। আর এটা কোনও সমাধান নয় অন্ধ। তুই বুঝিস না?

অন্ধ নীরবে বেরিয়ে আসে। হ্যাঁ। বোঝে সে। এটা কোনও সমাধান নয়। একদিনের সাহায্য কোনও সমাধান নয়।

সম্ভবেলায় বাড়ি ফিরেই হারিকেনে জ্বালিয়ে রেখেছিল মাস্টার, পলকে কমিয়ে রেখেছিল। অন্তর তো কী-বা দিন, কী-বা রাত্রি। লণ্ঠন জ্বলল কি জ্বলল না তাহে কিছু এসে যায়নি। কিন্তু পলাশও পলতেটা উসকে দেয়নি। বেশ কিছুদিন চিমনি মোছা হয়নি। কালচে ছোপ পড়ে গেছে। মাস্টার পলতেটা উসকে দিল। আলোটা একটু জ্বোর হল বটে, কিন্তু ঘরের অন্ধকার অপসৃত হল না। মাস্টারের মনে হল—এই বস্তিতে তার আসা কালচে হয়ে যাওয়া নতুনতর মতোই এখন। আলো আছে, তার দ্বারা অন্ধকারের কিছু এসে যায় না। সে একবার হাত মুঠো করে। যদি কোনওভাবে দুনিয়াটাকে সত্যিই বদলে দেওয়া যেত। পারল না। কেউই পারল না। বদলানোর চেষ্টা করতে করতেই সব ধ্বংস হয়ে যায়, শুধু বসন্তে যাওয়া পৃথিবীর স্বপ্নটাই বেঁচে থাকে এবং পৃথিবীর বুকের ওপর রাজত্ব করে চলে পালনশীল সমাজব্যবস্থা। আনন্দে মানুষ নিজেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। এবং সে-প্রতিষ্ঠা ভাঙতে চায়, সারাক্ষণ তার নিজের মধ্যে চলে অসাধারণ দ্বন্দ্ব। অর্ধাংশ চায়—প্রতিষ্ঠার পক্ষে যেতে। যা-কিছু বানানো হয় তা টিকিয়ে রাখতে। অন্য অর্ধাংশ সেই প্রতিষ্ঠা ভাঙে। কখনও ভাঙতে সফল হয়, কখনও হয় না। সফল হলে, সে-সাকল্যের ওপর গড়ে ওঠে নতুনতর প্রতিষ্ঠা, যা আবার নতুনতর ভাঙনের প্রয়োচনা দেয়।

দেশলাই আর বিড়ি নিয়ে ফিরে এল অন্ধ। মাস্টার বলল—আজ কী করা যায় বল তো? মেজাজটা ধরছে না।

অন্ধ বলল—কপিলাদির কী হয়েছে মাস্টারকাবা?

মাস্টার বলল—কপিলার কথা তুই শুনেছিস বুঝি? অবশ্য তুই কী-বা শুনিস না। ঈশ্বর তোকে চোখ না দিয়ে একপক্ষে ভালই করেছে রে অন্ধ। এই পৃথিবীর সমস্ত বিকৃতি তুই শুনিস শুধু, তোকে দেখতে হয় না।

অন্ধ বলল—তাতে কি কিছু কম পড়ে?

মাস্টার চমকে উঠল—কী বললি?

অন্ধ বলল—আমি দেখতে পাই না, কিন্তু এই পৃথিবীটা কেমন হওয়ার কথা সে তো তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছ। চোখ ছাড়া যেমন যেমন বোঝা যায়, আমি তেমনই বুঝেছি। তোমার বোঝার চেয়ে, সে-বোঝাটা আলাদা। কিন্তু আমি তো ওইরকম করেই চাই। যখন বুঝতে পারি—যেমন চাই তেমন হচ্ছে না, তখন আমারও তোমার মতো কষ্ট হয়।

মাস্টার অন্ধর চুলগুলো নেড়ে দিল, বলল—তুই খুব আশ্চর্য রে অন্ধ। তুই যখন কথা বলিস, মাঝে মাঝে আমার কেমন ধাঁধা লেগে যায়, যেন তুই—এক ভগবান বা দার্শনিক বসে আছিস আমার সামনে।

অন্ধ বলল—তুমি আজ কথায় কথায় খুব ভগবান আর ঈশ্বর বলছ, তুমি যে আমার বলতে—ভগবান নয়, যা-কিছু তৈরি হয়, তার সবেরই স্রষ্টা প্রকৃতি। তা হলে?

মাস্টার হাসল, বলল—এর মানে কী জানিস? এর মানে হল আমি যে হেরে গিয়েছি, এইটে এবার বুঝতে শুরু করেছি।

—কর কাছে হেরেছ?

—বলতে পারিস ভগবানের কাছে, যা সত্যি করে বলতে গেলে নিজের সক্ষমতার কাছে। মানুষের অক্ষমতার অন্য নামই তো ভগবান। আমরা যা পারি—তা তো পারিই। যা পারি না অথচ অপ্রাণ পারতে চাই, তার জন্য দু'হাত পেতে ভগবানের সামনে দাঁড়াই। শেষ পর্যন্ত কী হবে জানিস? আমি যা পারব, করব, কিন্তু আমি যে করেছি সেটুকু ভুলে গিয়ে বলতে থাকব এটাও ভগবান করেছেন। অর্থাৎ অক্ষমতা এসে আমার আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করে দেবে।

অন্ধ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মাস্টার আবার অন্য ভাষায় কথা বলছে। ঠিক কী যে বলতে চাইছে, এখন ধরতে পারছে না অন্ধ। মোক্ষা কথা হল—ভগবানে বিশ্বাস করবে, কী করবে না।

মানুষের যে এখন কোন দলে তা কে জানে। ভগবান যেমনই হোক, মানুষকে যে সে বাবুদের মতোই খুব একচোট খাটিয়ে নেয়, সে-বিশ্বাস অন্ধর হইয়াছে। এই যেমন—মা মাঝে মাঝে পুজোর জন্য উপোস দেয়, একটু সন্দেশ আনল বা দুটো কলা, বাতাসা, সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করে দেবে—‘খাইয়া ধুইস না যান, ঠাকুরের ভোগ দিমা।’

মনে পড়তেই হাসি পেয়ে গেল অন্ধর—সব ভোগে মাংস, কলা, সন্দেশ, বাতাসা, খেজুর, খিচুড়ি-পায়ের এমনকী ছাপল পর্যন্ত। ঠাকুরের ভোগ। ঠাকুরের পেট কত বড়! অন্ধর মায়ের মতো আরও কত অন্ধর মা-ই তো এই রকম রোজ রোজ পুজো করছে। আর ঠাকুর ভাদেবও কলা-বাতাসা চেটে চেটে খেয়ে নিচ্ছে। তার পেট খাটে না? কথাগুলো মাস্টারকে শোনাল অন্ধ।

মানস্টার বলল—বেশ জোর প্রশ্ন করেছিস রে অন্ধ। ভগবানের পেট কত বড়, সে বোকা মানুষের কর্ম নয়। শুধু জানবি তোর মতো এই লম্বটা আরও অনেকের মনে এলোছিল, আর তার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে পাগল হবার ঠিক আগে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে—এই গাছপালা, মাটি, নদী, মানুষ, জানোয়ার সব ভগবানের পেট থেকে বেরিয়ে আসছে আর পেটে গিয়ে সোঁদোচ্ছে।

অন্ধ হঠাৎ হাসতে লাগল, অবিশ্রাম বৃষ্টির মতো হাসি। হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল বিছানায়। সে তো জানে না পেট থেকে বেরিয়ে আসাটা কেমন, কিন্তু একটা পেটের মধ্যে গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ সব সোঁদিয়ে গিয়ে জটলাজটলি করছে এ কথা ভেবে তার আর হাসি থামছে না।

কথায় কথায় রাত বেড়েছে, অন্ধর মা ডাকতে এসেছে অন্ধকে। বলছে—খাওনদাওন সব মিটাইয়া আবি অন্ধ, আমার শরীলডা ভাল না, শুইয়া পড়ুম।

মানস্টার বলল—অন্ধ আজ আমার এখানেই থাক। কটি তরকা নিয়ে আসব, খেয়ে নেব দু’জনে।

অন্ধর মা ফিরে গেল। কটি তরকা-ভোজন শেষে চমৎকার টেকুর তুলল অন্ধ।

মানস্টার বলল—শুয়ে পড়বি?

অন্ধ বলল—না। ডায়রি ডায়রি খেলব। অনেকদিন খেলোনি তুমি এটা।

মানস্টার ডায়রি নিয়ে এল, অন্ধকে বলল—খোল। অন্ধ আকাশের দিকে মুখ করে, এক ঝটকায় খুলে ফেলল একটি পাতা, মানস্টার পড়তে লাগল—

—হে পশ্চিমবঙ্গ, তিন বৎসরকাল তুমি কী লইয়া বাঁচিয়া আছ?

—আয়ারাম-গয়ারাম সরকার লইয়া।

—আর?

—মূল্যবুদ্ধি লইয়া।

—আর?

—অস্থিতিশীল জীবন, ভাঙন আর উদ্ধার।

—বুঝাইয়া বলো।

—যদ্যপি কর্ণ সতর্ক করি, ভাঙনের শব্দ পাই। হৃদয় ভাঙে, সংসার ভাঙে, সংগঠন ভাঙে। দশ নেতা, দশ মাথা, দশ মত। নানা মূর্খের নানা মত লইয়া শত শত দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে কিন্তু দেশ চলিবে কী প্রকারে? সংগঠনই বা কীরূপে টেকে? সকলেই পূর্বে আসন প্রত্যাশা করে, তৎপরবত্তী কল্যাণের কথা ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিমাত্র দেয়। অস্থিরতা, অস্থিরতা। সর্বত্র অস্থিরতা। জীবনের স্থিতি নাই। জীবন ও মৃত্যু আজি এ বঙ্গে নিরর্থক।

—ইহা কথা কেন বলো?

—হীরেন বসু নামে এক ভরুশের কথা কহি। প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া সে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতরস

আহরণ করিতেছিল। সহসা প্রেক্ষাগৃহে আরক্ষাকর্মী ঢুকে এবং শূন্য দূরত্বে হীরেনকে গুলি করিয়া হত্যা করে। তাহাদের অভিযোগ, হীরেন আরক্ষাকর্মীদের নিকট হইতে বন্দুক হিন্দুই লাভইয়াছে। তাহা সত্য-মিথ্যা কে বলিবে? কে নির্ণয় করিবে। এক প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি লোকের চক্ষুর সম্মুখে হীরেনের পা ধরিয়া হিচড়াইয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। তৎক্ষণাৎ কোনও প্রতিবাদ উঠিল না। কেহ গর্জন করিল না। কিন্তু কনভেনশন ইন ডিফেন্স অব ডেমোক্র্যাটিক রাইটস অ্যান্ড সিকিয়ারিটির পক্ষে একটি বিবৃতি উঠিল—কোনও মতামতকে বাস্তবের জটিলতা হইতেছে যে হীরেনকে জনসমক্ষে শূন্য দূরত্বে গুলি করিয়া মারা হয়—“We came across the unanimous evidence of quite a large number of persons that Hiren was shot dead of point blank range in full public view.”

ঘটনার তদন্তের দাবি হইল। কিন্তু আরক্ষাপ্রধান পাণ্ডা বিবৃতি দিলেন—এই বিবৃতি ভুল ও মিথ্যা। এই ঘটনা বিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই।

ইহাই আমাদের বর্তমান জীবন। জীবন যাপন।

—মাস্টারকাকা?

—বল।

—কবে লিখেছিলে এই জায়গাটা?

—সত্তর সালের শেষের দিকে।

—এটা তো আটাত্তর সাল?

—হ্যাঁ।

—সত্যিই ওরকম হয়েছিল, না?

—তুই সবটা বুঝেছিস রে অঙ্ক?

—কেন বুঝ না মাস্টারকাকা?

—ভাষাটা অন্যরকম তো, তাই।

—তুমি যখন এ সব পড়ে শোনাও তখন আমি যেন ঘটনাগুলো দেখতে পাই। সবার সামনে মেরে ফেলল আর পা ধরে হেঁচড়ে নিয়ে গেল। ইস্! ছেলেটা গান শুনেও শুনতে মরে গেল! আমার খারাপ লাগছে। খুব খারাপ লাগছে।

—ক'জনের জন্য অঙ্ক? ক'জনের জন্য তুই কাঁদবি? এর ঠিক দু'দিনের মাথায় পুলিশ তিনজন নকশালকে গুলি করে মারে। তাদের একজনের বয়স ছিল আঠারো।

—ইস্!

—একজন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বিবৃতি দিয়েছিলেন, দশ দিনের মধ্যে পুলিশের গুলিতে একশজন নকশাল মারা গেছে, আহত হয়েছে সাতজন। সংখ্যাটা প্রকৃতপক্ষে এর তিন গুণ ভাবাই ভাল।

—ওরা কি মানুষ নয়? মাস্টারকাকা? ওরা কি দানব?

—মানুষই তো দানব হয়। তোকে স্পার্টাকাসের গল্প বলিনি? যিশুর কাহিনী শোনাইনি? একেবারে আদি থেকে মানুষের দু'টি বিপরীত সমান্তরাল ইতিহাস। একটি যুদ্ধ ও মৃত্যুর। অন্যটি শান্তি ও কল্যাণের। দ্বিতীয়টির ইতিহাস সরু। শীর্ণ। কিন্তু প্রার্থনীয়। আর তুই এই বলছিস। তবে শোন। আরও আছে। ওই একশজনের পর আরও মৃত্যু সংযোজিত হয় মাত্র সতেরো দিন পর। বেলেঘাটায় চারজন নকশাল যুবককে বিছানা থেকে তুলে এনে প্রকাশ্যে রাস্তায় খুন করা হয়। এবং একই দিনে বারাসতে খোলা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল এগারোজন নকশালের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ।

—এই সব তুমি লিখে রেখেছ, না?

—হ্যাঁ রে অঙ্ক, চেষ্টা করেছি অন্তত। কখনও লিখেছি, কখনও খবরের কাগজ কেটে সেটে

রোষেছি। অনেকটা ধরা আছে এখানে। মৃত্যুর ইতিহাস। নিষ্ঠুরতার ইতিহাস।

নিষ্ঠুরতা ও মৃত্যু, হত্যা ও অত্যাচার—মানুষ কোনও মিল উপভোগ করবে একাজ তার জন্য নয়। কমতা দখলের যুদ্ধ, ঈর্ষা ও লকলকে লোভ—মানুষ কোনও মিল উপভোগ করবে এ সম্পূর্ণতার বিরুদ্ধাচারী, বিকাশের ব্যাহতি, মানুষের বোমানান। এইসব ঘটবেই একদিন, ভেবেছিল কেউ কেউ। ভাববে। গুটিকি মানুষ সেই ভাবনাগুলি কুতে করে বেড়াবে আজীবন। এবং দিয়ে যাবে অন্য কোনও মানুষকে; যেমন মাস্টার। যেমন ভাঙ।

অন্ধ ও ঘুমোয়নি। মাস্টারও না। জেগে আছে যে-যাও আছে। স্বাভাবিক বিদ্য। প্রতিভা। শ্রুতি। স্বাভাবিক মানুষ। বাকি সব ঘুমন্ত। সারা খন্ডি ঘুমিয়ে পড়েছে। এমনকী ঘুমিয়ে পড়েছে মাছেরাও। বিলের জলের নীচে যথার্থ বাসস্থানে। শুধু কোনও মিল ঘুমোতে না। বাল্য প্রতিভা করে জেগে আছে পি ডব্লিউ ডি রোড। রেললাইন তবুও ঘুমোয়। একটা ট্রেন যাবার পর আরও একটা আসার আগে একটা বিশ্রাম নিয়ে নেয় সে। অন্ধ অন্ধ ঘুমিয়েও কি পড়ে না? অন্ধত্ব এটুকু তো সে জানে—একটি রেল চলে গেলেই আর একটি শব্দে শব্দে কমকমিয়ে তার ঘাড়ে এসে ঢুকবে না। রাস্তার সে-সুযোগ নেই। তাকে কেউ ঘুমোতে দেবে না। তাই ঘুমোনের ইচ্ছেই সে ত্যাগ করেছে। একমাত্র ধর্মঘটের প্রতীক্ষা। ধর্মঘট হলে পুলিশের গাড়ি ছাড়া আর কোনও গাড়ি নইতে হয় না তাকে। কিন্তু বরাহনগরের সব রাস্তা জানে—পুলিশের গাড়ির ওজন দুর্বল।

ঘুমোনের ইচ্ছে ত্যাগ করে মহান হয়েছি পি ডব্লিউ ডি রোড। অধিকার হরণ করে নেবার আগেই সেই অধিকার হস্তগত রাখার ইচ্ছা পরিহার করার মধ্যে এক ধরনের জয় ঘোষিত হয়। এই রাস্তার মতোই, এই মহানগর কখনওই ঘুমোয় না। চোরও জাগে, পাহারাদারও জাগে। ঘুনি জাগে, যে খুন হয় সেও জেগে থাকে ত্রাসে। আর কিছু লোক—যারা এই নিম্না ও জাগরণের খেলা প্রত্যক্ষ করতে চায় চুপিসাড়ে—তারা ঘুরে বেড়ায় একা। কিছুক্ষণ সময়। সকলের অলক্ষে। যেমন যোৱেন—আনিসুজ্ঞামান।



আজ আবার ভোর ভোর উঠে পড়েছে হরিচরণ। তুলসী আজ সন্তোষী মা'র পূজা করবে। গত বছর যখন সে পূজা শুরু করেছিল, তখন ভেবেছিল—মনস্কামনা পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত পূজা করে যাবে। কিন্তু অন্ধর মা বলল—এভাবে পূজা করতে নেই। বোলো শুক্রবার পালন করো তারপর উদ্যাপন দাও। অপেক্ষা করতে থাকো, যা চেয়েছ দেখি তা পূর্ণ করেন কিনা।

কতদিন অপেক্ষা? তার কোনও হিসেব জানা নেই অন্ধর মা'র। যতদিন না দেখি সন্তুষ্ট হন, যতদিন না তোমার মনে হয় আরও বেশি আরাধনা তাঁকে করা প্রয়োজন ছিল ততদিন। তুলসীও তাই অপেক্ষা করেছে, এবং আজ আবার পূজা শুরু করেছে। গত বছর ব্রত পালনের সময় প্রতি শুক্রবার ছোলা-গুড়ের পূজা হরিচরণ ও তার পরিবারের জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। যেমন রান্না খাওয়া, যেমন ছেলোদের ইচ্ছা পূরণে, তেমনই এও এক সংসারধর্ম। শুধুমাত্র পেশা পালন নয়, শুধু প্রেম বিবাহ জন্মদান শিশুপালন রান্না খাওয়া নয়। মানবজীবনের অলঙ্কারে শোভায় স্বাতন্ত্র্য আছে ধর্মবোধ। ধর্মচর্চা। পূজা না করলে কী হয়? কিছু না। মসজিদে না গেলে, মন্দির না পড়লে, চার্চে ঈশ্বরের ভজনা না করলে? কী হয়? কিছু না। এমন মানুষ আছে যারা ধর্মবোধকে অধর্ম ভেবে বসে। তাদের নাস্তিকতা ধর্ম। আর স্বধর্মে প্রতিপালিত মানুষ। তবু এইসব চর্চা, প্রার্থনা, পূজাপার্বণ জীবনকে রাস্তার যতক্ষণ না অপরের পক্ষে তা

কতকির। ব্রত উদ্‌যাপনের পর, কয়েকটি শুক্রবার বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগত। আজ এই নীতের ভোরে ঘুম থেকে উঠে হরিচরণ খুবই প্রসন্ন বোধ করছে এই ভেবে যে গৃহে আবার দেবী ফিরে এলেন। গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে সব সরঞ্জাম নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল বাতাস। আকাশ একটু ফিকে লাগছে বটে, কিন্তু ভোর খুব দীর প্রকিয়ায় নেমে আসবে এখন। তাহে কিছু যায় আসে না, হরিচরণ জানে—কোথায় কতটুকু ময়লা জমা হয়, তখন গৃহ থেকে বেরিয়ে আসে কত বেশি পরিমাণ আবর্জনা। এটা ঠিক যে, প্রত্যেকটি পরিবারই একই ধরনের জীবনযাপন করে। সকলেই উপার্জনে যায়, রাখে, খায়, পরচর্চা কিংবা শিল্পচর্চা করে। অথচ প্রত্যেক পরিবার থেকেই একই পরিমাণ আবর্জনা নিঃসৃত হয় না। কোন গৃহের সামনে কতখানি আবর্জনা স্নান থাকবে এবং তার মধ্যে কী কী বস্তু থাকতে পারে, সুবোধ্য ও সুযোজ্যের মতোই অনিবার্যভাবে বলে দিতে পারে হরিচরণ। আজ রাত্তা পেরুতে পেরুতে তার মনে পড়ল গত বছরের এমনই একটা ভোরের কথা, যে-দিন তুলসী সন্তোষী মার পূজা শুরু করেছিল। হরিচরণ, সাতকন্য়ার গলি দিয়ে প্রথম পাড়ায় ঢুকেছিল সে-দিন, আর দেখতে পেয়েছিল উদাস ভোরবেলায় সাতকন্য়ার তৃতীয় মেয়েটি একলা দাঁড়িয়ে আছে ছন্দে প্রসান্বহীন। আজও সে পায়ে পায়ে সাতকন্য়ার গলির দিকে যেতে লাগল।

পরিপূর্ণ ভোর হওয়ার পূর্বকার এই অন্ধকারে ননা রকম বিব্রম ভাগে, একটা সম্পূর্ণ নতুন দিন অনেক বেশি আকর্ষিত থাকে বলে, মানুষ আগের দিনের সমস্ত আবর্জনা রাত্তায় ফেলে দিয়ে আসতে চায় ভোর হবার আগে। হরিচরণ এমনই সব বিব্রমের মুহূর্তে আবর্জনার কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। যেমন সে চিরকাল ভেবে এসেছে ঈশ্বর আশীর্বাদের মতো তাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছে, তেমনই আজও আশীর্বাদমণ্ডিত পবিত্র কাজের জন্য সে বাগিয়ে ধরেছে তার বেলচা আর অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করেছে। এখন কোথাও কোনও নারী জাগে না, কোথাও কোনও মাতৃহৃৎ জাগে না, তাই একটি ছোট শিশু হয়তো সন্ধ্যোজাত সে আবর্জনার রূপে নিক্ষিপ্ত হয়। বেড়ালছানার চেয়ে ছোট শক্তিতে শিশুটি দু'একটি বিক্ষিপ্ত শব্দ করে যা হয়তো-বা জীবনের শব্দ, হয়তো-বা চাঁদ ওঠার শব্দ কিংবা ফুলেরা পাপড়ি মেলেছে কোথাও—যা আবর্জনা থেকে উঠে আসার সম্ভাবনা অবিদ্যাস্য করে দেয়। হরিচরণ প্রথমে কোনও বেড়াল-মায়ের বিব্রম ভাবতে চায় এবং বেলচার ডগায় বেড়ালছানা তুলে নেবার ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে হতবাক হয়ে যায়। প্রথমে সে ঈশ্বরকে ভাবে, তারপরই হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ চিরন্তন মানুষ-সন্তান। বেলচা ফেলে ক্রমশ নিচু হতে থাকে সে, তার চাদর ভুলুটিত হয়। কোথাও কোনও গাছে পাখিদের ঘুম ভাঙে তখনই, ঘুম জড়ানো গলার এই ভোরকে স্বাগত জানায় তারা আর হরিচরণ তার দুটি কম্পিত হাত ধীরে ধীরে এগিয়ে দেয় আবর্জনার দিকে আর তুলে নিতে থাকে সেই একটুখানি মানুষের বাচ্চা, যাকে জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং যে বর্জিত। যাকে মেরে ফেলা সম্ভব হয়নি কিন্তু ছুড়ে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুর সমান আবর্জনায়। শিশুটি তিরতির করে কাপছে, প্রাণ উড়ে যাবার আশে হয়তো-বা এই কাপুনি তাতে শেষ উচ্চতা দিয়ে রেখেছিল। হরিচরণ কম্পিত শরীরটিকে সাপাটে নিচ্ছে বুকে, আর চাদর দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে বলছে—‘হে ভগবান আবর্জনার মধ্যে এ তুমি আমাকে কী দিলে।’ সে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। বেলচা পড়ে রইল। ডান পড়ে রইল। হরিচরণের আর স্মরণে নেই কিছু। সে কেবল লম্বা লম্বা পায়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে তুলসীর বিশাল অপার্থিব স্তনের দিকে যেখানে সে নিজের শান্তির আশ্রয় পায়—তাদের পাঁচ ছেলে করুণার আশ্রয় পায়—সেখানে এই শিশুটিকে সমর্পণ করবে বলে। এবং সে নিশ্চিত, ঠাণ্ডা নীল এই শিশু তুলসীর স্তনের গভীরে প্রাণ হারাবে না কিছুতেই। সে ছোট্টে। ছোট্টে যায় বাঁচানোর আর্তিতে, যে আর্তি মানুষকে বাঁচায়।

আসলে আয়ুই সেই আশ্চর্য ভবিষ্যৎ যা মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অপ্রত্যাশিত উপসংহারে। আয়ুই প্রতীক্ষা করে, পৃথিবীতে নেমে আসার প্রথম মুহূর্তকাল থেকে কোনও এক অসামান্য



আলোর কাছে পৌঁছবার কাল পর্যন্ত। তুলসী বৃদ্ধি-বা আলো এখন আর কাছে গিয়ে হরিচরণ নিজের বুক থেকে শিশু তুলে দিয়ে দিচ্ছে আরও বৃহৎ বাকের প্রত্যাশায়। তুলসী কান্দছে। প্রথমেই তার মুখে উচ্চারিত হয়েছে অভিশাপ—মারো যাক সেই মা, যে শিশুর জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং তাকে আবর্জনায ফেলে দেয়। মায়ে পড়ে যাক সেই কুফল জন মা বার্থী ধারায় ডিকিয়ে দিতে থাকবে পোশাব।

তুলসী কান্দছে। তার নিজস্ব স্তনের মধ্যে প্রায় নীল হয়ে যাওয়া শরীর ঢুকিয়ে ওম দিতে দিতে বলছে—খুঁটে ছালাও। কড়াই চাপিয়ে ছোট খোঁকার ছোট কাঁধে একটি নির্দোষ গরম করে তাড়াহাতি।

হরিচরণ দিশেহারা বোধ করছে। তার হাত-পায়ে কীপন শুরু হয়েছে এখন। শুধু সমস্ত ঘোমের উপরে এটুকুই জাগ্রত আছে—উত্তাপ চাই, গর জন্ম উত্তাপ চাই। শীতের শুষ্ক খটখটে ঘুটে ভ্রত পোড়ানো নিজে, বৃদ্ধি-বা সেও উদ্ভীষ যাতে শিশুর উত্তাপ পেতে দেরি না হয়। কড়ায় কাঁধ গরম করে তুলসীর হাতে দিয়ে হরিচরণ ভিজ্ঞানো করছে—ও বাঁচবে তো?

—সন্তোষী মা'র কৃপা—ওকে মাই পাঠিয়েছেন আজ। তুমি কি জানো এই বাচ্চা কী?

—না।

—আমি দেখে নিয়েছি, এ আমাদের মেয়ে গো। আমাদের বিটিয়া। সন্তোষী মা'র কাছে আমি তো বেটি চেয়েছিলাম। তুমি দেখো ও ঠিক বাঁচবে। একটু গরম হলে ওকে আমরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

বাসি বিছানায় ঘন হয়ে বসে থাকল তুলসী আর হরিচরণ। উত্তপ্ত কাঁধ দিয়ে জড়িয়ে নিল শিশুটিকে। দেবতে থাকল অপলক। নীল রং একটু কি কিকে হচ্ছে? দুটি উদ্বিগ্ন মানুষকে ঘিরে ঘুমিয়ে আছে আরও পাঁচটি মানুষ সন্তান। ধীরে ধীরে সূর্য উঠছেন। আজ এই অনন্তকালের মধ্যে প্রথম অরুণ সেনের ছাদে লাফিয়ে না উঠে সমস্ত উত্তাপ নিয়ে তিনি নেমে এসেছেন হরিচরণের গৃহে। শিশুটি ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে। মিহি স্বরে ডাকছে যে প্রকৃতপক্ষে তার মা—তাকে। লাফিয়ে উঠেছে হরিচরণ—কান্দছে গো কান্দছে। তার মানে বেঁচে যাবে বলা? ডমরুর মা, মেয়ের কী নাম রাখব জানো? সীতা। কেমন? সীতাকে কি এ ভাবেই কুড়িয়ে পায়নি জনক? বলা?

ঝামরে ওঠে তুলসী। ফুঁসে ওঠে—না। কখনও না। ও কথা আর মনেও আনবে না তুমি সীতা নামের মেয়েরা সুখী হয় না তা জানো?

—তা হলে কী নাম হবে ওর? ডমরুর মা? জানকী?

—না। জানকীও না। ওর নাম সন্তোষী। সন্তোষী মাসি ওকে দিয়েছেন। তাই ও সন্তোষী কুসলে?

তুলসী মেয়েকে বুকে চাপে। তার শীতল নীলচে কপালে চোঁট ছোঁওয়ায়। আর বাধা ছেলের মতো এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মাথা নাড়ে হরিচরণ। ঠিক। ঠিকই তো। মেয়ের নাম সন্তোষীই হওয়া উচিত। তুলসী কখনও ভুল বলে না। সে প্রস্তাব করে—বাচ্চাদের তুলে দিই ডমরুর মা?

তুলসী বলছে—সবাইকে না। শুধু ডমরুকে তোলা তুমি। সবাইকে তুললে এক মহা হট্টমোল বেবে যাবে। ডমরু সমজলার। ওকে আমি বৃদ্ধিয়ে বলব, তারপর বাচ্চা নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাব। তুমি দেখো পাশে কুসকে পাও কিনা। ওর রিকশা নিয়ে চলে আসতে বলো।

হরিচরণ যন্ত্রের মতো তুলসীকে পালন করে গেল। কুসকে জাগিয়ে তুলল তার ঘরে গিয়ে এবং কুস রিকশাওয়ালা থেকে শিবতোষ ডাক্তার থেকে হর মুনিওয়ালা থেকে সমস্ত মাথুরের গড় জোনে গেল সাতকন্য়ার বাড়ির কাছে আবর্জনার তুপে একটি শিশুকন্যা কুড়িয়ে পেয়েছে হরিচরণ। ডাক্তার শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতালে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু তার আগে

বলেছেন খানায় যেতে। কারণ বেওয়ারিশ কুকুর বেড়াল তুলে তুমি ঘর ভর্তি করে দাও কেউ কিছু বলবে না কিন্তু বেওয়ারিশ মানুষের বাচ্চা তুলে ঘরে নেবার অধিকার তোমার নেই। সে তুমি যত ভালবেসেই থাকে নাও না কেন।

তুলসী বলল—এখন ওকে খানায় নিয়ে তারপর হাসপাতালে গেলেন, ও তো মরেই যাবে ডাক্তারবাবু।

শিবতোষ বললেন—তা যেতে পারে। তবু তোমাদের খানায় জানানো মরকাত।

হরিচরণ কী করবে ভেবে পেল না। ডাক্তারের ব্যক্তিগত নামে যেটা কিছু মাসে গেছে, সকলেই শিশুটিকে দেখতে চায়। কার শিশু, এটা চিহ্নিত করাই তাদের প্রথম কাজ। হরিচরণ সে-দিকে তাকাল একবার। দেখতে পেল মুখে শ্বেতী ভর্তি সেই মুসলমানবাবুকে, সে কলোকে পড়ায়। সেই মুখে অন্যদের মতো ঐশ্বর্য নেই, আছে বেসরকারি কয়েকটি অসামান্য আঁচড়, যা দেখে মানুষের জন্য মানুষ আছে বলে ভরসা জাগে এবং সেই ভরসায় হরিচরণ ভিত্তের মধ্যে এসে বলে। —আমি এখন কী করব বাবু!

আনিসুজ্জামান হরিচরণের বাহু স্পর্শ করেন, বলেন—একটু অপেক্ষা করো। আমি কয়েকজনকে ডাকছি।

সমস্ত ভিত্ত আনিসুজ্জামানের দিকে ঘুরে যায়। এই মুহূর্তে আনিসুজ্জামান হয়তো-বা এই শিশুটির বিধাতা।

হরিচরণ ডাক্তারের ঘরে ফিরে যায়। শিবতোষ বতটুকু সম্ভব পরিচর্যা করেছে। এর বেশি করার সাধ্য তার নেই, অপেক্ষা করা ছাড়া তিনি আর কী-বা করতে পারে। ডাক্তারি পড়ার সময়, শিশু ফেলে যাবার ঘটনা তিনি অনেক দেখেছে। তাঁর কাছে আবেগ ততখানি জরুরি নয় যতখানি খানার অনুমোদন। হরিচরণ জানালা দিয়ে দেখতে লাগল ছত চলে যাচ্ছেন আনিসুজ্জামান। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। সত্যিই কি সম্ভাব্য মা এভাবেই মেয়ে পাইয়ে দিলেন? হরিচরণ ভয়ে কঁটা হয়ে আছে এখন। সে যখন শিশুটিকে বুকে তুলে নেয় তখন পুলিশের কথা ভাবেনি। হাসপাতালের কথা ভাবেনি। কোর্ট-কাছারি করতে হবে, এ কথাও জানত না। একটি প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ছুটে গিয়েছিল তুলসীর বুকের উত্তাপের কাছে। হরিচরণ বুঝতে পারছে না এভাবে বাচ্চা পাইয়ে দেবার পেছনে ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য কাজ করছে। আত্মকৃত্তিক থেকে তুলে আনা বাচ্চা বাঁচানোর চেষ্টা, হরিচরণের মনে হয়, তুলসীর গর্ভজাত পাঁচটি সন্তান বাঁচানো অনেক সহজ ছিল। সে দুটি ভীত অসহায় চোখ মেলে তুলসীর দিকে তাকায়। তুলসী শিশুটির ঘুমন্ত শরীরের তাপ অনুভব করতে করতে চোখের ভাষা পাঠিয়ে দেয় হরিচরণের দিকে—ভয় পেয়ো না। ভগবানকে ডাকো। তিনি দিয়েছেন, তিনিই রক্ষা করেন। আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি। পাপ করিনি।

পাপ, পাপ—ধ্বনিত হচ্ছে লোকমুখে। সন্দেহ ছড়িয়ে যাচ্ছে জটিল আবেগে এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে। পাপ-পাপ। কার পাপ। কে করেছে এমন কাজ। যার গৃহে বয়স্কান্ধা মেয়ে নেই তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। যাক বাবা, আমাদের যে নয় তা সবাই বুঝবে। যার গৃহে তেমন মেয়ে আছে, সে বুঝি কলেজে যায়, স্কুলে যায়, দিবস-রাত বাবা-মায়ের চোখের সামনে থাকে, তবু সেইসব গৃহ সম্বন্ধে বিদ্বেষ হচ্ছে। সে বাড়ির মা-পিসিরা শুকনো মুখে বসে আছে। তাদের মেয়ের নয়। ভাগ্যিস তাদের মেয়ের নয়। কিন্তু যদি হত। যদি হয়। সকাল সকাল এই পাপের হাত থেকে পরিচ্রাণ পাবার জন্যে ছটফট করে তারা এবং মেয়ের বিবাহের জন্য বাপকে তাড়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজও করে। কার পাপ, কার পাপ? কে? কে? কোন মেয়েকে দেখা যায়নি গত কয়েক মাস? কোন মেয়ের মায়ের চোখের তলায় কালি? 'সাতকন্যা'র নয়? 'সাতকন্যা'র মা নয়? মেয়ে নয়? ওদের বাড়িতে অনেক মেয়ে আছে। কেউ যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে হঠাৎ এবং বলে—আহা! এ পাড়ার কেউই হবে তার কী মানে? অন্য কোথাকার কেউ যে ফেলে যায়নি,

তাই-বা কে বলবে! নিজের বাছাকে কেউ নিজের বাড়ির কাছে ফেলে রাখে? যদি চোখে সামনে কুকুর টেনে নিয়ে যায়? যদি চিল শকুনে ছোঁ মারে!

—ছাড়ো ও সব। বাছাকে যে ভাগাড়ে ফেলে দেয় সে ছোঁ কুকুরের ভোগ দেবার জন্যই ফেলে। অতই মায়া যার, সে তো ফেলবেই না। তেন যে এরা দশ মাস ধরে রেখে দেয়। ফেলেই যদি মেবে তো আগে ফেললেই পারে।

মন্তব্য চলে। সমালোচনা চলে। আর আলোচনা করতে থাকেন কংগ্রেসের। অনিসুজ্ঞামান বিকাশকে ডাকেন। বৃত্তান্ত বলেন। লক্ষ্মী বিকাশকে আড়ালে তেকে বলেন—ছি ছি এ সব নোংরা ব্যাপারে যেয়ো না।

জিনি বলে বাসে—নোংরা কেন মা? বাচটিকে বাচতে ছোঁ হবে।

লক্ষ্মী অগ্রীত দুখ ঘুরিয়ে নেন পুত্রবধূ দিকে। বলেন—তোমার কাছে আমাকে শিখতে হবে নাকি?

জিনি মাথা নিচু করে। বিকাশ ঘরের আশময়লা চাদর ছেড়ে একটি ভাল চাদর গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েন অনিসুজ্ঞামানের সঙ্গে। পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসেন রণেন, সমরেন্দ্র, মিথিলেশবাবু সেগরিস্ট ও তাঁর স্ত্রী, ওপর থেকে নেমে আসেন নীলিমা। অভিজ্ঞ শ্রৌতদের ঘিরে দাঁড়ায় কাজল সুজন মুখ্য অমিতাভ—তাদের চোখে পিচুটি লাগা, গালের হাড়ে ক্ষয়। নেশাগ্রস্ত ঘুম ছাড়িয়ে তারা বিছানা ছেড়ে এসেছে একটি শিশুর জন্য। এখন আকাশে আকাশে ধনিত হচ্ছে—পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে। একটি শিশু পাওয়া গেছে আন্তাবুঁড়ে। কোথায়! কে পেল!—হরিচরণ পেয়েছে। ময়লা পরিষ্কার করতে এসে পরিত্যক্ত শিশু বুকে তুলে নিয়েছে হরিচরণ জমাদার। কার শিশু? কার শিশু? উত্তর উঠছে—জানি না জানি না জানি না—না না না—কন্যা কন্যা কন্যা—সাত কন্যা সাত কন্যা, সবাই মনে সাত কন্যা উঁকি দিচ্ছে। কারণ ওদের কেউ ভাল করে জানে না। ওরা মেশে না কারও সঙ্গে। ওরা আলাদা। রহস্যময়। আর ওদের বাড়িতে অনেক মেয়ে।

চলে এসেছে শ্যামল-কমল। চলে এসেছে দেবশিস—মাকে অমান্য করে। এসেছে মানোদা কি, অম্বর মা, মকবুল, সুধীর পাল, গোপাল কুণ্ডু, এসেছেন কংগ্রেস নেতা অনিল সামন্তর ডান হাত বাসুদেব পোদ্দার, এসেছেন সি পি এম নেতা শ্যামাকান্ত আর তাঁর ভাই উপন, এসেছে কালীভারা, পঞ্চা মুদি, হর মুদি। উকিল নগেন মিত্তিরও। আর এসেছে খুঁটে কুড়ানি ফুলরেনু, অনুপম, দেবোপম, পরেশবাবু, হিরণ, এমনকী রাজেশ্বরী হোটেলের ম্যানেজার বিনয় খাড়া পর্যন্ত। জেগে উঠেছে সারা মাথুরের গড়। ভাবছে সারা মাথুরের গড়। শিশুটি কার এ বিষয়ে কোনও ঐকমত্য নেই। আন্তাবুঁড়ের শিশু। এক টুকরো ছেঁড়া প্রাণ নিয়ে ঘুমিয়ে আছে তুলসীর বুকে। সে জানে না সে বাচবে কি না। কিন্তু অন্য সব লোক, একমত হয়ে, এক জোট হয়ে ভাবছে—বাঁচাতেই হবে। শিশুটিকে বাঁচাতেই হবে। আর হরিচরণ যদি চায়, তাকে রাখতে, নইলে পুলিশ হাসপাতাল থেকে নিয়ে পৌঁছে দেবে অনাথ আশ্রমে। হরিচরণের পিতৃত্ব ভিড়ে মিশে আছে। সে চড়া করে বলছে—আমি রাখব। আমি নেব। ও আমারই আছে। আমারই হচ্ছে। আমার বউ ওকে নিজের মেয়ে ভেবে, ঈশ্বরের দান ভেবে বুকে নিয়েছে। ওকে আপনারা কোড়ে নেরেন না ছ-জৌ-র...

সমস্ত ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে একসঙ্গে—মেয়ে বুঝি? মেয়ে? ও মেয়ে?

সন্দেহ কুমারী মাকে ছাপিয়ে চলে যাচ্ছে বিবাহিতা মায়ের ওপর। তার স্বামী-শাশুড়ি স্বশ্বরের ওপর। মেয়ে বাচ্চা? মেয়ে? মেয়ে বলেই কেউ ফেলে নিয়ে যায়নি তো?

তখন, কপিলার পেট করে দেওয়া নগেন মিত্তির বলছে—ভয় পেয়ো না হরিচরণ। কোট থেকে যাতে অর্ডার পাও সে আমি দেখব।



যেমন হয়ে থাকে বিয়ের পর, যেমন নিয়ম, ঘর ছেড়ে যাওয়া, বা প্রকৃত অর্থে মর ফোলে যাওয়া কন্যার জন্য মন-কেমন-করা, আশঙ্কায় জর্জরিত এবং ও সুখে থাকুক এমনই অভিপ্রায়ে দৃষ্টান্তের কাছে প্রার্থনারত তেমনই জিনির মা জিজ্ঞেস করেছিলেন—জিনি, তুই সুখী তো।

জিনি বলেছিল—হ্যাঁ, মা।

—সত্যি তো?

—সত্যি মা। সুখী।

দাদারা বলেছিল—জিনি, এত রোগা লাগে কেন তোকে?

—আমি তো রোগাই বড়না।

—চোখের নীচে ফেন কালচে-কালচে লাগে।

—ও তোমার চোখের ভুল। চশমার কাচ কতদিন পাল্টাওনি বলো তো?

—তুই যেন আর আগের মতো হাসিস না জিনি।

—আহা। তোমরা হাসাচ্ছ না তাই বলো মেজদা। সবাই সারাক্ষণ গোমড়া মুখ করে কাজ করছ।

—জিনি, তোর কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?

—না। কোনও অসুবিধা নেই বড়দা।

বড় বউদি বলেছিল—হ্যাঁ রে, তোকে ভালবাসে?

জিনি লাল হয়ে যায়। তার চোখের তলার মৃদু কালি আরও কালো হয়। সে বলে—ও বউদি। আমি জানি না।

মেজ বউদি বলে—তোর শাশুড়ি কেমন রে জিনি?

—বেশ, মেজবউদি।

—তোর বউ-ভাতের দিন কত সেজেছিলেন। হ্যাঁ রে, খুব মর্ডার্ন, না?

—হ্যাঁ, খুব।

—তোর সেই দেওরের কথা-টখা বলেন? কীদেন?

—না। শুনিনি এখনও বউদি। তবে স্বপ্তরমশাই বলেছেন।

—যাই বল, তোর শাশুড়িকে দেখলে বোঝা যায় না কিছু অত বড় শোক পেয়েছেন।

—সেই তো ভাল, বউদি। শোক কি মানুষকে দেখিয়ে বেড়াবার জিনিস? ও তো লুকিয়েই রাখতে হয়। ঢেকেই বেড়াতে হয়।

—কিন্তু অত বড় ছেলের শোক, চেহারায়ে ছাপ থাকবে না?

—মুখ দেখে কি কিছু বোঝা যায় বউদি?

—যায় না বুঝি?

—না। কেউ যদি মনে করে মুখে তার মনের বিপরীত ভাবটি ফুটিয়ে রাখবে তবে সে তা করতেই পারে।

—আমাদের জিনিও তা করছে না তো?

—কী?

—নিজের মুখ লুকিয়ে বেড়াচ্ছে না তো? মিছিমিছি ভাব দেখাচ্ছে না তো?

—না, বাবা, না। তোমার বুঝি জানা নেই আমি কেমন? তুমি বুঝি কেঁদো না আমাকে?

—জিনি বলেই তো বলছি। আমার সেন কোথায় কমা গিয়েছে জিনি।

—কী কম?

—প্রাণ।

—কেন?

—নতুন বিয়ে করেছিস, কোথায় ধরলে পিছু পিছু ঘুরবি, না, কেমন সব আলগা আলগা।

—তুমি বুঝি মেজদাদার পিছু পিছু ঘুরতে? কই! আমি কোঁ সেখিনি।

—ঘুরতাম বৈকি বাপের বাড়ি বেলে। তোমার মেজদাদাকে নিয়ে টহলই করবে ঘুরে বেড়াবাম আমার ইস্কুল, বেলার মাঠ, বন্ধুর বাড়ি—সব জায়গায়।

জিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আমিও যাব। বিকেলে।

এখন নিজেকে প্রশ্ন করছে জিনি—কেমন আছ?

—ভাল।

—সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি।

—তা হলে? এখন তোমার চোখে জল আসছে কেন?

টিভি চলছে বসার ঘরে। কোনও হিন্দি সিরিয়াল। এ এক রবিবারের দুপুর। বিকাশ চলে গেছেন নিজের ঘরে। যা আসলে দেবাশিসের ঘর। বই পড়ছেন। দেবাশিস টিভি দেখছে। জিনি টিভির দিকে তাকিয়ে আছে। দেখছে না। লক্ষ্মী ছেলের পাশে বসে শাড়ি তুলছেন। শাড়ি পায়ের গোছ ছাড়াল। হাঁটু ছাড়াল। সাদা ভারী উরু বেরিয়ে পড়ল। বলছেন—টিভির সাউন্ডটা ভাল না।... তাঁর হাতে কুকুধার লোশন। সরাসরি শশা ছেঁচে রস নেওয়া এমনই বিজ্ঞাপন থাকে লোশনটির। টিভিতে। লক্ষ্মী শশার লোশন মাখছেন পায়ে। উইটার কেয়ার। জিনি তাকাতে পারছে না। তার চোখে শীত করছে। লক্ষ্মীর অঁচল খসে পড়ল। তিনি গ্রাহ্য করছেন না, বলছেন—টিভির সাউন্ডটা বেশ খারাপ। কী বল? খাবলা খাবলা শশার নির্যাস মাখছেন। শীতের বিরুদ্ধে লড়াই। শীতেরই বিরুদ্ধে? নাকি জ্বরার বিরুদ্ধেও? ঠাস ঠাস শব্দ হচ্ছে। পা ডলছেন তিনি। উরু ডলছেন। বুকের খাঁজ সমেত উপত্যাকায় কোনও আড়াল নেই। জিনির কষ্ট হচ্ছে। চোখে জল আসছে। সে ভাবছে উঠে যাবে কি না। যেতে পারছে না। যদি ভাবে সবাই, তার খারাপ লাগছে। খারাপ লাগা প্রকাশ করতেও লজ্জা, ভয়। মনিয়ে নিতে হবে। সব মনিয়ে নিতে হবে। হ্যাঁ আর ছেলে। এর মধ্যে দোষ কী? আড়াল কী? মা-ছেলের সম্পর্কে কাল বাসা বাঁধে না। বাসা বাঁধে না কোনও ক, কোনও কু। এমনকী অন্য কোনও মস্তিকও এ বিষয়ে মৌনী থাকে। মা-ছেলে ছেলে-মা পবিত্র-পবিত্র। মা-ছেলে ছেলে-মা স্বর্গ-স্বর্গ-স্বর্গ। কিন্তু মা-মেয়ে মেয়ে-মা তেমন স্বর্গ? তেমন পবিত্র? তেমন নির্দোষ শশার নির্যাস মাখামাখি? দেবাশিস মায়ের দিকে তাকাচ্ছে। বলছে—কেন? সাউন্ডটা কী খারাপ!

—বেশ খারাপ। তোরা কি যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—কী দরকার ছিল? এই বিষয়ে এত পরস্যা গেল। এবুনি বেড়াতে না গেলেই চলছে না? আমার পিঠে একটু মেখে দে তো।

জিনি লোশন এগিয়ে দিচ্ছেন ছেলের দিকে। উরু থেকে নামিয়ে কাপড় আবার যথাস্থানে করেছেন। ছেলে শশার রস মাখাচ্ছে মায়ের পিঠে। হ্যাঁ বলছেন—কী সব যে শুরু হয়েছে। হানিমুন—আমাদের এ সব ছিল না।

দেবাশিস লোশনের বোতল নামিয়ে রাখছে। বলছে—এটা কি হানিমুন নাকি? দশজন মিলে হানিমুন হয়?

জিনির কান গরম হয়ে উঠছে। ইস, কী আলোচনা।

লক্ষ্মী বলছেন—দশজন মানে কে কে?

—আমি-জিনি। অনুপম আর ওর বউ পুণ্ড। দেবোপম। দেবোপমের বন্ধু অরুণা আর কাকু-কাকিমা।

—কাকু-কাকিমা মানে পরেশ বোস আর শবরী বোস?

—হ্যাঁ।

—ওদের সঙ্গে যাচ্ছ? ওই নোংরা লোকগুলোর সঙ্গে?

জিনি টিভিতে ঢুকে পড়তে চাইছে। ওই পর্দায় যদি একটা দরজা থাকত। যদি সে তাকে পড়তে পারত ওখানে।

দেবশিস বলছে—অনুপম-দেবোপমকে কোথায় খারাপ দেবলে তুমি?

—ভালই-বা কী? যাদের ওই বাবা-মা। আর তোরা-তোরা যদি সে-একরকম। তাদের সঙ্গে যাবার কী দরকার?

—বেড়াতে যাবার আয়োজনটা অনুপমেরই মা। ওরা নাকি গত পানরো-কুড়ি বছর গোটা পরিবার কোথাও যায়নি। অনুপম সেই ফাঁকটা পূর্ণ করতে চায়। ইচ্ছে করলে তোমরাও যেতে পার।

—না বাপু। তোমরা যাচ্ছ যাও। আমার কথা শোনা তো তোমরা বাপ-বেটায় প্রায় ছেড়েই দিচ্ছেছ। সংসারে আমার আর এখন দাম কী? মুখে রক্ত তুলে খাটব আমি, আর কেউ কেউ আয়েস করে দুপুরে ঘুমোবেন। এই তো হয়েছে এখন সংসারের অবস্থা।

জিনির ফের কান্না পাচ্ছে। সে কি সংসারে কিছু করে না? হাত লাগায় না? এ কথা ঠিক, শান্তি তার নাম করে কিছু বলছেন না। তবু জিনি কাতর হয়ে যায়। শান্তির কঠিন শব্দগুলি তার গায়ে বেঁধে। সে ধীরে ধীরে উঠে পড়ে এ বার। পায়ে পায়ে নিজের ঘরের দিকে যায়। স্নানতে থাকে লক্ষ্মী বলছেন—তা তোমরা যে যা পারো করো। আমি তো তা বলে নিজেকে বিকোতে পারব না। ওই মেয়েছেলেটার সঙ্গে আমি কিছুতেই কোথাও যেতে পারব না।

দেবশিস বলল—যোয়ো না। আমি তো জোর করছি না।

—জোর করবে কেন? তোমার তো আর আমাকে প্রয়োজন নেই। তোমারও নেই। তোমার বাবারও নেই।

—তুমি এ সব কী বলছ বলো তো? তোমার কিন্তু কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে মা।

—কী বললি? কমপ্লেক্স? ওই মেয়েটা দুদিনেই তোর মুণ্ড ঘুরিয়ে দিল, না? এতদিন মাকে ছাড়া তোমার ঘুম হত না। এখন বউকে পেয়ে আর মায়ের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না ...

জিনি দু'হাতে কান চাপা দিচ্ছে। শুনবে না সে। শুনবে না এ সব। রেকর্ড স্লেয়ারে পঙ্কজ মল্লিক চাপিয়ে দিচ্ছে সে। রেকর্ড ঘুরে ঘুরে বাজছে—দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না—তার চোখে জল আসছে। কেন তিনি এরকম বলেন! কেন এরকম করেন! এ সংসারে তেমন কোনও আশান্তি ছিল না। জিনির মনে হয়, সে যেন এক আশান্তি হয়ে দেখা দিয়েছে। যেখানে যা-কিছু অসঙ্গতি, তার দায় লক্ষ্মী ছুড়ে দেন জিনির দিকে। সে-দিন পাড়ার জমাদার একটা বাচ্চা কুড়িয়ে পেল, লক্ষ্মী বলতে লাগলেন—আজকালকার মেয়ে সব, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, ছেলেকের গায়ে গা লাগিয়ে হাহা হিহি করাই সার। আর এইসব। কী নোংরা যে হয়ে যাচ্ছে দিনকাল।

জিনির খারাপ লেগেছিল। বলেছিল—এভাবে বলবেন না। আগে যখন মেয়েরা পরপুরুষকে মুখও দেখাত না তখনও জগহত্যা হত। অবৈধ সম্বন্ধ জন্মাত। চিরকালই তা হয়েছে। এমনকী ধর্মযুদ্ধের কালেও। আপনি সীতার কথা ভাবুন, শকুন্তলার কথা ভাবুন, কর্ণ তো সবচেয়ে বড় উদাহরণ।



হুঁসে উঠেছিলেন লক্ষ্মী— তুমি আমাকে এত বড় অপমান করলে? বাঁ ভাবো তুমি? এম এ পড়িনি বলে আমি কিছু জানি না?

জিনি অবাক হয়ে বলেছিল—আমি তো অপমান করিনি।

—করেনি? করেনি? বলেনি আপনি মুর্থ?

—কখন বললাম?

—যা বললে তাকে তাই পাড়ায়।

লক্ষ্মী কানদেহন। জিনি বিমূঢ় হয়ে বসে আছে। লক্ষ্মী ফোঁপাতে ফোঁপাতে খবর খবর দেবার দিলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। জিনি বোকাব মতো কান দিল কিছুক্ষণ। কোন কথাই কী মানে হয় সে বুঝতে পারছিল না। তার নিজেকে ছোট লাগছিল, কিছু লাগছিল। কেন মিছিমিছি তর্ক করতে গেল? কোনও লাভ আছে এ সবে। সে কি ঝগড়াটে হয়ে যাবে? সে টেনে পায় শান্তির কাছে সে গ্রহণীয় হয়নি, মাঝে মাঝে মনে হয় সহনীয়ও না। কেন? জিনি জানে না। কিন্তু বুদ্ধ এড়াতে চায়। সে মনে মনে ঠিক করছিল সে আর কথা বলবে না। কিছুই বলবে না।

সন্দের পর প্রথমে বিকাশ ফিরলেন। তারপর দেবাশিস। রাত দশটার আগে লক্ষ্মী বিছানা ছাড়লেন না। সারা রাত্রি খমখম করতে লাগল। দেবাশিস কড়া গলায় বলল—যাও। ক্ষমা চাও মা'র কাছে।

জিনি বলল—কীসের ক্ষমা?

—মাকে কী বলেছ?

—কিছু না।

—মা মিথ্যা বলছেন?

—আমি মাকে কোনও খারাপ কথা বলিনি।

—কিন্তু মার খারাপ লেগেছে। তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে জিনি।

—তা হলে তুমি ঘরে নিশ্চ আমি মিথ্যা বলেছি, তাই না?

—তুমি ক্ষমা চাইবে কি না? আমার মা ভীষণ ভাল। মা'র কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না। যাও যাও—

—আমি কিছু বলিনি। সামান্য কথা নিয়ে মা ... বেশ আমি ক্ষমা চাইছি। চলো।

জিনি লক্ষ্মীর ঘরে গিয়েছিল। বলেছিল—আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার খারাপ লাগবে আমি বুঝতে পারিনি।

তার হঠাৎ বলার কথা ছিল, কী আপনার খারাপ লাগবে আমি বুঝতে পারি না।

লক্ষ্মী উঠেছিলেন। কান্নাভেজা ফোলা ফোলা মুখ নিয়ে রাতের খাবার পুরোটাই খেয়েছিলেন। সেদিন রাতে দেবাশিস কিছুতেই জিনিকে রাজি করতে পারেনি। সে প্রায় খেপে গিয়েছিল। উদ্বেগের মতো জিনির রাতপোশাক খুলতে গিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল। কিন্তু জিনি পারেনি। গভীর অপমানবোধে পাথর হয়ে গিয়েছিল সে। ক্রমশ ভীত হয়ে উঠছিল। ক্রমশ শীতল। সারা রাত্রি ঘুমোতে পারেনি। সেও। দেবাশিসও। অধিকারবোধ এবং আত্মসম্মানের লড়াই চালিয়ে যেতে যেতে রাত ভোর হয়ে গিয়েছিল। চোখের তলায় বিপুল কাল নিয়ে চায়ের টেবিলে এসেছিল জিনি আর দেবাশিস। কিন্তু লক্ষ্মীর মুখের কোথাও কোনও অপ্রসন্নতা ছিল না। আর বিকাশ যখন চায়ের টেবিলে এলেন তখন জিনি দেখল তাঁর কপালে লেপটে আছে গুঁড়ো গুঁড়ো সিঁদুর।

জিনি ভাবতে লাগল, তারা সব পুরী যাচ্ছে। অফিসের হলিডে হোম বুক করেছে অনুপম। খুব ছোটবেলায় সে একবার বাড়ির সকলের সঙ্গে পুরী গিয়েছিল। সমুদ্রের পায়ে খেলতে খেলতে একটি সুন্দর বেগুনি রঙের গোটা বিনুক সে কুড়িয়ে পায়। বিনুকের খোল দু'টো কিছুতেই খোলা যাচ্ছিল না। সে যখন একমনে খোলার চেষ্টা করছে তখন হঠাৎই একটা লোক

এসে তার হাত থেকে কিছুকটা কেড়ে নিয়ে দৌড়ে গালিয়ে যায়। সে-দিনও বুঝি অশ্রুমানিত লেগেছিল জিনির। সবটা অপমান সে বুকের তলায় লুকিয়ে ফেলেছিল। কোনওদিন কখনওকে বলেনি। প্রাপ্য সম্মান যখন পায় না কোনও মানুষ, প্রাপ্য অধিকার যখন কেউ কেউ নেয় তখন মানবতায় এই অপমানবোধ জাগে। তার তলায় থাকে নিজের দুর্বলতার প্রতি ককণা। তারও তলায় আত্মবিকার। এই বিকার বিপক্ষ শত্রুর মতো যুদ্ধোন্মুখি হয় আত্মদমনসেতরে। দু'জনের যুদ্ধ বাবে। সেই যুদ্ধের নাম বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ দিয়ে আত্মন ছালা যায়। পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া যায় শ্যাওলাপড়া বোধ। আবার সমস্ত বিদ্রোহের শীতল অভিযান্ত্রিক বিঘল নয়। তায় নাম আত্মপীড়ন।

দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল রবিবার আর একটা নতুন সোমবার এসে পড়ল। রবিবার সবাই ঘরে থাকেন বলে দিনটাকে একটু অনারকম লাগে। কিন্তু সোমবার থেকে সব বড়ই প্রথ ও গতানুগতিক হয়ে যায়। চারটে-সাত্‌ চারটে পর্যন্ত একা থাকে জিনি। বিকাশ, দেবশিস, লক্ষ্মী—সবাই বেরিয়ে যান। জিনির কোথাও যাবার নেই। পিসির বাড়িতে গিয়েও লাভ নেই কারণ তিনি কলেজে চলে যাবেন। অঙ্কর মা ঘুরে ঘুরে আসে। এটা-ওটা কাজ করে। জিনি টুকটাক কথা বলে অঙ্কর মার সঙ্গে। বেশ লাগে জিনির, অঙ্কর মা মানুষ ভাল। কিন্তু কিছুক্ষণ কথা বলার পর কথা ফুরিয়ে যায়। সে তখন কবিতার বই খোলে। কিংবা ডিকেন্স পড়ে। ডিকেন্স তার এত প্রিয় যে এক-একটি বই সে বহুবার পড়েছে। কখনও গান শোনে। গান গায়ও। তার সময় কেটে যায়। সাত্‌ চারটে নাগাদ লক্ষ্মী ফেরেন। আজও ফিরলেন। একটু পরেই তাঁর ঘরে ডাক পড়ল জিনির। জিনি গিয়ে দেখল, আয়নার কাছে শায়া আর ব্রা পরে বসে আছেন লক্ষ্মী। সে তাড়াতাড়ি, ভুল সময়ে ঢুকে পড়েছে ভেবে ফিরে আসছিল। লক্ষ্মী ডাকলেন—চলে যাচ্ কেন?

জিনি দাঁড়াল। লক্ষ্মী বললেন—ব্রা-এর স্ট্র্যাপটা খুলতে পারছি না। একটু খুলে দাও তো।

জিনি হুকে হাত রাখল। লক্ষ্মী বললেন—দেখেছ, আমার বুকেটা এখনও কত ভাল আছে? তোমার এ বয়সেই কী অবস্থা! এই ব্রা-টার নাম জানো? চল্লিশ টাকা। দামি ব্রা ছাড়া আমি পরতেই পারি না।

জিনি নীরবে শুনে চলে। এ কথার কোনও উত্তর হয় কিনা সে জানে না। শুধু টের পায় এ পরিবারে অদৃশ্য ছায়ার মতো সারাক্ষণ প্রাকৃতশরীর খেলে বেড়ায়। তার অবসাদ আসে। একটু আলোর জন্য, হাওয়ার জন্য প্রাণ ছটফটায়। সে হুক বলে দিয়ে বেকনোর উদ্যোগ নেয়। লক্ষ্মী বলেন—বোসো, তোমাকে দু'টো কথা বলি। সবসময় মনে রাখবে, পুরুষমানুষকে কখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নেই। আর জেনে রাখবে, স্বামীকে বশে রাখতে হলে শরীরটা ঠিক রাখা দরকার।

জিনি অপলক চেয়ে রইল শাশুড়ির দিকে। তিনি এখন ব্লাউজ পরছেন। মাথা দিয়ে অন্য একটি শায়া গালিয়ে আগের শায়াটি ছেড়ে ফেলছেন। শাড়ি টেনে নিলেন আলনা থেকে। কুঁচি দিচ্ছেন। বলছেন—আজ স্কুলে যাচ্ছি। একটা লোক আমার পেছন পেছন গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে গেল। আমাকে দেখলে তো বোকা যায় না আমার বয়স কত। আমার পেছন-টেছনগুলো দেখেছ? এখনও কী দারুণ!

জিনি হাসার চেষ্টা করছে। সম্মতির হাসি বা ভদ্রতার। দু'টোই এই মুহূর্তে কঠিনতম তার পক্ষে। শাশুড়ি আজ তাকে এরকম অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করছেন কেন সে জানে না। তার পক্ষে পুরোটাই অসম্ভব। সে মাথা নিচু করছে। লক্ষ্মী বলছেন—তোমাকে দেখলে কিন্তু ঘাসের তুলনায় অনেক বেশি লাগে।

জিনির কষ্ট হচ্ছে। নিজেকে এত ছোট করছেন কেন লক্ষ্মী! পুরুষকে বিশ্বাস কোরো না পুরোপুরি। তার মানে কি তিনি বিকাশকে বিশ্বাস করেন না? তার মানে কি তিনি দেবশিসকে

অবিশ্বাস করতে শেখাচ্ছেন না? বিকাশ আর দেবশিষ্য কি নিজেদের অজ্ঞতে লক্ষ্মীর দ্বারা অপমানিত হচ্ছেন না? কারওকে অবিশ্বাস করলে কি কিছুই পাওয়া যায়, বিশ্বাস করলে যা পাওয়া যায় তার তুলনায়? হ্যাঁ। বিশ্বাস করলে ঠকতে হয় কখনও কখনও। কিন্তু জীবনের সামান্য যা-কিছু প্রাপ্তি তা বিশ্বাস থেকেই উঠে আসে। অবিশ্বাসের ফলাফল চিরকালই শূন্য।

শরীর শরীর শরীর! কী আশ্চর্য বোধ। স্বামীকে ধরে রাখতে গেলে শরীর ধরে রাখতে হবে। উরুর কাপড় তুলে মাখতে হবে শশার রস। মেধা নয়, বুদ্ধি নয়, রুচি নয়, শিল্পবোধ নয়, নম্র কোনও গুণ বা সৃষ্টিশীলতা—একজন শিক্ষিত শিক্ষয়িত্রী নারী আপন আত্মজাতুলা শিক্ষিত একটি মেয়েকে পরামর্শ দিচ্ছেন—স্বামীকে ধরে রাখতে গেলে শরীরটি ধরে রাখা দরকার। যেন কোনও তওয়ায়েফ দীক্ষা দিচ্ছে শিষ্যকে। কিংবা রূপোপজীবিনী শুনিয়ে দিচ্ছে মূল মন্ত্র। তিনি আয়নায় নিজেকে দেখে। রোগা। ফরসা। ছিপছিপে একটি শরীর। এ শরীরের নবতম মূল্যায়ন ঘটছে এখন। সে ভাবছে—আমি কে? আমি কী? আমি কি একটা শরীর?



ফিসফিস করে বলল ময়না। দু'চোখ গোল পাকিয়ে, নীলিমার প্রায় কানের কাছে এসে—আমাদের মতন না। কাজ-কাম করে নাই কুনোদিন। ভদ্র লোক গো। স্বামীতে আইনা বস্তুতে ফ্যালছে। খোঁজ নায় না।

নীলিমা রাধিকার দিকে তাকান।

বুকে বাচ্চা সামলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে রাধিকা। বাবুদের বাড়ি কাজ করতে আসা— সে কি কখনও ভেবেছিল? বাবুদের বাড়ি! সে তো বাবু বলতেই শেখেনি কারওকে। বাবু ভাবতেও শেখেনি। সে জানে সে গরিব। তাদের পয়সা নেই। সে জানে সে নিঃস্ব। তাকে সংযত থাকতে হয়। চাইতে হয় না। সে এ সব জানে কিন্তু ভদ্রলোক ছাপটা নিজের মন থেকে সরাতে পারে না। বস্তির মেয়েরা যা করে, যে-ভাবে বাঁচে, সেও সে-ভাবে বাঁচতে এসেছে। সেই কাজ করতে চেয়েছে, তবু সে যেন কোনওভাবে ময়না নয়। কালীতারা নয়। অন্ধর মা নয়। সে ভদ্রলোক, তাই সংযত। তাই লোভ করে না। পয়সা না থাকলে কিছু চাইতে নেই। পৃথিবীর ভাল কিছুর প্রতি, সুন্দর কিছুর প্রতি নজরই তুলতে নেই। যা অর্জন করতে তোমার ক্ষমতা কুলান দেয় না তার প্রতি চোখ তোলার অধিকারও তোমাতে বর্তায় না। সুস্বাদের বস্তু, ভাল বস্তু, আনন্দের বস্তু—যতটুকু আপনি এসে ধরা দেয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। যদি ধরা না দেয় তবেও ক্ষোভ কোরো না একথা মনে করে যে এই তোমার ভাগ্য। কখনও কিছু চাইলে কাকি বলত—কত সাধ লয় গো চিতে/ মলের আগে চুটকি দিতে। শেফালির মা বলত—

এই দিক নাই ওই দিক আসে

তিন কোনা নাই তার মুশইর আসে।

স্বপ্ন দেখার, প্রত্যাশা করার যতটুকু অবকাশ ছিল ছুঁটে ফেলেছে রাধিকা। নিজের শ্রেণী ও অবস্থান সম্পর্কে তার এটুকুই উপলব্ধি যে সে গরিব। কিন্তু ভদ্রলোকের তকমা ফেলে কী করে? বড় দিদিমণির বাড়িতে যখন ঝিয়ের মতো খাটত শেফালির মা তখন সেও বিদ্ব হত কষ্টে। বলত— দ্যাশেও কষ্ট করসি। গায়ে লাগে নাই। এখন যারে কয় :

জন্ম গ্যালো কর্ম করতে করতে

দুই হাঁটু গ্যালো স্যালাম পাড়তে পাড়তে।

মাঝে মাঝে বড় সিঁদিমণির ওপর রাগ করে এ রকমই একটুখানি ফোঁত প্রকাশ করতে শেফালির মা। রাধিকা নিরন্তর শেফালির মন সহনশীলতা প্রশংসা করে এবং নিজের সহনশীলতাকে প্রশংসা দেয়। এখন মানুষকে দেখে, অঙ্কর মাকে, মফনা, কালাতারা, টেপির মাকে দেখে তার মধ্যে নতুন একটি দর্শন তৈরি হচ্ছে। বাবুদর্শন। এইসব লালনবাড়ি, কোচোবাড়ির লোকেরা তবে বাবু। এইসব দেওয়াল ভর্তি বই ও ফ্রিজ আছে, রেকর্ড প্রেয়ার আছে, সম্প্রতি একটি ছোট টিভি কিনেছেন নীলিমা, টিভি আছে, লোকেরা তবে বাবু। আর বড়িতে যারা থাকে, তারা কী? নিরঙ্কর, ভাঙা ঘরের বাসিন্দা, অতীত-ভবিষ্যৎ খোঁজাঘনু পারের বাড়ি মাঝে মেজে খাওয়া মানুষেরা তবে কী? রাধিকা কী? রাধিকা জানে না। সে শুধু নিজের মধ্যে শূন্য হতে হতে জীবনকাঠির সন্ধান করে। এতদিন অত্যাগে অনটনে না থেয়ে মরার আগে, ভিক্ষাবৃত্তি করার আগে করুণা শিক্ষণ করে তাকে আর তার সন্তানদের আগলে রেখেছিল শেফালির মা। সে সম্ভব ছিল এক পরিবারের মতো একই গৃহে তারা বসবাস করত বলে। কিন্তু আর কতদিন? আর কেন? এই ফটিক বিল বস্ত্রি থেকে উদ্ধাস্ত কলোনিতে গিয়ে কি শেফালির মাকে বলা যায়— আমার চাল ফুরাইসে। পলাশের যে কী বাইতে দিমু? রাধিকা নিজের মধ্যে অনতিক্রমা দূরত্ব টের পায়।

নীলিমা একটু বিপন্ন বোধ করেন। তাঁর রান্নার লোক চাই। রাধিকাকে দেখে তিনি বুঝতে পারছেন সে আর পাঁচটা বস্ত্রির লোকের মতো নয়। তবু তার বস্ত্রিতে গিয়ে পড়া— মফনার কাছে যতখানি বিশ্বাসের হোক— নীলিমার কাছে নয়। নীলিমা জানেন এরকম হয়। এরকম হওয়া সম্ভব। তিনি নিজে কি কখনও ভেবেছিলেন চাকরি করে তাঁকেই সংসার প্রতিপালন করতে হবে? নীলিমা রাধিকার এই প্রথম কাজ করতে আসা নিয়ে একটুও বিচলিত না হয়ে বরং তার শিশুটি নিয়ে বিপন্ন বোধ করেন। শিশু বুকে করে রাধিকা কী করে রান্নার কাজ সম্পন্ন করবে। সরাসরি— তোমাকে দিয়ে হবে না— বলতেও খারাপ লাগছে নীলিমার। মেয়েটির কাজ পেলে সুবিধে হয়। তিনি বলেন— তোমার নাম কী?

—রাধিকা।

—কী করেন তোমার স্বামী?

—কাঠের মিলে কাজ করেন।

—তুমি বাঙাল?

—হা।

—বাড়ি কোথায় ছিল?

—ঢাকায়।

রাধিকা মুখ তুলে দেখছে না। কিছুই দেখছে না। শুধু উত্তর দেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। বাড়ি কোথায় ছিল তার? ঘর কোথায়? এই অসামান্য প্রশ্ন যেন কতকাল পর তাকে করছে কেউ। সে জবাব দিয়ে তৃপ্তি বোধ করছে।

—ঢাকায়? কোন গ্রামে ছিলে?

—খিলপাটনি।

নীলিমার জোর গলা শোনা যায়। বিস্মিত ও আনন্দিত গলা।

—কী বললে? খিলপাটনি? রূপসী নদীর পাড়ে? বুড়ো বাটলার জাগ্রত শিবমন্দির আছে যেখানে?

রাধিকার মুখ ওঠে। তারও জোর কণ্ঠ শোনা যায়। বিস্মিত ও আনন্দিত কণ্ঠ— আপনি চিনেন? আমাপো গেরাম চিনেন?

নীলিমা হাসি হাসি মুখে মাথা নাড়েন— না। চিনি না। কিন্তু জানি। বাবার মুখে অনেক গল্প শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

তখন পা ঘষে ঘষে এ ঘরে আসেন তৃণাকুর। নীলিমা খুশির পঙ্খায় স্বপ্নে— শোন মাছু, কী কাণ্ড, এই মেয়েটা খিলপটনির মেয়ে।

—খিলপটনি?

তৃণাকুর সহসা মনে করতে পারেন না।

—আরে আমাদের সেই ঢাকার বাড়ি! তাকে গল্প করিনি? বাবা জন্মভেনে।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই রূপসী নদী তো? দলু একবার ভূবে যাচ্ছিল, একটা জেলে পরনের ধুতি ছুড়ে দাদুকে বাঁচায়—।

নীলিমার উৎসাহ বেড়ে যায়। তিনি বলেন— গোখরী বাড়ি কেন? এখন অকল্যা কেউ থাকে না। অনেকদিন ধরেই নেই। আমরাই যাইনি কখনও। তুমি না চিনলেও তোমার বাবা নিশ্চয়ই চিনবেন।

রাখিকা বলে— হা, চিনুম না ক্যান? বাড়ি আর নাই। দাদানের ইট কয়খান আসিল। তায় লোকে কয় গোখরীগো ভিটা। রফিকুল চাচা কলহইয়ের চাষ মিসিল। ভিটা সেগে নেই। কইত— খাউক। মাটির ইট, মাটিতে মিশ্যা বাড়ক। আমাগো ভাঙনের কাম কী?

রাখিকা, গ্রাম প্রসঙ্গে, মোহগুণ্ড হয়ে যায়, ভুলে যায় এই বাড়িতে সে প্রথম এল, এই মানুষগুলির কাছে প্রথম এল। এত কথা বলার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সে বলে চলে— রফিকুল চাচা বলত, ভিটেমাটি তুলতে নেই, তাহলে অকল্যাণ হয়। হোক ভাঙা, হোক দু'চারটে ইটই আর পড়ে আছে, কিন্তু ওই ইটের মধ্যে জড়িয়ে আছে কবে বাস করে যাওয়া মানুষগুলির সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ইতিহাস। কত সফল হওয়া না-হওয়া স্বপ্ন! ভাঙা বাড়ির এইসব ইট কি মানুষের হাড়পাঁজরার মতোই নয়? ধরো, চাষ দিতে দিতে তুমি কোনালের ডগায় হঠাৎ কোনও কন্ডাল পেয়ে গেলে। সে প্রাণহীন বলেই, হাড়সর্বস্ব বলেই কি তুমি তাকে অস্বীকার করবে! তাকে কি এই বলে সম্বাদন করবে না যে সে একসময় মানুষের আত্মা প্রাণ শরীর ধরে রেখেছিল?

তৃণাকুর অপলক তাকিয়ে আছেন রাখিকার দিকে। এ কী সব আশ্চর্য কথা বলছে মেয়েটা? অনাহারের মেয়ে, দারিদ্র্যের মেয়ে, বুকে শিশু নিয়ে কাজ খুঁজতে আসা মেয়ে— এ সব কী বলছে।

নীলিমা ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত জেনে নিচ্ছেন। বাবা আছেন কি! স্বামী বারাপ কি! এবং সব শেষে, তাঁর কাছে যা সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন, সেটি করে নিচ্ছেন— কাজ যে করবে তুমি, ছেলে সামলাবে কী করে?

রাখিকা বলার আগেই এবার কথা বলছে ময়না, যেন সে মনে মনে দায়িত্ব বোধ করছে যাতে রাখিকা কাজ পায়। যেন সে এই বক্তিতে এসে পড়া, বস্তির পক্ষে বেমানান মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছে। সে বলছে— ওইটা কি কোনও কথা হইল মা? আমরা তো সব পোলাপানের জন্ম দিয়াই কাজ কইরা গ্যালাম। বস্তি তো বড়লোকের জায়গা না যে কেউ কারও দিকে মুখ তুইলাও চাইব না। এইখানে আর পোলা আরে দাছে। আর নাতিরে আরে মানুষ করে। আমার কানু যখন হইল, তখন কি আমি তারে চাইর মাসের বেশি দুধ খাওয়াইতে পারসি? না খাওয়াইসি। কাম করতে আইসা বুকে দুধ উপচাইয়া পড়ত। বেলাভিজ ভিজত। বুকা টানটান করত। হেই কথা কেউ বুঝব না। নিজের প্যাটও বুঝব না। তখন কে দ্যাখত আমার কানুরে? ওই পাড়া-পড়শি, ওই অন্ধর ঠাকুমা। আরেও দেখব গো। ওই জোছন, কী ফুটফুটো ছেইলা, অর যন্ত্রের অভাব ছইব না ফটিক বিলের বস্তিত।

নীলিমা মূদু ধমকান ময়নাকে। ধমক না দিলে ও থামবে না।

বলেন— তোমার বৃত্তান্ত খামাও দেখি। আমার আর কী! ওর অসুবিধে হবে বলেই বলা। তা তোমরা যদি সামলাতে পারো ভাল। তা মেয়ে, এ বাড়িতে কী কী কাজ করতে হবে তোমায় বলি।

তৃণাঙ্কুর উঠে চলে যেতে থাকেন। কাজকর্মের বৃত্তান্তে তাঁর মন নেই। শুধু বে-কাজ করতে আসবে তার মুখ সুরের রেশ হয়ে মনে লেগে যায়। আশ্চর্য মেয়েটি বিশ্ব এবং কল্প হতে থাকা সৌন্দর্যের মতো করুণ। যেন প্রাচীন প্রাসাদের অযত ব্যগানে নাক ভেঙে যাওয়া জন্য কেটে যাওয়া সুন্দর মার্বেল পরি।

নীলিমা বলেন— ময়না যা করছে করবে। তোমাকে আমার সংসার দেখতে হবে। নিজের মতো করে রাখবে, বাড়বে, ঘর গুলোবে। আমার আর ভাল লাগে না। তোমায় শেষে ভরসা হচ্ছে, ঠিকঠাক গুছিয়ে নেবে। তুমি আর আমি নিশ্চিন্তে বিবাহ করব। আমাদের মিলগাটনি গাঁয়ের মেয়ে তুমি। ভাবলেই ভাল লাগছে। আমাদের ময়না সব কাজ করে, আবার কিছুই করে না। যেমন মেঝে মুছে গেল। শুকোলে তুমি দেখতে পাবে ধুলোয় গোল গোলা দাঁশ শুকিয়ে আছে মেঝেয়। বাসন মেজে গেল, তুমি দেখলে বাসনে ভাত শুকিয়ে আছে। কি মন?

মানু নির্ধিকার উত্তর দিচ্ছে— হ। তা হয় মাজেমইখো। পাঁচ বাড়ি কামে করি। তাল খাচ্ছে না?

নীলিমা বলেন— তা তোমাকে মানুর কাজের ওপর কাজ করতে হবে আবার। বুঝলে?  
রাধিকা ঘাড় নাড়ে। ছেলেকে এ কোল থেকে ও কোলে নেয়।

নীলিমা বলেন— কত নেবে বলো।

রাধিকার ঘাড় আরও নুয়ে যায়। বুকের মধ্যে গুড় গুড় করে। ময়না সারা রাত্তা তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিল— সেডশো টাকা চাইবে। বলবে না হলে তোমার সংসার ধেমে যাবে। কিছু রাধিকা এখন কিছুই বলতে পারছে না। সে জানে না। বোঝে না। কত পায় লোকে? এ কাজ করে? তা ছাড়া এখন বুকের মধ্যে অজুত আত্মীয়তার বাঁধন টের পাচ্ছে সে। সেই গাঁয়ের গোস্বামীদের ভিটে। সেই ভিটেবাড়ির মানুষ ইনি। রাধিকা থেকে থেকে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে আর ভুলে যাচ্ছে সে প্রাসাদদানের জন্য কাজ চাইতে এসেছে। বাবুবাড়ি এসেছে। টাকার কথা কেমন করে বলবে সে।

নীলিমা বলছেন— আশি টাকা দেব, কেমন?

রাধিকা মাথা নাড়ে। ময়না আর চুপ করে থাকতে পারে না। নীলিমাকে সে দেখছে কিছু কম দিন নয়। সে জানে মানুষটার মন ভাল। দিল দরাজ। বেগুস্তা খুলে বললে একটু বেশি টাকা দিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই। সে বলে— ওইতে কি অর হইব মা?

নীলিমা বলেন— সে ও বলুক। তুমি কেন কথা বলছ?

—সে কইলে হয়? হায় কি আগে কাম করসে নাকি যে বুইজা কইব! মুখ ফুইটায় টাকার কথা হায় কয় কী কইরা? তা আপনেও মানুষ ভাল। হায়ও ভাল। তাই কই। তিরিশ ট্যাছ ঘর ভাড়া, বড় পোলাডা ইশকুলে যায়—

—তাই নাকি?

—তাইলে আর কী কই? কেমন সুন্দর ল্যাখাপড়া করে। আমাগো কান জুড়ায়। হেই পোলার খরচা আসে। কোলের পোলাডারে তো দ্যাখলেন। অর্ধন কন তিনজনের খাটিন পঞ্চাশ ট্যাছায় চলে।

নীলিমা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন— আচ্ছা একশো দেব। কাজ করুক। তারপর দেখব।

রাধিকা কৃতজ্ঞ চোখে ময়নার দিকে তাকাল। প্রথম যে-দিন এরা বাড়ি বয়ে কথা বলতে এসেছিল, তার পছন্দ হয়নি। এরা লোংরা, কুঁদুলে, ক্ষয়াটে। কথায় কথায় অকথা গালাগালি করে, কথায় কথায় রসে চুষচুষ, ইয়াকি। চিল্লিয়ে ছাড়া কথা বলতে পারে না। অনন্দে চেঁচায়, দুঃখেও চেঁচায়। আদরে চেঁচায়, অভিসম্পাতেও চেঁচায়। রাধিকা এদের থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেয়েছে। অথচ এরাই এখন রাধিকার আপন, তার নির্ভর। একজন তার জন্য কেমন



সওয়াল করছে। তার তো কোনও স্বার্থ নেই। বরং রাধিকার জন্য তার এ বাড়ির চাকরি যেতে পারত। নীলিমা বলতে পারতেন—‘রাধিকাই হবে সব স্বার্থ বন্ধক। দু’জনের দরবার নেই।’ তাঁকে ভাল বলতে হবে যে তিনি এ কথা বলেননি। ময়না নীলিমার প্রমাণ ত্রিশ বছরের কাজের লোক। মল্লিনাথ ডাক্তারের বাড়িতে ছিল কালীতারা আর নীলিমার বাড়িতে ময়না কেন এ বাড়িরই একজন।

ময়নার সঙ্গেই নীলিমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রাধিকা। একবার শেফালির মা’র কাছে যাবার জন্য মন ছটফট করল তার। ময়নাকে বলল—**অ মরনানি।**

—ক।

—আমার লগে যাইবা?

—কুনখানে?

—উদাত্ত কলোনি?

—অ। তর আগের বাসায়? শ্যাফালির মা’র বাড়িত যাবি?

—হ। যাইতে মন লইতাসে। আকা আকা ডর করে। যাইবা?

—আমি যাইতে পারি। শুন—

—কও।

—আমি মি-চাকরাইন্যা মানুষ। আমারে দেইখা হ্যায় রাইগা যাইব না?

—কী যে কও। রাগব ক্যান? মাসিউ তো খাইটাই খায়।

—হ। বাটো। কিন্তু ইশকুলের কাম করে ত। আমাগো লগে কথা কয় না।

—আমার লগে যাইবা। আমি কইতাসি। মাসি মানুষ খাটি।

ময়না আর কথা বাড়াল না। অন্য নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে পায়ে পায়ে রাধিকার সঙ্গে চলল। কিছুই নয়, তবু অকারণে বুকের মধ্যে শব্দ হতে থাকল রাধিকার। উঠোনে যখন ঢুকল সে তখন সন্ধ্যা পার হয়েছে। ঘরে ঘরে ধুনো পড়ছে। মিষ্টি ঘরোয়া ও সাংসারিক কলাণী গন্ধ ছড়িয়ে আছে উঠোনময়। বুকের মধ্যে ছেলেকে জোরে চেপে ধরল রাধিকা। পরমেশ কি আছে? পরমেশকে কি দেখতে পাবে? ভাবতে ভাবতে সংজ্ঞা হারাবার অবস্থা তার। ছেলেকে অঁকড়ে নিজের বুকের তলাকার শব্দ থেকে নিজেই পালাতে চাইছে সে। তার মনে পড়ছে—

পসরইতে শরীর হোয় অবসান।

কইহাতে ন লয় অব বুঝ অবধান ॥

কহয় ন পারিয় সহন ন যায়।

বচহ সজনি অব কি কর উপায় ॥

কোন বিহি নিরমিল হই পুন নেহ।

কাহে কুলবতী করি গড়ল মণু দেহ ॥

কাম করে যরিয় সে করয় বহার।

রাখয় মন্দিরে ই কুল আচার ॥

সহই ন পারিয় চলই ন পারি।

ঘন ফিরি যৈসে পিঞ্জর মাহ সারী ॥

পরমেশ নেই। শেফালির মা ছাড়া কেউই নেই ঘরে। রাধিকাকে দেখে হইহই করে উঠল শেফালির মা। জোছনকে কোলে তুলে আদর করে বলতে থাকল—**আমাগো জোছন আইসে।** আর ঘরখান আলো হইসে।

জোছনের ঘুম ভেঙে গেছে। শেফালির মাকে দেখে চমৎকার হাসি দিচ্ছে সে। শেফালির মা বিছানা দেখিয়ে বলে, বা। ব এইখানে।

ময়না এখনও ঘরে ঢোকেনি। শেফালির মা তার অস্তিত্ব টের পেল। বলল—**সঙ্গে কাড়া?**

—ময়নাদি।

—আইতে ক।

ময়নাকে ভিতরে ডাকল রাধিকা। ময়না এল। ফরে যাওয়া সেকটিপিন লাগানো হাওয়াই চিটি বাইরে বুলে দিবার পায়ে ঢুকে এল ঘরে। হোক না নশ মীরের ছাড়া বাড়ি, যত্ন তো এ ভদ্রলোকের বাড়ি। সে, ভদ্রলোকের গৃহে কাজ করতে যেতেই অভ্যস্ত। ভদ্রতা সমাধানে নয়। রাধিকা লক্ষ করল শেফালির মা ময়নাকে পিড়ি দিচ্ছে বসার জন্য। বিছানায় বসার আহ্বান জানাচ্ছে না। প্রথম দিন যখন বস্তির মহিলারা আসে তখন তার যেমন হুতুছিল তেমনি নিশ্চই হচ্ছে শেফালির মা'র। কিন্তু এখন, রাধিকা নিজেই, খাটি বস্তিবাসী একজন, ময়নাদির বা অঙ্কর মা'র সঙ্গে তার কেনও তফাত নেই। হয়তো আরও কিছুদিন পর সেও ওইরকম বুলে পা থেকে বুলে রাখবে ছেঁড়া হাওয়াই চিটি আর তাতে সেকটিপিন লাগানো থাকবে। শেফালির মা যখন দেখবে সে নীলিমার বাড়ি থেকে রান্না করে বেকছে নোহো উলোমুলো অবস্থায় তখন তাকেও আর বিছানায় বসতে বলবে না। রাধিকার ক্রমে প্রত্যয় হতে থাকে, সে আর সেই রাধিকা নেই, যে ছিল, যে শেফালির মা'র কুকের কাছে ছিল। সে হঠাৎ বিছানা থেকে নেমে ময়নার পাশে মেঝেতে বসে পড়ে। এবং পরবর্তী সকাল, যা কিনা তার কাছে নতুন হয়ে প্রতিভাত হবে, তার জন্য প্রস্তুত হয়।

বস্তিতে ফিরে সাতকানন করে সকলকে গল্প করে ময়না। কেমন চমৎকার ঠাণ্ড সে পাইয়ে দিয়েছে রাধিকাকে। সকলেই খুশি হয়। অঞ্জলি বলে, ছেলে নিয়ে ভাবনা কোরো না। আমার কাছে রেখে যেয়ো। এই বস্তিতে কেউ কারওকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু যে যা পারে করে।

অতএব, ছেলে বড় হচ্ছে রাধিকার। জোছন, তার যেমন হওয়ার কথা তেমনি ভুঁয়ে লুটিয়ে বড় হচ্ছে। কে না জানে চঞ্জের জোছনা, তার সৃষ্টি হয়েছিল ভুঁয়ে লুটিয়ে বলে আর বৃক্ষকে চুমো দেবে আর জলের ওপর পড়ে এই পৃথিবীকে ক্রমশ করে তুলবে মায়াময়। সমস্ত জোছন রচনা করে মায়া, মানুষ তাকে প্রতিপালন করে, লালন করে স্বপ্নের ভিতর। রাধিকা কি ব্যতিক্রম তবে? কেন না জোছন যে রাধিকার স্বপ্ন নয়। পলাশ সে নয় রাধিকার বসন্তমত্ততা। জোছন ও পলাশ রাধিকার দুই বাস্তব ও সত্য যাদের জন্য কোনও শর্মসের কোনও পরমেশ্বরের জন্য পরি হয়ে যাচ্ছে না রাধিকা। আর রাধিকা, নীলিমার সসারো তেলে দিচ্ছে নিজেকে। সেই প্রথম দিন যেমন কথা হয়েছিল, তারপর থেকে অত কথা আর বলেন না নীলিমা। তাঁর ব্যবহারে একটি নিপুণ দুরত্ব আছে যা কন্নী এবং কন্নীর মধ্যবর্তী ব্যবধান সূচিত করে। রাধিকা তা অনুভব করে এবং অতিক্রমের চেষ্টা করে না। সেই সন্ধ্যার পর সে আর শেফালির মা'র বাড়িতে যায়নি। পরমেশ্বরের জন্য আগ্রহ হয়নি। শেফালির মাও তাসেনি তার বাড়িতে। একদিন জুলে তার সঙ্গে দেবা করতে গিয়েছিল রাধিকা। শেফালির মা বলেছিল— ‘অনন তি আমার কথা কওনের সময়?’ দুরত্ব বাড়ছে। দুরত্ব তৈরি হচ্ছে। রাধিকা মেনে নিচ্ছে। যা হয়েছে এতকাল সব কিছুই মতো, এখন যা হচ্ছে তার মধ্যেও রাধিকা বাঁচতে থাকছে, এমনভাবেই বেঁচে থাকার কথা ছিল কিনা তা না জেনেই। দুরত্ব, দু'টি সম্পর্কের মধ্যবর্তী ব্যবধান, অকস্মাৎ গড়ে ওঠা কিংবদন্তীর মতো মাথা তোলে। সে তৈরি হল, তৈরি হতে থাকছে তা কেউ বুঝতে পারে না। রাধিকাও এই না বোঝার কাছে জলস্রোতের মতো নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে বারবার আর এ পাখর ও পাখর কাটিয়ে গিয়ে পড়েছে অনিদিষ্ট অজ্ঞাত সম্পর্কগুলির কাছে। এই পরিবার বিপদের সময় তাকে কাজের সুযোগ দিয়েছে তাই সে রান্নার এতটুকু অবসর করে না। জিনিসের অভাব নেই। তাই রসিছে রাধে। নীলিমা খুশি। তৃণাঙ্কুরও খুশি। নীলিমার নির্দেশে বিকেলের রান্না চুকিয়ে যাবার সময় নিজের মতো খাবার সঙ্গে নিয়ে যায় রাধিকা। তাতেই রাঙে তার ও পলাশের হয়ে যায়। প্রথম মাসের মাইনে হাতে পেয়ে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। কী কী করবে সে, কী কী

কিনাবে ভাবতে গিয়ে দিশেহারা হয়েছিল। এক মাসের মাইনে আর খরচশত্রু দিয়ে কার্তিক সেই যে চলে গেল আজ প্রায় চার-পাঁচ মাস সে আসছে না। মানুষ এত নিষ্ঠুরও হয়? কার্তিক কি জানত রাধিকা যেমন করেই হোক খরচ চালিয়ে দেবে। নাকি অনুরোধ বিন্দু করল কোকটীর। কবন্ধ গো। রাধিকা ভাবতে চায় না। আর নাই আসে যদি, কী এসে যায়। কার্তিকের প্রতি এতটুকু মমতা বোধ হয় না। সে জানে তার দুটি সন্তান আছে, যাদের জন্য তার বেঁচে থাকতে হবে। সে জানে তার বুকের তলায় একটি মুখ লুকানো আছে, থাকে নিয়ে স্বপ্ন না দেখে তার উপায় নেই। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হয়, ভবিষ্যতের কথা ভেবে সঙ্কট করতে হয়, পরিত্রাণ করতে হয়, এমনটা সে ছোটবেলায় দেখেছিল। এখন সে এতটুকু জানে, কামালে যেতে থাকতে হয়। শুধু বেঁচে থাকতে হয়। এই বাঁশের চাঁচের ঘরে, ফটিক বিলের মাঝারী শীত ও দুর্গন্ধ গায়ে মেখে, ফটিক বিলের দৃষ্টি মোংরাধক জল দিয়ে গান করে, এর খুলাস দুখের শিশুকে ফেলে গিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। এই বাঁচার ইচ্ছের মধ্যে কোনও গৌরব নেই। অসন্তোষ নেই। এই বাঁচার ইচ্ছের মধ্যে কার্তিকও নেই কোথাও। শুধু শমনের আছে। পরমেশ নামে একটি মানুষ সে একটুখানি শমনের হয়ে ছিল, সেও হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, কিন্তু শমনের কিছুতেই হারিয়ে যেতে রাজি হয়নি। সে রাধিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যায়। আর রাধিকা তাকে আগলে চলতে চলতে ঘরমোড়ার কাছটি বা তৃণাকুরের পুঙ্ক ভাঙারের ধূলা কাড়ার কাজটি খুবই শৈল্পিকভাবে সম্পন্ন করতে থাকে।

যে তিনদিন কলেজে যান না তৃণাকুর, সেই তিনদিন রাধিকা তাঁকে অন্বেষণ করে দেখে। মানুষটা চলতে পারেন না ভাল করে। বউ নাকি বিষ খাইয়ে এমনি করে দিয়েছে। মানুষ কী নিষ্ঠুর! কেনন করে পারল। সে যে কার্তিককে এতটুকু ভালবাসেনি, তাতেও কি সে পারবে কার্তিককে বিষ খাইয়ে দিতে।

দুপুরবেলটা বড় ফাঁকা, বড় অসুস্থ এই বাড়ি। নীলিমা ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রে আজকাল ঘুম হতে চায় না তাঁর। তাই এই দুপুরে গড়িয়ে নেন। কিন্তু তৃণাকুর জেগে থাকেন। দুপুরে ঘুমোলে মেন বৃদ্ধি হয়। তৃণাকুর জানেন তাঁর ওই ঘষে ঘষে চলাও অসম্ভব হয়ে যাবে যদি তিনি আরও মেদবাখলো পড়েন। তিনি তাই দুপুরটা পড়ে কটান। জোরে জোরে পাঠ করেন কবিতা বা নাটক। রাধিকা শুনতে পায়। ইংরাজি ভাষার বিন্দুবিসর্গ সে বুঝতে পারে না। কিন্তু শোনে। তৃণাকুরের স্বর তার ভাল লাগে। তাঁর পাঠের মধ্যে রাধিকা দুখ বা বেদনার রসটি চুতে পায়। এ বাড়িতে সে আসে এগারোটিয়া। সঙ্গে ছটা পর্যন্ত থাকে। নীলিমা স্বীকার করেন, রাধিকা তাঁর সঙ্গারকে চকচকে করে তুলেছে ক্রমশ। তিনি যেমন ভালবাসেন কিছু স্বপ্নের জন্য আর পারেন না তেমনটি করতে, তাই করছে রাধিকা। আজ রাধিকা তৃণাকুরের ঘরের ধূলা-ময়লা ঝাড়ছে। আর আজই তৃণাকুর, ইংরাজি ছেড়ে বাংলা কবিতা পাঠ করছেন—

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি  
সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ  
তাদের গায়ে গায় যে সোহেল পাখি  
তাহার গানে আমার নাচে বুক

রাধিকা খেমে গেছে। এক লহমায় পৌঁছে গেছে মিলপাটনি গায়ে। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! একথাই যেন সে বলতে চেয়েছে কতবার, বলতে পারেনি। ভাবতে চেয়েছে কতবার কিন্তু ঠুঁতে পারেনি। তৃণাকুর পড়ছেন—

তাহার দুটি পালন করা ভেড়া  
চরে বেড়ায় মোদের নটমূলে  
যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া  
কোলের পরে নিই তাহারে তুলে

ভেড়া ছিল না কিছু বকরি ছিল ওদের। গোরু ছিল। ছাঁ, চকলি নাচুর মাঠে মাঝেই ছুটে চলে আসত রাধিকাদের উঠানে। আর রাধিকা তাকে ভাঙানোর ছলে তার গলা জড়িয়ে ধরত একটাই কারণে যে সে শমসেরদের গোহালে বাস করে। সেই পুরনোকে ভাঙতে স্বার্থের মধ্যে নিয়ে সে পায়ে পায়ে তৃণাকুরের কাছে এসে দাঁড়ায়। হাতে ধুলোভর্তি কাপড়ের টুকরো। চুলে কুটো। শাড়িতে পরিষ্কারের ঘ্রাণ। সে দাঁড়ায়। স্বপ্নোচ্ছিতের মতো বলে— আবার থিক্যা পড়বান?

তৃণাকুর চমকে মুখ তোলেন। প্রথমে তাঁর বোধগম্য হয় না যে রাধিকা কী বলতে চায়। বিস্ময় এসে উপলব্ধি আড়াল করে দাঁড়ায়। তিনি মাঝখানে আতুল রেখে বই বন্ধ করেন। এক কুঁচকে রাধিকার দিকে তাকান। প্রশ্ন করেন— কী বললো? আর একবার পড়ুন।

—হ।

রাধিকা মুখ নিচু করে। ক্রমে লজ্জা পায়। ঘোঁকের মাথায় যা সে বলে বসেছে তার হাত থেকে মুক্তি চায় এখন। তৃণাকুর কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন তার দিকে। তারপর বলেন— দাঁড়িয়ে কেন? বোসো।

রাধিকা মেঝেতে বসে। তৃণাকুরের কষ্ট হয় কিন্তু ভদ্রতাবোধ, যা কিনা প্রায় শালীনতার সমার্থক— কখনও কখনও ডিঙোতে পারেন না তিনি, বলতে পারেন না— নীচে নয়। এখানে বসো। তার বদলে তিনি পড়ে চলেন—

আমরা দুজন একটি গায়ে থাকি

সেই আমাদের একটিমাত্র সূখ।

এক সময় কবিতা ফুরোয়। রাধিকা স্তব্ধ হয়ে থাকে। জীবনের অক্ষুরন্ত রুদ্ধ পথ যা শুধে শেষ করতে পারে না সেই অশ্রু ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে। তৃণাকুর দেখতে থাকেন, কাজের মেয়ে নয়, বস্তির মেয়ে নয়, এক অন্য মেয়েকে, যার বুকের তলায় টলটল করছে স্বপ্ন গভীর জলাশয়। তিনি ধীরে ধীরে শুধেন— কান্দছ কেন?

—আমাপো গেরামে রূপসী নদী আসিল। কী সোন্দর জল।

—আর কী ছিল গায়ে? কেউ কি ছিল যার নাম রজন?

রাধিকা তৃণাকুরের কথা বুঝতে পারে না। মুখ নিচু করে। আঁচল দিয়ে মুছে নেয় অবশ্যের গাল। তৃণাকুর ফের বলেন— তুমি আমাদের মতো কথা বলতে পারো না?

—কই না।

—কেন?

—পাকম।

—কও।

হেসে ফেলে রাধিকা। দু'হাতে মুখ ঢাকতে গিয়ে ধুলিমলিন কাপড়টি মুখে ঠেকিয়ে ফেলে। মুহূর্তে দূরত্ব পালিয়ে যায়। ব্যক্তি ও ব্যক্তির মনোকার দূরত্ব। সম্পর্ক ও অবস্থানের মনোকার দূরত্ব। কেউ তা টের পায় না। শুধু ধুলো আর চোখের জলের ছোপ লেগে যায় গালে। যে সারল্য জীবন এখনও তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি— তার দিকে চেয়ে থাকেন তৃণাকুর। তাঁর মধ্যে ভাল লাগা ঘনায়।

ফের নিজের ভুলে হাসির দমক আসছে। কতদিন পর সে হাসছে এমন? কতদিন পর? হাসতে হাসতে বলছে— আইজ না। কাহিল থিকা কমু।

—বেশ।

—না, কাল থিক্যা না।

—কবে থেকে।

—কয়দিন যাউক গিয়া।

—ক'দিন?

রাখিকা মুখ নামিয়েছে ফের। যেন তার মনে পড়ে গেছে এই সহজ কথার স্বাভাবিক নয়। এবং সে নিশ্চিত নয়, আপনি ভাষা ভাণ্ড করে সে করে নাগাদ এ দেশীয় হয়ে উঠবে। তৃণাকুর মনু হাসেন। বলতে থাকেন—থাক। তুমি তোমার মতো করেই কথা খোলো, কেমন?

রাখিকা মাথা হেলায়। হাসে।

হাসছেন তৃণাকুরও। বলছেন—তুমি জানো, কেমনও করিবা? কুলে পড়েছ?

রাখিকা তার পড়াশুনোর বৃত্তান্ত জানায়। তার বাবার কথা জানায়। তার পদবিবর্তী শোনার কথা বলে। কার রচনা জানে না। কোন বই জানে না। শুধু মুখস্থ বলে যায়। নির্জন শান্ত মধ্যাহ্নে, ছেলে ফেলে আসা, স্বামী ভুলে যাওয়া, খেতে খেতে থাকা মেয়ে আশ্রম মনে পদাবলার আখর শোনাতে থাকে বিদগ্ধ অধ্যাপককে। অধ্যাপক শুনে থাকেন—দু'জনের মধ্যবর্তী দূরত্ব ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। দুপুরের পর দুপুরের ধ্যানে সারানিন কাটিয়ে নিতে থাকে দুটি দুই স্তরীয় নারী-পুরুষ। তাদের আর কোনও কষ্ট নেই এখন। কোনও বঞ্চনা অপমান নেই। রাখিকা নামের মেয়ে শমসের নামের পুরুষ ছাড়াও অন্য এক পুরুষের আশ্রয়ে ধরা দেয় ক্রমশ। তার কষ্ট শেষে নেয়। তাপ শুবে নেয়। অসুস্থতাকে লঙ্ঘন করায়। তৃণাকুর নামের শিক্ষিত স্ত্রী-পরিভ্রমণ অধ্যাপক পুরুষ নিজের সমস্ত প্রেম ও শ্রদ্ধা দিয়ে জড়িয়ে ধরেন এই নিঃশব্দ ক্ষয়িষ্ণু নারীকে। মধ্যাহ্নের পর মধ্যাহ্নে তাঁদের মিলন বচিৎ হয়। শর্মি নেই, কার্তিক নেই, দারিদ্র্য নেই, বিবাহবিচ্ছেদ নেই, পরমেশ নেই, রঞ্জন নেই, শুধু অপূর্ব মধ্যাহ্ন জেগে থাকে আর নীলিমা ঘুমিয়ে থাকেন। আর শমসের জেগে থাকে। আর জোছন ধুলোয় ঘুমিয়ে থাকে। আর অন্ধ বিশ্ব প্রাণে ঘুরে বেড়ায়। আর পলাশ পড়া মুখস্থ করে। আর রাখিকা বলে—

ন কর ন কর সখি মোহে অনুরোধে।

কি করব হমহ তব পরবোধে ॥

অলপ বয়স হম কানুসে তরুণা।

অতিছ লাজ ডর অতিছ করুণা ॥

লোভে নিটুর হরি কয়লহি কেলি।

কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি ॥

তৃণাকুর জড়িয়ে ধরেন রাখিকাকে। এবং ধরাকালীন টের পান এর কোনও পরিকল্পনা ছিল না তবু এ অনিবার্য। প্রথম দিন যখন এই নারীকে সেখেছিলেন তখন আশ্চর্য লেগেছিল। কারণ, না খেয়ে মরেও যেতে পারে এমন সে-নারীর মুখে অপার্থিব আলো দেখেছিলেন তিনি, তার মনে রাখা দেখেছিলেন, শুধু গ্রামকে ভালবেসে মনে রাখা নয়, সে স্মরণ করেছিল অপূর্ব দর্শন। সে স্মরণ করেছিল কারণ তা আশ্চর্য করেছিল। সে আশ্চর্য করেছিল কারণ কথাগুলির নিহিত অর্থ স্পর্শ করেছিল তাকে। তাই সে সাধারণ নয়। সাধারণ ছিল না। তাই তৃণাকুর কাছে টানেন তাকে। রাখিকার শাড়ির পরিষ্কারের গন্ধ নাকে লাগে তাঁর। তিনি অঙ্গুলি বলেন—

What lovely lad most pleased me.

Of all that with me lay?

I answer that I gave my soul

And loved in misery,

But had great pleasure with a lad

That I loved bodily

রাখিকা দু'হাত দিয়ে তৃণাকুরের ভারী গিঠে বেত দেয়। ভাবে, কী সরল মানুষটা! কী সুন্দর সহজ মানুষটা! ওর বউ কেমন করে পারল। বিষ খাওয়াতে কেমন করে পারল! তৃণাকুরের পরীরের পেমণ নিতে থাকে সে আর বলে—

হঠাৎ ভেল রস হুম হরল গেরান।

নীবিবন্ধ তোড়ল কখন কে জন ॥

তৃণাকুর নীবিবন্ধ নামিয়ে আনেন নীচের দিকে। গাভীর নাভিগর্ভ। অমসুখ নিয় উপত্যকা।  
জন্মদানের ফটলে মহিমাবিত। তিনি ঠোঁট ঘেঁষেন। শর্মি কত সতর্ক ছিল যাতে তলাগোটে কোনও  
ফটল না হয়। যাতে একটুও চর্বি না জমে। শর্মির তলপেটে পারফিউমের দেশাবধান গন্ধ  
থাকত। তৃণাকুরের নাকে রাধিকার চামড়ার গন্ধ উঠে আসছে এখন। তিনি বলছেন—

Flinging from his arms I laughed  
To think his passion such  
He fancied that I gave a soul  
Did but our bodies touch,  
And laughed upon his breast to think  
Beast gave beast as much

রাধিকা তৃণাকুরের বুকে মুখ ঘষছে। তার লালা লেগে যাচ্ছে তৃণাকুরের স্তিমিত পুরুষবৃন্তে।  
আর সেই ক্ষুদ্র বৃন্ত উদ্ধত কণ্টকের ন্যায় শক্ত হচ্ছে। পাশের ঘর থেকে নীলিমার ঘুমের শব্দ  
আসছে। শীত নেই। একটুও শীত নেই কোথাও। পড়ি-মরি করে ছুটে আসছে বসন্ত। ঝাঁপ  
দিচ্ছে তৃণাকুরের জানালায়। রাধিকা বলছে—

দেল আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।  
তহিখনে হৃদয় মকু উঠল কাঁপি ॥  
নয়নে বারি দর শাওল রোই।  
তবুও কানু উপশম নহি হেই ॥

শক্তিমান হয়ে উঠেছেন তৃণাকুর। শক্ত হাতে মথিত করছেন দু'খানি পর্বতচূড়া। পান  
করছেন। পান করছেন। তাঁর দু'চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে।

I gave what other women gave  
That stepped out of their clothes,

আধর নীরস মকু করলনি মন্দা।  
রাছ গরাসি নিশি তেজল চন্দা ॥  
কুচযুগে দেল নখ পর হারে।  
কেশরী জানি কজকুজ বিদারে ॥  
But when this soul, its body off,  
Naked to naked goes,  
He it has found shall find therein  
What none other knows, ...

ঘুম ভাঙছে নীলিমার। ঘুমের আন্তরক ভেদ করে তিনি দেখতে পাচ্ছেন বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে  
জড়িয়ে যাচ্ছেন তৃণাকুর। রাগে তিনি মুখোমুখি হচ্ছেন ছেলের। ডাকছেন—মাষ্টু।

—বলো মা।

—শেষ পর্বন্ত একটা ঝিয়ের সঙ্গে তুই ... ছি ছি ছি আমি ভাবতেও পারি না।

—মা! ও তো মানুষ মা। প্রত্যেককেই কোথাও না কোথাও তো কাজ করতেই হবে।

—তাই বলে একটা রুচি থাকবে না? শিক্ষা থাকবে না?

—শিক্ষা তো ছিল মা, শর্মির। রুচিও তো ছিল মা। ওই শিক্ষার আড়াল থেকে রুচির আড়াল



থেকে কি অশিক্ষা আর কুচিৎ ব্যবহার খুঁজে পাওনি তুমি?

—হ্যাঁ। পেয়েছি। তার মানে সবাই এরকম নয়। ভাল মেয়েও আছে। তোমার জীবনে একটা খারাপ মানুষ এসেছিল বলে তোমাকে বন্দি থেকে দেনা খুঁজতে হবে।

—মা, বন্দিতে বাস করাটা একটা মানুষের শেষ পরিচয় নয়। তোমার কাছ থেকে এটা আশা করি না আমি। ওর আচরণব্যবহার বেগো তুমি। ওকে দেখো। ওর মধ্যে শিক্ষা আছে। ওর নিজস্ব শিক্ষা। ওর মধ্যে আলো আছে। আমি তার সন্ধান পেয়েছি। ওর ভাষা ও পরিস্থিতি ওকে এখানে টেনে এনেছে। তার জন্য ও দায়ী নয়। তুমি এ সব ভাবছ না। দেখছ না।

—আমি সবই দেখি মানুষ। তোমাকেও দেখি। তোমার বাবাকেও দেখেছি। তিনিও, তোমার মতোই, খিতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। চরিত্র রঙে স্বপ্ন নয়। তোমার বাবার ছায়া থেকে তোমাকে আড়াল করেছি এতদিন, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, কোনও লাভ হয়নি। তোমার রঙে তিনি আছেন।

—মা চুপ করো। তুমি আমাকে অপমান করছ। নিজেকেও অপমান করছ।

—হ্যাঁ, এখন তোমার অনেক কিছু মনে হবে। তোমার জীবনে যতবার নারী এসেছে ততবার আমাকে তোমার অসহনীয় ঠেকেছে।

—আমি সে কথা বলিনি মা। আমি বোঝাতে চাইছিলাম যে একজন বিপিরি করে পেট চালায় বলেই সে অশ্রদ্ধের নয়। একজন বিশ্বের কাছেও অনেক কিছু শেখার থাকতে পারে। অনেক কিছু নেবার থাকতে পারে।

—কালই দূর করে দেব মেয়েটারকে। বিপদের দিনে কাজ দিলাম। এক গাঁয়ের মেয়ে। কষ্টে পড়েছে। এক কথায় মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই। বেই সেখল একা পুকষমানুষ, বউ নেই, অমনি গলে পড়ল। একেবারে বিশ্বাস করতে নেই এদের। একদম না।

—আর একটা কথাও বোলো না মা। ওকে চলে যেতেও বোলো না। পাপ হবে তোমার। অসহায় একটা মেয়ে। সরল, সুন্দর। তোমার সংসার কি ও মাথায় করে রাখেনি? হ্যাঁ, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে। তুমি তো আজ জেনেছ। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক অনেক দিনের। ওর মধ্যে একটা বাড়তি জিনিস চাইতে দেখেছ ওকে? কোনও বিশেষ সুবিধা নিতে দেখেছ? আমি ওকে ভালবাসি মা। ওর সম্পর্কে আমার কোনও সংশয় নেই। আমি কী বা ও কী তার হিসেবও আমাদের সম্পর্কের মধ্যে নেই। উই গান্ডড ইচ্ছা আদার অ্যান্ড ওয়ার ইগনোরেন্ট।

—কবিতা বলছ? কবিতা? এই জন্য শর্মি তোকে ছেড়ে চলে গেছে। বই পড়ে পড়ে তোর আর বাস্তববুদ্ধি হল না। বিশ্বের সঙ্গে প্রেম—ইট্‌স্‌ আ ক্রাইম, আ পারভারসন আই সে।

How could passion run so deep

Had I never thought

That the crime of being born

Blackens all our lot?

But where the crime's committed

The crime can be forgot

আবার কবিতা বললাম মা। গত বছর অধুবাবুর সময় ছোটমাসি তোমাকে ফল দিতে এসেছিল। প্রতিবারই কেউ না-কেউ আসে। মেঝমাসি, ছোটমাসি, মামিমারা। সবাই জানে তুমি অধুবাবু করো না। তবু আসে। তুমি প্রতিবার ফল নাও আর বেছে বেছে ওই দিনগুলোয় আমিষ ভোজন করো, তুমি বৈধবা অঙ্গীকার করো আর ওরা তোমাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় তুমি কত বড় পাপ করছ। তুমি বেগে যাও কারণ প্রত্যেকের নিজস্ব পদ্ধতিতে জীবনচর্য্যর অধিকার আছে, তুমি বিশ্বাস করো। বাস্তবস্বার্থীনতায় ওদের ওই হস্তক্ষেপ তুমি মানো না কারণ তুমি প্রগতিশীল মহিলা। দুঃস্থ নারীকল্যাণের জন্য গড়ে ওঠা কিছু সংস্থার সঙ্গেও তুমি নিজে থেকে যুক্ত

করেছিলে। মা, আমার বয়স প্রায় চল্লিশ হতে চলল। আমি একটা কলেজে পড়ছি। এখনও তুমি আমাকে বলতে চাও, বোঝাতে চাও, কোনটা ঠিকের কোনটা নয়। আমার মধ্যে যে কটিবোহ তৈরি হয়ে গেছে তা তোমার সঙ্গে না মিললেও তা আমারই। আমি সে নিয়মেই চলব। তুমি অনেকবার বলেছ ওকে তাড়িয়ে দেবে। যদি দাও, আমি এ পাড়ায়তই থর নেবো থাকব। ওকে রাখব আমার ঘরে।

—ছিঃ। ওই মদোমাতাল হিরণের সঙ্গে আজ আমার ছেলের কোনও ব্যবসা নেই। মাক তোমাকে আলাদা ঘর ভাড়া করতে হবে না। কেউকারি বাড়িয়ে না, দুদিন বাদে আমি যোগ বুজব। তখন যা খুশি করো।

তখন অন্ধকারে ছেয়ে আছে রাধিকা। লঠনের আলো পড়ছে জোড়নের মুখে। ছেলেরা রোগা হয়ে গেছে। রাধিকা জন মুক্ত করেছে। দুই চোটে বৃত্ত ধরার জন্য হাসফাস করেছে জোড়ন। হঠাৎ পলাশ বুঁকে পড়ছে মায়ের ওপর। খোলা বুকে গাঢ় নীলচে দাগ। পলাশ বলছে— তোমার বুকে ও কীসের দাগ মা?

রাধিকা আঁচলের আড়াল দিচ্ছে। কিসু না। তুই মাস্টারের বাড়ি গেলি না আইজ?

তৃণাকুরের দংশনচিহ্নে বুক ভরে আছে রাধিকার।



আমার লড়াই শেষ। আমি, দেবোপম বসু, যে চূড়ান্ত ঘৃণা সম্পন্ন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, যে-ঘৃণার দিকে তাকিয়ে আমি শান্তিতে মরতে পারব এই ভেবে যে শুধু জন্মানোর দুর্ঘটনা নয়, আমার জীবনে আরও অনেক দুর্ঘটনা আছে যা আমাকে বাঁচতে সাহায্য করেনি এবং মৃত্যুর জন্য প্ররোচিত করেছে—সেই ঘৃণা আমার সম্পন্ন হয়েছে। এখন দুঃখ একটাই। ওই চূড়ান্ত ঘৃণার মধ্যেও সামান্যতম স্বর্গহেঁড়া আলো আমাকে জড়িয়ে গেছে যার জন্য, সমস্ত দুর্ঘটনার পরও, আমি বেঁচে থাকতে পারতাম। এবং ঠিক এ কথাই আমার মনে হয়েছে যে যে-জনা আমি বেঁচে থাকার লোভী হয়ে উঠেছি, সে-জনাও আমার আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। ঈশ্বর যদি সত্যিই থাকেন কোথাও, আর আমার মৃত শরীর ছেড়ে যাওয়া অমৃত অবিনশ্বর আত্মাকে জিজ্ঞাসা করেন— কী এনেছ আমার জন্য? ঘৃণা? পৃথিবী থেকে কি ঘৃণা নিয়ে এলে তুমি, যা সারাক্ষণ বুকুর তলায় বয়ে বেড়াতে?

আমি বলব—না, ঘৃণা নয়। সে-সব আমি আমার শরীরের সঙ্গে পৃথিবীতে ফেলে এসেছি। এই দেখো, তোমার জন্য আমি এই এনেছি।

আমি হাত প্রসারিত করব ভগবানের দৃষ্টি পর্যন্ত, আর দেখাব, আমার এইটুকু স্বর্গের আলো। আমার স্বর্গহেঁড়া আলো।

আমাকে যে মরতে হবে, আমার যে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না, এটা আমার নিজের কাছে খুবই স্পষ্ট ছিল। আমার কোনও ঈশ্বরচেতনাও ছিল না। অথচ আজ আমি ঈশ্বর লিখে ফেললাম। যেন সত্যিই বিশ্বাস করতে বসেছি, মৃত্যুর পর সেই পরম শাস্তিময়ের কাছে যাব।

অনেকবার ভাললাম, দাদা যেভাবে বাঁচার চেষ্টা করেছে, আমিও সেভাবে বাঁচি না কেন। ভাল থাকার চেষ্টা করতে করতে বাঁচা, নাকি ভাল থাকার চেষ্টা করতে করতে মৃত্যু। কোনটা ঠিক?

হবে না। আমার দাদার মতো হবে না। দাদা জীবনকে দেখে। আমি মৃত্যুকে দেখি। ওর সব ভাবনা জীবনের উপসংহারে পৌঁছয়। আর আমি সব কিছু পর মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দেখি

না। মরণকে দেখতে দেখতে মৃত্যুর সঙ্গে আমার একটা টানেন্দু সম্পর্ক হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি রি-অ্যাক্টিভ ডিপ্রেশনে ভুগছি। কিংবা বলব যেতে পারে আমি একজন উন্মাদ। আমার মানসিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস হয়েছে। আমি যাই হই, সিসিফাস হতে চাই না। আনন্দের জন্য সাত মাইল চড়ে আবার গড়িয়ে পড়া পাথর নতুন করে চিনার কঠোর প্রতি আমার মোহ নেই। যতই চেষ্টা করো, শেষ অঙ্কটা সেই শুনাই। আমায় অমরতায় নেই নেই। কোনও কিছুতেই আমার শোভা নেই। শুধু একটি জিনিস ছাড়া। ওই চোখ দুটি। কীভাবে অস্তিত্ব পাবে এসে, বিতৃষ্ণার চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে, ওই একটিই জিনিস আমাকে কুম্ভার রাখল। ওই দুটি চোখ। যদি একবার ভুঁতে পেতাম। থাকলে। যা আমার নয়, তা নিয়ে। তবে কী হবে? এই পৃথিবীতে কিছুই আমার নয়। কিছুই আমার নেই। তবু আমিও একবারের জন্য হলেও বিয়ানিচের জন্য ভাবিত হলাম।

কাল আমি জায়গাটা দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম মরন জিজাই সবচেয়ে ভাল জায়গা। আমার পরমশ্রদ্ধেয়া মাতা আমাকে রোজ ওখানে পাঠান খাটাল থেকে খাঁটি দুধ নিয়ে আসার জন্য। সেই দুধ আমার অনন্ত যৌবনা মা যৌবন ধরে রাখার জন্য পান করেন। সেই দুধ আমার দুধের মতো নিষ্পাপ সরল বউদিদি পান করে। যদিও বউদিদিকে আমি বউদিদি বলি না। বলি পুপু। আমার চেয়ে সে বয়সে অঙ্কত দশ বছরের ছোট হওয়ায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, পুপু না হয়ে ওর নাম ডল হলে বেশ হত। আমার নিষ্পাপ দাদা, সাধ করে, একটি ছোট, আদুরে, পুতুল পুতুল সুন্দর নিষ্পাপ মেয়ে এনে পত্তাচ্ছে কারণ মেয়েটি নির্বেদ। আমার যা সবচেয়ে অবাক এবং মজারও লাগছে, তা হল, আমাদের ব্যক্তিগত মায়ের সঙ্গে পুপুর অপূর্ব সম্পর্ক। আমরা কেউই কখনও আলোচনা করিনি, কিন্তু সকলেই মনে মনে জানতাম যে পুপুকে মেনে নিতে শবরীদেবীর প্রাণপাত হবে। কিন্তু প্রত্যেকের আশঙ্কা ভুল প্রতিপন্ন করে দেখা গেল পুপু শবরীদেবীর পায়ে পায়ে সাদা বেড়ালছানা হয়ে ঘুরছে আর শবরীদেবী তাকে দুধ ছানা খাওয়াচ্ছেন। গোল-গাল মেয়েটা শাওড়ির যত্নে এই ক'মাসেই বেশ ওজন বাড়িয়ে ফেলেছে। পুপুকে নিয়ে মা'র সতিাই কোনও অসুবিধে নেই। আমারও নেই। পরেশ বোসেরও নেই। বরং পুপু সতিাই ঘর আলো করা চমৎকার মেয়ে। কারণ ওকে নিয়ে কষ্ট নেই। ও যখন দু'-এক দিনের জন্য বাপের বাড়ি যায়, বেশ ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। মা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পরেশ বোস হাজারবার বলে। শুধু দাদা নীরব থাকে। আমি জানি, পুপুকে নিয়ে অসুবিধে যদি কারও হয়, সে দাদার। ইয়া, যে ভালবেসে বিয়ে করে এনেছে, তারই। ভাল থাকার চেষ্টা করার নামই জীবন—দাদা বলে। কিন্তু বেশি দিন আর বলবে না হয়তো। দাদা নিষ্পাপ দেখে মজোছিল। তখন বোঝেনি, পুপু নিষ্পাপ মেয়ে পুতুল। নিষ্পাপকে দূর থেকে মোহন লাগে, কাছে এলে তার মধ্যে প্রাণের অভাব। নীল আকাশ সুন্দর কিন্তু তাতে সূর্যাস্তের লালের ছিটে লাগলে চোখ ফেরানো যায় না। অপরাধ মুখশ্রীতে অভিজ্ঞতার দু'-একটি আঁচড় বড় তীর টানে। পুপু কি কোনওদিন বড় হবে? অভিজ্ঞ? কোনওদিন পৌঁছবে দাদার কাছাকাছি?

পুপুর বাবা পুপুকে একটা টেলিভিশন দিয়েছেন। টেলিভিশন ছাড়া নাকি মেয়ে থাকতে পারে না। এতে শবরী বোসও উপকৃত। দু'জনে সারাক্ষণ টি ভি দেখছে। একজন টয়লেটে গেলে আর একজনকে বলে যায়—কী হল এর মধ্যে, আমায় বলবে কিন্তু।

পুপুর গা ডর্তি গয়না। ও গয়না ভালবাসে। দাদার এত গয়নাগাটি পছন্দ নয়। তবু খুলবে না। নিজের বেশ কয়েকটা গয়না ও শবরী বোসকেও পরিয়ে দিয়েছে। শবরী বোস আবেগ আবেগ গলায় বলছিল—‘তোরা বাবা তো কোনওদিন দিল না, তোরাও দিলি না।’ আমার মুখে এসে গিয়েছিল—‘কেন, অরুণ সেন দেয় তোমাকে। এই বাড়ি, এই টাকা, এই জীবন-যাপন। মাই ডিয়ার মাদার, লোকটা তোমার পায়ে এত কিছু নিবেদন করল, তোমার দমায় আমরা খেয়ে-পরে বৈঠক বইলাম, তোমার আর দুঃখু কি মা আমার।’

বললাম না, পুপুর জন্য। পুপু এত ছোট, এত সরল। একে আমার বোনেক মতো লাগে। কিন্তু আমার না হয় বউদির বদলে বোন দিয়ে চলে। দাদার তো চলে না। (সহিত অন্তর রাত্তি পূর্ণ হু জেগে থাকি, আমি শুনতে পাই ওদের কথা। বুঝতে পারি দাদা কীক হতে যাচ্ছে। শূনা হয়ে যাচ্ছে।

দাদার বিয়ের পর বাবা-মা ওদের ওপরের শোবার ঘরটা দিয়ে নীচে নিজেরের ব্যবস্থা করেছে। ভালই হয়েছে। পরেশ বাস, শবরী বোসের এখনও যা সের, জোর টেঁচাতে পারবে। এদিকে আমার দুঃখী দাদা রাতের পর রাত চাঁদ দেখার জন্য বজকে ডাকছে। পুপু বলছে—  
ধুস। তুমি দেখো। আমার ঘুম পাচ্ছে।

একা একা বালকনিতে চলে যায় দাদা। সিগারেট খায়। অল্পাধিক ঘুম আসে। গর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। একদিন কানে এল, দাদা বলছে—

O lift me from the grass!

I die, I faint, I fail!

Let thy love in kisses rain

On my lips and eyelids pale

পুপু বলছে—কী বলছে! আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

দাদা কী করছিল আমি জানি না। হয়তো রোমান্টিক কিছু। মুখে বলছিল—

My cheek is cold and white, alas!

My heart beats loud and fast;

O! Press it close to thine again

While it will break at last

পুপু চোঁচাচ্ছে—ধুস। অরকর করে ইংরিজি বলছে! আমি কিছু বুঝি?

দাদা বলল—বুঝিয়ে দেবো। শোনো। মানেটা শোনো।

হয়। শব্দ আসছে আমার কানে। আর মনে হচ্ছে সপ্তদশ শতকের কোনও মধুরাঙ্গি যাপন করছি আমরা। মানে দাদা আর বউদি তা যাপন করেছে। আর আমি সাফী থাকছি।

পুপু বলছে—না। আমি শুনব না। আমি গান শুনব। তার চেয়ে তুমি একটা গান গাও।

দাদা বলল—এই রাতে গান গাওয়া যায়? জানো না তুমি? পুপু। আমি তোমাকে মানে বলে দিছি শোনো। এই দেখো—চিক মানে তুমি জানো, কোন্ড মানে জানো, হোয়াইট মানে জানো।

আমার মনে হল বলি—দাদা, এই যদি তোর ভাল থাকার প্রয়াস হয়ে থাকে তবে তুই খারাপ থাক।

পুপু বলল—করবে? আজ করবে? কই দেখি? শক্ত হয়নি। আমার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমোলাম।

দাদা অসহায়ের মতো নেমে এসেছে বিছানা ছেড়ে। বালকনিতে দাঁড়াল। পুপুও এল একটু বাদে। নাকে ঝাঁকছে—চলো না। আমার ইচ্ছে কঁরছে। ঘুম ইচ্ছে না।

দাদা ॥ আজ আর হবে না পুপু। তুমি শুতে যাও।

পুপু ॥ নী—আ। হবে। রোজ করতে হয়। আমি জানি।

দাদা ॥ তুমি জানো? কে বলল তোমাকে?

পুপু ॥ উ। মা বলেছে। রোজ করতে হয়। নইলে ভালবাসা থাকে না।

দাদা ॥ পুপু। গ্লিভ। ঘরে যাও। তোমার মা জানতে চাইলে বোলো আমি নপুংসক।

দাদা। যেচারা দাদা। কী হবে ওর। আমি জানি ও মনের সঙ্গী চেয়েছিল। শৈশব থেকে এই বিস্তী নাংরা কুটিল আবর্তে কাটিয়ে ও নিষ্পাপ বুজেছিল। কিন্তু পুপুকে না দেখলে এ সত্য অজ্ঞাত থাকত সে নিষ্পাপের তথ্য নির্বৃজিতার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। সারলা এক জিনিস, কিন্তু অগভীরতা অন্য। পুপু দাদার মনের সঙ্গী হয়নি। যে মনের সঙ্গী হয়নি সে শেষ পর্যন্ত প্রাণের

সঙ্গী হবে কী করে? যে প্রাণের সঙ্গী নয় সে কী করে শরীর আগিয়ে তুলাবে। বিশেষ করে দাদার ক্ষেত্রে তা খুবই কঠিন। ও তো আমি নয় যে শুধুমাত্র শরীরের জন্যই ছন্দা বউদির সঙ্গে গড়িয়ে নিলাম বিছানায়। দাদার জন্য কষ্ট হচ্ছে আমার। দাদাকে আলীকন বইতে হবে। পুপুর পাপবিহীনতার বোঝা। ও তো ভাল থাকার সাধনা করে থাকে, সেই ওকে হারানই হবে। একালের এক সিসিফাস। ওর ঠেলে তোলা পাথরটা এই প্রথমবার গড়াল। ও আবার তালুক। কিন্তু সেটা দেখার জন্য আমি আর থাকব না।

আচ্ছা, আমার ডায়েরিটা নিয়ে কী করব। নষ্ট করে ফেলব না দাদাকে দিতে হবে। টিক করিনি এখনও। একটা নোট লিখতে হবে— আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। কেন লিখব আমি? কেন লিখব? আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী নয় পবনশ বৈরাগ, অকল্য সেন, শরীফ বোস? দায়ী নয় আগ্রার সেই বিকেল? কেন আমার মৃত্যুর জন্য ওদেরও মৃত্যু হবে না?

না। বিচার চাইব না। কে কার বিচার করবে। এ দেশের সবটাই অবিচারের পরিকল্পনামো। সেদিন বেশ মজার কাণ্ড হল। মরণ ব্রিজ ঘুরে যখন এ দিকে আসছি, ক্লাবের কাছটায় কুঁজি ঘুঁটেকুঁড়ানি ফুলরেণুর সঙ্গে দেখা। ওর বুকটা খুব দুলাছিল। আমার ধরতেও ইচ্ছে করছিল। ও বোধহয় আমার চোখ টের পেল। বলল— রেল লাইনে এসে শুয়ে থাকো কেন বলো তো? তোমার কি ঘর-বাড়ি খটি-বিছানা নেই?

ও কি ইচ্ছে করে বিছানার প্রসঙ্গ আনল? কোনও ইঙ্গিত? আমি এটা-ওটা প্রসঙ্গ টানলাম আর বুক দেখলাম। ওর গায়ে পোবরের গন্ধ। পিঠে কুঁজ। ও কি একটা পুরো মানুষ? ও কি পরিপূর্ণ নারী? ঘুর! আমার আবার পরিপূর্ণ কিছু লাগে নাকি? দু'টো বুক ও ভাঁজ করা দু'পায়ের মধ্যবর্তী অবস্থান হলেই আমার চলে যায়। যেমন মৃত্যুত্যাগের জন্য যে কোনও দেওয়াল, এমনকী ট্রেনের দু'কামরার মধ্যবর্তী ফাঁক। না হলে কি আর ছন্দা বউদির সঙ্গে শুতে পারতাম? কিন্তু আশ্চর্য হল সেই বিয়োগ্রিচের পর ছন্দা বউদির সঙ্গে শুতে আমার আর ইচ্ছে করে না।

যা বলছিলাম। সেদিন মরণ ব্রিজ থেকে ফেরার সময় ফুলরেণুর সঙ্গে দেখা। খটি-বিছানা ইত্যাদির পর আমাকে বলল— তোমার কী ব্যাপার বলো তো?

কললাম—কেন?

ফুল ॥ ও দিকে কী দেখছিলে? মরার কথা-টকা ভাবো নাকি?

আমি ॥ ঠিকই ধরেছি দেখছি। ওখানে মরা যায় কিনা দেখছিলাম।

ফুল ॥ হাঁ। রেল তোমাকে টানছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি রেলের নীচেই তুমি মরবে।

আমি ॥ তাই নাকি? কী করে বুঝলে?

ফুল ॥ আমি জানি গো জানি। মরার আগে ওইখানে সব ঘুরঘুর করে। ওখানে যে কত প্রেত, কত আত্মা আছে। এক আত্মা আর একজনকে টেনে নেয়। কী দেখছিলে ওখানে? মরে গেলে কোথায় পড়বে?

আমি ॥ একেবারে ঠিক বললে তো! সত্যি আমি তাই দেখছিলাম। কিন্তু তুমি কী করে জানলে!

ফুল ॥ এ ছাড়া আর কী দেখবে। রেল লাইনের ধারে ধারে দিন গেল। কত মৃত্যুই যে দেখলাম! মরে যাবে, তবু শরীরটা কোথায় রইল দেখার ইচ্ছে যাবে না। পৃথিবীতে কীসের ওপর মানুষের সবচেয়ে বেশি লোভ জান?

আমি ॥ টাকা।

ফুল ॥ না। শরীরের ওপর। নিজের শরীরের ওপর। এই আমাকেই দেখো, ভগবান সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা দেয়নি। তবু বুক ঘষটে ঘষটে বেঁচে থাকি। ঘুঁটে দিই। গোবর কুড়িয়ে দিন গুজরান করি। জ্ঞান করি। খাই। মাথায় তেলও মাখি। শরীর দিয়ে কষ্ট পাই আবার শরীরকেই যত্ন করি। বলো? করি না? মরা মানে কী? শরীরটা মারবে তুমি, তাই না? তা হলে বাঁচা মানে

কী বলে? শরীরটাই তো? শরীরটা চলছে ফিরছে এই তো আনন্দ! মরবেই তো একদিন। তখন হাজার কাদলেও আর শরীরটা নাড়াতে পারবে না। তোমার শরীর তোমার পর হয়ে যাবে। তখন? তার জন্য এত ব্যস্ততা কেন বাপু?

আশ্চর্য লাগল। এ সবই তো ফুলেরু জীবন থেকে নিয়েছে। লেখেনি। পড়েনি। কিন্তুই জানে না। তবু কত জানে। অনিসুজ্ঞাদা ঠিকই বলেন। দর্শন সাধারণ। মনুষ্যের চিন্তায় চিন্তায় ব্যাপৃত আছে। তা উপলব্ধি করা চাই। দার্শনিক একা দর্শন দৃষ্টি করেন না। দার্শনিক তবু আসলে জনজীবন থেকে উঠে আসা ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও গভীর উপলব্ধি।

সে যাক গে। আমার আর এ সব কাজ কী। আমার যোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। এবার অন্ত চাই। আরে! ঠান্ড কি অন্ত যায় নাকি! যায়। সূর্য অন্ত গেলে ঠান্ড যাবে না। কেন? চন্দ্রাঙ্গ, কী চমৎকার কথাটি! আসল ব্যাপার হল চোখের অভাব হওয়া।

পুরী গিয়েছিলাম। মোটেই যেতাম না আমি। দাদার ইচ্ছে গিয়েছিলাম। ও চেয়েছিল একটা ফ্যামিলি ট্যুর। সেই যে আগা গিয়েছিলাম আমরা আর ধ্বংস করেছিলাম আমাদের শৈশবকে সারলাকে, তার পর থেকেই নাকি ও ভেবে রেখেছিল একটা ফ্যামিলি ট্যুর করবে কোনওদিন। ধুর। হয় না, হয় না। আমাদের দিয়ে এ সব হয় না। কষ্ট হয় দাদার জন্য। ও যে কবে বুঝবে এ সব। এখনও কত স্বপ্নিল ওর চোখ।

ওর জন্যই গিয়েছিলাম আমি। না হলে আমার যাবার কোনও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ভাগিস গিয়েছিলাম।

আমাদের পাঁচজন, অরুণ দেবশিস আর দেবশিসের বাউ জিনি— শিল্পিনী— এই ক'জন গিয়েছিলাম।

বেকরবার সময় আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল প্রায় বছর কুড়ি আগের সেই আগা যাবার কথা। দাদারও নিশ্চয়ই মনে পড়ছিল। আমার আর দাদার ছোটবেলার সমস্ত স্মৃতি একরকম। তবু ও ওর মতো তৈরি হল। আমি আমার মতো। হয়তো দু'জনের মূল উৎসে পার্থক্য আছে বলে। আর পার্থক্য যদি নাই থাকে তাহলেও আমার আলাদাই হওয়ার কথা। একই পরিবেশে থাকলেও প্রত্যেকটি মানুষই পরস্পরের থেকে আলাদা। সেটাই স্বাভাবিক। তবু আমরা যখন একলা হই, যখন দু'জনই থাকি, যখন গভীর চোখে পরস্পরের দিকে তাকাই, আমরা মনে মনে এ ওর যন্ত্রণা স্পর্শ করি। এ ওর উদ্বেগ স্পর্শ করি। বাবা মদ খেয়ে মাকে গালাগালি করেছে। মা এটা-ওটা ভাঙছে। আমি আর দাদা এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি। আমি ফিসফিস করে বলছি— বাবা কি আজ মাকে মারবে?

দাদা বলছে— না। মারবে না।

—যদি মারে?

—আমরা অরুণ জ্যেঠুকে বলে দেব, কেনন?

অরুণ সেনকে আমরা দু'ভাই ভাবতাম আমাদের আপন জ্যেঠু। ওঁকে দেখলেই দু'জন দু'হাত ধরে খুলে পড়তাম আর চিৎকার করতাম— জ্যেঠু, জ্যেঠু—ঠু, জ্যেঠু—এ—এ—ঠু।

আমরা বিশ্বাস করতাম, অরুণ সেনের ওই বিশাল বাড়ি, যার মাধ্যয় মাথুরের গড়ের প্রথম সূর্য ওঠে, সেটা আমাদের। ওই রাজেশ্বরী হোটেল, যার একটা ঘরে, এই বাড়িটা তৈরি হওয়ার আগে আমরা থাকতাম, সেটাও আমাদেরই বলে আমরা মনে করতাম। বন্ধুদের বলতাম— জানিস, ওটা আমাদের হোটেল। অরুণ সেনের বাড়ি দেখিয়ে বলতাম— জানিস, ওটা আমাদের জ্যেঠুর বাড়ি। আমাদের জ্যেঠু খুব বড়লোক।

অরুণ সেন আমাদের আদর করতেন কখনও কখনও। আমাকে কোলে নিতেন। দাদার গালটা টিপে দিতেন। দাদা তো খুব সুন্দর। ওকে সবাই আদর করত। আর মার মুখটা তখন



নরম হয়ে যেত। যেন আমাদের আদর করে অরুণ সেন মাকে ধনা করে দিচ্ছেন।

অনেক-অনেক পরে বুঝেছিলাম, ওই হোটেল-ফোটেল কিস্যু নয়, ওই বাড়ি-টাড়ি কিস্যু নয়, আমরা রাস্তার কুকুর, আমরা ভিখারির চেয়েও অধম। আমরা প্রায়-প্রায়-একটা বেশ্যার বাচ্চা। হ্যাঁ, শবরী বোস, একটা— একটা বেশ্যা। আমি যা দেখেছি, তারপর আর ওকে অন্য কিছু বলা যায় না।

আগ্রায় আমি আর দাদা হঠাৎ জেনেছিলাম অরুণ সেন আমাদের আপন কেউ নন। তিনি আমাদের বাবার প্রভু। আমাদের পালক ও মায়ের ভোজ্ঞা। এ সবই আমরা একসঙ্গে জেনেছিলাম। এমনকী, প্রথম নারী-মাংসদর্শন সেও আমাদের একসঙ্গেই। রেখাদি বলে ছিল একজন, ওই অরুণ সেনের বাড়িতে কাজ করত। কীরকম আগলা-পাগলা ছিল মেয়েটা। খালি হাসত। টাইট জামা পরত আর কোনওদিন পিঠের বোতামগুলো লাগাত না। একদিন ও বাড়ির উঠানে আমি আর দাদা গুলি খেলছি, ও আমাদের ডাকল। একতলার একটা আধো-অন্ধকার ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে বলল— লুকোচুরি খেলবি?

আমরা রাজি হলাম না। ও বলল— গল্প শুনবি? গল্প? তখন ওকে ঘিরে বসে পড়লাম আমরা দু'জন। দাদার তখন বারো। আমার দশ পেরিয়েছে। ও গল্প বলতে লাগল। কেমন খারাপ খারাপ সব গল্প। রাত্তিরে বর-বউ কী করে, কেমন করে বাচ্চা আসে, এইসব। আমাদের শুনতে মোটেও ভাল লাগছিল না। কীরকম যেন পাপ করছি-পাপ করছি লাগছিল, কিন্তু উঠতেও পারছিলাম না। দাদার কপাল দেখি ঘামে চকচক করছে। হঠাৎ রেখাদি বলল— তোরা মেয়েমানুষ দেখবি? আমি কিছু বলার আগেই দাদা বলল— ‘হ্যাঁ। দেখব।’ রেখাদি ফ্রক তুলল। ফ্রকের তলায় বিবর্ণ প্যান্ট। তার ওপর প্রথমে একটা নাদামতো পেট। নাইকুগুলি। তার ওপর অদ্ভুত স্ফীত দু'টো বস্ত্র। বিস্ত্রী, বীভৎস মাংসপিণ্ড। ও দাদাকে বলল, ধর। এইখানে ধর।

দাদা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। আমাকে বলল— ‘ছোটপম পালা।’ আমরা ছুট লাগলাম। পকেট থেকে সব গুলি এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল। আমাদের গুলির দিকে মন নেই। রেখাদি প্রথমে এই-এই-যাস না ... বলছিল, তারপর হাসতে লাগল হি হি হি হি। আমার কীরকম মনে হচ্ছিল রেখাদি নাচছে। হাততালি দিচ্ছে। নাচছে। ওই হি হি হি হি আমাদের তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল। আমরাও, যেন ভূত-পেত্নী তাড়া করেছে মতো ছুটতে থাকলাম। ছুটতে ছুটতে সোজা আছড়ে পড়লাম লাইব্রেরির মাঠে। অনেকক্ষণ ধরে হাঁফাতে লাগলাম। হঠাৎ দাদা হাসতে লাগল। হেসে গড়িয়ে পড়ল আর বলল— ‘মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ।’ আমিও হেসে গড়িয়ে পড়লাম। বলতে লাগলাম— ‘মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ।’ দাদা বলল— ‘কী বিস্ত্রী!’ আমি বললাম— ‘কী খারাপ!’ তারপর আবার হাসতে হাসতে মাঠে গড়িয়ে পড়লাম দু'জনে।

আমরা একসঙ্গে জীবনের অন্ধকার চিনেছি। একসঙ্গে মেয়েমানুষ দেখেছি। এবং একসঙ্গে অনেক কবিতা পড়েছি। সে-দিন দাদা পুপুকে যে কবিতা শোনাচ্ছিল সেটা আমাদের বহুব্যাপ্ত পড়া।

দাদা ফ্যামিলি ট্যুর চেয়েছিল। হল না। ফ্যামিলিই নেই আমাদের। ভেবেছিলাম দাদা বিয়ে করলে ওর নিজের মতো একটা সুন্দর পরিবার গড়ে নেবে। ওর বাচ্চারা হাসবে খেলবে, আমার ছবি দেখবে। কিন্তু এখন আর আমার বুঝতে বাকি নেই যে দাদার আর আদর্শ পরিবার করা হল না। পুপু বড় বেশি সাধারণ, খুবই অগভীর, একেবারেই নির্ভরশীল আদুরে সুখী মেয়ে। দাদাকে ও কোনওদিন বুঝতে পারবে না।

কতদিন আগেকার সেই সপরিবার বেড়াতে যাওয়া আমাদের— আজও তাড়া করে চলেছে। আমরা চারজন আর অরুণ সেন। জ্যেষ্ঠ আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। আমরা খুশি। সারা রাস্তা মা আর জ্যেষ্ঠ পাশাপাশি। আমরা দু' ভাই বাবার দু'পাশে। জ্যেষ্ঠ আর বাবা ওরই মধ্যে কায়দা করে মদ খেলেন। বাবা দু' বোতল ব্রান্ডারিষ্ট এনেছেন। আসলে তাতে মদ। আমরা গা টেপাটেপি

করছি। আমি বলছি—‘দাদা! মদের গন্ধে ঘুম আসছে না।’ দাদা আমার মুখে হাত চাপা দিচ্ছে—‘চুপ। চোখ বন্ধ করে থাক।’ আমি আর দাদা এক রাতে। মূলতঃ মূলতঃ ঘুমিয়ে পড়লাম। কখন যেন ঘুম ভেঙে গেল আমার। দেখতে পেলাম, মা বলে আছে, আর কোলে অরুণ জ্যেষ্ঠের মাথা। মা জ্যেষ্ঠের চুল ঘেঁটে দিচ্ছে। বাবা ওপরের বাঁধে। খুমোচ্ছে। আমার রাগ হল। ভয় করল—‘যেন নিষিদ্ধ কিছু দেখে ফেলেছি— চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি। খুব জ্বলন্তেই পেয়েছে কিছু সাহস করে চাইতে পারছি না। বোধহয় এই একটাই বুঝা যা আমি দেখেছি কিন্তু দাদা দেখিনি। কিংবা হয়তো আরও এককম কোনও দৃশ্য আছে। যা দাদা দেখেছে। আমি দেখিনি।’

আগ্রাস্য এসেছি। তাজমহল দেখতে যাব আমরা। অরুণ জ্যেষ্ঠের মাথাবাঁধা করছে। যাবেন না। আমার রাগ হচ্ছে। আমি বলছি—জ্যেষ্ঠের খালি মাথাবাঁধা করে। জ্যেষ্ঠ বলছেন—‘কেন? আমার আবার কবে মাথাবাঁধা করল। আমি চুপ করে আছি। মা’র দিকে চোখ চলে গেছে আমার। মা’রও আমার দিকে স্থির চোখ। বাবা বলতে লাগল—‘অরুণদার মাথাবাঁধা। একা কী করে ফেলে যাই! শবরী, তুমি তবে থাকো।’ মা এক কথায় রাজি। যেন তাজমহল দেখতে নয়, মা অরুণ জ্যেষ্ঠের মাথা টিপতেই এসেছে। আমরা দু’ভাই বাবার হাত ধরে তাজমহল দেখতে বেরলাম। অনেক জায়গায় ঘুরেছিলাম। সব আমার মনে নেই। তাজমহল সম্পর্কে এটুকু মনে আছে—একটা সাদা বাড়ি। দিনের আলোর ফ্যাটফ্যাট করছে। একটুও ভাল লাগছে না আমার। কলকাতায় ভিক্টোরিয়া দেখেছি। তাজমহলকে অবিকল ভিক্টোরিয়ার মতো লাগছে আমার। একটুকুপ যেনে না-যেতেই বাবা হঠাৎ ফেরার তাড়া লাগল। আমরা ভাবলাম আমাদের মতো বাবারও তাজমহল ভাল লাগছে না। আমার মতো দাদারও যে তাজমহল খুব ভাল লাগছে না সেটা দাদাকে দেখেই আমি বুঝতে পারছিলাম।

আমরা ফিরলাম। দেখলাম। জানলাম। কী দেখলাম। কী জানলাম! আমাদের জীবন। আমাদের বাস্তব। আমাদের সব সত্য। যা-কিছু আমাদের পর্ববিক্ষেপে ছিল, বোধে ছিল না, সে-দিন আমরা তার প্রায় সবটাই উপলব্ধি করে ফেললাম।

পুরীতে যাওয়া। এ-ও এক আশ্চর্য বিষয়। আশ্চর্য প্রাপ্তি। আমার ঘুগার ঘোলোকল্য পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্র। আমার চন্দ্রোদয় এবং চন্দ্রাস্ত।

প্রচুর মদ নিয়ে গিয়েছিল পরেশ বোস, ওরফে আমার পিতা। তাকে সহায়তা করেছিল আমার বন্ধু, সুহৃদ, পুলিশকর্মী, নায়ক ও রোমান্টিক—অরুণ। পবিত্র তীর্থস্থান পুরীতে মদ পাওয়া বাবে কি যাবে না ভেবে মদ দিয়ে ব্যাগ বোঝাই করতে রোমান্টিক অরুণের কোনও ক্লান্তি আসেনি। হ্যাঁ। এখানে একটা কথা আছে বটে, পুলিশকর্মী রোমান্টিক হয় কি না, তবে এ ক্ষেত্রে আমার সূত্র হল, যার-তার সঙ্গে যখন-তখন রোমান্স করে ফেলাটা যদি রোমান্টিকতার মাপকাঠি হয় তো অরুণ এক নম্বর।

সকালবেলা আমরা পৌঁছলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচুর মদ খেয়ে শুয়ে পড়ল অরুণ আর পরেশ বোস। অবশ্যই, খেল এক ঘরে বসে, কিন্তু শুলো আলাদা আলাদা ঘরে।

গানের সময় বয়ে যাচ্ছিল। সমুদ্রের পাড়ে আমি, দাদা আর পুপু। দাদা বলল—‘ওরা কী করছে? ডাক সবাইকে।’

পুপুর হাত ধরে জলে নামল ও। বেশ লাগছিল দেখতে। পুপু খুব বুশি। দাদা সবই করছে। কিন্তু কেমন যেন লান। যেন গানটা বেশ গাইছে। সুরেও লাগছে। কিন্তু প্রাণে বলছে না। হয়তো সবাই মিলে হইচই করে গান করলে দাদার ভাল লাগবে ভেবে আমি গেস্ট হাউসে ফিরলাম। প্রথমে দেবালিসের ঘরে গেলাম। বেশ টেনেছে দেবালিস। ঘুমোতে চাইছে। জিনি মুখ গৌজ করে বসে আছে। আমি যেতেই বলল—‘দেখুন তো, কিছুতেই স্নানে বাবে না। পুরীতে এসে গান না করলে ভাল লাগে?’

দেবাশিস বালিশ থেকে মাথা তুলে বলল— আই! ছোটখাট! তুই নিয়ে যা ওকে! মাইরি! মাথা খেয়ে ফেলল। এই, যাও তো। ছোটখাটের সঙ্গে বাত।

আমি জিনিকে বললাম— দাদা আর পুপু আছে তুমি যাও। আমি বাবা-মাকে ডাকতে যাচ্ছি।

পাশের ঘরে বাবা অচেতন। মা নেই। মা অরুণের ঘরে। মানে আমার ঘরেও। আমার আর অরুণের একই ঘরে থাকার কথা। গিয়ে দেখি অরুণও দেবাশিসের মতো বলছে— আমি বাব না। ঘুমোব। তুমি যাও না।

মা অরুণকে টানছে। টানছে, না জড়চ্ছে। মার মুখ প্রায় ওর মুখে। গারো পা লেগে আছে। মার এক পা মেঝেয়, এক পা বিছনায় ছোলা। অরুণকে বাঁচাচ্ছে— না। ছলো। তুমি ছলো। চলো না।

মার গলাতেও ঝাঁক। মাও বেশ খেয়েছে। আমি যে এসেছি কোনও খেয়াল নেই। আমিও আর ডাকিনি। দৃশ্যটা ভাল লাগেনি আমার। কিন্তু শব্দী বেস অরুণকে নিয়ে লীলা করছে, তাও আমার মনে হয়নি। আমি আবার সমুদ্রের পাড়ে গেলাম। দাদা আর পুপুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। জিনি একা বালুতে বসে আছে। আমাকে দেখে বালিকার মতো বুশি হল সে। বলল— নামবেন না? চলুন না। আমি আর না নেমে থাকতে পারছি না।

আমরা জলে নামলাম। এক-একটা বড় বড় ঢেউ আসতে লাগল। জিনি ভয়ে বুশিতে লাফাতে লাগল। চিৎকার করতে লাগল। মানে আসবে বলে সালামার-কামিজ পরেছে সে। লেপটে গেছে সে-সব। চুল খুলে ছড়িয়ে গেছে মুখময়। মুখের ওপর জলের ঝাপটা লাগছে। আর সে, তরুণী থেকে বালিকা— বালিকা থেকে শিশু হয়ে উঠছে। আমি পাশে পাশে আছি। তাকে ধরছি না। দেখছি। একা একা— শুধু জলের সঙ্গে কী আনন্দ করছে সে। তার চোখ দুটি জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কারণ সে মার্জারনয়না। এভাবে আমি কখনও কোনও মেয়েকে দেখিনি। কারওকে দেখে মনের মধ্যে এমন ভাল লাগা জাগেনি। হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ, আমার মনে হল, এ মেয়েটি আমার হল না কেন? সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ল আমাদের ওপর। আমরা আঁতুপাকু করতে করতে টাল সামলালাম।

হ্যাঁ! অস্বীকার করব না, ওইটুকু স্নানের পর থেকে আমার চোখ সারাক্ষণ জিনিকে বুঁজিয়ে। আকুল তৃষ্ণার্তের মতো আমার মনে হচ্ছিল ও যেন এতটুকু চোখের আড়াল না হয়। আমার মনে থাকছিল না ও আমার নয়। আমার জন্য ওর মনে কোথাও কোনও জায়গা নেই। এরকম কারও জন্য আমার হয়নি।

মা-বাবা অরুণ আর দেবাশিসের ঘোর কাটল বেশ বেলায়। সঙ্গেবেলা সকলে মিলে সমুদ্রের পারে যাওয়া হল। অরুণ থাকলে ও একাই সন্ধ্যাট। নিরন্তর কথা বলবে, কবিতা বলবে, গান গাইবে। আর সবটাই ও এমনভাবে পারে যে ভাল না লেগে উপায় নেই। কিন্তু আমি ওকে সহ্য করতে পারছিলাম না। অথচ ও আমারই বন্ধু। এখন অবশ্য দাদারও বন্ধু। এবং অনেক কিছু, কারও কারও ক্ষেত্রে।

আমি দল থেকে উঠে একা একা অন্ধকারের দিকে হেঁটে গেলাম। আমার মগজ থেকে অকারণ চোখ, অকারণ ঘৃণা, অকারণ সন্দেহ ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল। বালিতে মিশে যেতে লাগল। ওদেরও গর্জন আছে। সেইসব সমুদ্রের জলে মিশে গেল। সব চাপা পড়ে গেল জলে, ভেজা বালুতে, মানুষের পায়ের তলায়। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। যতখানেক আকাশ। থেকে থেকে বসন্তের ঝাপটা লাগছে। গত বসন্তে অমলেন্দু মারা গেল। তার চার বসন্ত আগে নীলাদ্রি আর দেবার্চন। কিছুদিন বাদে আমি মারা যাব। আশ্চর্য্য সমাপ্তন। এই মাধুরের গড়ের সমস্ত দুঃস্থলের সংসার থেকে একজন করে বসে যাবে নাকি? নীলাদ্রি নেই, প্রণবেশদা আছেন। দেবার্চন নেই, দেবাশিস আছে। অমলেন্দু নেই, কমলেন্দু আছে। আমি থাকব না, অনুপম থাকবে। আমি আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রদের দিকে তাকালাম। ছোটবেলায় শিখেছিলাম

মানুষ মরে গেলে তারা হয়ে যায়। সেবার্চন, নীলারি, কমলেন্দু, সেই সত্যজিৎ—সবাই কি আকাশে আছে? নক্ষত্র হয়ে জ্বলজ্বল করছে আকাশে। আমিও কি তারা হয়ে যাব? হঠাৎ, সেই দু'টি চোখ আমি দেখতে পেলাম। যে আমার নয়, আমার হবে না কোনওদিন, সে কেমন, কিছুই আমি জানি না। তবু তারই জন্য বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল। মনে পড়ল জীবনকলস দাশের সেই আশ্চর্য কবিতা—

...— সে এক বিশ্বয়  
পৃথিবীতে নাই তাহা— আকাশেও নাই তার স্থল,  
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রের তাল;  
রাতে-রাতে হেঁটে-হেঁটে নক্ষত্রের সনে  
তারে আমি পাই নাই; কোনো এক মানুষীর মনে  
কোনো এক মানুষের তরে  
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে—  
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে  
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে !...



বলো বলো ও কী করেছে তোমাকে? তোমার গায়ে হাত দিয়েছে?

জিনি চুপ করে আছে। কতদিন হল এই প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে সে? তার মনে নেই। মনে হয় অসম্ভবকাল। মনে হয় গতজন্ম থেকে, এই জন্মের প্রথম লগ্ন থেকে আজ অবধি। শুনে শুনে এ-ও সেই প্রশ্নাসের মতো যাকে আলাদা করে মনে করার দরকার নেই। প্রথম প্রথম সে জবাব দিয়েছে— বলো বলো— সে বলেছে— 'না।' তোমার গায়ে হাত দিয়েছে?— সে বলেছে— 'না।' অফিসে যাবার আগে প্রশ্ন করেছে দেবশিস। বলেছে— বলো, সত্যি কথা বলো, ও তোমায় কিছু করেছে?

—না।

অফিস থেকে ফিরে এসে প্রশ্ন করেছে দেবশিস— ও তোমার গায়ে হাত দিয়েছে? ওরা সব শয়তানের বাচ্চা। শালাদের জায়ের ঠিক নেই।

—উঃ মাগো।

জিনির বৈধ ভাঙছে। ভাষা এত নিষ্ঠুর কেন! এত অকরণ কেন। ভাষাই যে মূহুর্তে বন্ধু হতে পারে। মূহুর্তে শত্রুও।

—জন্ম থেকে দেখে আসছে কে বাপ কে জোঠা তার ঠিক নেই, সব এক মাল হাতায়। জিনি দু'কানে আঙুল দিচ্ছে। তারপর স্তব্ধ হয়ে গেছে। দেবশিস লক্ষীর কাছে গিয়ে কঁদে পড়েছে— মা, মা, ও সাড়া দিচ্ছে না।

—কী সাড়া দিচ্ছে না?

—ওকে কথা বললে উত্তর দিচ্ছে না।

লক্ষ্মী ছুটে আসছেন— কী ব্যাপার? জেসেটা এত করে তোমাকে প্রশ্ন করেছে, তুমি জবাব দিচ্ছ না কেন?

জিনি দু'টি ব্যথিত চোখ তুলে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে, ক্রমশ বুঝতে পারছে,

যতক্ষণ সে সব স্বীকার করে না নিচ্ছে ততক্ষণ তার মুক্তি নেই।

লক্ষ্মী বলছেন— বড়খোকা বলল, তোমরা অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলে।

জিনি চুপ করে আছে। দাঁড়িয়েছিল জো, সতিই তারা দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে কী হয়? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার মতোই কি চুকে পড়ে যাবতীয় অপবিত্র নুসেই।

লক্ষ্মী বলছেন— ছি ছি কী নোংরা কাজই করেছে। আমার এই সন্দেহ হলে, তাকে জোমার পছন্দ হল না। একটা বাজে ছেলে, জন্মের ঠিক নেই, চরিত্র ঠিক নেই। ডেকতার মর্ম বুঝবে কেন। তোমাদের চোখ হল ভাণ্ডারের দিকে।

জিনি সারা ঘর দেখছে। এ ঘর কার?

জোমার, জিনি, জোমার।

—না, এ ঘর আমার নয়।

এই খাট, এই বেকর্ড স্লেয়ার, এই এত বই— এ সব কার গো?

জোমার জিনি, জোমার।

—না, এ সব আমার নয়।

ওই যে আলনায় শাড়ি কুলছে, ম্যান্ডি শুকোচ্ছে তারে, দু'খানি ভাঁজকরা সালায়ার-কমিজ, যা এখানে পরতে নেই, কিন্তু বাইরে পরলে দোষ নেই, এ সব কার?

জোমার, জিনি, জোমার।

—না, কিন্তু আমার নয়। এরা আমাকে বিশ্বাস করে না। কেন বিশ্বাস করছে না? যে-ঘর বিশ্বাস করছে না সে-ঘর আমার কেমন করে হবে?

জিনির মা আগরতলা থেকে ফোন করেছেন— জিনি—

—হ্যাঁ মা।

—কেমন আছিস?

—ভাল।

—আর সবাই?

—ভাল।

—পুরী থেকে কী আনলি?

—অনেক কিছু মা। সে পরে বলব।

—তোকে চিঠি দিয়েছি। তোর জন্য মনটা বড় খারাপ লাগে বে।

লক্ষ্মী বলছেন— এ বার তো খুব কথা ফুটছে। শুধু বাপের বাড়ি আর ওদের বাড়ি। বরের বাড়ি পরের বাড়ি। না? শয়তান মেয়ে। আমার ছেলেকে কষ্ট দিচ্ছে।

দেবাশিস মার কোলে মুখ ধষছে— মা ও সাড়া দেয় না। সারা রাত দাঁতে দাঁত চেপে কটাই। আমি আর পারছি না।

লক্ষ্মী দাঁতে দাঁত পোকেন। লক্ষ্মীও আর পারেন না। তাঁর রাগ হয়। ঘৃণা হয়। তুমুল আক্রোশে মাথা ফেটে যায়। ছেলের মাথা বুকে তুলে নিতে নিতে বলেন— কী কষ্ট হোর! কী কষ্ট! আমি শুকে নিয়ে যাব। এক জায়গায় নিয়ে যাব।

দুপুরবেলায় স্কুল থেকে ফিরে এসেছেন লক্ষ্মী। জিনি ম্লান করেনি। খায়নি। লক্ষ্মী হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন বাথরুমে। শুকনো জামা সঙ্গে নেই, শুকনো কাপড় সঙ্গে নেই, জিনির মাথার ওপর শাওয়ার খুলে দিচ্ছেন। কঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিনি। ভাবছে। শুধু ভাবছে— ওরা আমাকে বিশ্বাস করছে না কেন? ভেজা কাপড় পরা জিনিকে ধাক্কা দিচ্ছেন লক্ষ্মী। ধাক্কা দিচ্ছেন। জিনি বসে পড়ছে। ঠাকুরঘরের মেঝে বসে পড়ছে। শীতল পরিষ্কার ঘরে নিখর অকর্মণ্য ডেকতার দল। জিনি তাকাতে পারছে না। তার চুল থেকে গাল থেকে শরীর ও শাড়ি থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। লক্ষ্মী কপালে করাঘাত করছেন— হে

ভগবান! হে ঈশ্বর! এ কোন পাগলের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলাম। পাগল, না শয়তান! শয়তান, না চরিত্রহীন!

জিনির ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। তাঁরও চুল খুলে গেছে। তাঁরও শাড়ি লুটিয়ে পড়ছে। জিনির ঘাড় ধরে মাটিতে নুইয়ে দিচ্ছেন তিনি— ঠেকা। ঠেকা মাথা মাটিতে। এটা আমার ঠাকুরঘর। আমি যদি সত্যি হই তবে এই বলে রাখছি তোমার শয়তানি আমি বন্ধ করব। এখানে সত্যি কথা বল! বল।

প্রতিটি শব্দের সঙ্গে তিনি জিনিকে প্রণাম করছেন। প্রণাম করছেন, নাকি মাথা ঠেকে দিচ্ছেন। জিনির কপালে লাগছে। লাগুক, লাগুক। জিনি বলছে— 'মা গো! লক্ষ্মী, হে লক্ষ্মী, তিনি মানুষ কেমন? ভাল ভাল। লক্ষ্মী, হে লক্ষ্মী—তিনি কি পাখি মারতেন ছোটবেলায় আর ফুলের পাপড়ি ছিড়ে ফেলতেন? জানি না তো। লক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন কেমন? ভাল ভাল। লক্ষ্মী বউ হলেন কেমন? বেশ বেশ। লক্ষ্মী মা কেমন, মা? ভাল না। লক্ষ্মী না। লক্ষ্মী লক্ষ্মী লক্ষ্মী, শাশুড়ি তরে ভালই? না-আ-আ-আ। লক্ষ্মী শাশুড়ি হয়ে আর ভাল নেই। লক্ষ্মী শাশুড়ি হয়ে আর মানুষ নেই। লক্ষ্মী, শাশুড়ি হয়ে, নিজের কাছে নিজেই এক অচেনা পরিজন।

দরজার কাছে ছায়া পড়ছে কার! লক্ষ্মী মুখ ফিরিয়ে দেখছেন অন্ধর মা। তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। চোখ দুটি বোবা, বিহ্বল। লক্ষ্মী জিনিকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। বলছেন— 'দেখো, দেখো অন্ধর মা। আমার কপাল দেখো। একটা ছেলে মরে গেল। আর একটা মাত্র ছেলে, তার কপালে কীরকম পাগল বউ জুটেছে দেখো। হাড় জালিয়ে খেলো আমার।' আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছেন তিনি। কী আছে হাতের কাছে, কী নেওয়া যার? দরজার হড়কো তুলে নিচ্ছেন। খোঁচা দিচ্ছেন জিনিকে— 'ওঠ। ঘরে যা।'

অন্ধর মা ঝাঁপিয়ে পড়ছে— মাইরেন না। মাইরেন না। আমি লইয়া যাইতামি।

সে জিনিকে আড়াল করছে। জড়িয়ে ধরে বলছে— চলো বউদি, ঘরে চলো।

জিনির মুখ বিষাদ হয়ে গেছে। জিনির মুখ হাহাকার হয়ে গেছে। সে অন্ধর মাকে জড়িয়ে ধরে কঁদছে। তার কপাল খুলে গেছে। রোগা শরীরে ভেজা কাপড় শুকোতে শুকোতে কাঁপন তুলেছে। অন্ধর মা ধরে নিয়ে যাচ্ছে জিনিকে। জিনি! সে জিনি? তার জন্য ভালবাসা বাপের বাড়ি আছে? তার জন্য ভাল ভাল পরীক্ষার ফলাফল, ইন্সুলের স্মৃতি, বন্ধুত্বের কলরব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি রাখা আছে? সে কি শিক্ষিত? দর্শনের শাস্ত্রজ্ঞ? সে? জিনি? অন্ধর মা ফিসফিস করে শুধোচ্ছে— 'অরো মারসে? আপনাদের মারসে?'

হায়। মারামারি, মাথা ঠেকে দেওয়া, লাঠি তোলা এতদিন বস্তিতেই দেখেছে সে। বাবুদের বাড়িতেও হয় এ সব? কালীতারা চোখ ঘুরিয়ে সবসময় বলে— হয় না? খুব হয়। আরে বাবুদের নোংরা কেচ্ছা আরও বেশি। আমাদের যা হল খোলাখুলি মিটে গেল।

সত্যিই তো! সত্যি! সে কি নিজের চোখেই দেখল না? জিনি বলছে— না না। মারেনি। অন্ধর মা, ওটা মার নয়। তুমি যেন এ সব বাইরে বোলো না লক্ষ্মীটি।

—না, কখনো না। বউদি, অরো যা কয় আপনে করেন না ক্যান?

—করা সম্ভব নয় অন্ধর মা, কিছুতেই সম্ভব নয়।

লক্ষ্মী দাঁপিয়ে বেড়ান সারা মাথুরের গড়। খাতিরের প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে দুঃখের কথা তোলেন— পাগল মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছি।

—ও মা! তাই নাকি!

সকলে অবাক হয়ে শোনে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। ভাবে— এই তো বউভাতব দিন দেখলুম। কেমন মিষ্টি হেসে কথা কইছে! কই তখন তো বোঝা যায়নি, পাগল।

কেউ বিশ্বাস করে। বলে— হ্যাঁ, হ্যাঁ। হতেই পারে। পাগলের পাগলামি ওমনি হঠাৎ দেখা দেয়।



জঙ্গী সরবে ফিসফিস করছেন। যেন এই প্রতিবেশীরা তাঁর কতই আগমনের জন্য। তাঁর চোখে জল আসছে। বলছেন— কী আর বলব, নিজের জেলের বস্ত্র ছাড়া স্বভাবচরিত্র...

হায়! পাগল সে! পাগলের আবার স্বভাবচরিত্র। লোকের তবু শোনে। পাগল বিষয়ক স্বভাবচরিত্র বিষয়ক আলোচনা সুনতে কারই-বা ভাল না লাগে।

ডাকে একবার চিঠি এসেছে শিজিলীর নামে। সে চিঠির মূখ্য বোধ্য। সে খুলল? কে? কেন খুলল? অন্যের চিঠি বুলি খুলতে হয়? সে চিঠি না পড়ে পাশে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু কতক্ষণ। আর পারছে না।

জিনির নব্বই বছরের দাদু চিঠি দিয়েছেন। বীরভূমের কোন গ্রামে এসে অল্পমাত্রায় শরীরে দিদা আর দাদু ডাকছেন জিনিকে। একবার এলি না? জামাইকে নিয়ে একবার এলি না তুই? জিনির মনে পড়ছে, দাদুবাড়ির পুকুরে সে হাঁস তড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাঁক-পাঁক-পাঁক। সে হাঁস তড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পেয়ারা দেখে দাদুকে বলছে— দাদু! আমাকে পেড়ে দাও। দিনা বলছেন— সর খাবি?

—না আমি আচার খাবো। আমাকে আচার দা-আ-আ-ও।

“রাধা”

কেটা

বীরভূম

দিন : ৭৩১১২৪

পরম মেহাস্পদেষু,

মেহের জিনি, তোর দিদিমা ও আমার স্নেহশীষ নে। বছরদিন তোর কোনও চিঠি বা সংবাদ পাই নাই। আশা করেছিলাম জামাইকে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবি। তোর বিবাহে যেতে পারি নাই। শরীর দেব না। ডাকের পরিহাসে তোর জামাই দেখা হল না। এটা আমাদের পক্ষে কতখানি মর্মান্তিক ভাৱে লিখে জানাবার নয়। আমি নিজে এ আঘাত সামলে নিতে পারলেও তোর দিদিমা যে কতটা আঘাত পেয়েছে তা চাক্ষুষ না দেখলে অনুমান বা উপলব্ধি করতে পারবি না। একেই তো দেড় মাস আগে হঠাৎ পড়ে গিয়ে শরীরের ভান দিক পড়ে গিয়েছে এবং এখন শয্যাশায়ী হয়ে আছে তোর ওপর তোর না আসা এত বড় আঘাত হয়ে উঠেছে যে দিনে রাতে কান্নাই তার একমাত্র সম্বল হয়ে উঠেছে। ....

জিনি ডুকরে কাঁদছে। ও দাদু গো। ও দিদা। আমাকে তোমাদের অসুস্থতার কথা কেউ বলেনি কেন? কেন বলেনি? ও দাদু। আমাকেও তোমাদের কাছে নিয়ে চলো। আমারও যে বাগ্না ছাড়া আর কিছু নেই। কিছু না। এখানে আমাকে কেউ বিশ্বাস করে না দাদু। তোমাদের দিদিমা দাদু। আমি কোনও অন্যায় করিনি।

“...তোর দিদাকে কেনও সাক্ষ্যবাক্যই আর স্পর্শ করে না। গত ১৫ মাস আগে আগরতলায় আমাকে যেমন দেখেছিলি তেমন আর নেই আমি। এখন হাঁটচলা করতেও খুব কষ্ট হয়। অতখানি বারবার ধকল ১৫ মাস আগেও কেমন করে নিয়েছিলাম তাই ভাবি। হয়তো এখন আমাকে দেখলে তুই চিনতেও পারবি না। এই নব্বই বছর বয়সে শরীর তো ডাঙবেই। কিন্তু আমার মানসিক বিপর্যয়ও আমাকে কুরে যাচ্ছে। তোর দিদার পরিচর্যা আমি করতে হয়। সব সহ্য করে খধাখধ করে যাচ্ছি। কিন্তু রোজ বুকতে পারি শরীর-মন বাদ সাধছে। আমাদের আদরের একমাত্র নাতনি, একমাত্র নাতজামাই একবার এল না আমাদের কাছে। গাছের ফল-পাকুড় সব নষ্ট হচ্ছে। জামাইয়ের পাতে একটু ফল দেব, টটকা শরজি, পুকুরের

মাছ সেব— সে সাধ আর পূর্ণ হল না। মন বড়ই অবাধ্য রে। বতাই মনে করি যার। আমাকে চায় না তাদের জন্য চিন্তা-ভাবনার দরকার কি। কিছু তোরা দিমা যখন স্মৃতিস্মরণ করে— তবে ফানু জনা কী করেছিল, কে কী খেতে ভালবাসে, তুই ছোটবেলায় কেমন ছিলি— শুনে নিজেকে খির রাখতে পারি না। আমিও অতলে ডুবে যাই।... ..

জিনির বালিশ ভিজে যাচ্ছে। জিনির আঁচল ভিজে যাচ্ছে। ও দাদু, আমার মনি ডানা থাকত, আমি উড়ে যেতাম। ও দাদু, আমিও যে অতলে তলিয়ে যাবি প্রতিদিন। আমি যে কবচকে বলতে পারব না, মরে গেলেও বলতে পারব না আমি কষ্টে আছি। মা বলবে— ‘জিনি, তোরকে এই শিক্ষা দিলাম, শ্মশুর বাড়িতে মানাতে পারলি না তুই?’ বলো দাদু মা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? মা কি জানবে কোনও দোষ আমার নেই?

“... ‘স্মৃতির সমাধিতলে, মালা গাঁথি আঁখিজলে।’ সেই আঁখিজলের মালার পাপড়ি একটি একটি করে যখন করে পড়ে তখন বৃকের পাঁজরের হাড়গুলিও যেন একটি একটি করে খসে যায়। তাই তো মৃত্যুপথযাত্রী তোর দিদিমা আজও দু’নয়নের জলে তোর স্মৃতি নিয়ে বুক ভাসায়। জসীমউদ্দিনের লেখা— এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিমগাছের তলে, ত্রিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দু’ নয়নের জলে। এতটুকু তারে ঘরে এনেছিলু সোনার মত মুখ, কোন কিছু হলে দু’নয়ন জলে কাদিয়ে ভাসাত বুক... ..।” একবার কি আসতে পারিস না জিনি? একবার দেখতে পারিস না তোর বিদার কান্না বন্ধ করা যায় কিনা। একবার আর। ওরে ফিরে আর এই স্নেহের নীড়ে। একবার ওই মৃত্যুপথযাত্রীর কানের কাছে মুখে রেখে বল— আমি এসেছি। দিমা, তোমার কাছে এসেছি।” আমার কথা নাই বা লিখলাম। আমি পুরুষ মানুষ। ব্যাটাছেলে। সহ্য-ধৈর্য মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি। তবুও এই ৯০ বছর বয়সে ঘেঁষের বাঁধ রাখতে পারছি না রে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আর কখনও গুমরে গুমরে কেঁদে উঠি আর বলি— ওরে একবার আর। মরার আগে একবার দেখি।

আশীর্বাদক

দাদু

পুং— তোর ঠিকানাটা ঠিক হল কিনা জানাস। পিন কোডটাও জানাস। চোখে ভাল দেখতে পাই না। ভুল থাকলে শুধরে নিস।”

সেবাশিস এস। সন্দেশাকুল চোখ। বলছে—

—দেখি কার চিঠি।

—না দেখবে না। জিনি চিঠি কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে।

—আমি দেখব।

—না। দাও। আমার চিঠি দাও। কেন তোমরা আমার চিঠি খুলবে?

—খুলতাম না যদি তোমার চরিত্রটা না বুঝতাম।

—কী করেছে আমি। কেন তোমরা বলছ এরকম?

কান্দছে জিনি। দাদু গো, কান্না ছাড়া আমার আর কিছুই নেই।

—নাকামো থামাও। পুরী থেকে ফিরে আসার পর একটা দিন তুমি আমাকে করতে দিয়েছ?

—কী ব্যবহার করেছে তুমি আমার সঙ্গে। কীসব কথা বলেছ। ও সব শুনলে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে একটুও? আচ্ছা, ওটা দিলেই তোমার বিশ্বাস হবে তো সব সত্যি?

নিজের স্বর কানে যাচ্ছে জিনির। এ কী ভাষা তার। সেও কি পাটে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে নিজের থেকে?

জিনি শরীর মেলে দিচ্ছে। তার রোগা শরীর আরও রোগা হয়েছে। নির্মদ শরীর থেকে লাভা লাভে গেছে। দেবশিস ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তার উত্তীর্ণ মোটা পুরুষ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জিনি, একটা মাটির প্রলেপের মতো, বোধহীন অস্তিত্বের তলায় ক্ষয় অনুভব করছে ক্রমশ। দেবশিস শরীর মেটাচ্ছে। জিনি চোখ বন্ধ করে ভাবছে। কী ভাবছে সে? কী ভাববে? দাদুর চিঠির কথা ভাবছে। দাদু তোমার চিঠিতে কত বানান ভুল অথচ কী সুন্দর লিখেছে তুমি! জসীমউদ্দিনের কবিতা এখনও মনে আছে তোমার? আমার মনে নেই জানো। লাইনগুলো ঠিক লিখেছে দাদু? আমার কাছে কোথায় যেন ছন্দ লাগছে না।

ছন্দ লাগছে না। কোথাও ছন্দ লাগছে না। দেবশিস সবল শরীর দিয়ে জোরে শরীর মেটাচ্ছে। আজ সে কন্ডোম পরেনি। জিনির খেয়াল নেই। সে শুধু নিস্তেজে এলিয়ে আছে। দু'চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে কানে ঢুকে যাচ্ছে।

পাশের শূন্য ঘরে একা একা জেগে আছে দেবার্চনের ছবি। তার বই জেগে আছে। চিন্তা জেগে আছে। না, চিন্তা জেগে নেই, সেগুলি উধাও হচ্ছে ক্রমশ। তার পাশের ঘরে ঠাকুরদেবতা ঘুমোচ্ছেন কিন্তু লক্ষ্মীর ঘরে লক্ষ্মী আর বিকাশ জেগে। লক্ষ্মী ডান পা তুলে দিয়েছেন বিকাশের গায়ে। হাঁটুতে চাপ দিচ্ছেন। বিকাশের পুরুষ জাগছে। লক্ষ্মী নকল দাঁতে কান কামড়াচ্ছেন। বিকাশের কান জাগছে। দু'খানি কানই পুরোপুরি জেগে উঠলে লক্ষ্মী বলছেন— বউ কতখানি দুশ্চরিত্র!

বিকাস অবিশ্বাসের গলায় বলছেন— যাঃ! অত ভাল মেয়েটা!

—আমি তবে ভুল বলছি? যাও!

লক্ষ্মী পাশ ফিরছেন। বিকাশ লক্ষ্মীকে কাছে টানছেন— হ্যাঁ, চরিত্র খারাপ, হ্যাঁ। কী করেছে?

—শুধু কি চরিত্র খারাপ? পাগলও। মাথা খারাপ। মেয়ের মাথার দোষ আছে লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছে। আমি সে-দিনই বুঝেছিলাম। নতুন বউ, লাজ নেই, লজ্জা নেই, ওভাবে কথা বলতে পারে?

—চরিত্র খারাপ বলছিলে কেন?

—ছি ছি! কত কাণ্ড করেছে পুরীতে। তোমাকে বলিনি। বড়খোকার বুক ভেঙে গেছে। ও নিজের চোখে দেখেছে, নিজের কানে শুনেছে—।

দেবশিস সিগারেট ধরাচ্ছে। হাসছে। এক ঝটকায় হাত টেনে উঠিয়ে বসেছে জিনিকে। চড় মারছে। খুব সতী হয়েছ না? আজ তুমি নিজে প্রমাণ করলে তুমি কী! অন্য দিন আমাকে দিতেই চাও না। কী আছে তোমার? ওই তো দুটো সুপুরির মতো বুক। আজ তুমি দিয়ে দিলে। নিজেকে সতী প্রমাণ করতে চাও, না? সতী? নিজেকে কে সতী বলতে চায় জানো? যে সতী নয়। আমি নিজে দেখেছি। নিজের কানে শুনেছি।

জিনি নিথর হয়ে থাকে। ক্রমশ রাত্রির চেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।



রাত্রে আবার মদের আসর বসল। সবাই খেল। জিনি, এমনকী পুপু পর্যন্ত। শুধু আমি খেলাম না। আমি খাই না তা নয়। কিন্তু কিছুতেই ইচ্ছে করল না সে-দিন। জিনি খেতে চায়নি প্রথমে। দেবশিসই ওকে জোর করল। শবরী বোস-পরেণ বোসের সামনে মদের গ্লাস তুলতে লজ্জাই পাচ্ছিল ও। আমার মাননীয় মাতা গ্লাস তুলে জিনির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন— যাও। পাড়ায় গেলে আমরা কাকু-কাকিমা। এখানে সবাই বন্ধু।

পান করে গান ধরলেন শবরী— 'আমায় নহে গো। ভালবাসো শুধু, ভালবাসো মোর গান...।'

শবরীর পর শেয়ালের মতো গান ধরল পরেশ বোস। তারপর পুণ্ডু, অরুণ, দানা, এমনকী জিনিও। কার ক'রাউণ্ড চলছে কে জানে। আমার মনে হল চোখের সামনে খাণ্ডামিটোলার পানশালা দেখছি। ছটা মাতাল এক সঙ্গে গান ধরলে যা হয়, কান ব্যস্তপালা হতে থাকল। ভাবলাম, বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে চলে যাই। হঠাৎ চোখে পড়ল জিনি বাথরুমের দিকে যাচ্ছে। টলাচ্ছে। ঠিকমতো হাঁটিতে পারছে না। কোনওমতে বরজা পর্যন্ত গিয়ে বমি করে ফেলল। ওয়াক-ওয়াক-ওয়াক— ক্রমাগত বমি করতে লাগল ও। আমি ছুটে গেলাম দরজা তেড়ে ওকে সাহায্য করার জন্য ছুটে আসেনি। ওর স্বাসকট হাঙ্গিল। আমি দিশেহারা বোধ করলাম। দেবশিসকে বললাম—যা। জিনিকে ধর। ও অসুস্থ।

দেবশিস দাঁড়াতে পারছে না। আমাকে বলল— তুই ধর। আমার ক্ষমতা নেই। অ্যাগো— ন থেকে আমার ব-উ তোর ও ব-উ বুঝলি? এক খাবড়া মারলাম ওর মাথায়। কিন্তু ছুটেও গেলাম জিনির কাছে। দু'হাতে তার রেখে বাথরুমের মেঝেয় উবু হয়ে বসে আছে ও। বমিতে গা ভিজ়ে গেছে। আমি ওর পিঠ ডালে দিলাম। মুখহাত জলে ধুয়ে দিলাম। দু'কাঁধ ধরে নিয়ে গেলাম ওদের ঘরে। ও আমার গায়ে নিজে থেকে ছেড়ে দিল। একটা আশ্চর্য অনুভূতি হল আমার। নারী তার রক্তমাংসে নিয়ে পুরুষকে ছুঁলে যেমন হয় তেমন নয়। ছন্দাবউদি ছুঁলে যেমন হয় তেমনও নয়। এ সুন্দর। এই অনুভূতি অন্য রকম। এমন আমার আগে কখনও হয়নি। আমি ক্রমশ ভুলে গেলাম আমি কে, কোথায় আমার জন্ম। এখানে আমি কেন এসেছি, কাদের সঙ্গে এসেছি। ভুলে গেলাম ও কে, ও কারও স্ত্রী কি না, প্রেমিকা কি না। ওকে বিছানায় বসিয়ে দিলাম।

ও সোজা হয়ে বসতে পারছিল না। কোনওরকমে বলল— খেতে চাইনি। ও বলল তাই। না খেলে বলত, আমার কোনও কথাই শুনবে না, না? এত জোরে চেপে ধরত আমাকে... ওর মাকে এমন বলত... আমার ভাল লাগে না। তাই খেয়ে নিলাম।...

ওর কথা শুনতে শুনতে আমার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল। এতক্ষণের সব রাগ চলে গেল আমার। ও মদ খাচ্ছে বলে খুব ধারাপ লাগছিল। কিন্তু এখন ওকে ক্ষমা করে দিলাম আমি। এত সহজে কখনও কারওকে ক্ষমা করিনি। যদিও আমি রেগে গিয়েছি কি যাইনি, ক্ষমা করেছি কি করিনি তাতে ওর কিছু এসেও যায় না। দেবশিসকে খুশি করার জন্য ও মদ খেয়েছিল। আমার রাগে ওর কী যায় আসে! কিন্তু আমার তো যায় আসে। মরার মুহূর্ত পর্যন্ত ওকে তো সঙ্গে রাখব আমিই। শুধু ওকেই সঙ্গে রাখব না। দাদাকেও রাখব। এটা ঠিক, দাদাকে আমি ভালবাসি। এতদিন শুধু দাদাকেই ভালবাসতাম। মৃত্যুর আগে জিনি আমার দ্বিতীয় ভালবাসা। যদি এটা ভালবাসা হয়।

দীরে দীরে ওর শাড়ি খুলতে লাগলাম আমি। ছোট্ট বালিকার মতো শরীর গুঁব। শিশুর মতো বলল— আমার লজ্জা করছে।

বললাম— লজ্জা পেয়ো না। তোমার শাড়িটা ভিজে গিয়েছে তো। বদলে দিই। কেমন?

ওকে শাড়ি পরাতে লাগলাম। কাজটা কঠিন। ও সোজা হয়ে বসতে পারছে না। আমিও শাড়ি পরাতে জানি না। তবে বুলেছি তো অনেকবার, একটা ধারণা আছে। কোনওক্রমে পরিয়ে ওকে শুইয়ে দিতে দিতে ভাবলাম, আশ্চর্য, আমার কোনও উদ্বেজনা নেই। আমি যেন কোনও শিশুকে ছুঁয়ে ছিলাম এতক্ষণ। অথচ ছন্দাবউদি বুকের কাপড় ফেললেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়। নিজের ওপর ঘোঁরা ধরল নতুন করে। আমার দ্বারা কৃত সমস্ত পাপের জন্য অনুশোচনা হতে লাগল। মনে হল, শুধু এটুকুর জন্যই, এই মেয়েটাকে একটু ছোঁবার জন্যই, আমার হাত দু'টি পবিত্র রাখার প্রয়োজন ছিল।

ও বলল—মাথাটা যত্নপায় হিঁড়ে যাচ্ছে।

আমি নীচে গেলাম। কেয়ারটিকার আমাদের রক্ষা করছিল। একটা লেবু চেয়ে নিলাম ওর কাছ থেকে। কিছু বলার আগেই লোকটা লেবুটাকে পিসু পিসু করে দিল। বলল— লাখলে বলবেন, তেঁতুলও আছে।

সমুদ্রের শব্দ পাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে চিতা পোড়ানোরও শব্দ পাচ্ছিলাম। এটুকু না হলে বোঝাই যেত না আমরা পুরীতে এসেছি। লেবুভাল করে ওকে খাইয়ে দিলাম আমি। ওর কপালে হাত রেখে আস্তে আস্তে টিপে দিলাম। ও একবার বলল—ও কোন্ডায়?

বললাম—আছে। ডাকব।

ও বলল—না। থাক। আপনি চলে যাবেন না তো?

আমি বললাম—না। যাব না।

আমার একটা হাত ধরল ও। বলল—আপনি খুব ভাল।

চোখে জল এসে গেল আমার। মনে হল এটুকু শোনার জন্যই বেঁচেছিলাম।

ও ঘুমিয়ে পড়ল। খেতেও উঠল না। রাতে বাওয়া-দাওয়া হল না ভাল করে। সবাই ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করল। কারও আর ঠিকমতো কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। যে যেখানে পারল শুয়ে পড়ল। আমার ঘুম এল না। আমি বালকনিতে দাঁড়িলাম। অনেকটা সমুদ্র দেখা যায় এখান থেকে। অনেকটা আকাশও দেখা যায়। সব কিছুই খুব ভাল লাগছিল আমার। আমি বসে পড়লাম। ওই অন্ধকার, ওই গভীরতা, ওই সুন্দর নিশীম সময়— একদিন পায়ে পায়ে চলে যাব ওইখানে। ঠিক চলে যাব। অন্ধকারের ছেলে, ফিরে যাব অন্ধকারে।

কে জানে কতক্ষণ বসেছিলাম, কে জানে কটা বাজে তখন! জিনি এসে বালকনিতে দাঁড়াল। আমি বসেছিলাম। ও প্রথমে আমাকে দেখতে পারনি। বললাম—এখন একটু ভাল লাগছে?

ও চমকে উঠল—আপনি! ঘুমোতে যাননি!

বললাম—ঘুম আসছে না।

ও বলল—আমাকে ক্ষমা করবেন।

বললাম—কেন?

ও বলল—খুব জালিয়েছি আপনাকে। ছি ছি। বাথরুমটাও আপনি ঘুয়েছেন বোধহয়।

আমি হাসলাম। বাথরুম ধুতে হয়েছিল ঠিকই।

ও বলে উঠল—কী অনায়া। কোনও দিন খাইনি তো আগে। সামলাতে পারব না জানলে খেতাম না আমি।

বললাম—যা হয়েছে, হয়েছে। ভুলে যাও। এ সব অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই কম-বেশি আছে। কত কী-ই তো হয় জীবনে। হয় না? সব অভিজ্ঞতারই একটা প্রথম দিন থাকে।

ও হাসল। কী সুন্দর হাসিটা। বলল—এই প্রথম। এই শেষ। আবার ছেলেমানুষ দেখাল ওকে। বলল—কী সুন্দর, না?

আমি বললাম—কী?

ও বলল—সমুদ্রটা। আকাশটা। তেঁউ ফেটে বাওয়া সাদা ফেনাগুলো! ও সব না খেলে সন্ধে থেকে দেখতে পেতাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম দু'জনেই। তখনও ও দাঁড়িয়ে আছে। আমি বসে আছি। ওর এই কাছে থাকার অসম্ভব ভাল লাগছে আমার। কেন লাগছে আমি জানি না। কী দেখেছি আমি জিনির মধ্যে? জানি না। শুধু এইটুকু জানি, জিনি আমার মধ্যে এমন সব অনুভূতি সঞ্চার করেছে যার খোঁজ আমি আগে পাইনি। ওর মুখে আলো আঁধার। হেঁড়া হেঁড়া কারুকাড়। ওর ঠোঁট নড়ছিল। যেন কোনও আত্মগত উচ্চারণ করছে। আমি অপলক ওকে দেখছিলাম। ওকে ছুঁতে ইচ্ছে করেনি। ছানতে ইচ্ছে করেনি। শুধু ওর থাকার মধ্যে কী একটা গাঢ় অর্থ আমি বুজে

পাচ্ছিলাম। ও হঠাৎ আমার দিকে ফিরল। বলল—আপনি কবিতা পড়েন?

বললাম—পড়ি।

ও এ বার কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। বলল—তার কবিতা সবচেয়ে ভাল লাগে? আধুনিক কবিদের মধ্যে?

বললাম—জীবনানন্দ দাশ।

ও কি একটু হাসল? ঠিক বুঝলাম না। বলল—আধুনিক, মানে, সাম্প্রতিক লেখা পড়েন?

বললাম—হ্যাঁ। মাঝে মাঝে পত্রিকাগুলো দেখি।

ও বলল—আমিও পড়তাম। সব। পত্রিকা। নতুন প্রকাশিত কবিতার বই, সব। এখন আর পড়া হয় না। পত্রিকা কোথায় পাব। মাঝে মাঝে বইগুলো পড়ি।

আমি চুপ করে আছি। আমার কী বলার থাকতে পারে। বিয়ে হলে মেয়েদের স্বাভাবিক ভাল লাগার বিষয়গুলি হারিয়ে যেতে থাকে। আমাদের সমাজব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এমনকী মেয়েরাও এটাই তার অনিবার্য গতি বলে ভাবে। তিনি যেমন বলছিল—এমন কিছু স্বগতোক্তি ছাড়া আর কিছুই মেয়েদের জীবনে ত্রেনন বেঁধে থাকে না। আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ত সুনন্দা সান্যাল। আমরা ওকে অকস্মিৎ সান্যাল বলে ডাকতাম। দারুণ দেখতে ছিল ওকে। তার চেয়েও বড় কথা—দারুণ গাইত। ছবি আঁকত। ফার্স্ট ইয়ারের শেষের দিকে বিয়ে হয়ে গেল ওর। ফাইনালের আগে শেষ ছ'-সাত মাস ক্লাস করতে এল আবার। তখন আর গায় না ও। আঁকে না। তখন ও সুনন্দা ব্যানার্জি। বলেছিল—‘ধুর, সময় কোথায়! ও সব বিয়ের আগে থাকে মেয়েদের। পড়াশোনাই ছেড়ে দিচ্ছিলাম। ও জোর করল, তাই...’ ওকে দুঃখিত লাগেনি। গান গাইছিল না বলে, আঁকে না বলে ওর কোনও বিবাদ ছিল না। জিনির কথার মধ্যে বিবাদ জড়িয়ে ছিল। একটা হারিয়ে ফেলার বেদন। এ সব কি কেটে যাবে ওর? ও কি সুনন্দার মতো সুখী ও দাম্পত্যতৃপ্ত হয়ে উঠবে? বিষয়টা ওকে ছেড়ে যাবে, নাকি যাবে না। ও আবার কথা বলল। এ বার আর আমার দিকে তাকাচ্ছে না। বলছে—আজ একটা কবিতার কয়েকটা লাইন খুব মনে পড়ছে! অথচ কোথায় পড়েছি, বার লেখা, মনে পড়ছে না।

জিজ্ঞেস করলাম—কী লাইন?

বলল—

...অথচ সেদিন রাতে যখন আরও ঘন মনে  
ভরে দিল ওর মুখ একা একা সবার অমতে,  
আর ধীরে ধীরে ওকে ঘিরে নিল সিঁদুর শূন্যল...

বললাম—জয় গোস্বামী। ‘ক্রিসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ’র কবিতা।

ও চমকে তাকাল। বলল—হ্যাঁ! হ্যাঁ! তাই তো! আপনি জানেন? পড়েছেন? কী কবিতা?

বললাম—কী কবিতা মনে নেই। বইটা পড়েছিলাম।

ও বলল—ছোট্ট বই। পিসির বাড়িতে ফেলে এসেছি।

আবার চুপ করে থাকল ও। বোধ হয় জোরে শ্বাস টানল। তারপর বলল—আমারও জীবনানন্দ প্রিয়।

আমি নীরব থাকলাম।

ও বলতে শুরু করল—

রয়েছি সবুজ মাঠে— ঘাসে—

আকাশ ছড়িয়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে;

জীবনের রক্ত তবু ফলানো কি হয়

এই সব ছুঁয়ে তেনে? — সে এক বিশ্বয়

আমি উঠে দাঁড়িলাম উত্তেজনায়া। আশ্চর্য। আজই সম্ভাব্য আমি এই কবিতার কথা ভেবেছি।



একই কবিতা আমরা দু'জনেই জানব এতে কোনও আশ্চর্য নেই। কিন্তু একই দিনে, প্রায় একই দিনে, প্রায় একই দৃশ্য দেখে একই কবিতা আমারই মতো করণ মনে পড়বে, এ কি আমি কোনওদিন ভেবেছিলাম? আমি আশ্বে আশ্বে বললাম—

পৃথিবীতে নাই তাহা— আকাশেও নাই তার স্থল,  
চেনে নাই তারে ঐ সমুদ্রের জল;

ও আমার দিকে ফিরল। চোখ দু'টি নিবদ্ধ হল আমার চোখে। কোনও কথা বলল না। পাশের ঘরে আলো জ্বলে উঠল তখন। ও চমকে তাকাল। সেবশিস। বলল— ও! হোঁরা! তোমার মাথা মাথা সেরে গেল, জিনি?

জিনি কোনও উত্তর করল না। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম হিন্দুস্তানে সেবশিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে লাগল। ওদের গা থেকে বাসি আলকোহলের গন্ধ বেরচ্ছে। আমার আর কিছু ভাল লাগছিল না। ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। আমার আর অরুণের এক বিছনায় শোবার কথা। অরুণ নেই। আমি চোখ বন্ধ করলাম। জিনির চোখ দু'টি আমার বন্ধ চোখের তলায় ভাসতে লাগল। বুকের তলায় কী ফেন কষ্ট হতে লাগল। কেন যে পুরী এলাম। কেন যে। ভালবাসা টের পাইনি এতদিন, সে একরকম ছিল। তখন চরমভাবে প্রেম অস্বীকার করেছি। চরমভাবে যৌনতা চিনেছি। সে-দিন বুঝলাম— এই যে দাবি নেই, যৌনতা নেই, চাহিদা নেই— শুধু এই যে বুকে লেগে থাকা কষ্ট, এই মনে পড়া, এই জেগে থাকা বোধ— এরই নাম প্রেম। সুন্দর, অনাবিল প্রেম।



সকালবেলায় জিনিকে নিয়ে মুখোমুখি বসলেন বিকাশ। বললেন— তোমার কি এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে?

জিনি মাথা নেড়ে না বলে।

বিকাশ বলেন— আমরা খুব ভালবেসে তোমাকে বউ করে এনেছিলাম। তুমি শিক্ষিত। ভাল পরিবারের মেয়ে। তোমার আচরণে অসংযম আসবে কেন?

জিনির মাথা টলে যায়। স্বামী আর শাশুড়ির কথা থেকে শুনে সে কষ্ট পেয়েছিল, স্বত্ত্বের কথা তাকে দ্বিগুণ ধাক্কা দিয়ে যায়। বিকাশ বলেছিলেন— তোমার শাশুড়ি তোমাকে খুবই ভালবাসেন। নিজের মেয়ের মতো...।

জিনির মনে পড়ে যায় শাশুড়ির স্তন সম্পর্কিত মন্তব্য, মনে পড়ে জিনিকে সেমাকি বলায় কাযদা, মনে পড়ে ইন্দনীং বাড়িতে কেউ এলেই তাকে বলা— কী বিয়ে দিলাম ছেলের, বউয়ের তো মাথা খারাপ— এবং মনে পড়ে— ঠাকুরঘরে টেনে হিঁচড়ে ফেলে মাথা ঠুকে দেবার কথা। মনে পড়ে নানান ছোট-বড় কটু ভাষণ, জিনিকে অলক্ষ্যে বলা। তার মা কি বলতে পারত তাকে এরকম? ভাবতে পারত? মায়ের শাসনের তলায় আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাটি চিনতে পৃথিবীর কোনও সম্ভাবনের কোনও দিন ভুল হয়নি। সুতরাং সে স্তান হাসে। কোনও কথা বলে না।

বিকাশ বলেন— এত ভালবাসা, এত সুন্দর পরিবার পেয়েও যখন তোমার অসুবিধা হচ্ছে তখন আমি ঠিক করেছি তোমার মাকে জানাব। তিনি যা ভাল বুঝবেন, করবেন।

জিনি চমকে ওঠে। মা! মাকে বলা হবে সব? এইসব? অসম্ভব। এতখানি অপমান মাকে পেতে দেবে না সে। সে ধীরে ধীরে স্বত্ত্বের পায়ের কাছে বসে পড়ে, বলে— মাকে জানানো

না কিছু। আপনারা যা বলছেন আমি তাই করব। শুধু থাকে বলছেন না।

তার চোখে বাষ্প নেই। রোগা শরীরে হাড়গুলি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। সে মনে মনে সমস্ত চড় ও সমস্ত মারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে এখন। সে নিজেকে কেমন করে প্রকাশ করবে। এরা তাকে বিশ্বাস করে না। সে কেমন করে সেই বিশ্বাস নিরাস করবে। সত্য যা সত্যই। মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সত্যকে যায় না।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট পান বিকাশ। এই কদিনে মেয়েটা কেমন শুকিয়ে গেছে। তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে ওই মেয়ে সত্যি নষ্ট আচরণ করেছে। তবু দেবশিস ও লক্ষ্মীর কথা ঠেলেতে পারেন না তিনি। ভাবেন, মানুষ ভুল করে, শুধরেও নেয়, একে শোধরানোর সুযোগ দেওয়া থাক। তবু পুত্রবধূর চরিত্র নিয়ে কিছু শুনতে কত খারাপ লাগে। হঠাৎ একটা হাওয়ার কলক আসে ঘরে। ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। দেবার্চনের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটি খনখন শব্দ ভেঙে পড়ে। বিকাশ ছুটে যান। লক্ষ্মী আর দেবশিসও ছুটে আসে। আর কোথাও কোনও ওলট-পালট নেই, শুধু দেবার্চনের ছবিটা খান-খান হল। লক্ষ্মী বলতে লাগলেন— ‘এতদিনে কিছু হল না, আর আজই। কী! অলক্ষ্যে ব্যাপার!’ বিকাশের মনে হল— দেবার্চন কি কিছু বলতে চাইছে? কোনও ইঙ্গিত? দেবার্চন কি চলে যাচ্ছে? বিকাশ ভয় পান। ইদম্নীং ছোট ছেলেকে নিয়ে ভাববার অবকাশ মেলেনি। দেবার্চন কি সে-কথাই মনে পড়িয়ে দিল?

দু’বার বেল বাজল দরজায়। দেবশিস দরজা খুলল। আনিসুজ্ঞামান। তাঁকে ভেতরে আহ্বান করল দেবশিস। গলা পেয়ে বিকাশ এলেন। বসতে বললেন। দরজাটা ভাল করে খুলে দিতে দিতে দেবশিস দেখল তানপুরা কাঁধে এগিয়ে যাচ্ছে অনুপম। অন্য দিন হলে সে ডাকত। পাড়িয়ে সিগারেট খেত একসঙ্গে। আজ ইচ্ছে করল না। ওদের দেখলেই পুরীর রাতগুলো মনে পড়ছে। দেবশিস এখনও স্পষ্ট করে জানে না যে জিনি সত্যি দেবোপমের সঙ্গে কিছু করেছে কি না। কিন্তু তার ঈর্ষা হচ্ছে। গভীর ঈর্ষা। দেবোপম যখন জিনিকে ধরে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে যায় এবং যত্ন করতে থাকে তখন দেবশিস একবার ও ঘরে যাবার জন্য এসেছিল। শুনতে পেরেছিল জিনি বলছে— ‘আমার লজ্জা করছে।’ দেবশিস ধমকে গিয়েছিল। কী করছে ওরা? তার প্রথমেই মনে পড়েছিল তার হাতে জিনির শরীর কত শীতল। সে উকি মারার চেষ্টা করেছিল। দেখেছিল, দেবোপম, কত যত্নে ও সাবধানে ভেজা শাড়ি খুলে শুকনো শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছে জিনিকে। নিজের কাছে স্বীকার না করে উপায় নেই যে দেবোপমের আচরণে কোনও অসততা ছিল না। দেবশিস হয়তো নিজেও পারত না, কোনও মাতাল মেয়ের শরীর ওই নিষ্পাপ উপায়ে ঢেকে দিতে। দেবোপম পারল! কেন পারল! ঈর্ষা— দারুণ ঈর্ষা দেবশিসের। জিনিকে যখন শুইয়ে দিচ্ছিল দেবোপম তখন আবার লুকিয়ে পড়েছিল দেবশিস। পরে বাকিটাও সে দেখেছে। জিনিকে তবুও উত্যক্ত করছে সে। কোথায় যেন একটা হেরে যাওয়া কান্না করছে। জিনি দেবোপমকে যে স্বীকৃতি দিয়েছে তা কি এক মুহূর্তের জন্যও বলেছে দেবশিসকে? ওই স্বরে। ওই সমর্পণে। কোথাও খারাপ কিছু নেই কিন্তু সবটাই দেবশিসের কাছে খারাপ। বিকৃত। দেবশিস জিনিকে বারবার বলছে— ‘ও কি তোমার গায়ে হাত দিয়েছিল?’ জিনির প্রতিটি না বলার সঙ্গে দেবশিস বিশ্বাস করতে চেয়েছে যে ওরা লিপ্ত হয়েছিল। নিশ্চয়ই হয়েছিল। সে প্রাণপণে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, হয়েছিল। জিনি যদি একবার বলত, অন্তত একবার বলত— ‘ছি, তোমার বন্ধুটা কী! অসভ্য!’ তবে সামান্য হলেও আরাম পেত দেবশিস। দেবোপমকে খাটো হতে দেখে নিজেকে উচ্চতর ভাববার অবকাশ পেত। কিংবা সে, জিনিকে, যতটুকু অমূলক ভেবেছিল, শরীরে যতটুকু অপূর্ণ, তার জন্য যত অবেহলা ও অপমান সে জিনিকে করেছিল, তার সামান্যতমও দেবোপমের মধ্যে ছিল না বলে সে নিজেকেই বড় হীন দেখেছিল। তাই ঈর্ষা। তাই রাগ। এবং হিংস্র ক্রোধ, কেন-না জিনি তার কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ সমর্পণ করে উঠল না কোনওদিন। এখন সে বিশ্বাস করছে জিনি

অসংলগ্ন। জিনি শীতল। সে প্রতিদিন অক্লান্ত থাকে। প্রথম দিন থেকে সন্তুষ্ট থাকে। তার ভেতরকার সমস্ত ঘন দ্রবণ বেরিয়ে যাবার সুযোগ নেওয়া সত্ত্বেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি তাকে একদিনের জন্যও জিনি দিতে পারেনি। দেবাশিস জিনিকে চাও আবার চাও না। পায় আবার পায়ও না। দেবাশিস জিনিকে চড় ঘেরেও ভাবতে থাকে— 'ও আমার হাত পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে অন্য কোথাও।' দেবাশিস জিনিকে ভালবাসেনি কিন্তু জিনির ওপর থেকে একচুল অধিকার হারাতেও সে রাজি নয়। সে অতএব, নিজের অধিকার বন্ধুর জন্য একটি মল গড়ে তুলতে চায়, সমর্থন পেতে চায় আরও অনেক লোকের এবং ঘৃণা প্রতিষ্ঠা করে। সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠা করে। সেই ঘৃণা, সেই সম্ভ্রান্ত ঘর ছাড়িয়ে চলে যায় পাড়ায় পাড়ায়। দেবাশিস, সে এমনই এক পিতার সন্তান, যার জন্ম নিয়ে সম্ভ্রান্ত প্রকাশ করে পাড়া এবং সে সকলের চোখে নিদার্ত হয়, ঘৃণিত হয়, এটা হওয়াই তার পক্ষে সহজ কারণ দেবাশিসের পক্ষেও এটা কবাই সবচেয়ে সহজ।

বিকাশ চা করতে বলেন জিনিকে। লক্ষ্মী কাচের টুকরো তুলছেন। অঁচল দিয়ে মুখে দিচ্ছেন মৃত সন্তানের ছবি। বুঝি-বা একটু জান হয়ে গেছেন তিনি, বুঝি-বা মনে পড়ে যাচ্ছে, ছোটখোকা ক্ষীরের সম্ভ্রান্ত ভালবাসত। নাতু ভালবাসত। বড় অল্প চাইত সে। বড় অল্প পেয়েই চলে গেল তাই। লক্ষ্মী জমালা দিয়ে বাইরেটা দেখেন। পাশের বাড়ির পাঁচিলে রোদুর পড়েছে। মিথিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সেতারির সেতারবানন ভেসে আসছে রোজকার মতো। বর্ষায় পাঁচিলে শ্যাওলা পড়েছিল, তার কালচে শুকনো ছোপ বরা আছে। রোদুরে অনেক বেশি স্পষ্ট লাগছে এখন। দেবার্চন সেতারের শব্দে রাগরূপ ধরার চেষ্টা করত। লক্ষ্মীর অর্ধহীন লাগত এ সব। সবার কথা ধামিয়ে দিয়ে, নিশ্চল থেকে, রাগরূপ বোঝার চেষ্টা করার মধ্যে কী আনন্দ থাকতে পারে তিনি বোঝেননি। তাঁর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। ছোটছেলেকে কোনও দিনই তিনি বোঝেননি। যখন ছোট ছিল তখনই তাকে দূরের মনে হত। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-দূরত্ব অলঙ্ঘনীয় হয়ে গেল ক্রমে।

জিনি চা আর বিক্টিট সাজিয়ে আনল। আনিসুজ্ঞামান দুর্গার প্রবন্ধ বিষয়ে কথা বলছিলেন। জিনির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন তিনি। বলে ফেললেন— শিজিনী, তোমার কি শরীর খারাপ?

জিনি মুখ নিচু রেখে জবাব দিল— না।

লক্ষ্মী পাশের ঘর থেকে প্রমটা শব্দে পেলেন। বিছানায় ছবি-টবি রেখে তাড়াতাড়ি এসে বললেন— হ্যাঁ, শরীর ভাল হবে কী করে। এই পুরী থেকে দাপাদপি করে এল।

জিনি চলে গেল সামনে থেকে। মেয়েটির জন্য কষ্ট পেলেন আনিসুজ্ঞামান। অল্প-স্বল্প যতটুকু কথা বলেছেন, ভাল লেগেছিল। মেয়েটির গভীর পড়াশুনা আছে। এখনকার বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীর মতো ওপর-ওপর নয়। আজ তাকে বড় বিষয় দেখাচ্ছে। কারওকে কারওকে বিস্ময়তা মানায় না। কলেজেও দেখেছেন তিনি। কোনও ছাত্রী বা ছাত্র, হঠাৎ বিষয় মুখে এসে দাঁড়ালে বুকের মধ্যে টনটন করে। ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে দুটি অভিব্যক্তি চমৎকার মনেতে যায় এমনই মনে করেন আনিসুজ্ঞামান। রাগ আর ঘৃণা। তুমুল ঘৃণা। এই মেয়েটি, জিনি, শিজিনী তাঁর ছাত্রী ছিল না। তবু, সে তো ছাত্রীবৎ। তার বিস্ময়তা, শুকনো, অযত্নের প্রকাশ আনিসুজ্ঞামানকে হতুগা দিতে থাকল। বেশিক্ষণ কথা বলতে ভাল লাগল না তাঁর। যতখানি আলোচনা করবেন ভেবেছিলেন, করা হল না। উঠে পড়লেন।

অন্য সময় কেউ এলে লক্ষ্মীও বিকাশের সঙ্গে বসে কথা বলে থাকেন। আজ, দেবার্চনের ছবি ভেঙে যাওয়া তাঁকে বিমর্ষ করেছিল। তবু, কিছু কথা না বললে তাঁর শান্তি হয় না—এমনই কারণে তিনি আবার ও ঘর থেকে এ ঘরে এলেন। আনিসুজ্ঞামান চলে যাচ্ছেন। লক্ষ্মীর কাপড়লোর দিকে নজর গেল। অঁতকে উঠে বলতে লাগলেন— দেখলে, মেয়েটার কাপড় দেখলে। কতবার বলেছি যাকে-তাকে এ কাপড় চা দেবে না।

তিনি ছুটে গেলেন ঘরে। জিনিকে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগলেন— তুমি কি একটা কথা শুনতে জানো না? তোমার বাড়িতে কি কোনও শিক্ষাই তোমাকে দেয়নি?

জিনি কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল— কী হয়েছে?

—কী হয়েছে তুমি জানো না? আমার সংসারে একটা আচার-বিচার রানবে না তুমি? ওই মুসলমানটাকে তুমি ঘরের কাপে চা দিলে? ওই কাপে চা খেয়ে আমি পুজো করতে গাই না।

—মুসলমান তো কী হয়েছে মা? ওঁর মতো মানুষ হয়। কত জরী? কী বিশাল ঐক্য পড়াশুনো।

—কী? আমাকে শেখাবে? তত্ত্ব করছ মুখে মুখে?

মায়ের গলা পেয়ে দেবশিস এসে যায়। জিনির ঘোঁপা ধরে টান মারতে থাকে সে। বলে— 'মায়ের মুখের ওপর কোনও কথা বলবে না তুমি। একটা কথাও না। বাজে, মোরো মেয়েছেলে।'

পাশের ঘরে বিকাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোনও প্রতিবাদ আসে না তার।

প্রহারের প্রবৃত্তিও হয়তো-বা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলির একটি। সভ্যতা ও সুসংস্কৃতির দাবিতে অন্যান্য প্রবণতার মতোই প্রহারও লুকিয়ে থাকে। ঘুম দেয় দীর্ঘ-দীর্ঘকাল। কিন্তু একদিন—হঠাৎ সেই ঘুম ভেঙে গেলে—প্রহার দানবপ্রায়। তখন সভ্যতা অক্ষকারে। সুসংস্কৃতি বিস্মৃত। পাশের নরজা প্রথমবার ডিঙোতেই কষ্ট বেশি। ধীরে ধীরে প্রহারও পাপেরই মতো অভ্যাসে দাঁড়ায়।



রক্তের গন্ধ পাচ্ছে অন্ধ। মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছে। তার ঘুম হচ্ছে না। কী যেন একটা ঘটবে। বড় কষ্ট হচ্ছে তার। সে হাতড়ে হাতড়ে বাইরে চলে এল। দু দিন হল মাস্টারের জ্বর এসেছে। পাঁজরে ব্যথা। কাজে যাচ্ছে না ক দিন। অন্ধ পায়ে পায়ে মাস্টারের বাড়ির দিকে চলল। এখনও ভোর হয়নি ভাল করে। পাখিরা স্বরের আড় ভাঙছে। যেন কচি শিশুদের সা রে গা মা গলা সাধা।

কপিলা মঠ করতে বেরিয়েছিল। এত ভোরে অন্ধকে দেখে বলল—কোথায় যাস অন্ধ?

—কপিলাদি? তুমি কোথায় গেছিলে?

—বিলের পাড় গেছিলাম।

—অ।

—তুই কোথায় যাস অন্ধ?

—মাস্টারকাবার কাছে যাব। কাকার জ্বর তো। কপিলাদি?

—বল।

—একটা গন্ধ পাচ্ছ?

—কী গন্ধ? ফটিক বিল থেকে কত গন্ধই তো আসে।

—না। মানে রক্তের গন্ধ পাচ্ছ?

—রক্তের গন্ধ? অ অন্ধ। অন্ধ রে। সত্যি তুই রক্তের গন্ধ পাচ্ছিস? তুই কি ভগবান রে অন্ধ? সভ্যতাই তুই এত গন্ধ কেমন করে পাস?

কপিলা ভেঙে পড়ছে। তার বিশ্বাস ও বিলাপ ভোরের আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধ চুপ করে আছে। কপিলা তার পায়ের কাছে বসে পড়েছে। তার কোমর সাপটে ধরেছে। তার উদরে কপিলার কামার জল পড়ছে এখন। কপিলা বলছে—পাপ করেছি রে অন্ধ। খুব পাপ করেছি।

রক্তের গন্ধ তো পাবিই তুই। এ আমার পাপের গন্ধ।

—ওটো কপিলাদি। কান্দছ কেন? আমাকে মাস্টারকাফির কাছে যেতে দাও।

—শোন অন্ধ শোন। আমি বুঝিনি লোকটা এরকম করবে। কী করল জানিস? টাকা দিল। মা'র মুখের ওপর একগাদা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বলল—মেয়ের পোঁট খালাস করে আয়। অনেক টাকা দিলাম, ভাল ডাক্তারের কাছে যানি। ডোমের ত্রো পাবার ষাধ না। তোর শুল ঈশ্বরানের সঙ্গে, বদনাম করিস আর একজনের। আমার টাকা দেখেছিল। একমি অজুহাত দেখিয়ে চলে এলি লাল। ফেলতে ফেলতে।

—এইসব বলল?

—হ্যাঁ রে। মা ফিরে এল চোখের জল ফেলতে ফেলতে।

—তোমরা টাকাটা নাওনি তো কপিলাদি?

—নিজেছি রে অন্ধ। না নিয়ে কী করব বল? কাল আমি পেট খসিয়ে এসেছি। অন্ধ, কী যন্ত্রণা! ভগবান আমাকে পাপের শাস্তি দিল রে! কিছু বিশ্বাস কর, নগেন মিস্ত্রির হাড়া আমি কারও সঙ্গে শুইনি। ওই লোকটাই আমার সতীন্দ্র ভেঙেছে। আমাকে বলত—‘তুই কী ভাল রে কপিলা। তোকে বিয়ে করব। আমার রানি করে রাখব। আমার বয়সটা একটু বেশি। কিন্তু তাতে কী? দেখ। তোকে কত সুখ দিই আমি।’ সুখের লোভ। সুখের ভীষণ লোভ। ওই লোভে লোকটার সব কথা আমি বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। আর বিশ্বাস করতে করতে কবে যেন ভালও বেসে ফেললাম রে! মনে হতে লাগল, বয়স বেশি তো কী? বুড়ো বর তো কত মেয়েরই হয়। ও যখন ডাকল আমাকে—জাপটাল, আদর করল—আমি গলে গেলাম। আমাকে ও ওর ওই নরম ব্যতককে বিছানায় পর্যন্ত নিয়ে গেল। কতদিন কত গল্প শুনেছি, বাবুরা মেয়েদের সর্বনাশ করে। তাও আমি বুঝলাম না নগেন মিস্ত্রির আমার সর্বনাশ করেছে। আমি বোকা রে অন্ধ। আর পাপী। ঘোর পাপী। আমার গায়ে পোষা পড়বে, দেখিস।

অন্ধ মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে কপিলার চোখে হাত রাখে। জল মুছিয়ে দিতে চায়। কপিলার সব কথাই সে বুঝেছে এমন নয়। কিন্তু এই ভোরে এক দুঃখের রাগিণী তার স্নায়ুতন্ত্রী স্পর্শ করেছে। এই বসন্তের শুরুতে শিলির অঙ্গ হয়ে আসা বেলায় কপিলার অঙ্গ কিছু ধুলো ভিজিয়ে দিল।

—কৈদো না। কপিলাদি। রক্তের গন্ধ কেন পাচ্ছি আমি তো জানি না। আমাকে যেতে দাও।

—আমাকে খারাপ ভাবলি, না রে অন্ধ? খুব খারাপ?

কপিলা অন্ধকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। অন্ধ ঠোঁটের তলায় পাতলা হাসে। সে খারাপ ভাববে কেন? কী খারাপ, কী ভাল সে কি বুঝতে পারে? সে কি জানে? তার খাঁধা লাগে। কপিলাদির আসল দুঃখটা কোথায়? নগেন মিস্ত্রির টাকা দিয়ে আবার লোভী বলেছে বলে? পেট খালাস করেছে বলে? নাকি নগেন মিস্ত্রিরকে ভালবেসে কপিলাদি সত্যিই দিওয়ানি বনে গেছে। মুন্নাদা অবশ্য বলে, ভালবেসে ছেলেরা যতখানি দিওয়ানা হয়, মেয়েরা ততখানি হয় না কখনও। মুন্নাদা কাকে ভালবেসেছিল আর ধাক্কা খেয়ে অন্ধকে বলেছিল—পুরা উমর ও তুঙ্গে ইয়াপ আয়েগী কিউ কি উসনে তুমে দিয়া ভি কুছ তো সিরফ জখম।

এই কদিন যে অসহ্য কষ্ট আর অপমান কপিলা চেপে রেখেছিল, অন্ধর কাছে সে-সব উগরে দিয়ে কীরকম হালকা বোধ করেছে সে। সে দেখল অনিবার্য পা ফেলে এগিয়ে চলেছে অন্ধ। চোখে দেখে না কিন্তু এতটুকু ভুল পা ফেলেছে না সে। সে আকাশের দিকে তাকায়। ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার। একটি একটি করে তারা নিভছে। এত তারা দিনের বেলায় কোথায় যে সব থাকে সে জানে না। ফটিক বিলের দিকে চেয়ে তার মনে পড়ে আরও একটা কাজ তাকে দ্রুত খুঁজো নিতে হবে। আবারও হয়তো কোনও বাবুর প্রলোভনে ভাল থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে এবং ভুল করবে। স্বপ্ন দেখা কি অটকানো যায়? কপিলা জানে না।

অন্ধ পায়ে পায়ে মাস্টারের দরজায় পৌঁছয়। দরজায় শব্দ করে। মাস্টার দরজা খুলে বলে—

অন্ধ, এত সকালে। ঘুম হয়নি রে তোর? মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন?

অন্ধ চুপ করে থাকে। মাস্টার তার কাঁধ জড়িয়ে বলে—আর আমার সঙ্গে শুয়ে নিবি একটু।

অন্ধ টের পায় মাস্টারের গায়ে তখনও ছুর আছে। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে বলে—  
আমি একটা গন্ধ পাচ্ছি।

—কী গন্ধ?

—খারাপ গন্ধ। রক্তের গন্ধ।

মাস্টার জানে অন্ধ গন্ধ পায়। এতদিন সে সময়ের ভ্রাণ পেত। মরশুমের ভ্রাণ, বইয়ের গন্ধ। এ পর্যন্ত মাস্টারের আশ্চর্য লাগেনি। কারণ কোনও ইন্দ্রিয় নিজস্ব হলে অন্য অনুভূতিগুলি অক্ষর হয়ে যায়, কিন্তু ইদানীং অন্ধ যেন ভবিতব্যের গন্ধ পাচ্ছে। মাস্টারের বুকের মনো নিরাসির করে। সে কোনওদিন অতিশ্রাবৃত্তে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু অন্ধের অনুভূতিগুলি ক্রমে ব্যাখ্যাভীত হচ্ছে যাচ্ছে। অন্তত সাতদিন আগে, যখন মাস্টার রীতিমতো খুব তখন অন্ধ তাকে বলেছিল—  
তোমার গায়ে আমি ছুরের গন্ধ পাচ্ছি—এখন মাস্টারের গা ভর্তি ছুর। আজ অন্ধ রক্তের গন্ধ পাচ্ছে। মাস্টার বুকতে পারে এ গন্ধের এত তীব্রতা যে অন্ধের মুখে কষ্টের ছাপ পড়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে মাস্টারের দুটোখ বুজে আসে। অন্ধ মাস্টারের বুকের কাছে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়ে ক্রমে। সে আগেও দেখেছে মাস্টারের কাছে এলে তার ছালা যন্ত্রণা কষ্ট কিছুই থাকে না।

সকালবেলায় হুইচই শুনে ঘুম ভেঙে গেল মাস্টারের। আজ তার কাজে বাওয়া নেই। তাই বেলা অবধি পড়ে ছিল। ছুরে শরীরটা কাহিল করে দিয়েছে। কারা যেন দৌড়ে যাচ্ছে কোথায়, কারা যেন ইস্ ইস্ করছে। হঠাৎ কোন সর্বনাশের ঘূর্ণী আছড়ে পড়েছে বস্তির ওপর। মাস্টারের মনে পড়ে গেল অন্ধ রক্তের গন্ধ পেয়েছিল। ছুর ভুলে দুর্বলতা ভুলে লাফিয়ে উঠল মাস্টার। অন্ধ অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। মাস্টার দরজা খুলে বাইরে এল। কোলাহলের মধ্যে, ছোট্টাছুটির মধ্যে একটি শব্দ কানে গেল তার।—মরণব্রিজ-মরণব্রিজ। হাবু আর নেপা ছুটে যাচ্ছিল। যেতে যেতে বলল, শুনেছ মাস্টার, মাঝুরের গাড়ের একটা ছেলে রেলের কাটা পড়েছে।

মাস্টার চমকে উঠল।—কে কাটা পড়ল, কে?—বস্তির কেউ নাম জানে না। শুধু আশ্চর্যের কথা হল—সেই ছেলেটার থেকে একটু দূরেই মরে পড়ে আছে কুঁজি ঘুঁটেকুঁড়নি ফুলগেণু। সে কিন্তু কাটা পড়েনি। বোধহয় রেলের ধাক্কা খেয়েছিল। মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারও পৌঁছে গেল মরণব্রিজে। লোকজন ঘিরে আছে জায়গাটা। কে যেন অজান হয়ে পড়ে গেছে। তাকে ঘিরেও জটলা। লোকে বলছে—যে মরেছে তার দাদা—।

—কখন হল? কখন হল ঘটনাটা?

—এই তো আধঘণ্টা হবে বুকি।

ইতিমধ্যে জেনে গেছে সবাই। মাস্টার দেখছে। ছেলেটির বুকের ওপর দিয়ে ঢাকা চলে গেছে। অর্ধাংশ অটিকে আছে পটিাতনে। নীচের দিকের আধখানা লাইন ও পটিাতনের খাঁজে অটিকে কুলছে। যেন মরাবে বলে বুক পেতে দিয়েছিল ছেলেটা। নিটোল মুখ। একটি নিটোল জগৎ। সেই হাতে তখনও ধরা আছে চকচকে সিটলের কান। কান থেকে দুধ গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে গিয়েছে মাটির দিকে। দুধ—তা আর কেনা যায় না। মাস্টার আর সহ্য করতে পারল না। রক্তের কী বীভৎস গন্ধ। এই রক্তই যখন শরীরে থাকে তখন কোনওরকম আঁশটে গন্ধের সন্ধান পাওয়া যায় না। মাস্টার মুখ নিচু করে ঘরে ঢোকে। অন্ধর ঘুম এখনও ভাঙেনি। মাস্টার তাকে জাগিয়ে দিল। বলল—তুই যে রক্তের গন্ধ পেয়েছিলি এ কথা আর কাউকে বলিস না রে—।

—কেন মাস্টার কাকা?

—একটা ছেলে টেনে কাটা পড়েছে, দেখে মনে হল আত্মহত্যা করেছে।

—কোথায়? মরণব্রিজে?



—হ্যাঁ, তুই কী করে জানলি?

—গন্ধটা ও দিক থেকেই আসছিল যে।

মাস্টার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—মরণ একজনের হয়নি, দু'জনের হয়েছে।

—আর কার?

—কুঁজি ফুলরেণু— ঘুটে বেচত।

—এই বস্তিতে তো থাকে না।

—না, ও স্টেশনের কাছে বুপড়িতে থাকত। মঠখান থেকে গোয়ার কুঁজিও রোদের স্লিপারে ঘুটে দিত। ও যে কী করে মরল?

দু'জনে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। অবশেষে এক বলল—হাঙ্গের কথা আমি একজনকে বলেছিলাম—

—কাকে?

—কপিলাদিকে।

মাস্টার ভাবছে, কপিলা কি বলবে কারণকে? বলবে কিছু? অঙ্ক যে আগে থেকে বুঝতে পারছে তা কি ঐশ্বরিক বলে ভেবে নেবে সবাই? গভীর অনুভূতিপ্রবণতা থাকলে এরকম হয়। কোনও কল্পনা ও বাস্তবের সমাপত্যও হতে পারে। যে মারা গেছে মাস্টার থাকে চেনে না। তবু ক্লান্তভাবে শুয়ে শুয়ে দু'টি ঘটনাকে জুড়ে নেবার চেষ্টা করে। ফুলরেণুর জন্য মানুষের তেমন ঔৎসুক্য নেই এখানে। বাবুদের বাড়ির ছেলের জন্য আছে। কিন্তু ফুলরেণু কেন মরে গেল? সে কি ছেলেটিকে বাঁচাতে চেয়েছিল? সারা শরীরে অবসাদ ছড়িয়ে যায়। অঙ্ককে নিয়ে কামারহাটির দিকে হাটতে থাকে মাস্টার। কামারহাটির পাশ দিয়ে বাদিকে একটি ছোট রাস্তা ধরে দক্ষিণেশ্বর চলে যাওয়া যায়। আজ মাস্টার অনেকক্ষণ গঙ্গার ঘাটে বসে থাকবে। অঙ্কও থাকবে। মাস্টার জল দেখবে আর অঙ্ক জলের শব্দে শুনবে। আজ তারা কোনও কথা বিনিময় করবে না।



সেবাশিস বলতে লাগল—এত দূর ছিল? এত দূর?

সে ভাবতে চাইল না, সেবোপম কেন মারা গেল। বুঝতে চাইল না, সম্পর্ক কতখানি গভীর হলে কেউ আত্মোৎসর্গ করে এবং ততখানি গভীরতা শিঞ্জিনী ও সেবোপমের মধ্যে কেমন করে হওয়া সম্ভব!

লক্ষ্মী বলতে লাগলেন—ছি ছি ছি। একই পাড়ায় বন্ধুতে বন্ধুতে, এ কী কেলেকারি। মুখ দেখাবার উপায় রাখল না।

তিনিও বুঝতে চাইলেন না, পুরী থেকে ফিরে জিনি একটি দিনও বাড়ি থেকে কোথাও যায়নি। সেবোপমের সঙ্গে কেনও যোগাযোগ বজায় রাখেনি। তাঁর মধ্যে কুটিল সন্দেহ প্রস্রব পেয়েছিল। এখন লালিত হতে লাগল। তিনি বলতে লাগলেন, প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন, গ্রেম স্মৃতি দুর্বার, যদি তা স্টেন্ড হয় তবে অগতিরোধ, তা অসমততা জড়িত, তাই অশীল—কে জানে, তারা টেলিফোনে যোগাযোগ রাখত কি না। যখন বাড়িতে জিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই তখন সেই ছেলে এসেও পড়ত কি না। হ্যাঁ, অঙ্কের মা থাকে বটে তখন। কিন্তু গরিব বস্তিবাসী সে, অজাবী। তার মুখ বন্ধ করতে কতক্ষণ!

এমনকী বিকাশও ভারতে লাগলেন—আর সন্দেহ হইল না। এতটুকু সন্দেহ হইল না।

পাড়া-প্রতিবেশী—যারা আগেই লক্ষ্মীর মুখে কিছু কিছু শুনেছিল, তেমন আমল দেয়নি, তারা বিশ্বাসে ও করুণায় তাকাতে লাগল জিনির জামালার দিকে। মেয়েটিকে দেখা যাবে কি? সে কি কাঁদছে? সেও কি ডাবছে মরে যাবে কি না! এই অপর আবেগ প্রেম, এই প্রেমিকের আত্মহত্যা, মেয়েটিকে কেমন রেখেছে। কেমন!

দেবশিশু খোঁজও নিতে যায়নি। মাথা নিচু করে হেটেছে রাজ্য। ডাবছে। মেলাতেও পারছে না। তা হলে কি আরও বেশি ছিল? আরও কিছু? শিজ্ঞানীকে পুরোপুরি অধিকার করেছিল দেবোপম? জিনির প্রত্যেকটি “না” দেবশিশুর কাছে চাকু পতিত হইয়া। প্রত্যেক নারীর নীতলতা উদ্ভাস করে তাকে। প্রেমের মতো—অবৈধ অবাদা। প্রেমের মতো সহজ সরল বিষয় পেয়ে দেবোপমের মৃত্যুর কারণে কোনও সুখ খোঁজ ও যুক্তি আলোচিত হয় না। দেবোপম যদি সত্যিই জিনির জন্য আত্মহত্যা করে থাকে তবে এই হবনের প্রয়োচনা কখন বচিও হইল। কখন যোবা গেল জিনি, দেবোপমের জন্য তেমন লভা নয় যে আত্মহনন বিনা গতি নেই! এই অল্প সময়ে এমনকী সম্পর্কটিকে জীবন-মরণ করে তোলা এমনই সম্ভব। ভাবে না কেউ। আর দেবোপম অবৈধ প্রেমিক হয়ে যায়। আর লক্ষ্মী ছেলেকে কাছে বসিয়ে আশা-উষ করেন। তোর কী কষ্ট বড়খোকা—বলেন! বলেন না—এ রকম ভারতে নেই। এ রকম করতে নেই।

আর জিনি নিজে নির্বাক হয়ে গেছে। সে প্রেমও জানে না। বৈধতা অবৈধতা জানে না। তার ও দেবোপমের মধ্যে সম্পর্কের কথা জানে না, শুধু মনে পড়ে ওই সমুদ্রজান, ওই বমিলিপ্ত পোশাক খুলতে থাকা একটি পবিত্র মুখ মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া প্রশান্ত মুখ। মনে পড়ে অন্ধকারে গভীর উচ্চারণ—

... সে এক বিষয়।

পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল,

চেনে নাই তারে ঐ সমুদ্রের জল,

রাত্রে-রাত্রে হেঁটে হেঁটে নক্ষত্রের সনে

তারে আমি পাই নাই; ...

এরপর এক টুকরো মুহূর্ত, যখন তার চোখে চোখ রেখেছিল জিনি। মনে পড়ে না কিছুই। কী ছিল চোখে? মনে পড়ে না। জিনি তো খোঁজেনি। একটুও খোঁজেনি। সে আপনি বহুটুকু বরা দিরাছিল তার মধ্যে মৃত্যু ছিল না কোথাও। অত সত্যতায়, অত পবিত্র ইচ্ছায় মৃত্যু কোথায় স্থান পাবে? সুন্দর মৃত্যুকে কোলে নিতে পারে না কখনও। জিনির বিশ্বাস হয় না দেবোপম আত্মহত্যা করেছে। তার পকেটে একটি কাগজ ছিল। দেখা—

কেউ দায়ী নয়।

পৃথিবীর সমস্ত মৃত্যুর নাম

লিখে দেয় জনক-জননী

আমিও তেমন মৃত্যু

জিনি বিশ্বাস করে না তবু। কেউ দায়ী নয়। মৃত্যুর জন্য কেই-বা দায়ী থাকে। যে মরে সে নিজেও নয়। তার হাতে দুখের ক্যান ছিল। আঁকড়ে ছিল সে।

সমস্ত জগৎ স্তব্ধ হয়ে থাকে। নির্বাক হয়ে থাকে। জিনির সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেন বিকাশ লক্ষ্মী দেবশিশু। অথবা শুধু কথা, শুধু দোষারোপ, শুধু ছিছিঙ্কারে আকাশ ভরে যায়। জিনি জানালা খুলে চেয়ে থাকে। সে জানত না অবিশ্বাস কী—জেনেছে। সে জানত না প্রেমহীন সঙ্গম কী—জেনেছে। সে জানত না এই দোষারোপ ছিছিঙ্কারের কত দুর্বহ ভার—জানছে এখন। সমস্ত আগামীকাল শূন্য হয়ে গেছে। এই বেঁচে থাকা মৃত্যুর মতো। এই দিনযাপন মৃত্যুর যাপন। সে মনে মনে মার কাছে চলে যায়। আগরতলার পথে-ঘাটে ডাক পরে দু’বিনুনি বেঁধে যোরে।

তার কুলের ইংরিজি দিদিমণির স্বর মনে পড়ে—

Fair is foul, and foul is fair,

Hover through the fog and filthy air

মনে পড়ে ইউনিভার্সিটির কথা। এস. পি. জি. সারের ভরাট কণ্ঠ—

একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমরা পাবে না কেউ খুঁজে আর জ্ঞানি;

হৃদয়ের পথ-চলা শেষ হলো সেই দিন—গিয়েছে সে শান্ত হিম ঘরে,

অথবা সান্তনা পেতে দেরি হবে কিছু কাল—পৃথিবীর এই মাইলানি

ভুলিতে বিলম্ব হবে কিছু দিন; এ মাঠের কয়েকটা শালিখের তরে

আশ্চর্য বিশ্বয়ে আমি চেয়ে র'বো কিছু কাল অন্ধকার বিচ্ছিন্নতার কোলে, ...

সে ভুলে যায়, ক্রমশ ভুলতে থাকে, কবিতাই শুধু নয়, সঙ্গীতই শুধু নয়, মৃত্যুর চেয়েও আরও বেশি অন্ধকার দাবি নিয়ে ছুটে আসে মানুষেরা। অধিকার চায়। কেউ খেতে ডাকল না, শুধাল না কেউ—খিদে পাঘনি জিনি? খাবে না? কিন্তু অভুক্ত মেয়েটিকে ধাক্কা শুইয়ে দিল পুরুষ। অধিকার চাই, তাই সে প্রায় নগ্ন হয়ে গেছে, এক টানে খুলে ফেলাছে শাড়ি। চূড়ান্ত অনিচ্ছায় ভীত হয়ে পালাতে চাইছে জিনি। আঁচড়ে-কামড়ে দিচ্ছে। অসম্ভব মানসিক প্রতিরোধ থেকে চলে যাচ্ছে শারীরিক প্রতিরোধের দিকে। দ্বিধা দিক জ্ঞানশূন্য সে, দরজা খুলে ছুটে যাচ্ছে পথ দিয়ে শায়া ও ব্লাউজ পরা অবস্থায়। খোঁপা খোলা, চোখ দু'টি বিস্তারিত, চুকে পড়ছে মিথিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সেতারির বাড়ি। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে— কাকিমা! দরজা খুলুন কাকিমা!

সেতারির স্ত্রী দরজা খুলছেন—এ কী এ অবস্থায়!... ঘরে এসো জিনি।

তিনি জিনিকে জড়িয়ে ধরছেন। জিনি কাঁপছে—ওরা আমাকে মেরে ফেলবে কাকিমা। আমি যাব না। আমি আর ওই বাড়ি যাব না।

সেতারি স্ত্রীর শাড়ি এনে তুলে দিচ্ছেন স্ত্রীরই হাতে। বলেছেন—‘ঢাকো ওকে। ঢেকে দাও। হে ঈশ্বর। এ সব কী?’ আপন নগ্নতা ঢাকতে ঢাকতে এসে পড়েছে দেবশিস। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন লক্ষ্মী আর বিকাশ। আর কিছু রইল না। আর কিছু বাকি রইল না।

দেবশিস নরম করে বলছে—চলো।

ভীত চোখে দেখছে জিনি। বলছে—আমি যাব না কাকিমা।

সেতারির স্ত্রী জিনির হাত দেবশিসের হাতে তুলে দিচ্ছেন। তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছে। তবু দিচ্ছেন। কোন অধিকারে রাখবেন মেয়েটিকে? কোন সাহসে? তাঁর প্রত্যয় হচ্ছে, মেয়েটি পাগল, সত্যিই পাগল। এঁরা এতদিনের প্রতিবেশী। কেমন করে এঁদের অবিস্থাস করেন!

জিনি ফিরে যাচ্ছে। দেবশিসের শক্ত হাতে ফিরে যাচ্ছে। সে-দিনের মতো আলো নিভেছে বিকাশের পরিবারে। কিন্তু ভোর হল। অপ্রতিরোধ্য শান্তি পাওয়ার ভোর। দেবশিস রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড চাপিয়ে দিল। পুরুষ কণ্ঠে সাবলীল বাজতে লাগল—

কোলাহল তো বারশ হল

এবার কথা কানে কানে

দেবশিস গর্জন করে উঠল—কেন গিয়েছিলে? কাল কেন গিয়েছিলে?

লক্ষ্মী চড় মারলেন জিনির গালে। বলতে লাগলেন—আমাদের সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিলে?

হাওয়া এসে ফরফর উড়িয়ে দিল কাগজ। দেবশিসের তত্ত্ব লেখা খাতার অস্পৃশ্য পাতাগুলি। বিকাশ গাছের যত্ন নিতে বা বস্তিতে নলকূপ বসানো যায় কি না এ বিষয়ে তদ্বির করতে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। ওইসব চড় মারার শব্দ বা ওইসব শাসনি ও গর্জন তিনি শুনতে পাননি ভঙ্গিতে হাত রাখলেন জ্যাকলগাছের ডালে আর তা থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ল। আর জিনি

ওইরকম খসে পড়া পাতার মতো ভুটিয়ে কাঁদতে লাগল। শীরব কান্না না। উচ্ছ্বাসে, নিঃশব্দে ভুলে, জগৎসংসার ভুলে—অন্ধর মা সেই কান্না দেখল আর শুনল, ‘বাড়ী-প্রতিবেশী শুনল কিছু দেখল না। লক্ষ্মী বললেন—মুখ অটকা। মুখ অটকা বড়খোকা, কীরকম কান্নাছে দেখ। কোলেছারী করে ছাড়বে। ...সেবাশিস লাফিয়ে উঠছে। রেবর্ত হেবারের মাথায় হাড় করে দিচ্ছে। গান বাজছে—আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে, চেয়েছিলেম তোম খান্না তারার সাথে... কান্না মিলিয়ে যাচ্ছে গানে। সুরে সুর মিলছে। আর সেবাশিস তেরায়ে দিয়ে মুখ বেঁধে দিচ্ছে জিনির। লক্ষ্মী চড় মারছেন। শশপে। সবলে। বলছেন—চুপ। চুপ। চুপ।

দুপুরবেলা, যখন বাড়িতে কেউ নেই, জিনির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে অন্ধর মা। তার চোখ থেকে জল পড়ছে। সে খেটে খাওয়া মানুষ এক, ধমক খাওয়া, ভুড়িই বাচ্চর মানুষ। তারও মেয়েরা সংসার যাপন করছে। দারিদ্রের সঙ্গে লড়ছে। কিল খাচ্ছে। কিল হজম করছে। দিচ্ছেও। আর অন্ধর মা নিজে পরম মমতায় উপার্জন করে ভাত ভুলে দিচ্ছে অসুস্থ স্বামী আর বৃদ্ধা শান্তি ও অন্ধ ছেলের মুখে। সে যখন ফিরে যায় ঘরে, শান্তি কঁপা কঁপা হাতে আলুচুড়ি আর ভাত ধরে সামনে। একটু কাঁচকলার খোসা বাটা, বলে—‘বাও। প্যাটো ভইয়া বাও। না খাইলে বাঁচবা না। গভরে বাটো, বাও শান্তি কইরা।’ সে যায়। স্বামী বাঁচবে না। তবু যায়। ছেলে অন্ধ। তবু যায়। যেহেতু দু’মুঠো শান্তির ভাত দেয় কেউ—। সে মমতাময়ী হয়ে জিনির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে—বউদি, চইলা যান বাপের বাড়ি। মার কাসে থাকেন গিয়া।

—না, না, যাব না আমি অন্ধর মা। ওরা ভাববে আমি পালিয়ে গেলাম। ওরা মাকে সব বলে দেবে। সে আমার সহ্য হবে না। আমি কি বিশ্বাস নষ্ট করেছি অন্ধর মা? আমি অন্যায় করেছি? মা কি বুঝবে আমি কিছু করিনি?

—আপনে মইরা যাইকেন, বউদি, আপনেরে মইরা ফালাইব।

—না, না অন্ধর মা। শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলবে না আমাকে। বলা, মেরে নিশ্চয়ই ফেলবে না।

সে ভুতহস্তের মতো উঠে বসে। লাল হয়ে থাকা গাল, হাড় উঁচু হয়ে থাকা, চোখের কোলে কালি—বলে যায়—

Go to, go to; you have known what you should not.

She has spoke what she should not, I am sure of that. Heaven knows what she has known.

Here's the smell of the blood still; all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. O. O. O

অন্ধর মা কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু ব্যস্তিতে ফিরে কথা রটিয়ে দিচ্ছে। বউটাকে মেরে শেষ করে ফেলল, রটিয়ে দিচ্ছে, আর সব কামেলি মেয়ে-বউরা পাড়ায় পাড়ায় কষ্টীদের কাছে গল্প রটিচ্ছে। কষ্টীরা শুনছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। বলছেন, ‘এ বাড়াবাড়ি, একটা ছেলে কী মরল, কেন মরল, বউটাকে কেন শাস্তি দিচ্ছে।’ কিন্তু কেউ খোঁজবর করছে না। নাগরিক রুচি ও শিক্ষা। নাগরিক সংস্কার। নাগরিক বিশ্বাস। পাশের বাড়ির দিকে তাকিয়ে না। আঙুন লাগলেও না। ওতে ব্যক্তিগত জীবনযাপন ব্যাহত হয়। কিন্তু আত্মনান যদি তার দেওয়ালে আটকে না থাকে, যদি বেরিয়ে আসে রাস্তায় তবে তা আর পারিবারিক থাকে না, ব্যক্তিগত থাকে না, সামাজিক হয়ে যায়। কিন্তু সমাজ বোবা-কালো-অন্ধ। তার অসাড় চেতনা জাগে না। নিলিপ্ত মানুষ অত্যাচারের শব্দ শুনতে শুনতে অর মুখে তোলে। পাশের বাড়ির ছেলেটাকে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছে। আহা! ওর মা কী করে বাঁচবে গো—বলতে বলতে অন্ধ মুখে তোলে। বলতে বলতে নিজের ছেলের জগদীন পালন করে শাখ বাড়িয়ে। পাশের বাড়িতে

তরুণী বধুর কন্না শোনা যায়। শিল্পী মানুষ, শ্রমী মানুষ চোখে বন্ধ করে সেভাবে মাগোয়া লাগান। আর লক্ষ্মী জিনিকে কামারহাটির পীরবাবার থানে নিয়ে যান। সংসারের কল্যাণে, ছেলের কল্যাণে সাবক সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যান। সন্ন্যাসী রক্তলাল চোখে গাছের মুখে বলেন—‘হম—বশীকরণ চাই—এ রকম কেস কত করেছি—এমন মস্ত দেব, ছেলের পায়ে লুটোবে।’ তিনি ছক কাটেন। আঁক কাটেন। জিনির চোখ পরীক্ষা করেন। চুল দেখেন। জিনি ভয় পান। কাতরায়। উদ্বেগে কাঁপে। সেই মুহূর্তে এমনকী শান্তিকৈও বড় অঙ্গন লাগে। হাত।

সন্ন্যাসী বলতে থাকেন—নারী চিত্রিনী, নারী তরুণী, হেমন্তে তরুণী ভোগ্যা, সজ্জায়ে অরুণ গাঢ়, উজ্জট মৈথুনে হুট্টা, রাত্রির প্রথম প্রহরে ভূমি স্মারিতে গমন যনবে মোচার বাসের সঙ্গে জাতিফল ও পান ভক্ষণ করবে।

সন্ন্যাসী হুলস্থ প্রদীপের শিখা বৃদ্ধি করে জিনির চোখের সামনে ঘোরাতে থাকেন। ভুল উচ্চারণে মন্ত্র পাঠ করেন। জিনি সেই উচ্চারণ অশুদ্ধতা উপলব্ধি করে কিছু শুনে যায় প্রতিবোধহীন—

তৎক্ষণং দীপ্তে চক্রে মোহমায়াতি কামিনী।

শরনে বা প্রসঙ্গে বা পিবা।

জিনির চোখের সামনে থেকে সারা পৃথিবী উখাও হয়ে যায়। সন্ন্যাসী তাকে একটি ছোট পিড়িতে বসিয়ে দেন। পিড়িটি ঘুরতে থাকে। জিনি তাকায়। একটি ঘূর্ণায়মান আলোকচক্র তার চেতনাকে সামগ্রিক অধিকার করে। সে শুধু শুনতে পায়—

যঃ সূর্যোণ পিবেচ্ছত্রং স ভবেশ্বকরধ্বজঃ ।

শিবমালিন্দ্রতে শক্ত্যা প্রসঙ্গে দক্ষিণেইপি বা।

তৎগান্ধাপয়েদ্ বস্ত্র মোহয়েৎ কামিনীশতম্।

তার জ্ঞান লুপ্ত হতে থাকে। সে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে যায়। ঘূমে জাগরণে ভয়ঙ্কর আলো তাকে তাজ করে ফেলে। শিল্পিনী নামের সহজ সরল কবিতা-পাণ্ডল মেয়ে ক্রমে উন্মাদিনী হয়ে যায়। বিকাশ বিপর্যস্ত বোধ করেন। জিনির মা ফোন করেন—জিনি—

লক্ষ্মী বলেন—জিনি অসুস্থ। শুয়ে আছে।

—কী হয়েছে?

—ভেতন কিছু না। শুয়ে আছে।

—ফোন ধরতেও পারবে না?

লক্ষ্মী রিসিভার নামিয়ে রাখছেন।

জিনির বড়দাদা, মেজদাদা, ছোটদাদা ফোন করছেন—

—জিনি কই, জিনি—

জিনির সাড়া নেই। দেবাশিস ফোন ধরে না। বিকাশ ফোন ধরেন না। তাঁরা পিসিকে খবর দেন। অধ্যাপিকা পিসি ছুটতে ছুটতে আসেন। এতদিন আসেননি, ফোনে খোঁজ নিয়েছেন, অনুভূ অধ্যাপিকা পিসি নববিবাহিতা ভাইঝির সংসারে আসতে লজ্জা পেতেন। এবার এসেন। প্রত্যেকের শীতল বাবহার। জিনি শুয়ে আছে। অস্থির। পিসি বলেন—কী রে?

আলোর ফাঁদ সরে যাচ্ছে জিনির চোখের সামনে থেকে, বলছে—ও আমাকে খুব ভালবাসে পিসি। তোমরা ভয় পেয়ো না।

সে আবার উচ্চারণ করে—Here's the smell of the blood still; all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. O, O, O.

—কী বলছিস জিনি?

—ভালবাসে। খুব ভালবাসে।

—কে?

—ও। আমাকে বলেছে, অন্য একটা বাড়িতে নিয়ে যাবে।

—কে নিয়ে যাবে? কোথায়?

জিনি উত্তর দেয় না। শূন্য হয়ে যায়। বোবা হয়ে থাকে। লক্ষ্মী পিসিকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে যান। প্রচুর চা-জলখাবার সাজিয়ে জিনির চরিত্র সম্পর্কিত কটুবাক্য পরিবেশন করেন। পিসির গলা বন্ধ হয়ে যায়। চোখে জল আসে। ভাইবির স্বত্তরবাড়ি থেকে খালি হয়ে বাসেন তিনি। ফোন করেন—তোমরা ভাড়াবাড়ি এসো। আমার ভাল চলেছে না।

তখন, শিবতোষ ডাক্তারের কাছে গিয়ে কৌদে গড়ে দেয়াশিশ। ডাক্তার তাকে মসৃণ কভোমের সন্ধান দিয়েছিলেন। এখন স্ত্রীকে সুস্থ করার ওষুধের সন্ধানও দিয়ে ফেলেন একরকম। সাধারণ এম বি বি এস ডাক্তার। দারুণ ব্যস্ত কেননা এলাকায় ডাক্তার অপ্রচুর। তিনি রোগিবীকে না দেখে ওষুধ মনস্থ করেন। ব্যবস্থাপত্র না করে একটা ডিরকুটে ওষুধের নাম লিখে দিতে দিতে বলেন—ওভারডোজ যেন না হয়। সাবধান।

ব্রজগোপাল ওষুধের নাম পড়েন। প্রশ্ন করেন—কে খাবে?

—আপনার বউমা।

—বউমা?

ব্রজগোপাল জ্র কঁচকে ভাবছেন। পরেশবাবুর হেলেকে জড়িয়ে নানা কথা আলোচনা হচ্ছে বিকাশের বউমাকে নিয়ে। বিকাশকে তিনি কোনও প্রশ্ন করেননি। ইদনীং তাঁর আসাও কমে গেছে। শুনেছেন, মেয়েটি পাগল। তাকে দেখে ব্রজগোপালের তা মনে হয়নি। তিনি ভাবেন, কে জানে, মানুষকে দেখে তো কিছু বোঝা যায় না। তিনি ওষুধ বার করে দেন। এ ওষুধের জন্য অতিরিক্ত অনুমতিপত্র করাতে হয়। ব্রজগোপালের সে কাগজপত্র নেই। তবু, দেবাশিস পুরনো বন্ধুর ছেলে, প্রতিবেশীর ছেলে, ব্রজগোপালের ছেলের বন্ধু, তিনি নিশ্চিত মনে ওষুধ দিয়ে বলেন—ডাক্তার কে? প্রেসক্রিপশন কোথায়?

—শিবতোষদা দিয়েছেন।

—অ।

আবারও নিশ্চিত বোধ করেন ব্রজগোপাল। শিবতোষ পাড়ার ছেলে। পাড়ার ডাক্তার।

দেবাশিস ওষুধ নিয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবে—ওভারডোজ যেন না হয়।

বাড়ি ফিরে মাকে ওষুধ দেখায় সে। বলে—ভাল হয়ে যাবে। শিবদা বলল। তবে ওষুধটা কড়া। ওভারডোজ যেন না হয়।

লক্ষ্মী ছেলের দিকে তাকান। বলেন—ক'দিন ছুটি নে। বাড়িতে থাক। নিজে ওষুধ খাওয়া বউকে। দেখিস, ওভারডোজ না হয়।

এবং ওভারডোজ হয়ে যায়। দেবাশিস ছুটি নেওয়া সত্ত্বেও নিজে সতর্কভাবে ওষুধ খাওয়ানো সত্ত্বেও ওভারডোজ হয়ে যেতে থাকে। অন্ধর মা দেবতে পায়—বউদিমণি কঁরকম নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকছে আজকাল। মড়ে না। কথা বলে না। শুধু চোখ চেয়ে থাকে। চোখের পাতাও পড়ে না। বউদিমণিকে ডাক দিয়ে দু'টি কথা বলার ইচ্ছা হয় তার, কিন্তু দেবাশিস সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো আগলে রাখে জিনিকে। এবং সে দেখতে পায়, এক সম্মান উদ্ভাস্ত দুই দাদা ও পিসি এ বাড়িতে উপস্থিত হলেন। অদরের বোনকে দেখে বড়দাদার বুকে বাথা করতে লাগল। তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন। মেজদাদা দেখলেন জিনি প্রায় জীবন্ত হয়ে আছে। দেবাশিস ও লক্ষ্মী সবিনয়ে জানালেন—জিনির চরিত্রলক্ষণ ভাল ছিল না। পাগলামি ও বিকৃতি দুই-ই দেখা দিয়েছিল। তাকে শাস্ত করার জন্য, ঘুমের ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। মেজদাদা ট্যান্ড্রি ডাকেন। দুই ভাই ও পিসি মিলে ধরাধরি করে নার্সিংহোমে নিয়ে যান। লক্ষ্মী, বিকাশ বা দেবাশিস এই নিয়ে যাওয়া কালে সঙ্গী হন না কেউ। ডাক্তার গম্ভীর হয়ে যান। তৎপর চেষ্টা



করেন তিনি। তারপর জীবনের ডাক্তার মাথা নাড়েন। কিছু করার নেই। সমস্ত আধুনিক প্রচেষ্টা ও পর্যাপ্ত প্রার্থনা এড়িয়ে মরে যায় তিনি।

বড়দাদা খানায় ছুটে যান। বোনকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করেন। মেজনাদা পাটি অফিসে ছুটে যান। পিসি করুণ মিনতি করেন। তৃণাকুর ও নীলিমার বাড়ির তলায় পাটি অফিসে গোলমাল বেঁধে যায়। অনিসুজ্ঞামান, নীলোদা, নীলিমা ও তৃণাকুর নেমে আসেন। পিসি তৃণাকুরকে দেখে কাঁদেন। তৃণাকুর তারই কলমেদের অধ্যাপক, এখানে থাকেন, তিনি জানতেন না। সি পি এম নেতা শ্যামকান্ত ক্ষেপে ওঠেন। তাঁর সহকর্মীর স্বর্গে ওঠে। দলমত নির্বিশেষে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিক্রার দিতে দিতে বিকাশের বাড়ি ঘেরাও করে পাড়ার লোক। ব্রজসোপাল আপনি বাঁচতে আরও লোক খোঁসিয়ে দেন। বলেন—শিবতোষ ডাক্তারই জিনিকে মেরে ফেলার ওষুধ দিয়েছে। এবং জানাতে ভালেন না—সে ওষুধ তাঁর কাছে চাওয়া হয়েছিল। তিনি দেবার অক্ষমতা জানিয়েছেন। লোক শিবতোষের বাড়িও ঘেরাও করে। মল্লিনাথ ডাক্তারের মতো নদাশিব নয় বলে শিবতোষের জনপ্রিয়তাও নেই। তাঁর বাড়িঘরে নির্মম ভাঙচুর হয়। গণপ্রহারে বিমবস্ত হন শিবতোষ। তাঁর নাক ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। সারা মাথুরের গড়, সারা ফটিকবিল বস্তির মানুষ, উদ্ভাস্ত কলোনির সব, ভদ্রজনবেশে খুনি দেখতে ছুটে আসে বিকাশের বাড়ির কাছে। জিনি মরে গিয়ে করুণা ঝরায়। মানুষকে প্রতিবাদী করে।

প্রতিবাদী মানুষ পুলিশের কাছে বহুহত্যাকারীকে ফেলতারের আর্জি জানায়। মূল দরজা বন্ধ করে লক্ষ্মী ক্রমাগত বিকাশকে বলেন—ফোন করো। মিনিস্টারকে ফোন করো।

বিকাশ কোনও কথা না বলে ছোট্টছেলের ঘরে চলে যান। কাচ ভেঙে যাওয়া ছবিটি বার করে বলেন—অন্যায় করেছে, না? পাপ করেছে, না? পাপের শাস্তি নিলে তুই আমাকে ক্ষমা করবি তো ছোট্টখোকা?

ছেলের কপালে চুখন করে বেরিয়ে আসেন বিকাশ। দরজার ছিটকিনি খুলে দেন। সামনে পুলিশ। ওরাই দেবার্ডনকে হত্যা করেছে। ওদের কাছে সরাসরি যেতে পারবেন না বলে বিকাশ প্রণবেশকে নিয়ে খানার সামনে থেকে চলে এসেছিলেন একদিন। ওদের সঙ্গে মুখোমুখি হবেন না বলে মাদকাসক্ত ছেলেদের ধরিয়ে দেবার জন্য ফোন করে খবর দিয়েছিলেন তিনি, তারা সব ছাড়া পেয়ে মাদক ছেড়ে মদ সেবন করে এখন। আর বিকাশ পুলিশের মুখোমুখি হন শেষ পর্যন্ত। বলেন—চলুন।

একে একে বেরিয়ে আসেন লক্ষ্মী আর দেবশিশ। যে-চিংকার চাপা দেবার জন্য জিনির মুখে তোয়ালে বাঁধা হত আর জোরে জোরে বাজিয়ে দেওয়া হত রবীন্দ্রসঙ্গীত, তার চেয়েও বড় চিংকারে কান ফেটে যেতে থাকে তাঁদের। স্তব্ধ, ব্যথিত ও ঘেমার কুঞ্চিত মুখে পাড়া-প্রতিবেশীর সামনে দিয়ে একে একে পুলিশের গাড়িতে ওঠেন এক মৃত নকশালের মা-বাবা-ভাই, তারা বহুহত্যার দায়ে অভিযুক্ত।



অনুপম, ভাইয়ের মৃত্যুর পরও যা পড়ার কথা ভাবেনি, তা-ই আজ খুলে বসেছে সঙ্গে থেকে। শিজিনীর মৃত্যুর পর কোনও এক গুপ্ত তড়িনা তাকে টেনে এনেছে দেবোপমের ভায়রির কাছে। দুপুর থেকে বিদ্যাহ নেই। সে মোম জ্বলেছে। পড়ছে—ভাগ্যিস গিয়েছিলাম পুরী। ভাগ্যিস। ভাই আমার ঘণা পূর্ণ হল। মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হল। কী ভাল হল আমার? কতটা ভাল

হল? সব ভাল। সব ভাল। যা হল সব। কে জানে! হয়তো এই ভালটুকুর জন্যই সে-দিন ক্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ার পরও আমার ঘুম আসেনি। আমার জায়গায় দাঁড়া হলে বলত—ঈশ্বরের ইচ্ছেই আমাকে জাগিয়ে রেখেছিল।' কিন্তু আমার জন্য কোনও ঈশ্বর নেই। আমার সবটাই ঐশ্বর্যহীনতা। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কিছু ঘটনা পরস্পর চলে যাচ্ছে আমার ওপরে দিয়ে। স্পর্শ করছে আমাকে। আর আমি তার বিষ নিচ্ছি। কেউ কোঁট বিষ নিতে জানায়। এই পৃথিবীতে এই গরলপায়ীদের বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। আমারও নেই। কোনও অর্থও হয়না বেঁচে থাকার। আমি শুধু বিশ্বাসের সঙ্গে ঘটনা পরস্পরের কথা ভাবি। যদি শেষদৃশ্যটা আগে দেখে ফেলতাম আর জিনিষ অপূর্ণ চোখ দু'টি ওই দৃশ্য দেখার পর আমার কাছে অমৃত নিয়ে আসত, তবে, হয়তো মৃত্যুর প্রতি বীতশ্রু হয়ে পড়তাম আমি। আর মৃত্যুর সঙ্গে তা চুড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা হত। আমার সমস্ত যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য এককাল একমনে আমি শুধু মৃত্যুকেই প্রার্থনা করেছি। দানার কথামতো ঈশ্বর যদি সত্যিই কোথাও থাকেন, তবে তার নামে শপথ করে বলি, শুধু যদি ওই চোখ দু'টি তিনি আমাকে দিতেন তবে আমার সমস্ত যন্ত্রণার বিনিময়ে কামা মৃত্যুকে, আমার আরাধ্য মৃত্যুকে, ফাঁকি দিতাম আমি। আমি বাঁচতে পারতাম। এই একপাক্ষে ভাল যে আমাকে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত বদলাতে হল না। কে জানে, যদি সে আমার হত, তবে হয়তো আমার জীবনের বিষ তাকেও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিত!...

দু'হাতে মুখ ঢাকল অনুপম। ভাবতে লাগল মনে মনে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের কাছে মাথা কুটতে লাগল—ঈশ্বর! ওদের মধ্যে তো এতটুকু বিষ ছিল না। তবু ওদের মৃত্যুর মধ্যে ঢুকে পড়ল অমোঘ অনিবার্য বিষ।' তার কান দু'টি আমূল উফ্ফ হল। শ্বাস বন্ধ হয়ে এল বুকের তলায়। সে পড়তে লাগল—যদি ধরেই নিই, শবরী বোস বাবা ছিল অরুণ সেনের কাছে যেতে, যদি ধরেই নিই আমার জন্ম রচিত হওয়ার কেল্যে শবরী বোস ইচ্ছে-অনিচ্ছে প্রকাশ করার সুযোগ পায়নি, তবে তার মাতৃমূর্তিতে নাগ কিছু কম পড়ে। আমারও যন্ত্রণা একটু প্রলেপ লাগে এই ভেবে যে মানুষ অসহায়তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু কোনও এক আসন্ন প্রত্যয়ে আমি যদি আমার চিরযৌবনা মাকে নয় দেখি, যদি দেখি তার ঠোঁট শুধু নিচ্ছে আমারই সুজন, সহপাঠী, আমারই বন্ধু অরুণ বিশ্বাসের ঠোঁট—যদি, দেখি এক অসংলগ্ন আলিঙ্গন ও সঙ্গমের দৃশ্য যা বিকৃত, অবৈধ, অপ্রাকৃতিক, যা শুধুমাত্র বিশ্রী রিকট কামনার উৎসার ঘটায় এ পৃথিবীতে, যার জন্য প্রায়-বৃদ্ধা আমার মা বোনতা ঘটিয়ে গেলেন পূত্রতুলা পুরুষের সঙ্গে—তবে পৃথিবীর একজনও কি বলবে আমার জীবনের প্রতি ঘণার যোলকলা পূর্ণ হল না। সুতরাং আমি পূর্ণ। আমার দৃষ্টি পূর্ণ। আমার এককালের বেঁচে থাকা পূর্ণ এবং সার্থক। এই সার্থকতার অপেক্ষাতেই এককাল আমার মৃত্যু হয়নি। কিন্তু—কিন্তু—আমি কী করি। কী করব আমি। সমস্ত অবিশ্বাসের পর, সমস্ত নোংরা, বিশ্রী, বিচিত্র জীবনধর্মের পর, আজ মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতেও আমার শেষবারের মতো বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে। প্রথম আমার কানওকে বলতে ইচ্ছে করছে—আমাকে বাঁচাও। বাঁচতে দাও। আমাকে নিয়ে চলে। এই পৃথিবীর এমন কোনও জায়গায় যেখানে যন্ত্রণা নেই...। বলতে ইচ্ছে করছে—আমাকে নেবে গো? নেবে? ওই বুকের মধ্যে একটুখানি নিয়ে আমার ভালবাসবে গো...।

সে-দিন মরণ ব্রিজটা ভাল করে দেখে এসেছি। মরার জন্য ওর চেয়ে ভাল, নিরুপদ্রব, নিরিবিলি জায়গা আর সত্যিই নেই এখানে। অন্ধকারে যারা খুন হয় তাদের শরীর ওই জায়গায় ফেলে রেখে যায় চতুর খুনির দল। আর মৃত্যুর মুখোমুখি যারা হয়, স্বেচ্ছায় বা অচমকা, তারা জানে, ওই মরণ ব্রিজে ট্রেনের খাতব ঢাকা বুক পিষে অবলীলায় চলে যায় আল্লাদে সিঁটি দিতে দিতে। আমি জানি, আমি দুখ আনতে যাব, খাটালের গোরুগুলো প্রশান্ত মুখে আমার পায়ে ভরে দেবে। সেই দুখ খেয়ে আমার মা চিরযৌবনা, একটির পর একটি জড়িয়ে ধরবেন পুরুষ। তাঁদের বয়সের তফাতে কোনও সীমা-পরিসীমা থাকবে না। তাঁর নীত খসে যাবে, ঢুল সাধা হবে,

পায়ের চামড়া দোল হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি কামনাময়ী থাকবেন, চিত্তের ওঠার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর একটি শব্দ সর্বদা পুরুষ প্রয়োজন হবে। আমি সে-দৃশ্য দেখার জন্য আর বেঁচে থাকতে চাই না। আমি আগ্রায় সেবেজিয়াম আমার নীরবতা মা অকণা সনের শরীরে শরীর বিছিয়ে শুয়ে আছেন। আমি দেখেছি, পরেশ বোস মদ খেয়ে তাঁকে বোকা বলার পরও তিনি মঞ্চরাস্তে পরেশ বোসের বিছানায় শিংকার রচনা করছেন। শেষ পর্যন্ত পুরীর সমুদ্ররাস্ত্রে দেখলাম অজাপের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি থাকছেন তিনি। আর আমি কিছু দেখব না। আর আমি কিছু দেখতে চাই না।

আমি দুধ ভর্তি বকরকে সিটলের পাত্র নিয়ে উঠে আসবে মরল ব্রিজের ওপর। তখন শুষ্ক ক্ষিপ্ত সকাল হতে থাকবে। লৌহবলচে আসবে একটা ট্রেন আর ড্রাইভার আমাকে দেখে সিটি বাজাবে কিছু থামবার অবকাশ পাবে না। আমি রেললাইনে শুয়ে পড়ব। আমার পেটের ওপর দিয়ে শান্তির মতো চলে যাবে গোটা একটা ট্রেন। আমি দুধের পাত্র আঁকড়ে ধরে থাকব। হয়তো পাত্রের ঢাকনা খুলে যাবে। আর আমার যন্ত্রণা, পাত্রের দুধ, গড়িয়ে গড়িয়ে মিশে যেতে থাকবে আমার রক্তের সঙ্গে। আমার শরীরের নীচের দিকটা ব্রিজ থেকে কুলতে থাকবে শূন্যে। আমি মারা যাব। এবং শেষ পর্যন্ত, দুধকে আর দুধ বলে চেনা যাবে না।

জিনি কি কোনওদিন জানতে পারবে—কেন মরলাম। কেন বাঁচলাম না। জানবে না। কিছুই জানবে না ও। জানবে না, শুধু চোখ দুটি দিয়ে কতখানি বেঁচে থাকা ও মিতে পেরেছিল আমাকেই।

কিছু কথা রেখে যেতে চাই। জিনির জন্য। শুধুই জিনির জন্য। আমার তো নিজের কোনও কথা নেই। ভালবাসি—বলতেও শিখিনি। যে কবিতাটি, সামান্য সময়ের জন্য হালও ওর চোখ দুটি আমার চোখে রাখতে পেরেছিল—সেই কবিতাই হোক আমার শেষ কথা বলা।...

অনুপমের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মস্তিষ্ক ফেটে যেতে চায়। কিন্তু সে সংঘম হারায় না। নিজের যন্ত্রণা নিজের মাথায় রাখতে চেয়ে দু'হাতে গলা টিপে ধরে। দু'হাতে চুল টানে। অস্থির পাগলপারা হয়। ছেঁড়া, ফটা দেবোপমকে সে-ই প্রথম দেখেছিল। যেমন-যেমন লেখা আছে ডায়রিতে, তেমন-তেমনই হয়েছিল দেবোপমের। শুধু ব্যতিক্রমের মতো অল্প দূরে পড়েছিল মাথা-খ্যাতলানো ফুলরেণু। সে কি বুঝেছিল, দেবোপম মারা যাবে সে-দিনই, সেই সকালেই! দেবোপমের লেখা থেকে বোকা যাচ্ছে, তার মৃত্যুর অভিপ্রায় ফুলরেণুর কাছে গোপন ছিল না। দেবোপমকে বাঁচানোর জন্যই কি ফুলরেণু সকাল-সন্ধ্যা পাহারা দিয়েছিল মরণ ব্রিজ আর খুঁটে দেবার ছলে লক্ষ করেছিল দেবোপমকে। তাকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এসেছিল যখন তখন ঝুঁকো অশক্ত শরীর আর সামলাতে পারেনি। শাস্তা খেয়েছে ট্রেনে, আর চুরমার হয়ে গেছে। এত কিছু বলার জন্য, ব্যাখ্যা করার জন্য, কেউ আর নেই। অনুপম দুই চোখে হাত রাখল। হাত ভিজে গেল। চোখ মুছে সে ডায়রির পাতার দিকে স্থির হয়ে চেয়ে রইল আরও কিছুক্ষণ। পড়তে লাগল—

তুমি তো জানো না কিছু—না জানিলে,  
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ করে;  
যখন ঝরিয়া যাবে হেমন্তের ঝড়ে—  
পাথের পাতার মতো তুমিও তখন  
আমার বুকের 'পরে' শুয়ে রবে?  
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন  
সেদিন তোমার!...

অনুপম ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। জীবনের প্রতি তীব্র চিন তারও আলাগা হতে থাকে। সমস্ত প্রশান্তি ভেঙে উঠে আসে ঘৃণা। সে টের পায়, দেবোপমের ডায়রি তাকে অধিকার করে আছে।

তার দম বন্ধ হয়ে আসে। একটু বাতাসের জন্য সে বালকনিতে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ শ্বাস নিয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসে নীচে। অন্ধকারে জানালাব কাছে দাঁড়িয়েছিলেন শবরী। তাঁর আর ঘুম নেই। অনুপম করুণা বোধ করে। আস্তে ডাকে—মা।

শবরী ফিরে তাকান। তাঁর নিটোল মুখে আজও শোকের চিহ্ন পড়েনি। অনুপমের মনে হয়—এও এক অভিষাপ। এতখানি দুঃখে-শোকেও এ রকম নিটোল হয়ে থাকে। সে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। চুপ করে দেখতে থাকেন শবরী। তিনি কি দরজা বন্ধ করলেন? অনুপমের পিছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে না। সে নির্জন অন্ধকার রাস্তায় পা রাখাে। হঠাৎ এই ঘূর্ণিঝড়ে নিজেকে খুব একা লাগে তার। দেবোপমের না-থাকাকে মনুন করে উপলব্ধি করে সে। নিজের অজান্তে অপরিবর্তিতভাবে এসে দাঁড়ায় দেবশিসের বাড়ির সামনে। তিনি নেই। ঘুমিয়ে নেই। বেঁচে নেই। তার আত্মা কি এখনও ঘুরছে এ বাড়িতে? পুলিশের সিল করে দেওয়া দরজার প্রান্তে বসে পড়ে অনুপম। দেবোপম ও শিল্পিনীর জন্য বুক ভেঙে কাঁদতে থাকে ব্যক্তি রাত।

একসময় অন্ধকার ফিকে হল। লাল হয়ে এল আকাশ। হরিচরণ তার পরিচ্ছন্নতার সরঞ্জাম নিয়ে পাড়ায় পৌঁছল। তার মুখ প্রসন্ন হওয়ার কথা ছিল। মা সন্তোষীর কৃপায় সে একটি কন্যারও লাভ করেছে। রামজির কৃপায় তার সংসারে কোনও অশান্তি নেই। হনুমানজির আশীর্বাদে নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান আছে সন্তানবো। কিন্তু হরিচরণের মুখে প্রসন্নতা নেই। সে ভাল আছে। কিন্তু তার চারপাশে যারা আছে তারা কেউ ভাল নেই। এই পাড়া, যাকে পরিচ্ছন্ন রাখবার পবিত্র কর্মটি সে সমাধা করে, তার গায়ে পায় বুক শুধু কষ্ট। হরিচরণ আনমনে আলগোছে সমস্ত বাড়ির দিকে চোখ রাখাে। কোথাও শান্তির প্রত্যক্ষ নামে না। তার দুঃখ হয়। কিন্তু তার দুঃখবোধে কারই বা কী উপকার হবে। ঈশ্বর তাকে দিয়ে যে পবিত্র কর্মটি করিয়ে নিচ্ছেন সেটি সমাধা করতে গিয়ে সে শুধু চারপাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারে মাত্র। এবং দেখতে পায় বহু বিচিত্র মানুষ। বহু ঘটনা। দেখা বিনা আর কী-ই বা সে করতে পারে। কুঁজি ফুলরেণুর জন্যও তার কষ্ট হয়। কতদিন ওই ক্লাবের পাশে, রেললাইনের চালে বিশ্রাম নিতে নিতে গল্প করেছে তারা। কত বৈধ-অবৈধ দৃশ্য দেখেছে। দেখেছে কত ক্ষয় এবং অপব্যয়িত জীবন। রেললাইনেই ফুলরেণুর জীবন ছিল। ওখানেই মরণ হল তার।

আর অন্ধর মা, তারও জন্য হরিচরণের বুক টনটন করে। এত সহ এত ভাল মানুষ—স্বামীটি কাজ থেকে বসে গেল। কিছুকাল আগেও সে রিকশা চালিয়ে ভাল আয় দিয়েছে। এখন রোগে-ভোগে বিছানায় পড়ে আছে। কদিন বাঁচে কে জানে। নিয়মিত সন্তোষী মা'র পূজা করে অন্ধর মা। তুলসীর মতোই। তুলসীর প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে। অন্ধর মা'রও কি হবে না? স্বামীর আরোগ্য প্রার্থনা করে অন্ধর মা। ছেলের জন্য দৃষ্টিশক্তিও কি প্রার্থনা করে না? হরিচরণ জানে না। তবে অন্ধর মা'র আয়গায় সে থাকলে নিশ্চয়ই প্রার্থনা করত।

ওই পারশবাবু আর তাঁর বউয়ের জন্যও কষ্ট পায় হরিচরণ। এটা ঠিক যে পরেশবাবুর বউ বাড়ির সামনেটা ময়লা করে রাখেন এবং তাঁদের নিয়ে বহু রটনা আছে এই পাড়ায়। কিন্তু তাই বলে তাঁদের পুত্রশোক মোটেই প্রার্থনীয় ছিল না। দেবোপম যে-দিন মারা যায় সে-দিন সকালে হরিচরণ অরুণ সেনের উঠানের আবর্জনা পরিষ্কার করছিল। প্রচুর আসবাব তৈরি হচ্ছিল তাঁর বাড়িতে। তাই কাঠের ছাল ও গুঁড়ো জামে পাহাড় হয়ে ছিল। ওগুলো ছাালানির কাজে দিয়া ব্যবহার করা যায়। সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলে একটা বস্তাও এনেছিল হরিচরণ। সব কুড়িয়ে-কাচিয়ে যখন বস্তায় পুরছে তখনই সেই সাংঘাতিক সংবাদটি পরিবেশিত হয়। কোনওভাবে তা পৌঁছয় অরুণ সেনের কানে, কোনওভাবে পৌঁছয় পরেশ বোসের কানেও। অরুণ সেন খবর পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামছিলেন তখন আর পরেশ বোসের একটি ঝড়ো আবির্ভাব ঘটেছিল উঠানের দরজায়। একটি উঠান—যেখানে দেবোপম খেলা করেছিল শৈশবে—মাঝখানে রেখে দুইজন পুরুষ পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর এগিয়ে

এসেছিলেন পরস্পরের দিকে। কে কাকে টেনে নিলেন বোঝা যায়নি। অরুণ সেনের প্রায়বৃদ্ধ কিন্তু দীর্ঘ সুন্দর শরীরের চওড়া বস্ত্র মাথা রেখেছিলেন বকিয়ার মাথা যে সন্ধ্যা পরেশ বোস। বহুক্ষণ দু'জনে জুজু হয়ে ছিলেন। স্থির। হরিচরণ কপালের কুটির—যুগে—যা কিনা দাড়া সহজেই—দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল আর দু'বে বোধ করছিল। সুব্রতন অরুণ সেনের ছাদ ছাড়িয়ে উঠে পড়েছিলেন অনেকটা।

বিকাশের বাড়ির কাছে এসে নাজুল হরিচরণ। আর কোনওমি এ বাড়িতে তাকে ঢুকতে হবে না। সন্মতে হবে না লক্ষ্মীর ছিঃ ছিঃ—ছুঁয়ে না, ছুঁয়ে না ধরনি। লোকের বলাবলি করছে ওঁরা নাকি ছাড়া পেয়ে যাবেন। আগরতলা থেকে যে বাসরা এসেছেন শিজিনার—তাদের একজনের কঠিন হৃদরোগ দেখা দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে বোসের কোকেই তিনিও হততো আর বাঁচবেন না। এবং ওই তরফের লড়াই থোমে যাবে। বিকাশরা তখন এ পাড়াতেই বসবাস করবেন? হয়তো নয়। পাড়ার ছেলেরা সব একছোট। বহুহত্বাকারী নোংরা পরিবারটিকে পাড়ায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। হরিচরণ সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে বিকাশের বাড়ির কাছে ভান নামায় এবং দেখতে পায় অনুপম দুয়ারে বসে আছে। সে কোনও কথা বলে না। অনুপমও হরিচরণকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। তার পোশাকে ধুলো। চুলে ময়লা। কান্না জড়ানো রাতজাগা চোখ লাল। ফোলা। জ্বালা। সকাল হল। তাকে ফিরতে হবে। কোথায় ফিরবে সে? কোথায়? দেবোপমের ডায়রি তাকে চিরকালের জন্য নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে। পরাজিতও করেছে বোধহয়। সেইসঙ্গে চির আশ্রয়হীন। সে উপলব্ধি করেছে, সে আর কোনওদিন ভাল থাকবে না।



তিনদিন যাওয়া ছিল না, ঘুম ছিল না অন্ধর মার। বস্তিতে সে প্রহার মেখেছে। কিন্তু হত্যা দেখেনি। তার বুক কান্নায় উপচে আসে। সে তো দেখেছে তত নিষ্ঠুর মারের পরও মেয়েটা বলত—‘ওরা আমাকে মেরে নিশ্চয়ই ফেলবে না, বলে।’ কত বিশ্বাস করত মেয়েটা। অথচ ফেলল তো, মেরে ফেলল তো! তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—‘তুমি কী দেখেছ?’ অন্ধর মা ধীরে ধীরে সব বলেছিল। বারবার বলেছিল। যেমন সে গল্প করত বস্তিতে এসে, তেমনই বলেছিল। সনাত অহারের কথা। লোকের বলছে, তাকে নাকি কোর্টে যেতে হবে। কথা বলতে হবে জজ সাহেবের সামনে। রুলবে অন্ধর মা। সেইসব কথাই আবার বলে আসবে। অনেকে বলছে কোনও শাস্তিই ওদের হবে না। অন্ধর মা জানে, এখানে চোরের সাজা হয় না। খুনিরা ঘুরে বেড়ায়। আর যারা একটু ভাল কাজ করতে চায়, গরিবের হয়ে দু’কথা বলতে চায় তাদের ধরে ধরে জেলে পুরে দেওয়া হয়। গুলি করে মেরে ফেলে দেওয়া হয় পাথর-ঘাটে। এ সব কথা মাস্টার আগে প্রায়ই বলত। অন্ধর মা জানে মাস্টার কখনও ভুল বলে না। শুধু একটি কথা ছাড়া। সে বলে—ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর কোথাও নেই। মানুষই সব। অন্ধর মা জানে, ঈশ্বর আছেন। ভগবান নেই তা হয় নাকি। তিনি না থাকলে এই দুনিয়া কেমন করেই-বা সৃষ্টি হল? সুতরাং মানুষের ন্যায়-অন্যায় বিচার-অবিচারের পরও তার শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে থাকেন ঈশ্বর। তাঁর আদালতে শেষ পর্যন্ত সকলের বিচার হবে এই ভরসায় আবার কাজ ঈশ্বরে বেরোয় সে। পাঁচ বাড়ির কাজ না হলে তার চলবে না। ঈশ্বরের কাছে সে যখন লক্ষ্মীদের শান্তি প্রার্থনা করছিল তখন অঙ্ক বলেছিল—ওরা রাগে খুঁতোতে পারবে না। ওদের হাতে সারাক্ষণ রক্ত লেগে থাকবে। চোখ বন্ধ করলেই ওরা দুঃখের দেখাবে রক্ত, রক্ত, শুধু রক্ত। বারবার হাত ধুতে ছুটবে



কার্তিক বিলের মতো কোনও হ্রদে আর তার নীল-সবুজ জল লাল হয়ে থাকবে। তবু ওদের হাতে রক্ত লেগে থাকবে।

অন্ধর মাও সেই ভরসায় আছে। রক্ত লেগে থাকবে। ওদের হাতে নিশ্চয়ই রক্ত লেগে থাকবে।

কালীতারা একটা কাজের কথা বলছিল। তার বাড়ির দিকেরই হাটছিল অন্ধর মা। রাধিকার বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল দুয়ারে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে কার্তিক। অন্ধর মা অবাক মনে গেল। কালীতারার বাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবতে লাগল—আশ্চর্য! এসেছে লোকটা। অথচ এতদিন একটা খোঁজ নেয়নি। টাকা পাঠায় না। একলা অসহায় মেয়েটা দু'টো বাচ্চা নিয়ে কী করে সামলাল সে কথা একবার মনে হল না। ফের কী লজ্জার সে আসে! তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। হয়তো, কার্তিক জানে, এই বস্তিতে এসে পড়লে মেয়েরা আর অসহায় থাকে না। তাদের কাজ জুটে যায়। আহার জুটে যায়। বিনিময়ে হারিয়ে যেতে থাকে স্বাস্থ্য। সৌন্দর্য। সম্মান।

অন্ধর মাকে দেখে দৌড়ে এসেছিল পলাশ। কিছুক্ষণ আগে সে স্কুল থেকে ফিরেছে। মা এখনও ফেরেনি। এ দিকে এতদিন পর বাবা উপস্থিত। সে বলল—মাসি আইজ কেমন আসো?

—ভাল।

—কাজে কবে যাবা?

—কাল থিকা যামু।

—অন্ধ কই?

—হ্যায় মাস্টারের বাড়ি আসে। মাস্টারের শরীলজা খারাপ যাইতাসে হেই কুন কাল থিকা।

—বাবায় আসছে।

—দাখলাম। তর মায় তো ফিরে নাই।

—না। বাবায় কয় মায় কই।

—তুই কী কইলি?

—কইলাম কাম করতে গ্যাসে। বাবায় কয়, তোর মা বেশ কামাচ্ছে না? আমি কিসু কই নাই।

—অ্যাডমিন আসে নাই কান?

—কয়, কাম আসিল। শীতে কাঠের গোলায় অনেক কাম থাকে। ছুটি মিলে না।

অন্ধর মা পা বাড়ায়। পলাশ মাস্টারের বাড়ির দিকে যায়। ভিতরে ঢোকার আগে একবার বেলিদের বাড়িতে ঢুকে ভাইকে দেখে নেয়। ভাই বেশ আছে। ছেলেকে দেখাশুনো করার জন্য, রাধিকা অঞ্জলিকে দশটা করে টাকা দিচ্ছে। অঞ্জলি নিতে চায়নি। রাধিকা বলেছে—‘তোমরা এইটুকু না করলে আমি তো কাম পাইতাম না। না খাইয়া মরতাম।’

এটুকু করার পরামর্শ রাধিকাকে তৃণাকুর দিয়েছেন। তাতে ফল ভালই হয়েছে।

পলাশ মাস্টারের বাড়ি পৌঁছে দেখল অন্ধ আর মাস্টার পাশাপাশি শুয়ে গল্প করছে। সেও এক পাশে শুয়ে পড়ল। অন্ধ বলল—তোর বাবা এসেছে, না রে?

—হ্যাঁ। তুই কী করে জানলি?

—গন্ধ পেলাম।

মাস্টার বলছিল—মহেঞ্জোদারো নামে একটা সভ্যতা ছিল একসময়।

পলাশ এ বছর ইতিহাস বই পেয়েছে। মহেঞ্জোদারো পড়ছে। সে শুনেতে লাগল। মাস্টার বলতে লাগল—অত বড় সভ্যতা, সেও ধ্বংস হয়ে গেল। কিছুই থাকে না। শেষ পর্যন্ত সব ধ্বংস হয়ে যায়।

অন্ধ বলল—আমরাও ধ্বংস হয়ে যাব, না মাস্টারকাকা?



—হয়তো হব।

—তোমার এই ডায়রি, এই এত কগজ, বই—সব জলে ডুবে যাবে।

—জলে ডুবে যাবে? কে বলল?

—আমার মনে হয়। অনেক জল আসবে। আর আমাদের ঘরবাড়ি সব ডুবে যাবে।

মাস্টার চুপ করে থাকে। অন্ধ আবার বর্তমান ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সত্যিই কি ও বুঝতে পারে? টের পায় জন্তুজানোয়ারদের মতো? রাধিকা বাড়ি ফিরছিল। মাস্টারের ঘরের দরজা খোলা দেখে দাঁড়াল একবার। পলাশ যদি থাকে বলবে ভাইকে নিয়ে আসতে। বাইরে থেকে ডাকল সে—পলাশ আছস? পলাশ?

পলাশ সাড়া দেয়—আছি মা।

—ভাইরে লইয়া আয় বাবা।

—বাই মা।

বাইরে বেরিয়ে আসে সে। প্রায় গোপন কথা বলার মতো ফিসফিস করে বলে—বাবায় আইসে।

রাধিকা প্রথমে যেন কথাটা ধরতে পারে না। বলে—ক্যাডার আইসে?

—বাবায়।

রাধিকার বুক হিম হয়ে যায়। আসন্ন ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হয় সে। তার মন ভাল নেই। নীলিমা প্রায় কথাই বলেন না তার সঙ্গে। তাতে কিছু না। সে তো ও বাড়িতে কাজ করতেই যায়। কিন্তু নীলিমা তৃণাকুরের সঙ্গেও প্রায় কথা বলেন না। তৃণাকুর মাঝে মাঝে দুঃখ করেন—‘মা, এতদিনেও আমাকে বুঝল না, জানো।’

রাধিকার নিজেকে অপরাধী লাগে। সেই কি এ সবের জন্য দায়ী নয়? একদিন কথাটা বলেছিল তৃণাকুরকে। তিনি বলেছিলেন—না। তুমি কেন দায়ী হবে? আমরা তো কেনও অন্যায় করিনি। ভালবাসা কি পাপ, বলো?

এত বড় কথা কেমন করে বলবে রাধিকা! সে তো এই একটি মাত্র কথা বুক করেই বেঁচে থাকে।

তৃণাকুর বলেছিলেন—তোমার স্বামী তোমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমার স্ত্রী আমাকে ত্যাগ দিয়েছেন। তুমি জানো, জানো, আমার মেয়ের সামনে ও অন্য পুরুষকে চুমু খেত?

রাধিকা চুপ করে ছিল। তৃণাকুর বলেছিলেন—আমরা দু’টি কষ্ট পাওয়া গ্রাণ, পোড়া গ্রাণ, যদি পরস্পরের বুকে মুখ রেখে একটু তৃপ্তি পাই, শান্তি পাই, সেটুকু মানুষ গেতে নেবে না কেন? আমাদের ঘরা কাছের, তারা কেন বাধা দেবে?

তবু রাধিকা ভেবেছিল, অন্য জায়গায় কাজ খুঁজে নেবে। তার তো বন্ধন নেই কোনও। আজকাল স্বপ্নও ধরা দেয় না আর। হয়তো স্বপ্ন দেখার অবসরই পায় না সে। কিন্তু তৃণাকুর করুণ বালকের মতো, কাতর হয়ে বলেছেন—আমাকে ছেড়ে যোয়ো না। চলে যোয়ো না। যাবে না তো? বন্ধন নেই। আবার আসছে। ভাল করে হাটতে পারেন না মনুষ্যটা। রোজ কলোজে যেতে পারেন না। নিজের কিছু করে নেবার ক্ষমতা নেই। ঘরকুনো, পতুয়া, অন্তর্মুখী, পরনির্ভরশীল মানুষ। নিজের বাবার সঙ্গে তৃণাকুরের মিল পায় রাধিকা। ওই অস্তর্মুখিতা, ওই ক্রীসঙ্গ-বঞ্চিত নির্ভরশীল পৌরুষ, ওইরকম জোরে জোরে কাব্য পাঠ—ফলে বন্ধনহীন এ বন্ধনকে সে মনে মনে স্বীকার করে নেয় ক্রমে। নীলিমা না থাকলে কে দেখবে মানুষটাকে? একদিন রাধিকা বলেছিল—বিয়া করেন। তৃণাকুর মাথা নেড়েছিলেন—না। আর না। আমি জানি ক্রীতে সুখী করার মতো কোনও গুণই আমার নেই। যে আসবে অসুখী হয়ে ফিরে যাবে। কাছে টেনেছিলেন রাধিকাকে। বলেছিলেন—প্রেমিকা তুমি। স্বাধীন তুমি। ক্রীও তুমি। আর আমার কিছুই দরকার নেই।

তৃপ্তির মধ্যে রাধিকা শমসেরকে কোথাও খুঁজ পায় না। তৃপ্তির নিজের মতো করে রাধিকার মধ্যে প্রবেশ করেন। আর রাধিকা বহুদিনের প্রয়াসে কার্তিক নামে লোকটাকে নিজের মধ্যে থেকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলে দেয়। আজ কার্তিকের আবির্ভাবে সে ক্রমশ কঠিন দেওয়াল তুলতে থাকে চারপাশে। কার্তিকের কথার জবাব দেয় না। কিন্তু কার্তিক নাছোড়। সে প্রথমেই শারীরিক আক্রমণ করে রাধিকাকে। অচল টেনে বুকের দিকে হাত বাড়ায়। ফিচেল হেসে বলে— আমার জিনিস, আমি হাতের না? হাতের না?

রাধিকা দাঁতে দাঁত চাপে। ফিসফিস করে বলে— ছাড়ো। পরাণ আইব। ছাড়ো।

— ছাড়ব না।

কার্তিক এগিয়ে আসে। তার বিড়ি বাওয়া মুখের থেকে ডামাকের গন্ধ ছড়িয়ে উঠে আসে দাঁতের গোড়া পচে যাওয়া গন্ধ। রাধিকার গা শুলোয়। সে এক ধাক্কা দেয় কার্তিককে। ঘরে আলো জ্বলেনি। অন্ধকারে ঢাল সামলাতে না পেয়ে বিছনায় ঢলে পড়ে রাধিকা। কার্তিক রাগে আক্রমণে ঝাঁপায়। লোভে রোষে ফালা-ফালা করতে চায় শরীর। অনেকদিনের রাগ তর। অনেক পাগল। একটানে আদায় করতে চায়। মুখে বলে— খুব কামাস? আঁ? খুব কামাস? গা দিয়ে তেল চুকচুক করে বারে কেমন?

ভাইকে নিয়ে ফিরে আসছিল পলাশ। সঙ্গে অঙ্ক আসছিল। রাধিকা আগ্রাণ চিৎকার করে— পলাশ! আয় বাবা।

পলাশের মাথায় বুন চেপে যায়। মুহুর্তে অনেকদিন আসে দেখা মধ্যরাত্রির উল্লস কার্তিককে তার মনে পড়ে। সে ভাইকে অন্ধর কোলে দিয়ে ছুটে যায়। খান ইট তুলে কার্তিকের পিঠে লক্ষ করে ছুঁড়ে মারে। বাধায় কঁকিয়ে উঠে মাটিতে খসে পড়ে কার্তিক। পিঠের হাড়গুলি বুঝি গুঁড়িয়ে গেল। ভক্তুর মেরুদণ্ড চুরমার। রাধিকা শাড়ি সামলায়। পলাশ দুটি গনগনে চোখ তুলে শাসাতে থাকে— বুন কইরা ফালানু যদি আর একবার মা'র গায়ে হাত লাগে।

অঙ্ক পলাশের ঘুমন্ত ভাইকে বুকে আঁকড়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। পলাশ হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলে— 'নে।' অঙ্ক ভাইকে নিয়ে দেয়। পলাশ বলে— আইজ আর আমি যামু না অঙ্ক। তুই যা গিয়া।

অঙ্ক জানে কেন পলাশ এল না। সে মাকে পাহারা দিতে চায়। ইঠাৎ পলাশকে অনেক বড় মনে হয় অন্ধর। এবং এই দুনিয়ার পাশে খুবই প্রয়োজনীয় মনে হয়। পাশাপাশি নিজেও মগা লাগে। নিশ্চয়োজ্ঞান লাগে। নিজের অর্থহীন জন্মের জন্য নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হয় সে। অন্ধকারে একবারও হেঁচট না খেয়ে সে মাস্টারের বাড়ির দিকে যায়। তবু না ভেবে পারে না, পলাশ তো আছে, এই পৃথিবীর জন্য, মারের জন্য, প্রতিরোধের জন্য, পলাশ তো আছে। সে মনে মনে, অজানার উদ্দেশে বলে— পলাশরা থাকুক। থেকে থাক চিরকাল।



এপ্রিলের শুরুতে কলকাতার অফিসে যোগ দিয়েছিলেন প্রণবেশ। এখন মনে হচ্ছে, একপক্ষে ভাল ছিলেন ফারাকায়। নদীর জলের মতো জীবন ছিল ওখানে। উত্থান-পতনহীন, শান্ত, কাজে ঠাসা। শুধু ছেলের জন্যই ফিরে এসেছেন কলকাতায়। কিন্তু ভাল লাগে না। একটুও ভাল লাগে না। মাথুরের গড়কে আজকাল অভিশপ্ত মনে হয়। সবাই সবাইকে সপেক্ষের চোখে দেখে এখন এখানে। দীর্ঘ পরিচিতি ভেঙে কে যে নাস্তিক উপকে শুরু করে দেবে তত্ত্বসাধনা, কে যে খুনি

হয়ে উঠবে এবং চরম নিষ্ঠুরতায় প্রান্তায় জুড়ে ফেলবে সন্দোহভাজ শিশু, কে যে কোন গোপন দুখে রেললাইনে বুক পেতে দেবে আর কার স্ত্রী বিখ্যাত ভেত্রে ছুটে যাবে অন্য জনের দরজায়—তা কেউ বলতে পারে না। পরিবারের নেওয়ারাল ভাল থাকার উপকরণে সুসজ্জিত হলেও ভাল না-থাকা অস্থির বায়ু চুকে পড়বেই গৃহস্থীতে, আত্মতপস্বী করে তুলবে সমস্ত শ্রৈর্যকে। তবে, ভাল থাকবার জন্য, মানুষ যখন গৃহমধ্যে বসে না থেকে বইরেকার হাওয়ার আলোড়িত, তখন তার সুস্থ মনুষ্যত্ব সম্পর্কেও আর সন্দেহ থাকে না।

মাধুরের গড় নাগরিক কমিটির সভা হল একদিন এর মধ্যে। সেই সভায়, বহুহাজার অভিযোগে, বিকাশ ও তার পরিবারের প্রতি বিক্রার সেওয়া হল। বিকাশ নিজের ছিলেন এই কমিটির অন্যতম সদস্য। কোনও দিন তাঁর পাশে এ কথা কখনোই করা সম্ভব হয়নি যে নিজের কৃতকর্মের জন্য এই কমিটি দ্বারা বিকৃত ছােকেন। যদিও সেই সভায় বিকাশ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু সারা মাধুরের গড়ে তাঁর উপস্থিতি বড় বেশি স্পষ্ট।

বিকার সেওয়ার বিষয়ে প্রণবেশের খুবই আগ্রহ ছিল কারণ বিকাশ সত্যি অভিযুক্ত কিনা এ বিষয়ে কোর্টের রায় এখনও বেরোয়নি। কিন্তু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রার আদালতের রায়ের পরে যা করে না। গণবিচারে একটি বৃহৎ জায়গা নেয় আবেগ। এবং পক্ষপাত। প্রতিষ্ঠান আদালতের মতো অকটি যুক্তি ও আবেগবিহীন নিরপেক্ষতার ত্রোয়াকা নেই এখানে। গণ-আদালতের দৃষ্টি সরল, যুক্তি সরল, আবেগ তুঙ্গী এবং বিচারকাল ক্ষণস্থায়ী। অভিযুক্তের প্রতি কোনও ন্যায্যবিচার না হওয়ার আশঙ্কা এখানে থেকে যায় বরাবর। আবার, জনমানুষের সরল চোখ হয়তো এমনও অন্তর্ভুক্তী হতে পারে যা সরাসরি সত্যে পৌঁছয়। সত্য ও সারলা জোড়া বেলফলের মতোই, পাশাপাশি সুন্দর। তাই সংশয় কাটে না। এমনকী বিকাশ সম্পর্কেও প্রণ থেকে যায় প্রণবেশের।

প্রণবেশ এখনও ভাবতে পারেন না, ওই অত্যাচারের মধ্যে, ওই নিষ্ঠুরতার মধ্যে, বিকাশ থাকতেও পারেন। নানা বিপর্যয়ে প্রণবেশ বারবার ওই মানুষটির কাছে ছুটে গেছেন। যখন ভাইয়ের জন্য উদ্বেগে ঘুম হত না, যখন থানা থেকে অত্যাচারিত হয়ে ফিরেছিলেন, যখন নীলাগ্রি মারা গেল, দেবার্টন মারা গেল—প্রণবেশ ও বিকাশ—দুই অসমবয়সী বন্ধু ও সমবায়ী—বারবার পরস্পরকে আকড়েছেন। প্রণবেশের ছেলে হারানোর সময় বিকাশই একমাত্র যিনি সারাক্ষণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রণবেশের সঙ্গে ছিলেন। সাধামতো সঙ্গ ও সহায়তা দিয়েছিলেন। সারা পাড়া জুড়ে গাছ করতেন তিনি। পাতার মানুষদের সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে ভাবতেন। সম্প্রতি ফটিকবিল বস্তিতে নলকূপ বসানোর জন্য খুব চেষ্টা করছিলেন বিকাশ। সরকারের দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে এককাল কাটিয়েছেন তিনি। প্রণবেশের মনে হয়—কোথাও কোনও ভুল হয়ে থাকবে। কিন্তু অন্ধর মা বলে যে মহিলাটি প্রণবেশের বাহিতে নতুন কাজ করতে এসেছে তাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন জুই। প্রণবেশ শুনছিলেন। অন্ধর মা বিকাশের বাড়িতে কাজ করত। সে আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছে জুইয়ের কাছে। দিতে দিতে কৈদেছে। বারবার বলেছে, বউটির ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। বড় ভাল ছিল সে। সুন্দর ছিল। কোথাও যায়নি। কারও সঙ্গে মেেশেনি। অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। হ্যা, তাকে মারা হত। নিষ্ঠুর মার। গান চালিয়ে তার চিংকার অটিকানো হত। বিকাশও কি শামিল ছিলেন এ সবে? জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রণবেশ। অন্ধর মা মুখ নিচু করে বলেছিল—না। তাইনরে মারতে দেখি নাই। তয় পোলায় আর বউয়ে মিল্যা মারে দেইখা বাইর যাইতেন গিয়া। কুনোদিন থামাইতেও দ্যাখলাম না, কিসু কইতেও না।

প্রণবেশ অবাক হয়েছেন। স্ত্রী-পুত্র মিলে বউটিকে মারছে সেখেন মীররে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন বিকাশ—এ দৃশ্য কষ্টকল্পিত লাগছে। যদিও বিকাশ খুব প্রতিবাদী ছিলেন না। কিন্তু

মেকপুইনও কি ছিলেন? প্রণবেশ মেলাতে পারেন না। বিকাশের কথা ভেবে কাঁড়ে মন বাসে না তাঁর।

ভাবতে ভাবতে অনামনঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন প্রণবেশ। সিঁথির মোড়ে বুজেনা জ্যামে দাঁড়িয়ে ছিল জিপটা। অফিসে যাওয়া-আসা করার জন্য জিপ পেয়েছেন তিনি। এই জিপস্বত্বের বা-হাতে স্টিয়ারিং বলে তাঁকে ডানদিকে বসতে হতো। একটি চিকানাও তাঁর চিন্তা ছিল। তিনি এ দিক-ও দিক দেখলেন, শব্দটা বাদিক থেকে আসছে। ছবিভাজের পাশ দিয়ে প্রণবেশ শব্দের উৎস খুঁজলেন। রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি পাগল। হাট-পা নেচে বাঁ সব বলে যাচ্ছে। যাই বলুক, বলার মধ্যে গমক আছে। ছন্দ আছে। তার দীর্ঘ শব্দ। গোপা হয়ে খানিকটা সামনে বৃকে আছে। গালে নাড়ি, বড় বড় চুল মাথাখা। পরনে আধময়লা শাল্লাবি আর প্রয়োজনের চেয়ে ছোট আধময়লা প্যান্ট। পায়ে হাওয়াই চটি। সে বলছে, তাঁর দিকে মনঃসংযোগ করার স্মৃতিতে পেলেন প্রণবেশ, — “...ওরা আপোসহীনতার কথা বলত। এই বামফ্রন্ট, বলত পুঁজিবাদের বিকাশের জন্যও যতটুকু অগ্রগতি দরকার ছিল তাও ত্তক করে রেখেছে বড় বড় শিল্পপতি ও জমিদার গোষ্ঠী। বলত, আমরা অপেক্ষা করব না। বিপ্লবের পথে এগোনোই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা কী করল? বিপ্লব থেকে সরে দাঁড়াল সমঝোতায়। শিল্পপতি ও জমিদারদের সঙ্গে আপোস করল। এই বামফ্রন্ট, সাতঘটিতে, মনে রাখবেন, মাত্র দশ বছর আগে সাতঘটিতে একটি দলিল ছাপে যাতে চিনকে ওরা সমর্থন করেনি, আবার একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে—করেছেও। কেন এই পরস্পর বিরোধিতা? কারণ হল, ওদের উদ্দেশ্য ছিল, কমিউনিজমের মুখোশ পরে সাম্রাজ্যবাদের দালালি। ওই দলিলে সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে ওরা একটি চমৎকার আড়াল নেয় এই বলে যে, যা সাম্রাজ্যবাদের অনুগমন ভাবা হচ্ছে তা আসলে দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্য ... ..”

জ্যাম ছেড়ে গেল। প্রণবেশের গাতি ছাড়িয়ে গেল পাগলটাকে। কিন্তু প্রণবেশ ভুলতে পারছেন না। খুব চেনা লাগছে ওকে। কোথায় দেখেছেন? এই রাস্তাঘাটেই কোথাও? কবে দেখেছেন? মাথার মধ্যে ছেলেটির মুখ তোলপাড় করতে থাকছে। অযত্ন আর শীর্ণতার আড়ালে ইতিহাস হয়ে যাওয়া সৌন্দর্য আর তাঁর স্বকবকে দুটি চোখ। ছেলেটি ... .. ছেলেটি ... .. কৌশিক না? জামাল কৌশিক! প্রণবেশ সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর হৃৎস্পন্দন এত ভারী ও তীব্র হল কেন পুরো যন্ত্রটা পাঁজর কেটে বেরিয়ে আসবে। তিনি ভাবতে লাগলেন—কৌশিক! কতদিন পর! তখন নীলাগ্রির কাছে আসত। কতদিন নীলাগ্রি, দেবার্চন আর এ—এই কৌশিক নীলাগ্রির ঘরে বসে কথা বলেছে। সবাই যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন, কতদিন এই কৌশিক এক মুহূর্তের জন্য এসে দরজায় দাঁড়িয়ে দু’টি খবর দিয়ে গেছে। আঃ—আঃ—প্রণবেশের মাথার ভেতর যন্ত্রণায় ফুলে ওঠে। চাপ ফুঁসে ওঠে আর তাঁকে কর্তব্যসচেতনতা সম্পর্কে বিমূঢ় করে দেয়। কৌশিককে তিনি চিনতে পারলেন না? কৌশিককে? তাঁর মধ্যে নীলাগ্রির জন্য তোলপাড় হল। নীলাগ্রির জন্য ভালবাসা, নীলাগ্রির জন্য উদ্বেগ-শ্রুতি, নীলাগ্রির জন্য যন্ত্রণা তাঁকে জিপে বসে থাকাকালীনই আকুল ও অস্থির করে তুলল। তাঁর ইচ্ছে করল, এখনি গাড়ি ঘুরিয়ে কৌশিকের কাছে পৌঁছতে। ইচ্ছে করল, তাকশো অর্ধেক জীবন পার করে ফেলা ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ভাই রে—ও ভাই—বলে ডাকতে। কিন্তু ও তো পাগল! হোক, হোক পাগল। ভাই বলে কাছে টেনে নিলে পাগলের মধ্যেও সুস্থতার সন্ধার হবে। নিশ্চয়ই হবে। প্রণবেশ মনে করেন, হয়তো এ বিষয়ে গভীর বিশ্বাস তাঁর—সমস্ত পাগলামি ও উন্মাদনার উৎস আসলে অপ্রেম। প্রেমহীনতা। ভালবাসা সমস্ত মানসিক অসুস্থতা ধুয়ে-মুছে দিতে পারে, প্রণবেশ দ্রুত পৌঁছে যেতে চান জামাল কৌশিকের কাছে, যা তাঁকে, একাংশে নীলাগ্রির কাছে পৌঁছে যাবার আকর্ষণ দেয়। দারুণ অনুপ্রাণিত করে সমস্ত ভাইকে যত্ন দেলে দিতে। কিন্তু এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় অসুস্থত্ব জ্যামের রাস্তায় গাড়ি ঘোরানো। তা ছাড়া ... .. তা ছাড়া ... ..

কৌশিক পাগল, নকশাল করত, একলা একলা তার কাছে পৌঁছিয়ে প্রণবেশ যদি জড়িয়ে পড়েন? কীসে জড়াবে? কীসে? প্রণবেশ জানেন না। কিন্তু প্রাথমিক উন্নয়ন কালিয়ে এ রাস ভয় ঢুকতে থাকে ভেতরে। যেমন স্বল্প পুত নদীজলে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ে বিধাতার সামান্যিক বর্জ্য। প্রণবেশ সীতিত বোধ করেন। ধরা যাক, কৌশিকের কাছে পৌঁছালেন, ধরা যাক ওর কোনও বাড়িঘরে ওকে পৌঁছে দিলেন, কিন্তু যদি না থাকে। যদি বাড়ি না থাকে। যদি ও যেতে না চায়। প্রণবেশ ওর বাড়ি চেনেন না। কোনও সমাধান পান না তিনি। অস্থির লাগে। যন্ত্রণা হয়। পাশে একজনকে পাবার ইচ্ছে বনছপলি পেরিয়ে তিনি আনিসুজ্ঞামানের কাছে আশ্রয় কখা ভাবেন।

আনিসুজ্ঞামানের স্নায়ুটির নীচে গাড়ি রেখে জলত লাগে সিঁড়ি উপরত্যা তিনি। ভাবেন, ভাবতে থাকেন, কৌশিক কি সত্যি পাগল হয়ে গেছে? সত্যিই কি ও বুঝতে পারছে না রাস্তার ধারে এই বাতুল কথনের অপ্রয়োজনীয়তা? আনিসুজ্ঞামান কৌশিককে চিনতে। বিকাশও চিনতে। বিকাশ— প্রণবেশের কষ্ট উপচাতে থাকে। কৌশিকের জন্য হতে থাকা কষ্টে বিকাশের জন্য অনুভূত বেদনা যুক্ত হয়। আজ বিকাশ থাকলে প্রণবেশ সবার আগে তাঁরই কাছে যেতেন।

আনিসুজ্ঞামানের দরজায় কেল বাজান প্রণবেশ। দরজা খুলে যায়। হাতে কলম নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বোরখা পরা নীলোফা। প্রণবেশকে দেখে দরজা ছেড়ে সরে যায় সে। ঘরে এসে প্রণবেশ দেখেন—ডিভানে অনেকগুলি বই। একই বই সব। চেয়ারে বসে আছেন আনিসুজ্ঞামান। দরজার দিকে পিঠ। গভীর মনোযোগে দেখছিলেন কিছু। কে এল, কী বলল তাতে নজর নেই। প্রণবেশ পড়ছেন—দুর্গা : বাঙালির সংস্কৃতির দেবী। লেখকের জায়গায় আনিসুজ্ঞামানের নাম। বইয়ের প্রচ্ছদে পটচিত্রের রীতিতে লাল শাড়ি পরা মা দুর্গা। প্রণবেশ শুনেছিলেন আনিসুজ্ঞামান দুর্গা নিয়ে কাজ করছেন। এই তা হলে সেই বই। নীলোফা ডাকল—  
তাইজান।

আনিসুজ্ঞামান ঘুরলেন। প্রণবেশকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। তাঁকে বসতে বললেন। তিনি অনুভব করেছেন প্রণবেশ স্বাভাবিক নেই। কিছুটা যেন চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন। তা ছাড়াও, প্রয়োজন না থাকলে প্রণবেশ খুব একটা আসেননি তাঁর কাছে। তিনি কিছু জানতে চাইলেন না। প্রণবেশ নিজেই বললেন তার প্রতীক্ষা করতে করতে একখানি বই দিলেন তাঁর হাতে। নীলোফা চা করবে বলে রান্নাঘরের দিকে গেল। এতক্ষণ কাকে কাকে বই পাঠানো হবে তার তালিকা করছিলেন আনিসুজ্ঞামান। তিনি বলছিলেন, নীলোফা লিখছিল। নীলোফার হাতের লেখা চমৎকার। মাঝে মাঝে সামান্য বানান ভুল হয় বটে, কিন্তু তার হাতের লেখার মধ্যে ছড়িয়ে আছে তার শিক্ষাবোধ, যা, সে কুলে না গেলেও থেমে থাকেনি, বরং প্রকাশিত হয়েছে কিশদা-কর্মে, গাছের যত্নে আর গৃহস্থালিতে, উন্নীত হয়েছে সেতারা: পৃথিবীকে মুখ দেখাবার উপায় নেই বলে এই পৃথিবীর মুখই সে খুঁজে নিতে চায় নিজস্ব সক্রিয়তায়। পৃথিবীকে বোঝার চেষ্টা করে, নিতে চায় রস, প্রাণ নিতে চায়, সবটা পায় না। সবটা বোঝে না। কিন্তু তার জন্য থেমেও যায় না একটুও। শুধু চেষ্টা করে। কতজন, কত সুস্থ জন, যাদের মুখ ঢাকার প্রয়োজন নেই, এই পৃথিবীতে যাদের অস্তিত্ব অবহেলিত হয়নি, তারা পৃথিবীর রস বুঝবার চেষ্টাটুকুও করে না। জানে না, টবের মাটিতে শিকড় চাটিয়ে দিতে গাছের কষ্ট হয় কারণ সেখানে পর্যাপ্ত সম্ভার নেই যা তাদের যথাযথ বেড়ে ওঠার সহায়ক হবে। জানে না যে ওই শিকড়ের তলায়ও জন্মায় অজস্র কীট—আর তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জীবনচক্র। তারা ভাবতেও চায় না। এই পৃথিবীর কোনও সীমা-পরিমীমা নেই। তারা জানে আর ভাবে আর সেখে শুধু জন্ম মৃত্যু ভোগ ভ্রমণ ও যুদ্ধ—আর মরে যায়। অসামর্থ্য বেঁচে থাকার মধ্যে দিয়ে পঞ্চভূতে নাচে। আর কয়েকজন, মাত্র কয়েকজন, এই মহাবিশ্বের রূপ-রসের ভাগ নিতে নিতে ভাবে কী বিশাল, কী বিচিত্র এই সৃষ্টি। জীবনের প্রান্তে গিয়ে তাদের এই বোধ হয়, কিছুই পাওয়া



হল না, কিন্তু কণামাত্র যা পেলাম তাতেই বৃন্দ হয়ে বইলাম।

প্রণবেশ বইটির দিকে তাকালেন অনামনস্বতায়। অনামনস্ব পাঠা ওপলিলেন। তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ। আনিসুজ্ঞামান বললেন—অফিস থেকে এলেন?

প্রণবেশ বললেন—হ্যাঁ, বাড়ি ফিরছিলাম। এমন একটা ঘটনা হল যে—

—কী হল? কোনও বিপদ?

—বিপদ কি না জানি না। মনে হল, আপনাকেই বলা যায়। বলা উচিত। বিকাশদা থাকলে হয়তো ওঁর কাছেও যেতাম।

দু'জনেই নীরব হলেন বিকাশ প্রসঙ্গে। আনিসুজ্ঞামান নিজেরও নানা প্রয়োজনে ছুটি-গোছের বিকাশের কাছে। প্রণবেশের মতো তাঁরও ভাবতে কষ্ট হয়েছে যে বিকাশ হত্যা ও বড়বড়ের লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এই সন্দেহকে সত্যি প্রমাণ করে দিতে চায় জিনিস মুখ—যা আনিসুজ্ঞামান দেখেছেন অতি করুণ ও ক্রিষ্ট। একটি কলমলে প্রাণবন্ত নোরে কেন কয়েক মাসেই শিলাবৃষ্টিতে খেঁতলে যাওয়া ফুলের মতো হয়ে যাবে? আনিসুজ্ঞামানের রাগ হয় বিকাশের ওপর। মাথা স্থলে। যদি ধরে নেওয়া যায় এই হত্যার বড়বড়ের তিনি লিপ্ত ছিলেন না তবু এ কথা মানা একেবারেই অসম্ভব যে মেয়েটিকে মারা ও সোনারোপ করার তুমুল কাজের সবটাই ঘটেছে বিকাশের অগোচরে।

আনিসুজ্ঞামানের চিন্তা ছিন্ন হল কারণ প্রণবেশ কথা বলছেন—আমার ভাই নীলাজির বন্ধু ছিল, বিকাশদার ছোট ছেলে দেবার্চনের বন্ধু ছিল—জামাল কৌশিক—মনে আছে? আপনার কাছেও আসত।

—হ্যাঁ। কৌশিক। খুব উজ্জ্বল ছিল ছেলেটা। ওর তো বহুদিন খোঁজ নেই। পুলিশের গুলিতে

—হ্যাঁ, আমরাও ভেবেছিলাম নীলাজি আর দেবার্চনের মতো ও-ও পুলিশের গুলিতে... কিন্তু তা নয়। কৌশিক আছে।

—কৌশিক। আছে। কোথায়? জেলে?

আনিসুজ্ঞামানের দু'চোখ বিস্ফারিত হয়। বুকের যন্ত্র দাপিয়ে ওঠে। কৌশিক— উজ্জ্বল সুন্দর সদা হাস্যময় প্রিয় কৌশিক— কত প্রাণ নিয়ে মতিয়ে বেড়াত! স্বপ্ন দেখত।

—কৌশিক আছে। কিন্তু ভাল নেই অধ্যাপক।

—কী? কী হয়েছে ওর? কোনও অসুখ?

—না। তার চেয়েও খারাপ।

—তা হলে? পঙ্গু হয়ে যায়নি তো? সজলের মতো? কৃষ্ণেন্দুর মতো?

—না। ও পাগল হয়ে গেছে।

—পাগল। কী বলছেন।

—হ্যাঁ, এই মাত্র দেখে এলাম সিথিমোড়ে দাঁড়িয়ে সি সি এমকে গালাগালি করছে। অপরিহার্য জামা-প্যান্ট। চুল উন্মো-খুন্মো। রোগা। স্নান-খাওয়ার কোনও ঠিক নেই হয়তো।

—সে কি?

নীলোফা চা নিয়ে এল। দু'জনে চা পান করতে করতে সিদ্ধান্ত নিলেন, এখুনি একবার সিথিমোড়ে যাওয়া দরকার। কথা বলা দরকার ওর সঙ্গে।

দু'জনে বেরিয়ে পড়েন। নীলোফা সযত্নে গুছিয়ে রাখে বইপত্র আর অসমাপ্ত তালিকা। রাত্রের রান্নার প্রস্তুতি নেয়।

এ সময় সে একবার নীলিমার কাছে যেত। ইন্দনীং ইচ্ছে করে না আর। কীরকম পাল্টে যাচ্ছেন নীলিমা। আগের মতো আর গীতবিতান পড়েন না। সাহিত্য পড়েন না। গানও শোনেন না আগের মতো। কথা বলতে গেলেই রাখিকা নামে কাজের মেয়েটির প্রসঙ্গ তোলেন—‘এই



দেখো না, আজ কী হল! বললাম, রাধিকা, মোচার বড়া করে ফেল করো। বলে কি-না উনি তো মোচার খন্টই বেশি পছন্দ করেন! সাহসটা ভাবো। জাম্বা! এ সামান্য আদার, না ওর! আমার ছেলে কী খায় না খায় আমি জানি না! ও জানে!

নীলোফা অনেক কিছু টের পায়। নীলিমা এতদিনের স্বস্তি অভিমান ভুলে আজকাল প্রায়ই ও বোনের বাড়ি এ বোনের বাড়ি যেতে শুরু করেছেন। দুঃখ-মহিলাদের নিয়ে একটি সমিতি তৈরির চেষ্টায় ছিলেন নীলিমা ও এ পাড়ার আরও কয়েকজন। সেই সমিতি সড়ার কাজের খুব বেশি সময় দিচ্ছেন। ঘরে ঘন টেকে না নীলিমার। আবার গোপেন বাড়িতে বা সমিতির কাজেও যে খুব আনন্দ পান তা নয়। খুবই অপ্রসন্নতা নিয়ে বিব্রত আছেন। তবু তাঁর বাতারা অগ্ন্যাহত আছে। নীলোফা নীলিমার বহুদিনের অবসরের সঙ্গী। সে তাকে বুঝতে পারে। নীলিমা ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে আছেন। তাঁর নিয়ন্তর যুদ্ধ হতে থাকা জীবনে আবারও এসেছে এক নতুনতর যুদ্ধ বা তাঁর বিশ্বাস, নৈতিক বোধ, সংস্কার ও সংস্কার ভাঙার প্রবণতার মধ্যে বহুমুখী বিরোধ বাধিয়ে বসে আছে। নীলোফা ব্যাখ্যা জানে না। শুধু হৃদয় দিয়ে নীলিমার হৃদয় টের পায়। আর নীলিমার না-থাকার দিনগুলিতে নীলোফা উপলব্ধি করে বাস্তব। এবং সত্য। এই সত্য লজ্জন করার সাধ্য থাকে না সাধারণ মানুষের। রাধিকা তৃণাঙ্গুরকে গ্লান করিয়ে দিচ্ছে। তৃণাঙ্গুরের বাথরুম ও অনিসূজ্ঞামানের বাথরুমের মাঝখানে একটি মাত্র দেওয়াল। নানা কাজে নীলোফা বাথরুমে গেলে গুনতে পায় বা শোনার ইচ্ছা তাকে টেনে নেয় এবং সে শোনে, রাধিকার গলা—আঃ! ছাড়েন। ভিজ্যামামু! ছাড়েন। মাসিমায় আইয়া আমারে ভিজ্যামামু বলে কী কইবেন।

—উ উ উ মা জানে না কিছু! টের পায় না?

—হা! আমার বাইজোর কাম পইড়া আসে। আসেন, পিঠটা ঘেঁষা সেই।

নীলিমা জানেন, বোকেন, সবই টের পান। তবু বাড়ি ছেড়ে চলে যান— সে কি বিরক্তিতে? খণার? নাকি কিছুটা সূক্ষ্মগ দেবার জন্যও যাতে ছেলে অনন্দের বক্ষনা কিছুটা মিটিয়ে নিতে পারে। নীলোফা বুঝতে পারে না। শুধু তার বুকের মধ্যে উথাল-পাখাল করে। সে নীলিমার যত্নশার কষ্ট পায়, আবার, একই সঙ্গে, তৃণাঙ্গুর ও রাধিকাকে গভীর আবেগে সম্মান করে বসে। রাধিকাকে বেশ দেখতে। দুই বাচ্চার মা। তবু সুন্দর। তৃণাঙ্গুর রাধিকায় মজেছেন। রাধিকা, বস্তিবাসী, কাজের লোক, খি-শ্রেণীর, তবু মজেছেন নিটুট শরীরের আভাঙ্গতায়। রাধিকার কিছু না থেকেও সব আছে। নীলোফার সব থেকেও কিছু নেই। সে রাধিকার প্রতি ঈর্ষা বোধ করে, কিংবা, হয়তো এই ঈর্ষা একরকম আত্মকরণ—যা তাকে দক্ষায় নিরস্তর। কী ফেন বড় শরীরে তোলপাড় করে বেড়ায়। মনে পড়ে, সে যখন অনিসূজ্ঞামানের সঙ্গে রিপন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে চলে আসার কথা বলেছিল আর অনিসূজ্ঞামান, মনিরুল ও আমিনা এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাদের বাড়িতে, ওই প্রথম, মনিরুলের মতের বিরুদ্ধে মেয়েদের মত উঠেছিল, সে-দিন গভীর রাত্রে সঞ্জিলা ভীত ভিতরের মতো মনিরুলকে বলেছিলেন— বলো, মেঠাকে তো বিশ্বাস করা যায়, বলো?

মনিরুল বলেছিলেন— হ্যাঁ। যায়।

সঞ্জিলা ॥ কিন্তু, তোমার মতের বিরুদ্ধে গিয়েছি আজ। এই প্রথম। কোনওদিন তো এমন হয়নি। একটু ভয় করছে গো। আমি কোমও অন্যায়, কোনও অধর্ম করছি না তো?

মনিরুল ॥ না, অন্যায় কী? ছেলেটা একা থাকবে না। এ একরকম ভালই হল।

সঞ্জিলা ॥ তবু। মেয়ে তো। রড় তো হয়েছে। চাচেরা ভাইবোন একসঙ্গে থাকবে।

মনিরুল ॥ এ পরিবারে চাচেরা ভাইবোন ভাইবোনই থাকে জানো তো।

সঞ্জিলা ॥ জানি। কিন্তু শুনেছি হিন্দুদের মধ্যেও অনেক সময় চাচেরা ভাইবোনে সম্পর্ক হয়ে যায়। আমি মেঠাকে বিশ্বাস করি। খুবই বিশ্বাস করি। ওর মতো ছেলে লাখে একটা। কিন্তু, তবু,

ভয় করে। নীলোফা, শেষ পর্যন্ত, একটা মেয়ে তো।

মনিরুল ॥ উঃ! থামো তো! মেয়ে তো পাঠাচ্ কেন। আসলে হুমিও, জানো, আমিও জানি— ও আর মেয়ে-ফেয়ে নেই। পুড়ে-বুড়ে ওর কি কিছু আছে? শোনো, নীলোফার মা, তুমি সারা জীবন যত পাপ করেছে তা ওই মেয়ের ওপর দিয়ে গেছে। কী কুসংস্কৃত! হে অম্মা! আমার মেয়ে। কিন্তু আমারই ভাবতে খোঁচা করে। বোরখা খুললে কোনও উদ্ভাসও ওর নিকটে থাকবে না।

সজিদা ॥ হ্যাঁ! ঠিকই বলেছ। আমারই পাপ। না হলে আন্না ওকে বাঁচিয়ে রাখতেন কেন? মেয়ে ফেললেন না কেন? ও তো কারও কোনও কাজে লাগবে না।

মনিরুল ॥ আহা-হা! তার জন্য ভেবো না। ও যাতে কালো ঘামো তার ব্যবস্থা তো তোমরাই করে দিলে। মেঠা বেচারা একা থাকত। হাত পুড়িয়ে খেত। ও মেঠার সেবা করবে। তবে হ্যাঁ! ওর সব খরচের ব্যবস্থা আমি করে যাব। মেঠা বলছে বাটে বিয়ে-সাদি করাবে না। যদি করে। তখন? নীলুর ভবিষ্যৎ কী? বেঁচে যখন আছে, কিছু দায় তো নিতেই হবে। কিন্তু যাচ্ছে যাক। চোখের সামনে সারা জীবন একটা জলজ্যান্ত পাপ ঘুরে বেড়াবে, এ আমার সহ্য হয় না। ওকে দেখলে, সত্যি বলছি, আমার কীরকম গা ঘিন ঘিন করে— বোরখার ওপর দিয়েও।

নীলোফা মনে রেখেছে। এই সব মনে রেখেছে। তার দম্ব শরীর নিয়ে আল্লার কাছে জানানো সব অভিযোগ কোনও গোপন অঙ্গকারে ডুবে ছিল। বিকৃত মুখ ঢেকে চলার মধ্যেই তার স্বাভাবিকতা জন্মেছিল। কিন্তু তা আর স্বাভাবিক রইল না, অঙ্গকারে রইল না যখন অনিসুজ্জামান নীলোফার ঘর থেকে পাליয়ে গিয়ে বমি করলেন। নীলোফার ডিমিয়ে পড়া ক্ষত দগদগিয়ে উঠল। এ কষ্ট বশ্যতা মানে না। এ দুঃখের উপশম হয় না। নীলোফার মনে অভিযোগ নয়, অভিশাপ নয়— জন্ম নিল নিরভিমান প্রার্থনা। সে জানে, খেতীর দাগ ধরে যাওয়া মুখ ও শরীর অনিসুজ্জামানের, আলো-ছায়ায় কেমন ভৌতিক লাগে, তাঁর পোশাকে কটু গন্ধ ছড়িয়ে যায়, কিন্তু ওই মুখ, ওই গন্ধ নীলোফার বমন উদ্রেক করে না।

টবিন রোড থেকে ধীরে ধীরে চলতে লাগল জিপ। মাথুরের গড় যাবার সময় পথের যে ধারে ছিলেন, এখন তার উপ্টোদিকে আছেন প্রণবেশ। এ ধারেই কৌশিকের থাকার কথা। তবু দু'জনে দু'দিকে চোখ রেখেছেন। দু'জনেই উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন, যদি সে কোথাও চলে যায়। যদি ইতিমধ্যে কোনও বাসে উঠে পড়ে। যদি পুলিশ আবার পাকড়াও করে তাকে।

জ্যাম এখনও ছাড়েনি। বরং বেড়ে গেছে। টবিন রোড ও সিধিমোড়ের মাঝামাঝি জায়গায় এসে জিপ আর এসোতে পারছে না। ড্রাইভারকে সিধিমোড় অটোস্ট্যাণ্ডে গাড়ি দাঁড় করাতে বলে নেমে পড়লেন প্রণবেশ আর অনিসুজ্জামান। দু'জনে মিলে পাগল খুঁজতে লাগলেন। কিংবা দু'জনে মিলে নকশাল খুঁজতে লাগলেন। কিংবা, প্রকৃত অর্থে একজন খুঁজলেন মৃত ভাইয়ের বন্ধুকে, অন্যজন প্রিয় ছাত্রবৎ স্নেহভাজনকে। এবং খুঁজে পেলেন। একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সে তখন বলে যাচ্ছে— আপনারা ভিয়েতনামের কথা ভুলে যাবেন না। ওরা ওদের অস্ত্র নিজেরা তৈরি করেছিল। আজ কংগ্রেসকে সরিয়ে সি পি এম গদি দখল করেছে মানে যদি আপনারা মনে করেন এই কমিউনিস্ট সরকারের আগমনে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেল, তবে শুনে রাখুন, এ বার আপনারদের মুখের ওপর নেমে আসবে চাবুকের অন্য পিঠ। কারণ, কমিউনিস্টের মুখোশে এরা সব সাম্রাজ্যবাদের দালাল। আসুন আমরা ওদের অস্ত্র কেড়ে নিই। ওদের মুখোশ খুলে দিই। আমাদের শ্রেণীসঙ্ঘ নিপাত যাক। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। ..

অনিসুজ্জামান অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছেন কৌশিকের দিকে। তাঁর চোখে জল আসছে। শতাব্দীর শেষের ভাগে শতাব্দীর সেরা বিপ্লবের পরিণতি দেখছেন তিনি। পাগলটির

হাত ধরছেন। বলছেন— কৌশিক—

কৌশিক হাত ছাড়িয়ে মিল না। জাকাল না। বলে চলল— ... আপনারা কুলে যাবেন না, নতুন বাম সরকারের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন একটাই ভীষণ। হ্যাঁ, মাত্র চার-পাঁচ বছর আগে এদের কী ভূমিকা ছিল আপনারা স্বরণ করুন...

আনিসুজ্জামান কৌশিকের হাত ধরে বাঁকুনি দেন। বলেন—কৌশিক! এ দিকে দেখো। আমার দিকে দেখো। তুমি কোথায় ছিলে? এতদিন কোথায় ছিলে?

—কোথায় ছিল এই মার্কসীয় অসুগত্য বনন গলিতে গলিতে লাস্টের শাহাড় করেছিল...

—কৌশিক—

কৌশিক থামে। তাকায়। বড় দূরদেশ থেকে আগত দু'টি অজানা চোখ স্থাপিত হয় আনিসুজ্জামান ও প্রণবশের ওপর। সেখানে পরিচয়ের জ্যোতি এতটুকুও নেই। স্বীকৃতির আনন্দ নেই। সে হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে— এবার কি আপনারা উঠে করে কোলাহাল প্রক্রিয়া নিতে চান? হ্যাঁ, তলায় রাখুন একটি গরম জেলের কড়াই আর তাতে কলাসে বাক আমাদের মস্তিষ্ক।

এবার প্রণবশ এগিয়ে আসেন। হাত ধরেন কৌশিকের। বলেন— কৌশিক, আমি প্রণবদা, নীলাদ্রির দাদা। আমাকে চিনতে পারছ না?

কৌশিকের চোখ দু'টি সহস্র হয়ে ওঠে এ বার। খুব সন্দেহের সঙ্গে চারপাশে তাকিয়ে সে বুকে প্রণবশের কানে কানে বলে— সাবধান। প্রণবদা। নীলাদ্রি যেন বাড়িতে না থাকে এখন।

আবার, অনেকদিন পর ভাইয়ের জন্য চোখে জল আসে প্রণবশের। ক্রমালে চোখ মোছেন তিনি। আর কৌতূহলী মানুষ চারপাশে ভিড় করে। একজন বলে— পাগলটা সেই নুপুর থেকে বকছে। প্যান্ট খুলে পেছাপ-টেছাপও করল এখানে। ভদ্রলোকের মতো দেখতে দাদা। মাঝে মাঝে ইংরিজি বলছে। মারতেও পারছি না। চলে যেতে বললেও যাচ্ছে না।

—আপনাদের কেউ হয়?

—পাগল হল কী করে?

প্রণবশ বলেন— আমার ভাই। হারিয়ে গিয়েছিল। কৌশিক, তুমি চলে আমাদের সঙ্গে যাবে তো?

আনিসুজ্জামানও বলেন— এসো কৌশিক। চলে।

জামাল কৌশিক হাসে। হলুদ ছোপধরা দাঁত। মুখের বুনে গছ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। তাকে সদ্য ধ্যান-ভাঙা কৃশ বুকের মতো লাগে। বিস্মৃতির ও পার থেকে ফিরে আসা মানুষের মতো স্বাভাবিক গলার সে বলে— ভাল আছেন, সার?

প্রণবশ ডান হাত ধরেন। আনিসুজ্জামান বাঁ হাত। রাস্তা পেরুতে হয় না। জ্যাম কাটিয়ে প্রণবশের জিপ এতক্ষণে মোড়ের কাছে আসার অবকাশ পেয়েছে। তাঁরা জিপে ওঠেন। জনতা দণ্ডায়মান থাকে জিপ বাঁক ঘুরে এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। সামনে না বসে কৌশিককে নিয়ে দু'জনেই পিছনে উঠেছেন এ বার। দু'জনেই চিন্তিত। বিবর্ণ। জানেন না কী হবে। কী করবেন। প্রণবশ বলেন— ওকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব?

আনিসুজ্জামান কিছু বলার আগেই কৌশিক বলে—সার, ওরা কি আসে? আজ কি আসবে?

—কারা?

—মনোজ, সৌমিত্র।

আনিসুজ্জামান কৌশিকের চোখে চোখ রাখেন। তাঁর চোখ জ্বালা করে। তবু বলেন— ওরা আর আসবে না কৌশিক। যেমন নীলাদ্রি, দেবার্জন, সভ্যজিৎ— কেউই আর আসবে না।

কৌশিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে— তা হলে আর গিয়ে কী হবে? ওদের সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। জেলে অতনু সামন্তর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমরা প্রচুর পরিকল্পনা করেছি।

অনন্দা বলেছেন আমাদের কর্মপদ্ধতি বদলাতে হবে। আবার প্রথম থেকে ঢেলে সাজাতে হবে সংগঠনের কাজ। আমি যাব না সার। আমি...

সে চলন্ত জিপ থেকে নামতে চায়। প্রণবেশ তার হাত ধরেন। কোথাও তান—কৌশিক। তুমি সবার দেখা পাবে। ক'দিন বিশ্রাম করো।

কৌশিক হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো এলিয়ে বসে। পা দু'টি সোজা করে হঠাৎ দিয়ে পায়ের পাতা ছোঁয়। বলে—বিশ্রাম? আচ্ছা।

সে চোখ বন্ধ করে। বুঝি-বা বিশ্রাম এখনই শুরু করতে চায়। হয়তো, সারা দিন বাড়ির থাকায় তার পা টানটান করছে।

অনিসুজ্ঞামান প্রণবেশকে বলেন—আপনার ছেলে ছোট। আশান্নি নিজেকে সারা দিন বাইরে থাকেন। বউদি কি পছন্দ করবেন ওকে নিয়ে যাওয়া?

প্রণবেশ অসহায়ভাবে মাথা নাড়েন। স্বীকার করেন—করবেন না। তিনি এ সবই ভাবছিলেন যে অনিসুজ্ঞামান কৌশিকের দায়িত্ব না নিলে তাঁরই ওকে নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ভুই কিছুতেই মেনে নেবেন না।

অনিসুজ্ঞামান প্রণবেশের অবস্থা উপলব্ধি করেন। হঠাৎ নিজেকে তাঁর পরম স্বাধীন ও মুক্ত লাগে। তিনি বলেন—ও আমার বাড়িতেই থাক। পরশু থেকে আমার কলেজে ছুটি পড়বে। তখন অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপনি আসবেন। আমাদের ভেবে দেখতে হবে ওকে নিয়ে কী করা যায়।

প্রণবেশ বলেন—কীভাবে কী করি বলুন তো।

অনিসুজ্ঞামান ভাবিত থেকে বলেন—দেখি। হয়তো ওর বাড়ির কারওকে বুঁজব।

কৌশিক এখনও চোখ বন্ধ করে আছে। একেবারে চুপ। হয়তো কিছু ভাবছে। হয়তো ঘুমোচ্ছে।

প্রণবেশের জিপ অনিসুজ্ঞামানের ফ্ল্যাটের নীচে থামল। কৌশিক সি পি এম পার্টি অফিসের হোর্ডিংটার দিকে দেখল একবার। থুথু ফেলল। পার্টি অফিসে ছেলেরা এসে গেছে। প্রণবেশ ও অনিসুজ্ঞামান পার্টির কারওকে কিছু না বলে কৌশিককে নিয়ে ওপরে চলে গেলেন। তপন বলল—আরে এই পাগলটা আজ সিথির মোড়ে বকুতা দিচ্ছিল। প্রণবদারা চিনেছেন তা হলে?

—কী বলছিল?

—তুই চিনিস নাকি?

—কী বলছিল পাগলটা?

—সে কি আর আমি শুনেছি?

—তা হলে বুঝি কী করে, বকুতা দিচ্ছিল?

—ওই শুনলাম আর-কি। আসলে জ্যাম ছিল তো। বাস আটকে গিয়েছিল। অনেকটাই শুনলাম। বলছিল—মাও সে তুঙ-এর কথা আপনারা ভুলবেন না। যুবশক্তির অপচয় করবেন না। মনে রাখুন—The world is yours, as well as ours, but in the last analysis, it is yours. You, young people, full of vigour and vitality, are in the bloom of life, like the Sun at eight or nine in the morning....

—শিক্ষিত পাগল বলতে হবে, মাও রপচাচ্ছে, কী বল? সুমন বলল—কিন্তু তপন, তোর এত বড় আংরেজি কথাটা শুনেই মনে থেকে গেল কী করে।

তপন হাসল। বলল—আসলে ওই পাগলটাকে আমিও চিনি। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। ওই কথাগুলো প্রায়ই বলত ও। নকশাল করত। মাও মুখস্থ করে ফেলেছিল একেবারে। প্রায়ই বলত, অনুসন্ধান করতে হবে, বুঝলি, সঠিক অনুসন্ধান। এ বিষয়ে মাও কী বলেন জানিস?...আমাদের অনুসন্ধান কার্যের মূল পদ্ধতি হবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিশ্লেষণ করা,

আর চরম উদ্দেশ্য হবে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বোঝা, শ্রেণীভিত্তিক একটা সঠিক মূল্য নিরূপণ করা, এবং তারপর বিপ্লবী সংগ্রামে কোন কোন শ্রেণী মূল-শক্তি জ্ঞাণ্যবে, কোন কোন শ্রেণীকে মিত্র বলে আমাদের কাছে টানতে হবে, আর কোন কোন শ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে হবে, সেটা নির্ধারণ করে সংগ্রামের জন্য সঠিক কৌশল সুত্রবদ্ধ করা। এটাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কোন কোন শ্রেণীর তথ্যানুসন্ধান করতে হবে? তারা হল নিম্নোক্ত—

শিল্প নিযুক্ত সর্বহারা  
হস্তশিল্প কর্মী  
ক্ষেত্রমজুর  
গারির কৃষক  
শহরে গমিন  
ভবঘুরে সর্বহারা  
হস্তশিল্পী  
ছোট ব্যবসায়ী  
মাঝারি কৃষক  
ধনী কৃষক  
জমিদার  
ব্যবসায়ী বুর্জোয়া  
শিল্পপতি বুর্জোয়া

সুমন চেঁচায়— শুক! পায়ের ধুলো দাও শুক! জিভে ঠেকাই। মাইরি। সন্দেহ হচ্ছে। তুমি নিজেও মাও-ফাও পড়েছ কি না।

তপন বলে— না রে। পড়িনি। শুনতে শুনতে হয়ে গেছে। তবে কি জানিস, সাক্ষা কমিউনিস্ট হতে গেলে একটু পড়াশুনো করা দরকার।

—হ্যাঁ তো। আসল কথা হল কাজ। পড়াশুনো তো করবে তাত্ত্বিক নেতারা। আমরাই যদি অত লেনিন-মার্কস-মাও সে তুঙ-এর নামটা পড়ি তাহলে পলিটব্যুরো কী করবে? হ্যা—হ্যা—হ্যা। কিছু তুই যে বললি পাগলটা তোর চেনা, তো কথা বললি না কেন? পাগল দেখলি আর ফুটে গেলি বাওয়া?

তপন নিশ্বাস ফেলছে বড় করে। বলছে— খানিকটা তাই। পাগল হয়ে গেছে, আর কথা বলে কী হবে। হয়তো চিনতেই পারবে না। বললে বিশ্বাস করবি সুমন, আমার ছ'জন নকশাল বন্ধুর খবর পেয়েছি যারা পাগল হয়ে গেছে।

সুমন তির্যক হেসে সিগারেটে আঙুন দিতে দিতে বলল— কুসু শালা। নকশাল মানেই তো পাগল। পাগল না হলে কেউ ক্ষুদ্রিরাম হয়?

তপন বলল— কিন্তু নকশাল মানেই পাগল হতে পারে, তবে পাগল মানেই নকশাল নয়।

পাটি অফিসে হাসির গমক উঠল। কেউ জানতে চাইল না কৌশিককে কেন আনা হয়েছে। তার জন্য কোনও সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না। তাকে রাস্তা থেকে আনিসুজ্ঞামানের বাড়িতেই বা তুলে আনা হল কেন। তারা জানতে চাইল না কারণ তারা পাটির কাজে নিবেদিতপ্রাণ। নির্দেশের বাইরে তারা কেনই-বা একজন প্রাক্তন নকশাল সম্পর্কে কৌতূহলী হবে।

বেল বাজিয়েছিলেন আনিসুজ্ঞামান। নীলোফা দরজা খুলে দিয়েছিল। প্রণবেশের কথা তখন সে শুনতে পায়নি। দরজা খুলেই সে চমকে উঠল। বোরখা-ঢাকা মুখে কয়েকটি শব্দ ছিটকে উঠেছিল তার— এ কী। কৌশিক না।



রাতে কৌশিক কোনও কথা বলেনি। কোনও গোলমালও করেনি। মা-মা ডাকে করতে বলা হয়েছে, ভাল খেলের মতো তাই করেছে সে। বদার ঘরের ডিভানে তার শোবার ব্যবস্থা হল। এবং সে, যেহেতু আনিসুজ্ঞামানের চোখে দীর্ঘকায়, সুতরাং, আনিসুজ্ঞামানের প্রেতশব্দ তাঁর কানে না বলে, প্রণবশ সুপার মার্কেট থেকে কিনে এনে দিলেন এক-জোড়া রেডিমেন্ট পাঞ্জামা ও পাঞ্জাবি। একটি বাস্র সহ সাবান ও টুথব্রাশ। একটি তোয়ালে ও চিকনি। দু'শ্রু ভেতরের প্যান্ট ও গেঞ্জি এবং একটি দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। কারণ আনিসুজ্ঞামান দাড়ি-গোঁফ কাটেন না বলে এই গুঁহে এটি দুর্লভ। যে কোনও সভা মানুষের, পরগৃহ বানকালে, এই সবই নিত্যান্ত প্রয়োজন বলে প্রণবেশের মনে হল। তিনি ভাবতে লাগলেন, যদি এমন হত, নীলাদ্রি মারা যায়নি, আর জেল থেকে বেরিয়েছে, আশাবিস্মৃত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন কোনও জায়গায়, ধরা যাক বহরমপুরে, যেখানে কেউ তাকে জানে না, অতএব দিনের পর দিন তার পরিবেশ ছিড়তে থাকবে। সে পাত মাছে না, জান করে না, তার চুলে জট পড়ে, গায়ে মাটি পড়ে, সে বন্ধুতা দেখে, লোকে ঢিল মারে। সে পালিয়ে বেড়ায়। অনমনা চলতে চলতে চুলকে নেয় গা হাত-পা, উকুন-ভর্তি মাথা। সে তুষা ভোলেনি তাই রাস্তার কলে জল ঝায়। সে খিদে বোধ করে এবং পচা গলা ফেলে দেওয়া খাবার কুড়িয়ে খায় আঁতাকুড় থেকে এবং ভরপেট হলে শুয়ে পড়ে আবর্জনার পাশেই আর প্রস্তুত করে তার পাগল মস্তিষ্ককে পরবর্তী বন্ধুতার জন্য। যদি এমন হত—আর কে কৌশিক, কে নীলাদ্রি, কে দেবার্ন, কে সত্যজিৎ, কে তাদের বাবা-মা, কেন কলেজে তারা পড়ত, আর কেন পাটি করত, কত অত্যাচার করা হয়েছে তাদের ওপর আর কারা এইসব অত্যাচার করেছে—সব চাপা পড়ে যেত আবর্জনার তুপে।

বাড়ি যাবার আগে প্রণবেশ কৌশিকের মাথায় হাত রাখেন। কৌশিক নির্বিকার। কিন্তু প্রণবেশের চোখে জল এসে যায়। কৌশিকের পিঠে হাত বুলায়ে আনিসুজ্ঞামানের হাত দু'টি ধরে বিদায় নেন প্রণবেশ। তাঁর চোখে গভীর কৃতজ্ঞতা আনিসুজ্ঞামানের প্রতি। গভীর শ্রদ্ধাবোধ। আনিসুজ্ঞামান কত সহজে উপলব্ধি করেছেন প্রণবেশের সমস্যা এবং দায়িত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, এ দায় নেবার কোনও বাধাও ছিল না তাঁর, তবু। কোনও কথা বলতে পারেন না প্রণবেশ। সহসা তাঁর ধাঁধা লাগে। কোনটা ভাল, কোনটা? পাগলামি, না মৃত্যু।

বাড়ি ফিরে জুইকে কিছুই বলেন না তিনি। বলতে ইচ্ছে করে না। জুই নীলাদ্রিকে ভালবাসেননি কখনও। কৌশিককে পাওয়া গেছে আর প্রণবেশ তাতে জড়িয়ে পড়েছেন শুনলে জুই হয়তো বিচলিত ও বিরক্ত হবেন। অতএব প্রণবেশ, অন্য দিনেরই মতো নিশ্চুপ থাকেন, একাগ্র থাকেন বইয়ের প্রতি। বাগ্নাকে পড়াতে কষ্ট ছিলেন জুই। প্রণবেশের দিকে নজর ছিল না। বাগ্না ছাড়া অন্য কোনও দিকে নজর দেবার প্রয়োজনও জুই বোধ করেন না। প্রণবেশ এক কাকের নীলাদ্রির ছবির কাছে দাঁড়ান। তাঁর মনে পড়ে—ছাদে যাবার সিঁড়ি দিয়ে বারবার উঠছে নীলু আর বলছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়।

—কী করছিস নীলু?

—সিঁড়ি ভাঙার অঙ্ক করছি রে দাদা।

কেন সিঁড়ি যে ভাঙল নীলু, আর ভাঙতে গিয়ে কোথায় ছিটকে পড়ল! হঠাৎ জুই এসে দাঁড়ালেন পিছনে। বললেন—কী হয়েছে তোমার?



—কিছু না।

—এখানে ঠাড়িয়ে আছ? কোনও সাড়া নেই।

—এমনিই।

—জড়িয়েছ কিছুতে? অফিসে কিছু হয়েছে? কোনও ক্যামেরা থাকিয়েছ?

—না।

প্রণবেশ বই তুলে নেন। জুই সমস্ত জড়ানো এজাতের চেন। বাগা ছাড়া, বাগার ফুল, সীতার, ছবি আঁকা, পড়াশুনো আর ভবিষ্যৎ ছাড়া আর সব কিছুই জুইয়ের কাছে অদরকারি। মূল্যহীন। আর কিছু ভাবতেই চান না তিনি। বাগা একটু বেশি সময় বাথরুমের দরজা বন্ধ রাখলেই তিনি দরজায় ধাক্কা মেয়ে টিংকার করতে থাকেন—বাগা! কী হল! সাড়া দিচ্ছে না কেন? দরজা খুলছ না কেন।

বাগা বিরক্ত মুখে দরজা খুলে দেয়। হ্যাতে—বা তার রান হুয়নি তখনও। জুই বিরক্ত বোধ করেন। প্রণবেশ এক দিন একান্তে জিজ্ঞেস করেছিলেন বাগাকে—কী করিস অত্যক্ষণ? বাথরুমে?

—খেলি।

—কী খেলিস?

—জলের সঙ্গে খেলি।

—দরজা খুলে খেলবি।

—নাঃ! মা দেবে না।

—কেন দেবে না?

—দেবে না। তুমি জানো না। বলবে ঠাণ্ডা লাগবে। বুকে, সীতার কাটলে ঠাণ্ডা লাগে না। জল ঝটলে লাগে।

মাঝে মাঝে বয়স্ক মানুষের মতো কথা বলে বাগা, প্রণবেশের বুক টেনটন করে। নীলান্দিও এ রকম ছিল। ঠিক এ রকম।

বইয়ে মন বসে না। শুধু পড়ার ভান করে যান প্রণবেশ। রাতের খাবার গলা দিয়ে নামতে চায় না। কিন্তু জুইকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে বা ধরা পড়ে যাবেন ভরে কোনওক্রমে খেয়ে নেন। আসো নিবিয়ে শুয়ে পড়েন তাড়াহাড়ি। অনেক দিন পর বাবা-মার কথা মনে পড়ে তাঁর। সম্ভ্রামাসিকে মনে পড়ে। ছোটবেলার কত কথা। চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে বালিশে পড়ে। জুই আসেন তখন। প্রণবেশের পাশে শুতে শুতে বলেন—কী হয়েছে তোমার? কেমন লাগছে!

মিথ্যা বলেন প্রণবেশ—মাথা ব্যথা করছে। আর কিছু নয়।

নীলোফা রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে। আনিসুজ্জামান তালিকা তৈরি করছেন। প্রকাশক তাঁকে দিয়েছেন মাত্র কুড়িটি বই। কিন্তু সেবার লোকের সংখ্যা ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। প্রণবেশকে দেওয়া বইখানা তিনি ফেলে গেছেন। আনিসুজ্জামান সেটি সরিয়ে রেখেছেন। কৌশিক বলছে—গান্ধিজিকে জাতির জনক কেন বলা হয় বলুন তো সার?

আনিসুজ্জামান তাকান্ধের কৌশিকের দিকে। বলছেন—তিনি জাতিকে জাগিয়েছিলেন বলে। অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলে।

—জাগিয়েছিলেন, না ঘুম পাড়িয়েছিলেন স্যার? গান্ধিজি এ দেশের সবচেয়ে বড় বুজোয়া। নাথুরাম ঠাকুর না মারলে আমি মারতাম।

—শোনো কৌশিক—তোমার নিজস্ব মতামত থাকতে পারে বা পছন্দ-অপছন্দ, কিন্তু অন্য কারও দর্শন বা বিশ্বাস সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারানো বাঞ্ছনীয় নয়।

—সোজা কথাটা সোজা করে বলতে আপনার এত কষ্ট কেন সার?

আনিসুজ্জামান প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইছেন। নিজের একটি বই তুলে রিফ্রেশ কৌশিকের হাতে। তুলতে চেষ্টা করছেন কৌশিক স্বাভাবিক নেই। তাবো অস্বাভাবিক দেখাচ্ছেও না। বাড়ি কেটেছে সে। দাঁত মেজেছে। ঘন করে নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরেছে। কলমগলে লাগছে তাকে এখন। প্রায় আগেরই মতো। সে যখন চুপ করে থাকছে তখন আর তাকে পাগল লাগছে না।

আনিসুজ্জামান জানেন শ্যামগাজারের দিকে কৌশিকের বাড়ি ছিল। সেখানে তাঁর জানা নেই। কয়েকবার বাড়ির প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করেছেন তিনি। কৌশিক চুপ করে ছিল। তিনি ভাবছেন, নিরস্তর ভাবছেন, কোথায় ওর বাড়ির খোঁজ পাওয়া যায়।

কৌশিক বলছে—বইটা রাখুন সার। নেব না।

আনিসুজ্জামান বলছেন—কেন কৌশিক। এ বই আমি লিখেছি।

—কী হবে সার এ সব পড়ে! পোড়ামাটির দুর্গা, পটের দুর্গা, রামের দুর্গা, না রাবণের দুর্গা— এ সব পড়ে কী হবে! এখন প্রত্যেক ভারতীয়র মাথাপিছু জাতীয় ঋণ কত এ নিয়ে একটা বই আপনি লিখতে পারতেন সার।

—তুমি তো জানো কৌশিক, আমি অর্থনীতিবিদ নই।

—তাতে কী, সার। আপনি তো পুরাতাত্ত্বিকও নন। তবু কেমন দুর্গা লিখে ফেললেন। আপনি বাজারে যান তো সার? যান তো?

—হ্যাঁ, যাই।

—জিনিসপত্রের দাম কীরকম বাড়ছে আপনি জানেন। সবাই আপনার মতো। বাজারে যায়। জিনিসের দাম বাড়ছে দেখে। মুখ ব্যাজার করে ফেরে আর বাড়িতে ফিরে চুল ঘামচায়। কী করে সংসার চালাবে জানে না। সার, ইন্দোনীশালের হিসেব বলতে পারব না। তবে ১৯৭০ সালে ওয়াশ্চু কমিটি রিপোর্ট করেছিল ৭০০০ কোটি কালো টাকার নোট বাতিল করা জরুরি। কারণ এর জন্য কৃষিমন্ত্রী অন্ডার তৈরি হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা বৃদ্ধি। ১৯৭৩-৭৪ সালে জিনিসের পাইকারি দাম বেড়েছিল শতকরা ২২.৭ ভাগ। খুচরা দাম বেড়েছিল শতকরা ৫২ ভাগ। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে কোনও কোনও জিনিসের দাম বেড়েছে শতকরা ৩০০ ভাগ। আর মাত্র একটা তথ্য দিই। ১৯৭৬-৭৭ সালে কেন্দ্রীয় পুলিশের জন্য খরচ হয়েছে ১৬৯ কোটি টাকা। ১৯৫০ সালে এই ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৩ কোটি, হ্যাঁ মাত্র ৩ কোটি টাকা। সার, এ সব জানার জন্য অর্থনীতি পড়ার দরকার নেই।

আনিসুজ্জামান বলেন—তোমার কথা মানছি কৌশিক। কিন্তু জনজীবনে অর্থনীতি নিয়ে ভাববার গুরুত্ব যেমন আছে, তেমনই সংস্কৃতি সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে ভাববারও গুরুত্ব আছে।

কৌশিক ডিভানে শুয়ে পড়ে। বলে—বিদে পেয়েছে সার।

নীলোফা টেবিল প্রস্তুত করে। তিনজনের খাবার সাজায়। বহুদিন পর আনিসুজ্জামানের বাড়িতে কেউ থাকছে। ভাল লাগছে নীলোফার। তিন-চার বছর আগেও কত ছাত্র প্রায় এসে এক-দু'রাত কাটিয়ে যেত। তাদের প্রত্যেকের দুঃসংবাদে কষ্ট পেয়েছে নীলোফা বা কারও আনন্দ-সংবাদে আনন্দ পেয়েছে আনিসুজ্জামানেরই মতো। এখন ছাত্ররা কেউ থাকতে আসে না।

কৌশিক যখন রান্না গিয়েছিল তখন আনিসুজ্জামান তুখাঙ্গুর ও নীলিমাকে কৌশিকের বৃত্তান্ত বলে এসেছিলেন। নীলিমা শুনে বলেছিলেন—যেমন বলছ তাতে ওকে আশে ডাক্তার দেখাও। ওর বাড়ির লোককে খুঁজতে গেলে পুলিশের সাহায্য না নিলে হবে বলে আমার মনে হয় না।

তুখাঙ্গুর বললেন—কগজে একটা বিজ্ঞাপন দেবে?

ভাবছেন আনিসুজ্জামান। সবই ভাবছেন। কৌশিকের মাথায় খুব বড় ধরনের গোলমাল

এখনও বাঁধেনি। হয়তো এখনও চিকিৎসা করলে সেয়ে উঠে। কিছু অন্তর্যবিনদের কাছে যাওয়া এখনও সমাজে সহজপ্রাপ্য নয়। কৌশিকের পরিবারের অনুমোদন ছাড়া এ কাজে আনিসুজ্ঞামান দ্বিধা বোধ করছেন। পুলিশের কাছে যাওয়াও কতকটা মুক্তিযুক্ত হবে যে জানে। কারণ কৌশিক এতদিন কোথায় ছিল তা সঠিকভাবে বলেনি। বিড়টো অনুমোদন করা যায়। সি পি এম ক্ষমতায় এসে এক ঝাঁক মকশাল বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে। হয়তো কৌশিক তাদের মধ্যে একজন। কিংবা সে আদৌ ঘরা পড়েনি। পালিয়ে বেড়িয়েছে এতকাল। এখন অবস্থা অনুকূল দেখে মেরিয়ে এসেছে। পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে সে।

হ্যাঁ। এটা ঠিক যে কাগজে বিজ্ঞাপন করা যায়। কারণ সব নিষা দিয়ে বিচার করলে কৌশিকের বাবা-মা বা আত্মীয়স্বজনকে খুঁজে পাওয়াই প্রাথমিক কাজ। কিছু মনে মনে ইচ্ছেপ বোধ করেন তিনি। যদি খুম থেকে উঠে দেখেন কৌশিক নেই। যদি যে-কোনও দিন ও ঘেরিয়ে চলে যায় আর ওর আত্মীয়েরা খবর পেয়ে এসে দেখেন ও নেই। আনিসুজ্ঞামানের বুক কঁপে। কিছু কৌশিক পালানোর বা চলে যাবার চেষ্টাও করে না একেবারে। সে ভিতরনে শুয়ে ঘুমায়। অসহায় শিশুর মতো। তাকে, ঘুমন্ত মুখে-চোখে পাগল দেখায় না একদম। পরিচ্ছন্ন করে কাটা নাড়ি আর সবুজ গোলকের রেখায় তাকে তরুণ ছাত্রের মতোও দেখায় না। হঠাৎ চলে আসা এক ভদ্র শাস্ত্র অতিথির মতোই সে ঘুমোয়। এবং সকালে আনিসুজ্ঞামানের কাছে কিছু সাদা পাতা চেয়ে নেয় সে। শূন্য পাতায়—কালি নেই, কলম নেই, তুলি নেই—শুধু আঙুলে সে লিখে চলেছে ইস্তাহার। মাঝে মাঝে চোখের সামনে তুলে ধরছে সেইসব আর ভরাট গলায় গাইছে—

হাত দিতে বলা সূর্যের আলো

কবিতা পারে কি কেউ

আমাদের মেরে ঠেকানো কি যায়

জনাছোয়ারের ঢেউ

কমিউনিস্ট আমরা, আমরা কমিউনিস্ট

যারা খেটে যায়, আমরা তাদেরি

আমরা কমিউনিস্ট।

নীলোফা রান্না করতে করতে শুনেছে। তারও, বারবার, ওই কথা আর সুর শুনতে শুনতে সমস্ত প্রক্রিয়া সমেত মস্তিষ্কবাহিত হয়ে চলে আসছে কণ্ঠে। সেও গুন গুন করছে—কমিউনিস্ট আমরা, আমরা কমিউনিস্ট।

আনিসুজ্ঞামান প্রণবেশের সঙ্গে কথা বলছেন। প্রণবেশ কয়েকদিনের ছুটি নেবার কথা ভাবছেন। আনিসুজ্ঞামান কলেজ যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। ছুটির আগে আজই শেষ প্রাণ। বেরোবার আগে নীলোফাকে বলছেন— ও হ্যাঁ দুই নেই। হোঁর যদি একা ভয় করে, মাসিমার কাছে চলে আস।

নীলোফা মাথা নাড়ছে। তৃণাকুর আর প্রণবেশ বেরিয়ে গেছেন। নীলোফা নিজের মতো কাজ করেছে এতক্ষণ। বেলা বাড়ছে। নীলোফা তাক দিচ্ছে কৌশিককে।

—জানে যাও। এই। রান্না করবে না।

নীলোফার ভয় করছে না। বরং কৌতূহল হচ্ছে। তার মধ্যে গভীর সংশয়। ও কি সত্যি পাগল? পাগলের চোখ অত শাস্ত হয়? সে কৌশিকের মুখোমুখি বসছে। যেন-বা খোজার সঙ্গী পেয়েছে একজন। মেঝের জড়ো করা শূন্য সাদা ইস্তাহারের এ পারে বসে বসে— আগে যখন আসতে ভাইজানের কাছে তখন তোমায় গাইতে শুনি নি কিছু। গাইবে আর একটা?

কৌশিক তাকাচ্ছে। দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে গাইছে—

ধাক না হাজার অযুত বাধা

নির্য দু'র যাত্রা কীসের ভয়, কীসের ভয়

সাহসী মোরা লাল যৌজ এই  
লাফিয়ে হই পার।

নীলোফা শুনছে। তাল দিচ্ছে। বলছে—বেশ গাও। খুব ভাল তোমার গায়া। এ বাব মানে  
বাও।

কৌশিক এক সাবলীল বালকের মতো বলছে— বাব। যদি একটা উত্তর দাও।

—কী?

—তোমার নাম কী?

—নীলু! নীলোফা।

—না।

—সে কী।

নীলোফা বোরখার আড়ালে রিনিঝিনি হাসে। বলতে থাকে—আমার নাম কী তবে?

—নীলুফার। তুমি আসলে নীলুফার। বা নীলোফার। মানে পদ্ম। নীলোফা কোনও পূর্ণ শব্দ  
নয়।

—তাই?

—হ্যা, এটা অশুদ্ধি।

কৌশিক স্নানঘরের দিকে গমন করে। আর চুপ করে বসে থাকে নীলোফা। অশুদ্ধি! হয়তো।  
তার সমস্ত অস্তিত্বের মতো নামেও এক অশুদ্ধি ঢুকে আছে। হয়তো এ-ই ঠিক। এ-ই ভাল।  
সে-ও তো অশুদ্ধই একরকম। এবং নীলোফা না ভেবে পারে না—তার নাম নিয়ে ইতিপূর্বে এ  
ভাবে ভাবেনি কেউ।

ক্রমে তিনটি দুপুরের পর এসে যাচ্ছে একটি চতুর্থ দুপুর। ইতিমধ্যে প্রণবেশ ও  
আনিসুজ্জামান কিছুই করে উঠতে পারেননি। প্রণবেশ পুলিশের সাহায্য নিতে রাজি নন।  
পুলিশের কথা শুনেই আনিসুজ্জামানের হাত আঁকড়ে ধরেছেন তিনি— পুলিশ নয়। পুলিশের  
কাছে নয়। গ্লিভ।

আনিসুজ্জামান, এই মাথুরের গড়ে আসা ইস্তক, সব পরিচিত মানুষের সমস্ত দুর্বলতা ধারণ  
করে আছেন। তিনি জানেন, প্রণবেশের হৃদয়ের গভীরে পুলিশ শব্দটি দগদগে ক্ষত হয়ে আছে।  
বারবার আলোচনা করছেন তাঁরা। বারবার ভাবছেন। কৌশিকের সামনে সব আলোচনা করা  
যেতে পারে না বলে তৃণাকুরের বাড়িতে বসে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। স্থির হয়েছে, আরও  
কয়েকদিন চেষ্টা করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। একদিন রাত্তায় তপন কথা বলেছিল  
আনিসুজ্জামানের সঙ্গে। কৌশিকের খোঁজ নিয়েছিল। কৌশিককে সে চেনে তা জানিয়েছিল  
কিন্তু তার বাড়ির খোঁজ দিতে পারেনি। একটি উপায় ভাবা হয়েছে আপাতত। কৌশিকের  
কলেজে গিয়ে পুরনো রেকর্ড থেকে যদি ওর ঠিকানা পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা আগে মনে  
আসেনি কারও। কলেজগুলিতে ছুটি পড়ে গেছে। যদিও তারই মধ্যে খোঁজ নেওয়া হবে বলে  
স্থির হয়েছে।

এ কথা বলা যাবে না যে কৌশিকের পূর্ণ বিশ্বস্তি হয়েছে। হতে পারে সে পরিবারে ফিরতে  
চায় না। হতে পারে সে ঠিকানা ভুলে গেছে। গ্রীষ্মের পিচগলা দুপুরে ঠিকানার সন্ধান ঘুরছেন  
আনিসুজ্জামান। সঙ্গে প্রণবেশ। আজও জুইকে জানাননি কিছু। নিয়ম করে অফিসের সময় হান  
করে খোঁয়ে বেরনছেন। জানিয়েছেন—গাড়ি আসবে না কিছুদিন। হঠাৎ যদি রাত্তায় কোথাও  
জুইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, প্রণবেশ কী বলবেন জানেন না।

আনিসুজ্জামান বলেছিলেন—বউদিকে জানাননি কেন?

প্রণবেশ বলেছেন—ও বুঝবে না। চোঁচামেঁচি করবে।

হয়তো। সংসার বোঝেন না আনিসুজ্জামান। এবং না বোঝার জন্য আবারও মনে মনে কুপ্তি।

বোধ করেন তিনি। তাঁর স্ত্রী নেই। বন্ধন নেই। চৌচামেটি বা কৈশিক নেই। বিকাশের বাড়িতে গেলে মাঝে মাঝে লক্ষীর শাসন ও চিৎকার কানে আসত। তৃণাভূরের স্ত্রী শব্দ যখন ছিলেন এ বাড়িতে তখনও চিৎকার শুনেছেন। বেপারোয়া অভিযোগ ও উদ্ভ্রমাল জিনিসপত্র চৌড়াখুড়ি টের পেয়েছেন। এ ছাড়া কলেজের অধ্যাপকরা যে-যার গৃহিণীর মোচড়া ও চিৎকারের কাহিনী শোনান মাঝে মাঝে।

অনিসুজ্ঞামানের বসার ঘরের দেওয়ালে ছড়িয়ে আছে খুলা ইস্তাহার। অনেক লেখার পর কৌশিক সে-সব ঘরে সঁটে নিচ্ছে। নীলোফা খুবই আপত্তি করেছিল কারণ এই ক্র্যাটের দেওয়াল, মেঝে, ঘরের কোণ থেকে বেশির পর্যন্ত ঝকঝকে ও সুন্দর বাঁধার দায় এ শিল্পবোধ তারই ওপর বর্তায়। তাদের রিপন স্ট্রিটের বাড়ির মোকদ্দম পুরা গালিচা পাতা থাকত। এবং তার তুলায় ছ' মাসের মফলা ও ধুলো জমত যা বছরে দু'বার পরিকৃত হত এবং নীলোফার তা পছন্দ ছিল না। ধুলো আবৃত করা গালিচাও তার পছন্দ নয়, যা, সে মনে করে, মাঝে মাঝে পাতা ভাল, তাহলে প্রতিদিনের ঘরটিকে অন্য রকম সখ্যত্রে পারে ঘটে এবং ধুলোও জমে না। আর এভাবেই সে দেখে এই দুনিয়া। তার ছোট দুনিয়া ওই সুপার মার্কেট, ওই বি টি রোড ও পি ডব্লু ডি রোডের সংযোগে তেমাথার মোড়ে বু'ধনি পেট্রল পাম্প, ওই শ্যাওলাধরা ব্যান্ডের বাড়ি, যেখানে সে টাকা তুলতে ও জমাতে যায়। এই পাড়া, এই ক্লাট— সবই তার প্রতিদিনের, চিরদিনের এবং চিরনতুন। দিন বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে, ঋতু বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে, রোজকার এই সবই সে নতুন করে পায়। শীতের দুপুরে বারান্দার যে জায়গায় তেরছা আলো পড়ে, গ্রীষ্মেই সে জায়গার রূপ বদলে যায়। আর শ্রুতে কেমন জাফরিকাতা রোদ্দুর। বাড়ির পিছনে ওই ঝাঁকড়া আমগাছ আর তার টবের গাছগুলিও এইসব বিচিত্র রোদ্দুর পেয়ে খুশি থাকে। এইসব পাওয়া, এইসব দেখাই তার প্রিয়।

রিপন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে আসার পর সে এক অন্য নীলোফা। ওখানে গাছ নেই, রোদ্দুর নেই, বই নেই, গান নেই। ইচ্ছেমতো মার্কেট যাওয়া নেই। ওখানে শুশু নিয়ম, নিষেধ, শুশু বাচ্চা পালন, শুশু পাপ-পাপ, পুণ্য-পুণ্য। অনিসুজ্ঞামানের সঙ্গে থাকতে থাকতে নীলোফারও ধর্মচরণে শৈথিল্য এসে গেছে। আজ্ঞার কাছে সে প্রতিদিন প্রার্থনা জন্মায়। কিন্তু সেও তার নিজের মতো করে। তার সঙ্গে ছোটবেলা থেকে শিক্ষা করে আসা নিয়মকানূনের কোনও মিল নেই। নীলোফা যদি দগ্ধ ও বিকৃত না হত, যদি তার একটি স্থায়ী দুঃখের জায়গা না থাকত, তাহলে, হয়তো, সে প্রচলিত রীতিগুলো আঁকড়ে রাখার কথা ভাবত। কিন্তু কষ্ট তাকে নির্ভীক করেছে। তাই তার পাপের ভয়ও নেই।

এখানে আসার পর প্রথম প্রথম যখন তাকে নিতে প্রায়ই গাড়ি পঠাতেন আমিনা, উৎসবের দিনগুলিতে সে রিপন স্ট্রিট চলে যেত, তখনও তার মনে থাকত সব। কিন্তু মনিরুল তৃতীয়বার নিকাহ করেছেন আর আমিনারও ইন্তেকাল হলে রিপন স্ট্রিটের বাড়ির হাওয়া বদলে গেছে। এখন, ও বাড়িতে, চাচেরা ভাই সব আলাদা-আলাদা। মাথুরের গাড়ের এই ক্লাটের দেওয়ালগুলি প্রথম দিন থেকেই নীলোফার প্রিয় ছিল। এখন তা প্রিয়তর হয়েছে। আর সেই দেওয়ালে কৌশিক সাদা ইস্তাহার সঁটেছে। পোস্টার সঁটেছে। নীলোফার রাগ হচ্ছে। অনিসুজ্ঞামান বলছেন— থাক। ও যা চায় করুক। পরে তোর দেওয়ালে আমি রং করিয়ে দেব।

নীলোফা কৌশিককে জিজ্ঞেস করছে— কী লিখেছে পোস্টারে?

কৌশিক বলছে— মাও সে তুঙ-এর একটা কথা।

—কী?

—If we tried to go on the offensive when the masses are not yet awakened, that would be adventurism.—If we did not advance when the masses demand advance, that

would be Right opportunism.

—যা বললে, তার এক বর্ণও যদি বুদ্ধতাম।

—মাও সে তুঙ-এর নাম জানো? শুনেছ?

—হ্যাঁ।

—কী জানো?

—ওই যে চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। কেতলালে লিখতে তোমরা। আর লোকে আলোচনা করত।

—মানে?

—মানে, মাও সে তুঙ একজন চৈনিক ব্যক্তি, তোমরা যাকে পূজা করত।

কৌশিক নীলোফার কাঁধ খামচে ধরে। চোখ দুটি তার ফুলিস হয়ে যায়। নীলোফাকে ঝাঁকতে ঝাঁকতে সে বলে— তোমার জিভ ঝিড়ে নেব আমি যদি ওই বুজোয়া শব্দটা আর একবার ব্যবহার করো।

নীলোফা ভয় পায়। ব্যথাও পায়। কৌশিকের জ্বলন্ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে সে কাঠ হয়ে যেতে যেতে কৌশিকের কাঁধ খামচে রাখা হাত ছাড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু কৌশিক উদ্ভাদ। ফিণ্ড। সে বলে চলে— পূজো। আমরা পূজা করি। পূজাকে আমরা ঘেঁষা করি। পূজা করে করে... বুদ্ধলে, পূজা করে করে এই দেশটার সারা গায়ে পচন ধরে গেল। ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম। পূজা-পূজা। প্রার্থনা-প্রার্থনা। গুরু-ভাগা-মন্ত্র-পীর। সমস্ত দেশটাকে অক্ষম করে দিয়েছে এইসব। বুদ্ধলে! অক্ষম! আর বলবে তুমি ওই শব্দটা। বলবে? বলবে?

—ছাড়ো। ছাড়ো। লাগছে।

নীলোফা ঝটকা দেবার চেষ্টা করে। এবং ঝঁকুনিতে, ছটফটানিতে তার মুখ থেকে বোরখার আবরণ সরে যায়। এক বলকে নীলোফা সেটি ঢেকে নেবার চেষ্টা করে কিন্তু ওই অনুপালে, ওই থাকায় সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যায়। এমনকী কৌশিক নিজেও এক জড়বৎ পৃথিবীর মতো নির্বাক হয়ে অপলক তাকিয়ে থাকে নীলোফার দিকে। নীলোফার কাঁধ থেকে তার হাত দুটি খসে পড়ে। নিলোফা অপ্রস্তুত বোধ করে। কী করা উচিত না জানে, না বুঝে ওঠার চেষ্টা করে। কৌশিক, এই কদিনে তার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত যে-স্বর, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও অনেক বেশি গভীর স্বরে বলে— দাঁড়াও।

নীলোফা অমেঘে আদেশের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ। কৌশিক তাঁর চোখে নীলোফাকে দেখতে দেখতে বলে— এই জনাই? এই জনাই তুমি এ রকম বোরখা পরে থাকো? বলো? বলছ না কেন?

নীলোফা ঘাড় নাড়ে। তার গলা শুকিয়ে গেছে। কৌশিককে সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে এখন। আবার কীরকম অপ্রতিরোধ্যভাবে ভালও লাগছে। সে বলছে—ঢাকো কেন? বলো? আমি ভাবতাম আনিসুজ্ঞামান সারের মতো মানুষের বাড়িতে এই গোড়ামি কেন। এখন বুঝতে পারছি। তুমি ঢাকো কেন? বলো?

নীলোফা কথা বলে না। কৌশিক বলে— তুমি যা, তুমি তাই। এ কথা মনে রাখো না কেন?

এতক্ষণে নীলোফা শান্ত কারুণ্যে বলে— সম্ভব নয়। কেউ সহ্য করতে পারে না যে।

কৌশিক হাঁটু মুড়ে নীলোফার মুখোমুখি বসে। দু'হাত দোয়া প্রার্থনার—অঞ্জলি দেবার ভঙ্গিতে প্রসারিত করে সামনে। তার চোখে আর তীব্রতা নেই। সমস্ত অস্তিত্বে কোমলতা ঢেলে সে বলে— সরাও। আড়াল সরাও।

—না। কিছুতেই না।

—আমি সহ্য করতে পারি নীলোফার। নিতে পারি।

—তবু।



—নিজেকে লুকিয়ে না। নীলোফার: তুমি পোড়া, এটা তোমার লুকানো নয়। তোমার যন্ত্রণা দেখে-বুঝে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, লজ্জা তাদের।

—না। আমি ঘৃণা সহ্য করতে পারি না। তুমি জানো না কৌশিক—কী দারুণ ঘৃণা আমি পাই—

—আমি ঘৃণা করি না। আমি ভালবাসি। সরাও নীলোফার: নিজেকে লুকিয়ে না।

নীলোফা পালাতে চায়। কৌশিক বলে— দ্যাখো, তোমার হাত ধরে আমি অটকাতে পারি। জোর করে অভয় সরিয়ে দিতে পারি। তুমি আমাকে রাগা দিতে পারবে না। কিন্তু আমি তা করব না। তুমি মেয়ে তো। আমাকে ভুল বুঝবে। তুমি নিজে থেকে সরাও। আমাকে দেখতে দাও।

নীলোফা যেন-বা স্বপ্নাবিষ্ট হয়। তার কণ্ঠ কড় হয়ে আসে। কৌশিকের উচ্চারণ— তা হতে পারে আদেশ, বা অনুরোধ, বা প্রার্থনা— তার অবিচ্ছিন্ন মনে হয়। এ ভাবে কেউ কোনওদিন তাকে বলেনি। বলেনি, কেন ঢেকে রাখো? আবরণ সরাও। বলেনি, আমি দেখব। তোমাকে দেখব।

কৌশিক আবারও বলে— সরাও নীলোফার। আমি দেখব। তোমার মুখ আমাকে দেখতে দাও।

নীলোফা আত্ননাদ করে— না না। তুমি দেখবে না।

—কেন? নীলোফার?

নীলোফা দু'হাতে মুখ চাপা দেয়। তার শরীর দুমড়ে দলা পাকিয়ে আসে। যেন সে নিজেই নিজের গর্ভে প্রবেশ করবে এবার। কৌশিক আবার বলে— বলো, নীলোফার, কেন দেখব না আমি বলো।

—তুমি সহ্য করতে পারবে না।

—কেন? কেন?

—তোমার গা শুশোনে। বমি পাবে। তুমি পালাবে।

নীলোফা কান্দে। কান্দতে থাকে। উৎক্লিষ্ট পীড়ার-ফাটা কান্নাকে অটিকে রাখার প্রয়াসে তার গলা থেকে জ্ঞাতুর শব্দ ছিটকোয়।

কৌশিক চঞ্চল হয়। বিচলিত হয়। আবেগে বলে— উঃ মাগো! দেখো। এ দিকে দেখো। আমি তো দেখছি তোমার মুখ। এক ঝলক দেখছি। আমি কি পালালাম বলো?

নীলোফা কান্নার দমকে কাঁপছে। বুঝি-বা আবেগেও। কী মধুর, কী আশ্চর্য সুরম্বজ কৌশিকের স্বর। তার আর কথা নেই। প্রতিবাদ নেই। পলায়ন নেই। সে দু'চোখ বন্ধ রেখেছে আর টের পাচ্ছে কৌশিক তার দুই কাঁধ স্পর্শ করছে। বলছে— আমাকে মুখ দেখাতে তোমার কোনও ধর্মীয় বাধা নেই তো নীলোফার? মুখ দেখানোর মধ্যে তুমি কোনও পাপ পাও না তো? দেখো, আমি তো ধর্ম মানি না। আমি জামাল কৌশিক, মানুষ ছাড়া কিছু জানি না আমি। নীলোফার।

নীলোফা মাথা নাড়ছে। কৌশিক বলছে— তা হলে আমি বুলি? খুলে দিই? তুমি কেন জানো না তুমি নীলুফার? সুন্দর সুগন্ধ সুবর্ণ পদ্ম। কেন তুমি বিশ্বাস করো না? উঃ নীলু— নীলুফার? নীলোফার?

নীলোফা ভেঙে পড়ছে এ বার। সম্পূর্ণ ধ্বস্ত হয়ে বলছে— জানি না। আমি জানি না।

কৌশিক নীলোফার মুখের কাপড় সরিয়ে দিচ্ছে। একটি একটি করে খুলে ফেলছে বোরখার বোতাম। চোখ বন্ধ করে আছে নীলোফা আর তার দুটি দম্ব, কসবসে, এবড়োখেবড়ো হয়ে যাওয়া, সাদা-কালো-বয়েরি ছোপ লাগা, গ্রীষ্মে উষ্ম হয়ে যাওয়া ফাটা ফাটা মুণ্ডিকার মতো মুখ দু'হাতে ধরে অনিমেয় দেখে নিচ্ছে কৌশিক।

গলা থেকে ভাঁজ ভাঁজ চামড়া উঠে গেছে চিবুকের তালে প্রাণতিহাসিক জন্তুরই মতো। দুই কাঁধে পিণ্ড পিণ্ড দলাপাকানো ত্বক। শুণু অক্ষত মঙ্গল কপাল ও চুলের প্রায়। কানের নতি দুটি গলিত। দল্ল সোমড়ানো গাল বেয়ে টান পড়া চোখ থেকে কাকিয়ারা পড়ে নামছে অশ্রু। নীলোফা তির তির কাঁপছে। কৌশিক তার পিঠে হাত রেখে কাছে টানছে ভারক। সে আর সংযত নয়, স্বকণ নয়, উদ্ভাসিত কান্নায় ভেঙে পড়ছে কৌশিকের কোলে। এত বছরের কষ্ট, অভিযোগ, অধিমান ও বেদনার ঢল এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে কৌশিকের শাশুরা পোশাক। কৌশিক টেনে নিচ্ছে নীলোফাকে। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে পিঠে, কপালে, গালে। কলছে—কলছে—খুব কষ্ট? খুব কষ্ট? আর না। আর কষ্ট পায় না।

সে ঠোঁট ভুবিয়ে দিচ্ছে নীলোফার চোখে। আর শুধে নিচ্ছে জল। আর ওই অক্ষতে ভেলা ঠোঁট সে বুলিয়ে দিচ্ছে নীলোফার কপালে, গালে, কানে, গলায়। সেইসব, প্রবর গ্রীষ্মের পর, বর্ষার শান্তির মতো শুধে নিচ্ছে নীলোফা। কৌশিক তার ঠোঁট রাখছে সমস্ত দলা পাকানো মাংসপিণ্ডে। আঁচল সরিয়ে দিচ্ছে। একটি একটি করে খুলে ফেলছে রাউজের ত্বক। পোড়া স্তনের গড়ন আর যথাবিধি নেই বলে অন্তর্বাস ব্যবহার করা সম্ভব হয় না নীলোফার পক্ষে। তাই রাউজের নীচে বিস্তৃত আছে অনাবৃত বুক। পুড়ে গিয়ে টান ধরেছিল দুই স্তনের মধ্যবর্তী উপত্যকায়। ডাক্তারের ছুরি সেই টান কিছুটা উপশম করেছে। উপত্যকার দিকটি নিচু। নমিত। অনাপাশে বিস্তার। পোকা লাগা আশ্রয়নের মতো কিংবা দুটি পেয়ারা বা পেঁপে—পোকা লেপে বাঁকা ও বিকৃত—এমনই গড়ন। এতটুকু নিটোল চামড়া নেই। যেন আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে নিঃসৃত জ্বলন্ত গলন্ত লাভা গড়াতে গড়াতে নেমে গেছে অমিত ভূমণ্ডলে। আর এখন ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেছে। কৌশিক মুখ রাখছে সেই কঠিন অমঙ্গল উপত্যকায়। সেই বিকৃত স্তনশীর্ষে। নীলোফা ধরা দিচ্ছে। সাজা দিচ্ছে। তার পুড়ে যাওয়া ত্বকের নীচে বহমান সমস্ত অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠছে অনিবার্য পুষ্পদল বিকাশের মতো। যদিও সে জানে না তার ত্বক—এই ভাল লাগা, এই সর্গ, এই ফুল, এই ফলস্ত পৃথিবী, এই রঙে রঙে রাতানো আকাশ অনুভূতি-বার্তাগুলি মস্তিকে পৌঁছে দিতে সক্ষম কি না। তবু সে জাগছে। জেগে উঠছে। এক মানসিক নারী। কৌশিক নিজস্ব পুরুষ দিয়ে নারী জাগিয়ে তুলছে। তার সমস্ত বিশ্বাসের ইত্যাহারের সামনে সে গ্রহণ করছে এক নারীকে যার পৃথিবীর কাছে মুখ উন্মোচন করার উপায় নেই। যার প্রাণ দল্ল হয়নি। অনুভব দল্ল হয়নি। শুধু পোড়া শরীরের পাশে সে ক্রিষ্ট হয়ে আছে।

কৌশিক দুই হাতে জড়িয়ে নিচ্ছে পোড়া শরীরের দাগ। নীলোফার প্রথম বিদীর্ণ হওয়ার যন্ত্রণা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। লাগছে। খুব লাগছে। কিন্তু এ যন্ত্রণাও অপক্লপ আনন্দ প্রতিভাত হয়ে উঠছে তার কাছে। সে চোখ খুলছে। বহুক্ষণ পর চোখ খুলছে। নারী ঘরে গ্রীষ্মের দুপুরে ঝলসানো আলো। নীলোফা অনাবৃত হয়ে আছে। এই প্রথম সূর্য তার শরীর দেখার অধিকার পেয়েছে। এই প্রথম হাওয়া এসে ঝাঁপ নিচ্ছে সেখানে। আর নীলোফা সেখানে, তার শরীরের মধ্যে শরীর—পরম আনন্দে ঝলমল করছে পরিতৃপ্ত চাঁদ। তার গালে এক দিনের দাড়ি গাঢ় জ্যোৎস্নার মতো সবুজাভ হয়ে আছে। কপালে, নাকের ডগায়, নশ্বরের মতো স্বেদ বিন্দু বিন্দু নিটোল অপরিমেয়। যেন এক প্রকৃত পুরুষ, পরমা নারীকে জুড়ে ধ্যানস্থ আছে। সে বলছে—আমি তোমাকে দেখলাম। এই আমার ভারতবর্ষ। দল্ল। কলসানো। রিক্ত। আমি তোমাকে নিলাম। এই আমার দেশ। তোমার এ পোড়া শরীরের নীচে সব আছে। সব প্রাণ। সব প্রেম। সব অনুভূতি। তোমার প্রতিটি বিকৃত দলাপাকানো মাংসপিণ্ডকে আমি দেখলাম খরায় বন্যায় অন্ধকার কষ্টজর্জর শোষিত অস্তিত্ব। এসো। তোমাকে সুস্থ করে দিই। ও আমার দেশ। আমি তোমার। আমি এসেছি। আমি আসছি।

নীলোফা পীরবাবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল পরিপূর্ণ অতৃপ্ত। সে চেয়েছিল এমন পুরুষ—যে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। আজ তার প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে।



কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। শুধু মাথুরের গড় নয় ; শুধু দিকে দক্ষিণেশ্বর, কামারহাটি, সোদপুর, বেলঘরিয়া—অন্য দিকে টবিন গোড, সিঁচি কোড়, চিড়িয়া মোড়, শ্যামবাড়ার—কিছুই বাকি রাখলেন না প্রণবশ আর অনিসুজ্ঞামান। এমনকী সত্য যে মোটামুটিভাবে কৌশিককে মনে করতে পারছিল, সেও আপন ইচ্ছা বরানগরের নানা জায়গা, কাশীপুর, দক্ষিণ সিঁচির গলি-বুঁজি ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগল চিত্রিত অধ্যাপককে। কিন্তু পাওয়া গেল না। তখন কয়েকটি জায়গায় যাবার সম্ভাবনার কথা বলেছিল, সেই তাদের কলেজে পড়ার সময়কার কিছু লুকনো আড্ডার জায়গা, সে-সব জায়গাও বাদ পড়েনি। কিন্তু নেই।

আবারও পুলিশের সাহায্য দেবার কথা তাঁদের মনে পড়ল এবং আবারও সেই মনে হওয়াকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করলেন এই ভেবে যে, কৌশিক এতদিন কোথায় ছিল তার স্পষ্ট ধারণা না থাকায় পুলিশের হস্তক্ষেপ তার পক্ষে অশুভ হয়ে উঠতে পারে। সব কিছু ভেবে বরং হাল ছেড়ে দিলেন তাঁরা। অনিসুজ্ঞামানের মধ্যে এ আশঙ্কা সর্বক্ষণ ছিল যে সে দরজা খুলে চলে যেতেও পারে কারণ এ তো ঠিক যে সে সংলগ্ন আচরণ করছিল না। তাঁরা, অতএব খুবই দুঃখের সঙ্গে যে-যার কাজের দিকে মুখ ফেরালেন এই ভেবে যে, কৌশিক হয়তো-বা নিজেকে একবার মনে করিয়ে দেবার জন্যই যে সে মেরেনি, এখানে এসেছিল। চলেও গেছে। বহু বিষয়তার মধ্যেও তাঁরা নিজের নিজের কাজের পরিকল্পনায় মন দিলেন, মন দিতে সক্ষম হলেন, কেননা, দু'জনেরই প্রিয়জন হারানোর অভিজ্ঞতা আছে এবং হারাবার পর শ্বাস নিরুদ্ধ করে দেওয়া গভীর জলের তলা থেকে একটুখানি বাতাসের জন্য মরিয়া হয়ে ভেসে ওঠার প্রক্রিয়াও তাঁরা অর্জন করতে পেরেছেন। যে হারিয়ে যেতে চায় তাকে খোঁজার মধ্যে অর্থহীনতা থাকে। আগলে রাখা তাকেই সম্ভব যে আগল স্বীকার করে নেয়। যে মানতে শেখেনি তার ওপর জোর করা যায়, কিন্তু মানিয়ে তোলা যায় না।

কিন্তু নীলোফা ক্রমশ ভুবে যাচ্ছে এখন। ভুবে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব কি না তাও সে ভাবতে শেখেনি। সে, যেহেতু পীরবাবার দক্ষিণ্য বুকে সাপটে নিয়েছে এবং সে-কথা মরে গেলেও মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারবে না, এমনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে—অতএব তার গভীর আনন্দের পর গভীরতর দুঃখ বোরখার আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে যা দেখার জন্য আর কেউ এই গৃহে রয়ে গেল না। এমনকী বলেও গেল না, সে, তার এই দীর্ঘপ্রতিম দৃষ্টি নিয়ে চলে যাচ্ছে কোথায়, কেন যাচ্ছে, বা আবার ফিরে আসবে কি না। সে অতএব এই দুঃখ ও করুণ একাকিত্ব একা একা আগলাচ্ছে, সামলাচ্ছে, বহন করছে এবং যেহেতু কথা সে খুব বেশি বলে না, বলছে না, সূত্রায় সেই নীরবতাও ধারণা মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতার অনুভব জাগাচ্ছে না।

প্রথমে কৌশিকের এই নীরব পরিভাষণ, যা কিনা গৌতম বুকের ত্যাগের মতোই নিষ্ঠুর, অনিবার্য ও প্রশংসনীয়—নীলোফা বিশ্বাস করেনি। সে-দিন থেকে প্রায় সাতদিন, দশদিন সে প্রতীক্ষা করেছে। এমনকী গভীর প্রতীক্ষায় তার হৃদযন্ত্র অতি দ্রুত ক্রিয়ানীল থেকেছে সর্বক্ষণ। ভোরবেল বাজলেই সে ছুটে গেছে এই ভেবে যে যদি কৌশিক ফিরে আসে এবং সে আশাহত হয়েছে। তবু এই ভেবে সে প্রাণ বেঁধেছে যে কৌশিক ফিরবে, ফিরবেই, কেননা সে ই একমাত্র যে নীলোফার সমুহ কষ্ট অনুভব করেছে এবং শুধু নিয়েছে দুঃখ-যন্ত্রণা সমেত চোখবাহিত জলবিন্দু। আর চিত্ত অসংবত হয়েছে, উত্তাল হয়েছে এবং বেপরোয়া কান্নার ভেসে যেতে যেতে

তার মনে হয়েছে এরই নাম বৃষ্টি প্রেম এবং এই ভেবে দহন জেগেছে যে এর নাম হয়তো প্রেম নয়। আত্মকরণা ছাড়া এ কিছু নয়। কারণ সেইদিন, সেই মিলন ও বিরহ রচনার, জে জানে, হয়তো বিচ্ছেদ রচনারও দিনে আনিসুজ্ঞামানকে খোঁজার তার মাতি থেকে ছিটিকার সমেত একটি শিখা জ্বলতে জ্বলতে হারিয়ে এসেছিল এবং সে ভেবেছিল—হায় তোমা! একী করলাম! আমি এ কী করলাম! সে, জামাল কৌশিকের রেখে যাওয়া পোশাক ভাজিয়েছে বাতাসে, তার দাড়ি কটিবার সরঞ্জাম ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছে, তার ব্রাশে আঙুল রেখে অনুভব করছে চোখেই কেনও সকালবেলার ছাপ। এবং, এই প্রত্যেকটি ক্রিয়ার কালে আনিসুজ্ঞামানের সঙ্গে কেন বিচ্ছেদ হয়েছে তার, এমনই বেদনা সে বোধ করেছে।

ফলে কদিন সে এতটুকু সেতার বাজায়নি। আর আনিসুজ্ঞামান তা লক্ষ্য করেছেন এবং এক সম্ভার খুবই তাপিত কণ্ঠে বলেছেন—‘একটু বাজা নীলু। বাজা। হোর বাজনা জ্বলে তেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।’

সে তেমন বাজিয়ে নয়, তেমন শিল্পী নয়, তবু শিল্পী মাত্রেরই সেই প্রতীক্ষা থাকে যে অন্য কোনও হৃদয়কে জাগিয়ে তুলবে এবং দেবে শান্তি বা প্রজ্জ্বলন। অতএব সে সেতার নামিয়েছিল এবং হয়তো-বা নিজেকেই ঠাণ্ডা করার জন্য আঙুল চালিয়েছিল। কিন্তু তার চোখে জল এসেছিল এই ভেবে যে এমনই যন্ত্রে কেউ তার শরীরে আঙুল রেখেছিল, তখন বৃষ্টি সে নিজেই সেতার একজন, আর সেতার ও সেতারি দু’জনেই স্বর্গের সুখ বা বেহেস্তের আনন্দের চেহেও উপচানো, অতিরিক্ত সুখে সুরের মতো পাক খেয়ে খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল হাওয়ায়—এমনটি আর সম্ভব হবে না।

অতএব নীলোফা, কখন কার জন্য তাপিত হল, দুঃখিত হল, তা তার নিজের কাছেও স্পষ্ট থাকল না। কিন্তু বাইরে থেকে বোরখা ঢাকা সেওয়া নীলোফা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল মোটামুটি এবং আনিসুজ্ঞামান তাঁর পরবর্তী প্রবন্ধের দিকে যাবার জন্য কেন্দ্রীয় পাঠাগারে যাওয়া-আসা শুরু করলেন। সেই সঙ্গে তাঁর কলেজের ছুটি ফুরিয়ে এল।

প্রথম দিন, কলেজ খোলার পর, অধ্যাপক অজিতভূষণ বললেন—হ্যাঁ, বইখানা পড়লাম। বেশ খেটে করেছি। তবে দুর্গার প্রতি গভীর অনুভব ও শ্রদ্ধা তোমার লেখায় নেই। অবশ্য না থাকটিই স্বাভাবিক।

আনিসুজ্ঞামান চমকিত হলেন। লজ্জিত বোধ করলেন। হিন্দুদের কাছে বিশেষত বাঙালির কাছে, দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য কতখানি তিনি অনবহিত নন। এ লেখা তৈরি করার সময় গবেষকের দৃষ্টি ছিল কিন্তু কোথাও অশ্রদ্ধা ছিল না। তিনি খুবই বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—শ্রদ্ধার অভাব কোথায় আছে বলে আপনার মনে হয়েছে যদি বলেন তবে আমি নিশ্চয়ই শুধরে দেব।

অজিতভূষণ এড়িয়ে যান কিন্তু জুলজির অধ্যাপক মুগেন সেন বলেন—আপনি তো দু’হাতে দুয়ার কথাও লিখেছেন। সে কোথায় পেলেন শুনি? দুয়ার যে পৌরাণিক বর্ণনা তাতেই তো দশ হাতের কথা আছে। ওই যে, মহালয়ায় বলে না অমুকে অমুক অগ্নি দিলেন।

অজিতভূষণের ঐতিহাসিক জ্ঞান টনটন করে। তিনি বলেন—না না মুগেন, দ্বিভুজা দুর্গার পূজা হত এককালে। এখনও কোনও কোনও পারিবারিক পূজায় এ রীতি প্রচলিত আছে।

বাংলার অধ্যাপক শক্তি আচার্য গভীর মতামত দেন। বলেন—তবে দুয়ার দশ হাতই থাক আর দু’হাত—হিন্দু দেবদেবীর প্রতি একজন হিন্দুর যে শ্রদ্ধা থাকবে একজন মুসলমানের তা থাকতেই পারে না। মুসলমানরা মূর্তিপূজা মানে না।

বসে তরুণ ফিজিঞ্জের অধ্যাপক সঞ্জয় বসু বছরখানেক হল কলেজে যোগ দিয়েছেন। হয়তো আর বেশিদিন থাকবেন না। চলে যাবেন আমেরিকায়। বললেন—শক্তিদা, বইটা আপনি পড়েছেন?

শক্তি আচার্য মাথা নাড়েন—না। পড়িনি ভাই। তবে অজিতবাবু তো পড়েছেন। তাই বলছি।

সঞ্জয় তাঁকে প্রায় থামিয়ে দিয়ে বলেন—আপনি পড়েননি, এই তো? কিন্তু আমি পড়েছি। খুবই নিরপেক্ষ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা। লেখা পড়ে একটুও মনে হয় না শ্রদ্ধার অভাব আছে বা কোনও মুসলমানের লেখা বলে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে। উনি যদি কোনও হিন্দুর ছদ্মনামে লিখতেন তবে আপনারা ধরতে পারতেন? তা ছাড়া আমরা সবাই জানি, আনিসুজ্জাদার একেবারেই ধর্মের গোঁড়ামি নেই।

শক্তি আচার্য চড়া গলায় বলেন—শোন হে, ধর্ম মানা না-মানায় কিছু এসে যায় না। এ এমন জিনিস যে আমরা জন্মাবধি সঙ্গে করে বেড়াই। কম দেখলাম এ পর্যন্ত! যতবার হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছে ততবার ক্ষিপ্ত উন্মত্ত মানুষগুলো পরস্পর কাটাকাটি করেছে এই বলে যে, এ হিন্দু কাটি—ও মুসলমান কাটি। তুমি কি বলতে চাও এরা গভীরভাবে ধর্ম পালন করত? মোটেই না। কাটাকাটি করার আগে হয়তো মনেও ছিল না সে নিজে হিন্দু না মুসলমান।

সঞ্জয় বসু স্বাভাবিক কিন্তু দৃঢ় গলায় বলেন—এই তো আপনি পরস্পরবিরোধী কথা বলছেন, যারা দাঙ্গায় অংশ নেয় তারা স্বাভাবিক অবস্থায় মনেই রাখে না তারা হিন্দু না মুসলমান। দাঙ্গা লাগলে হঠাৎ এই বোধ মাথা-চাড়া দেয়। এটা ধর্মের প্রতি আনুগত্য নয়। এটা গণহিস্টরিয়া। একধরনের সার্বিক পাগলামি বা মানসিক মড়কও বলতে পারেন। তার সঙ্গে একটা গবেষণামূলক কাজের তুলনা করাটা অন্যায়। আমি বলব নীচতাই একরকম, কারণ গবেষণাধর্মী কাজ সামগ্রিক সচেতনতা ছাড়া সম্ভব হয় না।

শক্তি আচার্য টেবিলে ঘুঁষি মারেন। রাগে বা তরুণ অধ্যাপকের স্পর্ধায় তার বাক্য সরে না। বলেন—তো-তো-তোমার সা-সা-সাহস তো কম নয়! আমাকে তুমি অ-অ-অপমান করছ!

অজিতভূষণ উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করেন। আর মুখ প্রায় টেবিলের প্রান্ত পর্যন্ত নিচু করে বসে থাকেন আনিসুজ্জামান। তিনি একটি কাজ করেছেন। কাজ হিসেবেই করেছেন। সারা জীবনে যে-কাজ তিনি করবেন বলে ভেবেছেন—এ তার অংশমাত্র। কিন্তু এ কী প্রতিক্রিয়া! তাঁর পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে যায়। তিনি দু'হাতে চুল খামচে ধরেন। তাঁর ধারণা হয় যে এঁদের কারও হয়তো মনে নেই আলোচ্য মানুষটি এখানেই বসে আছেন। মনে মনে নিজেকে ঘাঁটতে থাকেন তিনি। মনের অন্ধ-সন্ধি হাতড়ে বেড়ান। বুঝতে চেষ্টা করেন, কাজগুলি করার সময় তাঁর মধ্যে কোনও ধর্মসচেতনতা ছিল কি না! না। ছিল না। এমনই উত্তর অন্তরে রচিত হয়। দেব-দেবী বা প্রাচীন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণামূলক রচনাগুলি মানুষের ইতিহাসই প্রকাশ করে— এই তাঁর বিশ্বাস। এবং একজন মানুষ হিসেবেই এ কাজ তিনি করেছেন। কিন্তু এতখানি আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা সত্ত্বেও সহকর্মীদের আচরণ তাঁকে যন্ত্রণা দিতে থাকে। সঙ্গে মিশে থাকে অপমান। তখন, ঘরে ঢোকে সহ-অধ্যক্ষ, ইংরাজির অধ্যাপক দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়। গোলমাল থেমে যায়। দীপঙ্কর গভীর গলায় ডাকেন—আনিসুজ্জামান—ভাই—

আনিসুজ্জামান উঠে দাঁড়ান। দেখতে পান প্রবীণ অধ্যাপক অর্ধশতাব্দী মেলে দু'হাত বাড়িয়ে বলছেন—উঠে এসো, ভাই, কী কাজ করেছ! একেবারে সম্পূর্ণ। একেবারে সমগ্র।

আনিসুজ্জামান এগিয়ে আসেন। অধ্যাপক দীপঙ্কর তাঁকে বুক টেনে নেন। প্রবীণ অধ্যাপকের দীর্ঘ, মেদবহুল, ধবধবে ধুতি ও শার্ট পরা শরীরের ভাপে তাঁর এতক্ষণের খারাপ লাগাগুলি পুড়ে যায়। তিনি দীপঙ্করের পা স্পর্শ করেন। দীপঙ্কর বলেন—তুমি যদি আমার ছাত্র হতে ভাই, ভারী গর্ব হত। এই যে এখন আমি মাঝে মাঝে আর্থিটিসিস মেঝেতে পা রাখতে পারি না, তার বদলে তখন আমি গর্বে পা মাটিতে ফেলতুমই না। কাজ করো। কাজ করে যাও। আমার শুভেচ্ছা রইল। অনেকে অনেক কথা বলবে। কান দিয়ে না। যে কাজের সংকল্প নিয়েছ, তা শেষ করো।



অনিসুজ্ঞামানের চোখে জল এসে যায়।

বাড়ি ফেরার পথে আবার বিষম বোধ করেন অনিসুজ্ঞামান। কিন্তু অনুপ্রাণিতও হোম করেন। ভাবতে অবাক লাগে যে কী করে এক কচকাষ চেনা মুখগুলি অচেনা হতে যায়। শক্তি আচার্য, মৃণাল সেন বা অজিতভূষণ—কেউই আগে এ ভাবে কথা বলেেননি। অনিসুজ্ঞামান প্রত্যেককেই ভাবতেন ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। আবার মৃত্যু—সেও সম্পূর্ণ নতুন মাত্রায় নিজস্ব ব্যক্তিত্ব উন্মোচন করেছে আজ। সঞ্জয় কখনও অনিসুজ্ঞামানের অন্তরঙ্গ হননি। বইটিও তিনি নিজেই চেয়ে নিয়েছিলেন। অল্প তাঁরই ছিল সবচেয়ে কাছের বন্ধু বৃন্দিকায়। অনিসুজ্ঞামান জানেন, উপলব্ধিও করেছেন এতকাল যে জীবন এইরকমই—ভালো-মন্দ। উদার-অনৈদার্য। তবু সম্পূর্ণ কই তাড়াতে পারেন না মনে থেকে। বৌদ্ধধর্মকে পেয়েও হারিয়ে ফেলার এবং তার জন্য কিছুই করতে না পারার গভীর বেদনা আজকের কণ্ঠে মিলে গিয়ে হতাশার জন্ম দেয়। এই ভার অনিসুজ্ঞামানের শব্দে দুর্বিসহ বোধ হয়। বাড়ি ফিরে এসে নীলোফার কাছে উপরে সেন সব।

নীলোফা সব শুনে বলে—আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন ভাইজান, আপনার মতো মানুষ যেমন আছেন তেমনই আমার আকাজানের মতো মানুষেরও অভাব নেই। বলতে গেলে সংখ্যায় তাঁরই বেশি।

অনিসুজ্ঞামানের চমক লাগে। তিনি কৃতজ্ঞতার চোখে নীলোফার দিকে তাকান। তাঁর কুক টন টন করে কারণ এই কথা এই উচ্চারণ যে-মুখে—সেখানে মায়াময় মাতৃহৃৎ লাগে। সে-মুখ দেখতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু উপায় নেই। কোনও উপায় নেই। নীলোফা যা বলেছে তিনি নিজেও সে-কথা কতদিন ভেবেছেন। তবে আজ কেন মনে পড়ল না? আর নীলোফা তা কত অনায়াসে বলে দিল। যেমন বন্ধু বলে বন্ধুকে। যেমন মা বলে ছেলেকে। যেমন স্বামী বলে স্ত্রীকে বা স্ত্রীও স্বামীকে। সম্পর্ক বাই থাক, মানুষ মানুষের আশ্রয় হয়ে উঠছে তখন। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে বোঝাই তাপিত, ক্রিষ্ট, যন্ত্রণায় বিদীর্ণ মানুষ গুহে ফিরে আসছে শান্তির আশায়। ভাবছে, সমস্ত অপমান, দাহ ও যন্ত্রণা উপশম করে দেবে কেউ। তেমনই অনিসুজ্ঞামান, তেমনই নীলোফা। বেদনার্ত অনিসুজ্ঞামানের জন্য পরিপূর্ণ আশ্রয় হয় নীলোফা। তার নিজের কষ্ট কই? নেই। তার নিজের যন্ত্রণা কই? নেই। সে সমস্ত লুকিয়ে রাখছে আর সে চায় অনিসুজ্ঞামানের জন্য শান্তি এনে দিতে।

অনিসুজ্ঞামানের সব ভার নেমে আসতে থাকে। তিনি শিশুর সারল্য হাসেন। নীলোফারও বুকের তলায় মোড়ল লাগে। দ্বিতীচিহ্নিত ওই অসুন্দর মুখের হাসিও অপাধিবি লাগে তার। সে প্রশ্ন করে—খিদে পায়নি বুঝি ভাইজান? থাকেন না?

অনিসুজ্ঞামান পরম নির্ভরতায় বলেন—হ্যাঁ, খাব। কী বানিয়েছিস রে নীলোফা?

—ময়দা মেখে রেখেছি। পরোটা আর ভাজি করে দিই?

—দে। একটু বেশি করে বানাবি নীলু? মাতুলাকে ডাকি?

নীলোফা মাথা নেড়ে রাগাঘরে যায়। অনিসুজ্ঞামান তৃণাকুরের খোঁজে বান।

তৃণাকুর আজ কলেজ যাননি। ইদানীং তাঁকে বেশ সুস্থ লাগে। যদিও কলেজ যাবার দিনসংখ্যা তিনি বাড়াননি। কিন্তু নিজে নিজে হাটা-চলার প্রবণতা বেড়েছে। নির্ভরশীলতা ছাপিয়ে আজকাল মাঝে মাঝে বাজারে যেতেও দেখা যায় তাঁকে। কথায় কথায় উজ্জ্বল হাসি ও কৌতুকের ঢল এসেছে তার স্বভাবে। অনিসুজ্ঞামান টের পান, বিষয়তা উধাও করা এই হাওয়াটির নাম সম্ভবত রাসিকা। আর রাসিকাকে নিয়ে নীলিমা ও তৃণাকুরের মধ্যবর্তী বন্ধ ও অশান্তির আঁচ অনিসুজ্ঞামানের কাছে গোপন নেই। নীলিমাকে বোঝেন অনিসুজ্ঞামান। যতই উদার হোন, বি-কে বি বলে না দেখে শুধু মানুষ বলে দেখার মতো উদার—তিনি পৌছতে পারেননি। এতে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। এক জীবনে নীলিমা যত সংস্কার পেরিয়ে



এসেছেন—সে অনেক। সব মানুষই কিছু-না-কিছু সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু তৃণাকুর ও রাধিকার সম্পর্ক নিয়ে আনিসুজ্জামানের কোনও আপত্তি বা অভিযোগও নেই। শ্রেণীগত দিক থেকে ঝি বা বস্তিবাসী হলেও মেয়েটি ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন। তার চেয়েও বড় কথা হল কেউ কারও দ্বারা মানসিক শূন্যতা অতিক্রম করে গেলে অন্য কারও আপত্তি করার কোনও অধিকার নেই। এ বিষয়ে আনিসুজ্জামান খুবই নিরপেক্ষতা গ্রহণ করেছেন।

আনিসুজ্জামান ঢুকতেই তৃণাকুর হাতের মোটা বইটি নামিয়ে রাখলেন। বললেন—কী? বইয়ের প্রতিক্রিয়া কেমন?

আনিসুজ্জামান অবাক গলায় বললেন—প্রতিক্রিয়া! আপনি কী করে জানলেন!

তাদের মধ্যে বই সম্পর্কে কথাবার্তাগুলি চলতে থাকে। তৃণাকুর চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। এ রকম কিছু হবে অনুমান করেছিলেন তিনি। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার পাতলা আবরণ সরিয়ে ফেললে যে-মুখ সহজে বেরিয়ে আসে তার সন্ধান পেয়েছেন তিনি ইতিপূর্বে। তাঁর কলেজের অধ্যাপক রজতকান্তি যখন একটি মুসলমান ছাত্রীকে বিয়ে করেন তখন গোটা কলেজের চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত নড়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন রজতকান্তি প্রাণ সংশয়ে ছিলেন কারণ তাঁর স্ত্রীর ভাইয়েরা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। সেইসঙ্গে রজতকান্তি অন্যান্য অধ্যাপকদের দ্বারা পরিত্যক্ত ছিলেন অনেকদিন। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কিন্তু আজও রজতকান্তি সম্পর্কে কোনও প্রসঙ্গ উঠলে তাঁর মুসলমান স্ত্রীর কথাও অনিবার্য এসে পড়ে।

তৃণাকুরের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে নীলোফার পরোটা সংবাদ পেশ করেছিলেন আনিসুজ্জামান। রাধিকা ঘুরে ঘুরে এ কাজ ও কাজ করছিল। তার বাড়ি যাবার সময় পেরিয়ে গেছে। এখন আর সময় মানে না সে। যতক্ষণ পারে থাকে। নীলিমা গজ গজ করেন—বাচ্চাটার প্রতি একটু টান পর্যন্ত নেই। অন্যদের দেখে, বাড়ি যাবার জন্য কীরকম ছটফট করে! আর এ? কে বলবে দুধের বাচ্চা ফেলে এসেছে!

আনিসুজ্জামানের কথা শুনে রাধিকা বলল—আমি ডিম-পাঁউরুটি করুম ভাবসিলাম।

নীলিমা রামকৃষ্ণ কথামৃত হাতে নিয়ে বসেছিলেন। বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন—তোমাকে আর ভাবতে হবে না। বাড়ি যাবার তো তাড়া নেই। তার চেয়ে যাও, নীলোফাকে একটু সাহায্য করো।

রাধিকা মাথা নিচু করে চলে যায়। তৃণাকুর ও আনিসুজ্জামান পা বাড়ান। নীলিমা বলেন—আমাকে বাদ দিয়ে না।

আনিসুজ্জামান হাসেন। বলেন—কখনও না।

আনিসুজ্জামানের ঘরে এসে তৃণাকুর ডিভানে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসেন। নীলোফাকে ডেকে বলেন—নীলু। শোন। পরোটা পরে বানাবি। আগে বল। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম গল্প কী?

নীলোফা হেসে বাজে। বলে—জানি না মাস্তুদা। আপনি বলুন।

তৃণাকুর বলেন—ভাল করে শোন। মন দিয়ে। বলব আর ফুরিয়ে যাবে কিন্তু। আর কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। শুরু করছি—

দুইটি শিকারী। একটি বাঘ।

একটি শিকারী। একটি বাঘ।

একটি বাঘ।

আনিসুজ্জামান গলা ছেড়ে হেসে ওঠেন। নীলোফা অনুধাবন করতে একটু বেশি সময় নেয়। তারপর সেও হাসে। আর হাসতে হাসতে আনিসুজ্জামানকে দেখে। এ ভাবে হাসিতে ফেটে পড়তে সে ভাইজানকে এই প্রথম দেখল!

রাধিকা পরোটা বেলছে। নীলোফা ভাজছে। রান্নাঘরে জায়গা নেই। রাধিকা বলেন—চাকি, তেলের বাটি, ময়দার তাল ও থালা নিয়ে ছড়িয়ে বসেছে বসার ঘরের মেঝেয়। মাঝে মাঝে

ময়দাটি ঠেসে নিচ্ছে খানিক। কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক নিরুপায়তায় সে শুনেছে তৃণাকুর ও আনিসুজ্ঞামানের কথোপকথন। তৃণাকুর বলছেন—তোমার জন্য খবর আছে।

—কী খবর?

—তোমার গবেষণার কাজে আগ্রহী একজন শিগগির আসছে ঢাকা থেকে। আমি তাকে চিনি না। তবে শুনেছি খুবই উজ্জ্বল ও মেধাবী। তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য অবশ্য কলকাতা দেখা এবং তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তোমার সঙ্গে কথা বলে সে তার পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক করবে।

আনিসুজ্ঞামান উৎসাহিত হন। আগ্রহের সঙ্গে বলেন—কবে আসছেন? কী নাম?

—সম্ভবত সাতাশে আসবে। তোমার এখানেই থাকবে প্রথম কয়েকদিন। তারপর শান্তিনিকেতন চলে যাবে। ছেলেটির বৃত্তান্ত অদ্ভুত, জানো।

—কীরকম?

—ওর বাবা নিরক্ষর। কিন্তু সম্পন্ন চাষী। ওদের পরিবারে ও-ই প্রথম অক্ষর চিনতে শিখেছে।

—বাঃ! চমৎকার! নাম কী ছেলেটির?

—শমসের। শমসের চৌধুরী। বা পুরো নাম বোধহয় শমসের রহমান চৌধুরী।

রাধিকার দম বন্ধ হয়ে আসছে। পরোটা চাপ দিচ্ছে সে। খুব চাপ দিচ্ছে। চাকিতে—বেলনে মাথামাখি হয়ে যাচ্ছে ময়দার তাল। সে ভাবছে—ঢাকা থেকে আসবে! শমসের! শমসের চৌধুরী, শমসের রহমান চৌধুরী, নিরক্ষর সম্পন্ন চাষীর ছেলে! এ কোন শমসের? সে নয় তো? হে ভগবান! পৃথিবীতে কত শমসের আছে? কত? রাধিকার মাথা টলমল করে। সারা শরীর অবিরল ঘামে ভিজে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে প্রকাশ অবরুদ্ধ রাখে সে।



এই মাথুরের গড়। এই ভুখণ্ডের উত্তরে রেললাইন ও তার ধারে ফটিক বিল। ফটিক বিলের ধারে যে জনবসতি, দরিদ্রের বাসভূমি বলে তা বস্তি নাম পায়। লোকে বলে ফটিক বিল বস্তি। এই ভুখণ্ডের পশ্চিমে গঙ্গা ও দক্ষিণেশ্বর। উত্তর-দক্ষিণে সদাব্যস্ত বি টি রোড এবং বি টি রোড থেকে একটি শাখার মতো রাস্তা বেরিয়ে এসেছে পি ডব্লিউ ডি রোড, যা দক্ষিণেশ্বরের অভিমুখে গেছে। অর্থাৎ ফটিক বিলের অবস্থান বলা যায় উত্তর-পশ্চিমের কোণে এবং মাথুরের গড়ের সূর্য সেখানে প্রথম আলো কখনওই ফেলেন না। প্রথমে তিনি লাফিয়ে নামেন অরুণ সেনের ছাদে এবং ছাদের আলসেয় জোড় আসন করে বসে দরিদ্র জনগণকে আলো বিতরণ করেন। এ নিয়ে কখনও কোনও প্রশ্ন ওঠেনি কারণ এমনটাই হয়ে আসছে চিরকাল। আর, যা চিরকাল ধরে হয়ে আসে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকে। এতটাই অস্বাভাবিক যে যুগে যুগে যে-ইতিহাস রচিত হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে এই মহাজগৎ সম্পর্কিত প্রত্যেক মূল প্রশ্ন ও যথাযথ উত্তরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হত্যা ও রক্তের কাহিনী। কোনও কালেই তার ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকী এ কালেও মানুষের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কেউ কেউ এবং অবাধ হত্যালীলা সম্পাদিত হয়েছিল। এখন, সে-প্রসঙ্গ চাপা আছে বটে, তবে কখন কার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে আবার আর নতুন নতুন অস্ত্রের নীচে বুক-পেট ফুটো হয়ে গড়াতে গড়াতে বয়ে যাবে মানুষের লাল গরম রক্ত তা কেউ বলতে পারে না।

যেমন এই মাথুরের গড়। এখানে কোনও বর্ষায় কখনও জল জমেনি। কিন্তু কোন বর্ষায় হঠাৎ এই মাথুরের গড়ও ভাসতে শুরু করবে তা কে বলতে পারে! গঙ্গায় বান এলে সে বানের জল পি ডব্লু ডি রোড ধরে তেঁতুলতলা পর্যন্ত আছড়ে পড়ে আর হামলে ঝাঁপায় ফটিক বিলে। বিলের জলের অশুদ্ধি সংশোধন হয়। কিন্তু ওই বিল পর্যন্তই। মাথুরের গড়ের অভিজাত পাড়ার টিকি ছুঁতে পারেনি গঙ্গাজল।

অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে কলকাতা মহানগরী ও তার উপকণ্ঠগুলির মানচিত্র স্বরণ করতে হয়। নোয়াই, বিদ্যাধরী ও বাগজোলা খাল কুলটি নদী পর্যন্ত সবই পরস্পর সংযুক্ত। নোয়াই খালের বহমানতা এই এলাকা থেকে খুব দূরে নয়। বাগজোলা উপচালেও এ জায়গার রক্ষে নেই। বিদ্যাধরী নদী ছিল এক সময়। স্কুলের ছুগোল বইতে এখনও সে নদী হয়ে বেঁচে আছে বটে তবে বাস্তবে তার অস্তিত্ব নদীমাতৃসুলভ নেই। সে এখন মজে যাওয়া, হেজে যাওয়া, জঞ্জাল ও কচুরিপানা ভর্তি খাল, যার জলধারণ ক্ষমতা শূন্য ঠেকেছে। নোয়াই খালের অবস্থাও তাই। প্রায় বারো বছর আগে একবার নোয়াই খাল সংস্কারের প্রস্তাবনা হয়েছিল কিন্তু তাতে খালের মজন ঠেকানো যায়নি। ফলত প্রতি বছর বর্ষায় যা হয় তাতে এ ভাবে সংবাদপত্রগুলি জানায় যে—

টোলা থেকে বিরাটি পর্যন্ত উত্তর কলকাতা ও শহরতলির জলনিকাশী ব্যবস্থা গুরুতর সঙ্কটে। আষাঢ়ের ঘন বর্ষায়, এমনকী ভারী বর্ষণের আগে, স্বল্প বৃষ্টিপাতেও জল জমে যাচ্ছে সিথি-কাশীপুর-বরানগর-নিমতা-কামারহাটি-বিরাটি প্রভৃতি অঞ্চলে।

এরকমই হয়। প্রতি বছর। প্রতি বর্ষায়। বৃষ্টির জল জমে। খালের জল, নদীর জল উপচে এসে বিল ভরিয়ে দেয়। বিলের জল উপর-চূপুর হয়ে আছড়ে পড়ে ঘর-উঠানে। প্রথমে তাই ফটিক বিল বস্তির ঘরদুয়ারে পায়ের পাতা ডোবে। তারপর, দিন গেলে, জল পায়ের গোছ ছাড়ায়। চৌকাঠ গলে ঘরে ঢুকে পড়ে। বস্তিবাড়ির মাটির মেঝে গলে কাদা। ক'দিন বড় কষ্টে যায়। কিন্তু তাতে বস্তির কোনও কাজ আটকায় না। বাচ্চার জন্ম পর্যন্ত হয়। কাজের মানুষেরা হাটু অবধি কাপড় তুলে জল ভেঙে কাজে বেরোয়। ক'দিনেই পায়ে হাজা ধরে। পা কুটকুট করে। গিমিদের কাছ থেকে তখন তারা একটু একটু হাজার মলম চেয়ে নেয়। খানিকটা মাখে। খানিকটা কাগজে লাগিয়ে বা পান-দোস্তার কৌটোয় পুরে ঘরে নিয়ে যায় বরের পায়ে লাগিয়ে দেবে বলে। এমনই হয়ে আসছে চিরকাল আর চিরকালের মতো একেবারে শুকনো ডাঙা হয়ে জেগে থাকছে মাথুরের গড়। কোনওকালে, কোনওদিন এখানে জল দাঁড়ায়নি। কে জানে, যদি সত্যিই কোনওকালে এ জমি রানি রাসমণির জামাই মথুরাবাবুর হয়ে থাকে তবে তা হয়তো এ জন্যই যে, এ ডাঙায় জল জমে না। ভরা বর্ষায়ও মাথা তুলে জেগে থাকে দিনের পর দিন— পলাতক ছেলের জন্য মায়ের জেগে থাকার মতো। যদিও সে-ইতিহাস কোথাও লেখা নেই, শুধু নামটুকু আছে।

বসন্তের শেষ থেকে গ্রীষ্মের শুরু এবং এই বর্ষার মধ্যবর্তী ভরস্তু সময় যখন কলকাতা মহানগরী ও উপনগরীগুলি সব কাজ বজায় রাখতে চায় এবং জলমগ্ন ভূমিখণ্ডে জলকাদা মাড়িয়ে, টপকে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়, সেই সময়, অর্থাৎ প্রায় তিন মাসকাল ঋতু বন্ধ আছে নীলোফার। প্রথম মাসে সে ভেবেছিল এই বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক ছন্দপতন কারণ মাঝে মাঝে কোনও কোনও মাসে তার এরকম হয়েছে। দ্বিতীয় ঋতু পেরুনার সময় সে শঙ্কিত ছিল এই ভেবে যে রিপন স্ট্রিটের বাড়িতে কোনও বউদির দ্বিতীয় ঋতুকাল পেরিয়ে গেলেই বড়আম্মা আল্লার কাছে দোয়া প্রার্থনা করতেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল দেখাত ভরা শৃঙ্খলাবদ্ধ সংসারের সম্ভাবনায়। কিন্তু নীলোফার আনন্দ নেই। উজ্জ্বল্য নেই। তার দক্ষ বিচিত্র চোখের তলায় কালি পড়ারও উপায় নেই। কালি পড়ার জন্যও প্রয়োজন হয় কিছু মৃগ্ন ত্বক। নীলোফার

তা নেই। কিন্তু চোখ দুটি হাসে জান। আর তা বোরখায় ঢাকলি আছে। নীলোফা অতি অসহায়তায় চুপ করে থাকে সারাফণ। এতটুকু মাথা ঘোরা, এতটুকু বমিভাব সে প্রকাশ করেছে না। তার কাছেই-বা করবে। আর কেমন করে করবে। একবার নীলিমাকে বললে বলে ভেবেছিল। কিন্তু গুটিয়ে গেছে। নীলিমার সামনে এ কথা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তার আশ্রয় কথা মনে পড়ে। বড় আশ্রয় চলে যাবার পর পর তিনিও চলে গেছেন। নীলোফা রেখে ভাল উপচায়। হায়। তার কথা শোনার মতো একজনও নেই। একজনও। কাকে বলে সে। কাকে জানায়। কষ্ট যন্ত্রণা গোপন রাখা যায়। ঢেকে রাখা যায়। কিন্তু মাতৃহত? সমস্ত পৃথিবীকে জানান দিয়ে মাতৃহত আসে।

মনিকলের শিক্ষা তার মনে পড়ছে। বহুবার শোনা। শুনতে শুনতে মুগ্ধ। কিন্তু এ সব ভাবনা, স্বরণ কবে তাকে ছেড়ে গেছে। মনিকল বলতেন, শেখাতেন— গরিব আচরণ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখো। নৈতিক গুণের মাধ্যমে দিয়েই মানুষের কল্যাণ আসে। তোমাদের হাত, তোমাদের জিহ্বা, তোমাদের চক্ষু বা কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন অন্যের সম্পদ সন্ধান বা প্রাপের কোনও ক্ষতিসাধন না করে। কোনও অনিষ্ট বা মানহানি না করে। যদি, জীবনযাপনে পবিত্রতা না থাকে, তবে কুজিয়ার কুফলে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও অভিশাপ নেমে আসে। পরলোকে শাস্তি হয়। আত্মীয়স্বজনদের লজ্জা ও ক্ষতির মুখে পড়তে হয়।

নীলোফার হৃদয়ে হায়-হায় উৎকণ্ঠিত হয়। সে কি তবে দুশ্চরিত্র? সে কি অসংযত? নাপাক কুজিয়ায় লিপ্ত? কিছুতেই নিজেকে খারাপ লাগার মতো দার্শনিকতা আসে না তার। সে জামাল কৌশিকের বাবরহত বস্ত্রগুলি স্মৃতি আঁকড়াবার মতো করে নাড়ে। ছোঁয়। দেখে। মাঝে মাঝে সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে এমনই প্রত্যাশায় যে, কৌশিক সমস্ত সুন্দর নিয়ে ফিরে আসবে ঠিক। কিন্তু আসে না কৌশিক। আসেনি। যেন তার আসতে নেই। যেন তার হারিয়ে যেতে হয়। যেন এই দম্ভ স্বদেশের টানে সে দূরে চলে গেল স্বদেশকে মুক্তি দেবে বলে। কিন্তু একসময় ভাবনাগুলি নিভেজ হত আসে। সে, অসহায়ভাবে ভয় পায় কিন্তু পাপবোধ দ্বারা যন্ত্রণাদীর্ণ হতে পারে না। তার মধ্যে এই বিশ্বাস গভীর প্রোথিত থাকে যে পীরবাবার দোষায় সে যা-কিছু প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার যেন কুণ্ঠীর দশা। পরিণতি না বুঝে বর প্রার্থনা করেছে সে। তার জানা নেই কর্তৃকে ভাসাবার আগে কুণ্ঠী এই বৎসরকাল বিশাল মাতৃহত কীভাবে গোপন করেছিল। তাই ভয়ে তার ঘুম আসে না। অসহায়ের মতো রাত জাগে। নির্ধুম রাতে নীতি ও অনুশাসন, সাংসারিক অকল্যাণের সজ্জাবনা ও মনিকলের চণ্ডা মুখ তাকে গিলে খেতে আসে। কাকে বলে সে? কাকে বলে এইসব? এই বিদীর্ণ হওয়া, এই গুঁড়ো গুঁড়ো হতে থাকা অস্তিত্ব নিয়েও তার মনে হয় পীরবাবা যদি ওই আশ্চর্য স্বর ও দুষ্টি দিলেন, ওই আশ্চর্য শরীর ও হৃদয় দিলেন, দান করলেন ওই পরম আনন্দ— তবে তিনিই কি রক্ষা করবেন না আপন দানের মহিমা? স্থিতি ও বিশ্বাস আঁকড়াতে চায় সে। কিন্তু এই কঠিন দুনিয়য় এই দুটিই ফণিকমাত্র। যে-কোনও সময় টলে যায়। ভেঙে যায়। এবং নীলোফাও দিশেহারা বোধ করে। পরকালের শাস্তি বা পাপবোধের চেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয় সামাজিকতার প্রহ। অন্ধকারে একা ডাকে সে। কৌশিককে ডাকে।

- কৌশিক তুমি চলে গেলে কেন?
- চলে গেছি? না তো।
- দেখো। আমি দম্ভে বেঁচেছিলাম। এখন যে আমার আর কোনও উপায় নেই।
- এই তো আমি আছি। এই তো। তোমার মধ্যে। তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব আমি।
- তুমি হারিয়ে যেও না। কৌশিক। হারিয়ে যেও না।
- তুমি, নীলোফা, যা চেয়েছিলে, পাওনি।
- হ্যাঁ। পেয়েছি।



- তবে?
- এটুকুই! ব্যস! এটুকুই?
- তোমার কীসে ভয়!
- সমাজকে। পরিবারকে। আর— আর—
- আর আনিসুজ্জামানকে।
- হ্যাঁ...না...মানে...তুমি কী করে জানলে?
- ওই যে আমি তোমার ভিতরে আছি। তোমার মধ্যকার সব গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর জেনে নিচ্ছি সব।
- কী জেনেছ?
- আমাকে কতটুকু চিনতে তুমি নীলোফা?
- চিনতাম। ভাইজানের ছাত্র ছিলে তুমি।
- ছাত্র নয়।
- বন্ধু ছিলে।
- ছিলাম। আমি হারিয়ে যাওয়াতে তোমার দুঃখ হয়েছিল?
- হয়েছিল।
- কেন?
- ভাইজানের দুঃখ হত বলে।
- আমি ফিরে আসাতে তুমি খুশি হয়েছিলে?
- হ্যাঁ। হয়েছিলাম।
- কেন? কেন হয়েছিলে?
- কারণ— কারণ— তোমাকে পেয়ে ভাইজান খুব খুশি হয়েছিলেন।
- আমি যখন তোমার মুখ দেখেছিলাম তখন তুমি কার মুখ না দেখার কথা ভেবে কষ্ট পেয়েছিলে? কার বমনের স্মৃতি তোমাকে নিয়ে গেছিল পীরবাবার কাছে আর তোমাকে আকুল কাঁদিয়েছিল আমার কোলে ফেলে?
- ভাইজানের। ভাইজানের।
- আমি যখন গ্রহণ করেছিলাম তোমাকে আর আমার ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করেছিলাম তখন তুমি আনন্দ পেয়েছিলে তো? পেয়েছিলে কি-না বলো?
- হ্যাঁ। পেয়েছিলাম।
- সে কি এ জন্যই নয় যে তুমি প্রমাণ করতে পেরেছ তোমাকে গ্রহণ করা যায়?
- হ্যাঁ, মানে, না। মানে হ্যাঁ। তাই তো।
- তা হলে আর দ্বিধা নয়। বলো। তাঁকেই বলো। তিনিই শুনবেন। তোমার কেউ নেই ভেবো না। তিনি আছেন। আনিসুজ্জামান।
- কিছু— কিছু— সে-দিন আমি তো ভালবেসে ফেলেছিলাম তোমাকেই।
- মৌহূর্তিক ভালবাসা। নীলোফার। ভেবে দেখো। শুধু তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হচ্ছিল বলে তুমি ভালবেসেছিলে। আমি না হয়ে দেব দানব যাই হোক না— তোমার ইচ্ছে পূর্ণ করলে তাকেই তুমি ভালবাসতে, যেমন মানুষ হৃদয় হিসেবে ভালবেসে থাকে তার হৃদয়স্বত্বকেই।
- নীলোফার হাত-পা কাঁপে। কিছু সে সিদ্ধান্ত নেয়— বলবে। আনিসুজ্জামানকে বলবে। মনে মনে বয়ান প্রস্তুত করে সে। তারপর? ঘৃণা পাবে সে? নতুন করে ঘৃণা? যদি পায়? সে মরে যাবে। মরে যেতে ইচ্ছে করে না নীলোফার। সে বাঁচতে চায় অনেক-অনেক দিন। বাঁচতে চায়। তবু মরে যেতে হবে, যদি ঘৃণা পায়! যাবতীয় ঘৃণা ও অবহেলা, এতকাল গাছের গোড়ায়, প্রত্যেক কশিদা শিল্পে সে ছড়িয়ে দিয়েছে নিরুত্তাপ। এ বার সে কী করে!

সে জানে না। জীবন ও মৃত্যু সমান অনিবার্য হয়ে যায় তার অস্তিত্ব নিরূপণে।

এই সবকিছুই ঘটতে থাকে ঘোর বর্ষায় যখন আকাশে মেঘ ঘন হয়ে সূর্য আটকাতে তৎপর। একদিন ‘হিন্দুধর্ম জাগরণী সভা’ হিন্দুত্ববাদ ও অন্যান্য ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা সভায় আনিসুজ্জামানকে আমন্ত্রণ জানাল এ মর্মে যে, তিনি যে-সাম্প্রতিক গ্রন্থটি লিখেছেন এবং তার ভূমিকায় তাঁর সারা জীবনের গবেষণার বিষয় উল্লেখ করেছেন সে-সম্পর্কে সভায় দু’চার কথা বললে তারা কৃতজ্ঞ থাকবে।

আনিসুজ্জামান সে-সভায় যোগ দিলেন। ‘হিন্দুধর্ম জাগরণী সভা’র সভাপতি একজন রাজনৈতিক সংগঠক। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সংগঠন ছোট কিন্তু নিষ্ক্রিয় নয়। তাঁর প্রশস্ত বসার ঘরে ফরাসি বিছিয়ে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন বিদ্বৎ ও প্রাজ্ঞজনের সভাকে চেহারা ও চরিত্রে অনেকটা উনবিংশ শতকীয় দেখাল। এবং সভা শুরু হওয়ার কিছু পরেই তিনি বুঝলেন, ধর্মসম্বন্ধে নয়, মতাদর্শ নয়, আলোচনা বা প্রকৃত অর্থে এই সভা এক আক্রমণ যা তিনি দুর্গাবিষয়ক গ্রন্থ রচনার জন্য লাভ করতে চলেছেন। একজন, তাঁর কপালে তিলক, পাতলা শাটের নীচে সোনার চেনের সঙ্গে পৈতে বাহিত দেখা যায়, আনিসুজ্জামানের বইখানি হাতে নিয়ে পরিশীলিত উচ্চারণ ও ভঙ্গিতে তাঁর পরিচয় সম্পন্ন করলেন। আনিসুজ্জামান ছাড়া এখানে সকলেই পরস্পরের পরিচিত এবং হিন্দুত্ববাদ নতুন করে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কারও মতবিরোধ নেই। নিম্নশ্রেণী, তফসিলি জাতি বা অন্য ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে এঁরা বিদ্ভিষ্ট ও উন্মাদিক। আনিসুজ্জামান অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। যদিও কেউ তাঁর সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করেননি। তবু তিনি নিজেকে বারবার এই বলে দায়ী করলেন যে তাঁর এখানে আসা বোকামি হয়েছে, এ কথা আগে বোঝা প্রয়োজন ছিল।

পৈতে ও সোনার চেনবাহক আনিসুজ্জামানের কাছে সভার বিশিষ্ট কয়েকজনের পরিচয় দিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে দুর্গাবিষয়ক গ্রন্থখানি খুবই প্রয়োজনীয় ও তথ্যবহুল। সভাপতির কাছে কয়েকটি জায়গা পড়ে শোনাবার আবেদন জানালেন তিনি। আবেদন মঞ্জুর হল। তিনি শুরু করলেন—

দুর্গাপূজায় যে-নবপত্রিকা ব্যবহৃত হয় তা দুর্গার প্রতীক। প্রতীক এ কারণে যে নবপত্রিকা দেখলে কোনও নারীজ্ঞান জন্মায় না। কিন্তু দুর্গার প্রতিভা নারীজ্ঞানের দ্যোতক। আর দুর্গার এই নারীদেহ, মাতৃদেহ। কুমোর ধীরে ধীরে যে-নারীমূর্তি ফুটিয়ে তুলে দশ হাত যোজনা করে দেন— সেই নিটোল নারীমূর্তিতে শক্তিশালিনী প্রবল মাতৃকারূপ বর্তমান। খোলা চুলে, দশ হাতের অস্ত্রসজ্জারে একটু আলুথালু লাগে এই মাকে। যেন দুপুরবেলায় দশ হাতে দশ সন্তানকে অন্নবাঞ্ছন পরিবেশন করতে করতে মা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি এক শিশুকে ভাত বেড়ে দেন, এক শিশুকে মেখে দেন। এক শিশুকে ভোলান, আরেক শিশুকে স্তন্য দেন। এ জনাই তিনি দশভুজা। দুর্গাপ্রতিমা আসলে আমাদের গার্হস্থ্যের কব্ৰী। আমাদের মায়ের রূপক! এই রূপকে ভাব ও রসের সম্মিলন হয়েছে। লোকগান খুঁজলে দেখা যাবে, আমাদের ঘরে ঘরে যত মেয়ে আছে, উমা, পুঁটি, খেতি, বুঁচি— প্রত্যেকেই তাদের পিতার বুকে দুর্গা হয়ে থাকে যখন তারা স্বস্তুরবাড়ি যায় বা স্বস্তুরবাড়ি থেকে দু’দিনের তরে প্রত্যাগমন করে। আবার অন্য দিক থেকে ভাবতে গেলে দুর্গামূর্তির মধ্যে অতিমানবিক শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়...

গুঞ্জন উঠল। বাড়তে বাড়তে শোরগোল হল। শোরগোল প্রায় উন্মত্ততা ছোঁয়! আনিসুজ্জামানের হাত-পা কাঁপছে। তাঁকে কি এবার প্রশ্ন করা হবে? তাকে কি জবাবদিহি করতে হবে? তিনি ঝজু থাকার চেষ্টা করছেন। শব্দ হওয়ার চেষ্টা করছেন। একজন বলছেন— দুর্গা স্তন্যদান করছে এ কথা লেখার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? অন্যজন বলেন— আপনি মুসলমান। হিন্দুদের দেব-দেবী নিয়ে এরকম তুলনা করার অধিকার আপনাকে কে দিল?



আনিসুজ্জামান শাস্ত্র গলায় বলছেন— দুর্গার সঙ্গে আমি আমার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি।

—মা মানে আপনার মা কি?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। আমারও মা। যে-কোনও বাঙালি মা।

—কিন্তু আপনারা পৌত্তলিকতা মানে না। কোন সাহসে নিজের মায়ের সঙ্গে দুর্গার তুলনা করেন আপনি?

—আমি তো বলেছি, দুর্গার মূর্তি মাতৃহের প্রতীক।

—আমি যদি বলি, আপনি ঘরের মাকে বাইরে টেনে নিয়েছেন আর কুৎসিত উপমা নিচ্ছেন হিন্দুকে অপমান করার জন্যই?

—আমি তা হলে বলব, আপনি ভুল জাবছেন। মা ও শিশুর চিত্র পৃথিবীতে সবচেয়ে পবিত্র ও সুন্দর বলে মানা হয়। যে-কোনও ধর্মেই তা সত্য। কারণ মাতৃত্ব সৃষ্টির ধারক। মাতৃত্ব মানবিক।

—এত বিষয় থাকতে আপনি হঠাৎ হিন্দুদের দেবী নিয়ে মাতামাতি করতে গেলেন কেন? আর বিষয় পাননি আপনি? আপনি অধিকার চর্চা করেছেন।

আনিসুজ্জামান ক্রান্ত ও পর্যুদস্ত বোধ করেন। তাঁর বোকানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয় যে তিনি বাঙালির সংস্কৃতিকে দেখেছেন এখনে। এই অংশটি সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ। তিনি একজন নিরপেক্ষ লেখক হিসেবেই দুর্গার মাতৃমূর্তি দেখেছেন, মুসলমান হিসেবে নয়। কিন্তু তাঁর সব কথা সভ্যত্বের গোলমাল ও মূল্যের তলায় গড়িয়ে গেল। প্রস্তাব এল যে এই গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

আনিসুজ্জামানের মধ্যে প্রতিবাদ তোলপাড় করে। কিন্তু তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিজ্ঞা প্রাজ্ঞ, শিক্ষিত ও চেতনাসম্পন্ন মানুষদের এই আচরণের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার সংকল্পেও নিজেকে হীন লাগে তাঁর। তিনি দু'হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ান। বলেন— এই বই লিখে আমি ন্যায় করেছি না অন্যায় করেছি আমি জানি না। আপনারা যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু করতে চান সে-সিদ্ধান্ত আপনারদের। আমার সে-সব শোনার জন্য এখানে থাকা নিরর্থক। আপনারদের সবার অনুমতি নিয়ে আমি এখন যাবার জন্য তৈরি হতে চাই।

—পালাচ্ছেন? বই লিখেছেন। জবাব দিন।

—আমি যা বলতে চাই, বলেছি। আর হয়তো সত্যিই পালাছি কারণ আমি অতি দুর্বল, সাধারণ একজন লোক। আপনারদের সঙ্গে কথা বলার কোনও যোগ্যতাই আমার নেই। আমি যা সঠিক ভেবেছি, করেছি। আমার আর কিছু বলার নেই।

আনিসুজ্জামান পথে বেরিয়ে পড়েন। কটুক্তিগুলি তাজা করে তাঁকে। নির্মমতা তাজা করে। তিনি মুখ নিচু করে বাসে উঠে পড়েন। তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করে ভয় ও বিতৃষ্ণা। এবং সভ্য যাবার জন্য নিজের প্রতি জন্মে ওঠে ক্ষমাহীন বিরক্তি। বাসের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু কিছুই তাঁর চোখে ধরা দেয় না। মনের মধ্যে বিভিন্ন স্তর ভেসে করে উঠে আসে জটিল প্রশ্ন। মৌলিক প্রশ্নও। ধর্মকে আশ্রয় করা এবং গোঁড়ামি অবলম্বন করা— এই-ই কি তবে জীবনের মূল মন্ত্র হওয়ার কথা ছিল? পরধর্মবিদ্বেষই কি তাঁকে সমস্ত আখ্যাত ও অপমান থেকে রক্ষা করতে পারত? তাঁর কি উচিত ছিল জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করা ও অন্য ধর্ম সম্পর্কে উদ্ভাসিক হয়ে ওঠা? তাঁর মনিরুলের কথা মনে হয়। মনিরুল বলতেন—তুমি ক্রমশ যেন হিন্দু হওয়ার চেষ্টায় আছ।

আনিসুজ্জামান মনে মনে বলতেন—‘আমি মানুষ। এই আমার ধর্ম। এই আমার পরিচয়।’ তিনি কি ভুল করেছেন? ভুল ভেবেছেন এতকাল! পরধর্মবিদ্বেষ! কাজটি অতি সহজ কিন্তু অতি নীচ। আনিসুজ্জামান তাঁর সমস্ত শিক্ষা ও উপলব্ধি ছাড়া উত্তর রচনা করেন— না। পরধর্মবিদ্বেষ নয়। সহিষ্ণুতা-সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতার পথ সবসময়ই দুর্গম, কিন্তু এই-ই মানুষের

যথার্থ লক্ষ্যের পথ। তিনি স্থির করেন, যেমন ছিলেন, যেমন আছেন, তেমনই থাকবেন চিরকাল। এই অভিজ্ঞতাগুলি অতি তিক্ত ও নির্মম। কিন্তু এই-ই জীবনের সত্যিকারের চেহারা। মানুষের অন্ধত্ব ও ওদার্য দুই-ই যদি না দেখতে পান তবে তাঁর কাজ পূর্ণ হবে না।

এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরে একটু সহজ লাগে তাঁর। তবু ক্লান্তি আসে। অনিবার্য ক্লান্তিকে তিনি কেমন করে আটকাবেন? অতএব ভারী শিকল পায়ে নিয়ে ক্লান্ত বিপন্ন মানবজন্মকে টেনে টেনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে চলেন তিনি আর দেখতে পান মনিরুল এসেছেন। তাঁর খেয়াল হয়, নীচে মনিরুলের গাড়ি রয়েছে। সমস্ত ক্লান্তি ঢেলে দেবার পরিবর্তে বরং টান টান হয়ে ওঠেন আনিসুজ্জামান কারণ মনিরুলের মুখ এমন এক ঝড়ো আভাস ঘোষণা করে যা কখনও আনিসুজ্জামানের অভিপ্রেত হতে পারে না।

মনিরুল চেয়ারে বসে আছেন। নীলোফা মাথা নিচু করে ডিভানে বসে আছে। এত বছরে এই প্রথম মনিরুল এই ফ্ল্যাটে পা রাখলেন। গভীর মনিরুল নিজের সম্পর্কে আরও যত্নবান হয়েছেন, আরও সতর্ক। তাঁর বেশবাসের চেকনাই বেড়েছে। অঙ্গের শুল্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুক্ষণ এ কথা সে-কথার পর এই বৃষ্টিবাদলায় এত দূর আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিবেশন করলেন তিনি। বললেন— তুমি ধর্মান্তরী হবে শুনলাম?

—ধর্মান্তরী? আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

—হবে না রলছ?

—না। হব না। হওয়ার কথা আমার মাথাতেও আসেনি।

মনিরুল বাঁকা হাসেন। তাঁর গৌঁফবিহীন ঠোট ও গালভর্তি লালভ দাড়ির প্রেক্ষাপটে সেই হাসি কুটিল ও তেতো লাগে। তিনি বলেন—হবে নাই-বা কেন?

আনিসুজ্জামান বলেন—হব না কারণ কোনও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকা আমার কাছে জরুরি মনে হয় না। যা আমি কোনও দিন গ্রহণই করিনি তাকে ত্যাগই-বা করব কী করে!

—আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

—একটা আলোচনা সভা ছিল।

—শুনলাম হিন্দু ধর্ম জাগরণী সভায় যোগ দিয়েছ তুমি। সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করছ?

আনিসুজ্জামান নীলোফার দিকে তাকালেন। এসব গল্প কে করেছে মনিরুলকে! নীলোফা নিশ্চয়ই নয়। তিনি বলেন— আপনি শুনেছেন ঠিকই। তবে তা অর্ধসত্য। হিন্দু ধর্ম জাগরণী সভা আমাকে আজ আমন্ত্রণ করেছিল। আমার বইটি নিয়ে আলোচনা... ..

মনিরুল আনিসুজ্জামানকে থামিয়ে দেন। তাঁকে উত্তেজিত দেখায়। বলেন— বই? না? বই? যে-বই তুমি লিখেছ, এই দুনিয়ায় তার বাইরে কি আর বিষয় ছিল না মেঠা? তুমি কোনওদিন ধর্মাচরণ করোনি। নমাজ পড় না। বারবার বলা সত্বেও সাদি করোনি। রোজা রাখা কাকে বলে তুমি জানোই না। তুমি কি বলতে পারবে আমাদের ক্যালেন্ডারে এটা কী মাস? এই মেয়েটাকে পর্যন্ত তুমি ধর্ম ভুলিয়েছ।

আনিসুজ্জামান চমকে ওঠেন। সারাদিনের সমস্ত তিক্ততার ওপর ভাসমান অসহিষ্ণুতা আঁকড়ে বলেন— নীলোফা? নীলোফাকে তো আমি কিছু বলিনি। বারণও করিনি। ওর যা মনে হয় ও তাই করে।

—ওর যা মনে হয়? তুমি জানোই না যে ঘরে জেনানা থাকলে তাকে সহবৎ ‘শিক্ষা’ দিতে হয়, এটাই পুরুষের কাজ। শিক্ষা না দিলে জেনানা বিগড়ে যাবেই। তোমাকে বলতে হবে কেন? তুমি ধর্ম-তর্ম মানো না। নীলুও মানো না। তুমি হিন্দুদের সঙ্গে মেশো। ও-ও মেশো। তোমার কথা আর কী বলব! নীলুর কথা তো ছেড়েই দিলাম। ও তো একটা জ্যান্ত কয়লা। ও কী করল না-করল তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তোমার জন্য সমাজে আমাকে জবাবদিহি করতে হয়।

নীলোফা আস্তে আস্তে রান্নাঘরে চলে যায়। আনিসুজ্জামান টের পান মনিরুলের কোনও

কথা নীলোফাকে বিধেছে। মনিরুল বলে চলেন— তুমি বরাবরই হিন্দু ঘেঁষা। এমনকী বসবাসের জন্যও তুমি হিন্দু পাড়া বেছে নিলে।

আনিসুজ্জামান হাসেন। বলেন— আপনি বোধহয় জানেন না। এ পাড়ায় অনেক শিখ পরিবারও আছে। একটি বৌদ্ধ ও তিনটি জৈন পরিবার আছে।

—কিন্তু মুসলমান তুমি ছাড়া আর আছে কি? তুমি যাই বলে না কেন আর যতই হুক কয়ে না কেন, আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি তুমি পৌত্তলিকতার দিকে ঝুঁকেছ। তোমার বইয়ের পাতায় পাতায় পুতুলপূজার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে।

আনিসুজ্জামান দু'হাতে মুঠো মুঠো চুল খামচে ধরছেন। কী! অশুভ! কী! অশুভ! হিন্দুরা তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায় অশ্রদ্ধা পেয়েছেন আর মনিরুল পেয়েছেন শ্রদ্ধা। দুইয়ে মিলে, সাম্প্রতিক প্রক্রিয়ায়, নিশ্চিত হওয়া যায় যে তিনি নিরপেক্ষ আছেন।

মনিরুল বলে চলছেন— আমি তোমাকে জন্মতে এসেছি যে, ইয়াসিনের সাদি স্থির হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে আমরা তোমাতে আমন্ত্রণ জন্মতে পারলাম না কারণ তুমি উপস্থিত থাকলে আমাদের অনেক ভাই-বন্ধু অনুষ্ঠানে আসবেন না বলে জানিয়েছেন।

আনিসুজ্জামান মনিরুলের দিকে দেখেন। নীলোফার কাছে ভাল চেয়ে পান করেন খুরো এক গ্লাস। ভাবেন, এই ভাল হল। এই ভাল।

মনিরুল বলেন— তুমি যাবে না শুনে নীলোফাও যেতে পারবে না জানিয়েছে।

নীলোফা চা আর বিস্কিট সাজিয়ে নিয়ে আসে। আনিসুজ্জামান বলেন— নীলু যা ভাল বোঝে করবে।

মনিরুল উঠে দাঁড়ান। চা পান করতে অস্বীকার করেন। তাঁর অনিচ্ছে কবুল করেন তিনি। কিন্তু নীলোফা ও আনিসুজ্জামানের বুঝতে বাকি থাকে না যে মনিরুল এখানে কিছুই থাকেন না। তাঁরাও জোর করেন না। আনিসুজ্জামান মনিরুলের সঙ্গে নীচে গিয়ে তাঁর গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তারপর ফিরে এসে নিজের চায়ের কাপ হাতে নেন। বিস্কিট চিবোন প্রতি অনামনস্বতায়। নীলোফাও চায়ের কাপ হাতে চুপ করে বসে থাকে আনিসুজ্জামানের কাছে। বাসবাকি বাঁধা-ধরা কাজ নীরবেই সম্পন্ন করেন দু'জন। আনিসুজ্জামান নিজের ঘরের বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েন বিছানায়। বলেন— বাজাবি নীলু?

নীলোফাও বসার ঘরের মদু আলোটি জ্বলে আনিসুজ্জামানের ঘরে মেথেন সেতার নিয়ে বসে। সামান্য বাজায়। কিন্তু আজ আর আঙুলে সুর উঠছে না। আনিসুজ্জামান বলেন— কি? আজ বাজাতে ভাল লাগছে না?

নীলোফা অনামনস্ব আঙুল রাখছে সেতারে। বলছে— ভাইজান?

—কি?

—আমার কিছু কথা ছিল।

আনিসুজ্জামান নীলোফার স্বরের বিপর্যয় কেবল করেন না। আজ সারা দিন তাঁর ওপর দিয়ে ঝড় গেছে। সে-ঝড়ের বেশ লেগে আছে মাথায়, মস্তিষ্কে। তিনি বলেন— আমারও কথা আছে রে নীলু। অনেক কথা। আজ সভায় কী হল জানিস?

এই প্রথম নীলোফা, আনিসুজ্জামানকে ছাড়িয়ে, নিজেকে প্রক্ষেপণ করল। বলল— ভাইজান, আজ আমার কথা বলি?

কী করণ, কী আকুল কণ্ঠস্বর! আনিসুজ্জামান বিছনায় সোজা হয়ে বসেন। কী হয়েছে! কী বলতে চায় নীলু? মনিরুল কিছু বলেছেন। তাঁর প্রথমই মনে হয়, মনিরুল কি নীলোফাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান?

নীলোফা সেতারে হাত বুলায়, যেন-বা পৌঁছে গেছে স্মৃতিতর্পণে, বলে, ভাষা ও সংঘম হারাতে হারাতে বলে— কৌশিক, ভাইজান, কৌশিক.....

আনিসুজ্জামান প্রাথমিকভাবে স্বত্ত্বিবোধ করেন। প্রসঙ্গ তবে মনিকলন। বলেন—হ্যাঁ। কী হয়েছে? কৌশিক এসেছিল নাকি নীলোফা? ওকে কোথাও দেখতে পেয়েছিন?

—না।

—তবে?

—আমি আর কৌশিক সারা দুপুর একা থাকতাম...

—হ্যাঁ। নীলু। তাতে কী?

—ভাইজান, কৌশিক আমাকে... আমাকে...

যে কথা উচ্চারণ করতেও যত্না, সে কথা শোনার জন্য হতবুদ্ধি হন আনিসুজ্জামান। তিনি অনুমান করেন কিন্তু নিজের কাছেও তা অস্বীকার করতে পারেন। নীলোফা বলে—আমি মা হচ্ছি, ভাইজান।

—হে আল্লা।

মাত্র দুটি শব্দ উৎক্ষিপ্ত হয় আনিসুজ্জামানের মুখ দিয়ে। তাঁর বোধ, বিশ্বাস, ক্রিয়া-কর্তব্য গুলিয়ে যায়। অতীত বর্তমান গুলিয়ে যায়। শুধু ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ রাঙ্কুসে মুখ দিয়ে গ্রাস করতে চায় অস্তিত্ব। দু'হাতে মুখ ঢাকেন তিনি। কিন্তু জেবী হন না। ফ্রোশ প্রকাশ করা বা জাম্মানের শক্তিকুণ্ড হারিয়ে ফেলেন। মনে মনে নিজের প্রতি দোষারোপ করেন। কেন এরকম সম্ভাবনার কথা তাঁর আগে মনে হয়নি? কেন নীলোফার নিরাপত্তার চিন্তা না করে একটি পাগলের ডার তার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন? কৌশিক। কৌশিক এরকম করল। কিন্তু আনিসুজ্জামান নিজেকে বোঝান, কৌশিক সুস্থ ছিল না। আত্মস্থ ছিল না। হঠাৎ তাঁর ভয় করতে থাকে। তাঁর আশঙ্কা হতে থাকে যে নীলোফা তবে অভ্যচারিত হয়েছিল! অসম্ভব কষ্ট হতে থাকে এ বার। তিনি কোনওক্রমে বলেন—নীলু, ও কি জোর করে... তোর ওপর জোর করে...

—না, ভাইজান, না।

আনিসুজ্জামানের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝাঁপ দেয় নীলোফা। বলে—ওরকম বলবেন না। সে ওরকম নয়।

আনিসুজ্জামানের বিশ্বয় জাগে। কৌতূহলও হয়। একই সঙ্গে অসহায় অবস্থিত তিক্ততা জাগে মনে। গলা শুকিয়ে যায়। বলেন—তুই হতে দিলি তবে।

নীলোফা জবাব দেয় না। আনিসুজ্জামান আবার শুয়ে পড়েন। ভাবেন, কৌশিক পারল? কেমন করে পারল? পাগল বলেই? পাগল—তবু তাঁর অস্বাভাবিক কষ্ট হয়। এ কষ্ট কীসের তিনি বুঝতে পারেন না। এ কষ্ট কি ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের—যার পরিণতি তিনি জানেন না? নাকি এ কৌশিক ও নীলোফার দ্বৈতাকৃত জড়িয়ে পড়ার দরুন যত্না! তিনি অসহায়ের মতো প্রশ্ন করেন—কেন নীলু? কেন হতে দিলি?

এখন নীলোফার গলায় কান্না নেই, ভয় নেই, উদ্বেগ নেই। স্বপ্ন দেখার মতো সে বলে যায়—আপনার কি মনে আছে ভাইজান, পীরবাবার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম?... ভাইজান, কৌশিক হঠাৎ আমার মুখ দেখতে পেল। আমার পোড়া, বীভৎস, কুৎসিত মুখ। কিন্তু সে তার মুখ ফিরিয়ে নিল না। আমি মুখ ঢাকলাম। তবু সে বারবার ফিরে দেখতে চাইল। আমি বোরখা খুলতে চাইলাম না। সে নিজে খুলে দিল। এমন চোখে সে আমার দিকে চাইল যেন আমি কত সুন্দর। আমি ভুলে গেলাম আমি কী! সে এমন করে আমাকে হুঁল, ভাইজান, আমি সুন্দর হয়ে উঠলাম। ভুলে গেলাম যে আমাকে দেখলে লোকে শিউরে ওঠে। আকা আমাকে দেখলে ঘোঁরা পায়। আন্না মৃত্যুকামনা করে। আমি ভুলে গেলাম যে আপনি আমাকে দেখে পালিয়ে যান, বমি করেন। আমি খুব-খুব-খুব সুন্দর পরি হয়ে উড়ে বেড়াতে লাগলাম। আর সে, আমাকে ধরে বলাতে লাগল—আমি তোমাকে দেখলাম। এই আমার ভারতবর্ষ। দম্ভ। স্বলসানো। রিক্ত। আমি তোমাকে নিলাম। এই আমার দেশ। তোমার এ পোড়া শরীরের নীচে সব আছে। সব প্রাণ। সব

প্রেম। সব অনুভূতি। ও আমার দেশ। আমি তোমার। আমি এসেছি। আমি আসছি।...

নীলোফা থামল। জল পড়ছে দু'চোখ বেয়ে। কৌশিক নেই যে শুয়ে নেবে। অতএব তা পড়তে থাকল অবাধে। আনিসুজ্জামান বলতে চাইলেন—ওকে কেন বিশ্বাস করলি? ও তো সুস্থ নয়! ও তো পাগল!—কিন্তু বলতে পারলেন না। তাঁর প্রাণ পুড়তে লাগল। কোন যন্ত্রণায় নীলোফা পাগলকে বিশ্বাস করে বসে আছে আর সে-পাগল তাকে ছেড়ে গেছে অবহেলায়। তবু মনে মনে মিথ্যে স্বর্গ আঁকড়ে আছে নীলোফা যে একজন তাকে সুন্দর করেছিল। তাঁর দিশেহারা লাগে। এই মেয়ে নিয়ে কী করবেন তিনি! তখন নীলোফা কথা বলে। কান্নাচাপা আত্মস্থ গলায়—আপনি ভাবছেন ভাইজান, কৌশিক পাগল, তাই এরকম করেছে, না? কিন্তু তখন ওর চোখ দু'টো পুরো সুস্থ ছিল।

আনিসুজ্জামান চমকে ওঠেন। নীলোফা তাঁর চিন্তা পাঠ করেছে। হঠাৎ নিজেকে অক্ষম ও অসহায় লাগে তাঁর। ভয় করে। খুব ভয় করে। আতঙ্কিত মানুষের মতো কাঁপতে থাকেন তিনি। অসম্ভব যন্ত্রণা ও অসহায়তার কান্না ছিটকে ওঠে গলায়। তিনি এমনকী সে-কান্না লুকোবারও চেষ্টা করেন না। নীলোফা স্পষ্ট তার শব্দ পায়। তিনি কান্নায় ভিজতে ভিজতে বিলাপ-কণ্ঠে বলেন—আমি কী করব নীলু! আমাকে তো কেউ বুঝবে না। চাচা-চাচী কতখানি বিশ্বাস করে তোকে আমার সঙ্গে আসতে দিয়েছিলেন। তাঁদের সে-বিশ্বাস কোথায় রইল? পৃথিবীসুদূর লোক ভাববে আমি সুযোগ নিয়েছি। আমি তোমার সুযোগ নিয়েছি নীলোফা।

নীলোফা বোরখার ঢাকনায় নিজের চোখ মোছে। দুর্ব্বহ অসহায় লাগে তার। যন্ত্রণাও হয়। কিন্তু নিজেকে কিছুতেই অপরাধী লাগে না। তার মনে পড়ে আকু ও আশ্বির সংলাপ। মনে পড়ে, মনিরুল বলছেন—...কী কুৎসিত! হে আল্লা! আমার মেয়ে কিন্তু আমারই তাকাতে ঘেন্না করে।...

সঙ্গীদা বলছেন—... আল্লা ওকে কেন বাঁচিয়ে রাখলেন!...

নীলোফা এতদিনে একবারও জীবন ছাপিয়ে মৃত্যুর কথা ভাবেনি। মৃত্যু তার কাছে অপ্রিয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু এই প্রথম তার মনে হল, সে তো মরে যেতেই পারে। সে মরে গেলে কারও কোনও ক্ষতি হবে না। সে একবার সেতারে হাত রাখে। পরক্ষণেই তার মনে হয় মৃত্যু খুব কঠিন। খুবই অনভিপ্রেত। এই ঘর ফেলে, এই সেতার, এই বাগান, বাড়ির পেছন দিকের আমগাছ ও সুপার মার্কেট ফেলে, এই রান্নাঘর, এই নির্ভরশীল সর্বজন পরিত্যক্ত মানুষটাকে ফেলে সে কেমন করে মরে যাবে! সে মৃত্যুমুখী হতে পারে না। জীবনের প্রতি আশ্চর্য মমতায় মনে মনে পীরবাবার কাছে সমাধান প্রার্থনা করে। কিন্তু দিশেহারা উদ্ভ্রান্ত মানসিক অবস্থার তবু উপশম হয় না। সে নিজের ঘরে যায়। যত্নে সেতার তুলে রাখে। পাশাপাশি দু'টি ঘরে শুক ঘুমহীন রাত কাটে দু'জনের। মেঘ ছিঁড়ে বৃষ্টি নামে। ঝোঁপে বিদ্যুৎ জড়িয়ে ভূমি ছোঁয়। গুরু গুরু শব্দ ওঠে আর তার কাঁপন লাগে আনিসুজ্জামান ও নীলোফার সাজানো পাঁজরগুলিতে। আনিসুজ্জামানের মনে হয়— তিনি একজন পুরুষ, এ কথা ভেবে বিচলিত হয়েছেন যে লোকে তাঁকে কী বলবে! হায়! তিনি কী স্বার্থপর! নীলোফার অবস্থা একবারও ভেবে দেখছেন না তিনি যে সে কতখানি অসহায়! কারও কাছে বলার জায়গা নেই! কোথাও যাবার জায়গা নেই! যে তাকে স্বপ্নে ঠেলে দিল তার আর ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেই! অসুন্দর, অনভিপ্রেত সে। কুমারী মাতৃত্বে অসহায়। ভয়ের হিমশ্রোত আনিসুজ্জামানের মেরুদণ্ড বেয়ে গলে গলে নামতে থাকে। যদি মরে যাবার কথা ভাবে নীলোফা? যদি অসহায়তা ও লজ্জায় আত্মহত্যা করে? পর পর ঘটে যাওয়া মৃত্যুগুলির কথা মনে হয় আনিসুজ্জামানের। তিনি উঠে পড়েন। তাঁর মনে হয় নীলোফাকে সাহস দেওয়া দরকার। বোঝানো দরকার তিনি আছেন। নীলোফার পাশে আছেন। কিছু একটা হবে। কী হবে জানেন না। কিন্তু নীলোফাকে মৃত্যুর ইচ্ছা বা হননের ইচ্ছা থেকে দূরে রাখবার জন্য তিনি ছুটে যান তার দরজার কাছে। শব্দ করেন দরজায়। উত্তেজিত হয়ে

ডাকেন—নীলোফা! নীল! নীল!

নীলোফা উঠে আসে। বোরখায় মুখ ঢেকে, যথাবিধি জাগরণে, বলে—কী হয়েছে ভাইজান? আনিসুজ্জামান শিশুকে বোঝানোর মতো বলেন—নীল, ঘাবড়াস না। ভেঙে পড়িস না। যা হয়েছে তা ভুল না ঠিক, পাপ না পুণ্য আমি জানি না। কিন্তু মানুষকে সবসময় জীবনের দিকে তাকাতে হয়। মনে থাকবে তো নীলোফা?

নীলোফা ঘাড় নাড়ে। এবং চোখে জল আসে তার।

এই প্রথম আনিসুজ্জামান তার চিন্তা পাঠ করেছেন। সে আশ্বে বলে—ঘুমোতে যান, ভাইজান, কাল শরীর খারাপ করবে।

বাইরে আকাশে বজ্রবিদ্যুৎ উদ্ভাস্ত দাপিয়ে বেড়ায় এবং তুমুল অগ্ন্যুৎপাতের মতো বর্ষা নামে ডাঙায়।



ভোর হল। সূর্য উঠল না। সকাল হল। কিন্তু অন্ধকার এমন ঘনিয়ে এল যেন অকালেই সূর্য অস্ত গেছে। আনিসুজ্জামান ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঘন কালো মেঘের দিকে চেয়েছিলেন। নীলোফা চা করছিল। দরজায় বেল বাজল। নীলোফা বলল— দরজা কি খুলবেন আপনি, ভাইজান? আমার হাত বন্ধ।

আনিসুজ্জামান সাড়া দিলেন। দরজা খুললেন। তাঁর মুখোমুখি এক অচেনা যুবক। উচ্চতায় মাঝারি। ভাল স্বাস্থ্য, শ্যামল-শ্যামল রং। তার শার্ট-প্যান্ট ভিজ়ে গেছে। পাশে একটি স্যুটকেস। হাসিমুখে সে বলছে— আমি শমসের রহমান চৌধুরী, আমি এসেছি—

আনিসুজ্জামান তাকে কথা শেষ করতে দেন না। তার দু' হাত ধরে বলেন— এসো, এসো। আমি আনিসুজ্জামান।

তাঁরা পরস্পরকে অভিবাদন করেন। আনিসুজ্জামান আপ্যায়নে মন দেন। খুশির সঙ্গে অতিথ্য করেন। এই সকালে এই বৃষ্টিতে শমসের কেমন করে সঠিক ঠিকানায় এসে পড়ল তার খোঁজ নেন তিনি, যদিও আনিসুজ্জামান ও শমসেরের মধ্যবর্তী যোগাযোগ তৃণাকুর এ পারে এবং অধ্যাপক সমীরুদ্দিন চৌধুরী ও পারে, ফলে শমসের তৃণাকুরের নাম জানে এবং তিনি পাশেই থাকেন শুনে উৎসাহিত হয়। সে জানাতে থাকে, আনিসুজ্জামানের গবেষণার বিষয়ে সে আগ্রহী, সে সাহায্যও করতে চায়, তবে তার এ বারে কলকাতায় আসার মূল উদ্দেশ্য কলকাতা দেখা এবং যাকে কি-না এই বর্ষাতেই সে দেখতে চায়।

আনিসুজ্জামান প্রথম দর্শনেই শমসেরকে গ্রহণ করলেন। তার শ্যামল-শ্যামল শরীর, সুস্বাস্থ্য, তার সরল দু'টি চোখ এবং গালভর্তি দাড়ি— এই সব কিছু সমেত সে অতি চঞ্চল এবং হাসি ছড়িয়ে দেয়। সে কথা বলতে ভালবাসে বোঝা যায়, কারণ এখানে আসা ইস্তক সে থামেনি এবং নতুন পরিচয়কে হাওয়ায় উড়িয়ে ক্রমাগতই কথা বলতে থাকছে। আনিসুজ্জামানের অস্থিরতা এবং এই চার দেওয়ালের মধ্যবর্তী গুমোট জটিল অবস্থান সে এক ঝটকায় পাল্টে দিয়েছে। আনিসুজ্জামান তাকে, পোশাক বদলাবার সুবিধে করে দেবার জন্য নিজের ঘরে নিয়ে গেছেন। সেখান থেকেই, পোশাক বদলাতে বদলাতে সে বলছে— হ। আমি আমাগো দ্যাশখানৈ তুইল্যা আনলাম। কী কন?

আনিসুজ্জামান সাড়া দেন— কেন বলো তো?



—এমন জল, এমন বৃষ্টি! সালতি একখান লাগব না-কি ক্যাডা জানে!

আনিসুজ্জামান হাসছেন। বোরখার জ্বালায় নীলোফাও হাসছে। একখানি লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এল শমসের। ডেজা পোশাক কোথায় রাখবে জানতে চাইল। নীলোফা তার হাত থেকে পোশাক নিতে থাকল। সে বুঝি-বা দেবে কি-না ইতস্ততঃ করছিল। আনিসুজ্জামান নীলোফার পরিচয় দিয়ে বললেন— দিয়ে দাও। এ বাড়িতে নীলু যা চাইবে, না করলেই বিপদ!... আনিসুজ্জামানের কথায় শমসের হাসতে পারছে না। সে সালাম জানিয়েছে এবং চুপ করে গেছে। আনিসুজ্জামানের গৃহে এই বোরখাপ্রথা তাকে আহত করেছে। যতটুকু সে জেনেছিল আনিসুজ্জামানের গবেষণা সম্পর্কে, তাতে, একজন আধুনিকমনস্ক সংস্কারমুক্ত মানুষের কাছে সে আসছে এমনই ধারণা করেছিল। নীলোফার বোরখা তার উৎসাহ কালো করেছে। সে মনে মনে স্থির করেছে, এ বিষয়ে আনিসুজ্জামানের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

চা খাওয়া হলে শমসেরকে তৃণাকুরের কাছে নিয়ে গেলেন আনিসুজ্জামান। অন্যান্য দিন তৃণাকুর একটু দেরি করে ওঠেন। বিশেষ করে এই বাদল দিনে কিংবা যখন জাঁকিয়ে শীত পড়ে, তৃণাকুরের বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আজ তিনি তাড়াতাড়ি উঠেছেন কারণ আজ নীলিমার ইচ্ছায় তাঁকে চলতে হবে। রাধিকা কাজে আসছে না। তাদের ঘরে জল ঢুকে আছে। নীলিমা আবার নিজের হাতে সংসারের কাজ করছেন। কিছু অসহিষ্ণু হয়ে আছেন তিনি। কাজ-কর্ম রান্না-বান্না আর ভাল লাগে না। রাধিকার বিপদ তিনি বুঝছেন না এমন নয়। তবু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

তৃণাকুর শমসেরের সঙ্গে কথা বলছেন। অধ্যাপক সমীকদ্দিন চৌধুরী বিষয়ে কথা চলছে। আনিসুজ্জামান শুনছিলেন। নীলোফা এল। বলল— পাড়ার একজন এসেছেন ভাইজান। আপনাকে দরকার।

—কে?

—ওই যে, ডাক্তার জেঠুর ছেলে।

—কমলেন্দু?

আনিসুজ্জামান বেরিয়ে এলেন। কমলেন্দুই বটে। ভেতরে যায়নি। দরজার কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আনিসুজ্জামান বললেন— কবে এলে কমলেন্দু?

কমলেন্দু বলল— কাল এসেছি। অমরেশ কাকা টেলিগ্রাম করেছিলেন। বাবার অবস্থা ভাল না।

—তাই নাকি! সত্যি তো! অনেকদিন খোঁজ নিইনি ডাক্তারদার। কী হয়েছে?

—দিন ছ'য়েক আগে দুপুরে পূজো করতে করতেই অজ্ঞান হয়ে যান। কালীতারা মাসি দেখতে পায়। চোখে-মুখে জল-টল দেবার পর একটু সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। পূজোও শেষ করেছেন। কালীতারা মাসি ডাক্তার ডাকার কথা বলেছিল। কান দেননি। মাসি নিজেই অমরেশ কাকাকে খবর দেয়। রাত্রে যখন কাকা এলেন তখন বাবা আর বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না।

—হাসপাতালে নিলে না? বা কোনও নার্সিংহোমে?

—বাবা যাবেন না। জানান তো বাবাকে। কথা বলতে পারছেন না। জিভ জড়িয়ে গেছে, তা নিয়েও বলেছেন— এখানে মরতে দে। বাড়িতে মরতে দে। রাত থেকে কথা বন্ধ হয়ে গেল। তার আগে শুধু আপনার নাম করলেন অনেকবার। সুবীরদা ছিলেন। বললেন, পরে ডেকো, সকাল পর্যন্ত সময় পাবে।

—সুবীরদা মানে, ডাক্তার? সুবীরব্রত?

—হ্যাঁ। আপনি কি যাবেন একবার?

—নিশ্চয়ই। একটু দাঁড়াও।

কমলেন্দুর ভাবলেশহীন মুখ। সে অপেক্ষা করতে লাগল। আনিসুজ্জামান নীলিমা ও তৃণাকুরকে মল্লিনাথের খবর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। শোশাক বদলাবার কথা মনে রইল না। নীলোফা একটা ছাতা এগিয়ে দিল।

মল্লিনাথের ঘরে এলেন আনিসুজ্জামান। ঘরের সন্তর্পণ স্তব্ধতায় অমলেন্দুর মৃত্যুর দিনটি তাঁর মনে পড়ল। মল্লিনাথের মাথার কাছে চেয়ারে বসে আছেন মাধবী। তাঁর মুখও কমলেন্দুর মতো। কোনও ভাবান্তর নেই। পায়ের কাছে লিলি। লিলির ছেলে-মেয়েকে দেখা যাচ্ছে না। সত্যেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। মেঝেতে কালীতারা। মল্লিনাথ শুয়ে আছেন। গর্তে ঢুকে যাওয়া চোখ। গালে পাকিয়ে যাওয়া দাড়ি। বুকের খাঁচা জোরে জোরে ওঠা-পড়া করছে। ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপছেও যেন। চোখ দু'টি নিস্পৃহ। বহু দূরে সীমাবদ্ধ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। আনিসুজ্জামান বুঝলেন— সময় আসল। তাঁর মনে পড়ল—

The years to come seemed waste of breath,  
A Waste of breath the years behind  
In balance with this life, this death.

কমলেন্দু মল্লিনাথের কাছে গিয়ে ডাকল— বাবা। উনি এসেছেন।

মল্লিনাথের চোখের তারাগুলি কাঁপল। আনিসুজ্জামান শয্যা স্পর্শ না করে একটু ঝুঁকে বললেন— ডাক্তারদা, আমি এসেছি। আমি, আনিসুজ্জামান।

মল্লিনাথের স্ববির চোখ দু'টিতে জল ভরে এল। অস্তিম যাত্রার কালে যখন এই মহাপৃথিবী ডাকে, যেও না, দ্যাখো, আমরা এসেছি, আমাদের প্রিয়জন তুমি, থাকো, থেকে যাও, তখন একটু ফিরে আসার ইচ্ছা, একটু-বা লোভ এবং চূড়ান্ত অক্ষমতা জল হয়ে জমতে থাকে চোখে এবং গড়িয়ে যায়। মল্লিনাথ পক্ষীশাবকের মতো হাঁ করেন। শুকনো সাদা জিভ ভেতরে পাক খায়। আনিসুজ্জামান কী করবেন বুঝতে না পেরে এ দিক-ও দিক তাকান। মাধবী এক বাটি জল, বুঝি-বা তা গঙ্গাজলই, এনে বলেন, খুব স্বাভাবিক গলায়— ওঁকে জল দাও। উনি জল চাইছেন।

আনিসুজ্জামান অবাক হলেন। বলতে থাকলেন— আমি? আমি দেব? উনি তো আমাকে... আমার হাত থেকে... মানে শেষের দিকে উনি...

তাঁর কথা শেষ হয় না। মল্লিনাথ তাঁর জল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এ কথা তিনি আজ পর্যন্ত কারওকে বলেননি। মাধবী বলেন— আমরা দিতে চেষ্টা করেছি। উনি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। এখন হাঁ করছেন। তুমিই দাও। উনি তোমার জনাই অপেক্ষা করছিলেন।

আনিসুজ্জামান ভেতরে-ভেতরে কেঁপে উঠলেন। অমলেন্দুর মৃত্যুর দিন এই মহিলা সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। তাঁর পক্ষে হয়তো-বা তা আশীর্বাদই হয়েছিল। কিন্তু আজ তাঁর স্বাভাবিকতা যেন আরও এক অপ্রকৃতিস্থতারই অভিব্যক্তি। মানুষের সুস্থতাও যে কখনও এমন অসহ্য হতে পারে, আনিসুজ্জামান ইতিপূর্বে টের পাননি। তিনি বাটি হাতে নিলেন। একটি ছোট চামচ এগিয়ে দিলেন লিলি। আনিসুজ্জামান চামচে জল নিয়ে মল্লিনাথের মুখের কাছে ধরলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। বললেন— ডাক্তারদা, জল খাবেন কি?

মল্লিনাথ হাঁ করলেন। লিলি বললেন— ‘তিনবার দিন।’ একটু একটু করে তিনবার জল দিলেন আনিসুজ্জামান। মল্লিনাথ মুখ বন্ধ করলেন। চোখ বন্ধ করলেন। মাথাটা ঈষৎ কাত হল। মল্লিনাথ চলে গেলেন।

সমস্ত কান্নার শব্দ থেকে পালাবার জন্য বেরিয়ে এলেন আনিসুজ্জামান। তাঁর মন ভারাক্রান্ত হল। একটা মানুষ শুধু মিথ্যে দুঃস্বপ্নের তাড়া খেয়ে দগ্ধ হতে হতে চলে গেলেন। একটা মানুষ, যিনি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সমস্ত অশুভ সম্ভাবনার সঙ্গে লড়তে চেয়েছিলেন সংস্কার আঁকড়ে।

তিনি ভুল করেছিলেন। এই ভুলের উপলব্ধি হয়েছিল তাঁর। তাই, মৃত্যুর আগে তিনি ক্ষমা চেয়ে গেছেন। আশ্চর্য সেই ক্ষমা চাওয়ার অভিযুক্তি! আশ্চর্য সেই পাপ শ্রদ্ধাশীল। মাত্র তিন চামচ জল দিয়ে তা সম্পন্ন হয়। মাত্র তিন চামচ জলে অনিসুজ্ঞামানের সমস্ত অপমানবোধ ধুয়ে যায়। নীচেরতলার সিঁড়ির মুখে একলা দাঁড়িয়ে ছিল কমলেন্দু। জীবন বেকবে। তার মুখ নিশ্চুপ। করণ। অনিসুজ্ঞামান ছাড়া খুলছিলেন। কমলেন্দু অসহায় গাধায় বসে— কাকে কাকে খবর দিই বলুন তো। প্রমোদশকালা ও মিকটায় গেছেন।

অনিসুজ্ঞামান বলেন— আমি লাইব্রেরির দিকে কয়েকজনকে বলছি। সবাই খবর পেয়ে যাবেন। তুমি আর এখন বেরিয়ে না।

কমলেন্দু চুপ থেকে শুধু মাথা নাড়ে। একটি বিরাট মনে পড়ে যায় অনিসুজ্ঞামানের। প্রশ্ন করা উচিত হবে কি হবে না ভেবেও শেষ পর্যন্ত প্রস্তুতি রাখেন তিনি— তোমাদের পূজার কী করবে? কমলেন্দু?

কমলেন্দু জানে হাসে। জবাব দেয়— আর ইচ্ছা পূজেনি রাশি। নিষিদ্ধ শ্রুতি আদ্যবশ্যায় করা তো সম্ভব হবে না। আর বাড়ির রীতি অনুযায়ী বড় ছেলে ছাড়া তা করার অধিকারও কারও নেই। ওই বছরে একবার আসব, পূজা দেব। এই।

অনিসুজ্ঞামানের মনে হয়, সত্যিই সংস্কারের মৃত্যু নেই। সংস্কার অমর।



একটানা চারদিন বৃষ্টি হচ্ছে। সমস্ত খাল-বিল জলে ভর্তি। ফটিকবিলের জল রাস্তার এ পার থেকে ও পারে পড়ছে। যার জানা নেই তার পক্ষে চট করে ঠাইর করা মুশকিল যে ওখানে আলাদা কোনও বিল আছে। গোটা এলাকাই এখন খাল-বিল-জলাভূমি। বাদল আকাশ ক্রমশ-ক্রমশ-ক্রমশ নেমে আসছে নীচে ফেনা ছুঁয়ে দেবে অরুণ সেনের বাড়ির ছাদ। মাথো! এ কত বছরের জমা বর্ষা! কত দিনের অবরুদ্ধ জল।

পি ডব্লু ডি রোড বন্ধ। ট্রাক-বাস চলছে না। ট্রেনও বন্ধ। কোথাও কোথাও রেললাইনের ওপরে জল উঠে গেছে। ফটিক বিল বস্তির বেশ কয়েকটি বাড়ির দেওয়াল ধসে গেছে। সেইসব বাড়ির লোকেরা প্লাস্টিকের ছাউনি বেঁধে রেললাইনের ওপরে উঠে গেছে। যে-যার নিজেকে সামলাচ্ছে। কারও কোনও দিকে তাকাবার সময় নেই। সামান্য সাংসারিক বস্তু সামান্য তল্লি-তল্লা বাঁচাতে জান-জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে, আর সেই জীবন বাঁচাবার জন্য মাথার ওপর ছাদ বলতে প্লাস্টিকের ছাউনি। মাথুরের গড়ের গৃহিণীদের খুবই কষ্ট এই সময় কারণ কেউই আপন সংসার ও তার ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা ফেলে কাজে যাচ্ছে না।

প্রথম দু'দিনেই যখন হাঁটুর ওপর পর্যন্ত জল উঠল তখনও কারও ভয় করেনি। প্রতিবারের মতোই এই বাৎসরিক বিপর্যয় তাদের এই ভরসায় রেখেছিল যে বৃষ্টি কমলেই জল নামতে শুরু করবে আর তারা আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। কিন্তু তৃতীয় দিন বৃষ্টি তো কমলই না। বরং খাল-বিল এক হল। মাটির মেঝে গলে গেল। ছাদ ফুটো হল। দেওয়াল ধসে পড়ল।

কলকাতার নানা জায়গা বন্যাবিক্ষণ হওয়ায় বিপর্যয় ঢুকে পড়েছে। কে বাঁচাবে, ত্রাণ করবে কে? আসে তো বন্যাকে বন্যা বলে সরকারি ঘোষণা জারি হোক— তারপর ত্রাণ। এই মাথুরের গড়ের একটুখানি ফটিক বিল বস্তি, কতখানি জল জমলে, কতখানি ক্ষতি হলে বন্যার্ত এলাকার

পড়া যায় জানে না, তবে বন্যাকবলিত মানুষের মতোই অকৃত্রিম ত্রাস ও খাঁটি জীবনধারণের তাগিদে সামান্য পৌঁটলা বেঁধে, খোকাখুকু কোলে করে, ভাঙা ধসে পড়া ঘরের মানুষেরা ছুটে যাচ্ছে উঁচু কোনও ডাঙাভূমির সন্ধানে। আপাতত পার্শ্ববর্তী রেললাইন নাকটুকু জাগিয়ে রেখেছে। সেই এক ভূমির আশ্রয়। মাথুরের গড়ে হাঁটু-ডোবা জল। সেইখানে বাবুদের বাড়ি। আর তাতে আশ্রয় দেবে তেমন বাবু তারা নয়। এবং এই জলে মাথুরের গড়ও বিপন্ন বোধ করছে কারণ হাঁটু-ডোবা জলও জমে ওঠার কাহিনী এ অঞ্চলে কখনও শোনা যায়নি।

রাধিকা কাজে যাচ্ছে না। এই জল, এই বৃষ্টিতে যখন বিদ্যুৎ আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আর জল জমছে, ঘরে এক দানা আনাজ নেই, চাল ভিজ়ে পচা গন্ধ বেরুচ্ছে তখন তার দুধের ছেলেকে সে কার ভরসায় রেখে বেরুবে? তার বালক পুত্র পলাশকে সে কার ভরসায় কাছছাড়া করবে! ফটিকবিলের সীমানা আর আলাদা করা যায় না। তাদের রূপসী নদী যেমন হত বর্ষায়, বিশাল, ভয়ঙ্করী, চরাচরগ্রাসী— এই বর্ষায় সামান্য ফটিকবিলকেও তেমনই লাগছে রাধিকার। যদি ঔৎসুক্যে কাছে যায় পলাশ! আর সীমানা বুঝতে না পেরে ডুবে যায়! ভয়ে বুক কাঁপে তার।

খিলপাটনি গাঁয়ে বর্ষা এলে আশ্রয় যাবে এমন ভয় ছিল না। এখন সে-ভয় মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে। সংসার গেল বুঝি। দুই ছেলে নিয়ে এ বার সতি নিরাশ্রয় হল বুঝি রাধিকা। তার ঘরের চাল ফুটো হয়ে বৃষ্টি ঢুকছে অবিশ্রাম। ঝর ঝর টপ টপ। পলাশ ভয় পেয়ে মায়ের কোলের কাছটিতে এসে বসেছে। তাদের উঁচু বিছানা অবধি জল চলে এসেছে। তোশক ভিজ়ে সপসপ করছে। যেন মড়া স্বামীর বদলে দুই জ্যাস্ত সন্তান নিয়ে এ বার ভাসনে যাবে আধমরা বেছলা।

জল থেকে কীট, কেম্বো, কৈচো, বিছে উঠে পড়ছে বিছানায়। পলাশ একটি কাঠি নিয়ে বসে আছে। পোকা দেখলেই খুঁচিয়ে ফেলে দিচ্ছে। তার ভয়, একটি সাপ না উঠে পড়ে। ঘোলা জলে মাঝে মাঝে এমনকী দেখা যাচ্ছে শিঙমাছ সাটিমাছ। সেইসবে মন নেই পলাশের। ভেজা তোশকে বসে বসে তাদের গায়ের চামড়া জ্বালা করছে। ঘুম নেই। খিদে মেটেনি। ত্রাস আর অজানিত ভয়। ঘেন্না আর অস্বস্তি। আর সীমাহীন কষ্ট। কষ্টে চোখ-মুখ কালো। ক্লিষ্ট। জোছন সারাক্ষণ কঁদে-কঁকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এখন। পলাশ মায়ের দিকে চেয়ে আছে। বারেবারে বলছে— বৃষ্টি কখন থামবে, মা? জল নামবে কখন?

সে জানে মা এক বর্ষাদেশের মেয়ে। মা মেঘ চেনে। বৃষ্টি চেনে। মায়ের সেই দেশে বাদলদিনে সালতি দিয়ে ভেসে পড়তে হয়। সেখানে জলে ভেসে এ বাড়ি-ও বাড়ি যাও। এ উপান থেকে চলে যাও অন্য উঠানের ফসল। কিন্তু এখনকার জলজমা ঠিক ওখানকার মতো নয়। সে ছিল নদী। পলি আনত। মাটি ভাঙত। খেলা যদি হতও সে বিশুদ্ধ মাটি মেখে। - এনে সব নোংরা। সব ময়লা। মল, মূত্র, রক্ত, কফ। আ - পলাশ... গা গুলোয়। রাধিকারও গা গুলোয়। শরীরে ভয়, ঘেন্না, খিদে অহরহ জড়াজড়ি পাক খায়।

এই প্রথম বর্ষা রাধিকার। অন্যদের কাছে শুনে সেও প্রথম ভেবেছিল জল নেমে যাবে। কিন্তু যখন সব ঘরের চাল ফুটো হল আর একে একে এ বাড়ি-ও বাড়ির দেওয়ালগুলো ধসে পড়ল, জল বাড়তে বাড়তে সর্বস্ব খায়, তখন সে ভাবছে— কার বাড়ি যাবে! কার বাড়ি যাওয়া যায়! জোছনের জ্বর আসবে হয়তো। তার নাক দিয়ে জল পড়ছে। পলাশের বুঝি পেটের অসুখ করবে কারণ সে ঘেন্নায় জড়সড়। কী করে রাধিকা? কার্তিক ত্রাতা হয়ে আসবে তা স্বপ্নেও ভাবে না সে। শেফালির মা কি আশ্রয় দেবে? সেখানেও জল। শুনেছে সে। তা হলে? তৃণাকুর! তৃণাকুরের কাছে যাবে? নীলিমা কি তাড়িয়ে দেবেন? বলবেন— 'এত ঝুঁকি কী করে পোহাব বাপু!' না। বলবেন না। মানুষটা তো খারাপ নন। আর, তা ছাড়াও, এমন বোধ করে পোহাব বাপু!' না। বলবেন না। মানুষটা তো খারাপ নন। আর, তা ছাড়াও, এমন বোধ রাধিকাতে আজও অন্তর্গত যে সমস্ত বিপন্নতা নিয়ে অনাহুত কোথাও আশ্রয় চাইতে নেই। এবং যতখানি অপারগ ও দিকদিশাহীন অবস্থা এলে আশ্রয় আত্মসম্মানের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে

ততখানি রাধিকারও অন্তরে পৌঁছে গেল কিনা সে-বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। তবু, সে জোছনা শিশুটির দিকে দেখে, বাগল পলাশের দিকে দেখে এবং ভাবিত হয়ে সে যদি একবার যেতে পারত! একলা, সম্ভানদের কারও হেফাজত করে, যদি বলাহে পারত অবস্থা আর নীলিমা তাকে আদেশ করতেন—ছেলেদের ফেলে না রেখে এখানে নিয়ে এসো—যদি তা-হয়, তবু এই বিপদে নিশ্চয়ই রাধিকাকে ফিরিয়ে দেবেন না তিনি। কিন্তু এখন যাবেই-বা কী করে! এই বুকজলে, কোমরজলে পলাশকে নিয়ে, জোছনাকে নিয়ে কী করে পথ ভাঙে সে! ভাবছে, একটু জল নামুক, তারপর যাবে। তার ভাবনা হচ্ছে! নীলিমা ও তৃণাঙ্গুরের জন্যও তারনা হচ্ছে। একজন বৃদ্ধা। একজন আধাপঙ্গু। আহা! তাঁদের না-জানি কত কষ্টই হচ্ছে। তার মনে পড়ছে শমসের চৌধুরী বলে একজন আসবে ঢাকা থেকে। একবার শমসের মিলিয়ে যাচ্ছে। ভেসে আসছেন তৃণাঙ্গুর। তাঁর সব কথা, সব আর্তি, সব করুণ প্রার্থনা ও খুশি, সমস্ত অসহায়তা তাঁর। রাধিকা আবুল হয়। তার পলাশের মতো যেমন, জোছনের মতো যেমন তেমনিই তৃণাঙ্গুরের জন্যও। আবার শমসের আসে। চলে যায়। তৃণাঙ্গুর আসেন। থাকেন অনেকক্ষণ। চলে যায় আবার শমসের আসে। ঢাকা থেকেই আসবে কি সে? নাকি খিলপাটনি গা থেকে গায়ের গন্ধ নিয়ে? এই বর্ষায় সে কেমন করে আসবে! রাধিকার মনে পড়ে—এমনই জলময় গায়ে, এমনই মোর বর্ষায় সে সেইদিনও ভেবেছিল কেমন করে সে আসবে? কিন্তু সে এসেছিল। তাকে অটিকানো যায় না বুঝি। দাবিয়ে রাখা যায় না। সে সব বর্ষার দিনে পৌঁছয়। কত কাল, কত যুগ পেরিয়ে যেতে থাকে, তবু সে পৌঁছয়। সে বারবার বর্ষা বুকে করে, সালতি নিয়ে ভেসে ভেসে পৌঁছে যায় গ্রামে, আর পৌঁছে যায় ভাঙা মন্দিরের দাওয়ায়, আর বজ্রবিদ্যুৎ সাংকী করে তুমুল জলধারার মতো জাপটে নেয় রাধিকাকে। অপূর্ব ভালবাসায় কাছে টানে। বলে—ভালবাসি। ভালবাসি। ভালবাসি। অসামান্য প্রেমে সে দু'ঠোঁট নামিয়ে দেয় ঘাড়ের কুচো কুচো চুলে, কপালে, চোখে, গালে। সেই ঠোঁট ছক ভেদ করে শিরা, উপশিরা বেয়ে চলে গেছে কোন অন্তঃস্থলে। রাধিকা ভাবে। ভাবতে ভাবতে ভেজা ভোঁশকের থেকে, ভেজা পোশাকের থেকে, পাচা চাল ও পাচা জলের গন্ধ ও দুই অসহায় সম্ভানের থেকে পৃথক হয়ে পৌঁছে যায় জলময় গায়ে, খুপসি বটগাছের নীচে ভাঙা মন্দিরতলায়। জলময় বস্তির মতোই সে আবিষ্কার করে তার গ্রাম। আর নিরাপত্তাবিহীন অনিশ্চয়তার মতোও সে শরণ করে পদাবলীর আশর—

আমার মনের কথা শুনো গো সজনি।

শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস-রজনী ॥

কিলা গুণে কিরা রূপে মোব মন-গৈল।

মুখেতে না সবে সঙ্গি দুটি আঁখি কান্দে ॥

নিশ্বর অনন্দ ও চিত্তে নিবারিব।

না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি কহিব ॥

তখন বাইরে চিংকার ওঠে— ঝপ বাড়়ে। জল বাড়়ে। কে আছ ঘরে...এ...এ এসো...ও...ও।

পলাশ রাধিকাকে ঠেলা দেয়—মা, অ মা, কী কয়! বাইর যাইতে কয়! অ মা।

রাধিকা চমকায়—আঁ! কী! কী!

বুকজল ঠেলে রাধিকার ঘরে আসে মাস্টার, হর ও অন্যান্য যুবক পুরুষ। তারা সাবধান করে। চৈতন্য—চলে আসুন। বেরিয়ে আসুন। বান আসছে। জল যা বেড়েছে—এখুনি গোটা বস্তি চলে যাবে জলের তলায়।

হর পলাশকে কাঁখে নেয়। মাস্টার জোছনাকে তুলে ধরে। রাধিকা জলে নেমে আসে। জোছন দুম ভেঙে কাদছে। আরও কত কান্নার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তার কান্না। শোনার অবকাশ নেই। জোলানোর সময় নেই। সকলেই প্রতি মুহূর্তে টের পায় জল বাড়ছে। দলে দলে লোক ইটুচ্ছে।

একটুখানি ডাঙার সন্ধান ইটছে। জেগে থাকা রেল লাইনে ছুটছে। ক্রান্তিক জটিলের নীচে গাদাগাদি বসে ধরথর কাঁপছে। চোঁচাচ্ছে। কান্দছে। ভয়ের কান্না। সব হারানোর কান্না। সব গেল। সব গেল। ওই কি তাদের বস্তি? ওই কি তাদের সংসার? ভাঙা হোক, শূন্য হোক, তবু ওই ভোঁ তাদের গেরস্থালি।

অন্ধ বাপের মাথা কোলে করে বসে আছে। বুকে আগলেছে একটি মাত্র জীবন্তি। মাস্টারের সংগৃহীত সমস্ত ইতিহাসের একটি মাত্র কথা। বাকি সব ইতিহাস ভুলে গেছে। যেমন যায়, চিরকাল। প্রায় সবটাই ভুলে গিয়ে ভেসে গিয়ে জেগে থাকে একটুখানি স্মৃতি। ইতিহাস নাম। কান্না নয়। হাসি নয়। কিছু কথা। কিছু কীর্তি।

বস্তি নেই। বিল নেই। জল জল জল। বস্তিতে-বিলে একাক্ষর যেমন অন্ধকারে মারা-পুরুষ।

এতগুলি মানুষ। কোথায় যাব। কী করে। মাস্টার ও অন্যান্য পুরুষেরা ভাবছে। চিরকাল ডাঙা হয়ে জেগে থাকা মাথুরের গড়ে ইটুজল। তারা মাথুরের গড়ে আশ্রয় চেয়ে যাচ্ছে। বুকজলে এগোয় সাধ্য কী? তবু এগোতেই হয়। এ পার থেকে শ্যামাকান্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে রওনা হয়েছিলেন তখন। তলিয়ে যাওয়া ফটিকবিলের মানুষজনের জন্য যাচ্ছিলেন। বুকজল ঠেলে এগুনো। মাঝামাঝি জায়গায় দেখা হল দু' দলের। বর্ষা ভারী হচ্ছে। আরও ভারী হচ্ছে। শব্দ কথা শোনা যায় না। শ্যামাকান্ত নেতৃত্ব দিচ্ছেন। চিৎকার করছেন— ভাই সব, এখন আর পাটি নয়, নীতিবিরোধ নয়, এই চরম বিপদের দিনে আসুন আমরা মতবিরোধ ভুলে বস্তির বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াই।...

মানুষের পাশে মানুষই দাঁড়ায়। স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। মনুষ্যত্ব প্রমাণের জন্য মানুষের জীবনে সব সময়ই কোনও বিপর্যয় প্রয়োজন হয়েছে।

ছাতা নিয়ে লাভ নেই, তবু ছাতা মাথায় যুবদল কাজে নেমে পড়ছে। শক্ত কাজ। মিছিলে ইটু নয়। গুছনো বক্তৃতা দিয়ে ফিরে এসে আরামের মাছের কোল ভাত ও আলুপোস্ত খাওয়া নয়। এ এক সত্যিকারের বিপর্যয়ের মোকাবিলা। বন্যা। এ কি বন্যা? কে জানে বন্যা ঘোষণা করা হবে কি না। সাধারণ লোক বন্যাকবলিত হলেও, বন্যার প্রাণে দুর্গতিপ্রাপ্ত হলেও, আশ্রয়হীন খাদ্যহীন হলেও সরকার যতক্ষণ না ঘোষণা করছে—হ্যাঁ, এই জলোচ্ছ্বাস, এই বিপর্যয়, এই বিদ্যুটে আকাশ, এই বিশ্বাসঘাতক বৃষ্টি— এদের ষড়যন্ত্রে যে-অব্যবস্থা তার নাম বন্যা বটে। বিশ্বাস করুন ভাইসব— এই বন্যার জন্য আমরা মোটে প্রস্তুত ছিলাম না— ততক্ষণ বন্যা নয় বন্যা। খরা নয় খরা। বিপর্যয় নয় বিপর্যয়।

কিন্তু বন্যা ঘোষিত হোক বা না-হোক, কাজ না করলে চলবে না। সেইসঙ্গে সরকারের বিরোধিতা না হয় জা দেখতে হবে। সরকার বন্যা ঘোষণা না করলে বলতে হবে জল উঠেছে। তীব্র সেনে জল উঠছে। নিয়োগীপাড়া জল উঠেছে। উদ্ভাস্ত কলোনিতে জল উঠেছে। ফটিকবিল বস্তি জলের তলায়...

শ্যামাকান্ত মাথুরের গড় আদর্শ বিদ্যালয়ের বাড়িতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। একতলায় জল ঢুকেছে। থাকার ব্যবস্থা দোতলায়। আনিসুজ্ঞামান শমসেরকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। ছেলের দলে যোগ দিয়েছেন। শ্যামাকান্ত দল ভাগ করছেন। ছাতা মাথায়, মাথা ঠাণ্ডা করে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সকলে তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করছে। তিনি স্থির করছেন— রেললাইনের ওপর থেকে মানুষগুলিকে ভুল পর্যন্ত নিয়ে আসার দায়িত্ব নেবে কারা। এই দীর্ঘ জলমগ্ন পথ কিছু কম নয়। কারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল সংগ্রহ করবে। কারণ এখনও কোনও বাহ্যভাগর নেই। কারা থাকবে বিলি-বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায়। শ্যামাকান্ত আনিসুজ্ঞামানকে বলছেন— খাবার বিলি করার সময় আপনি থাকুন।

জল আরও বাড়ছে। সকলে আকাশ দেখছে। মেঘ সরে যাবার কোনও চিহ্ন নেই। শমসের ও আনিসুজ্ঞামান দেখছেন— প্রত্যেক দল একনিষ্ঠ কর্তব্য পালন করছে। এই বিপর্যয়



কর্তব্যপালনের সময়ও বটে যেমন মনুষ্যের দেখাবার সময়। আনিসুজ্জামান শমসেরকে নিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করার জন্য অপেক্ষা করছেন। শমসের এক বর্ষার দেশ থেকে এসে এ দেশের বন্যা ও বিপর্যয় দেখছে। সে ভাবছে, মাত্র তিরিশ বর্ষার আগে দুইশে একই বর্ষা হত। এখন বর্ষাও ভাগ হয়ে গেছে।

ভেজা কাপড়ে, ভেজা শরীরে, শীর্ণ, লাগটানো, সব খোয়ানো মানুষের মিছিল আসছে। কেউ ছেলে কোলে নিয়ে, কেউ বৃদ্ধ পিতাকে কাঁধে নিয়ে, কেউ সামান্য সফল মাথায় করে আসছে। মাস্টার অন্ধকে পিঠে নিয়েছে। অন্ধ বলছে—‘আমার নামিয়ে দাও।’

—না।

—আমি ঠিক চলে যাব।

—না। পড়ে যাবি। জলে ডুবে যাবি রে অন্ধ।

—ডুবে গেলে কী? আমি তো কারও কাজে লাগব না মাস্টারকাকা।

—লাগবি। অন্ধ। আমাদের ইতিহাস পড়তে হবে না?

—তোমার মাত্র একটাই ডায়ারি বাঁচানো গেল। আর সব চলে গেল।

—মাক।

—তোমার সব ইতিহাস, সব বই, সব লেখা চলে গেল।

—মাক। আমরা তো রইলাম। মানুষ থাকলেই ইতিহাস তৈরি হবে অন্ধ।

—আমি জলের গন্ধ পেয়েছিলাম মাস্টারকাকা।

—চুপ অন্ধ চুপ। এ কথা আর কারওকে বলিস না।

অন্ধর কান্না পাচ্ছে। সে জলের গন্ধ পেয়েছিল। ভাসানের গন্ধ পেয়েছিল। কিন্তু এই ভাসান কী ভরসার? মাস্টার অসুস্থ ছিল। তবু অন্ধকে বইছে। অন্ধ কত অসহায়। তার ভাল লাগে না। ভাল লাগছে না। অবধারিত অর্ধহীন লাগছে নিজেকে। আনোপ্যাস্ত অপ্রয়োজনীয়। মাস্টার যতই ইতিহাস পড়তে প্রলুব্ধ করুক, অন্ধ, তার পিঠে চেপে নিজেকে বোঝা ভাবা থেকে বিরত থাকতে পারছে না। সে ফের বলতে থাকছে—‘আমার বেঁচে থেকে আর কী হবে মাস্টারকাকা?’

—কেন রে?

—এই যে, তুমি, তোমার অসুস্থ শরীর, আমাকে পিঠে করে টানছ—

—তাত্তে কী?

—তুমি তো বলো মানুষের উচিত তার নিজের ভার বইতে পারার শক্তি অর্জন করা, নইলে আর মানুষ কীসে? আমি আর নিজেকে বইতে পারছি কই!

—শুধু কি নিজের দেহ বয়ে চলার কথাই আমি বলেছি রে অন্ধ? মানুষকে আসলে বইতে হয় তার বোধ, উপলব্ধি, অনুভূতি। অন্ধ, শরীরের চেয়ে মানুষ অনেক বেশি দায়বদ্ধ তার বিশ্লেষণী শক্তির কাছে।

—বিশ্লেষণী শক্তি? মাস্টারকাকা? সেও তো তা হলে শক্তিই হল। তুমি যে বলো মানুষের শক্তিই তার সার্থকতা—আমার সার্থকতা কই?

—শোন, অন্ধ, শোন। পৃথিবীতে সবার ভূমিকা এক হয় না। এই যে আমি তোকে নিয়ে যাচ্ছি অন্ধ, আমার নিজের জন্মের বেশ একটা অর্থ আছে এতে। যেন আমার জন্ম, আমার বেঁচে থাকা শুধু আমার জন্যই নয়। তোর জন্যও। মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে আমার নিজের কাছে নিজের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাকে পিঠে নিয়ে মনে হল, না, এটুকু সার্থকতা তো আজও ফুরোয়নি। অন্ধ, এই যে জলে ডুবে গেল আমাদের বস্তি, এই যে আমার এত আগলে রাখা ইতিহাস ভেসে গেল, এই যে আমরা এখন রিলিফের ঘিড়ি ঝেঁতে যাচ্ছি আর ইশকুলে থাকব কত দিন কে জানে, এর পরও, আমার আবার নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে করছে। জল নেমে গেলে আবার আমরা নতুন করে ঘর বেঁধে ফেলব দেখিস।

—সেই ঘরটা কেমন হবে মাস্টারকাকা? আর জলে খসে পড়বে না?

—জানি না অন্ধ। হয়তো পড়বে। হয়তো আগামী বছর আবারও আমরা সব জীবিত বুকজল ভেঙে আশ্রয়ের জন্য ইটব। কিন্তু আমরা ধ্বংস হব না।

—তখনও আমার কোনও কাজ থাকবে না, কল্যাণ, তখনও আমি হোমল্যান্ড পিঠে চেপে জল পার হব।

—অন্ধ, মানুষ যেমন নিজের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হবে তেমনই পরস্পরের ভীষ্মকে সার্থক করে তোলাও তার কাজ। অন্যকে সার্থক করেও নিজের জীবনের অর্থ পাওয়া যায়।

—তবু... কারও পিঠে চেপে জল পার হওয়া... এ তো সবসময়ই বিপ্লী, না, মাস্টারকাকা? নিজেকে একটা বোঝার মতো লাগে না?

—দরকার হলে আমরা এ গুর বোঝা একটু নেব না, অন্ধ? মানুষের সার্থকতা একমুখী নয় রে। একমাত্রিকও নয়। মানুষ একটা মানুষের শরীর নিয়েই জন্মায়। তার মধ্যে কিছু ক্ষমতা। উপলব্ধি। আচরণ। এর পর তাকে প্রতিনিয়ত ভাবে হয়, ওই ক্ষমতা সে কীভাবে ব্যবহার করবে, ওই উপলব্ধি সে কী করে অভিব্যক্ত করবে, ওই আচরণ সে নিয়ন্ত্রণ করবে কেমন করে। ভাবতে হয়, ভাবতেই হয়, কারণ, এরই মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণগুলি ফুটে উঠবে।

মাস্টার আকাশের দিকে দেখে। ক্ষুণ্ণ কুঞ্চিত বাদল। কালো রাণী মেঘ। হালকা আলো আছে। সূর্য নেই। অবিজ্ঞান বৃষ্টিপতন। কখনও ভারী, কখনও হালকা। মাস্টারের মনে হয় এই ভিজতে থাকা কোন অনাদি অতীত থেকে, এই জল ভেঙে চলা যেন চলবে চলছে আবহমানকাল। তখন, একটি জলস্থ গর্তে মাস্টারের পা পড়ে। সে একটু টাল বায়। অন্ধ জোরে আঁকড়ে ধরে মাস্টারকে। মাস্টার ঝাঁকি দিয়ে তাকে ঠিকঠাক পিঠে বসিয়ে নেয়। তারপর বলে—গলটা ভাল করে জড়িয়ে ধর অন্ধ। হাত আলগা করিস না।

অন্ধ তবু ভাবছে নিরন্তর। যেন তার সংশয় ঘোচে না। অন্ধত্ব ছিড়ে বেরিয়ে আসার মতোই সংশয় নিরসন নির্মম অসম্ভব। এ শুধু চাইতে পারা যায়। এবং চাইতে থাকলেও তার একা লাগে। নিসঙ্গ লাগে। আর মাস্টার? সেই বা নী? ইতিহাস হতে চাওয়া মানুষ। সে কি নিসঙ্গ নয়? ইতিহাস কি নিসঙ্গ নয়? একজন নিসঙ্গ একজন অসহায়কে কাঁধে তুলে জল ভেঙে চলেছে। তারা পরস্পর বন্ধুত্ব প্রার্থনা করছে। কে যে কখন কার বন্ধু হয়ে যায়, কে কার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করে, কে বলতে পারে? যেমন শমসের ও অনিসুজ্জামান— দুই দেশের দুই যুবা, বয়সে অসমান, প্রথম দিনযাপনে পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব অনুভব করছেন। মেঘলা আকাশ ও বারিপাতের নীচে, বিপর্যয়ে ও দারিদ্র্যশীলতায় তারা পরস্পর দর্শনবিনিময় করে নিচ্ছেন। শমসের প্রণয় করছে— আকখান কথা জিগাই?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

শমসের বলছে। শান্ত ও দৃঢ়ভাবে। তার নিজস্ব ভাষা ও উচ্চারণে— আপনারে দেখা লাগে... হ্যাঁ। সত্যি। অবাক লাগে আপনাকে দেখে কারণ আপনি ধর্মের অনুশাসন মানেন না, নিষম মানেন না, অথচ আপনার বাড়িতে এখনও মেয়েদের বোরখা পরতে হয়।

অনিসুজ্জামান হাসেন। সে হাসি করণ লাগে। ঠিক প্রশ্নই করেছে শমসের। সঙ্গত প্রশ্নই করেছে। তিনি বলেন— মেয়ে মানে তো একা নীলোফাই।

—হ।

অনিসুজ্জামান চূপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। তার বকের মধ্যে ভয়ের সিরসিরানি বাড়ে। কারণ, নীলোফা প্রসঙ্গে এসে তাঁর আবার মনে পড়ে গেছে কেন বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এই বর্ষা খেমে যাবে। কন্যার জল নেমে যাবে। কিন্তু অনিসুজ্জামানের বিপর্যয় বৃদ্ধি পাবে ক্রমশ। তাঁকে কোনও উপায় বুজতে হবে। কী উপায় তিনি জানেন না। এই বন্যার্ত

মানুষগুলির চেয়েও নিজেকে বেশি বিপন্ন ও অসহায় লাগে আনিসুজ্জামানের। শমসের, আনিসুজ্জামানের নীরবতায় সতর্ক হয়। প্রশ্ন করে—কিছু মনে করলেন কি? কললাম বলে! আনিসুজ্জামান।

আনিসুজ্জামান শমসেরের পিঠে হাত রাখেন। ধীরে ধীরে নীলোৎসব পুড়ে যাবার বৃত্তান্ত বলতে থাকেন তিনি। শমসের স্তব্ধ হয়ে শোনে। আনিসুজ্জামানকে বিবরণ ও গভীর দেখাও এখন। এই বিষয়টা কাটাতে দুর্গাবিসয়ক থইতির অনেক আগে শমসের। বসন্তে তায়, থইখানি প্রশংসনীয় কর্ম বটে। আনিসুজ্জামান বলেন—এ নিষেধই প্রশ্ন উঠেছে।

—কী প্রশ্ন?

—মুসলমান হয়েও আমি পৌত্তলিকতা বিষয়ে কথা বলেছি। কতজন কারও মতে এটা ইসলামবিরোধী কাজ। আবার কোনও কোনও হিন্দুর মত হল, দুর্গাবিসয়ে আমার বই লেখা অন্যকার চর্চা। আমি হিন্দুধর্মকে অপমান করার জন্য এটি লিখেছি।

শমসের মুখ নিচু করছে। আনিসুজ্জামানের বিবরণটা তাকেও স্পর্শ করছে। সে বলছে—শুধু বিরোধ। শুধু ভাঙন। হিন্দু আর মুসলমান। মুসলমান আর হিন্দু। এ কি কোনওদিন মিটেবে না? মিটেতে পারে না? একই মানুষের শরীর। চামড়ার নীচে একই লাল রক্ত। একই প্রাণ। আনিসুজ্জামান, আমি আমাদের সব নিয়ম মানি। অস্ত্রত বাড়াতে যখন থাকি তখন আকাশের সামনে আমার নিয়ম না মেনে উপায় নেই। মনতে আমার খারাপও লাগে না। কিন্তু এই স্বধর্মবোধ আমাকে কখনও হিন্দুবিরোধী করেনি। কেন করেনি আমি জানি না। কতদিন আগে এক হিন্দু মেয়েকে আমি ভালবেসেছিলাম। সেই আমার প্রথম ও শেষ ভালবাসা।

সে বলে যায়। অস্বপ্নতভাবে বলে যায়। বড় দুঃখী ছিল সেই মেয়ে। আর তাকে দেখেই তার হৃদয়ে প্রেমের উদ্বেগ হয়েছিল। একদিন, এরকমই বৃষ্টির বিকেলে তাকে বুক সাপটে নিয়েছিল সে। ভাঙা মন্দিরের অন্ধকার বারান্দায় প্রেমিকাকে বুক নিয়ে অপার শান্তির সন্ধান পেয়েছিল। তখন শুধু শান্তিত্ব ছিল, সুখ ছিল, স্বপ্ন আর আকুল উদাস ভালবাসা। তার মধ্যে এতটুকু হিন্দু বা মুসলমানত্ব ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের এরকমই তো হওয়ার কথা, আনিসুজ্জামান, কেন হয় না?

আনিসুজ্জামান শমসেরের হাত ধরেন। বলেন—আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা এরকমই, শমসের। আমরা তা কেবল ভুলে থাকি। কিন্তু সেই মেয়েটির কথা বলো। সে কোথায় এখন?

—হারিয়ে গেছে সে, আনিসুজ্জামান। আমি ঢাকায় পড়তে চলে গেলাম। রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম। নিয়মিত গ্রামে যাওয়া হত না। কললাম তার বিয়ে হয়ে গেছে। একটা আধবুড়ো লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—ও।

—হেইলিগাই আমি কইলকাতায় আইসি।

—তাই?

—হ্যাঁ। আনিসুজ্জামান। একবার দেখতে চাই ওকে। একবার জানতে চাই ও কেমন আছে। ভাল আছে কি না। ও যদি ভাল না থাকে, তবে ও যে অবস্থাতেই থাক, ও যদি পড়ে-গলে যায়, ওকে যদি কুষ্ঠরোগে ধরে, ও যদি পুড়ে-দগ্ধে আগুনে হয়ে যায়, তবু তবু তবু আমি ওকে নেব। ও আমার।

আনিসুজ্জামান আমূল কৈশে ওঠেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে শব্দ বেরোয়। ছিটকে ছিটকে ওঠে। হিজা তোলায় মতো। খাবি খাওয়ার মতো। চোখের জল শুকিয়ে যাওয়া দম ফুরিয়ে যাওয়া কান্নার মতো। শমসেরের কথা শুনে শুনে এই বর্ষা, এই বন্যা ও বিপর্যয়ে, খিচুড়ি বিলোবার আগে একটি তবু তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়—তিনি অন্ধ। নিজের সম্পর্কে এই অন্ধত্বের

কোনও সীমা নেই তাঁর। শমসের, সেই কৈশোরের স্মৃতি আগলে রেখে যা-উপলব্ধি করতে পেরেছে তিনি প্রাত্যহিকতার মধ্যে থেকেও তা বুঝতে পারেননি। আজ তাঁর এই বোধ জাগছে যে যা-কিছু থেকে তিনি পালাতে চেয়েছেন সারাক্ষণ তাই আসলে তাঁর পরম বাস। তিনিও কি ঠিক ওভাবেই চাননি কোনও প্রেম? কোনও দাম্পত্য? আশ্রয় দেখা দেয় তাঁর মধ্যে। আত্মদর্শন। আনিসুজ্জামান— কার ওপর সরচেয়ে বেশি নির্ভর করে তুমি।

—নীলোফার ওপর।

—সমস্ত ক্রান্তি ঢেলে দিয়েছ কাকে?

—ওকেই।

—কে, মাত্র দু'দিনের জন্যও রিপন স্ট্রিটের বাড়িতে গেলে অসহায় হয়ে গিয়েছ তুমি?

—ও। ওর জন্য।

—কষ্ট পেলে কার কাছে উদ্গিরণ করেছ সব আর বিদে-ভূফার কথা জানিয়েছ?

—ওকেই তো। ওকেই।

—তোমার তাপিত হৃদয়কে সুরে সুরে শান্ত করেছে কে?

—ও। ওই।

—তোমার ঘুণায় চূড়ান্ত কষ্ট পেয়ে কে ছুটে গিয়েছিল পীরবাবার মাজারে আর প্রার্থনা করেছিল মাত্র একজনের জন্য যে ওকে দেখে...

—ও। ও-ই। আমারই জন্য ও ছুটে গিয়েছিল। আমিই ওকে চরমতম অপমান করেছিলাম। আমিই ওকে প্ররোচিত করেছি। আমার ওপর নির্ভর করেছিল ও। বিশ্বাস করেছিল। বিনিময়ে ওকে আমি কষ্টই দিয়েছি শুধু।

—আজ এই ভয়ঙ্কর পরিণতির মুখোমুখি সে কার জন্য?

—আমার, আমার জন্য।

—ভবে দ্যাখো, কার জন্য উত্তলা হয়েছ তুমি? কে ভয়ে ও লজ্জায় মারা যেতে পারে বলে রাস্তা ঘুরোতে পারেনি?

—ও। ও। ওর জন্য।

—পৃথিবীতে কেউই কি আছে তোমার, যাকে ছাড়া বাঁচবে না তুমি? চলবে না তোমার?

—ও। ও না থাকলে। ওই রূপহার। মেয়ে। ওই পুড়ে যাওয়া বীভৎস মেয়ে। তবু ওই তো সবচেয়ে সুন্দর। সবচেয়ে প্রিয়জন আমার। ও আমাকেই... ও আমাকেই...

—কি? কি? কি? বলো।

আনিসুজ্জামান অকস্মাৎ শমসেরকে বলেন— তুমি কি ঝুলে গিয়ে কাজটা শুরু করে দেবে ভাই?

—আপনি?

—একটা জরুরি কাজ মনে পড়ে গেল। একবার ফিরে যেতে চাই।

—কোথায় আনিসুজ্জামা?

—বাড়িতে। শমসের।

অনুপম আসছিল। ডাকছিল আনিসুজ্জামানকে। আনিসুজ্জামান অনুপমের সঙ্গে শমসেরকে পাঠিয়ে দিলেন ঝুলে। নিজে ইটিজল ভেঙে চললেন। বলবেন নীলোফাকে। কী বলবেন। কীভাবে বলবেন। বলবেন কি, ভালবাসি তোকে, ভালবাসতাম, কিন্তু বুঝিনি, বুঝতে পারিনি, কিন্তু, মনে মনে মূল্য দিয়ে গেছি, নীলোফা—। নীলোফা কী বলবে তখন? বলবে কি—মূল্য তুমি কীভাবে দিয়েছিলে? কীভাবে বানো আমাকে তোমার জন্য লতা ও নিশ্চিত ককণা? আমাকে নিরস্ত করো কী করে, কবে কতদিন রেখেছ অন্তরে, আমি কি তোমার কাছে নিতান্ত পথিক? বসবাস দু'দিনের? দু'দিনের দেবাশুনা ফুরিয়ে যাবে কি? কখন ফুরোবে কখন

নির্ধারিত হবে আমি আর প্রয়োজন নই। এর চেয়ে বড় কুস্তি, আরও আরও বড় উদ্দেশ্য জানিয়ে তুমি পেয়ে যাবে অবিকৃত... আমি তো বিকৃত... ভুলে যাওনি তো? বলবে কি সে? এত করিন করে? এত স্পষ্ট? জানেন না তিনি। কিন্তু এইটুকু নিশ্চিত যে বলবে। বলছেই হবে তাঁকে। তাঁর আর একটুও সংশয় নেই। উদ্বেগও নেই। ভেজা ভেজা ছাপ ঢালে সিঁড়ি নিয়ে উঠতে থাকেন তিনি। সঙ্গে নেমেছে। আলো নেই। অন্ধকারে ভুবে বাসে সব। আনিসুজ্জামান দরজায় শব্দ করলেন। নীলোফা দরজা বুলে দিল। এখনও আলো জ্বালেনি সে। ল্যাম্পের চিমনি পরিষ্কার করছিল বৃষ্টি। টেবিলে ছড়ানো সব। আনিসুজ্জামান দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। তাঁর শরীর কাপতে থাকছে। ঠোঁট দুটি গালাভ ও চঞ্চল। তিনি দুপুরে যাওয়া সমর্পিত, একলা মানুষের গলায় ডাকেন— নীলোফা, নীলু, গেল।

নীলোফা এই ঘর শুনে শক্ত হই। কিছু কি ঘটল? এমনিতেই তো জরুরী এক দুঃসময়ে আছে। সে প্রশ্ন করে— কী হয়েছে ভাইজান? কী হল? আপনি ছুলে গেলেন না?

আনিসুজ্জামান বলেন— গিয়েছিলাম, নীলোফা। যাব আবার।

নীলোফা তাকিয়ে আছে। ভাইজানকে অন্যরকম লাগে তার। আনিসুজ্জামান বলেন— তোর কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো নীলোফা?

—না ভাইজান।

আনিসুজ্জামান ভাষা হারিয়ে ফেলেন। দুটি যেমে যাওয়া কাপতে থাকা হাতে তুলে দেন নীলোফার মুখের চাকনাটি। এবং উষর মুখ— এই প্রথম—স্পর্শ করেন তিনি। বলেন— ভয় পাস না। নীলোফা। আমি আছি রে। আমার যে তুই ছাড়া কেউ নেই আর। আমি তোকে... আমি তোকে... নীলু, তুই চলে যাবি না তো?

নীলোফা কঁপে যায়। বলে— কোথায় যাব, ভাইজান?

—যদি কেউ তোকে নিতে আসে? যদি ফিরে আসে কেউ? যদি বলে—চলো—তুই চলে যাবি নীলু?

—আজ আপনার কী হয়েছে ভাইজান?

—আগে বল নীলু, চলে যাবি না তো তুই?

—না। যাব না, ভাইজান।

—কারণ কাছে না?

—না।

—সত্যি? সত্যি নীলোফা? তোকে ছাড়া আমার চলবে না রে নীলু। নীলোফা। তোর মধ্যে যে আসছে সে আমার। কেমন? নীলোফা— আমি তোকে... আমি তোকে...

দরজায় শব্দ হয়। আনিসুজ্জামানের কথা শেষ হয় না। নীলোফা স্তব্ধ পাথর হয়ে আছে। অসম্ভব আলোড়নের পূর্বকার নিশ্চলতা। আনিসুজ্জামান দরজা খোলেন। তৃণাকুর। বনছেন— তুমি যাওনি তো এখনও? ভাগ্যিস।

—কেন মাথুলা?

—হ্যাঁ। আমাকে একটু ছুলে নিয়ে যাবে ভাই? ফটিকবিল বস্তির সবাই তো ওখানেই আছে?

নীলোফা তৃণাকুরের দিকে তাকায়। সে অনুমান করে কী হতে চলেছে। তৃণাকুর বলেন— রাহিকাকে নিয়ে আসব বাড়িতে। ওকে তো দেখার কেউ নেই। হলই-বা কাজের মেয়ে। আমার তো দায়িত্ব আছে একটা। বলো? দুইটা ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে... বোঁরা...

—আছেই তো।

জোরের সঙ্গে জবাব দেয় নীলোফা। আপনি চলে যান ভাইজানের সঙ্গে মাথুলা।

তৃণাকুরকে ধরে ধরে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন আনিসুজ্জামান। বলেন— তুমি

আর কষ্ট করে যাবে কেন? আমিই তো নিয়ে আসতে পারতাম।

তৃণাকুর বলেন—না। আমি না গেলে যদি না আসে সে?

দু'জনে ধীরে ধীরে এগোন। ইটুজল ভেঙে তৃণাকুরের এগোতে কই হয়। তবু তিনি অনিসুজ্ঞামানের হাত আঁকড়ে এগোন। অনিসুজ্ঞামান নির্দিষ্ট লক্ষ্য অতিক্রম প্রত্যয়ে পা ফেলেন। তাঁর একটুও অশান্তি নেই। সব কথা বলা হল না নীলোৎসবে। তাতে কী? বলবেন। তাঁর আর তাড়া নেই। এবং, যেতে যেতে নিজেকে নতুন করে দেখতে পান তিনি। এই প্রথম তাঁর ধর্মের বিধান তাঁকে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করেছে। এই প্রথম তাঁদের পরিবারের প্রচলিত বিধিটি তিনি ভাঙছেন। জীবন তাঁকে দিয়ে সম্পন্ন করে নিচ্ছে বহু ভাঙনের কাজ। বহু নির্মাণের কাজও। তাঁর সিদ্ধান্ত কে কীভাবে নেবেন? মনিফিল? ভাটামারা? তৃণাকুর? নীলিমা? যে যে-ভাবেই নিক—অনিসুজ্ঞামান অপূর্ব প্রশান্তি নিয়ে হেঁটে যান। ধীরে ধীরে। তৃণাকুরকে ধরে। তাঁর তাড়া নেই। কোনও তাড়া নেই।



ঝিচুড়ি বিলোড়িল শমসের। সে আর অনুপম কীধে কীধ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। দু'খানি লঠন ছালা। তবু পূর্ণ আলো নেই। আধো আলো আধো অন্ধকারে একের পর এক মিছিল করে আসে থালায় ঝিচুড়ি তুলে দেওয়া কাজ। একটি যেমটা দেওয়া মুখের হাত থেকে ঝিচুড়ি সমেত থালা পড়ে গেল নীচে। মিছিলের পিছনের লোকেরা তাকে থিকার দিতে থাকছে। খাবার সস্তা পেয়েছ? একটু সাবধান হতে পারছ না? শমসের খামিয়ে দিল তাদের। ধমকাল। থালা তুলে ঝিচুড়ি দিল ফের। আর ওই থালাভর্তি ঝিচুড়ি নিয়ে একলা অন্ধকারে এসে দাঁড়াল রাধিকা। জল জল জল। আলো নেই এতটুকু। হাতের থালার ঝিচুড়ি দোতলার বাবান্দা থেকে জলে ফেলে দিল সে। ছপ ছপ শব্দ হল জলে। মনে পড়ল তার— মা ভেসে যায়। সাপত্তি ভেসে যায়। মেঘ-আঁচল ওড়ে। দুই চোখে জল আসে তার। এই বর্ষায় এই জলে ভেসে গেল সব। কী ভাসে? কী? তখন জোছনকে কোলে করে পলাশ মায়ের পাশে আসে। বলে—মা। তেনি আইছেন।

—কে?

—আমাগো লইতে আইছেন মা। যাবা না?

—কে?

—তুমি যাগো বাড়ি রান্দো।

ধীরে ধীরে থালা নামিয়ে রাখছে রাধিকা। তিনি এসেছেন তবে। বেশ। জোছনকে কোলে তুলে পলাশের হাত ধরে সে বলছে—'চল।' ভাবছে—আহা! পদ্ম মানুষটা এত দূর এসেছেন কষ্ট করে। এই জলে। এই বুড়িতে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার আগে আর একবার খাবার দেবার ঘরে উকি দিল রাধিকা। শমসের একমনে কাজ করছে। লঠনের আলোর ঘাম-চকচকে শরীরে কী আশ্চর্য দেখাচ্ছে তাকে। সুখা ছানিয়া কেবা ও সুখা ঢেলেছে গো, যেমতি শ্যামের চিকন দেখা... শমসের— কী সুন্দর! এ পাড়ায় অতিথি হয়ে এসে সবার সঙ্গে কেমন কাজ করছে দেখো। কী শক্ত কীধ ওর। কী মসৃণ কীধ! রাধিকা সেই কিশোরবেলার মতো ডাকতে চায়— শমসেরদা— কিন্তু পারে না। কোলে জোছন ছুটিয়ে কেঁদে ওঠে। তার গা গরম। রাধিকা তাকে শান্ত করতে করতে ভাবে—



কাকে ডাকতে যাচ্ছিল সে। কেনই বা ডাকছিল! এত বছর পরেও শমসের কি মনে রেখেছে সেইসব? রাখলে চিনতে কি পারত না সে? বুঝতে কি পারত না? সে তো বলত—‘আমি তব গন্ধ পাই। যেখানেই থাক। তরে আমি ঠিক পাম।’

আজ রাধিকা এত কাছাকাছি ছিল, কই গন্ধ তো গেল না শমসের? চিনতে তো পারল না রাধিকাকে। ঘোমটা ছিল তার। তবু— তবু—। রাধিকার সংশয় বাড়ি। এই ক’ বছরে নিশ্চয়ই বদলে গেছে শমসের। কিংবা কে জানে, শমসের হয়তো তেমনই আছে, বদলে গেছে রাধিকার গন্ধ। ভাসতে ভাসতে কইতে কইতে সে বুঝি আর তেমন রাধিকা নেই।

পলাশ তাড়া দেয়। এই অন্ধকার ছুলবাড়ি, এই গাদাগাদি ভিড় আর যত্ণার চিৎকার হা-ছতশ তার আর ভাল লাগছে না। এমনকী অন্ধও কেমন ক’টা বলাই নে। এক কোণে তার বাবাকে নিয়ে চুপ করে বসে আছে। বাবার গায়ে মৃত্যুর ছাপ পেয়েছে সে। পলাশ তাই তাড়া দিচ্ছে মাকে। মায়ের ভেজা ময়লা আঁচলটি ধরে বলছে— মা! বাবা না? চলে।

তারা নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। তৃণাকুর সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে ছাতা। বলছেন— চলে। সঙ্গে কিছু আছে? কেনও জিনিস? তবে নিয়ে নাও।

কিছু নেই। কী নেবে। আজ রাধিকা পরিপূর্ণ রিক্ত। সে আজ সমস্ত ভাসিয়ে দিল। সবটুকু। তার দেওয়া অস্ত্রের সঙ্গে সমস্ত স্বপ্ন আর স্মৃতি। এবং রিক্ত বলে, সে নেমে আসছে সন্তান সমেত। চলে যাবে—যেখানে তৃণাকুর।

আনিসুজ্জামান বলছেন— আমি তোমার সঙ্গে যাব মাছুস?

তৃণাকুর বলছেন— না ভাই। আর তোমাকে যেতে হবে না। রাধিকা আছে। আমার আর অসুবিধে নেই।

কী নিশ্চিত তৃণাকুর। রাধিকা আছে। কী মমতায় জল ঠেলে পঙ্ক শরীর নিয়ে চলে এসেছেন তিনি। রাধিকার বুকের তলায় মোড় লাগে। সে ভাবে, শমসের পাশের বাড়িতেই থাকবে। সে কি বলবে— ‘রাধু, তরে বিয়া করম?’ না। বলবে না আর। যদি বলে তাতেই বা কী? সত্যি তো আর তা সম্ভব নয়। কেন নয়? যদি চলে যায় সে? কার্তিককে ফাঁকি দিয়ে? কার্তিককে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব। কিছু পলাশ? জোছন? যদি শমসের আকাশের মতো বড় হয়ে যায়? যদি বলে— ‘যাউক অরা। যাউক আমাগো লাগে।’ তারপর?

না। এখন আর হয় না। হবে না। সে যে নিরন্তর ধান করেছে শমসেরকে আর চেয়েছে এতকাল জাগরণে, স্বপ্নে— তা কি চাওয়াই শুধু নয়? চেয়ে বেঁচে থাকা নয়? স্বর্গের কল্পনায় পৃথিবীর কষ্ট পেরুনা নয়? সেই টান আর টের পাচ্ছে না রাধিকা। যার তুমুল প্ররোচনায় সে পরমেশে শমসের দেখত। কোথায় হারিয়ে গেল সব? স্বপ্নে যা জেগে ছিল, স্মৃতিতে যা জেগে ছিল সত্যিই সেই সবই কি ভেসে গেল জলে? নাকি তারা অন্য কোনও মানুষে ডুবেছে?

কিংবা কোনও মানুষেই নয়। দেহ-মানে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে রাধিকার। চিলচিলছন্দ! কোনও মানুষে পৌঁছেই বুঝি তার পূর্ণতা সম্ভব না। এক পুরুষে দেহ ধায়, এক পুরুষে মন।

শুন গো মরম সবী

ঐ শুন শুন মধুর মুরলী

ডাকয়ে কমল-আমি ॥

যেরখ না ধরে প্রাণ কেমন করে

ইহার উপায় বল ॥

আর কিয়ে জীব গোপের রমণী

বৃন্দাবনে যাব চল ॥

এই অনুমান করে গোপীগণ

শুনি যে বীশির গীত।

শুধু তনু দেখ      এই তনু নোল  
তথায় আছয়ে চিত্ত ॥

জোছনকে কোলে নিয়েছে রাধিকা। অন্য হাতে পলাশ। তুণাকুর পানিকণে কাছে হাত রাখলেন। ছাতা ধরলেন মাথায়। রাধিকা বলল—ছাড়েন। মাইনয়ে কী কইব।

তুণাকুর বললেন— কে লোক ? রাধিকা ? লোকের কথায় কী আসে যায় ? আমার কাছে থাকতে চাও না তুমি ? চাও তো ?

রাধিকা ক্লান্ত বোধ করে। নরম হাসে একবার। অন্ধকারে জোঁক মেলে দেখ। অন্ধে মাথা হেলিয়ে গাল রাখে তুণাকুরের কাঁধ জড়ানো হাতে। বলে— চাই। চাই।

অন্ধকারে জন ভেঙে এগিয়ে যাবার শব্দ হয়। সে-শব্দ বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে।

—